বঙ্গবাণী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ—দ্বিতীয়ার্দ্ধ

ভাদ্র হইতে মাঘ,

১৩২৯

সম্পাদক—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ও

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

প্রথম বর্ষ

দ্বিতীয় ষাণ্মাষিক বর্ণানুক্রমিক

বিষয় সূচী

ভাদ্র হইতে মাঘ

১৩২৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র

লেখক সূচী

চিত্রসূচী

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্ত্তিক

চিত্রসূচী

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

জন্মাষ্টমী

"আবার তো'রা মানুষ হ।"

প্রথম বর্ষ
১৩২৮-'২৯

ভাদ্র

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
১ম সংখ্যা

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা

বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে,—(১) বাঙ্গালায় উপাসক প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে,—(২) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় তে হইবে,—(৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত প্রায় সাতশত বর্ষকাল ন সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর স্মৃতি ও দায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা জানিতে বে—(৪) বাঙ্গালীর জাতি এবং কুল-পরিচয় পূর্ণরূপে ইতে হইবে। এই য়টা বিষয় মত ব্যাখ্যাত হইলে তবে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বাঙ্গালীর ন্ত্র্য বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার মূল উপাদান। এমন কি বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডে, যজ্ঞাদিতে ালী ভবদেবের পদ্ধতি মান্য করিয়া চলে, অন্য কোন আর্য পদ্ধতিকারকে গ্রাহ্যই করে

দায়তত্ত্বে জীমূতবাহন বাঙ্গালীকে অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছেন; দায়ভাগ বাঙ্গালার য়ানীকে অনেকটা Territorial বা দেশগত ও জাতিগত করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেব,

হয়, সে ততোঽধিক মূর্খ।' সোজা কথা এই; বাহিরের দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া, যাগযজ্ঞাদি পরিহার করিয়া পরমাত্মার পূজায় ব্যাপৃত হও। ইহাই বাঙ্গালার ধার্ম্মিকগণের আদেশ, ইহাই বাঙ্গালার সকল সাম্প্রদায়িক উপাসকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর উপাসনা-তত্ত্ব বিন্যস্ত। বাঙ্গালীর দেহতত্ত্ব বেদের Deismএর প্রতিবাদ। বাঙ্গালীর দেহতত্ত্বর প্রভাবে বাঙ্গালায় বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি লোপ পাইয়াছিল; আমাদের মনে হয় বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এবং Deism কোন কালেই বঙ্গদেশে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

দেহতত্ত্ব

এই দেহতত্ত্বের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র নিহিত আছে। তাহার পুরাপুরি ব্যাখ্যা মাসিক পত্রের সন্দর্ভে সম্ভবপর নহে। তথাপি মোটামুটিভাবে এই সম্পর্কের গোটাকয়েক তত্ত্ব বলিয়া রাখিব। সহজিয়া সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে অনেকের দোঁহাবলীতে এই কয়টা সিদ্ধান্ত আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আমার মনে হয়, এই কয়টা সিদ্ধান্তই বাঙ্গালার সাহিত্যে, ভাষায়, গানে, কীর্ত্তনে, সাধনে-ভজনে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

(১) ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—যুক্তিতর্কের দ্বারা, চাক্ষুষ বা পরোক্ষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা যখন বহির্দ্দেবতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না, তখন তাঁহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া প্রয়োজন নাই। অজ্ঞেয়ত্বাৎ তিনি এখন বর্জ্জনীয় হইয়া থাকুন।

(২) ঈশ্বর অনন্ত অজ্ঞেয়, তাঁহার অনাদি সৃষ্টিও অনন্ত এবং অজ্ঞেয়। তবে একটা ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিত এবং চেষ্টা করিলে ও সাধনা করিলে হয়ত তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। ক্ষুদ্রের এবং ব্যষ্টির ক্রিয়া এবং ক্রিয়াফলের পরিচয় পাইলে হয়ত আমরা মহানের, গোষ্ঠীর এবং সাকল্যের পরিচয় পাইলেও পাইতে পারি।

(৩) মানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার নহে কি? জীব হইতে জীবের উৎপত্তি বিশ্বসৃষ্টির অংশ স্বরূপ একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়জনক কাণ্ড নহে কি? কেমন শক্তি দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছে যাহার প্রভাবে নূতন জীবের উৎপত্তি ঘটিতেছে? সেই দেহস্থ শক্তির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত অপূর্ব্বা মহতী শক্তির কতকটা পরিচয় পাইতে পার। এই দেহতত্ত্ব বুঝিলে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিবে।

(৪) দেহস্থ এই শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী;—"বিষতন্তুময়ীদেবী সর্ব্বদেহপ্রসারিণী"—পদ্মের নালের সূক্ষ্ম সুতার মতন এই শক্তি জীবদেহের সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত রহিয়াছেন। ইহা হইতেই সৃষ্টি, ইনিই জগজ্জননী। ইনিই পুরুষের চারিধারে, অনাদিলিঙ্গের সর্ব্বাবয়বে সর্পের ন্যায় জড়িত হইয়া আছেন।

(৫) দেহস্থ এই পুরুষ এবং প্রকৃতির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পুরুষপ্রকৃতির পরিচয় পাইবে। ভাব ও রসের সাহায্যে ইহাদের পরিচয় পাইতে হয়। রস মনুষ্য দেহস্থ একাদশ প্রকারের আসক্তি হইতে নির্গলিত। ভাব জীবের মিলন-আকাঙ্ক্ষা হইতে উন্মেষলাভ করিয়াছে। একটা অজ্ঞেয় অতৃপ্তিই জীবত্বের লক্ষণ। কি-যেন নাই, কি-যেন হারাইয়াছি, কি-যেন পাইলে পরমানন্দলাভ করিতে পারি ;—এই অতৃপ্তি ও লালসাই ভাবের জননী। রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন—"ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে" ; দেহতত্ত্বের বৈষ্ণব কবি গান করিয়াছেন,—"স্বপনে মন যে কেমন মানুষ রতন হেরিয়াছে, সে যে অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে।"

এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, নাম, রূপ, ভাব, রস এই চারি পদার্থকে বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে। নহিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অর্দ্ধেকটা বুঝিতে পারিবে না, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ভাবের অর্দ্ধেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এই যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের (কি রামপ্রসাদের রচিত, কি ভারতচন্দ্রের রচিত) কালী পক্ষেও ব্যাখ্যা আছে, উহার মহিমা আদৌ পরিগ্রহ করিতে পারিবে না। চণ্ডীদাস রচিত অনেক পদাবলীর অর্থ ব্যাখ্যা করিতে এখন অনেকে পারেন না, কেন না আজকালকার শিক্ষিত সমাজ দেহতত্ত্ব ভুলিয়াছে, ষট্‌চক্রভেদ জানে না। মান, মাথুর, দূতীসংবাদ, বাসকসজ্জা প্রভৃতি লীলা কীর্ত্তনে রোদনের অবসর কোথায় আছে ? অথচ বাঙ্গালী ভাবুক এই সকল কীর্ত্তনের পালা শুনিয়া কাঁদে কেন ? উহা ত করুণ রসের উদ্ভব নহে। উহা কি ? দেহতত্ত্ব বুঝিলে বাঙ্গালীর রোদনের বিশিষ্টতাটুকু বেশ বুঝিতে পারিবে,—হয়ত শেষে নিজে কাঁদিয়া আকুল হইবে। ধর্ম্মব্যাখ্যা ত করিতে বসি নাই, বাঙ্গালীর বিশিষ্টতাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। তাই সামান্য ইঙ্গিত করা ছাড়া আর কিছু এ সম্বন্ধে বলিব না।

বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব—Individualism.

আসল কথা এই, বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব তাঁহার আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলার একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রগণকে ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া মিথিলায় যাইতেই হইত। বাঙ্গালার কাণাভট্ট শিরোমণি,—রঘুনাথ মেধার এতই উন্নতিসাধন করিলেন যে, তিনি ক্রমে শ্রুতিধর হইয়া উঠিলেন। তিনি মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনাথ তাবত ন্যায় গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব

মনীষা প্রভাবে নব্য-ন্যায়ের উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ ন
এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্বরূপ হইল। ইহাই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পরিচায়ক
আবার মজার কথা, বাঙ্গালী ন্যায়ের এই অভ্যুদয় ধারা চারিশত বর্ষ-কাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়
ছিলেন, নবদ্বীপকে নব্য-ন্যায়ের অদ্বিতীয় কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"ভুবনান্তক গদাধর।"

এই উক্তির অর্থ পরিগ্রহ করিতে পার কি? গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের সমসময়ের ব
পূর্ব্বেকার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার বংশে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ৺ভুবনচন্দ্র বিদ্যার
পর্য্যন্ত, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমান ভাবে প্রধান ও সর্ব্বজন-বরেণ্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন্মগ্রহ
করিয়াছেন। এমনটি পৃথিবীর আর কোন সভ্যজাতির পণ্ডিত সমাজে ঘটিয়াছে কি? ভারতবর্ষে
আর কোন প্রদেশে, কোন পণ্ডিত বংশে মনীষার এমন অব্যাহত ধারা কেহ দেখাইতে পারে কি?
ইহাই বাঙ্গালার ব্যক্তিত্বের এবং বিশিষ্টতার শ্লাঘ্য পরিচয়। বাঙ্গালী সকল বিষয়ে চূড়ান্ত করিয়াছে।
গোটাকয়েক উদাহরণ দিব :—

(১) দায়ভাগ ও স্ত্রীধনবিন্যাসে বাঙ্গালী স্মার্ত্ত যে গণবাদের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডেও
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কল্পনামাত্র ছিল। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত সকল পুরামাত্রায় এখনও
ব্রীটিশজাতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" মিতাক্ষরার প্রকাণ্ড প্রতিবাদ,
Feudalism এর বিরুদ্ধে বিষম Protest। সহস্রবৎসর পূর্ব্বে, সকল সভ্যজাতির আগেভাগে
বাঙ্গালী এই প্রতিবাদটি করিয়া গিয়াছেন।

(২) স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন একজন বিষম Protestant ছিলেন। তিনি গোঁড়ামীর
প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব ভারতবাসীর বৈদিক গোঁড়ামীর অপহ্নবকর্ত্তা। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি
সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব এবং অতুল্য।
তাঁহারই প্রভাবে বাঙ্গালায় আচারী-দিগের "ছুৎমার্গ" দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে
নাই। রঘুনন্দনকে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইদানীং বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, অজ্ঞতাবশে
তাঁহার প্রতি অনেকে কঠোর হইয়া আছেন। রঘুনন্দন বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা উন্মেষের একজন
প্রধান সাধক পুরুষ।

(৩) শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার আর একটা উপাদান।
রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের আচার্য্য সম্প্রদায়
যে নানাবিধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সে সকল অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।
বৃন্দাবনে, মথুরায়, নাথদ্বারায় হরি কীর্ত্তন, শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি। এই সকল হিন্দুস্থানী
ভজনে ও কীর্ত্তনে শ্বপচাদি অস্পৃশ্য জাতি সকল গণ্ডীর বাহিরে স্থান পাইয়া থাকে। বাঙ্গালায়

হরি সঙ্কীর্ত্তনে সে বাধা নাই, উচ্চনীচ সকল জাতি সমান ভাবে কীর্ত্তন-আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; কীর্ত্তনের ক্ষেত্রে শ্বপচাদির স্পর্শে বাঙ্গালীর জাতি যায় না। কেবল এইটুকুই নহে, সেই কীর্ত্তন ক্ষেত্রে সকল জাতীয় কীর্ত্তনীয়ার পদরজের উপরে সোপবীত ব্রাহ্মণও ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেই কীর্ত্তন মণ্ডলার উপরে হরির লুটের বাতাসা ছড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে দেয়। এতটা বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ, কোন প্রদেশের বৈষ্ণব করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তনে এমন ব্যাপার হইয়া থাকে।

(৪) আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ গিরি বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা উন্মেষের আর দুইজন সাধক। ইঁহারাই "বাশিস্টা পদ্ধতি" অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় "শৈব বিবাহের" প্রচলন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় শাক্ত তান্ত্রিক সমাজে শৈব বিবাহের খুব প্রচলন ছিল। রাজা রামমোহন নিজেও শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নারীর জাতি বিচার করিতে হয় না, যৌবনের পূর্ণ উন্মেষ না ঘটিলে শৈব বিবাহ হইতে পারে না। এই শৈব-বিবাহের প্রভাবে বাঙ্গালায় নানা জাতির সম্মেলন ঘটিয়াছিল, এমন কি মগ, আরাকাণী, ভুটিয়া তিব্বতী, পাঠান রমণী বাঙ্গালার শাক্ত ব্রাহ্মণের গৃহকর্ত্রী হইয়াছিলেন। কুলজী গ্রন্থসকল ঘাঁটিলে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ গিরি এক পাঠান রমণীকে শক্তির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শাক্তের যেমন শৈব বিবাহ, বৈষ্ণবের তেমনি "কণ্ঠী বদল" ছিল। সহজ মতের প্রচলন প্রভাবে "পরকীয়া অর্চ্চনার" বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে খুব প্রচলন ছিল। সাহিত্য পরিষদ তাঁহাদের একখানা প্রচারিত গ্রন্থে আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বের স্বকীয়া-পরকীয়া সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব আলোচনার কাগজ-পত্র ছাপিয়াছেন। সে এক বিরাট বিচার, খোদ সুবাদার সাহেব সে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর-রাজ প্রেরিত বিদেশীয় পণ্ডিত এ বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর পরকীয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার "কণ্ঠী-বদল" সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বজায় রহিয়াছে।

(৫) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অথবা বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাই লোকে ইঁহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বলিত। দীপঙ্কর ভুটানে, তিব্বতে, চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; টেঙ্গুরে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়; নেপালে বাঙ্গালী কীর্ত্তির অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল দিন যখন বাঙ্গালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বৎ, চীন, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন যখন বাঙ্গালায় অসংখ্য বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত এবং বাঙ্গালী রমণীকে, শৈব বিবাহের সাহায্যে, শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত। "ভব্রার মেয়ে বিবাহ" বাঙ্গালা দেশে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং কুলাচারী

অন্য জাতির মধ্যে পাকস্পর্শের দিনে নব-বধূর জাতি কুলের পরিচয় লইয়া ঘোঁট হইত না। ইহা একটা বড় কথা।

(৬) দেবীবরের মেলবন্ধন এবং কৌলীন্যের নবপ্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একটা বড় পরিচয়। মিথিলায় ও কান্যকুব্জে যে কৌলীন্য এখনও প্রচলিত আছে, তাহা দেবীবর প্রবর্ত্তিত প্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেবীবর মেলবন্ধন করিয়া যে কত সাঙ্কর্য্যকে ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর এখন হিসাব করিয়া বলা যায় না। অর্জ্জুন মিশ্রের বিবাহ ব্যাপার একটা অপূর্ব্ব ঘটনা, রত্নেশ্বরের বিবাহে আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ সকলের আলোচনা, বিশ্লেষণ ও বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। কুলজা গ্রন্থসকল মন্থন করিলে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করা যায়।

(৭) বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্ব্বত্ব আছে। কবিকঙ্কন, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড় কবিই ব্রাহ্মণ, পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের Hero and Heroine নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক, সদ্গোপ, কৈবর্ত্ত, গোড়ো গোয়ালা প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ সকলই এই সকল কাব্যের নায়ক। আরও মজা দেখ, ভারত চন্দ্রের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের লেশমাত্র নাই। চণ্ডীর ঘট স্থাপন ফুল্লরা নিজেই করিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু, পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতি প্রমুখ নায়কগণ কোন জাতীয় ছিলেন? ইহাঁরা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন্ হিসাবে? কাজেই বলিতে হয় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের, জল আচরণীয় এবং জল অনাচরণীয়ের মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ত্ব আছে, যাহা এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই। "অ-শূদ্র প্রতিগ্রাহী" শব্দটা কত দিনকার তাহার আলোচনাও এই সঙ্গে করিতে হয়।

(৮) এই সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাংলা ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সে পরিচয় পাইতে হইলে প্রায় সহস্র বৎসরের বাঙ্গালা ভাষার উন্মেষ-পদ্ধতি বুঝিতে হয়; সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত ও দোহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মন্থন প্রয়োজন। এই বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। কুলজী গ্রন্থ সকল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশ" অপূর্ব্ব কাব্যও বটে, ইতিহাসও বটে। ইহা ছাড়া বাঙ্গালার সঙ্গীত সাহিত্যও অপূর্ব্ব এবং অনন্যসাধারণ। কবির গান, পাঁচালীর গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্ত্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সঙ্গীত সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই, ঘটেও নাই। অথচ বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবদ্ধ আছে।

কত আর উল্লেখ করিয়া বলিব! বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্ব্বাবয়বে, শিল্পকলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, চিকিৎসা পদ্ধতিতে, ঔষধ নির্ম্মাণে,—লাঠি খেলায়, ক্ষুরপা-রণপা নির্ম্মাণে ও ব্যবহারে, নৌশিল্পে, নৌকা প্রস্তুতিতে, কথকতায়-ব্যাখ্যায়, বয়ন-শিল্পে, তসর-গরদের বসন প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্য্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে,—সভ্যজাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী শ্রীযুত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাদের Technique ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর ভাস্কর্য্য অপূর্ব্ব ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে; বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের ঢোল বাজান অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোন জাতি পারে না। বাঙ্গালার গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর আর কোন জাতিতে পারে না। বাঙ্গালার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপসকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাইও। বাঙ্গালার "শাঁখের কাজ" বাঙ্গালীর নিজস্ব; উহা বাঙ্গালার বাহিরে ছিল না,—নাইও। এখন সে "শঙ্খ শিল্পের" নমুনা গভর্ণমেণ্ট হাউসের গোটা কয়েক স্তম্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি বাঙ্গালার জনার্দ্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্ম্মকারগণ যেমন তোপ কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিকরে তেমনটি পারিত না, জাহান-কোষা, দল-মাদল, কালে খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালীর নৌশিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোন জাতি পারিত না। বাঙ্গালার "ষাঠ বৈঠার ছিপে" চড়িয়া মীর কাসেম একরাত্রে গোদাগিরি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুম শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বাঙ্গালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেবপুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কি আর মণিমুক্তা, চুণি পান্নার লোভ দেখাও পিত, বাঙ্গালার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার সকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি।

আসল কথাটা কি জান, বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য সমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগেযুগে, বারেবারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি,

আমদানী করিয়াও বাঙ্গালায় যাগ-যজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুকগণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল। স্বীকার করি বটে যে, বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্ত হইতে, আর্য্যগণের নিকট হইতে অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যাসংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু সে সকলকে বাঙ্গালীর মনীষা যেন বাঙ্গালার কোমল, পেলব পলিমাটির আবরণ দিয়া এতই মধুর, এতই স্নিগ্ধ, এমনই রসাল করিয়াছিল যে, পরে উহা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর অনেকটা অংশ হিন্দুস্থানী কবি ও ভক্ত সুরদাস ও শ্যামদাসের অনুবাদ বলিলেও চলে; পরন্তু বাঙ্গালী মহাজন সে সকল ভাবের গানে এমন "আঁখর" এমন স্ফুটোক্তি বসাইয়াছেন যে কেবল তজ্জন্যই বাঙ্গালীর পদাবলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়া মনে হয় আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিলে, "পুনঃসংস্কারমর্হতি!" কেন না বাঙ্গালায় দীর্ঘকাল বাস করিলে সোমরসপায়ী, গোঘ্ন আর্য্যগণের জাতিনাশ ঘটিত, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট হইত। বাঙ্গালায় জৈন ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোন গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া, জীবনের অর্দ্ধেকটা কাল বর্দ্ধমান বিভাগে বা রাঢ়দেশে কাটাইয়া ছিলেন; বাসুপূজ্য উত্তর রাঢ়ে ও ভাগলপুর জেলার পূর্ব্বাংশে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জৈন ধর্ম্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথের "নাথী ধর্ম্ম" বাঙ্গালার উত্তর রাঢ়ে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। একপক্ষে জৈন তীর্থঙ্করগণ অন্য পক্ষে গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যগণ বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। আবার বলিব, বাঙ্গালী যজ্ঞবিলাসী, পশুবধে পটু সোমপায়ী আর্য্য নহেন; বাঙ্গালারই কপিল-কণাদ, বাঙ্গালাই অহিংসা পরম ধর্ম্মের বেদী, বাঙ্গালাই জৈনাচার্য্য-গণের লীলাক্ষেত্র, বাঙ্গালায় সিদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাব এখনও ধর্ম্ম-কর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট। চিনিতে জানি না, চিনিতে পারি না, চিনিতে ভুলিয়াছি বলিয়া,—বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধনতন্ত্র, ভাবের ভাষা, রসের ভাষা প্রভৃতি সব ভুলিয়াছি। আমরা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালার শ্লাঘায় আর শ্লাঘাবোধ করি না। একবার তাকাও—মালঞ্চ-বেষ্টনী পরিবৃত বাঙ্গালীর নিজ নিকেতনের প্রতি সস্নেহে একবার তাকাও,—জাতির অতীত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেহের—স্বীয় সমাজ-শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও! তাহা হইলে আবার যেমন ছিলে তেমনই হইবে, হারানিধি ফিরাইয়া পাইবে, তোমাদের শ্যামা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে।

———

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবাণী

জয় তব জয় এ ভুবনময় দীন কাঙ্গালের জননী,
যুগে যুগে যুগে তব পাদযুগে প্রণত নিখিল অবনী।
অনশনম্লান তোমার আনন,
জীর্ণ তোমার ভূষণ ভবন,
তবু শত মণি-মুকুটের শোভা তব ধূলিমাখা চরণ-ই ॥

বেদ-বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র আপন অঙ্কে বহিয়া
পিয়ায়েছে তোমা সোমরস-ধারা, জ্ঞান ত্রিদিবের অমিয়া।
মহাভারতের জলধি অতল
চিন্তামণিতে ভরেছে আঁচল,
ঋদ্ধ করেছে রামায়ণীধারা পতিত পাতকি পাবনী ॥

করিছে গিরীশ তোমায় আশীষ চির বরাভয় প্রদানে,
তুমি পবিত্রা মেনকা রাণীর অশ্রু-তটিনী সিনানে।
দ্বৈতকাম্য দণ্ডক বন
রচেছে তোমার দর্ভ আসন।
বৃন্দাবনের সুরভিরা তব যোগায় ভোগের নবনী ॥

ইয়োরোপা তোমা আরতি করেছে দিব্য জ্ঞানের আলোকে
নিশীথ ভানুর প্রেমমণ্ডল অর্ঘ্য পাঠায় পুলকে।
দূর কানাডায় জাগে বিস্ময়
মরুতে মেরুতে তব জয় জয়
ইরাণ তুরাণ, বসরাই গুলে সাজায় বিজয়-তরণী ॥

আজি কালিদাস ভবভূতি ভাস রুমী জামী গেটে দান্তে
হ্যুগো মিল্‌টন ওমার হোমার মিলেছে ত্রিদিবপ্রান্তে।
তব শির'পরে পুষ্প বরষে
করে কোলাকুলি প্রেমের হরষে।
তব গৌরব-গীতি-মুখরিত আজি দ্যুলোকের সরণী ॥

কণ্ঠে তোমার অভয়মন্ত্র দৃষ্টিতে তব অমৃত,
পরশে তোমার হয় বিদূরিত দুখ পাপতাপ অনৃত।
হৃদয়ে তোমার অমেয় ভক্তি
সঙ্গীতে তব অজেয় শক্তি
তব পদসেবা অপবর্গদা স্বর্গের অধিরোহণী ॥

শ্রীকালিদাস রায়

হারানো খাতা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কহিলা তাপস চাহি মোর মুখে—কেন দেব আজি আনিলে দিবা ?
তোমার পরশ অমৃত-সরস তোমার নয়নে দিব্য বিভা।
—কাহিনী।

আট বৎসর আগের কথা ;—বর্ষার ঝিপ্ ঝিপে বৃষ্টি কাদায় রাস্তা ঘাটের দুর্দ্দশা যেমন হইতে হয় তেম্‌নি হইয়াছে। আকাশ ঘোলাটে, ঢলনামা গঙ্গার জলের মতই তাহারও যেন কর্দ্দমাক্ত ময়লা রং। সূর্য্যের দেখা শোনা পাওয়াই ভার, রাত্রে চাঁদ তারা যে কত দিনই ওঠেন নাই তার হিসাব ছিল না। এই রকম সময়ে একদিন চাঁপাতলার গলির মোড়ে একখানা মোটর গাড়ী কষ্টে স্বষ্টে প্রবেশ করিল, কিন্তু প্রবেশপথেই তার কল বিগড়াইয়াছিল, সে আর চলিল না। গাড়ীর আরোহী দুজন ইহাতে বেজায় বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ মাদ্রাজী সোফারের সঙ্গে বকাবকি করিলেন ও শেষটায় অগত্যাই নামিয়া পড়িতে হইল।

দুজনের মধ্যে একজন অপর জনকে বলিলেন, "ওহে ননি! আজ আর তাহলে হলো না, চলো ট্যাক্সি নিয়ে সিনেমা টিনেমা কোথাও একটা ঘুরে আসা যাক।"

ননী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কিন্তু আমার মুখে তার গানের খ্যাতি শুনে আপনি যে তার গান শুনতে আসবেন, এ খবর আমি পাঠিয়েছি। ডালিম আপনার জন্যে যে অপেক্ষা করে থাকবে। আমি তাকে খবর দিয়েছি যে থিয়েটারে তোমার গান রাজা বাহাদুরকে মুগ্ধ করে দিয়েছে!"

'রাজা বাহাদুর' অপ্রসন্ন ভ্রূকুটী করিলেন "তা বলে তো আর কাদা মাখামাখি হয়ে যেতে পারিনে। অত সব বল্‌তে গেলে কেন? একদিন শুন্‌লেই চল্‌তো।"

আর কি বলিতেছিলেন বলা শেষ হইল না, পথের পাশের কর্দ্দমাক্ত অন্ধকার হইতে কে বলিয়া উঠিল—"বাবু! বাবু মশাই গান শুনবেন?"

নরেশচন্দ্র কি বলিতেছিলেন ভুলিয়া গিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওই শোন হে ননীলাল! গান শুনবার আবার অভাব কি, যে তার জন্য এই গলির কাদা ভাঙ্গ্‌তে হবে? গান স্বয়ং এসেই আমাদের আমন্ত্রণ করচে!—কই কে গান শোনাতে চাইছিলে? এসো না, গান আমি শুন্‌তে রাজী আছি।"

মোটর গাড়ীর পাশ কাটাইয়া অর্দ্ধান্ধকার গলির ওধার হইতে একটি ছোট্ট মেয়ে এধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটীর পরণে একখানি গোলাপী রংএর সন্তোষপুরের ডুরে, গায়ে একটি ঢলঢলে গোলাপী সিল্কের বাজারে বে-া জ্যাকেট, এক হাত কাঁচের ঝুরো চুড়ি, কপালে তেলেজলে চকচকানো চুলের পাতা নামানো এবং তাহারই নীচে একখানা বড় গুলপোকার টিপ। বয়স তাহার সাত আট বছরের বেশী মনে হয় না। পাতলা ও অপুষ্ট দেহ, কিন্তু রংটুকু দিব্য ফুট ফুটে এবং মুখখানিও সুন্দর।

এই বৃষ্টির রাত্রে জনবিরল অপরিচ্ছন্ন গলির মধ্যে একা এমন সুসজ্জ একটি ছোট বাঙ্গালীর মেয়েকে গান শুনাইতে ব্যগ্রভাবে উদ্যত দেখিয়া নরেশচন্দ্র কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। সাজ পোষাক চেহারায় তাহাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে মনে হয়, ভিখারীর মেয়ে কখনই নয়। তবে এমন করিয়া সে পথের মধ্যে গান শুনাইতে চাহিল কিজন্য—এই কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। এমন সময় মেয়েটী ঈষৎ একটুখানি সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! এইখানেই কি দাঁড়িয়ে গান শুনবেন? না আমার বাড়ীতে আসবেন?"

ননী এই কথায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া কৌতুকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, "ওহে, রাজা! খুকিমণিটি যে আবার বাড়ীতেও ডাকে হে! ব্যাপারখানা কি?"

নরেশ কিছু ব্যথিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কতদূর? তোমার গান শুনলে তোমাকে কিছু দিতে হয়?—না অম্নি গান শুনাও?"

মেয়েটীর চোখে জল আসিয়াছে তাহা নিকটস্থ মোটরের আলোয় দেখা গেল, সে ঢোক গিলিয়া গিলিয়া সেই চোখের জলটাকে দমনে রাখিল ও কাঁপা ঠোঁটে জবাব দিল, "অম্নি ত শোনাই না, পয়সা দিতে হয়।"—বলিয়াই তারপর হঠাৎ যেন চমক-ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "অ বাবু! আসুন না, গান শুনবেন আসুন না। আমি খুব ভাল গাইতে পারি। সত্যি বলছি।"

ননী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুনশ্চ বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজী ঝাড়িল, "হোয়াট এ লিট্‌ল উইচ সি ইজ!"—তারপর সেই মেয়েটিকে বলিল "এই বয়েস থেকেই খুব তো তৈরি হয়ে উঠেছ দেখ্‌ছি! ঘরে তোমার আর কেউ আছে বল্‌তে পারো, না তুমিই?"

মেয়েটী আবার জলভরা চোখে ঘাড় নাড়িল এবং আবার সেই রকম ঢোক গিলিতে গিলিতে অশ্রুজলে-ভেজা অস্পষ্টস্বরে "আমার মা আছে, মার বড্ড অসুখ—" বলিয়াই হঠাৎ সে দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "তৈয়ারি" সে যে এখনও হইতে পারে নাই—তাহাই যেন ওই রকমে সে ইহাদের কাছে প্রমাণ করিয়া দিল।

একটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই নরেশচন্দ্র সকল অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। কি দারুণ দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াই এই কচি বয়সের মেয়েটী আজ কি নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যের হস্তে নিজেকে ঠেলিয়া দিতে আসিয়াছে,

সেই ভয়াবুহ কাণ্ডটা যেন একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার মূর্ত্তিতে নরেশের দুই চোখের সাম্‌নে অগ্নিময় হইয়া উঠিল। এই সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত জীবগুলার শেষ দুরবস্থা তাহাদের পাপের ভার প্রায় এই রকমেই ভরাইয়া তোলে। কোন পতিতপাবন যদি নিজে আসিয়া এদের একটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই হয়ত এর একটু সদুপায় হয়! করুণায় একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েটীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কি বেশীদূর? কাছে হয়ত আমি যাব।"

মেয়েটী রুমালে চোখ মুছিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ওই বড় বাড়ীটার একতলার একটা ঘরে আমি আর মা থাকি, দূরে যেতে আমার ভয় করে, আমি পারি না।"

নরেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলো।"

সোফার বলিল "রাজা সাহেব! গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে।"

ননী উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাব করিল, "ওহে, তাহলে এটিকে কিছু দিয়ে দিয়ে ডালিমের ওখানেই যাওয়া যাক্ চলো।"

নরেশ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়াই অগ্রসর হইতে থাকিয়া সঙ্গিনী মেয়েটীকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটী বলতো?"

সে বলিল "সুষমা।"

"তুমি ক' বছরের?"

মেয়েটী বলিল "নয়।"

"নয়! তা কিন্তু মনে হয় না। আচ্ছা গান গেয়ে তুমি রোজ কত করে পাও?"

সুষমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর আবার তেমনি সলিলার্দ্রকণ্ঠে উত্তর করিল, "এই তিনদিনে এক টাকা বার আনা পেয়েছি, তাতে মার এক শিশি ওষুধই হয়নি। নরেশ কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অত কম কেন? একটা গানে কত নাও?" সুষমা বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, সে এবার আর তাহা গোপন চেষ্টা না করিয়াই জবাব দিল, "কত আর নিই, যে যা দেয়। কেউ শুন্‌তেই চায় না, অনেকে এমন ঠাট্টা করে যে আমার গাইতে ভাল লাগে না। আজ তাই সারাদিন আসিনি, এখন মার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—কি করি তাই এলুম। না হলে——"

মেয়েটী আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তাহার ক্ষুদ্র শরীরটুকু দুলিয়া দুলিয়া উঠিয়া তাহার অসহ্য দুঃখ জানাইয়া দিতে লাগিল।

পাপের পরিণাম যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়। বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও সুগন্ধার রোগে রোগে এমন দশা হইয়াছিল যে চোখে সে যেন দেখা যায় না। সেঁৎসেঁতে ঘরের মেঁজেয় ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ বিছানায় কঙ্কাল মূর্ত্তির মত মা পড়িয়া

পড়িয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, গৃহসজ্জার মধ্যে দু' একটি ওষুধের শিশি, একটা জলের ঘটি ও এক পাশে দু' একটা হাঁড়িকুঁড়ি ও ময়লা কাপড় চোপড় পড়িয়া আছে। এই ভয়ানক দুরবস্থাপন্ন গৃহের মধ্যে গৃহস্বামিনীর কন্যা আসিয়া যখন দাঁড়াইল, এই ঘরের গৃহবাসিনীর সহিত তুলনায় তাহার সাজসজ্জাকে তখন কত বড় যে কৃত্রিম বলিয়াই বোঝা গেল, সে যেন বাহিরে থাকিতে অনুভবও করা যায় না। মেয়ের সাড়া পাইয়াই সেই কঙ্কালাবিশিষ্ট মুমূর্ষু তার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে প্রবল তীক্ষ্ণ স্বর বাহির করিয়া বদ্ধ জন্তুর অনুপায় হিংস্র গর্জ্জনের অনুকল্পে চেঁচাইয়া উঠিল, "পোড়ার মুখী! এরই মধ্যে যে আবার ছুটে চলে এলি বড়? এবার যদি পয়সা না নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিস তো এই মরতে মরতে উঠেও খেংরাতে পিঠের চামড়া তুলে নেবো জেনে ঢুকতে আসিস্। পোড়ার মুখী তোর আবার ভদ্দরআনির অত পটপটানি কেন শুনি? লোকে ঠাট্টা করলে ওঁর লজ্জায় মাথা কাটা যায়! ওরে আমার লজ্জাবতী লতারে! এর পরে খাবি কি-করে? দাসীগিরি করলেও যে কোন ভদ্দর লোকের ঘরে তোকে ঠাঁই দেবে না।"—

সুষমা ছলছলে চোখে মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুগাঢ়স্বরে কহিল—"রাজাবাবু গান শুনতে এসেছেন।"

"ওমা! তাই বল্! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, যে আমার মতন দীনের কুটীরে আজ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো! ওমা, ও সুষমা! আসনখানা এনে রাজাবাবুকে পেতে দাও, মা পেতে দাও! আঃ এমন আধমরা হয়েও পড়ে আছি যে, উঠে বসে আপনাদের মতন মহাজনদের একটু সম্বর্দ্ধনা করে নেবো সেটুকুও শক্তি নেই।"

নরেশ ও ননীলাল আসন গ্রহণ করিলেন, সুষমার গানও একটার পর একটা করিয়া তিন চারটে শোনা হইয়া গেল। গলা শুনিয়া নরেশের তো বটেই, এমন কি ননীবাবুরও আর এই সন্ধ্যাটাকে নিতান্তই ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল না। গান শুনিয়া নরেশ সুগন্ধাকে বলিলেন, "সুষমার এমন গলা ওকে কেন কোন থিয়েটারে দাওনি?"

সুগন্ধা ফোঁস করিয়া একটা জ্বলন্ত নিশ্বাস ফেলিল, "দেখুন, রাজা সাহেব! পাপের পথে যতই এগিয়ে গেলুম, পাপের ভারে মন আমার ততই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সুখ খুঁজতেই বাড়ীর বাইরে এসেছিলুম, খুঁজে দেখলুম,—একটা কণাও পেলুম না। আমার সেই কুঁড়েঘরে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, এই বাড়ীর তেতালাতেও তা পাইনি, তাই বড় সাধ ছিল ওকে ও পথে আর যেতে দেবো না। ওর গলার জন্যে বছরখানেক আগে থেকেই ওর জন্যে ওরা দর দিচ্ছিল, আমি দিইনি। কি মনে করেছিলুম জানেন? আমার সব টাকা দিয়ে ওর জন্যে কোম্পানির কাগজ কিনে দোবো, তার আয়ে ওর খাওয়া পরা চলবে, আর ওকে খুব গান বাজনা শেখাব, বড় হয়ে ও একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলবে, তাই থেকে ওর নামও হবে, পয়সাও হবে, আর ধর্ম্মও থাকবে। তা হলো না। তা হলো না,—ভগবানের ইচ্ছে নয়—তা হলো না।"

নরেশ এই রূঢ়ভাষিণী নিষ্ঠুর প্রকৃতির পতিতা মায়ের মনের ।৩৩।৫।।। -।
ও সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার জন্য অনেকখানি সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার টাকা ছিল, তাহলে এমন হলো কেন?"—

সুগন্ধা বলিল "ঠকিয়ে নিলে মশাই! ঠকিয়ে নিলে! ভদ্রলোক মনে করে শ্যামলাল পাইনের হাতে দশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজ কিনতে দিলুম। সেই টাকা নিয়েই সে ফেরার হলো! উল্টে তার পিছনে পুলিসে ডিটেক্‌টিভে কত রকমে কত টাকাই আমার খরচ হয়ে গেল মশাই! ধনে প্রাণে আমায় সে মেরে গেল! তা যদি ধর্ম্ম থাকেন, তা হলে একদিন ঐ টাকা নেওয়া তার বেরুবে, ওম্‌নি হজম করতে পার্ব্বে না।—" আরও অনেক কটূক্তি সে তাহার নিজের ধনের অসৎ পথের অংশীদারের উদ্দেশ্যে ফোয়ারার মতই উৎসারিত করিয়া দিল। তারপর মনের জ্বালা, গালির বন্যায় অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে পরে, কথঞ্চিৎ শান্তভাবে পুনশ্চ নিজের কাহিনী ফিরিয়া আরম্ভ করিল। অনেক আড়ম্বরে নিজের সুখ-ঐশ্বর্য্যের দিনের সবটুকু খবর দিয়া মোট কথা সে এইটুকু জানাইল যে, সেই চৌর্য্য ব্যাপারের পর হইতেই মনের অত্যন্ত আঘাতেই তার বাতজ্বর হয়; তার উপর উকিল বাড়ী, পুলিস থানায় ছুটাছুটি ইত্যাদিতে রোগ বাড়িয়া যায়। উপার্জ্জন বন্ধ,—চিকিৎসার খরচ প্রথমে গহনা, শেষে আসবাবপত্র বেচিয়া চলিতে থাকে। কালের ধর্ম্মে গহনাগুলায় সোনার ভাগ কমই ছিল, বিলাতি সোনা, পাথর, মতি এই সবই কিনিবার সময় দাম লাগে বেশ, বেচার বেলায় সিকি হইয়া যায়। শেষে বেচিতে বেচিতে যখন সবই ফুরাইয়া গেল কেবল প্রাণটাই বাকি রহিল, ডাক্তারও ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেও শুধু পথ্য মেলা পর্য্যন্ত ভার হইল। প্রথম কিছুদিন ধার কর্জ্জ বন্ধু বান্ধবের দয়াধর্ম্মে চালাইয়া—শেষে সে সবও যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অনুপায়েই সুষমাকে রোজগার করিতে পাঠাইতে হইল। তাহাকে থিয়েটারে পাঠানই স্থির হইয়াছে, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না। কাঁদিয়া উঠিয়া পা জড়াইয়া ধরে, বলে অত লোকের সামনে গান তাহার গলা দিয়া বাহির হইবে না;—বরং সে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া পয়সা আনিয়া দিবে, তবু ওখানে যাইতে পারিবে না।

সুগন্ধা বলিল, "দেখুন রাজাবাবু! মেয়েটার ঐ কথা শুনে আমারও কি আর বুক ফেটে যায়নি? আমিই তো ওকে সেই একরত্তি বেলা থেকে পাপকে ঘেন্না করতে শিখিয়ে এসেছি। 'আমার পাপ আমার সঙ্গেই বিদায় হোক, ওকে আমার সে যেন কিছুতেই স্পর্শ করে না',—এই যে আমার ঠাকুরের কাছে একমাত্র কামনা ছিল। কিন্তু কি করবো বলুন, পোড়া পেটের দায়ে শেষকালে তাই আমায় করতে হলো। তা আপনিই বলুন তো ও রকম ভিখিরির মতন পথে বার হওয়ার চাইতে এখন থেকেই থিয়েটারে ঢোকা ওর পক্ষে ভাল নয় কি? আপনি বরং দয়া করে ওকে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজারকে একটু বলে কয়ে দেন,—দেবেন কি?"

[illegible] তানপুরা সেতারের ওস্তাদ হইল, ননীবাবু হইল হারমোনিয়ম ও দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। [illegible] বীন শিখাইতে লাগিয়া গেল। ইংরাজী বাংলা চিত্তকে বিপুলবলে আকর্ষণ করিল। আহা এই [illegible] নরেশচন্দ্র আবজ্ঞনা অসহায় জীবনটীকে সে যদি আজ তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া যায় তাহা হইলে সে [illegible] সমুদয় পাপ এবং তাপের জন্য সম্পূর্ণরূপেই দায়ী হইয়া থাকিবে না? তাহার বুদ্ধি তাহার বিবেক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়, তাহাকে,—শুধু একমাত্র তাহাকেই এই অসহায় জীবটীর সমস্ত দুর্দ্দশার জন্য এখানে নাই হোক আর এক লোকের সব চেয়ে বড় দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবেই হইবে। তখন সে বলিবে কি? ঘৃণা করিয়া সে ইহার দিকে চাহে নাই, এই কথা কি জোর করিয়া বলিতে পারিবে? ঘৃণা বাস্তবিকই তো ইহাদের তাহারা করে না! তা করিলে ডালিমের গান শুনিতে এই বর্ষার রাত্রে বাহির হইয়াছিল কিসের জন্য? অবজ্ঞায় তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম,—এমন কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিতে, লজ্জায় কি মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা করিবে না? তিনি যে এর আসন্ন বিপদের ঠিক সন্ধিক্ষণেই তাহার রক্ষা-হস্তের মধ্যেই এই অনন্যসহায় ভীরু দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তখানি টানিয়া আনিয়া তুলিয়া দিয়াছেন! কেমন করিয়া সে ইহার এত বড় দুর্দ্দশার দিনে ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? না সে তাহা পারে না।—মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তো নয়ই, অমানুষ হইলেও নয়। সৃষ্টির মধ্যে যে কদর্য্য সৃষ্ট কাক,—তারাও সহায়চ্যুত কোকিল শিশুকে নিজের কুলায়ে লালন করে, ফেলিয়া দেয় না।

নরেশ একটু পরেই বিদায় লইলেন, আসিবার সময় সুষমার হাতে দশটী টাকা দিয়া তার মাকে বলিয়া আসিলেন, "সময় মত তিনি আবার আসিবেন, তাহাদের খরচ তিনিই দিবেন কিন্তু আজ হইতে সুষমা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে এবং তাঁহাকে না জানাইয়া বাড়ীর বাহির হইতে পাইবে না।"

সুষমার বয়স যদি ন বছর না হইয়া চৌদ্দ হইত তো সুগন্ধা বা ননীবাবু কিছুই বিস্মিত হইত না। তাহা নয় বলিয়াই দুজনেই একটু একটু বিস্ময় বোধ করিল। কিন্তু তখনি কি ভাবিয়া লইয়া পতিতা করজোড়ে কহিল, "কিন্তু আমারও একটি নিবেদন আছে রাজাবাবু! আপনি দেবতা জানেন?"

"কেন?"

"তা হলে দেবতার নাম নিয়ে শপথ করতে হবে, সুষমাকে আপনি কোন দিনই ত্যাগ করতে পারবেন না।"

নরেশ শুধু বলিলেন, "আচ্ছা।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গগন ব্যবধান, তবুও মনঃ-প্রাণ, না সঁপি যদি বুক না ফাটে ও
তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,—
ভাঙিলে সে স্বপন—মরিতে নার যদি—বলনা 'প্রেম' তবে কভু তায়।

—তীর্থরেণু।

সুষমার মা মাসখানেকের মধ্যেই মরিল। তখন সুষমাকে লইয়া নরেশ একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। পতিতার গর্ভজাতা কন্যাকে নিজের ঘরে আনিয়া রাখা সঙ্গত নয়; অথচ থাকেই বা সে কোথা! তাহার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির যে পরিচয় তিনি পাইতেছিলেন তাহাতে তাহার প্রতি মমতায় চিত্ত তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়াই উঠিতেছিল, এমন জীবনটা যেমন করিয়াই হোক তাঁহাকে নির্ম্মল করিয়া রাখিতে হইবে; পাঁকের মধ্যে জন্মিলেও তাহাকে পঙ্কজরূপে ফুটিয়া উঠিতে সহায়তা করিতে হইবেই ভাবিয়া চিন্তিয়া ভবানীপুরের প্রান্তে এই ছোট্ট বাড়ীখানি তাহার নামে কিনিয়া দিলেন। একটা বুড়ো দরওয়ান ও একটী বুড়ো চাকর রাখিয়া তিনি সেই বাড়ীতে এই ভিন্ন জগতের মেয়েটীকে এক রকম বন্দীদশাতেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঝি প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়াই রাখিলেন না। কারণ, ইহার পরিচর্য্যা করিতে স্বীকৃতা হইবে এমন দরের যে ঝি, অসৎ শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয় তাদের মত অল্পই পাওয়া যায়। এই রকমই নরেশের বিশ্বাস ছিল।

সুষমার মায়ের সাধ ছিল মেয়ে সঙ্গীত কলাটা ভাল রকমে আয়ত্ত করিয়া তাহারই চর্চ্চায় ও শিক্ষায় জীবনোৎসর্গ করিতে পারে। নরেশচন্দ্রের ইহা অসঙ্গত ঠেকিল না, এই রকমই একটা কোন পথ ইহাদের জন্য তৈরি করিয়া না দিতে পারিলে এদের জীবনই বা আশ্রয় পায় কোথায়? আজকাল তো অনেকেই মেয়েবউদের গানবাজনা শিক্ষা দিতেছেন, এদের মধ্যে যারা পাপের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুপথে জীবিকার্জ্জন করিতে চায়, তাদের লইয়া যদি একটী সঙ্ঘ তৈরি করা যায়,—অবশ্য বিশেষভাবে পরীক্ষা লইয়া,—তবেই ইহাতে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। তাহারা অন্তঃপুরিকাদের গানবাজনা শিখাইতে পারে। বৈষ্ণবীরা তো অন্তঃপুরে ভিক্ষা লইতে যায়, মিসনরী মেমেদের সঙ্গে যে সকল দেশীয় খৃশ্চান মেয়েরা যিশুর গান গাহিয়া ও শেলাইবোনা একটু আধটু শিখাইয়া বেড়ায় তাদের মধ্যেও তো ঢের জিনিষ ছিল, ধর্ম্মশিক্ষার ও সঙ্ঘ-মধ্যের শাসন সংযমতায় তারাও ত সংযতভাবে চলিতে শিখিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার অধিকার লাভ করিয়াছে। তেমনি এদের লইয়াও যদি একটা কর্ম্মশালা খোলা যায় মন্দ হয় কি? অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নরেশচন্দ্র ওস্তাদ রাখিয়া সুষমাকে গানবাজনা ভাল রকমেই শিখাইতে লাগিলেন।

হরিধন ঠাকুদ্দা তাহার তানপুরা সেতারের ওস্তাদ হইল, ননীবাবু হইল হারমোনিয়ম ও এসরাজের এবং একজন বুড়া হিন্দুস্থানী আসিয়া বীন্ শিখাইতে লাগিয়া গেল। ইংরাজী বাংলা লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও হইল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নরেশচন্দ্র আবর্জনা ঠেলিয়া ফেলিয়া ধূলা ময়লা কাটাইয়া ইহার ভিতরকার খাঁটি সোনাটুকু ধুইয়া বাহির করিতে চাহিতেছিলেন। কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে দৈবাৎদৃষ্ট একটা বৃদ্ধ সাধুর প্রতি তাঁহার বড় শ্রদ্ধা জন্মিলে সে তাঁহাকে ইহার নিকট টানিয়া আনিলেন। মেয়েটার ভিতরকার আগ্রহ ও সদিচ্ছা সাধুটীকেও বিগলিত করিল, তিনি সানন্দে ও সাগ্রহে উহাকে যখন তখন আসিয়া সংস্কৃত পরিচয় করাইতে আরম্ভ করিয়া মুখে মুখে নারীশাস্ত্রের অনেক শিক্ষাদানই করিলেন। ইহাঁকে পাইয়া সুষমা নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ করিল। এমন মহৎ সঙ্গ ও প্রকৃত স্নেহ সে ত কল্পনাতে কখনও পায় নাই।

এদিকে কিন্তু বাহিরে বাহিরে নরেশ ও সুষমা সম্বন্ধে অনেক কিছুই রটিয়া উঠিতেছিল। নরেশ—অবিবাহিত ধনী ও নিরভিভাবক নরেশ একটা কম বয়সের সে যে কত কম সে হিসাব রাখিতে কার গরজ পড়িয়া গিয়াছে—মেয়েকে একখানা সাজান বাড়ীতে রাখিয়া তার উপর বিস্তর খরচপত্র করিতেছেন, তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা আসিয়া সেখানে গানবাজনার মজলিস জমাইয়া তুলে;—আবার সে মেয়েও দেখিতে ভাল, গায় ভাল, বাজায় উৎকৃষ্ট!—এসব যোগাযোগের মধ্যে সাধারণতঃ মানবকল্পনা কিসের সন্ধান পাইয়া থাকে! কাজেই চারিদিকে সুষমা সম্বন্ধে যে গুজব রটিল, সে তার বেশ অনুকূল নয়। নরেশের বাকি বন্ধু যারা, তারা ননীবাবুদের প্রতি তীব্র ঈর্ষাপ্রদর্শন করিয়া নরেশকেও তাঁহার একচোখোমার জন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ ও অনুযোগ করিতে থাকিল। নরেশ ব্যস্ত হইয়া সকলকেই অল্প বিস্তর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তাহাদের আন্দাজ একেবারেই ভিত্তিহীন, সুষমা তাঁহার আশ্রিত।—আর কিছুই নয়। সে নেহাৎ ছেলেমানুষ এবং অত্যন্ত নির্ম্মল। বন্ধুরা মুখ টিপিয়া চোখের ইসারা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "বেশতো, আমাদের তাতেতো কোনই আপত্তি নেই। আমরা শুধু তার দুটো গানশুনে আসতে চাই বৈতো নয়।"

অগত্যা গান শুনাইতে হইল এবং আরও দুচারবার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পার পাওয়া গেল না। দু একজন গূঢ় রহস্য করিয়া কথা কহিতে চাইতেই নরেশ চোক রাঙ্গা করিয়া চাহিলেন এবং সেই হইতে তাঁহাদের বন্ধুত্বের অবসান হইল। নিজের সম্পত্তির উপরে উঁহার প্রবল আধিপত্যের চেষ্টা বোধ করিয়া বাকি সকলে কদাচ সুষমার গান শুনিতে চাহিলেও, তাহাকে অসম্মানের ভাবে সম্ভাষণ করিতে ভরসা করে না। তবু সুষমা হঠাৎ একদিন নিজের সম্বন্ধে লোকমতটা জানিতে পারিল। 'সাধুটা' বদরিনাথ চলিয়া গিয়াছেন, সুষমার বয়স এখন ষোড়শ পূর্ণ; ননীবাবু ও হরিধন এখন শুধু সপ্তাহে একদিন করিয়া আসে, বাকি

দুজন একদিন অন্তরে। সুষমার মনটা আজকাল বড়ই শূন্য শূন্য বোধ হইতেছিল; নরেশ ইদানীং আর তেমন ঘন ঘন আসাযাওয়া করেন না। আসিলেও আর যেন তেমন প্রাণ-খোলাভাবে তাহার সহিত না মিশিয়া চুপচাপ গানের বুলিই শুনিয়া যান এবং গানের শেষে সবার সঙ্গেই, কোন দিন সকলের চেয়ে আগে উঠিয়া, নিঃশব্দে প্রস্থান করেন। কে জানে কেন সঙ্গতই হোক আর অসঙ্গতই হোক সুষমার প্রাণ ব্যথিত হয়, তাহার বুকে আঘাত লাগে।

একদিন সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিল। কালীঘাটে মহিলা সমিতি হইল। স্বদেশী সম্বন্ধে কোন ভদ্র মহিলা কি বক্তৃতা করিবেন। নরেশকে পত্র লিখিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সে সমিতিতে গেল। সে যেখানে বসিয়াছিল, কমবয়সী কতকগুলি বৌ ঝির সেইখানে সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একজন অপরকে বলিল, "দেখেছিস ওর মুখের সঙ্গে আমাদের ছোট বউদির একটু যেন আদল আসে! কে ভাই ও?"

"জ্যাকেটটির ছাঁট তো বড় সুন্দর! জিজ্ঞেস কর্‌না কাদের বাড়ার মেয়ে না বউ?"

"ওমা, বউ কি বলছিস লো! সিঁতেয় নাকি সিঁদুর আছে! জান্‌না ভাই—ও কে?"

অবশেষে জানাজানি হইল। সুষমা উহাদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত হইয়া স্বীকার করিল, তার বিবাহ হয় নাই, তার বাপকুলের কেহ নাই। তার বাপের নাম জিজ্ঞাসায় সে নিরুত্তর রহিল। তারপর কার কাছে থাকে জিজ্ঞাসায় সে যখন বলিল, একাই থাকে, তখন সেই তরুণী মেয়েরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। একটী মেয়ে বুদ্ধি করিয়া প্রশ্ন করিল "তোমরা কি ভাই ব্রহ্মজ্ঞানী, তাদের ঘরের মেয়েরা মেমেদের মতন পড়াশোনার জন্যে বোর্ডিং টোডিং-এও তো থাকে শুনেছি। সেই রকমই কি এখানে এসেছ?"

সুষমা ম্লান ও বিপন্নভাবে ঘাড় নাড়িল।

এই সময়েই একটী প্রৌঢ়া উহাদের কথাবার্ত্তায় একটুখানি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া তাহাদের সাম্‌নে আসিয়া সুষমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখি কার পরিচয় শোধান হচ্চে! ওমা! এ যে ওই 'সুষমাকুটিরে'র সুষমা গো! অবাক্ কল্লি তোরা! ও আবার নিজের পরিচয় কি দেবে তোদের শুনি? চল্ চল্, ওদিকে গিয়ে বস্‌বি চল্। ছুঁড়িগুলোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে! হরিবলো মন!—"

নিজেদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটা কোথায় ঘটিয়াছিল ভালমতে বুঝিতে না পারিলেও কোথাও যে ঘটিয়াছে সেইটুকু বুঝিয়া লইয়া সেই অনুসন্ধিৎসাপরায়ণা তরুণীর দল দুমদাম করিয়া উঠিয়া পাড়ল এবং ঝন্‌ঝন্ শব্দে অলঙ্কার বাজাইয়া সভামণ্ডপের অপর প্রান্তে চলিয়া যাইতে যাইতে পূর্ণ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "কেন গা! ওকে আপনি চেনেন?"

প্রৌঢ়া হাতমুখ নাড়া দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওমা, তা আর চিনিনে? ও যে কোথাকার এক খেতাবী রাজার রাখা মেয়েমানুষ। ওর সঙ্গে কি আর ভদ্দর ঘরের মেয়েদের কথা কইতে আছে?"

সুষমার মনে হইল, তাহার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতেছে। আলোকময় জগৎ যেন তমসাবৃত হইয়া গেল।

নরেশচন্দ্রও কিছুদিন হইতে এই সম্বন্ধীয় জ্বালা নেহাৎ কমও ভুগিতেছিলেন না। বন্ধু বান্ধবদের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুহৃদ্ ও হিতকামীর দলও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অল্প বিস্তর ভর্ৎসনাপূর্ব্বক এই সর্ব্বনেশে নেশার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। দেশ হইতে বিমাতা হঠাৎ এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহার মর্ম্ম এইরূপ—বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম তুমি একটা পতিতার সঙ্গ লইয়া উন্মত্ত হইয়াছ। তাহার পায়েই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছ। তাঁকে রাণীর বাড়া করিয়া রাখিয়াছ, তা এ সব কি ভাল? অবশ্য তোমাদের মত বড় লোকের ঘরে সবই সাজে, তথাপি বিবাহ না করিয়া শুদ্ধমাত্র হীনসঙ্গে কাটাইলে চলিবে কেন! ও সব যা আছে থাক্। এর সঙ্গে একটী বউ আন, সব গোল চুকিয়া যাক। যদি তোমার মত হয় আমার বোনঝি চামেলীর সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন স্থির করি। চামেলীকে ছোট বেলায় বোধ করি দেখিয়াছ? বড় হইয়া আরও সুন্দরী হইয়াছে। দিব্য ডাগর মেয়ে, তোমার সঙ্গে অসাজন্ত হইবে না।

এই চিঠি পাইবার পর নরেশের দ্বিধাগ্রস্ত মন যেন সম্পূর্ণরূপেই তাহার নূতন চিন্তাধারারই অনুবর্ত্তন করিয়া একেবারে স্থিরসঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী সুষমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে ইহাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।—সন্ধ্যাবেলায় একাকিনী সুষমা বসিয়া অর্গানের বাজনার সঙ্গে নিজের মধুর কণ্ঠের যোগ করিয়া গাহিতেছিল ——

"ওহে জীবনবল্লভ! ওহে সাধন-দুর্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু নীরবে যাব, হৃদয়ে লয়ে প্রেম মুরতি তব।—

হঠাৎ খুব কাছেই জুতা-পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেশচন্দ্র। তৎক্ষণাৎ বাজান বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িতে গেল।

নরেশ ব্যগ্র হইয়া বারণ করিলেন, বলিলেন, "বেশ মিষ্টি লাগছিল, জান তো গান শুনতে আমি বড় ভালবাসি। যা গাচ্ছিলে গাও, আমি শুনি।"

সুষমা আজ্ঞা পালন করিল। গাহিতে তার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। সে গাহিতে লাগিল——

"সুখ দুঃখ সব ত্যজ্য করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা দিবে তাহা মাথায় তুলি লব।"

গান থামিলে তাহার দিকে একটু নত হইয়া নরেশ কোমলকণ্ঠে কহিলেন—"নিজে হাতে 'যা' দেব, তা মাথায় তুলে নেবে কি? 'তোমার মর্ম্মের কথা' আমি না জানি তা' নয়; আজ 'আমার মর্ম্মের কথা' আমি তোমায় জানাতে এসেছি, তুমি শুন্‌বে কি সুষমা?"

সুষমা এমন সুর ইঁহার কণ্ঠে কোন দিনই শুনে নাই! আর এই সব কথা! সে ত্রস্ত বিস্ময়ে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

নরেশ তাহা বুঝিতে পারিয়া কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন ও তাহার দৃষ্টি হইতে নিজের চোখ সরাইয়া লইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "আমি তোমায় ভালবাসি।"

সুষমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেশ দেখিলেন সে হাত দুখানা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি দুই হাতে তাহার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"অনেকদিন থেকেই তোমায় আমি ভালবেসেছি, দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছিলাম, পার্‌লাম না, তুমিও তো আমায় ভালবাস—আমার হও। আমি তোমায় চাই।"

সুষমা জোর করিয়া তাঁহার হাতের মধ্য হইতে নিজের মুখ ছিনাইয়া লইয়া পিছু হাটিয়া গেল, বারেক মাত্র তাহার শান্ত, সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধ, দৃষ্টি দীপ শিখার মতই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ললাটের শিরা সকল স্ফুরিত হইয়া ধূমকেতুর মত দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সে একটী মুহূর্ত্তের জন্য! পরক্ষণেই নরেশের পায়ের তলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া সে দুটী হাত জোড় করিয়া বলিল—

"আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার সাধ্য আমার নেই; কিন্তু ইহলোকে আপনিই যে আমার একমাত্র আশ্রয়। আপনার প্রতিও শ্রদ্ধা হারালে কি নিয়ে আমি বাঁচবো আমায় তাই বলুন?—" থরথর করিয়া বায়ুতাড়িত পুষ্প-পেলবের ন্যায় দুখানি ঠোট কাঁপিয়া উঠিল, ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পাতায় জমা শিশিরের মত ঝরিয়া পড়িল।

নরেশ তাঁহার কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নিতান্ত দুঃখিতভাবে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি আমায় ভুল বুঝেছ সুষমা! তেমন করে তোমায় আমি পেতে চাইনি। আমি স্থির করেছি তোমায় আমি বিয়ে করবো।"

বিদ্যুৎছটার মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুষমা উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "আপনি আমায় বিয়ে করবেন! আমাকে! নিশ্চয়ই আপনার মাথার ঠিক নেই; কিম্বা—"

নরেশ মনের মধ্যে ঈষৎ লজ্জানুভব করিলেও তাহা গোপন রাখিয়া সপ্রতিভভাবেই হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আমি পাগলও হইনি, নেশাও করিনি, সহজ সজ্ঞানেই এই প্রস্তাব করচি এবং এ সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে,—তা আর বদলাবে না।"

শুনিয়া সুষমার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, সে তাহার শানিত ছুরিকার মতই উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নরেশের আবেগময় নেত্রের উপর স্থির করিয়া তেমনি নির্ম্মমকণ্ঠে জবাব দিল—"কিন্তু আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত নই। আমি আপনার স্ত্রী হতে চাই না।"

নরেশের মুখের ছবি বিস্ময় ও বেদনাহত হইয়া উঠিল "সুষমা! তুমি কি আমায় ভাল বাস না?"

বন্দুকের গুলি খাইয়া ছোট পাখীটা যেমন করিয়া ঘুরিয়া পড়ে, তেমনি করিয়াই মুহ্যমানা সুষমা আবার নরেশের পায়ের তলায় ফিরিয়া বসিয়া পড়িল। অনাহুত চোখের জলকে প্রাণপণে রোধ করিতে করিতে অর্দ্ধব্যক্তস্বরে সে কহিল, "আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত কিনা ভগবানই জানেন। কিন্তু জ্ঞানতঃ আমার শরীর মন দিয়া এজন্মে আমি কোন পাপই করিনি, তাই মনের মধ্যে আপনার পূজো করাকে আমার পক্ষে দুঃসাহস বোধ করলেও তাতে পাপ করেছি বলতে পারি না। আপনি আমার দেবতা,—আমার দেবতারও বাড়া—আমার ঈশ্বর! আপনাকে মিথ্যা আমি কেমন করে বল্‌বো? কিন্তু যদি কখন জন্ম বদলে আবার মানুষের দেহ—মেয়েমানুষের দেহ—পাই, তবেই তা আপনাকে দিতে পারবো। কিন্তু এ পাপ দেহ—আমি বরং একে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবো,—তবু আপনার পায়ে দিতে পারবোনা।"

নরেশচন্দ্র এই গভীর বেদনাপূর্ণ আত্ম প্রকাশে গভীরতর সহানুভূতি ও ব্যথানুভব করিলেন। নত হইয়া সুষমার একখানি হাত হাতে লইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ আদরের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "তোমার দেহ পাপ দেহ কিসে সুষমা? কোন পাপই তো এ শরীরে তুমি করোনি, তবে কেন অন্যের পাপের কলুষে নিজেকে তুমি ময়লা করে দেখচো? জন্ম সম্বন্ধে তোমার হাত ছিল না, সেজন্য তুমি দায়ী নও। তোমার যা সাধ্য তাতে তুমি উচ্চ সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়ে উঠেচ!"

সুষমা নিজের হাত যথাস্থানেই বদ্ধ থাকিতে দিয়া মর্ম্মপীড়িতের ব্যাকুল বেদনার সহিত তীব্র বিলাপপূর্ণ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আপনি ভুল করচেন! আমার এ দেহ পাপ-প্রসূত, পাপ পুষ্ট, এই শরীর দিয়ে আমি আর সব হতে পারি, শুধু গৃহস্থের বউ, আর—" সুষমা নীরব হইল!

নরেশ তাহার হাতে একটু চাপ দিয়া অধীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, আর জোর করিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া সুষমা নতচক্ষে উত্তর করিল, "সন্তানের মা হতে পারি না। সমাজের বাইরে দেশের দশের ধর্ম্মের কর্ম্মের আর আর অনেক প্রকার প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আপনারা আমাদের নিয়োগ করে আমাদেরও বাঁচান আর নিজেরাও বেঁচে থাকুন, শুধু ড্রেনের মধ্য থেকে তুলে অন্তঃপুরে নেবেন না; কার মধ্যে কতখানি বিষ যে থেকে যায় তার কি কিছু স্থিরতা আছে!"

নরেশ অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহা লক্ষ্যে সুষমা আরও একটু জোর দিয়া দিয়া বলিতে লাগিল—"যেমন ব্যধিগ্রস্ত স্ত্রী বা পুরুষের বিবাহ করা অনুচিত, এবং দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্তদের বিয়ে করা মহাপাপ, তেমনি আমাদেরও এই বিষাক্ত শরীরের রক্ত দিয়ে জীব সৃষ্টির মত মহাপাপ আর সংসারে কোন কিছুই নেই। আমার মায়ের রক্ত আমার মেয়ের মধ্যে যদি—"

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুষমা দু হাত দিয়া মুখ ঢাকিল।—"আর বলবেন না, আমি পারচি না, হয়ত দুর্ব্বল সামান্য স্ত্রীলোক লোভে পড়ে যাব। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার সন্তান আমার রক্তের দোষে হয়ত—হয়ত—হয়ত ঐ পাপপথে ঐ হীন বৃত্তিতে—ওঃ ভগবান! ভগবান! এমন যেন না হয়।"

সুষমার সুগভীর হতাশার মর্ম্মান্তিক বিলাপ, মর্ম্মের একান্ত প্রাণফাটা অসহায় আর্ত্তিতার মধ্যে মিশিয়া অস্ফুট হইয়া গেল। দুহাত-দিয়া-ঢাকা মুখ সে নিজের দুই জানুর মধ্যে লুকাইল।

সুষমা চাহিয়া দেখিলনা; কিন্তু তাহার অঙ্কিত এই ভয়াবহ চিত্র নরেশের বুকের মধ্যেও বোধ করি একটা সংশয়ের আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার এতক্ষণকার দৃষ্টি ও প্রসন্ন ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়া এক্ষণে তাহার স্থলে কেমন যেন একটা সন্দেহাকুল চলচিত্ততা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কতক্ষণই এই ভাবে কাটিয়া গেল। দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি টাঙ্গান ছিল। তার পেণ্ডুলেমটা একটা ভ্রমরের গঠনের, একটা পদ্ম ফুলের কাছে সেই ভ্রমরটা ক্রমাগত ডানা মেলিয়া আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু যেন প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, তাহারই ব্যাকুল আবেদনের সুরে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল।

তখন যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়া নরেশচন্দ্র সুষমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুষমা!"

"আজ্ঞে!"

"কিন্তু সুষো! দুটো জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষটা কি একেবারেই তুচ্ছ করবার? এ বিয়েতে আমরা দুজনেই কত সুখী হতেম সেটাও ভেবো।"

সুষমা হয়ত এই কথাটাই তখন ভাবিতেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ইহার জবাব দিল,—"এ বিয়েতে আপনাকে স্বজনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতে হবে, সমাজে হেয় হতে হবে, আর তা ছাড়া সবচেয়ে বড় যা' তাতো আগেই বলেছি। এ অবস্থায় যে সত্যকার ভালবাসে, সে কি সুখী হতে পারে? না মরে যায়? কেমন করে জানলেন যে দুজনেই সুখী হবো?"

"তাহলে কি তোমায় চিরদিনই এই অমর্য্যাদার মধ্যে ফেলে রেখে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য বলে তুমি স্থির করচো?"

"আমার জন্মই যে এই অমর্য্যাদার মধ্য দিয়ে, আপনি কি তা এত করেই বদল করতেই পারলেন—যে আরও 'আশা' করচেন? লাভে হতে এখন যেটাকে 'পুরুষোচিত দুর্ব্বলতা' বলে লোকে আপনাকে করুণার সঙ্গে মাপ করে চলে তখন তা করবেনা। আর আমি? আমি লোকের

চোখে যেমন আছি তাই থাক্‌বো। শুধু তারা ঘৃণার সঙ্গে এই কথাই বলে আমার সান্নিধ্য ছেড়ে সরে যাবে যে ওটা এতদিন রাজা নরেশচন্দ্রের—নরেশচন্দ্রের—" যে লজ্জাকর শব্দটা মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছিল না, তাহার দুশ্চেষ্ট অধ্যবসায় হইতে উহাকে মুক্তি দিয়া নরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমার কথাই হয়ত ঠিক।"

সুষমা মুখ তুলিয়া বলিল, "আরও একটী ভিক্ষা চাইবো ?"

নরেশ শুধু ম্লানমুখে চাহিয়া রহিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না।

সুষমা কহিল, "আপনাকে খুব শীঘ্র বিয়ে করতে হবে। আর যতদিন না আপনি আপনার সেই স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন, ততদিন আমায় দেখা দেবেন না।"

নরেশ গভীরতর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচনপূর্ব্বক ভারাক্রান্তচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, "আচ্ছা।"

দুজনে পাশাপাশি অর্দ্ধ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। রাত্রি তখন গভীর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উঠানভরা চাঁদের আলো যেন থমথমে নিঝুম হইয়া আছে। অঙ্গনের এক পাশে পেয়ারা গাছটায় একটা পাখী সেই প্রস্ফুট চন্দ্রালোককে দিবালোক ভ্রম করিয়া ঘুমভাঙ্গা ভাঙ্গাগলায় মিনতি করিয়া বলিতেছিল—"বউ কথা কও। বউ কথা কও।—"

বহির্দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ সুষমা দাঁড়াইয়া পড়িল, নরেশচন্দ্র নিতান্ত বিমনা থাকিলেও তাহার এই আকস্মিক অচলতা তিনি অনুভব করিলেন। চলা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া সুষমা হঠাৎ কান্নাধরা দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, "অত্যন্ত লোভ হলেও বড় হয়ে অবধি কখনও আপনাকে স্পর্শ করে আপনার পায়ের ধূলো আমি মাথায় নিতে সাহসী হইনি। আজকের মতন একটীবার আমায় সেই অধিকারটুকু দিন।" এই বলিয়াই অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই সে উপুড় হইয়া উঁহার দুই কম্পিত পায়ের উপরে মাথা রাখিল এবং বিলম্বে সেখান হইতে নিজের মাথার চুলে মুছিয়া জুতার ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেশ তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, দেখিতে চেষ্টাও করিলেন না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়া গাড়িতে উঠিলেন।

তারপর তিন বৎসরের পরে এই দেখা

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১০)

সুরাপান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া আমি সর্ব্বদাই এই ভূমিকা করিতাম যে বর্ব্বর মাত্রেই সুরাপান করে। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বর্ব্বর ছিলেন তখন তাঁহারাও সুরাপান করিতেন। এই অভ্যাস বর্ব্বর সমাজ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। আমরা যখন ক্রমে সভ্য হইতে লাগিলাম তখন হইতেই এই কু-অভ্যাস ছাড়িয়া দিলাম। এখন তোমাদের নূতন সভ্যতা আমাদের প্রাচীন শুদ্ধাচার নষ্ট করিয়া আমাদিগকেও তোমাদেরই মতন সুরাপায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ সকল কথা ধর্ম্মাভিমানী ও সভ্যতাভিমানী খৃষ্টীয়ান শ্রোতৃমণ্ডলীর ভাল লাগিত কিনা জানি না। কিন্তু তাঁরা যখন আমার স্বদেশাভিমানে খোঁচা দিতেন তখন এই পাল্‌টা জবাবটা না দিয়া আমি থাকিতে পারিতাম না।

National Temperance Societyর অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত পৃষ্ঠপোষকেরা আমার বক্তৃতা ভাল করিয়া বুঝিত কিনা, অনেক সময় সন্দেহ হইয়াছে। আমি একদিন প্রিন্স্‌টনের সুরাপান নিবারণী সভার আমন্ত্রণে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম। এই সহরে একটা প্রসিদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। আমি ভাবিয়াছিলাম যে এই সভাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক লোক উপস্থিত থাকিবেন। হরি হরি! সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি মুদি, দোকানদার, মুচি এবং মৎস্যজীবী সমাজের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মাত্র সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। কথায় বার্ত্তায় বুঝিলাম এই সহরে সুরাপাননিবারণী সভার কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে সমাজের উচ্চস্তরের লোকের কোন প্রকারের সংশ্রব নাই। আমাদের দেশের ভাষায় বলিতে গেলে সমাজে ইঁহাদের জল-চল নাই, এইরূপই বলিতে হয়। পানাহার সম্বন্ধে না হইলেও সামাজিক লোক-লৌকিকতা সম্বন্ধে ইঁহারা মার্কিণ ভদ্রসমাজে অস্পৃশ্য বটে। মান্দ্রাজে যেমন পারিয়াদের মণ্ডলীতে ব্রাহ্মণেরা কখনও পদার্পণ করেন না, সেইরূপ সাম্যবাদী য়ুরোপ বা আমেরিকাতেও নিম্নশ্রেণীর মুদি, মৎস্যজীবী, মুচি প্রভৃতির সভা সমিতিতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা কখনও যান না। আমাদের দেশে যাকে জল-চল কহে, বিলাতে এবং আমেরিকায় তাহাকে চা-চল কহিতে পারা যায়। এই চা-চলটা যাদের সঙ্গে নাই, অর্থাৎ যে যাহাকে নিজের বাড়ীতে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করে না, তাহার সঙ্গে সে কোনও প্রকারের সামাজিকতাও রক্ষা করে না। যার সঙ্গে চা-চল আছে তার সঙ্গে আবার সকল সময় টিফিন-চল নাই, অর্থাৎ চাতেই তাকে নিমন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু টিফিন বা লাঞ্চে নিজের বাড়ীতে

ডাকা যায় না। যার সঙ্গে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত চলে তার সঙ্গে আবার সকল সময় দিবসের সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য ভোজ যে ডিনার, তাহাতে নিমন্ত্রণ করা যায় না। যাদের সঙ্গে ডিনারের নিমন্ত্রণ চলে তারাই সামাজিক হিসাবে পরস্পরের সমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। লাঞ্চ বা টিফিন তার নীচে, চা সকলের নীচে। চায়ের নিমন্ত্রণটা যেন বাড়ীর দেউড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া। এ অধিকার যাদের নাই ইলেক্‌সনের সময় ভোট ভিক্ষার জন্য তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইলেও ঠিক সামাজিক ব্যাপারে তাদের সঙ্গে মেলামেশা চলে না। সুতরাং মুদি ও মুচির কর্ত্তৃত্বাধীনে যে সভা আহুত হইয়াছিল তাহাতে যে প্রিন্স্‌টন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা ছাত্র একজনও আসিলেন না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। নিউ ইয়র্কের আশে পাশে ন্যাশ্‌নাল্‌ টেম্পারেন্স্‌ সোসাইটীর যে সকল সভা সমিতিতে বক্তৃতা করি, তার অধিকাংশ স্থলেই মার্কিণ সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে বড় একটা আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হয় নাই। কেবল বষ্টনে মাত্র দু'তিনবার খুব বড় বড় সভাতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সম্মুখে বক্তৃতা করিবার সুবিধা হইয়াছিল।

ভদ্র সমাজের পরিচয় না পাইলেও এই সূত্রে মার্কিণের সাধারণ লোকের সঙ্গে অনেকটা মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে মার্কিণীয়েরা ইংরাজ অপেক্ষা বেশী উদার। শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ কথাটা সত্য বটে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকের পক্ষে ইহা সত্য নহে। নিম্নশ্রেণীর ইংরাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, যারা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া একখানা মাত্র ঘরেতে বাস করে, সেই ঘরেই রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া, শোওয়া বসা এবং অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিয়া থাকে;—উনানের পাশে একটা জলের কল আছে, সেই কলের নীচে টব পাতিয়া সেই টবেতে যারা স্নান পর্য্যন্ত করে, এমন পরিবারেও আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু ইহারা অজ্ঞ হইলেও অভদ্র নহে, নিজের সভ্যতার অভিমানে পূর্ণ হইয়া অন্য দেশের লোকের প্রতি কোনও প্রকারের অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। এ উদারতা ও ভদ্রতা মার্কিণ সমাজের এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখি নাই। বিশেষতঃ শ্বেতেতর বর্ণের প্রতি আমেরিকার নিম্নশ্রেণীর লোকের যে গভীর ঘৃণা, ইংলণ্ডে তাহা একেবারে নাই বলিলেই হয়।

আমেরিকায় যে সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাহার কোথাও কোন হোটেলে বা খাবার দোকানে (রেষ্টরোঁতে) কোন দিন কোন নিগ্রোকে থাকিতে বা খাইতে দেখি নাই। শুনিয়াছি নিগ্রোরাও এ সকল জায়গায় যান না। আর হোটেলের বা রেষ্টরোঁর কর্ত্তৃপক্ষেরাও নিগ্রোদিগকে গ্রহণ করেন না। নিগ্রোদের পৃথক হোটেল এবং খাবার জায়গা আছে। এমন কি উচ্চশ্রেণীর রেলগাড়ীতে পর্য্যন্ত কোন দিন কোন নিগ্রোকে দেখি নাই।

মার্কিণ গণতন্ত্রতার একটা প্রধান নিদর্শন আমেরিকার রেলের ব্যবস্থাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার রেলগাড়ীতে শ্রেণী বিভাগ নাই; সকলেই এক শ্রেণীর যাত্রী; কিন্তু সমাজে যখন

শ্রেণী বিভাগ আছে তখন প্রকৃতপক্ষে রেলগাড়ী হইতে শ্রেণী বিভাগ একেবারে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। মার্কিণেও তাহা হয় নাই। রেল কোম্পানীরা কেবল এক শ্রেণীর টিকেটই বিক্রয় করেন এবং তাঁহাদের নিজেদের গাড়ীতে কোনও প্রকারের শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু পুলম্যান কার কোম্পানী রেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দূরগামী প্রত্যেক ট্রেণেতেই নিজেদের কতকগুলি গাড়ী জুড়িয়া দেন; এই সকল গাড়ীতে খাবার, শোবার এবং দিনের বেলা আরাম চৌকিতে বসিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার জন্য তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাড়া লইয়া থাকেন। রেলের টিকেট কিনিয়া তাঁহাদের এসকল পার্লার (Parlour) কার বা শ্লিপিং (Sleeping) কারের টিকেট কিনিতে হয়। এইভাবে আমেরিকার ধনী ও ভদ্র সমাজ নিজেদের সুখ সুবিধার একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। এই পার্লার এবং শ্লিপিং কারগুলিকেই আমি উচ্চশ্রেণীর রেলগাড়ী কহিতেছি। এই পার্লার বা শ্লিপিং কারেতে বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন কাফ্রী আরোহীর দেখা পাই নাই।

আমেরিকার কাফ্রীদের দুর্দ্দশার কথা আমাদের এদেশেও অনেকেই কাগজপত্রে পড়িয়াছেন। কিন্তু এ যে কি ভীষণ বর্ণভেদ স্বচক্ষে না দেখিলে তাহার ধারণা করা যায় না। কাফ্রীরা ঠিক আমাদের দক্ষিণের পারিয়াদের মতন। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ-পল্লীকে অগ্রহারম্ কহে, পারিয়া পল্লীকে পার্চ্চারি কহে। অগ্রহারমে পারিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, পার্চ্চারিতে ব্রাহ্মণের পদধূলি পড়ে না। মার্কিণে শাদা এবং কালার মধ্যেও এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শাদা লোকেরা স্বতন্ত্র পল্লীতে বাস করেন, কালা লোকেরা সহরের ভিন্ন অংশে বাস করেন। আইনের চক্ষে শাদা ও কালা সমান বলিয়া, কালা লোকে যে শাদা পল্লীতে কখনও ঘর বাঁধিতে পারে না, এমন নহে। টাকা থাকিলে সহজেই ইহা পারা যায়। কিন্তু ঘর বাঁধিলেই সেখানে বাস করা যে যায় তাহা নহে। মানুষ সমাজ ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারে না। আর প্রাতিবেশীদিগকে লইয়াই সাধারণতঃ সমাজ। নিজের পল্লীর প্রতিবেশীরা বিমুখ হইলে সে পল্লীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া ওঠে। এই ভাবে আমেরিকাতে কাফ্রীদের পক্ষে শ্বেতাঙ্গদিগের পল্লীতে বাস করা অসাধ্য।

বষ্টনে একবার মাদকতা নিবারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া আমি নগরের উপকণ্ঠে মার্কিণ পল্লীতে এক গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ করি। এ পল্লীটা তখন নূতন পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চারিদিকে খোলা ময়দানের মাঝখানে তখন বোধ হয় একটা রাস্তার দুপাশে কুড়ি পঁচিশ খানা মাত্র বাড়ী হইয়াছিল। একদিন আমার বন্ধুটি তাঁর বাড়ীর নিকট, একখানা বড় ও সুন্দর বাড়ী দেখাইয়া কহিলেন যে এ বাড়ীখানি অনেক টাকা খরচ করিয়া একজন কাফ্রী ভদ্রলোক তৈয়ার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। তিনি যখন বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন এ পাড়ার কেউ তাঁহার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহে না, পল্লীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহার স্ত্রীর উপরে কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত করেন না।

পথে ট্রামে দুবেলা দেখাশুনা হয়, কিন্তু কোন প্রকারের বাক্য বিনিময় তাঁহাদের সঙ্গে কেহ করে না, এমন কি, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত এই কাফ্রী ভদ্রলোকের বালক বালিকাদিগের সঙ্গে ধূলাখেলা ত দূরের কথা, কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহে না,—এমন সামাজিক মরুতে মানুষ কি কখনও তিষ্ঠিতে পারে? ছয় মাসের ভিতরে এই ভদ্রলোককে পাড়া ছাড়িয়া, নিজের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বাড়ীটা খালি পড়িয়া আছে। তিনি সাদার দলে মিশিতে আসিয়া যে বেয়াদপী করিয়াছিলেন, তাহার শাস্তিস্বরূপ কেহ এ বাড়ীটা এখন কিনিয়া লইতেও চাহে না।

(১১)

ন্যাশ্‌নাল্ টেম্পারেন্স্ সোসাইটীর পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিয়াই আমি মাকিণ প্রবাসের সমস্ত সময়টা কাটাই নাই, পূর্ব্বেই একথা কহিয়াছি। এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষেরাও সর্ব্বদা আমার কাজের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুতরাং অবসরের অভাব হয় নাই। আর এই অবসর কালে আমি চারিদিকের সভা সমিতিতে রবাহুত হইয়া যাইতাম। কখনও বা আমার হোটেলের কোনও বন্ধু নিমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। কখনও বা পয়সা দিয়া টিকেট কিনিয়া বক্তৃতাদি শুনিতে যাইতাম। এইরূপে ন্যাশ্‌নাল্ টেম্পারেন্স্ সোসাইটীর সাহায্যে মাকিণ সমাজের ও সভ্যতার যে পরিচয় আমি পাই নাই, নিজের অধ্যবসায়ে এবং চেষ্টায় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে পাইয়াছিলাম।

আমেরিকায় প্রায় সকল বক্তৃতাতেই লোকে পয়সা দিয়া যায়। বক্তৃতা করিয়া কেবল বক্তা নিজে নন, তাঁর দালালেরা পর্য্যন্ত বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করে। এই দালালেরা বড় বড় বক্তাদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া লয়। তারাই বক্তৃতার সমুদয় আয়োজন করে এবং শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে দক্ষিণা আদায় করিয়া লয়। নিউ ইয়র্কের মেজর পণ্ড (Major Pond) একজন খুব বড় বক্তৃতার দালাল ছিলেন, এখনও জীবিত আছেন কিনা জানি না, কিন্তু বোধ হয় তাঁর কারবার এখনও চলিতেছে। আমার প্রথম বিলাত প্রবাস কালে ফরাসী দেশে ড্রাইফুসের (Drylus) মোকদ্দমা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ড্রাইফুস্ জাতিতে য়িহুদী, ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে সেনানায়কের কর্ম্ম করিতেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি জার্ম্মাণীকে ফরাসীদের সেনা বিভাগে সম্বন্ধীয় কতকগুলি গোপনীয় সংবাদ বিক্রি করেন, এই অভিযোগে ড্রাইফুস্ অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হন। ড্রাইফুসের স্বপক্ষের লোকেরা কহেন যে ড্রাইফুস্ নির্দ্দোষ, কতকগুলি শত্রু লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে। ক্রমে ড্রাইফুসের পুনর্ব্বিচারের জন্য একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। পরিণামে ড্রাইফুস্‌কে কারাগার হইতে আনিয়া পুনরায় আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। এই ব্যাপার লইয়া ফ্রান্সে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব হয় হয়

এমন হইয়াছিল।' এইজন্য ড্রাইফুসের মামলার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় এবং বহুলোকের অন্তরের সহানুভূতি এই নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয়। ড্রাইফুস্ এই পুনর্ব্বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। মার্কিণের লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে। মার্কিণের একজন বক্তার দালাল—মেজর পণ্ড কি অন্য কেহ আমার মনে নাই—ড্রাইফুসকে তিন মাসের জন্য আমেরিকায় যাইয়া বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ করিয়া দেড়লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিতে রাজী হন। ড্রাইফুস্ আমেরিকায় গিয়াছিলেন কিনা মনে পড়ে না, কিন্তু এই ঘটনা হইতে মার্কিণের লোকেরা খ্যাতনামা বিদেশীকে দেখিবার এবং তাহাদের কথা শুনিবার জন্য কি পরিমাণে অর্থব্যয় করে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ড্রাইফুসের এই ঘটনার কথা তুলিয়া আমি এক মার্কিণ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ড্রাইফুস্ ত ইংরাজী জানে না, আমেরিকাতে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা শুনিবার জন্য এত লোক যাইতে পারে কি যে তাদের নিকট হইতে তিন চারি লাখ টাকা টিকেট বেচিয়া তুলিতে পারা যায়? কারণ, বক্তাকেই যেখানে দেড় লক্ষ টাকা দিতে হইবে সেখানে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করিতে এবং দালালের মুনাফার হিসাবে আরও দেড় কি দু'লক্ষ টাকা না হইলে চলিবে কেন?

আমার বন্ধুটি কহিলেন, "টাকা প্রচুর উঠিবে। আর যারা এই বক্তৃতায় টিকেট কিনিবে তাদের অতি অল্প লোকেই ফরাসী ভাষা বোঝে, ইহাও সত্য। কিন্তু তারা বক্তৃতা শুনিবার জন্য যাইবে না, কেবল যে লোকটাকে লইয়া ফরাসী দেশে একটা রাষ্ট্র বিপ্লব হইবার আশঙ্কা দাঁড়াইয়াছিল সে লোকটার চেহারা কেমন, তাহা দেখিবার জন্যই জনতা হইবে।"

একদিন প্রাতঃকালে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক লেমান (Leman) সাহেব লাটসিয়াম থিয়েটারে সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ ও মহাভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। কৌতূহল পরবশ হইয়া আমিও টিকেট কিনিয়া বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম প্রায় দু'তিন শত মার্কিণ রমণী বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমি একটা বেঞ্চে যাইয়া বসিলাম। তখনও বক্তা আসেন নাই। আমার মাথায় কমলালেবু রঙ্গের হাতে বাঁধা পাগড়ী, গায়ে কোর্ট ও চোগা—পোষাক দেখিয়া আমি যে ভারতবর্ষের লোক, এ পরিচয় ঢাকা রহিল না। আমি বসিয়াছিলাম রঙ্গমঞ্চের নীচে, যাকে ষ্টল কহে সেখানে। দুতিন মিনিট পরেই একটী ভদ্রমহিলা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া উপর তলায় তাঁর Box-এ লইয়া গেলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল! শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বক্তা এবং সভাপতি আর আমি ছাড়া আর কোনও পুরুষ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বক্তৃতার বিষয় সংস্কৃত মহাকাব্য, এই দুতিন শত স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহ যে সংস্কৃত জানিতেন, এমনও মনে হয় না। বিষয়টি হাল্‌কা‍ও ছিল না, অথচ এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য তিনশত স্ত্রীলোকের সমাবেশ! দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আমেরিকায় কোনও বক্তা এরূপ সভায় কেবল বক্তৃতা দিয়াই নিষ্কৃতি

পান না, বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রোতৃবর্গ তাঁহাকে, যাহা বলিয়াছেন তাহার উপরে জেরা করিতে আরম্ভ করেন। আমাকেও অনেকবার এই পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। আমার ভালই লাগিত। শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতা কতটা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছেন ও কি পরিমাণে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, জেরার প্রশ্নেতে তাহার পরিচয় পাইতা। যাহা হউক, লেমান সাহেবের বক্তৃতার পরেও এই জেরা করিবার পালা সুরু হইল। আমার সদ্যঃপরিচিত মহিলা বন্ধুটি আমাকে কিছু বলিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি বক্তাকে জেরা করিবার অছিলায় উঠিয়া কিছুতেই একটা বক্তৃতা করিতে রাজী হইলাম না। জিজ্ঞাস্যও আমার কিছু ছিল না। শেষটা এই ভদ্র মহিলা দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বক্তাকে আমার কোনও প্রশ্ন করিবার নাই। কিন্তু এখানে একজন ভারতবাসী উপস্থিত আছেন। আমি সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি এই ভারতবাসী বন্ধুটিকে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করুন।" শ্রোতৃমণ্ডলী করতালি দিয়া এই কথার সমর্থন করিলে সভাপতি আমাকে লেমান সাহেবের বক্তৃতা অবলম্বনে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। কি বলিয়াছিলাম তার কিছুই মনে নাই। কিন্তু সভা ভঙ্গ হইলে অনেকে আসিয়া আমার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহাদের জ্ঞান পিপাসা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হই। এই বক্তৃতা শুনিতে যাইয়া আমার সব চাইতে বড় লাভ যেটা হয় সেটা নিউ ইয়র্কের বার্ণাড ক্লাবে নিমন্ত্রণ। এই নিমন্ত্রণের সূত্রে নিউ ইয়র্কে এবং বষ্টন সমাজের শিক্ষিত পুরুষ এবং ভদ্র মহিলাগণের সঙ্গে নানাভাবে পরিচিত হইবার কতকটা সুযোগ ঘটে।

(১২)

এই বার্ণাড ক্লাবটি মহিলাদের ক্লাব। এই ক্লাবের সভ্যেরা কেবল নিউইয়র্কেই থাকিতেন না। বষ্টন প্রভৃতি অন্যান্য সহর হইতেও বার্ণাড ক্লাবের সভ্য সংগৃহীত হইত। যতদূর মনে পড়ে, এই ক্লাবের নিজের একটা খুব বড় বাড়ী ছিল। সে বাড়ীতে লাইব্রেরী, রিডিং রুম, নিউজ রুম প্রভৃতি ত ছিলই, নানাপ্রকার খেলারও বাবস্থা ছিল। আর বোধ হয় ভিন্ন সহর হইতে সভ্যেরা নিউইয়র্কে আসিলে, এখানে তাঁহাদের রাত্রি যাপনেরও ব্যবস্থা ছিল। চা খাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া বোধ হয় সেই দিনই বিকাল বেলা আমি বার্ণাড ক্লাবে যাই। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তার মধ্যে একজনের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। ইঁনি কেম্ব্রিজের মিসেস্ ওলি বুল (Mrs. Ole Bull)। মিসেস্ বুল আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমি যে নিউইয়র্কে আসিয়াছি, একথা তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বোধ হয় আমার নাম শোনেন। আমি সে সময় বিলাতে ছিলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি কহিলেন যে আমার সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

যখন কোন শনি রবিবারে আমার অবসর থাকিবে তখনই তাঁহার আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিব, আমিও প্রতিশ্রুত হই।

আমার এও যেন মনে পড়ে যে বার্ণাড ক্লাবের এই নিমন্ত্রণের সূত্রেই নিউইয়র্কের People's Association এর সম্পাদকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তিনি তাঁর সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করেন এবং সেখানে বক্তৃতা করিতে যাইয়া নিউইয়র্ক সহরের সাধারণ শ্রমজীবী দিগের যে পরিচয় পাই তাহা কখনও ভুলিব না। এই সভার সভ্যেরা নিজেদের জ্ঞানোন্নতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ছোট ছোট দল বাঁধিয়া, কোনও দল বা গণিতের, কোনও দল বা ইতিহাসের, কোনও দল বা ন্যায় দর্শন বা মনস্তত্বের, কোনও দল বা সমাজবিজ্ঞানের আর কেহ বা সঙ্গীতাদি ললিতকলার অনুশীলনাদি করিতেন। সামান্য শ্রমজীবী হইলেও ইঁহাদের আত্মোন্নতির চেষ্টা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। ইঁহারা যে শিক্ষিত এমনও বলা যায় না। জন খাটিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করেন, সাধারণ শিক্ষালাভের অবসর তাঁহাদের কৈ? অথচ সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও সন্ধ্যার পরে আরাম বা নিকৃষ্ট আমোদ অন্বেষণ না করিয়া ইঁহারা যে এ সকল বিষয়ের অনুশীলন করিতেন, ইহাতে মার্কিণ লোক চরিত্রের একটা দিক্ আমার নিকটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

প্রতি রবিবারে ইঁহাদের সাধারণ সভা হইত। এই সাধারণ সভাতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। ছমাস পূর্ব্ব হইতে এ সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়া থাকিত। আমার নিউইয়র্ক পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সব কটা রবিবারের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একজন বক্তাকে হঠাৎ য়ুরোপ যাত্রা করিতে হয়; যে রবিবারে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল সেই রবিবারে বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে ডাকা হয়। ঘরে যাইয়া দেখি প্রায় পনের ষোল শত স্ত্রী পুরুষে তাহা পূর্ণ হইয়া আছে। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল—ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও দর্শন। বিষয়টা যেরূপ জটিল ও গুরুগম্ভীর, নাম শুনিয়াই সাধারণ লোকের আতঙ্ক হইবার কথা, কিন্তু এরূপ বিষয়ে বক্তৃতা শুনিবার জন্য এতগুলি শ্রমজীবীর সমাবেশ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দেড় ঘণ্টাকাল আমি বক্তৃতা করি, অথচ একটি প্রাণীও সভা হইতে উঠিয়া যায় নাই, নিস্তব্ধ হইয়া গভীর মনোনিবেশপূর্ব্বক আমি যাহা কহিতেছিলাম তাহার মর্ম্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল, শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখ দেখিয়া ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, বোধহয় এই বক্তৃতায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবারুণী সম্বাদের ব্যাখ্যা করি। এই কাহিনীটি একদিকে অত্যন্ত গভীর তত্ত্বব্যঞ্জক হইলেও, অন্যদিকে অনেকটা সহজবোধ্য এবং চিত্তাকর্ষক। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য খৃষ্টজগতে সচরাচর যেভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা হয়, এখানে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুকে যেমন হাতে পেন্সিল দিয়া বর্ণমালার উপরে হাত বুলাইয়া লেখা শেখান হয়, ভৃগুবারুণীসম্বাদে কডকটা যেন সেইরূপ আমাদের সাধারণ জ্ঞানবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই

চালাইয়া লইয়া গিয়া পরিণামে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখানে কিছু অতিপ্রাকৃতের কথা নাই, বিশ্বাস কর বা না কর এরূপ কথা নাই, দণ্ডপুরস্কারের কথা নাই, কেবল মানুষের সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার কথাই আছে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় তাহারই নির্দ্দেশ আছে। যারা ইতিহাস পড়ে, মনোবিজ্ঞান পড়ে, জীববিজ্ঞান পড়ে, দুনিয়াটা ওলটপালট করিয়া দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের নিকটে, হোক না কেন তারা শ্রমজীবী, আমাদের ভৃগুবারুণীর কাহিনীটি যে মিষ্ট লাগিবে এবং তাহাদের কুতূহলকে উদ্দীপ্ত করিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এ সকল যখন ভাবিয়া দেখিলাম তখন কেন যে এই দেড় হাজার লোক এই দেড় ঘণ্টাকাল অমনভাবে চিত্রপুত্তলির মত বসিয়া আমার কথাগুলি শুনিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

বক্তৃতার পরে বক্তাকে জেরা করিবা[illegible] বক্তৃতা শেষ হইবামাত্রই সভাপতি মহাশয় উঠিয়া কহিলেন যে এখন মিস্টার [illegible] আপনারা তাঁর বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিতে চাহেন তার উত্তর দিবেন। কিন্তু আমি কাহাকেও প্রশ্ন করিবার [illegible] কোনও বক্তৃতা করিতে বা বাদ বিতণ্ডা বাধাইতে দিব না। আপনাদের যাহা জিজ্ঞাস্য আছে তাহাই সংক্ষেপে এবং স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করুন।

আমি তখন আদালতের কাঠগড়ায় সাক্ষীর মতন এই জনমণ্ডলীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। একটি যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন :—

"আপনি কহিয়াছেন যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র এবং সকলের ভিতরই আছেন। ঈশ্বরকে খুঁজিতে কাহাকেও বাহিরে যাইতে হয় না। এ যদি সত্য হয় তবে এই ঈশ্বর আপনার ভিতরেও আছেন। তাহা হইলে আপনার বক্তৃতার আরম্ভে আপনি যে প্রার্থনাটি করেন, সে প্রার্থনার সার্থকতা রহিল কৈ?"

যুবকটির পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইল যে ইনি কতকটা নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী সমাজের লোক। কথার ভঙ্গীতে বুঝিলাম, ইনি ইংরাজ নহেন, রুশ বা ইটালীয়, অষ্ট্রিয়ান বা ফরাসীস্ হইবেন, ইংরাজী ইঁহার মাতৃভাষা নহে। ইতিপূর্ব্বেই এই জন-সভার সম্পাদকের নিকট শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সভার সভ্যেরা প্রায় কোন ধর্ম্মের ধার ধারে না, কোনও ভজনালয়ে যায় না, ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে ইহাদের কোনও বিশেষ প্রবৃত্তি নাই, এইজন্য ইহারা প্রতি রবিবারে নানা বিষয়ের আলোচনা শুনিতে তাঁহার সভায় আসিয়া জনতা করে। এই সকল মনে হইয়া এই যুবকের প্রশ্ন শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত এবং কি পরিমাণে যে মনোযোগ দিয়া তিনি আমার বক্তব্যের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি কহিলাম:—আমি যখন কহি যে ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন, তখন আমি ইহাও বুঝাই যে ঈশ্বর কাহারও মধ্যেই নাই। ইংরাজী কথাগুলি

এখনও মনে আছে ঃ—When I say that God is in every thing I mean also that He is in no thing.

কথাটা কহিয়াই ভাবিলাম যে এবার আমার শ্রোতৃমণ্ডলী বিকট হাস্য করিয়া আমার কথাটা উড়াইয়া দিবে। অনেক বিজ্ঞতর লোকেও এই সকল কথাকে কেবল শব্দের মারপ্যাঁচ বলিয়া উড়াইয়া দেন জানি। কিন্তু এই দেড় হাজার লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিও কোন প্রকারে কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন না। সকলে কেবল বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে, রুদ্ধশ্বাসে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে তাঁহারা আমার কথার মর্ম্ম বোঝেন নাই ইহা সত্য, কিন্তু ইহার ভিতরে যে বুঝিবার বস্তু আছে এটুকু তাঁরা দৃঢ় করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। আমি তখন বক্তৃতামঞ্চে তাঁহাদের দিকে আর এক পা অগ্রসর হইয়া আমার বাঁ হাতখানি মেলিয়া কহিলাম, মনে করুন এমন একটা বস্তু আছে যাহাকে কাটা যায় না, কোনও প্রকারে ভাগ করা যায় না। এই বস্তুটি সর্ব্বদা আপনার পরিপূর্ণস্বরূপে বিরাজ করে। তার সঙ্গে যোগ বিয়োগ চলে না। এই বস্তুটির নাম A হউক। আর এই যে আমার হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দেখিতেছেন, এদের B, C, D, E, F, এই নাম করণ করা যাউক। এখন যদি বলি এই A বস্তুটি, যাহাকে ভাগ করা যায় না, তাহা সমগ্রভাবে একই কালে এই যে আমার পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গুল, তাহাতে থাকে অর্থাৎ এই A বস্তুটি একই সময়ে একই সঙ্গে এই B, C, D, E, F এর মধ্যে রহিয়াছে, এ অবস্থায় একথা কি সত্য হয় না যে এই A বস্তু যখন Bয়েতে থাকে তখন Bকে ছাড়াইয়াও থাকে, যখন C-য়ে থাকে তখন B ও C উভয়কেই ছাড়াইয়া থাকে, এইরূপে B, C, D, E, Fএর মধ্যে থাকিয়াই আবার এই বস্তু এ সকলের প্রত্যেকের ও এই সমষ্টির অতীতে থাকে। ঈশ্বর যখন সকলের মধ্যে আছেন বলি তখন ইহাও বুঝাই যে তিনি কাহারও মধ্যে নাই, একই সঙ্গে সকলের ভিতরে ও সকলের অতীতে রহিয়াছেন।

আমি যখন এইটির ব্যাখ্যা করিতেছিলাম তখন এই শ্রমজীবী সভার সভ্যদিগের মুখ প্রথমে গম্ভীর ছিল, যেন একটা দুর্ব্বোধ্য রহস্যের সম্মুখে ইহাঁরা উপস্থিত; কিন্তু ক্রমে দেখিতে লাগিলাম দলে দলে যেন তাঁহাদের মনোপদ্ম আমার কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি যখন বক্তব্য শেষ করিলাম তখন এই দেড় সহস্রাধিক লোকের করতালিধ্বনিতে সভাগৃহে ঝড় বহিয়া গেল। আমি গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিলাম। বুঝিলাম যে পাশ্চাত্য খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজকেরা যে ভাগবত কথা ইহাঁদের কর্ণে পৌঁছাইতে পারেন না, আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাদের নিকট সহজেই বোধগম্য হয়। পাশ্চাত্য সমাজের ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে ও গড়িতে গেলে এই যুগে ভারতের সনাতন সাধনার সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

অতি মানুষ

কিষণলালের বসতি আছিল
জওয়ালপুরের কাছে,
তাহার বাড়ীর পাষাণ-প্রাচীর
এখনও সেখানে আছে।
ভীম পালোয়ান, ভীষণ গুণ্ডা—
বিবেকবুদ্ধি-হীন,
অত্যাচারের সীমা নাহি তার
চলিতেছে নিশিদিন।
সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল চোখ,
দরাজ বুকের পাটা,
কণ্ঠেতে ডুরি, হস্তে যষ্টি,
কপালে তিলক কাটা।
ভালবাসে সে যে মল্লযুদ্ধ
বাহুতে বাহুতে রণ,
ভালবাসে সদা রক্তারক্তি
অস্ত্রের ঝন্ ঝন্।
বিশ্বাস তার, রঞ্জিত ধরা
হ'লে রক্তের রাগে,
অত্যাচারের মধ্য হইতে
জগদ্ধাত্রী জাগে।
নরমুণ্ডের মাল্য পরিয়া
ভবে দেখা দেন শ্যামা,
দয়াটা দারুণ পাপের কার্য্য,
নরকের দ্বার ক্ষমা।

সে বছর হল দারুণ দাঙ্গা
হিন্দু মুসলমানে,
বকরীদ লয়ে রক্তারক্তি
দেশের সবাই জানে।

কিষণলালের বড়ই সুযোগ
জ্বালাতে লাগিল গৃহ,
গৃহ-হীন কাঁদে পথে ঘাটে পড়ি'
বিন্দুও নাই স্নেহ।
হেলায় বৃদ্ধ ফকিরের এক
ডান হাত দিল কাটি'
কতই সাধুর মাথা ফাটাইয়া
চলিল তাহার লাঠী।

তাহার পরেই আরম্ভ হল
প্রায়শ্চিত্ত পালা,
গ্রামবাসিগণ পলাইল সবে
দুয়ারে লাগায়ে তালা।
কিষণলালকে ধরিতে ছুটিল
পুলিশ প্রহরী সবে,
তোলপাড় আজ করিতেছে গ্রাম
কোথায় লুকায়ে রবে।
হয়ে নিরুপায় কিষণ তখন
গভীর আঁধার রাতে,
চুপি চুপি আসি দাঁড়াইল ধীরে
ফকিরের আঙিনাতে।
কাতরে বলিল আপনার কাছে
মাগি একটুকু ঠাঁই,
রজনী প্রভাতে দূরে চলে যাবো
সাধু বলে 'এসো ভাই'।
তখনো সাধুর শুকায়নি ক্ষত
হতেছে যাতনা বড়,
ছিন্ন হাতের উপরে করিছে
ছিন্নকন্থা জড়,

কুটীরে ঢুকিলে ফকির তাহাকে
হাসিয়া সুধান কথা,
এসো এসো ভাই হিঁদু মোসাফির
মোকাম তোমার কোথা।
কিষণ কহিল হে ফকির তুমি
চিনিতে পারনি হায়,
আমিই তোমার কাটিয়াছি হাত
ঠেকেছি খুনের দায়।
চারিদিকে ঘোরে পুলিশ প্রহরী
কখন ধরিবে মোরে,
দেহ আশ্রয়, আজিকার রাতে
পলাইয়া যাবো ভোরে।
ফকির বলিল নাহি কিছু ভয়
শুয়ে থাকো মোর কাছে,
এখনো তোমাকে রক্ষা করিতে
একটা হস্ত আছে।

না পোহাতে নিশি কিষণ পলালো
সাহারাণপুর পানে,
সন্দেহে তারে বেড়িল আসিয়া
দুইশ' মুসলমানে।
কাটিয়াছে সে যে হজরত পাণি
শির নেওয়া তার চাই,
পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিয়া
কোনো প্রয়োজন নাই।
ক্ষিপ্ত সে দল ধরেছে তাহারে
হয় ত বা দেবে ফাঁসি,
ছিন্নহস্ত ফকির সহসা
হাজির সেখানে আসি।
দেখিয়া গুরুর কাতর মূর্ত্তি
শিষ্যেরা সব কাঁদে,
পাষণ্ড সেই কিষণলালকে
কঠিন করিয়া বাঁধে।

কিষণের কোনো শঙ্কা ত নাই
গর্ব্বিত তার মুখ
শৃঙ্খল বেড়া সিংহ শাবক—
ভীম দুর্জ্জয় বুক।
বলে শিষ্যেরা এই সে কিষণ
লুটে মসজিদ্ খানি
জ্বালাইয়া দিল, ছুরির আঘাতে
বধিল কতই প্রাণী।
চাহিয়া দেখুন চিনিবেন ঠিক
দুষমন দুর্জ্জনে
ফকির বলেন কইত আমার
কিছুই পড়ে না মনে।
বলে শিষ্যেরা এই সে কিষণ
কাটে আপনার পাণি,
লাঠীর আঘাতে লুটাইল শির
আমরা যে বেশ জানি।
দেখুন চাহিয়া চিনিবেন ঠিক
দুষমন দুর্জ্জনে,
ফকির বলেন কইত আমার
কিছুই পড়ে না মনে।

বলে শিষ্যেরা এই সে কিষণ
ভিক্ষা মাগিলে ঘরে,
এক মুঠি আটা দিল আপনাকে
দারুণ ঘৃণার ভরে।
সে কথা হইল বিশটী বরষ
বহু বহু দিন আগে,
ফকির বলেন সে আটার কথা
মনে মোর বেশ জাগে।
ঘৃণার কথা ত হয় না স্মরণ
পড়ে না মোটেই মনে,
দেখিতে দেখিতে জল এলো হায়
ফকিরের আঁখি কোণে।

আপনার হাতে খুলি বন্ধন
ফকির বলিল হাসি,
অন্নদাতার প্রত্যুপকার
গলায় লাগায়ে ফাঁসি ?

মুক্ত কিষণ ভাবে মনে মনে
এই যে ফকির বুড়া
বুক্‌টা উহার মুঠির আঘাতে
করে দিতে পারি গুঁড়া।
ওই টুকু বুকে কেমনে রয়েছে
অত বড় প্রাণ খানা
কৌটার মাঝে পুষ্পক রথ
কেমনে যাইবে জানা।
ক্ষুদ্র ফুলের বুকের ভিতরে
ভরিয়াছে কোন্ জন
মধু গন্ধের পুরা রাজস্য়
গোটা নন্দন বন ?

অতটুকু ওই পুঁথির পত্রে
দিগ্বিজয়ের কথা,
ক্ষুদ্র ছবির তুচ্ছ রঙেতে
সাগরের গভীরতা ?
ক্ষুদ্র গোলক ভূমণ্ডলের
বিরাট কাহিনীভরা,
জানিনে ও বুক কেমন ধাতুতে
কাহার হাতেতে গড়া।
আজি হতে মোর জীবনী হইবে
নূতন আঁখরে লেখা
ভগ্ন বুকের কুটীরে পেলাম
অতি মানুষের দেখা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ধনী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়

বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। সে আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা একদিকে স্বার্থপর, অর্থপিশাচ, ভোগবিলাসী ধনকুবেরগণ (Capitalists), অপরদিকে নিপীড়িত অর্দ্ধভুক্ত, নিঃস্ব, শ্রমিকশ্রেণী (Labourers)। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় আজ আপনাদের সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধতা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধনীরাও কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নাই। কি উপায়ে এই শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে বা মজুরদলগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় সেই উপায়ই তাঁহারা উদ্ভাবন করিতেছেন। এমন কি এ বিষয়ে তাঁহারা সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভের আশায় অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। কোন প্রকারে যদি এই সমিতিগুলিকে unlawful assembly বা অবৈধ জনতা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক ঘোষিত করান যায়, তাহা হইলেই তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু ইহাতে যে ধনীসম্প্রদায় কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন তাহা বলা একান্ত দুষ্কর। কেননা গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও যে তাঁহারা শ্রমিকগণের এই ক্ষুদ্র ন্যায্য আশার মূলে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে কুঠারাঘাত করিবেন তাহা মনে হয় না। তবে দেশে যে এরূপ একটা আন্দোলন বর্ত্তমান থাকিবে তাহাও তো প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না। যতদিন না ধনী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন বা অসন্তোষ তিরোহিত হয়, যতদিন না উভয় সম্প্রদায় একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ততদিন পৃথিবীতে মানবের সুখময় জীবন বিষময় হইয়া থাকিবে। এমন কি ভবিষ্যতে যে ইহাতে একটা ভয়াবহ কাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে তাহাতে কোনও

সন্দেহ নাই। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহাও তো বলা যায় না। আজ যদি ধনীসম্প্রদায় তাঁহাদের নিষ্ঠুর স্বার্থ বলিদান দিয়া অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে এই অশিক্ষিত শ্রমিক-সম্প্রদায়ের কল্যাণে উদ্যোগী হন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সকল অসন্তোষের তিরোধান হয়। শিক্ষিত ধনীসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য এই অশিক্ষিত শ্রমিকবর্গের বাসোপযোগী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া, তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ন্যায্য বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া, সুশিক্ষা দেওয়া তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি। অবশ্য এসব বিষয় শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহা শিক্ষিত সমাজের কর্ত্তব্য নয়? এসব দিকে লক্ষ্য রাখিলে ধনীসম্প্রদায়ও যে বিশেষ লাভবান হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে সে অধিকপরিমাণে শ্রম করিতে পারিবে, উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে কর্ম্মপটু হইবে, সকল বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ধনীসম্প্রদায় এসব দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মূর্খতা বশতঃই হউক বা যে কোন কারণেই হউক শ্রমিকগণের ন্যায্য অধিকারে বাধা দিতেছেন। ফলে শ্রমিকেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যপ্রদেশের ঘটনাবলী হইতে সহজেই অনুমান করা যায় সেখানে কিরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অবতারণা করা হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় আজ অবধি ভারতে সেরূপ কোন কাণ্ডের অভিনয় হয় নাই। সময়ে হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতিতে আজ ত্রিশ কোটী নরনারী দীক্ষিত। তবে এই অশিক্ষিত অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিক সম্প্রদায় কতদিন এই ধনীসদম্প্রায়ের অত্যাচার অনাচার অহিংসা বলে সহ্য করিবে তাহাও বিশেষ চিন্তার বিষয়। আজ কাল দেশে যেরূপ ধর্ম্মঘটের প্রাবির্ভাব হইতেছে, ধনীসম্প্রদায়ের অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান চলিতেছে ও দেশের শাসক সম্প্রদায়ের ঔদাসিন্য দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই ইহাদের মধ্যে একটা সম্প্রদায়ের ধ্বংস অনিবার্য্য।

শ্রমিকগণের উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের প্রকৃতরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে সমবায়-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ইত্যাদি। পাশ্চাত্যপ্রদেশ এই সমবায় প্রণালীতে কত উন্নীত হইয়াছে তাহা এ দেশীয় শ্রমিকগণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আয়ার্ল্যাণ্ড প্রদেশ যেখানে আজ শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই গভীরভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সেখানেও এখনও তাহারা সমবায়ের সার্থকতা ভুলে নাই। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড সকল স্থানেই এই Co-operative movementএ প্রত্যক্ষ ফল দর্শিয়াছে এবং শ্রমিক সম্প্রদায় ইহাতে বিশেষ ভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে এ দেশীয় শ্রমিক-শ্রেণীর নেতাদের একটু দৃষ্টি থাকিলে শ্রমিকগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এ দেশীয় শ্রমিকেরা অশিক্ষিত তাই তাহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হঠাৎ যে কোন কারণেই ধর্ম্মঘট করিয়া বসে। ইহাতে এক দিকে যেমন মালিকগণের অশেষ ক্ষতি হয় তেমনি অপর দিকে শ্রমিকগণের দুঃখ কষ্টের পরিসীমা থাকে না; পরন্তু দেশের ব্যবসা বাণিজ্যেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। পাশ্চাত্য

প্রদেশের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া জয়লাভ করে বলিয়া যে ভারতীয় শ্রমজীবীরা ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করিবে তাহা বিবেচনা করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। কেননা সামান্য কথায় বলা যাইতে পারে সেখানকার শ্রমজীবীরা অর্থশালী, প্রত্যেক সঙ্ঘের তহবিলে প্রভূত অর্থ থাকে—যাহার বলে তাহারা অর্থশালী ধনীসম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। এ দেশীয় শ্রমজীবীরা যাহাদের একদিন না খাটিলে খাইবার সংস্থান নাই, আপনাদিগের ভিতর সৌহার্দ্দের অভাব তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তোলে। চক্ষের সম্মুখে একাধিক প্রমাণ রহিয়াছে তবুও ইহাতে শ্রমিকগণের বা উহাদের শিক্ষিত নায়কগণের জ্ঞান হয় না। সেদিন ই, বি রেলওয়ের ধর্ম্মঘটের শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া গেল। কতলোকের চাকুরী গেল, কত লোক অনাহারে মরিল, কত লোকে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, আবার কত তথাকথিত নায়কগণ গললগ্নীকৃতবাসে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুরাতন চাকুরী প্রার্থনা করিল। এই ত অবস্থা, তবুও কথায় কথায় ধর্ম্মঘট হয়। অবশ্য শ্রমিকের যে এই ধর্ম্মঘট তাহা অযথা বলা যায় না, কেননা তাহারা নিরুপায় হইয়া এই রূপ করে। দুঃখের বিষয় ইহার দ্বারা তাহারা আপনাদের উপকারের পরিবর্ত্তে প্রভূত অপকার করিয়া ফেলে। গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য এই—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্য সংস্থাপন করা। কয়েক মাস হইল শ্রমিকদের নেতা মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম্, এল্, সি, সরকারী ব্যবস্থাপক সভায় Peaceful picketting অর্থাৎ ধর্ম্মঘটের সময় কলহ না বাধাইয়া লোকদিগকে তাহাদের কাজে না লাগিবার জন্য অনুরোধ করা আইন সিদ্ধ করাইবার প্রস্তাব করেন। তথাকথিত গরীবের মা বাপ সরকার মহাশয়েরা উত্তর দিলেন ইংলণ্ডে এরূপ আইন আছে বলিয়া যে ভারতেও সেই আইন প্রচলিত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। বিশেষতঃ ভারতবাসীরা এখন যেরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে উত্তেজিত আছে তাহাতে এরূপ একটা আইন করা অন্যায়। শ্রমিকেরা অন্য লোককে কাজে লাগিতে বাধা দিলে কঠিন শাস্তি পাইবে অথচ মালিকেরা যে প্রকাশ্যে এই কাজ করিয়া বেড়ান তাহার বিরুদ্ধে কোন আইন নাই, শাস্তি নাই! সম্প্রতি বঙ্গীয় শ্রমজীবি-সঙ্ঘের অধিবেশনে মিঃ চৌধুরী ইহার অগণিত উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন কোন শ্রমিকের এক স্থানের (Factory) চাকরী গেলে সে আর অন্যস্থানে (Factory) চাকুরী পায় না তাহার প্রকৃত কারণ বণিকেরা তারযোগে (Telephone) সকল স্থানে নিষেধ করিয়া দেন যাহাতে কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে আর কোথাও লওয়া না হয়। এই দেশের এই ত অবস্থা, তাহাতে দেশের কতটুকু উন্নতি আশা করা যায়? গভর্ণমেণ্ট যতই এই শ্রমিকদলকে বলপ্রয়োগে দমন করিতে চেষ্টা করুন না কেন এই অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিকশ্রেণী যে দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত হইলে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার
"কর্ম্মী" সম্পাদক

ঘুণ্টি

(১)

সে আজ বহু বৎসর পূর্ব্বেকার কথা; বি, এ, পরীক্ষা দিয়া ছুটিতে মামার কর্ম্মস্থলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। মামা তখন হুগলি অঞ্চলে বদলি হইয়াছিলেন। মামা ছিলেন ডেপুটী।

দ্বিপ্রহর; বেলা তখন একটা কি দেড়টা হইবে; মামী খাওয়া দাওয়া সারিয়া পাশের বাড়ীর মেয়েদের সহিত তাস খেলিতে গিয়াছেন। আমি মামার শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর শুইয়া একখানা বাঙ্গালা নভেল পড়িতেছিলাম। আর জানালার ধারে একটা মাদুরের উপর বসিয়া আমারই ফরমাস মত ননী হেলিয়া দুলিয়া নামতা মুখস্থ করিতেছিল। ননী হ'চ্চে—আমার মামাত ভাই। মামা-মামীর ঐ একটীমাত্র সন্তান। স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে পুত্ররত্ন পাঁচ রকম ছেলের সহিত মিশিয়া পাছে খারাপ হইয়া যায়, এই ভয়ে মামা ননীকে স্কুলে দেন নাই। বলিলে বলিতেন, "আর একটু বড় হোক্ তখন স্কুলে দেবো"।

আমি আসাতে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল কেবল এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির মুখখানি একটী ভবিষ্যৎ ভয়ের সম্ভাবনায় হঠাৎ ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছিল। তাহার কারণও যথেষ্ট ছিল। মামা কাছারীতে বাহির হইয়া গেলেই, ননী পাড়ার যত ডানপিটে ছেলেদের সহিত জুটিয়া গ্রামময় টো টো করিয়া বেড়াইত। কোথায় কাহাদের বাগানে আম পাকিয়াছে, কাহাদের গাছে খুব নোনা ধরিয়াছে, এই সব সন্ধানে সমস্ত দুপুরটা কাটফাটা রৌদ্র মাথায় করিয়া সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইত। আমার আগমনে তাহার এই স্বাধীন অপ্রতিহত বিচরণ-ব্যাপারটা বেশ বিলক্ষণ একটু বাধা পাইয়াছিল। সবে কাল সন্ধ্যার সময় আসিয়া পঁহুছিয়াছি, আর আজ এখন বেলা দেড়টা—ইহারই মধ্যে অত্যাচার সুরু হইয়াছে—যথা, আজ দুপুর বেলায় এই নামতা মুখস্থ করিবার জন্য জোর জবরদস্তি। কোথায় গ্রামের খোলামাঠ, রায়েদের আমবাগান, কলুদের পুকুর ধার,—আর কোথায় মামার অপরিসর শয়ন-কক্ষ, হায়রে হায়!

ননী অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল—"দশ একে দশ; দশ দুগুণে কুড়ি"—ইত্যাদি। আর আমি আপনার মনে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ উল্টাইয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় একটা ছোট ঢিল ঠিক আমার মাথার কাছে আসিয়া পড়িল। "কে রে!" বলিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখি একটী ছোট ছেলে নিমেষের মধ্যে জানালার নিকট হইতে সরিয়া গেল। ধমকের সুরে বলিয়া উঠিলাম, "কে রে? ভারি দুষ্টু ছেলে ত!" কেহ উত্তর দিল না। কেবল

শুনিতে পাইলাম, জানালার পাশ হইতে খিল খিল করিয়া কে হাসিতেছে। আমার ভারি রাগ হইল। ননীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও কাদের ছেলে রে?" সে ভয়ে ভয়ে বলিল "ও টোল বাবুদের মেয়ে—ঘুণ্টি।" আমি ত অবাক; টোলবাবুদের মেয়ে? মেয়ের কোন চিহ্নই ত দেখিতে পাইলাম না। অবশ্য তখনও তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই। কেবল একটা আব্‌ছা দৃষ্টিমাত্র। সেই আব্‌ছা দৃষ্টিতে যতদূর দেখিলাম তাহাতে তাহাকে কোন মতে মেয়ে বলিতে পারা যায় না। মালকোচা মারিয়া কাপড় পরা, শুধু গা, তবে মাথার চুলগুলো কিছু ঝাঁকড়া। তা অনেক ছেলেরও ত তা থাকে। তা ছাড়াও তাকে যে ছেলে বলিয়া ভ্রম হইবে তাহার আর একটা কারণ ছিল। মেয়ের হাতে কে কবে ঘুড়ি লাটাই দেখিয়াছে? বাস্তবিকই অদ্ভুত! এই অদ্ভুত মেয়েটিকে ভাল করিয়া একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। বুঝিলাম রাগ করিলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। তাই গলার স্বরটাকে কড়ি হইতে কোমলে নামাইয়া লইয়া ডাকিলাম—"তুমি কাদের মেয়ে—দেখি? সে জানালার পাশ হইতে তেমনি ভাবেই হাসিতে লাগিল। আমি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছাটা—পিছন দিক হইতে গিয়া ধরিয়া ফেলি; কিন্তু সে যেন হরিণীর মত চঞ্চল এবং তারই মত সতর্ক। আমাকে আসিতে দেখিয়া সে তার কোঁকড়া চুলের রাশি দোলাইয়া চকিতের মত ছুটিয়া পলাইল—ধরিতে পারিলাম না।

(২)

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রামের প্রায় শেষাংশে আসিয়া পহুঁছিলাম। সেটা হচ্ছে ধোপাপাড়া,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ, আর তারই চারিদিকে ধোপাদের ছোট ছোট কুটিরগুলি পরের পর সাজান রহিয়াছে।

মাঠের অপর পারে ধোপাদের কাল-কাল ছেলেগুলো ঘুড়ি উড়াইতেছিল, একটু ঠাওর করিয়া দেখি, দুপুর বেলাকার সেই অদ্ভুত মেয়েটাও তাহাদের সহিত দিব্যি নিঃসঙ্কোচে ঘুড়ি উড়াইতেছে। আমি একটু একটু করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মেয়েটা তখন ঘুড়ি উড়াইতে এতই তন্ময় যে আমি গিয়া তাহার পিঠে হাত না দেওয়া পর্য্যন্ত সে আমার আগমনবার্ত্তা আদপেই টের পায় নাই। আমার করস্পর্শে সে চকিতের মত মুখ ফিরাইল; কি সুন্দর সে মুখ! তেমন মুখ আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রং যে বিশেষ ফর্সা তা নয়; নাক চোখ যে বিশেষ ধারাল তাও নয়; তথাপি সব জড়াইয়া এমন একটা আল্‌গা শ্রী তাহার মুখখানিতে আছে, যাহা দেখিলে মানুষকে পাঁচ দণ্ড হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হয়। এতক্ষণ মুখ দেখি নাই, তাই তাহাকে বালক বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল; এখন আর সে সন্দেহ রহিল না। "এইবার পালাবে কেমন ক'রে?"

বলিয়া হাত দিয়া তাহার ছোট্ট মাথাটী নাড়িয়া দিলাম। বাস্তবিকই সে সে-দিন বড় জব্দয় পড়িয়াছিল। ঘুড়িটা তখন অনেক দূর উঠিয়াছে—পালাইবার যো নাই। সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয় তার একটু ভয়ও হইয়াছিল—কেন না দুপুর বেলা সে আমাকে ঢিল মারিয়া পলাইয়াছে।

আমি আবার বলিলাম, "তুমি আমাকে ঢিল মেরেছিলে কেন?', সে কোন উত্তর না করিয়া ঘুড়িটা নামাইয়া লইতে লাগিল।

ঘুড়িটা ক্রমে হাতের গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। ধোপাদের একটা ছোঁড়া আসিয়া বলিল "ঘুণ্টি, ও ঘুড়িটা আমাকে দিয়ে যা ভাই,—তোর তো আরও অনেক ঘুড়ি আছে।" সে কোন কথা না বলিয়া সুতা হইতে ঘুড়িটা ছিঁড়িয়া তাহার হাতে দিল। সে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। অন্যান্য বালকেরাও একে একে সরিয়া পড়িল।

মাঠ জনশূন্য। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দূরে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামান্তরের প্রদীপগুলি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। প্রকাণ্ড একটা ঝাউগাছের মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। আমি বলিলাম—"তুমি একলা বাড়ী যেতে পার্‌বে?" সে গম্ভীরভাবে বলিল—"পার্‌ব।"

"ভয় করবে না?"

"না।"

আমি বলিলাম "একলা যেতে হবে না—আমার সঙ্গে এস। আমিও ত বাড়ী যাব।"

দুজনে গ্রামের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নাম কি?" উত্তর হইল—"ঘুণ্টি।"

এইবারে তার স্বরটা কিছু স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইল। এতক্ষণ কথাগুলো কিছু ভার ভার ঠেকিতেছিল। বোধ হয় সে এতক্ষণ মনে করিয়াছিল আমি তাকে ঢিল ছোড়ার জন্য বকিব; বা অন্য কোনরূপ শাস্তি দিব। কিন্তু এখন দেখিল—সে সকলের সম্ভাবনা খুবই কম। তাই বোধ হয় তার উত্তর দেওয়ার ভঙ্গীটা এইবার কিছু স্বাভাবিক হইয়াছিল।

আমি বলিলাম—"আচ্ছা ঘুণ্টি! তুমি ছেলেদের মত কোঁচা কাছা দিয়ে কাপড় পর কেন?" সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া উত্তর দিল—"আমি মেয়েদের মত কাপড় পরতে পারি না।" "তুমি নিজে না পার, তোমার মাকে কেন পরিয়ে দিতে বল না?" সে তেম্‌নি ভাবেই উত্তর দিল—"মেয়েদের মতন কাপড় পরে আমি ছুটাছুটি করিতে পারি না।" আমি বলিলাম—"তোমার বয়স কত?" এইবার মুখটা একটু উঁচু করিয়া সে বলিল—"দশ।" আমি বলিলাম "আর বড় জোর এক বছর কি দুবছর না হয় এমনি করে ছুটোছুটি করলে, কিন্তু তারপর?"

সে অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ; এ কথাটার অর্থ সে বোধ হয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

আমরা কেদারেশ্বরের মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। মন্দিরে তখন আরতির আয়োজন হইতেছিল। আমি মন্দিরের পৈঠার উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলাম। মাথা তুলিয়া দেখি—ঘুণ্টি নাই ; সে অবসর বুঝিয়া কখন পলাইয়া গিয়াছে। আমি এই অদ্ভুত বালিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম। আজ ভাল করিয়া আলাপটা জমাইয়া তুলিতে পারিলাম না। বুঝিলাম প্রথম দিন রাগটা দেখাইয়া ভাল করি নাই।

(৩)

রাগ দেখাইয়া ভাল করি নাই যে বলিলাম,—জিজ্ঞাসা করি, মন্দটাই বা কি করিয়াছি ? আমার চিরকাল একটা গর্ব্ব ছিল যে, ছোট ছোট ছেলেপুলেরা আমার কাছে বড় একটা ঘেঁসিতে পারে না। ছোট ছেলে মহলে আমি একটা বর্গীবিশেষ ছিলাম। তাহারা বাস্তবিকই আমাকে বাঘের মত ভয় করিত। আর এই ভীতির কারণ হওয়াটাকে আমি মনে মনে একটা গর্ব্বের সামগ্রী বলিয়া মনে করিতাম। পাড়ার ছেলেপুলেরা দুষ্টামি করিলে তাহাদের মা তাহাদের বলিতেন—"রোস্ তোর শচীদাদা আসুক, বলে দিচ্চি।" বালকেরা যে আমাকে দেখিয়া ভয় পায়, এটাতে আমি একটু বেশ আনন্দ অনুভব করিতাম। আজ কিন্তু তাহা হইল না। আজ এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিজের বশে আনিবার জন্য সমস্ত হৃদয়টা যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কেন যে এমন হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়াও কি জানি কেন একটি ছোট্ট বালিকার ছোট্ট একখানি কচিমুখ মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল।

যে আমি ননীর হাতে ঘুড়ি দেখিলেই, টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতাম, সেই আমি একদিন যখন যাচিয়া বলিলাম—"ননি, তোর লাটাই আছে ?"—তখন সে বাস্তবিকই অবাক হইয়া গেল। প্রথমটা সে এ কথাটা বিশ্বাসই করিতে পারিল না। মনে করিল, আমি তাহার সহিত ঠাট্টা করিতেছি, অথবা এই বলিয়া লাটাইটা আদায় করিয়া লইয়া পরে ভাঙ্গিয়া ফেলাই আমার উদ্দেশ্য। তাই সে ভয়ে ভয়ে বলিল—"কৈ, আমার'ত লাটাই নেই।" আমার হাসি আসিল, বলিলাম "ভয় নেই। তোর লাটাই তোকে আবার ফিরিয়ে দেবো।" সে তখন একটু ভরসা পাইয়া আস্তে আস্তে তাহার বহুযত্নে লুকান লাটাইটা গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দিল। আমি বলিলাম "তোর ঘুড়ি আছে ?" সে এবার সাহস করিয়া বলিল—"হাঁ আছে।" "কৈ নিয়ে আয় দেখি।" নিমিষের মধ্যে কোথা হইতে সে একরাশ ঘুড়ি আনিয়া হাজির করিল।

আমি বলিলাম "তুই ঘুড়ি উড়াতে জানিস ?" সে ধীরে ধীরে বলিল, "ভাল জানিনা।"

"তবে ওড়াস্ কি ক'রে ?"

"আমি ওড়াই না, আমি কেবল দেখি।"

"তবে কে ওড়ায় ?"

"ঘুণ্টি।"

আমি বলিলাম, "কই, তাকে ত একদিনও তোদের বাড়ীতে ঘুড়ি ওড়াতে দেখিনি।" ননী বলিল, "তুমি আসবার আগে সে রোজ আমাদের ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াত।" আমি বলিলাম— "তবে আজ কাল আসে না কেন ?"

ননী বলিল, "তুমি যদি মার !"

আমি অতি কষ্টে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলাম—"না, আমি মারবোনা। কৈ তাকে ডেকে নিয়ে আয় দেখি।"

আমার কথা শুনিয়া ননী তার সঙ্গিনীকে এই শুভ সংবাদটা জানাইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল যে, রকের উপর হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িবার সময় হোঁচট খাইয়া তার পায়ের খানিকটা মাংস উঠিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়া সত্বেও সে সেদিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

সেদিন ঘুণ্টির সহিত খুব আলাপ হইয়া গেল। তারমধ্যে আশ্চর্য্য এইটুকু দেখিলাম যে যতক্ষণ তার সহিত আলাপ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে বশে আনা ভারি শক্ত।—সে কিছুতেই ধরা দেয় না—দিতে চায় না; কিন্তু সে যখন একবার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে তখন সে এত বেশী করিয়া নিজকে ধরা দেয় যে, তার ধরা দিবার মাত্রাটা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

তার উৎপাতের অন্ত নাই। আলাপ হইবার পর হইতে সে প্রত্যহই মামাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইত, আর সমস্ত দুপুর এত দাপাদাপি করিত যে তার আর কথা নাই। গাছে উঠিতে, সাঁতার কাটিতে, দৌড়াদৌড়ি করিতে ঘুণ্টির জোড়া মেলা ভার।

একটি দিন কেবল তাহাকে কয়েকঘণ্টার জন্য চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ননীর সেদিন জ্বর হইয়াছিল। সে বিছানায় শুইয়া মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। আমি তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতেছিলাম। মামীমা মাথার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিলেন। ঘুণ্টি ননীর জ্বরের সংবাদ শুনে নাই। সে প্রত্যহ যেমন আসিত, সেইভাবে সেদিন বৈকালেও ঘুড়ি লাটাই লইয়া আসিয়াছিল। সে বাহিরের উঠান হইতেই চীৎকার করিতেছিল,—"ননি, ননি।" তারপর ননীর সাড়া না পাইয়া সে ডাকিল,—"শচীদাদা, শচীদাদা।" আমি আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম; আমাকে দেখিয়াই সে বিরক্তভাবে বলিল, "কখন থেকে ডাক্‌ছি। তোমরা কালা হয়েছ নাকি ?" আমি তখন তাকে

ননীর জ্বরের কথা বলিলাম। সে ঘুড়ি লাটাই বুকের উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রোগীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ননী তখন জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। ঘুণ্টি আস্তে আস্তে তার মাথার শিয়রে আসিয়া বসিল। তার মুখখানি সহানুভূতিতে পূর্ণ। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই দিনটী কেবল আমি ঘুণ্টিকে কয়েকঘণ্টার জন্য লক্ষ্মী মেয়েটীর মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

ঘুণ্টির সহিত ত অনেক দিনই আলাপ হইয়াছিল; এইবার ঘুণ্টির বাপের সহিত আলাপ হইয়া গেল; লোকটী বড সাদাসিদে ধরণের। তিনি এখানকার টোল-কালেক্টর। পাড়ার লোকে তাঁহাকে টোলবাবু বলিয়া ডাকিত। সন্ধ্যার কিছু পরেই টোলবাবুর বৈঠকখানাটী চাক্‌রেবাবুদের আগমনে মস্‌গুল হইয়া উঠিত। তাস, পাশা, দাবা—কোনটাই বাদ যাইত না। সঙ্গে সঙ্গে তামাকের শ্রাদ্ধ ত আছেই। মোট কথা আড্ডাটা খুব জমকাল রকমেরই হইত। আমি মাঝে মাঝে এই সান্ধ্যসভায় যোগ দিতাম। এইস্থানে আমার খাতিরটা খুব ছিল। প্রথমতঃ ডেপুটী-বাবুর ভাগ্নে; দ্বিতীয়তঃ বি, এ, পাশ দিয়াছি; তৃতীয়তঃ একজন পাকা তাসখেলিয়ে।

তাস খেলিতে আরম্ভ করিলেই ঘুণ্টি আসিয়া জ্বালাতন করিত। "শচীদাদা, আমি খেলবো।" সকলে ধম্‌কাইত। আমি বলিতাম, "তুই কি খেল্‌তে পারিস্‌ ঘুণ্টি; তুই বরং আমার পাশে বসে থাক্‌ আমি যেটা দেখিয়ে দেবো সেইটে খেলবি।" সে মহা খুসি হইয়া, ছোট্ট মাথাটীকে খুব জোরের সহিত নাড়া দিয়া বলিত,—"সেই বেশ।"

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে বাড়ী ফিরিয়া দেখি, মামীমা দালানে বসিয়া কে-একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছেন। আমি দালানে পা দিয়াই সরিয়া আসিলাম।

"পালালি যে বড়!—আয়, নমস্কার করে যা।"—বলিয়া মামীমা একটু হাসিলেন। তখনও এ হাসির অর্থ কিছু বুঝি নাই। আমি অগত্যা আস্তে আস্তে আসিয়া প্রণাম করিলাম। "বেঁচে থাক বাবা, রাজরাজেশ্বর হও।"—বলিয়া স্ত্রীলোকটী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিলেন।

মামীমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কে বল দেখি?"

আমি বলিলাম—"কি জানি!"

"ঘুণ্টিকে দেখেছিস্‌ ত, ইনি হচ্চেন ঘুণ্টির মা।" স্ত্রীলোকটী তখন বলিতে লাগিলেন—"আমি এমন কি ভাগ্যি করেছি, দিদি, যে এমন সোণার চাঁদ ছেলেকে জামাই করতে পারব?" এতক্ষণে মামীমার হাসির কারণটা বুঝ্‌তে পারলাম্‌। সে রাত্রিটা কি জানি কেন ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না। ঘুণ্টিকে আমি বাস্তবিকই ভাল বাসিতাম। কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিব—এ কথাটা আমার মনে কোনদিন উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আজ ঘুণ্টির মার কথা শুনিয়া অবধি মনটার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ একই কথা বারম্বার উঠিতে লাগিল—

"ঘুণ্টিকে বিবাহ করিলে ত বেশ হয়; এ কথাটা এতদিন মনে আসে নাই কেন?" কথাটা মনের মধ্যে যতই উঠিতে লাগিল ততই যেন মনে মনে হইতে লাগিল—"ঘুণ্টিকে বিবাহ করা চাই। তাহা না হইলে জীবনে কখনও সুখী হইতে পারিব না।" কি জানি কেন, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে খাইতে বসিয়াছি। মামীমা আসিয়াই আরম্ভ করিলেন, "হ্যাঁরে শচীন্, ঠাকুর জামাই তোর বিয়ের কথা কিছু বলেন কি?"

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, "জানি না।"

"তবু কিছু শুনিস্ নি?"

আমি বলিলাম—"আমি কিছুই জানি না" মামীমা তখন একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আমার ইচ্ছে, ঘুণ্টির সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, কেন, মেয়ে কি মন্দ?"

আমি কি বলিব—চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলাম।

বিবাহের কথা ওঠা অবধি কি জানি কেন একটা লজ্জা আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল, আমি অনেক চেষ্টায়ও পূর্ব্বেকার মত করিয়া ঘুণ্টির সহিত মিশিতে পারিতাম না। সে এ কথা শুনিয়াছিল কিনা জানিনা; বোধ হয়—নয়; কেননা, আমার উপর তার দৌরাত্ম্যের মাত্রাটা কমা ত দূরের কথা দিন দিন বাড়িতেই চলিয়াছিল।

এদিকে পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এইবার আবার সেই সহরের হুড়াহুড়ির মধ্যে ফিরিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে।

ঘুণ্টি যেমন রোজ বৈকালে আসিত, আজও সেইভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানা ইংরাজী নভেল পড়িতেছিলাম। সে আসিয়াই চিলের মত ছোঁ মারিয়া বইটা কাড়িয়া লইল।

তাহাকে দেখিয়া আজ মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। কতবার মামার বাড়ী আসিয়াছি। কিন্তু যাইবার সময় ত এমন মন খারাপ কোন বার হয় নাই। আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম,—"ঘুণ্টি, কাল আমি কল্‌কাতায় যাবো।" ঘুণ্টি নিবিষ্টমনে পুস্তকের একটা ছবি দেখিতেছিল। আমার কথা শুনিতেই পাইল না। আমি আবার বলিলাম, "আমি কাল কল্‌কাতায় চলে যাচ্চি ঘুণ্টি।". এইবার ঘুণ্টির চমক ভাঙ্গিল। সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "এরি মধ্যে?"

আমি বলিলাম,—"কলেজ খুল্‌বে যে ঘুণ্টি।" সে চুপ করিয়া রহিল—বুঝিলাম তারও কষ্ট হইবে। তথাপি তার মুখ হইতে কথাটা শুনিবার জন্য বলিলাম—"আমার জন্য তোর মন কেমন করবে ঘুণ্টি?" সে খুব জোরের সহিত ছোট মাথাটীকে নাড়া দিয়া বলিল—"খুব মন

কেমন করবে।” কথাটার মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ, এতটুকু ঘোর প্যাঁচ ছিল না। এই দুই মাসের মধ্যে, এই ক্ষুদ্র বালিকাটি আমার হৃদয়ের কতখানি স্থান যে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে তাহা আজ প্রথম জানিলাম।

(৪)

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আসিবার সময় ঘুণ্টি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—“আবার কবে আস্‌বে?” আমি বলিয়াছিলাম—“ছুটী পেলেই।” আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—“আসবার সময় তোর জন্য কি নিয়ে আস্‌ব বল দেখি?” সে বলিয়াছিল—“একটা ঘুড়ি আর একটা লাটাই।” বিদায়ের সেই বিষাদময় ক্ষণেও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই।

পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। আমি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছি। মামাকে সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ জানান হইয়াছিল।

ইহার কিছু দিন পর, মামা একদিন বাবাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি ঘুণ্টির সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বাবাও রাজী হইয়াছিলেন; কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। কেন ভাঙ্গিয়া গেল তাহাই বলিতেছি। বাবা ঠিকুজি কুষ্ঠিতে বড় বিশ্বাস করিতেন; মেয়ে সুন্দর হোক না হোক—তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। পয়সা কড়ি সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ খাঁই ছিল না—যত কড়াক্কড় ঐ কুষ্ঠির বেলায়; আর ঐ কুষ্ঠিই আমার কাল হইল। বাবা নিজে জ্যোতিষ শাস্ত্রটা কিছু কিছু জানিতেন; তিনি নিজেই আমার এবং ঘুণ্টির কুষ্ঠি মিলাইলেন। কুষ্ঠিতে মিলিল না। মামা লিখিলেন,—“এত কুষ্ঠি মিলাইতে গেলে চলে না।” বাবা তার জবাবে লিখিলেন—“আমার ছেলে; মেয়ে ত নয়; এত তাড়াতাড়ি কেন? আরও অনেক মেয়ে আছে ত ইত্যাদি।” সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। বুকখানা সত্য সত্যই যেন সাত হাত মাটির তলায় বসিয়া গেল। মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পোড়া মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানিতে চায় না। গ্রীষ্মের ছুটী আসিল, প্রতিবারের মত এবারও মামার নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। লিখিলাম, “এবার যাইতে পারিলাম না, পড়াশুনার বড় ক্ষতি হয়।”

উক্ত ঘটনার পর প্রায় আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মামা এখন অন্যস্থলে বদলি হইয়াছেন। ঘুণ্টির আর কোন খবর রাখি না। কেবল শুনিয়াছিলাম তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমি এম, এ, দিয়াছিলাম—পাশ করিতে পারি নাই। লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই—করিবও না। পাড়ার ছেলেরা মিলিয়া একটা

সেবাশ্রম খুলিয়াছিল, আমি তাহারই সেবক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলাম। পরোপকার করাটা ঠিক মতলব নয় ; আসল কথা, কোন রকম একটা খেয়াল লইয়া পড়িয়া থাকা।

সেদিন সকাল হইতে সেই যে বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল রাত্রেও তাহার বিরাম নাই। ভয়ানক দুর্য্যোগ। রাত তখন প্রায় বারোটা কি আরও বেশী হইবে। শয্যায় শুইয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতেছিলাম। বাহিরে শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় বহিতেছিল। সারসির ভিতর দিয়া বিদ্যুতের আলোক চকিতের মত ঘরের দেওয়ালের উপর আসিয়া পড়িতেছিল,—পড়িয়া বিলীন হইয়া যাইতেছিল। আমি শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম—কিছুতেই আর ঘুম আসিতে চায় না। এমন সময় কে দরজায় আঘাত করিল। আমার ঘরটি ঠিক রাস্তার ধারেই। জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে ?"

"আমি সুরেশ।"

"এত রাত্রে যে ? কি খবর ?"

"একজনদের মড়া উঠছে না। এই দুর্যোগে কেউ যেতে চায় না। তাই তাঁরা সেবাশ্রমে খবর দিতে এসেছেন। তিন জন লোক জোগাড় হয়েছে, তুমি হলেই চার জন হয়।"

আমি তৎক্ষণাৎ উঠিলাম। একটা গামছা আর কিছু পয়সা সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সংবাদদাতা লোকটী সঙ্গেই ছিল। লোকটীকে দেখিয়া নীচজাতীয় বলিয়া মনে হইল। তাহার সহিত কথা কহিয়া জানিলাম মৃতব্যক্তির বাটীর নিকটেই তার মুদির দোকান ; সে জাতিতে মুদি।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে বাড়ীতে কি পুরুষ মানুষ নেই ?"

"থাকলে কি আর আমাকে এই দুর্য্যোগে এতদূর ছুটতে হোত মশাই ? বাড়ীতে থাকবার মধ্যে ভদ্রলোকের যুবতী স্ত্রী, আর দূর সম্পর্কের এক বুড়ো মাসী।"

আমরা ক্রমে বাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া পঁহুছিলাম। বৃদ্ধ পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল, আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ আমাদিগকে লইয়া একটী কক্ষে প্রবেশ করিল। পালঙ্কের উপর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে—আর তাহারই পদতল জড়াইয়া ধরিয়া এক যুবতী নিঃসাড় হইয়া শুইয়া আছে। কক্ষের একধারে মেঝের উপড় পড়িয়া এক বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিতেছে।

——কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সুরেশ বলিল—"আর দেরী কর্‌লে ত চলবে না।"

আমি সংবাদদাতা মুদির দিকে চাহিয়া বলিলাম—"ওঁকে ত সরিয়ে নিতে হবে।" সে তখন আস্তে আস্তে ভূমিলুণ্ঠিতা শোকনিরতা বৃদ্ধার নিকট গিয়া বলিল—"মাসিমা! শোক কর্‌বার ঢের সময় পাবেন, এখন বৌদিদির মুখ চেয়ে একটু শান্ত হোন। ওঁকে ওখান থেকে না সরিয়ে আনলে ত চলবে না মাসিমা।"

বৃদ্ধা উঠিল ; যুবতীকে আস্তে আস্তে বুকে করিয়া তুলিয়া লইল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থা ; সুরেশ বলিল "ওকি, উনি যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন।" তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "শচিন্, শিগ্‌গির একটু জল নিয়ে এস।" সুমুখেই একটা ঘটী ছিল, তাতে খানিকটা জলও ছিল।

যুবতীকে আলোর নিকট লইয়া আসা হইল। মুখে জল দিবার জন্য হাত বাড়াইতে গেলাম,—হাত উঠিল না ; সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। চক্ষের স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া আসিল ; আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম ; খুব জোরে—নিজের অজ্ঞাতসারে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"ঘৃণ্টি !"

তারপর কি হইল জানি না। যখন চক্ষু মেলিলাম তখন সকাল হইয়াছে। রৌদ্রকিরণ জানালার ভিতর দিয়া আমার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। চাহিয়া দেখি—আমি আমাদের সেবাশ্রমের নির্দ্দিস্ট কক্ষে শুইয়া আছি।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

বিরহে

তোমারে বেসেছি ভাল—সে কি অপরাধ ?
দাঁড়ায়ে রহিব তাই বিশ্বসভা মাঝে
উচ্চশির করি নত ? ব্যর্থ মনোসাধ
দহিবে হিয়া কি মোর অপমানে লাজে ?

তোমারে বেসেছি ভাল—জানি না কি আশে—
দৃপ্ত অভিমান মোর কোথা টুটে যায়,
নিজেরে লুকায়ে রাখি সঙ্কুচিত ত্রাসে,
দুঃখ, দৈন্য, অবহেলা, তীব্র নিরাশায়।

তোমারে বেসেছি ভাল সহি' অপমান—
সে-ই মোর দেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

সে যে মোর বিনিসূতে গাঁথা ফুলহার—
সহিবে না মিলনের নিবিড় পরশ ;
বিরহের তীব্র জ্বালা, অবহেলা তার
বহিবারে পারি যেন অনন্ত বরষ।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

মিলনে

তোমার নূপুর বাজে আমারি ছন্দেতে,
প্রেম মোর জাগি রহে তব আঁখি ছায় ;
হৃদিকুঞ্জ ভরা মোর তোমারি গন্ধেতে—
তবু এ সঙ্কোচ কেন এই অমরায় ?

কেন পিছু ফিরে চাওয়া—মৌন অভিমান—
স্মৃতির পীড়ন সে কি ? এই চন্দ্রালোক—
রক্তিম কপোল কোথা মদির নয়ান !—
সম্মুখে সুধার পাত্র—স্মৃতি লুপ্ত হোক !

তুমি আমি এক দোঁহে—মানসী ও কবি
নিখিল বিশ্বেতে আজি মিথ্যা আর সবি।

মুহূর্ত্তটী পা বাড়ায়ে আসিয়াছে আজ,
সাদরে বরিয়া বন্ধু ডেকে লও তারে,—
ক্ষুদ্র ধরণীর এই মানব সমাজ
দূরে রাখি কোনে তাঁর স্মৃতিশাস্ত্র পারে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

জাপানের সামাজিক প্রথা

খাদ্যদ্রব্য

(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহা ছাড়া এখানে বিশেষ করিয়া একটা কথা বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালায় যেমন ডাল না হইলে ভাত খাওয়া চলে না, মাদ্রাজে যেমন অত্যন্ত ঝালযুক্ত আমের চাট্‌নি না হইলে চলে না, ব্রহ্মদেশে যেমন "নাপ্পি" বলিয়া একরকমের লবণাক্ত বিকৃত মাছ না হইলে চলে না, সাহেবদের যেমন "চীজ্" না হইলে চলে না, তেমনি জাপানীদেরও "মিসসিরু" ও "টুকেমন" না হইলে নিত্যকার ভোজন চলে না। এখানে এই 'মিসসিরু' ও 'টুকেমন' কেমন করিয়া তৈয়ারী হয় তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইবে। একরকম বিশেষ নিয়মানুসারে কতকগুলি ডাল প্রথমে দুই একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহার পর সেই ভিজান ডালগুলিকে বাষ্পের উত্তাপে ধীরে ধীরে বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। পরে সেই সিদ্ধ ডালগুলিতে খুব বেশী পরিমাণে লবণ মিশাইয়া কুটিয়া লইতে হয়। কোটা হইয়া গেলে সেগুলি একটী কাঠের টবে—বাতাস যাইতে না পারে এমনভাবে—অন্ততঃ এক বৎসর বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই মিসসিরুর "মিস," আর "সিরু" হইতেছে ঝোল; অর্থাৎ প্রথমে অনেকখানি জল গরম করিয়া লইয়া তাহাতে আলু, বেগুণ বা অন্যান্য সব্জী কিম্বা সময়ে সময়ে মাছের ছোট ছোট টুক্‌রা ফেলিয়া দিতে হয়। তাহার পর উহাতে লবণের মত দুই তিন চামচ পূর্ব্বোক্ত 'মিস' মিশাইয়া লইলেই "মিসসিরু" তৈয়ারী হইল।

এবার "টুকেমন"র কথা বলিব। ইহা একরকমের চাট্‌নী বিশেষ। প্রথমে একটা কাঠের টবে চাউলের পরিষ্কৃত কুঁড়া ৮।১০ সের পরিমাণ লইয়া তাহাতে অন্ততঃ তিন চারি সের লবণ মিশাইয়া বেশ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে তিন চারি দিন থাকিলে সেই শুষ্ক চাউলের কুঁড়াগুলি লবণের রসে ভিজিয়া বেশ সরস হইয়া উঠিবে। এই অবস্থায় শসা বা বেগুণ কিম্বা মূলা অথবা শালগম লইয়া উহার মধ্যে একদিন মাত্র রাখিয়া দিলে তাহাদের লোণতার সহিত একরকমের বিশেষ মুখপ্রিয় আস্বাদ হয়। ইহারই নাম টুকেমন। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, ঐ লবণমিশ্রিত চাউলের কুঁড়াগুলি দুই তিন বৎসর একই ভাবে রাখিয়া দেওয়া চলে—বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের দরকার হয় না। কেবল মাঝে মাঝে কিছু নূতন কুঁড়া ও লবণ উহার সহিত মিশাইয়া লইলেই হইল; নচেৎ পচিয়া যাইবার ভয় আছে। অবশ্য শসা প্রভৃতি যে

সব্জীগুলি উহাতে জড়াইয়া লইয়া টুকেমন করা হয়, তাহা রোজ রোজ নূতন নূতন দিতে হয়। ঐ টুকেমন অর্থাৎ জরান সব্জীগুলি প্রতিবার খাইবার সময় বেশ করিয়া ধুইয়া ও টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত "সোইউ" মাখাইয়া লইতে হয়। এই জিনিসটী আমাদের মুখে যেমনি ভাল লাগে হজমের পক্ষেও তেমনি অনুকূলত. করে। আমাদের নিত্যকার ভোজনের মধ্যে যদি এই টুকেমন না থাকে, তবে আরও অন্য অনেক রকমের খাবার থাকিলেও আমাদের খাওয়া বেশ পরিপাটী হয় না। এদেশের গরীব লোকেরা যেমন প্রায়ই ডাল ও ভাত মাত্র খাইয়া থাকে, তাই এ দেশে কথায় বলে "ডাল ভাত"; তেমনি আমাদের দেশের গরীবলোকেরাও সারা বৎসর ধরিয়া কেবল ভাত ও টুকেমন মাত্র খাইয়া থাকে, তাই আমাদের দেশেও কথায় বলে "চাযুকে" (Chazuka)।

ইহা তো গেল জাপানীদিগের খাদ্যদ্রব্যের পাকপ্রণালীর কথা। এবার তাহারা কি ভাবে খায়, কতবার খায় ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। এ দেশে সকালে ও বিকালে চায়ের সহিত জলখাবার খাওয়া ছাড়া ভদ্রলোকেরা দিনে ও রাতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া ভাত খাইয়া থাকেন। কিন্তু জাপানে সকলেই ঐ ভাত প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইয়া থাকেন। জাপানীরা প্রথমে সকালে ৭।৮'র মধ্যে প্রাতর্ভোজন, তার পর ঠিক্ ১২টার সময় মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং সন্ধ্যা ৬টায়,—কেহ কেহ ৭টায়, কেহ কেহ বা ৮টায়—সান্ধ্যভোজন সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ প্রাতর্ভোজনে বিশেষ করিয়া কোন তরকারী রান্না হয় না। কেবল গরম গরম ভাত আর গরম গরম মিসসিরু ও টুকেমন মাত্র। কিন্তু মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ভোজনে বিশেষভাবে মাছ মাংসাদির বন্দোবস্ত থাকে। ইহা পূর্ব্বে একবার বলিয়া আসিয়াছি যে আমাদের দেশে চা জিনিসটা বারে বারে খাওয়া হয় এবং তাহা এদেশের মত দুধ চিনি মিশান নহে; তাই এদেশের মত সেখানে ইহাকে একটা স্বাধীন খাবারের মধ্যে ধরা হয় না।

এখন আমরা কি প্রণালীতে খাইতে বসি সেই কথা বলিব। জাপানীরা এদেশীয়দের ন্যায় মাটীর উপর থালা রাখিয়া আসনে বসিয়া খায় না; আবার ইউরোপীয়েনদের ন্যায় চৌকিতে বসিয়া টেবিলে খাওয়ার প্রথাও তাহাদের নাই। অবশ্য আজকাল পাশ্চাত্যের অনুকরণে কেহ কেহ চৌকিতে বসিয়া টেবিলে খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ দুই চারিটী লোক ছাড়া আর সকলেরই খাইবার প্রথা দেশীয় ধরণের। জাপানীরা সাধারণতঃ গৃহের একটী কামরায় স্ত্রী-পুরুষে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ভোজনে বসে। ভোজনের এই কামরাটাকে আমাদের দেশের ভাষায় বলে "মকুদ"। এ দেশে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সাধারণতঃ পদ্মাসন হইয়া খাইতে বসে; জাপানে কেবল নীচশ্রেণীর পুরুষেরাই ঐরূপে বসিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের রমণীগণ বা উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই খাইবার সময় বীরাসনে বসিয়া খাইয়া থাকে। আবার কোন বিশিষ্ট ভোজের সময় উচ্চনীচ স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলকেই বীরাসনে বসিয়া খাইতে হয়। এখানে একটা কথা বলিতে চাই, ইহা অবশ্য পূর্ব্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, জাপানীদের গৃহে মেজের উপর

প্রায় এক ফুট উচ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত আর একটী স্থান আছে। তাহার উপর সর্ব্বদাই "তাতামী" বলিয়া এক ইঞ্চি মোটা মাদুর বিছান থাকে। এই মাদুরের উপর বসিয়াই আমাদের দেশের লোকেরা খাইয়া থাকে। মাদুরটী এক ইঞ্চি পুরু বলিয়া তাহার উপর বীরাসনে বসিলেও পায়ে ব্যথা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বড় লোকের বাড়ীর ব্যবস্থা আবার একটু অন্য রকমের। সেখানে ঐ পুরু মাদুরের উপর প্রত্যেকের জন্য এক-একটা তুলার গদি-আসন বিছাইয়া দেওয়া হয়।

বাড়ীর সকলে খাইবার কামরায় আসিয়া বসিলে চাকর অথবা চাকরাণীতে এক-একজনের "ওজেন" অর্থাৎ খাইবার ছোট ছোট চৌকিগুলি তাহাদের সম্মুখে আনিয়া রাখে। চাকরের অভাবে বাড়ার স্ত্রীরাই এই কাজ করিয়া থাকেন। এখানে ওজেন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা দরকার। এগুলি খাইবার চৌকি হইলেও একটু অন্য ধরণের। দেখিতে কতকটা এদেশের ছোট ছোট জলচৌকিগুলির মত; কেবল একজনের থালাবাটী ধরিতে পারে এতটুকু চওড়া এবং উচ্চতায় আধ হাত মাত্র। লোকে খাবার সময় বীরাসনে বসিলে এই ছোট চৌকিগুলি তাহাদের বুকের কিছু নীচে থাকে। প্রত্যেকেরই এক-একখানি নিজস্ব 'ওজেন' আছে। সেই ওজেনখানির উপর তাহার নিজস্ব থালাবাটীগুলি সাজাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য ঐ থালাবাটীগুলি এদেশের মত কাঁসার তৈয়ারী জিনিস নয় বা তাহাদের আকারও ওরূপ নহে। আমাদের দেশের চীনামাটীর পাত্রগুলিই আমাদের থালাবাসনের কাজ করে। কতকগুলি ঢাকনীওয়ালা ছোট ছোট বাটী ও রেকাবিই আমাদের থালা-বাসন। বাটীগুলির কোনটাতে ভাত, কোনটাতে বা টুকেমন, মিসসিরু প্রভৃতি তরকারীগুলি, আর রেকাবিতে ভাজাভুজি প্রভৃতি রাখা হয়। চীনামাটীর এই বাসন ও ওজেনগুলি সর্ব্বদা একটা আলমারীতে বন্ধ থাকে। খাবার সময় হইলে এগুলিকে এক-একজনের সম্মুখে আনিয়া রাখা হয়। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া আবার সেই আলমারীতেই যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। এখানে কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিত যে, একজনের ওজেন ও বাসনগুলি অন্যের ব্যবহার করিবার কোন নিয়ম নাই।

এদেশে খাবার সময়ে ভাত তরকারীগুলি অনেকবার করিয়া পরিবেশনের প্রথা আছে। কিন্তু জাপানের প্রথা একটু অন্য ধরণের। বাড়ীর কর্ত্রী বা কর্ত্রীস্থানীয় অন্যে পূর্ব্ব হইতেই সেই ওজেনের বাটীগুলিতে মিসসিরু, টুকেমন, মাছ প্রভৃতি তরকারীগুলি পরিবেশন করিয়া রাখেন। ঐ তরকারীগুলি প্রথমবারেই এত অধিকপরিমাণে দেওয়া হয় যে, আর দ্বিতীয়বার পরিবেশনের দরকারই হয় না, তাই আমাদের দেশে খাইতে বসিবার পর এদেশের মত তরকারী পরিবেশনের কোন নিয়মও নাই। কিন্তু ভাতগুলি একটা কাঠের ছোট টবে ভরিয়া বাড়ীর যিনি কর্ত্রী তাঁহার সম্মুখে আনিয়া রাখা হয়; তরকারীগুলির সহিত পূর্ব্বেই পরিবেশন করা হয় না। ভাত রাখিবার ছোট টবগুলিকে আমাদের দেশের ভাষায় "ওহেতু" বলে। সকলে আসিয়া খাইবার আসনে বসিলে বাড়ীর চাকরাণী বা কর্ত্রীঠাকুরাণী এই 'ওহেতু' হইতে একখানি রেকাবিতে

একটা কাঠের হাতায় করিয়া ভাতগুলি উঠাইয়া লইয়া প্রত্যেকের বাটীতে বাটীতে ঢালিয়া দেন। এই ভাত পরিবেশনের সময় বাড়ীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে আর সকলকে পরিবেশন করিবার প্রথা আছে। ছোট একবাটী ভাতে একজনের কুলায় না বলিয়া খাবার সময় অনেকবার করিয়া ভাত পরিবেশনের নিয়ম আছে। কিন্তু যতটুকু আমার জানা আছে; তাহাতে এই বলিতে পারি যে, আমাদের সেই তিন চারিবারে পরিবেশন করা ভাতের পরিমাণ এদেশীয়দের একবার পরিবেশনের এক থালার অর্দ্ধেকের বেশী হইবে না।

এদেশে বা বর্ম্মায় খাবার জিনিসগুলিকে সাধারণতঃ হাত দিয়া তুলিয়া খাওয়ারই নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু জাপানের প্রথা এরূপ নহে। হাত দিয়া কোন খাবার জিনিস স্পর্শ করিলে তাহা অপবিত্র ও নোংরা হইয়া যায়, এইরূপ আমাদের ধারণা। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সাহেবদের মত কাঁটা চামচও ব্যবহার করি না। আমরা এই উদ্দেশ্যে দুইটী কাঠি ব্যবহার করি। আমাদের দেশের ভাষায় ইহাকে "হাসি" বলে। এই "হাসি" বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। নূতন অবস্থায় এগুলি কাগজের মোড়কের মধ্যে থাকে। মোড়কের কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলে খানিকদূর পর্য্যন্ত মাঝামাঝি চেরা একটা কাঠের ফলা বাহির হইয়া আসে। সেই চেরা জায়গার দুইদিক্ ধরিয়া টানিলে ইহা দুই খণ্ড হইয়া যায়। লম্বায় এগুলি সাত আট ইঞ্চির বেশী হয়, চওড়া বড় জোর আধ ইঞ্চি হইবে। এক জোড়া কাঠিতে একজন লোকের অনেকদিন চলিতে পারে। প্রতিদিনের আহারের পর বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া একটা কৌটায় ভরিয়া প্রত্যেকের নিজের 'ওজেনের' একধারে রাখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ীতে কোন অতিথি আসিলে তাঁহাকে একজোড়া নূতন হাসি আনিয়া দেওয়া হয়। তিনি যে কয়দিন থাকেন, যথানিয়মে তাহা ধুইয়া মুছিয়া রাখা হয়, চলিয়া গেলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। একের হাসি অন্যের ব্যবহার করিবার নিয়ম নাই। সকলে আহারে বসিয়া বাম হাত দিয়া খাবারের বাটীটা তুলিয়া ধরে এবং দক্ষিণ হস্তের কয়েকটী অঙ্গুলির সাহায্যে পূর্ব্বের সেই হাসি দুইটী একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সুকৌশলে তাহার দ্বারা খাবার তুলিয়া মুখে ভরিয়া দেয়। এইরূপ ভাবে কেবল ঐ একজোড়া কাঠির সাহায্যেই ভাত-তরকারী, মাছ-মাংস সবই খাওয়া হয়; কোনটাতেই হাত লাগাইবার দরকার হয় না। তবে একটা কথা হইতেছে এই যে, এদেশে যেমন ভাতের সহিত তরকারীগুলি আগে থালার উপরে বেশ করিয়া মাখিয়া লইয়া পরে খাওয়া হয়, আমাদের দেশে সেরূপ নহে। আমারা প্রথমে হয়ত একগাল ভাত খাইলাম, তাহার পর একগাল তরকারী খাইলাম, পরে আবার হয়তো একগাল ভাত খাইলাম—এইরূপ ভাবেই বরাবর চলে, কাহারও সহিত কোনটা মিশান হয় না। এখানে এই সম্পর্কে বিশেষ করিয়া একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই; এদেশে যখন খাইতে বসে, তখন প্রথমে যেমন গণ্ডুষ করিয়া বসে এবং আহার শেষ হইয়া গেলে আবার গণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া উঠে, আমাদের দেশেও কতকটা এইরূপ 'ধরণের' একটা প্রথা আছে।

সেখানে সকলে একত্র মিলিত হইয়া আহারে বসিবার সময় করজোড়ে অন্নের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বসে এবং খাওয়া শেষ হইয়া গেলে আবার করজোড়ে নমস্কার করিয়া তবে আসন ত্যাগ করে। প্রথাটীর তাৎপর্য্য এই যে, অন্নই আমাদের জীবনকে রক্ষা করে, তাই এই অন্নই বোধিসত্ব ; এবং আমাদের এই করযোড়ে নমস্কার সেই বোধিসত্বেরই উদ্দেশে। কেবল ইহাই নহে, আমরা মনে করি যে, অন্নের একটী ক্ষুদ্র কণিকাও হাজার হাজার লোকের পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন, তাই তাহাদেরও উদ্দেশে আমাদের এই সকৃতজ্ঞ নমস্কার।

এতক্ষণ ধরিয়া কেবল আমাদের সাধারণ দৈনিক আহারের কথা বলিলাম। এবার আমাদের দেশের 'ভোজের' সম্বন্ধে কিছু বলিব। এদেশে যেমন উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি উপলক্ষে কিম্বা কোন সৌভাগ্যের কারণ ঘটিলে বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা হয়, আমাদের দেশেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এদেশে বিশেষ ভোজন বলিতে বহু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ মাছ-মাংস-তরকারী, সময়োপযোগী ফল ও বহুপ্রকার মিষ্টান্নের আয়োজন বুঝায়। কিন্তু জাপানের বিশেষ ভোজনের ইহা ছাড়া আরও একটু বিশেষত্ব আছে। আমাদের দেশে ভোজে সামাজিকভাবে শাকে পানের ব্যবস্থা আছে। এই শাকে জিনিসটী চাউল হইতে তৈয়ারী সুরা বিশেষ। যদিও ইহা ছাড়া অন্যপ্রকারের সুরাও আমাদের দেশে আছে এবং আজকাল পাশ্চাত্যদেশীয় সুরাও জাপানে ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি সামাজিকতা উপলক্ষে এই শাকে ছাড়া অন্য সুরার ব্যবহার প্রচলন নাই। কারণ শাকে যদিও সুরা তথাপি দেবকার্য্যে ও সামাজিকতার জন্যে বহুকাল ধরিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া, প্রাচীন ভারতের সোমরসের ন্যায় ইহাকে একটু বিশেষ পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়।

আমি এ দেশের ভোজে বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছি। তাই আমি নিজের চোখেই এইটুকু দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি যে, এ দেশে বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সমাগত নিমন্ত্রিতগণকে বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বসান হয়। কিন্তু জাপানে বর্ণভেদ নাই বলিয়া সেখানে এ ধরণের প্রথাও দেখা যায় না ; তথাপি সকলে মিলিত হইয়া ভোজে বসিবার সময়, তাহাদের মধ্যে যে সব সম্মানিত, জ্ঞানী, গুণী ও বৃদ্ধ থাকেন তাঁহাদিগকে সকলের উচ্চ আসনে বসাইয়া আর সকলে নীচের আসনে বসে ; বিশেষতঃ স্ত্রীদিগের সকলের নিম্নে বসাই প্রথা। এ দেশের সহরগুলিতে যেমন বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে বৃহৎ ভোজের ব্যবস্থা হইলে সকলকে একসঙ্গে বসাইয়া খাওয়ান সম্ভব নয় বলিয়া দলে দলে খাওয়ান হয়, তেমনি জাপানের সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রথা। ইহার কারণ কতকটা স্থানাভাব কতকটা বা ওজেন প্রভৃতির অভাব। কারণ, এ দেশে যেমন দেখিতে পাই বড় বড় ভোজে থালাবাটীর বদলে কলাপাতা, পদ্মপাতা বা শালপাতা এবং মাটীর খুরী ও গেলাসের ব্যবহার হয়, আমাদের দেশে তেমন হয় না। সেখানে ভোজের সময় সাধারণ অপেক্ষা মূল্যবান ও সুন্দর সুন্দর

ওজেন গুলিই সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়; এবং ভোজের সময় সাধারণতঃ খাদ্যবস্তু গুলির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায় বলিয়া একখানি ওজেনে না ধরিলে সময় সময় একজনের জন্য দুইখানি ওজেনেরও বন্দোবস্ত করিতে হয়। যে ভোজে এইরূপ বন্দোবস্তের দরকার হয়, তাহাকে "নিনোজেন" অর্থাৎ একজোড়া ওজেনের ভোজ বলিয়া বৃহৎ ভোজ মনে করা হয়। এ দেশে দেখিতে পাই ভোজের সময় নানাবিধ তরকারীর বৈচিত্র্য ছাড়াও সময়ে সময়ে লুচি ও পোলাও প্রভৃতি আসিয়া নিত্যকার ভাতের স্থান দখল করিয়া বসে; কিন্তু জাপানে এদেশের মত তরকারীর বৈচিত্র্য থাকিলেও ভাতের বদলে অন্য কিছু ব্যবহারের প্রথা বড় দেখা যায় না। কেবল, সময় সময় নানাবিধ তরকারীর সঙ্গে ভাত রাঁধিয়া একটু বৈচিত্র্য করিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। সকলের শেষে মিষ্টান্নের ব্যবস্থাও যথেষ্টই হইয়া থাকে; তবে তাহা ঠিক এদেশের ছানা চিনির তৈয়ারী মিষ্টান্নের মত নয়—বরং কতকটা ইংরেজী কেকের ধরণের।

কোন ভোজের সময় সমাগত নিমন্ত্রিতগণ যখন ভোজসভায় আসিয়া আসন গ্রহণ করেন, তখন গৃহস্বামী সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে নিজের দীনতা জানাইয়া সকলকে অনুগ্রহ করিয়া আহারে বসিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সময় তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষের ভোজে বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ পরিতে হয়। গৃহস্বামীর এই অনুরোধ বচন শেষ হইয়া গেলে নিমন্ত্রিতগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হন। প্রথমেই আট দশ জন লোক এক একটা চীনামাটির জাগে ভরিয়া পূর্ব্বের সেই শাকে বা সুরা গরম করিয়া লইয়া আসে। পরিবেশন উচ্চস্থান হইতে সুরু হইয়া একেবারে নিম্নস্থানে আসিয়া শেষ হয়। প্রত্যেককে আধ ছটাক আন্দাজ ধরিতে পারে এমন ছোট একটী চীনামাটির পাত্র ভরিয়া শাকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই পাত্রগুলিকে আমাদের দেশের ভাষায় "শাকাজুকি" বলে। শাকে পরিবেশন শেষ হইলে সকলে ইহা এক সঙ্গে পান করে। পান করিবার সময় সকলকে এক সঙ্গে বলিতে হয় "গোচিছো ছামা" অর্থাৎ সুন্দর খাওয়া আজ আমরা খাইব; ইহার পর ভোজন আরম্ভ হয়। জন্ম বিবাহ প্রভৃতি কোন শুভ-কর্ম্ম উপলক্ষে যে ভোজ হয়, সে সময় পূর্ব্বে এই কথাটী ছাড়া আরও একটি কথা বলিতে হয়—"ওমেদেত" অর্থাৎ সুসংবাদ।

নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে যাঁহারা মদ্যপায়ী তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ শাকে পরিবেশনের প্রথা আছে। তাই বলিয়া তাঁহারা যে কেবল একটানা সুরা পানই করিতে থাকেন তাহা নহে; একটু একটু তরকারী, মাছ বা মাংস খান এবং এক এক পাত্র শাকে পান করেন—সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলিতে থাকে। যাঁহারা সুরা ব্যবহারে অভ্যস্ত নন, তাঁহারা এক পাত্র শাকে গ্রহণের পরই ভোজন আরম্ভ করেন। এই দলের মধ্যে প্রায়ই কেবল রমণীগণ ও কিশোর বয়স্ক যুবকেরাই পড়িয়া থাকেন। কারণ আমাদের দেশে কেবল ইহাঁদেরই মদ্যপান বিশেষ নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়। অবশ্য তাই বলিয়া স্বভাবতঃই সুরার উপর যাঁহাদের বিতৃষ্ণা আছে এমন লোকও আমাদের সমাজে বড় কম নাই।

এখানে পরিবেষ্টাদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিতে চাই। সাধারণ ভোজে দশ বারজন হইলেই কাজ চলিয়া যায়; কিন্তু বৃহৎ ভোজে বহু পরিবেষ্টার দরকার হয়। উপলক্ষবিশেষে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে মিলিয়া পরিবেশনের কাজ করিতে হয়, এবং সাধারণতঃ নিজের জ্ঞাতিবন্ধু ছাড়া অন্যকে পরিবেশনের কাজে লাগানর নিয়ম নাই। কোন বিশেষ সৌভাগ্যের কারণ ঘটিলে যে ভোজ দেওয়া হয়, তথায় গেসা বালিকাদিগকে পরিবেষ্টার কাজে নিয়োগ করা হয়। আমাদের দেশের গেসা বালিকার মত এদেশে ঠিক্ তেমন কিছু দেখি না; কাজেই এক কথায় ইহাদিগকে বুঝান বড় মুস্কিল। সাধারণতঃ নাট্য-গীতকলায় সুদক্ষা বালিকাদিগকে গেসা বালিকা বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেককে ঘণ্টায় দশ টাকা করিয়া দিয়া এই কাজে নিয়োগ করিতে হয়। ইহারা একদলে বা পরিবেশন করে, আর একদলে গান গাহে, অন্য দলে বাজাইতে থাকে, অপর দলে বা সুন্দর অঙ্গভঙ্গিমার সঙ্গে নৃত্য জুড়িয়া দেয়। কখন কখন বা সকলে মিলিয়া একটা গীতিনাট্যের অভিনয় আরম্ভ করে। মোটের উপর নিমন্ত্রিত-গণের চিত্তকে ইহারা সকল রকমে প্রফুল্ল করিয়া তুলে। আয়োজন ভাল হইলে সময়ে সময়ে সারারাত্রি ধরিয়া এইরূপ আনন্দভোজ চলিতে থাকে। ইংলণ্ডের যুবরাজ এবার জাপানে এই গেসাবালিকাদের নাট্যাভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। এই গেসা-বালিকাদের সম্বন্ধে আমি স্থানান্তরে বিস্তারিতরূপে বলিব।

শ্রী আর, কিমুরা

"কবি"

হে কবি! আজি এ নবীন বরষে
মাতাও নবীন গানে,
তব সুমধুর সুরধারা আজি
বহাও সবার প্রাণে!

আজিকে যাহারা অলস-শয়নে
মগ্ন আকাশ-কুসুম চয়নে,
ফুটাও তাদের অন্ধ নয়ন
নূতন আলোক দানে॥

পথের ধূলায় লুটিছে যাহারা,
ফেলিছে নয়ন-জল;—
বিপুল সাহসে উঠিয়া দাঁড়াক
লভিয়া নবীন বল।

ভুলে যাক্ সবে মিছে দলাদলি,
আসুক ছুটিয়া ধরে গলাগলি,—
লভুক আজিকে নূতন জীবন
তব গীত-সুধা পানে॥

কুমারী বেলা গুহ

কনস্তান্তিনোপল
ও
নিকটবর্ত্তী দৃশ্যাবলী।
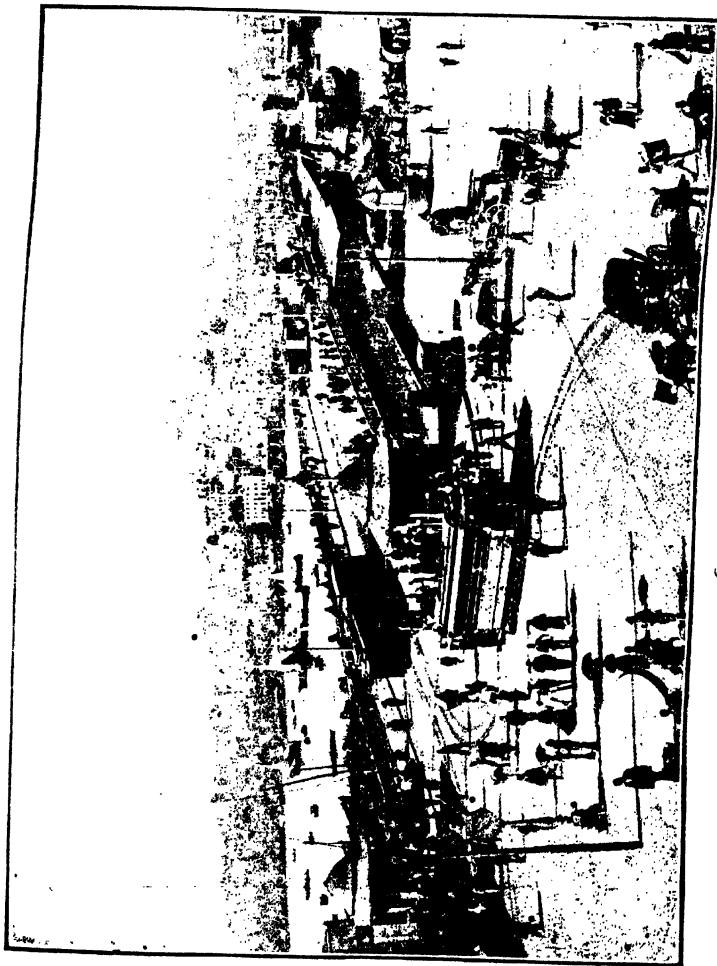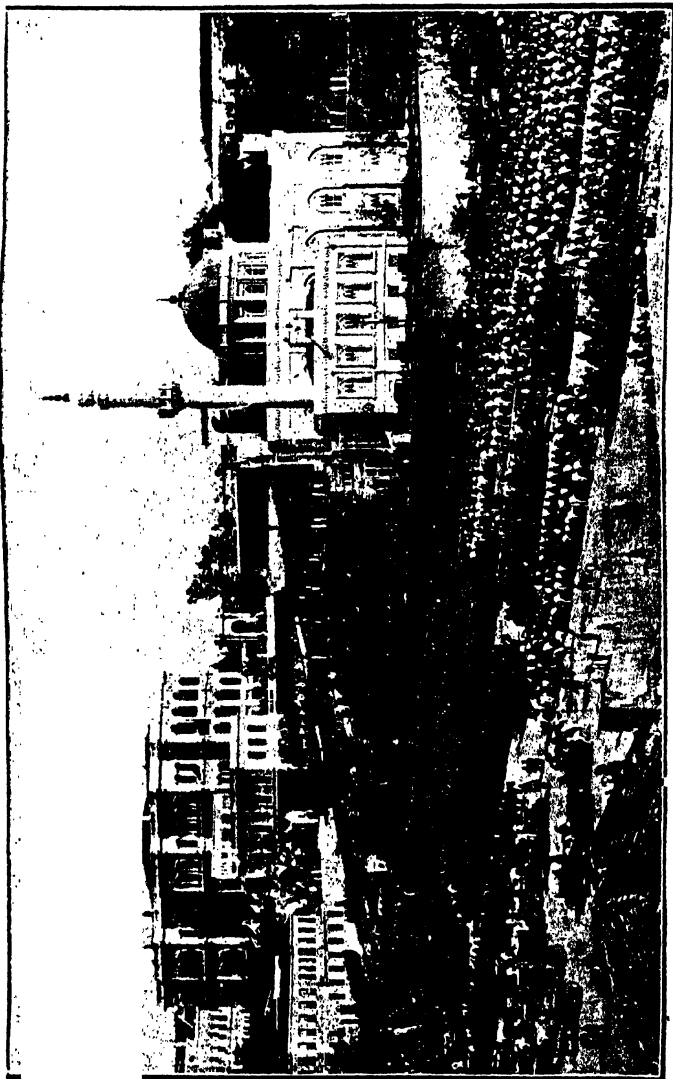
সুবিখ্যাত গালাটা সেতু।

["লুকার-অন" পত্রের সৌজন্যে।]

পেরা-বন্দর, বস্‌ফোরাস্ ও স্কুটারি।

“লুকার-অন” পত্রের সৌজন্যে]
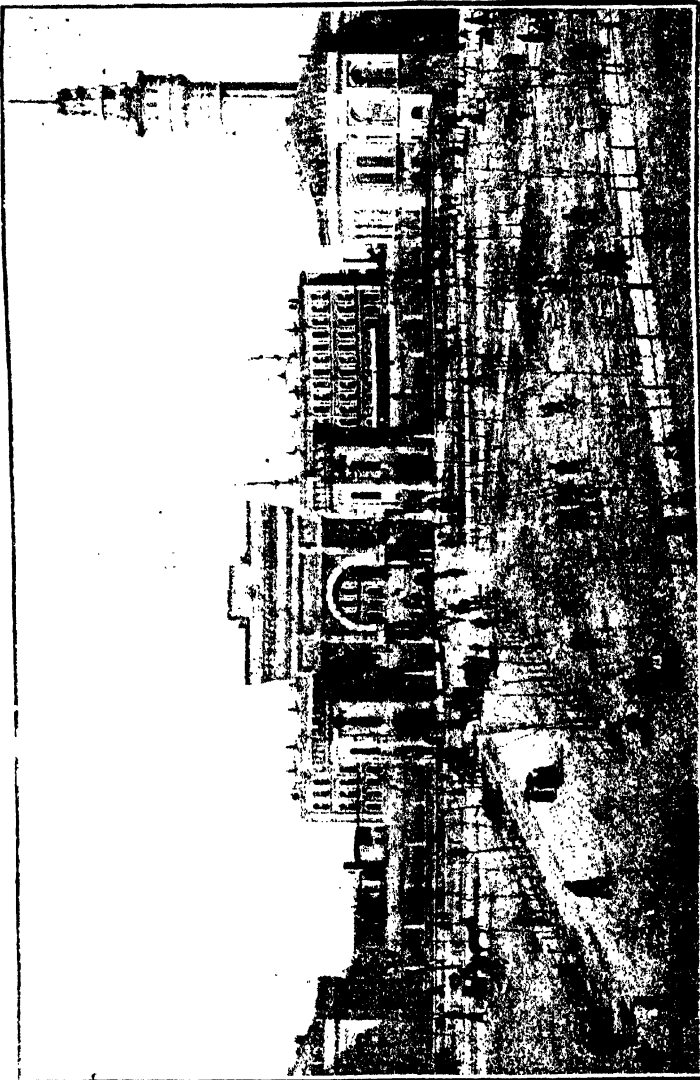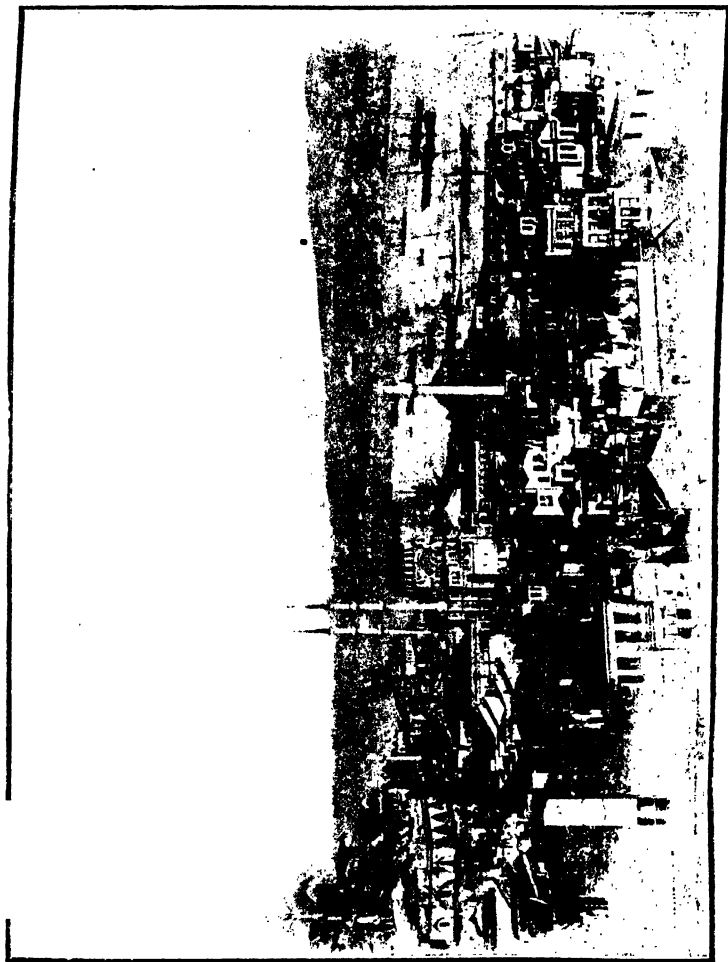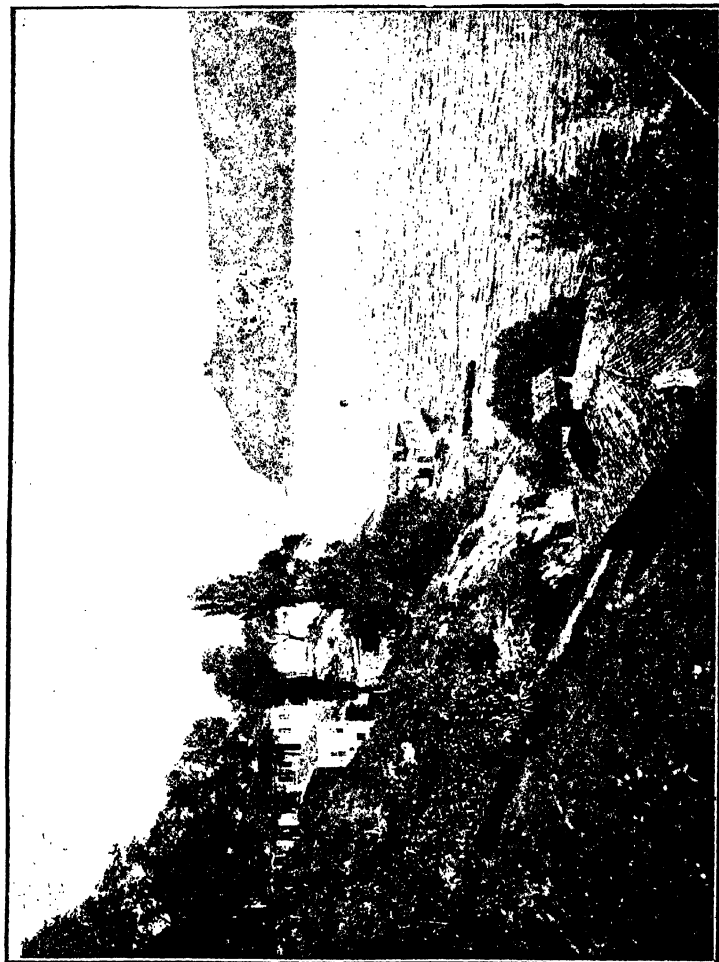
কৃষ্ণসমুদ্রের (Black sea) প্রবেশদ্বার।

"লুকার-অন" পত্রের সৌজন্যে।]

বাংলার নবযুগের কথা

ষষ্ঠ কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—প্রথম অধ্যায়

(১)

ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাংলার নব্যশিক্ষিত সমাজে যে স্বাধীনতার আদর্শ জাগিয়া উঠে, ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথমে সেই আদর্শকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এই কারণেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ যে বেশী লোকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন নহে। ব্রাহ্মেরা যে পরমার্থসাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন, দেশের শিক্ষিত সাধারণে সেই সাধনের মূল্য ও মর্য্যাদা যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, একথাও বলা যায় না। ফলতঃ সে সময়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে অসংযত যুক্তিবাদ এবং সন্দেহবাদই বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। যাঁহারা এতটা বাড়াবাড়ি করিতেন না, তাঁহারাও উপাসনা ও প্রার্থনাদির আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক লোকই নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। এ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট মতবাদের উপরে শিক্ষিত জনসাধারণের যে খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল, এমন বলা যায় না। অথচ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সাধারণভাবে প্রায় সকল শিক্ষিত লোকেরই গভীর সহানুভূতি দেখা যাইত। আর এই সহানুভূতির মূল কারণ, ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার আদর্শ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়েই এই স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সেকালের ইংরাজী-নবীশেরা হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন। দেবদেবীর উপাসনাকে এবং বিশেষভাবে প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে মিথ্যা এবং মানুষের উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই সকল কুসংস্কারের জন্যই আমরা য়ুরোপীয়দিগের মতন সাংসারিক অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারিতেছিনা, অনেকেরই এই ধারণা ছিল। এই সকল কুসংস্কারের জন্যই আমরা দুনিয়ায় এতটা হেয় হইয়া রহিয়াছি, প্রায় সকল ইংরাজীনবীশই ইহা বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন, তখন নব্যশিক্ষিতসমাজের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই তাঁহার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন। মহর্ষি যখন ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে আরম্ভ

করেন, তখন অন্যদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অসাধারণ দক্ষতা সহকারে সে সময়ের য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং দার্শনিক চিন্তার প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার দত্ত নামে মাত্র ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার মনের ঝোঁক বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়তা-বাদের দিকেই বেশী ছিল। এই ঝোঁকটা ক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে মহর্ষির সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য মতবিরোধ হয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলীর জন্যই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সে সময়ে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল বাঙ্গালীর নিকটে এতটা আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর, উদারমতি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সেকালের বাংলার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যরথী ও চিন্তানায়কেরা প্রায় সকলেই তত্ত্ববোধিনী এবং মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে না দাঁড়াইলেও ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। আর এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহাদের এতটা সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে স্বাধীনতার সংগ্রামটা কেবল আরম্ভ হয় মাত্র এই জন্য যে সকল শিক্ষিত যুবকেরা স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

এই স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিপূর্ণমাত্রায় বাধিয়া উঠে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে। আর এই সংগ্রাম প্রথম বাধে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রপ্রমুখ নবীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে। তিন কারণে এই বিরোধটা বাধে। প্রথম, মহর্ষির ধর্ম্মসাধনের সঙ্কীর্ণতা, দ্বিতীয়, মহর্ষির ধর্ম্মমতের একদেশদর্শিতা, তৃতীয়, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরিচালনায় মহর্ষির একতন্ত্রতা বা autocracy (অটোক্রাশী)। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল ব্রহ্মোপাসনার মধ্যেই কার্য্যতঃ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমতবাদকে জীবনের সকল কর্ম্মে এবং সকল সম্বন্ধের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এ ভাবটা তখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হয় নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ ব্রাহ্মমতবাদের আদর্শে ব্রাহ্মদিগের জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কহিলেন, ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনার সময়ে এককথা কহিব, এক ভাবের অনুশীলন করিব, মনে মনে এক আদর্শের ধ্যান করিব, আর মন্দির হইতে ফিরিয়া বাড়ী যাইয়া পরিবারে এবং সমাজে অন্যরূপ আচার আচরণ করিব, ইহা সঙ্গত নহে। ইহাতে সত্যের প্রতি সম্যক্ মর্য্যাদা প্রকাশ হয় না। যাহা সত্য বুঝিব তাহা জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে মানিয়া চলিব। অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধির বা বিবেক বা Conscience অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য আদর্শ। এই লইয়াই মহর্ষির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ বাধে। কেশবচন্দ্র এই বিরোধ সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজী পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়ান মিররে' লেখেন যে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল একেশ্বরবাদের যুদ্ধ। এই সংগ্রামে প্রথমে রামমোহন এবং পরে দেবেন্দ্রনাথই সেনানায়ক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের "দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ।" বিবেকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই

"সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল।...পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন; কিন্তু কয়েকজন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিকভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাস অনুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে।..ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোনও কার্য্য করা উচিত নহে। জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্যসকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত। প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদিগণ জীবনপথে এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।"

এই বিরোধের দ্বিতীয় কারণ, মহর্ষির ধর্ম্মের আদর্শের সঙ্কীর্ণতা। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনও বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রণীত কিম্বা ধর্ম্মের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। সত্য ভিন্ন এই ধর্ম্মের অন্য কোনও প্রামাণ্য নাই। যে শাস্ত্রে যতটুকু সত্য আছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাহাকেই মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও শাস্ত্র স্পর্শ করে না। নবীন ব্রাহ্মেরা এই সঙ্কীর্ণতারও প্রতিবাদ করেন। ইহাও মহর্ষির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধের একটা কারণ হইয়া উঠে।

বিরোধের তৃতীয় কারণ, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপরিচালনায় মহর্ষির অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী একাধিপত্য। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের গৃহের ও অন্যান্য সম্পত্তির 'ট্রাষ্টি' ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের 'ট্রাষ্ট' পত্র অনুসারে 'ট্রাষ্টি' হিসাবে মহর্ষির উপরেই সমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার ন্যস্ত ছিল। ব্রাহ্মসাধারণের এ সকল বিষয়ে আইনতঃ কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু বিরোধ বাধিবার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধি সভা গঠন করিয়া, তাহারই হস্তে ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যভার অর্পণ করেন। বিরোধের সূত্রপাত হইলে তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের পরামর্শে নবীন ব্রাহ্মদিগের এই অধিকার কাড়িয়া লইয়া ট্রাষ্টিরূপে ব্রাহ্মসমাজের সকল কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন। মহর্ষির এই একতন্ত্রতা বিরোধের তৃতীয় কারণ হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

"বাহিরে দেখিতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সমাজগৃহের ট্রাষ্টি মাত্র। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহারা সমুদয় ব্রহ্মমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও নিয়ামক। মানবাত্মাগুলিকে শাসনাধীন করিবার জন্য তাঁহারা রাজবিধি-গঠিত কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার আমাদিগের বিবেকের নিকট অতি উদ্বেগকর।...সাধারণে আর এরূপ ভাব এখন সহ্য করিতে পারেন না। এখন পৃথিবীর সকল লোককে আমাদের বোঝান প্রয়োজন হইয়াছে যে কলিকাতাসমাজ বর্ত্তমান অবস্থায় মণ্ডলীর মত প্রকাশ করে না। উহা এখন জনকয়েক ব্যক্তির মাত্র। যে অস্ত্রে উহা আপনাকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে, সেই অস্ত্রেই এখন আমরা উহাকে ভগ্ন করিব।... একপক্ষের একাধিপত্য অন্য পক্ষের শৃঙ্খলমুক্ত হইবার কারণ হইয়া থাকে।..

কেশবচন্দ্র এইরূপে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলার শিক্ষিত সাধারণের দরবারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি কহেন যে "কলিকাতা সমাজ (আমরা এখন যাহাকে আদি সমাজ কহি, আদিতে তাহাই কলিকাতা সমাজ নামে অভিহিত ছিল) মানবের ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে একটা কথার 'কথায় পরিণত করিয়াছে।" বিরোধের সকল কারণগুলির সমাহার করিয়া উপসংহারে কেশবচন্দ্র কহেন :—

"কলিকাতাসমাজ এইরূপে ঈশ্বরের ধর্ম্মকে সংসারের ধর্ম্ম করিয়াছেন; সমগ্র মানবজাতির উদার ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্ম করিয়াছেন; বিবেকের স্থলে ফলাফল চিন্তা, বীরত্ব ও ঐকান্তিকতার স্থলে চাঞ্চল্য, ভীরুতা ও কপটতাকে স্থান দান করিয়াছেন; সত্যকে সংসারের দাস করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরের নামে ধনের সম্মানার্থ বেদী স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতাসমাজের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা সমুচিত, অন্যথা মহা বিপ্লব ঘটিবে। সত্যকে কখনও কেহ দাসত্বে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না, উহা সমুদয় শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বাধীন হইবেই হইবে।"

কেবল ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্ম সিদ্ধান্ত লইয়া এই বিরোধ উপস্থিত হইলে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই বিরোধের ফলাফলেতে কোনও স্বার্থ থাকিত না। তাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও মনোনিবেশ করিতেন না। আর এই সংগ্রামের সেনাপতিরূপে কেশবচন্দ্রও তাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র সংখ্যক ব্রাহ্মেরা ইহাকে একটা ধর্ম্মসংগ্রাম বলিয়া মনে করিলেও, দেশের শিক্ষিত সাধারণে এই বিবাদকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র নিজেও ইহাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই প্রচার করেন। মহর্ষির দল ছাড়িয়া যাইয়া কেশবচন্দ্র স্বপক্ষে লোকমত গঠনের জন্য ইংরাজীতে 'ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই নাম দিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতায় কোনও কোনও খৃষ্টীয়ান পাদরী উপস্থিত ছিলেন। সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নেতৃস্থানীয় দুইজন মহাপুরুষের নামও বক্তৃতার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের একজন দিগম্বর মিত্র, অপর মহেন্দ্র লাল সরকার। ইঁহারা কেহই ব্রাহ্ম ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের মত বিরোধে ইঁহাদের কোনই ইন্টারেষ্ট ছিল না। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সকলেই যেমন দেশপ্রচলিত কুসংস্কার এবং সমাজানুগত্যের বিরোধী ছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ স্বজাতির কল্যাণ কামনায় যাহাতে সত্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী যাবতীয় রীতিনীতি ও সংস্কার নষ্ট হয় সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই চাহিয়াছিলেন। সরকার মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশবাসীর চিন্তা ও চরিত্রকে সত্য ও স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। মিত্র মহাশয়ও অন্য দিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অন্যতম অধিনায়করূপে পরজীবনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বদেশীয়দিগের অধিকার বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই নিজ নিজ ভাবে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন; আর এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যখন এই স্বাধীনতার

সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল তখন দেশের শিক্ষিত সাধারণের সঙ্গে ইঁহারাও কেশবচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন।

(২)

ফলতঃ সে সময়ে কেশবচন্দ্র সর্ব্বতোভাবেই বাঙ্গালীর চিত্ত ও চরিত্রকে স্বাধীন ও উদার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ ইংরাজীর নভেম্বর মাসে নবীন ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজই সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাধীনতার আদর্শকে সাকার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি বিশুদ্ধ মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। সাধন ভজনকেই ধার্ম্মিকের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী চরিত্র গড়িয়া তোলা, এবং পরিবারের এবং সমাজের সকল সম্বন্ধকেই নিয়মিত করা, ইহাই তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের মূলসূত্র হইল, সত্য ও স্বাধীনতা। নিজের বিচার বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, প্রাণ পাত করিয়াও তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে না কোনও গ্রন্থের, না কোনও পুরোহিত সম্প্রদায়ের, না সমাজের—অধীনতা স্বীকার করিলে চলিবে না, তাহাতে ধর্ম্মহানি হইবে। ইহাই কেশবচন্দ্রের নূতন ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র হইল। এই মূলমন্ত্র স্বাধীনতার মন্ত্র। এইজন্যই বহুতর শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী ব্রাহ্মমতবাদ বা ব্রাহ্মসাধন গ্রহণ না করিয়াও সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইভাবে সেকালের শিক্ষিত লোকমাত্রেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন।

(৩)

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও এই সংগ্রাম ঘোষণা করেন। প্রকাশ্যভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু নানা দিক দিয়া অপরোক্ষভাবে স্বদেশের আত্ম-মর্য্যাদা বোধ জাগাইয়া তুলেন। প্রথমতঃ তাঁহার অলোকসামান্য মনীষা এবং বাগ্মিতা দেশের লোকের হীনতা-বোধ নষ্ট করিয়া দেয়। সেকালে ইংরাজী বিদ্যারই একাধিপত্য ছিল। ইংরাজী বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিলেই বিদ্বান ও জ্ঞানী বলিয়া লোকসমাজে সমাদর পাওয়া যাইত। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার মনীষা এবং বাগ্মিতা ইংরাজ-সমাজকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া তুলে। ইংরাজী ভাষার উপরে কেশবচন্দ্রের যে পরিমাণে দখল ছিল, অনেক কৃতবিদ্য ইংরাজেরও সে দখল ছিল না। দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধের মতন হইয়া যাইতেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালীর আত্মগৌরববোধ জাগিয়া উঠিল। এই আত্মগৌরববোধেই দেশাত্মবোধের প্রথম সূচনা।

হয়। কেশবচন্দ্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নায়ক না হইয়াও, এই দেশাত্মবোধকে সে সময়ে বিশেষভাবে জাগাইয়া তুলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মাস কয়েক পূর্ব্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ-থিয়েটারে কেশবচন্দ্র 'যিশুখৃষ্ট—য়ুরোপ ও এশিয়া' এই নাম দিয়া এক ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই এক বক্তৃতাতেই দেশের চিন্তানায়কত্বে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার মূলকথা ছিল দুটি। এক, তোমরা যাহারা খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দাও, তাহারা অনেকেই যিশুখৃষ্টের চরিত্রের অনুশীলন কর না। যিশুখৃষ্টের শিক্ষা তোমাদের চরিত্রে ফলিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয় কথা, যিশুখৃষ্ট এসিয়ার লোক ছিলেন। এসিয়ার সাধনা এবং সভ্যতার মূলগত বিনয়, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বজীবে মৈত্রী এবং আধ্যাত্মিকতার উপরেই যিশুখৃষ্টের জীবনের ও ধর্ম্মের পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। এ সকল আদর্শ প্রবল পরাক্রান্ত য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাল করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই। যিশুখৃষ্টকে বুঝিতে হইলে এশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধালাভ করিতে হইবে। এশিয়াকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে যিশুখৃষ্টের জীবন ও চরিত্রের প্রতি মর্য্যাদা দেখান হয় না। এই বক্তৃতা দিয়া কেশবচন্দ্র কেবল ভারতবাসীদিগের নহে, কিন্তু ইংরাজেরও শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে এভাবে কোনও বাঙ্গালী দেশের রাজপুরুষদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। আর যে ভাবে কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতাটি দেন, তাহাতে ইংরাজ খৃষ্টীয়ানেরা ভিতরে ভিতরে বাঙ্গালীর মুখে এ সকল কথা শুনিয়া যতটাই অবমাননা বোধ করুন না কেন, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার উপায় ছিল না।

সমসাময়িক ঘটনার আলোচনা করিলে মনে হয় যে কেশবচন্দ্র স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই এই বক্তৃতা দিতে উদ্যত হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আর, স্কট মনক্রীফ্ নামে এক বিলাতী সওদাগর বাঙ্গালী চরিত্রের উপরে অযথা আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি বাঙ্গালী পুরুষদিগকেই শঠ, জুয়াচোর ও প্রবঞ্চক বলিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই, আমাদের দেশের মহিলাদিগের উপরেও অকথ্য আক্রমণ করেন। ইহার ফলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ জ্বলিয়া ওঠে। উভয়পক্ষের সংবাদ পত্রের সাহায্যে এই আগুন দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। কেশবচন্দ্র মনক্রীফের বক্তৃতাকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁর এই বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু এমন সুচতুরভাবে এই কাজটি করেন যে মনক্রীফের পক্ষের লোকেরা তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার সূচ্যগ্র পরিমাণেও অবসর পায় নাই। 'তোমরা খৃষ্টীয়ান, যিশুখৃষ্টের আদর্শ অবশ্যই মান; এস তবে যিশুখৃষ্টের চরিত্রের ও উপদেশের তৌলদণ্ডে চড়াইয়া তোমাদের ও আমার স্বদেশীয়দিগের চরিত্রের ওজন করি।' কেশবচন্দ্র কার্য্যতঃ এই ভাবেই এই বক্তৃতা দান করেন। এদেশের দেশীয় ও ইংরাজদিগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই কথার অবতারণা করিতে যাইয়া তিনি কহিলেন,—

"In handling this rather delicate part of my subject, I must avoid all party spirit and race antagonism. I stand on the platform of brotherhood and disclaim the remotest intention of offending any particular class or sect of those who constitute my audience, by indulging in rabid and malicious denunciation on the one hand and dishonest flattery on the other.

অর্থাৎ এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি কোনও সম্প্রদায়ের বা জাতির পক্ষে ওকালতী করিব না। মানবের নিখিল ভ্রাতৃত্বের মঞ্চ হইতেই আমি ইহার বিচার করিব। কোনও জাতির অযথা নিন্দা করিব না, কাহারও তোষামদও করিব না। দোষ গুণ উভয় পক্ষেরই আছে, ইংরাজেরও আছে, এদেশীয়দিগেরও আছে। মনক্রীফ্ সাহেবের বক্তৃতার নাম না করিয়া তাঁহার বক্তৃতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে, এ দেশের য়ুরোপীয় সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা দেশীয় লোকদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণাই যে করে তাহা নহে, এরূপ ঘৃণা করাতে আনন্দ পায়। ইহারা এদেশের লোককে শৃগালের সঙ্গে তুলনা করে। সে শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছে, শৃগালের শিক্ষাই পাইয়াছে, শৃগালের মতই জীবন যাপন করে এবং মরে, অতএব—As a fox a native should always be distrusted, and treated with contempt and hatred. এদেশের লোকেও ইংরাজকে ছাড়িয়া কথা কহে না। তারা বলে, ইংরাজ নেকড়ে বাঘের মতন হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও শোণিতলোলুপ। ইংরাজ নেকড়ে বাঘ হইয়াই জন্মিয়াছে, নেকড়ে বাঘের শিক্ষাই পাইয়াছে, নেকড়ে বাঘের মতই জীবন যাপন করিবে এবং মরিবে। বিনয়, ক্ষমা এবং মৈত্রীধর্ম্ম সে জানে না। অল্পেতেই সে ক্রোধে জ্বলিয়া ওঠে এবং—Once out of temper he rants and raves, and inflicts the most cruel and barbarous torture on his enemy to gratify his ire and is even some times so far carried away by his passions as to commit the most atrocious murder. অতএব নেকড়ে বাঘকে যেমন লোকে ভয় করে এবং দূরে পরিহার করে সেইরূপ ইংরাজকেও পরিহার করিতে হয়। এদেশের লোকেরা ইংরাজকে যে ভয় করে তাহা ইংরাজের উন্নত চরিত্রের প্রভাবে নহে, কিন্তু তাহার পশুত্ব দেখিয়া। This fear, be it said, is not the fear due to a superior nature but that which brutal ferocity awakes তারপর স্বদেশবাসীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া কহিলেন, মিথ্যাপ্রবঞ্চনা জাল জুয়াচুরী আমাদের মধ্যে আছে সত্য, কিন্তু ইহা আমাদের প্রকৃতিগত নহে, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহারই ফল। আমাদের দেশের লোক বড় স্বার্থপর, ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভেই তাহাদের জীবন পরিচালিত হয়। এই স্বার্থের প্রেরণাতেই তাহারা মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অবলম্বন করে, আর বহু শতাব্দীর পরাধীনতাই আমাদিগকে এরূপ সঙ্কীর্ণ ও নীচ করিয়া তুলিয়াছে।

We are a subject race and have been so for centuries. We have too long been under foreign sway to feel anything like independence in our hearts. Socially and religiously we are little better than slaves ....under such circumstances all the higher impulses and aspirations of the soul must naturally be smothered, and hence it is that though educated ideas rebel, and organised communities of enlightened men often protest, the general tenor of native life is a dead level of base and unmanly acquiescence in traditional errors."

(৪)

বিগত পঞ্চাশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী যে স্বাধীনতামন্ত্র সাধন করিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের একরূপ প্রথম দীক্ষাগুরু। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিউজিয়নটদের সাধনে ও স্বার্থ ত্যাগেই ফরাশীসের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডেও পিউরিটানদিগের সাধন এবং আত্মবিসর্জ্জনের উপরেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভিত্তি গড়িয়া উঠে। আমেরিকার স্বাধীনতার মূলেও হিউজিয়নট এবং পিউরিটানদিগের সাধন দেখিতে পাই। আমাদের সমকালে রুশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বহুলপরিমাণে টলস্টয়ের শিক্ষা এবং আদর্শকে আশ্রয় করিয়াই জাগিয়া উঠে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই তাহার গোড়ায় একটা ধর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়াছে। এবং এই ধর্ম্মের প্রেরণায় মানুষ আগে ভিতরের বাঁধন কাটিয়াছে, নিজের চিন্তা ও চিত্তকে বাহিরের বন্ধনমুক্ত করিয়াছে, পরিবারে ও সমাজে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে, এবং পরিণামে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ভিতরে যে দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। পরিবারে এবং সমাজে যে আপনার বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্বাস অনুসারে চলিতে ভয় পায়, সে কখনও নির্ভীক হইয়া একতন্ত্র রাজশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে না। কেবল সাংসারিক সুখ সুবিধা যেখানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল প্রেরণা হইয়া রহে, সেখানে এই স্বাধীনতার সংগ্রাম কদাপি জয়যুক্ত হইতে পারে না। যেখানে জয়যুক্ত হয়, সেখানে দেশের জনসাধারণে এক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অপর অধীনতাতে যাইয়া পড়ে, 'স্ব'য়ের উপরে দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা বিশুদ্ধ, উদার এবং অপরাজেয় হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়া ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বর্ত্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুরূপে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতে পাই।

(৫)

কেশবচন্দ্র বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন নাই, একথা সত্য। কিন্তু সে সময়ে রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনাও লোকে অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। বন্ধনের বেদনা যেখানে নাই, মুক্তির বাসনাও সেখানে জাগে না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের শৃঙ্খল আমাদের গলায় বাধে নাই। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডে এবং

জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও ছোঁৎমার্গচারী সমাজের কঠোর রজ্জুটাই আমাদিগের গলায় এবং হাতে ও পায়ে বড়ই বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই বন্ধনের বেদনা জাগিয়াছিল। পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস নাই, অথচ তাহাদিগের নিকটে মাথা নোঁয়াইতে হইত ব্রাহ্মণের অতিপ্রাকৃত অধিকারে আস্থা ছিল না, অথচ পরিবারের শাসন ভয়ে পূজাপার্ব্বণে শ্রাদ্ধশান্তিতে বামুন ডাকিয়া মন্ত্র পড়িতে হইত। সংস্কৃত জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান তখনও জন্মে নাই, সুতরাং না পুরোহিতের, না যজমানের, কাহারও মন্ত্রের অর্থবোধ ছিল না, অথচ টিয়াপাখীর মতন এ সকল অর্থশূন্য শব্দ আবৃত্তি করিতে হইত। এই সকল ব্যাপারে বিচার বুদ্ধিতে আঘাত লাগিত। এই আঘাতের তাড়নাতেই মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যাঁহারা সমাজ-ভয়ে এ সকল অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারাও মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সত্যধর্ম্মের প্রেরণা বিশ্বাস ও ভক্তি। বিশ্বাস বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হইলেই সত্য ও শক্তিশালী হয়। এখানে তাহা হইত না। সমাজে জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হইত। অথচ নব্যশিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিচারযুক্তি কিম্বা নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা এই কৃত্রিম সামাজিক ভেদবাদকে সত্য বা কল্যাণকর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেন না। এই জাতিভেদ মানিতে যাইয়াও তাঁহাদের অন্তরে গুরুতর আঘাত লাগিত। যাঁহারা মানিতেন তাঁহারাও নিজের কাছে নিজে অত্যন্ত খাটো হইয়া থাকিতেন। আর নিজের কাছে নিজে খাটো হইয়া থাকার মতন দুরবস্থা মানুষের আর কিছুতে হয় না। ইহাতে তাহার আত্মসম্মানে যেমন আঘাত লাগে, পরের অপমান বা নির্য্যাতনে তাহার শতাংশের একাংশও আঘাত লাগিতে পারে না। এই বন্ধনবেদনাটাই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেই বাধিয়া উঠিল। মহর্ষি এই সংগ্রামের পূর্ব্বাবস্থাটা মাত্র আনিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে তিনি স্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন; তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগাইয়া, ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপের সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাকে সংযত করিয়াছিলেন। এইভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য তিনি দেশবাসীদিগকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রাম যখন প্রত্যক্ষভাবে বাধিয়া উঠিল, প্রাচীনে নবীনে যখন মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল, এবং কে কাহাকে বিধ্বস্ত করিবে তাহারই চেষ্টা আরম্ভ করিল, তখন মহর্ষির শান্ত ধীর প্রকৃতি, এবং অস্থিমজ্জাগত রক্ষণশীলতা এই বিপ্লব তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিল না। কেশবচন্দ্র তখন নবীন ব্রাহ্মদিগকে লইয়া এই ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের মাঝখানে 'জয় জগদীশ হরে' বলিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। এই শৌর্য্য বীর্য্যের বলেই তিনি এবং তাঁহার সহচর এবং অনুচরেরা বাংলার স্বাধীনতা ভিখারী শিক্ষিত সমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের চিন্তা ও ভাবরাজ্যের রাজা হইয়া উঠিলেন। তাহাদের অন্তরে যে সকল ভাব মূক হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের দৈবশক্তিরসায়িত রসনায় তাহাই বাচাল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের চিত্তে যে আকাঙ্ক্ষা ভয়ে ভয়ে নড়িতে

চড়িতে ছিল, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গীগণের জীবনে তাহাই নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যে বন্ধন তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিতেছিল অথচ যাহা ছেদন করিবার শক্তির প্রেরণা তাহারা পাইতেছিল না, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গিগণ অবলীলাক্রমে সে সব বন্ধন ছিড়িয়া মুক্ত পুরুষের মতন তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইলেন। এই ভাবেই স্বদেশবাসিগণের চিত্ত ও চিন্তাকে অধিকার করিয়া কেশবচন্দ্র নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। তিনি যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহাতে আসিয়া পড়িলেন। কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের এই সাধনা মহার্ঘ বস্তু। সেই সাধনার উত্তরাধিকারীরূপেই বাংলা আজি পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার সাধনে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া আছে।

রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনা তখনও জাগে নাই, সুতরাং রাষ্ট্রীয় মুক্তির বাসনাও প্রবল হয় নাই। তবে এই সাধনার পূর্ব্ব অবস্থা কেশবচন্দ্র অনেকটা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বাজাত্যের গৌরববোধ জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বনিয়াদ। কেশবচন্দ্র এই গৌরববোধ নানা দিক দিয়া জাগাইয়া তুলেন। তাঁহার মনীষা এবং বাগ্মিতা এ বিষয়ে কতটা সাহায্য করিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম প্রচারার্থে বিলাতে যান। সেখানে তাঁহার অলোকসামান্য মনীষা ও বাগ্মিতাতে ইংরাজ সমাজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। কেশবচন্দ্রের নাম দেশময় ছাইয়া পড়ে। সুরসিক পাঞ্চ (Punch) লিখেন :—

Big as lion or small as a wren
Who is this chunder Sen ?

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং নিজের ফটোগ্রাফ স্মৃতি-চিহ্নরূপে তাঁহাকে দান করেন। সামান্য মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী নিজের কেবল মনীষা ও প্রতিভাবলে বিলাতকে কাঁপাইয়া, মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর নিকটে রাজযোগ্য সম্মান পাইয়াছিলেন, ইহাতে কেবল বাঙ্গালীর নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর চিত্ত গৌরবে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে সকল বিষয়েই আমরা ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। ইংরাজের সার্টিফিকেট' মাথা পাতিয়া লইতাম। ইংরাজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। ইংরাজ আমাদিগের অপেক্ষা কতটা যে উঁচু, ইহা আমরা সকল সময় ধারণাই করিতে পারিতাম না। এই ইংরাজ যখন রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতিভার নিকট মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল, তখন আমরা বাঙ্গালী ও ভারতবাসী বলিয়া অভূতপূর্ব্ব গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম। এই স্বাজাত্যাভিমান সর্ব্বত্রই জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় আত্ম-চৈতন্যের—National life এবং National consciousness এর সূচনা করে। কেশবচন্দ্র এইরূপেও আমাদের বর্ত্তমান বৃহত্তর জাতীয় প্রচেষ্টার ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বিলাতে যাইয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা দেন তাহাতে অনেক সময়ই খোলাখুলিভাবে ইংরাজ চরিত্রের বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সকল বক্তৃতা পড়িয়াও আমাদের আত্মচৈতন্যের উদয় হয়। দুনিয়াতে আজিও যে আমাদের কিছু দিবার আছে, সভ্য জগতের যে আমাদের নিকটে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, কেশবচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে এই ভাবটা জাগাইয়া দেন। এই দিক্ দিয়াও আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার হরিদ্বারে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাই।

প্রথম যুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগত নবীন ব্রাহ্ম যুবকেরাই সেনানী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই উপরে আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইহাই প্রধান কীর্ত্তি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

আদার ব্যাপারী

পুরাকালে এক আদার ব্যাপারী— অতি বড় উজবুক্
জাহাজের নাকি খবর জানিতে হয়েছিল উৎসুক!
তাই দেখে নাকি কোন এক বিজ্ঞ অতীব সমজদার
ব্যাপারী ভায়াকে দিয়েছিল এক ধমক চমৎকার!
চমৎকার যে ধমকটা তাঁর প্রমাণ তা' সেটা হয়
সে ধমকানির চমক এখনও রয়েছে দেশটাময়!
দেশ জুড়ে যত আদার ব্যাপারী আদা নিয়ে আছে সুখী
জাহাজের কথা ভুলেও তাদের মনেতে দেয় না উঁকি!
কত পাল তুলে কতনা জাহাজ আসে যায় অপরূপ
পৌরাণিক সে ধমকের চোটে ব্যাপারীরা সব চুপ!

"বনফুল"

সোনার ফুল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

গোবিন্দের স্বভাবটি ছিল সেই পুরাণের গল্পের রাক্ষসের মত, যাহার আকাঙ্ক্ষার আর শেষ নাই !

একটি তরুণ নিষ্কলঙ্ক জীবন তাহার কাছে বলি দিয়া সকলে মনে করিয়াছিল—এ বলির স্বাদ পাইলে অন্য কিছুর প্রতি তাহার আর রুচি থাকিবে না ; কিন্তু কিছু দিন যাইতেই দেখা গেল, সে, মেয়েদের স্নানের ঘাটের পাশ দিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে—'যেন কোন্ কাজে' যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে !

ঘোষাল মহাশয় আসিয়া হরনাথকে বলিলেন—ভায়া শুনেছ ?—

হরনাথ চোখ বন্ধ করিয়া শুধু একবার বলিলেন—শ্রীমধুসূদন—

ঘোষাল মহাশয় চলিয়া যাইলে হরনাথ ঠাকুর ঘরের মাটিতে পাড়য়া কাঁদিয়া বলিলেন—ঠাকুর, তুমি যখন কিছু ভাঙ্গ, তখন তার মধ্যে আর কোন করুণার চিহ্ন রাখ না ;—একেবারে তাকে শেষ করে দাও। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে যে অশান্তির আগুন মনে জ্বেলেছি, তার শান্তি মরণেও হবে না......

অপর্ণা এতক্ষণ ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। হরনাথকে মাটিতে মাথা ঠুকিতে দেখিয়া, ছুটিয়া ভিতরে আসিয়া, তাঁহার মাথাটি কোলে তুলিয়া লইল।

চোখের জলে অন্ধ হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন—মাগো, তোকে জেনে শুনে কি লজ্জায় ফেল্‌লাম ! —এ কি করে সইবে তোর ?

হরনাথের চোখের জল মুছাইয়া অপর্ণা বলিল—মানুষের সব সয় বাবা, আমারও সইবে।

হরনাথ। ঐ জানোয়ারটাকে যখন তোর ঘরের দিকে যেতে দেখি—ওঃ কি হয় যে মনের মধ্যে তা কি বলব !......কিন্তু এ পাপ আর নয়। তুই চলে যা মা এখান থেকে ; আমি তোর বাপ্‌কে লিখে পাঠাই।

অপর্ণা অভিমান করিয়া বলিল—তুমি আমায় তাড়িয়ে দিতে চাও বাবা ?—কিন্তু আমি ত যাব না। গেলেও সেখানে ত আমার জায়গা হবে না। আমার আরো পাঁচটি ভাই বোন আছে। ঐ টুকু বাড়ীর মধ্যে ওদের সকলেরই কুলোয় না—

স্বামীর কাছে কাঁদিয়াও লক্ষ্মী কোন ফল পাইল না। তিনি বলিলেন—পরের বৌ এর জন্যে মাথা ব্যথা দেখালে সমাজ তা সহ্য করে না।

তবু লক্ষ্মী বুঝিল না। কেন? ইহাতে কি অন্যায় আছে? এই লজ্জার হাত হইতে বাঁচাইলে সমাজের কাছে দোষী হইতে হইবে কেন?

সে বলিল—আমার বন্ধু আমার পাশের বাড়ীতে ঐ অবস্থায় থাক্‌বে, এটা জেনে, তোমার আদর কি করে বুক ভরে নেব?—তুমি নিশ্চয়ই এর একটা কিছু কর্‌তে পার। গাঁয়ের লোকদের ডেকে সব বলে দাও না কেন?

লক্ষ্মীর স্বামী বলিলেন—তাতে কি হবে পাখী, কোনই উপকার হবে না। তোমার বন্ধু যে ওর স্ত্রী, এটা ত কিছু দিয়েই রদ কর্‌তে পার্‌বে না? লাভের মধ্যে হবে এই যে, বেচারীর শরীরের হাড় কখানা গুঁড়িয়ে যাবে।

লক্ষ্মীর কান্নার কোন ফল হইল না। যেমন ভাবে দিন এবং রাত্রি কাটিতেছিল তেমনিই কাটিতে লাগিল।

(৭)

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াও এখনও থামে নাই—থামিবার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। রাস্তার ধারের জানালার সাম্‌নে একটি আরাম চেয়ারের উপর একজন যুবা শুইয়াছিল। পাশে একটি 'টিপয়ের' উপর কতকগুলি বই ছড়ান রহিয়াছে। পিছনে একটি বড় টেবিল লিখিবার এবং পড়িবার সরঞ্জামে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও একটু ফাঁক নাই। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় আলমারি। সমস্ত গুলিই আইন-সংক্রান্ত বইএ পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি বইএর নীচে সোনার অক্ষরে লেখা আছে—মোহনকুমার মুখোপাধ্যায়।

একখানি কাব্যগ্রন্থ তাহার কোলের উপর রহিয়াছে। একটি কবিতার কিছু পড়িয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশের উপর চোখ তুলিয়া সে ভাবিতে ছিল।

এমন বাদ্‌লার দিনে কবি ছাড়া ডাক্তার, উকিল সকলেরই বুকখানি ভাবের মেঘে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। মোহন পড়িতেছিল:—

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারি ধার!
দুজনে মুখোমুখি,   গভীর দুঃখে দুঃখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর!

তাহার চোখে যেন কোন যাদুকরের সোনার কাঠির স্পর্শ লাগিল! সমস্ত জগত, আর যত কিছু দুঃখ দৈন্য অশান্তির কথা তাহার মন হইতে মিলাইয়া গেল!

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব!

তাহার শরীরে সুখের শিহরণ জাগিয়া উঠিল!

বলিতে বাজিবেনা নিজ কানে
চমক লাগিবেনা নিজ প্রাণে
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে,
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

ঐ স্বপ্নের মধ্যে অভিমানে তাহার বুকখানি ভরিয়া উঠিল। যেন কোন অদৃশ্য এক বাধাকে লক্ষ্য করিয়া সজল দুটি চোখ মাঝে মাঝে বই হইতে উঠাইয়া একটু তীব্রস্বরে পড়িতে লাগিল :—

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহ কোণে
দুকথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

কবির মন্ত্রণায়, এমন ঘন ঘোর বরিষার দিনে, 'তাকে' কিছু বলিবার ইচ্ছা মোহনের যে কতখানি হইয়াছিল, তাহা, তাহার ঐ ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু তাহার গোপন কথাটি শুনিবার সেই বিশেষ মানুষটি কোথায়? ঘরে যে নাই, তাহাকে বলিতে না পারার দুঃখ কেন যে এত বেশী করিয়া বুকে লাগিয়া থাকে তাহা কে জানে?

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়!
যে কথা এজীবনে রহিয়া গেল মনে
সেকথা আজি যেন বলা যায়!
এমন ঘন ঘোর বরষায়!

হরনাথ। তা হোক, না হয় একটু কষ্ট হবে, কিন্তু এই অপমান, এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচ্‌বি।

অপর্ণা। প্রথম দিনটা যখন সয়েছে বাবা, তখন অন্যগুলোও সইবে।—আমি যাব না। এখন চল, তোমার খাবার হয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে, বেলাও ঢের হল, আর দেরি করা হবে না।

অপর্ণা তাঁহাকে তুলিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে হরনাথ বলিলেন—ঠাকুর, এবার শেষ করে দাও। আমার এই দেহটায় এমন একটু জায়গা নেই, যেখানে তোমার মার এসে পৌঁছায়নি—ডেকে নাও তোমার কাছে—

অপর্ণা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—আমি ?......তাহ'লে আমার কি হবে বাবা ?—

কিন্তু তাহার এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না। হরনাথ শয্যা লইলেন; আর উঠিলেন না—একদিন শেষ রাত্রে বসুকুলপ্রদীপের শিখা হরনাথ জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া বিদায় লইলেন।

কুলপ্রদীপে 'তৈলের' অভাব যথেষ্টই ছিল, তাহা আর পূর্ণ তেজে উঠিল না। বাকি রহিল শুধু একটি 'আধ পোড়া' পলিতা। তাহা হইতে একটা বিশ্রী গন্ধ উঠিয়া লীলাপুর ভরিয়া গেল।

(৬)

অপর্ণা এখন আর নূতন বধূ নয়। তাহার উপর সকলের মোহ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে আর ভিড় করিয়া সকলে আসিয়া বসে না। ছোট ছেলে মেয়েরাও গ্রামের অন্য নূতন বধূর মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, অপর্ণাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবার অবকাশ পায় না। কেবল লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়ে নাই। সে তাহার প্রতিদিনের কাজের অবসরে, যেমন করিয়াই হোক একবার আসিবেই।

সেদিন দুপুরবেলা অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। অন্য দিন হইলে সে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকিতই। আজ যেন তাহার আগ্রহও নাই—শক্তিও নাই!

লক্ষ্মী আসিয়া তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অপর্ণার পাশে বসিয়া তাহার কপালে হাত দিতেই, সে লক্ষ্মীকে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী অপর্ণার দুঃখ বুঝিত এবং সহস্র উপায়ে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু আজ তাহার কান্না দেখিয়া তাহারও কোন উৎসাহ রহিল না।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া অপর্ণা একটু শান্ত হইলে, সাহস পাইয়া লক্ষ্মী বলিল—কৈ, আজ আমার বরের কথা শুন্‌লি না ?

অপর্ণা বলিল—বল্‌।

লক্ষ্মী অপর্ণার মুখখানি ভাল করিয়া মুছাইয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া বলিল— রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা কি বারোটা হবে, আমি সব কাজ সেরে ঘরে এলাম।—উনি তখন মজা করে বেশ এক ঘুম দিয়ে নিয়েছেন! আমি বিছানায় আস্‌তেই কি বল্‌লেন জানিস?— উঃ ভাব্‌লেও মনটা যেন কেমন হয়ে যায়! বল্‌লেন—পাখী আমার সমস্ত দিন খেটে খুটে আধ্‌মরা হয়ে গেছে। এবার আমি তোমার একটু সেবা কর্‌ব। বলেই আমার মাথাটা ধরে বালিসের ওপর রেখে, নিজে উঠে গিয়ে আমার পা দুখানা কোলের ওপর নিয়ে হাত বোলাতে লাগ্‌লেন।......ও অপর্ণা, উঃ, কি কান্নাটাই কাল রাতে কেঁদেছি। আমার বালিসটা একেবারে ভিজে গিয়েছিল।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা আজ তোকে আমিও কিছু বল্‌ব।— তখন রাত প্রায় বারোটাই হবে, সে বাড়ীতে এল। আমি তখন রান্নাঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তার পায়ের শব্দ পেয়ে জেগে উঠে দেখি, তার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!......ভাব্‌লাম স্বপ্ন হবে বা! এমন সময় সেই মেয়েটি ওর নাম ধরে ডেকে বল্‌ল—বেজায় খিদে পেয়েছে—

লক্ষ্মী দুহাত দিয়া অপর্ণার মুখ চাপিয়া বলিল—থাক, আর বল্‌তে হবে না।

অপর্ণা। আরে আগে সবটা শোন্‌ তারপর ত থাম্‌ব?—এবার আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম। ঘরে এসে উনান ধরালাম। রান্না হ'লে তাদের খেতে দিলাম। মেয়েটি আমায় বল্‌ল—তুমিও বোস না ভাই—

আমি বল্‌লাম—না, আমার খাওয়া হয়েছে।

খাওয়া হলে তারা উঠে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল!......কিন্তু এবার আর পারলাম না। ছুটে এসে হাত দিয়ে দরজা আট্‌কে বল্‌লাম—শুধু এই অনুরোধটা রাখ আমার। এ ঘরে নয়। অন্য ঘরে তোমাদের জন্যে বিছানা পেতে দিয়ে আস্‌ছি।

মেয়েটি বল্‌ল—বাবা! যে বাড়ী! এখানে কি করে রাত কাটাব?—আর এই ঘরটাই ত দেখ্‌ছি যা একটু পরিষ্কার—

তারপর? তারপর দেখ্‌লাম সে আমাকে সরিয়ে তাকে নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল......দরজা বন্ধ হয়ে গেল......ভিতরে একটা চাপা হাসির শব্দ উঠ্‌ল......

লক্ষ্মী নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া ছিল। তাহাকে ঠেলা দিয়া অপর্ণা বলিল—শুন্‌লি?

লক্ষ্মী বলিল—হাঁ, আর তুই?—

অপর্ণা। আমি?—বেঁচে আছি এখনও,—থাক্‌বও, তাতে কোন সন্দেহ নেই......

লক্ষ্মী বাড়ী আসিয়া তাহার শ্বশুরকে বলিল—বাবা, তুমি একটা গতি করে দাও।

ঘোষাল মহাশয় বলিল—অসম্ভব মা। আমরা কিছুই কর্‌তে পারি না। কিছু কর্‌তে গেলে, ঐ জানোয়ারটাই বরং উল্টে আমাদের বিপদে ফেল্‌তে পারে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া এই কথাটি মোহনকে যেন কোন এক স্বপ্ন-সুন্দরীর অভিসারে লইয়া চলিয়াছিল। এমন সময় উপরকার ঘরে কে চীৎকার করিয়া উঠিল—কি! দেবেনা?—ও তোমার বাবার টাকা কিনা?

মোহনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া একটি ছাতা লইয়া পথে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে বলিয়া উঠিল—জগৎটা সয়তানের সয়তানী খেলাঘর,—আর কবি মিথ্যাবাদী।

(৮)

হরনাথকে সকলেই বিশেষ ভক্তির চোখে দেখিত বলিয়াই গোবিন্দ এত দিন কতকটা অব্যাহতি পাইয়া আসিতেছিল। এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে সকলেই বসুকুলপ্রদীপের ঐ 'আধ্‌পোড়া' পলিতাটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কারণ, হরনাথের মৃত্যুর পর হইতে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা এত অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার অনুচরগণও তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল।

গোবিন্দ বিপদ বুঝিয়া মহাজনের কাছে বাড়ীটি বন্ধক রাখিয়া স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল এবং কিছুদিন শ্বশুরগৃহে থাকিয়া, নিকটেই একটি বাড়ীর দোতলার ঘরগুলি ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। নাচে মোহন থাকিত এবং এটি তাহারই বাড়ী।

যে দিন গোবিন্দ এবং তাহার স্ত্রী এবাড়ীতে আসে, তাহার পর দিন সকালে গৃহের অবস্থা দেখিয়া মোহন অবাক হইয়া গেল। সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! কোথাও এমন কিছু নাই যাহা দেখিলে মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। সে বহুদিন হইতে এখানে একা বাস করিতেছে। তাহার গৃহের কাজ একজন উড়ে ব্রাহ্মণ এবং একটি বাঙ্গালী ঝি দুজনে মিলিয়া করে। কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রীলোক না থাকিলে যে প্রকার অবস্থা হয়, তাহাই ছিল। তাহার ঘরের ভিতরকার ছড়ান চূণ বালি, কাগজ দেশলাইকাঠি প্রভৃতি যেমন অবস্থায় প্রথমে পড়িয়াছিল, আজ-ও ঠিক তেমনিই আছে!

বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহার মন আনন্দে ভরিয়া গেল! এত সকালেই কে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে? সমস্তের উপরই সে যেন এক সোনার কাঠির স্পর্শচিহ্ন দেখিতে পাইল!

তাহার পর হইতে প্রতিদিন সে ঐ সোনার কাঠির স্পর্শ চিহ্ন তাহার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাইত! এই জন্য সময় সময় সে বালকের মত ভাবিত—ঐ চৌকাঠ টুকুর আড়াল কি এতই বড়? সোনার কাঠি কি ওটাকে 'এড়িয়ে' আস্‌তে পারে না?—আমার ঘরখানা—উঃ কি বিশ্রী হয়েই রয়েছে!

এই রকমের একটা বিদ্রোহভাব, তাহার মনে উঠিয়া তাহাকে আনন্দও দিত, লজ্জিতও করিত। অথচ একজন অপরিচিতের কাছে সে যে কেন এতখানি প্রত্যাশা করে তাহাও বুঝিতে পারিত না।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা আর একটি জিনিস তাহাকে বেশী করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। সে যখন কোন কাজ করিত বা পড়িত, তখন কর্ম্মনিরতা গৃহলক্ষ্মীর হাতের চুড়ির শব্দটি তাহার সমস্ত কাজ ভুলাইয়া দিয়া যাইত। সে চুপ্ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিত; এবং ঐ গৃহলক্ষ্মীর চলা ফেরা ইত্যাদির শব্দ শুনিয়া তাহার কাণ এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে শব্দের বিভিন্নতা হইতে সে বুঝিতে পারিত—এবার 'তরকারী কোটা হচ্ছে'......'এবার 'রুটি' বা 'লুচি বেলা' হচ্ছে' ইত্যাদি। ভাবিয়া সে পরম তৃপ্তি লাভ করিত।

এই সময়ে একদিন তাহার পাচক ব্রাহ্মণ আসিল না। তাহার অসুখ। সেদিন মোহন বাজার হইতে খাবার কিনিয়া খাইয়া কাটাইল। এবং তাহার পর আরো দুই তিন দিন ঐ ভাবে গেল।

সেদিন কোর্টে যাইবার পূর্ব্বে প্রতিদিনের মত মোহন খাইবার আয়োজন করিতেছে, ঝি আসিয়া বলিল—বাবু উপরকার মাঠাকরুণ বল্লেন, তিনি নিজে আপনার জন্যে রেঁধে দিতে চান।

মোহন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তিনি,—নিজে!

ঝি। আমিও তাই বল্ছিলাম বাবু,—আপনি বামুনের ছেলে হয়ে ওঁর হাতে কি করে খাবেন?

দরজার বাহিরে ঝুম্ ঝুম্ শব্দ হইল। ঝি বলিল—ঐ তিনি এসেছেন।

অপর্ণা ঝিকে ডাকিয়া বলিল—ঝি, তুমি ওঁকে বল যে বাজারের কেনা খাবারের চেয়ে হয় ত একটু ভাল করে আমিই রেঁধে দিতে পারব। অবশ্য আমরা যে ব্রাহ্মণ নই তা হয়ত উনি জানেন—বিশেষ আপত্তি না থাক্লে—

কথাগুলি সমস্তই মোহন শুনিল। লজ্জিত হইয়া বলিল—ঝি, এই নাও আমার ভাঁড়ার ঘরেব চাবি, ওঁকে দাও, আর বল—জাত যাবার ভয়ে আমি খেতে চাইছিনা—এই যদি উনি মনে করেন, তাহলে আমার ওপর বড় অবিচার করা হবে।

অপর্ণা চলিয়া গেল। যাইবার সময় চাবির গোছাটা একবার 'ঝমাস্' করিয়া পিঠের উপর ফেলিল। সেই শব্দ শুনিয়া মোহন বুঝিল—ঐ নারী তাহাকে তাহার মনের আনন্দ জানাইয়া গেল।

তাহার পর পুনরায় যখন তাহার পাচক ব্রাহ্মণ সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল, অপর্ণা ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল—ওকে আর দরকার হবে না, আমিই রাঁধ্ব।

(৯)

গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া গোবিন্দ প্রথমেই খুঁজিতে বাহির হইল তাহার মনের মত সঙ্গী। অমূল্য সঙ্গী-রত্ন অনাদরে পথের দুধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে আদর করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া লইল।

তাহাদের মধ্যে দু একজনের কার্য্য কলাপের বিবরণ শুনিয়া গোবিন্দ বলিল—'সাবাস্!' এদের কাছে কোথায় লাগে লীলা, হরে, কেদার, আর মোনা! এমন সঙ্গী পাওয়া অনেক 'পুণ্যির' কথা। দেখিতে দেখিতে বন্ধুত্ব জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

গোবিন্দ বন্ধুদের বলিল—ভাই তোমরা এখন আমায় পরামর্শ দাও, কি করে ঐ 'কঞ্জুস্'টার কাছ থেকে কিছু টাকা বার করা যায়।

বিপিন বলিল—বৌকে দাও 'লেলিয়ে'; শ্বশুর বেটার 'তবিল' আপনি 'চুপ্সে' আস্‌বে।

গোবিন্দ। আমিও ত তাই মত্‌লব করেছিলাম, কিন্তু——'

সুরেন। কি বাবা, একটি আস্ত 'ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্টির' বিয়ে করেছ নাকি?—তাহলে 'পস্তাবে' দেখ্‌ছি।

হারাণ। পস্তাবে কেন? গোবিন্দ ত আর কচি খোকাটি নয়;—'মুষ্টিযোগ'টা ওর ভাল করেই জানা আছে।

হারাণের প্রশংসায় সন্তুষ্ট হইয়া গোবিন্দ বলিল—তা দাদা, একটু আধটু জানা আছে বৈকি। তবে কথাটা কি জান?—একজাতের ঘোড়া আছে যারা খাটে খুব, কিন্তু যদি মনে করে চল্‌বে না, তাহ'লে তাকে মেরে আধমরা করে ফেল্‌লেও এক পা নড়ে না।—আমার গিন্নীটি হচ্ছেন সেই জাতের।

কার্ত্তিক। তাহ'লে ওকে আর এর মধ্যে এনোনা, সব মাটি করে দেবে। তুমি নিজেই কোন মৎলব খাটিয়ে টাকা 'হাতাবার' চেষ্টা দেখ।—কিন্তু দাদা, তখন কি আর এই গরীবদের মনে থাক্‌বে?

গোবিন্দ। বিলক্ষণ; যদি পাই, তাহ'লে রাত্তিরের কালো রং গোলাপী করে ছেড়ে দেবো।—শাস্ত্রে আছে শুভস্য শীঘ্রং। আমি বলি কি আজই সন্ধ্যার পর যদি কথাটা পাড়ি—কি হয়?

সকলেই একবাক্যে তাহার কথার সমর্থন করিল।—মঙ্গলে ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা

যা—খনা বলে গেছেন। আজ বুধবার, সুতরাং এমন সুদিনটা একেবারেই বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু খুব সাবধান—মন্মথ মিত্তির নামজাদা 'ধড়িবাজ',—এটর্নি চরিয়ে খায় সে!

গোবিন্দ বন্ধুগণকে আশ্বাস দিয়া বলিল—'ঘুঘু' দেখেছেন কিন্তু 'ফাঁদ' ত দেখেন নি। গোবিন্দ যে কি 'চিজ্' দিয়ে তৈরী তা তাঁর মেয়ে হয় ত কিছু জান্‌তে পেরেছে।

সকলে গোবিন্দর কথায় হাসিয়া উঠিল! বাস্তবিক এমন সুরসিক মানুষ তাহারা অতি অল্পই দেখিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল; এবং প্রথমে তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে ভূত' ভাবিয়া যে অন্যায় করিয়াছে তাহার জন্য অনুতপ্তচিত্তে সকলে ক্ষমা চাহিল। গোবিন্দকে পাইয়া তাহারা যে মৃতদেহে প্রাণ পাইয়াছে তাহা সকলেই বলিল এবং গোবিন্দ এখানেও তাহার একাধিপত্যটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে দেখিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল। সে বার বার দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল—কেদার আর মোনাটা যদি আমার সঙ্গে আস্‌ত তাহ'লে তারা 'মানুষ' হয়ে যেত।

হারাণ! বরাত;—নইলে আর তোমার কথা শোনে না!—এই ধরনা তুমি। তোমার 'কদর' কে বুঝ্‌ত? এখানে এসেছিলে বলেই ত তোমায় আমরা চিন্‌লাম?—কিন্তু আর দেরি করা নয় হে, ওঠ; সন্ধ্যা হয়ে গেছে,—আবার তোমায় অনেকটা যেতে হবে—বেশ মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে কথা কইবে। চাই কি চোখ দুটোকে একটু রাঙ্গা কর্‌তেও পার। জলের ফোঁটাগুলো একটু চট্ পট্ কাজ করে, বুঝেছ?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—ওসবের কিছুই শেখাতে হবে না ভাই, তোমাদের আশীর্ব্বাদে—আচ্ছা আবার দেখা হবে।

আগামী বারে সমাপ্য

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

বর্ষা

বিশ্ব-প্লাবী উথল জলে ভরে' যাবে প্রাণ!

ভাদ্রমাসের গাঙ্গে ছুটুক ষাঁড়াষাঁড়ীর বাণ

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

১৯০৭ সালের মাঝামাঝি রাজদ্রোহ মামলার বেশ একটা ধূম পড়িয়া গেল। 'যুগান্তরে'র মামলা যখন চলিতেছিল তখন যুগান্তরের কতকগুলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ 'বন্দেমাতরম্' কাগজে বাহির হওয়ায় 'বন্দেমাতরমের' উপরও রাজদ্রোহের অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। পুলিসের তরফ হইতে সাক্ষী সাবুদ অনেক ডাকা হইল, কিন্তু অরবিন্দ বাবু যে বন্দেমাতরমের সম্পাদক এ কথা আদালতে প্রমাণিত হইল না; কাজেই তিনি মুক্তি পাইলেন। সুবোধ বাবু, শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন যে যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ যেমন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করিয়া জেলে গিয়াছিলেন অরবিন্দ বাবুও বোধ হয় তাহাই করিবেন। কিন্তু অরবিন্দের সেরূপ বীরত্ব দেখাইবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। ভারতবর্ষে রাজনীতির চর্চ্চা যে শিশুশিক্ষার নীতিকথার উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, এ কথা তিনি মোটেই বিশ্বাস করিতেন না। 'শঠে শাঠ্যং' নীতিটা যে ধর্ম্মসঙ্গত নয় একথা তাঁহাকে কখনও বলিতে শুনি নাই।

এতদিন তিনি সুবোধ বাবুর বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন। ১৯০৭ সালের শেষাশেষি আলাদা বাসা করিয়া সংসার পাতিবার জন্য আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে তাঁহার উপর তাড়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সংসারধর্ম্ম-পালন করাটা বোধ হয় কোনদিনই তাঁহার ধাতের সহিত ঠিক খাপ খায় নাই। একটা বাড়ী ভাড়া করা হইল বটে, কিন্তু তিনি কংগ্রেস উপলক্ষে গুজরাতে চলিয়া গেলেন। কংগ্রেস শেষ হইয়া গেল; সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল; তিনি বরোদা, অমরাবতী, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার বিছানাপত্র আর বড় সাধের বইগুলি বাসায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ নাই।

শেষে দুই তিন মাস পরে যখন তিনি বিষ্ণু ভাস্কর লেলের নিকট হইতে ধর্ম্মদীক্ষা লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন তখন তাঁহার মধ্যে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিতে লাগিল। ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ লেলের শিক্ষার গোড়ার কথা। লেলের বিশ্বাস ভগবানের নিকট হইতে প্রত্যাদিষ্ট না হইলে দেশের কাজে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা অনেকেই লেলের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলাম; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিবার চেষ্টা অরবিন্দ বাবু ভিন্ন আর কাহারও ভিতর দেখি নাই। আমাদের মনে 'লক্ষ্যবিহীন লক্ষ বাসনা' ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল; সেগুলিকে গুটাইয়া লইয়া ভগবানের প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায় ঊর্দ্ধমুখ হইয়া

বসিয়া থাকা আমাদের পোষাইত না। জ্ঞানকাণ্ডের চেয়ে কর্ম্মকাণ্ডের দিকেই আমাদের ঝোঁক ছিল বেশী। কিন্তু সমস্ত কর্ম্মজাল হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা অরবিন্দের ছিল। বাস্তবিকই লেলের নিকট হইতে দীক্ষা লইবার পর তাঁহার কর্ম্মের আসক্তি যেন দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে ব্যাপার এমনি দাঁড়াইল যে কোন কাজের একটা মীমাংসা তাঁহার

নিকট জানিতে চাহিলে তিনি হাঁ, না কোন উত্তরই দিতেন না; বলিতেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে; 'তিনি নিজে কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

লেলে-প্রদর্শিত সাধনপন্থার উপর এতটা আস্থাবান হওয়ার অনেক কারণও ঘটিয়াছিল। সুরাট কংগ্রেস হইতে ফিরিবার সময় এমন কতকগুলা অসাধারণ ঘটনা ঘটে যাহাতে যোগশক্তির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা খুব বাড়িয়া যায়। একদিন একটা সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি আহুত হন। লেলে তাঁহাকে বলেন—"বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে তুমি নিজে কোনরূপ চিন্তা করিও না। বক্তৃতা

দিবার জন্য তোমার ডাক পড়িলে তুমি ভগবৎ উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও। ভগবান তোমার মুখ দিয়া যাহা বলাইতে চাহেন তাহা নিজেই বলিয়া যাইবেন।" অরবিন্দ বাবুও একান্ত বিনীত শিষ্যের মত তাহাই করিলেন। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর তাঁহার মনে হইল যেন ভিতর হইতে একটা শব্দ উঠিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। তিনি যন্ত্রবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে লাগিল। আর একদিন তাঁহার আর একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়। রেলগাড়ীতে আসিতে আসিতে তিনি দেখিলেন যেন লোকজন, গাড়ী, ষ্টেসন, গাছপালা সমস্তই একটা চৈতন্যময় সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া রহিয়াছে।

এই সকল অনুভূতির ফলে তাঁহার যোগমার্গের উপর শ্রদ্ধা খুব বাড়িয়া যায়, এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পরও তাঁহার মন এই সাধন-ভজনের উপরই পড়িয়া থাকে। অন্যান্য কাজকর্ম্মও তাঁহাকে করিতে হইত বটে; কিন্তু সে গুলির উপর আর আগেকার মত তাঁর অনুরাগ রহিল না।

এই অবস্থায় মানিকতলার বোমার ব্যাপারে সংযুক্ত ভাবিয়া পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া হাজতে পুরিল। জেলে আনিবার পর প্রথমে তাঁহাকে একটা পৃথক কুঠরীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। মাসখানেক পরে সকলকে একত্র রাখা হয়। কিন্তু সকলের সহিত একত্র থাকিবার সময়ও অরবিন্দ বাবু একটী কোণ বাছিয়া লইয়াছিলেন। সেই-খানে তাঁহার শিয়রে খানকয়েক শাস্ত্রগ্রন্থ থাকিত। সকাল হইতে প্রায় বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া নিজের সাধন-ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। জেলের কর্ত্তারা মাঝে মাঝে আসিয়া ঘুরিয়া যাইতেন; কিন্তু অরবিন্দের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি একমনে নাক টিপিয়া প্রাণায়াম লাগাইয়াছেন। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতেন। অপরাহ্নে প্রায় পায়চালি করিতে করিতে উপনিষদ পাঠ করিতেন। সমস্ত দিন তাঁহার সহিত আলাপ করিবার বড় একটা অবসর মিলিত না।

কিন্তু সন্ধ্যার পর তিনি আর আমাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। আমরা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নানারূপ গল্পগুজব আরম্ভ করিয়া দিতাম। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে অনেকখানি সরস মাধুর্য্য লুকান ছিল। সন্ধ্যার পর আমরা সেইটুকুর পরিচয় পাইতাম। ছেলেদের সঙ্গে তিনি ঠিক ছেলেদের মত হইয়াই মিশিতে পারিতেন। রসিকতার স্রোতে তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও নেতৃত্ব ভাসিয়া যাইত।

কিন্তু এ আনন্দ বড় বেশী দিন আমাদের অদৃষ্টে সহিল না। নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যাকাণ্ডের পর আমরা সকলেই আবার পুনর্মূষিক হইয়া পৃথক পৃথক কুঠরীতে আবদ্ধ হইলাম। এই হত্যাকাণ্ডের সহিত অরবিন্দ বাবুর কোনও সংস্রব ছিল কিনা তাহা লইয়া এখনও পর্য্যন্ত অনেকে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। ইহার সহিত তাঁহার সহানুভূতিও ছিল না; যাঁহাদের চেষ্টায় ইহা সংঘটিত হয় তাঁহাদের উপর

তিনি খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই এ সময় আমাদের মধ্যে বেশ একটু দলাদলির ভাব দেখা দিয়াছিল। একদল ছিলেন অরবিন্দ বাবুর একান্ত অনুরাগী ভক্ত; আর একদল তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইলেও তাঁহাকে 'কাজের লোক' (Practical) বলিয়া মনে করিতেন না। ইঁহাদের ধারণা ছিল যে অরবিন্দ বাবু একটু 'কাণ-পাতলা'; অন্তরঙ্গ ভক্তদের কথাই তিনি ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লন; তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াই সব বিষয়ের বিচার করেন; নিজের চোখে কিছু দেখেন না। এই সমস্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অরবিন্দবাবুকে এ ব্যাপারের কোন কথাই জানিতে দেন নাই।

যাই হোক্, এ ব্যাপারের ফলে কুঠরীবদ্ধ হইয়া আমাদের বহুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। মোকদ্দমার জন্য আদালতে না যাইলে আর কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত না।

আদালতে গিয়া দেখিতাম অরবিন্দ বাবু একটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা নাই। সর্ব্বদাই আপনার ভাবে বিভোর; কোন কথা জানিতে চাহিলে হাঁ হুঁ দিয়াই আবার চুপ করিতেন। জেলের কুঠরীর মধ্যে তাঁহার আচরণ প্রহরীদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত। তিনি নাকি স্নান করিতেন না, দাঁত মাজিতেন না, কাপড় ছাড়িতেন না, রাত্রে বড় একটা ঘুমাইতেন না; আবার কখন কখন ১০।১২ ঘণ্টা ধরিয়া আহারও করিতেন না। প্রহরীরা ভাবিত তিনি বোধ হয় পাগল হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ভিতর কি কি পরিবর্ত্তন হইতেছে আমরা সে সংবাদ কেহই বড় একটা রাখিতাম না। তবুও এটুকু বেশ বুঝিতে পারিতাম যে দিন দিন তাঁহার চেহারার পরিবর্ত্তন হইতেছে। শুষ্ক, ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট শরীরের মধ্যে যেন অপূর্ব্ব, শান্ত, দিব্যশ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে। চোখে মুখে কোথাও চাঞ্চল্য বা উদ্বেগের লেশ মাত্র নাই। দেখিলে মনে হইত যেন তিনি নিজের ভিতর এমন একটা আশ্রয় পাইয়াছেন যেখানে আর বাহিরের গণ্ডগোল পৌঁছিতে পারিতেছে না।

(৬)

মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি যে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে একটা নূতন দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহা তখন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে এইটুকু তখনও বুঝিয়াছিলাম যে তাঁহার অনুভূতি নব্য-বেদান্তের মায়াবাদকে সমর্থন করে না। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে মায়াবাদ যে একটা প্রকাণ্ড দাঁড়ী টানিয়া দিয়াছে সে দাঁড়াটার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতিই মানুষের চরম অনুভূতি নয়। এমন অবস্থাও আছে যেখানে নির্গুণ ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ই পূর্ণতর সত্যের মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে।

এগুলি যদি তাঁহার পুঁথি-পড়া কথা হইত তাহা হইলে বোধ হয় শুষ্ক কচ্‌কচি বলিয়াই আমাদের কাছে ঠেকিত। কিন্তু আমরা জানিতাম যে তিনি নিজে দার্শনিক পণ্ডিত নন। ইউরোপীয় বা ভারতীয় দর্শন তিনি কখনও বিশেষভাবে চর্চ্চা করেন নাই। এগুলি তাঁহার সাধন-লব্ধ সত্য বলিয়াই আমাদের কাছে এত জীবন্ত বলিয়া মনে হইত।

আমাদের দেশে সাধারণের একটা ধারণা আছে যে ধর্ম্মজগতে আর নূতন সত্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা ঋষিরা বহু পূর্ব্বেই শেষ করিয়া গিয়াছেন; আমাদের কাজ শুধু সেইগুলি মুখস্থ করা ও তাহা লইয়া বড়াই করা। কিন্তু বৈদিকযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যত কিছু দার্শনিক মতবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলি মূলতঃ সাধকদিগের অনুভূত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ পর্য্যালোচনা করিলে সেগুলির মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মতবাদে ও শাঙ্কর দর্শনে সত্যের সহিত জীবনের যে বিরোধ কল্পিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্রে তাহা নিরসনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী বৈষ্ণব ও শাক্তের অনুভূতি বৈদান্তিকের অনুভূতি অপেক্ষা পূর্ণতর ও গভীরতর বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে অরবিন্দ খাঁটি বাঙ্গালী। তিনি আপনার অনুভূতিলব্ধ সত্য অবলম্বন করিয়া যে দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে ব্যবহার ও পরমার্থের পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

অরবিন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ এই মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সেগুলি বুঝিতে গেলে আগে এই গোড়ার কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধ ও শাঙ্কর মতবাদ যেমন এক সময়ে জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমাদের মনে হয় ভবিষ্যতে অরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত সত্যও সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে। কারণ আমাদের জাতীয় জীবনধারার পূর্ণ পরিণতির বীজ ইহার মধ্যে নিহিত।

দুঃখের বিষয় জাতীয় জীবনে অরবিন্দের যাহা বিশেষ দান তাহার সন্ধান বড় কেহ রাখেন না। একদল রাজনৈতিক নেতৃত্বের আশায় তাঁহার পানে চাহিয়া আছে; আর একদল তাঁহাকে অবতার বানাইতে ব্যস্ত। খাঁটি অরবিন্দের পরিচয় বাঙ্গালী আজও লইল না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘর

নওগো দূরের পথের যাত্রী;——কিসের তরে ডর?
নাইক ডাগর সাগর-পাড়ী,——কাছের গোড়ায় তোদের বাড়ী;
তেপান্তরের পারেতে নয়,——বুকের ডাঙ্গার'পর।

অপরাজিতা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বর্ষার মেঘ

আমি সমস্ত অপরাহ্নটা অপরাজিতার সঙ্গে তাহার শিশুপাঠ্য পুস্তকের খস্‌ড়ার আলোচনা করিলাম; যত আলোচনা করিতে লাগিলাম, ততই তাহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। যে ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতিবার জন্য শিক্ষিত হয়, সে যেমন দ্রুতপদ অতিক্রম করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়—যেন বাতাসের উপর দিয়া চলিয়া যায়—আমরাও তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই সর্ববিদ্যার সারসংগ্রহ কণ্ঠস্থ করি, শিক্ষার সোপান পরীক্ষা করিয়া দেখি না। তাই যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া বাহির হই, তখন অধীত বিদ্যার ভিত্তিটাও ভুলিয়া যাই; এম, এ, পাশ করা বাপকে ছেলে যদি কোন মূল সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে পিতা বিপদ গণেন। অপরাজিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ভাবনা ভাবে নাই—যেটুকু পড়িয়াছে, সেটুকু পরিপাক করিতে পারিয়াছে। তাই আমি যাহা অসম্ভব মনে করিতেছিলাম—সে তাহা একান্তই সহজ মনে করিয়াছে।

আমি আলোচনা করিতে করিতে লোকেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; অধিকন্তু অপরাজিতার সঙ্গে আলোচনায় সকল সঙ্কোচও যেন আপনা আপনি দূর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল এবং আমাদিগকে আলোচনা শেষ করিতে হইল তখন অপরাজিতার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখের বিষণ্ণ ভাবটুকু দূর হয় নাই। পরন্তু আলোচনা শেষ হইলে সে-ই আমাকে সে কথা মনে করিয়া দিল—"তুমি লোকেশ বাবুর কাছে প্রতিশ্রুত আছ—আমার সম্বন্ধে তোমার কি করা কর্ত্তব্য তাহা ভাবিয়া দেখিবে। সমস্ত দিন ত তোমাকে ভাবিবার অবসর দিলাম না। এইবার ভাবিয়া দেখ। আমার অনুরোধ—তুমি আমার উপর দয়া করিয়া আপনি অসুবিধা ভোগ করিও না। আমার জন্য ভাবনা নাই—সুখের হউক, দুঃখের হউক, আমার একটা আশ্রয় মিলিবে।"

সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কিশোরীর এই কথা শুনিয়া আমার চিন্তার কারণ ঘটিল। সে পল্লীগ্রামে যে আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহা দুঃখের হইলেও আশ্রয় বটে; কিন্তু সে জানিত না, এই সহরে যে আশ্রয় মিলিতে পারে তাহা আশ্রয়ই নহে এবং যাহাতে অভয় হইবার

কোন সম্ভাবনাই নাই সে আশ্রয়ের আশায় আমি তাহাকে নিরাশ্রয় করিয়া দিতে পারি নাই। এই যে বিরাট নগর—ইহার আবৃত পয়ঃপ্রণালীর মত ইহার গুপ্ত অন্ধকার সহসা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না—তাই ইহার পথে পথে যে প্রলোভনের ফাঁদ পাতা থাকে, লোক সহসা তাহা দেখিতে পায় না। সে সব কথা মনে করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। যদি তাহাকে আমার গৃহ অপেক্ষাও নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারি, তবেই তাহাকে আমার গৃহ ত্যাগ করিতে দিব—নহিলে নহে। আমার আপনার জন্য আমি ভয় করি না।

সেদিন অপরাহ্ণে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাহির হইয়া পড়িলাম—ট্রামে উঠিয়া একেবারে গঙ্গার কূলে উপনীত হইলাম এবং একটা জেটীতে বসিয়া গঙ্গার তরঙ্গসঙ্গ-শীতল পবন উপভোগ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম। অপরাজিতার সম্বন্ধে কি করা আমার কর্ত্তব্য ? লোকেশ আমাকে বলিয়াছে—আমি আগুন লইয়া খেলা করিতেছি। কিন্তু অপরাজিতার নয়নের স্নিগ্ধ ও সরলতাব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখিয়া মনে হয় না—তাহার মধ্যে অগ্নি আছে; সে যেন বর্ষার মেঘ—স্নিগ্ধ—সজল। কিন্তু সেই মধুর দৃষ্টিতে যেন আবার সাগরের গভীরতা আছে—কিন্তু সে চাঞ্চল্য নাই। যদি আমি কোন মহিলা বিদ্যালয়ে তাহাকে দিতে পারি, তবে তাহার পক্ষে আরও বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে আপনার ভার আপনি লইবার উপায় হইতে পারে। আমি তাহার আর কোন আশ্রয়ের সন্ধান কল্পনা করিতে পারিলাম না। নদীর তরঙ্গমালা যেমন নদীপ্রভাবে বদ্ধ জাহাজগুলির গাত্রে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, আমার কল্পনা তেমনই এই একই উপায়ে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

ভাবিতে ভাবিতে আমি আর কোন দিকে লক্ষ্য করি নাই। কখন যে দিনান্ত-তপনের কনক কিরণে রঞ্জিত আকাশ অন্ধকার করিয়া নিদাঘদিনান্তে মেঘমালা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। সহসা একটা বাতাসের ঝাপটা গাছের শুষ্ক পত্র ও রাজপথের ধূলি উড়াইয়া হু-হু করিয়া বহিয়া গেল। আমি দেখিলাম, নদীর জল দুলিয়া উঠিয়াছে—পরপারে কলকারখানাগুলার উপর বৃষ্টির ধারা যেন সব অস্পষ্ট করিয়া দিতেছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আশ্রয় সন্ধান করিলাম; কিন্তু জেটীর অনাবৃত অংশ অতিক্রম করিয়া গুদামের বারান্দায় আসিতে আসিতেই ভিজিয়া গেলাম। সেখানেও যে অধিক স্থান ছিল এমন নহে। কারণ, জেটীর কুলিমজুররা আমার মত চিন্তাকুলিত হয় নাই; তাহারা ঝড়ের আগমন বুঝিয়াই তথায় আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদেরই সঙ্গে দাঁড়াইয়া বৃষ্টির অবসান অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

গ্রীষ্মের ধারা—আধ ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল—বাতাস ধৌতধূলি—বৃক্ষপত্র ঘনশ্যাম—আকাশ তারকাখচিত। আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য বাহির হইলাম। কিন্তু রাস্তায় জল—যানও নাই। কাজেই আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার

পর একখানি যান লইয়া বাড়ী আসিলাম। কুলদীপ আমার এমন ঘটনায় অভ্যস্ত থাকিলেও কখন তাহা নির্ব্বিকারভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই—সে আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইত। আজও বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম সে সেইভাবে বসিয়া আছে। কিন্তু আজ আর সে একা নহে। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিলাম, সে অপরাজিতাকে বলিতেছে, "আমি আর পারি না, দিদিমণি! কি মানুষ দেখ দেখি—এই কাল বৈশাখীর দিন, এমন সময় কি মানুষ বেড়াইতে যায়? কেন, বেড়াইবার কি আর সময় নাই? দাদাবাবু বিয়ে করিলেই আমি চলিয়া যাই—কিন্তু সে কথা বলিলেই কেবল হাসেন। অথচ মা'র কাছে সত্যবন্দী হইয়া আছি; কাহার হাতে ভার দিয়া আমি চলিয়া যাই বল?"

কুলদীপ আমার জুতা খুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে।" তাহার পর সে আমাকে বলিল, "কলের ঘরে কাপড় জামা সব আছে।"

আমি স্নানের ঘরে যাইয়া কাপড় বদলাইয়া আসিলাম। কুলদীপ সেগুলা কাচিতে গেল। অপরাজিতা আমাকে বলিল, "তুমি এমন করিয়া লোককে ভাবাও কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি বুঝি কুলদীপের কথা শুনিয়া মনে করিয়াছ, আমি কেবলই বিপদের মুখে যাই?"

"বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ? সাবধান হওয়াই ত ভাল।"

"ও কেমন আমার খেয়াল থাকে না। ওটা আমার স্বভাব।"

"স্বভাব বলিলেই কি যাহা ভাল নহে, তাহা ভাল হয়? আচ্ছা, মা থাকিলে তুমি কি এমন করিতে পারিতে?"

এইবার আমাকে হার স্বীকার করিতে হইল। মা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন—তিনি আমার পথ চাহিয়া আছেন বলিয়া বাহিরে বিলম্ব করিতাম না; আকাশে মেঘ দেখিলেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। আমি বলিলাম, "কিন্তু আর ত কেহ আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করে না।"

অপরাজিতা কোন কথা বলিল না; কেবল আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে কাতরতা।

রাত্রিতে শুইতে যাইবার সময় বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, অপরাজিতার ঘর হইতে আলো আসিতেছে। দেখিয়া কৌতূহলবশে সেই দিকে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম, অপরাজিতা ছেলেদের বহি লিখিতেছে। আমি বলিলাম, "এখনও লিখিতেছ?"

অপরাজিতা বলিল, "আর একটু হইলেই শেষ হয়; শেষ করিয়া শুইব।"

পরদিন আহারের পরই "কাজ আছে" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম—যে সব বালিকা বিদ্যালয়ে সংলগ্ন ছাত্রাবাস আছে প্রথমে তাহার সর্ব্বপ্রধানটিতে যাইলাম। অধ্যক্ষ অপরাজিতার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের ধারা শুনিয়া আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, আমার সঙ্গে অপরাজিতার কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ আমি আপনাকে তাহার অভিভাবক বলিতেছি—ইহাতে তিনি বিস্মিত হইতেছেন। আমি সত্য গোপন না করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এখন আমাদের স্কুলে স্থান নাই। আপনি ঠিকানা রাখিয়া যাইলে পরে সংবাদ দিব।" আমি বুঝিলাম, তিনি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান না করিয়া অন্যভাবে করিলেন। তাহার পর আর একটি বিদ্যালয়ে যাইলাম। তথায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সব শুনিয়া স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, "এ বিদ্যালয় ভদ্র ঘরের respectable বালিকাদের জন্য।" শুনিয়া রাগ হইল; বলিলাম, "মেয়েটি ভদ্র ঘরের এবং আপনাদেরই মত respectable না হইলে, আমি এখানে আনিতে চাহিতাম না।"—বলিয়া অভিবাদন পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া আসিলাম। লোকেশের সঙ্গে দেখা করিয়া গৃহে ফিরিয়া শ্রান্তভাবে একখানা আরাম কেদারায় শুইয়া মানুষের কুসংস্কারের কথা ভাবিতে লাগিলাম। খানিকটা পরে কুলদীপ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার আনি?" আমি সম্মতি জানাইলাম।

তাহার পরই খাবার লইয়া অপরাজিতা আসিল; কুলদীপ সঙ্গে আসিয়া ছোট চা'র টেবল্‌খানা কেদারার কাছে আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অপরাজিতা রেকাবিখানা তাহার উপর রাখিল। তাহার পর বলিল, "তুমি—"

বলিয়াই সে চুপ করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলিতেছিলে!"

অপরাজিতা আমার কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "কেন?"

"তোমার মুখ যে অন্ধকার।"

আমি কথাটা উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আমার ও 'শালগ্রামের শোয়া বসা' বুঝা কঠিন।"

"আমি বলিতেছিলাম; লোকেশবাবু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কি করিলে?"

আমি কোন কথা গোপন না করিয়া দুইটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার অভিজ্ঞতার সব কথা অপরাজিতাকে বলিলাম। আমার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে তাহার মুখ বর্ষার আকাশেরই মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার নয়নের কাতর দৃষ্টি অস্পষ্ট করিয়া তখনও অশ্রু ঝরিল না। পরন্তু সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "তবে এখন তুমি কি করিবে?"

আমি বলিলাম, "তুমি এখানেই থাকিবে।"

"না। যাহাকে আশ্রয় দিতে সকলেই ভয় পায়, তাহাকে আশ্রয় দিয়া তুমি কেন বিপদ ডাকিয়া আনিবে?"

"বিপদ কিসে ?"

" সে কথা ত লোকেশবাবু তোমাকে বলিয়াছেন।

"ভয় মানুষের আপনার মনে। আমি ভয় করি না। সমাজের যে সব কুসংস্কার সমাজের লোককে মাথায় করিয়া লইতে হয়, আমার পক্ষে সে সব তেমন করিয়া লইবারও ত কোন কারণ নাই।"

"কিন্তু তোমার বন্ধু বান্ধবও যাহা করিতে বারণ করেন, তুমি তাহা করিবে কেন ? আমি আমার জন্য তোমাকে তাহা করিতে দিব কেন ?"

"তুমিই ত বলিয়াছ, লোকেশের মত বন্ধু আমার আর নাই। আমি লোকেশকে সব কথা বলিয়া আসিয়াছি।"

"তিনি কি বলিলেন ?"

"আমার মতেরই সমর্থন করিলেন—তুমি এখানেই থাকিবে।"

এইবার বর্ষার মেঘে বারি-বর্ষণ হইল। অপরাজিতা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। —তাহার দুই গণ্ড বহিয়া বর্ষার ধারার মত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে চেষ্টা করিয়াও তাহা গোপন করিতে পারিল না—উঠিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সে যখন ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই খাবার খাও নাই!" তখন মুখ তুলিয়া দেখিলাম, তাহার মুখে স্নিগ্ধ শান্তির বিকাশ। বর্ষণের পর বর্ষার আকাশ যেমন আলোকিত হয়, তাহার মুখ তেমনই। লোকেশের কথা শুনিয়া অবধি সে যে দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়াছিল, অশ্রুপাতে যেন তাহা দূর হইয়া গিয়াছে।

আমি খাবারগুলার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম—জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছেলেদের বই কতদূর ?"

অপরাজিতা বলিল, "যেখানা কাল দেখিয়াছিলে সেখানা শেষ হইয়াছে।"

অপরাজিতা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমাকে দেখাইল। দেখিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। লোকেশের কথা শুনিয়া অবধি সে কিরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম। সেইরূপ দুশ্চিন্তার মধ্যেও সে এমন পুস্তক রচনা করিয়াছে! আর আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপমারা ছাত্র—আমি "অনেক চিন্তার পর" কি ভাবে পুস্তক লিখিতে হইবে, তাহাই স্থির করিতে পারি নাই!

ইহার পর সঙ্ঘের অধিবেশনে যখন সে রচনা পেশ করিলাম, তখন সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "চমৎকার!"

লোকেশ বলিল, "চমৎকার! কিন্তু খাবার আরও চমৎকার!

তখন একজন প্রস্তাব করিলেন, যিনি খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হইবে। আর একজন বলিলেন, "তিনি স্বয়ং আসিয়া ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

আমি বলিলাম, "তাঁহাকে আমাদের সঙ্ঘের সদস্য করিয়া লওয়া হউক।"

সকলে সম্মতি দিলেন। লোকেশ বলিল, কিন্তু মনে রাখিও, বুদ্ধ যে দিন নারীকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দিনই তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁহার ধর্ম্মে বিনাশের বীজ উপ্ত হইল।"

আমি অপরাজিতাকে ডাকিয়া আনিলাম এবং সে যেরূপ সপ্রতিভভাবে আসিয়া বসিল, তাহাতে আমিও মনে মনে তাহার প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইবে, তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

সেইদিন একজন সদস্য আর একজনকে আনিয়া নূতন সদস্য করিয়া লইয়াছিলেন, অপরাজিতা আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে সব বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছিল; কিন্তু অপরাজিতা আসিবার পর হইতেই তাহাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আমাদের ইউরোপ প্রবাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিদেশে এসে বাইরের জগতকে একটু নিকট থেকে দেখ্‌বার সুযোগ সর্ব্বত্রই খুব কম লোকে পেয়ে থাকে। অথচ জগতের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অদ্যাবধি যতটুকু পরিচয় লাভ করেছে তা অনেক ক্ষেত্রেই এই কতিপয় দেশভ্রমণকারীদের উৎসাহে ও প্রচারে। তাই যাঁরা বিদেশে গিয়ে দেশের অর্থ ও ব্যক্তিগত শক্তি ব্যয় করেন তাঁদের সহায়তায় দেশ যদি বিদেশের সম্বন্ধে একটু সত্যিকার অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ করার আশা রাখে তবে সে আশার মধ্যে অসঙ্গত আবদার বোধহয় বেশী নেই। সুতরাং আমাদের দেশের সুধীবৃন্দের সচরাচর বিদেশযাত্রাকে মাত্র চাকরীর টোপস্বরূপে গণ্য করা ও তরুণদের মনে সেই ধারণা শৈশব হ'তে ঢুকিয়ে দেওয়াটা যে অশেষ নষ্টের মূল এ সিদ্ধান্ত বোধহয় করা যেতে পারে। কারণ ছেলেবেলা থেকে বিদেশ-যাত্রাকে মাত্র চাকরীর টোপস্বরূপে গণ্য কর্ত্তে শেখার দরুণ আমরা বিদেশে গিয়ে প্রাণপণে যতগুলি পারা যায় পরীক্ষা ভাল রকম করে পাশ করে কোনওমতে একটা চাকরীর যোগাড় কর্ত্তে পার্লেই গুম্ফদেশে চাড়া দিতে থাকি; এবং দেশে যখন ফিরি তখন শুধু বিদেশী থিয়েটার, বা

বায়স্কোপ ও বড়জোর ল্যাণ্ডলেডী পরিবারের ছাড়া অন্য কোনও খবর দিতে না পার্লেও সেটা "Comme-il-faut" ভাবেই ধরে নেই (অর্থাৎ কিনা এছাড়া আর কি হতে পার্ত্ত?) কিন্তু এইরূপ ওপর-ওপর ভাবে বিদেশ দেখে যাঁরা ফিরেন তাঁরা হয় দেশেও বিদেশের অসার বাহ্যাড়ম্বরের হেয় অনুকরণে মগ্ন থাকেন, না হয় পুনর্মূষিক হয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্মই সত্য, অন্য সব ধর্ম্ম অসার ইত্যাকার সুলভ আত্মপূজায় ধ্যানস্তিমিতলোচন হয়ে বসেন। কারণ, তাঁদের ক্ষেত্রে বিদেশের পরিচয়টা নিতান্ত অগভীর বলে তাঁরা হয় বিদেশের সম্বন্ধে একরাজ্য ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে দেশে ফেরেন যা তাঁদের বিদেশী সভ্যতাকে sweeping ভাবে সমালোচনা কর্ত্তে শেখায়;—না হয় তাঁরা বিদেশের বহিশ্চাকচিক্যের ধাঁধায় তাকেই বিদেশী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে ভুল করে বসেন। বলা বাহুল্য এ দুই প্রকার attitudeই ভ্রান্ত এবং এ দিগ্‌ভ্রমের মূলগত কারণ বিদেশীর সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাব।

কিন্তু নানান্ বিদেশীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্টভাবে মিশ্‌বার সুযোগ পেয়েও যাঁরা তা হেলায় হারান এজন্য তাঁদের ক্ষতিটা যে কতখানি হয়ে থাকে তা যাঁরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁদের লাভের সঙ্গে তুলনায় অত্যন্ত সু-স্পষ্ট হয়ে উঠে। এজন্য আমি একটি ইংরাজ ভদ্রলোকের দৃষ্টান্ত একটু বেশী করেই উল্লেখ কর্ত্তে চাই। কারণ দ্বীপাবদ্ধ, একদেশদর্শী ইংরাজের ক্ষেত্রে * বিভিন্ন বিদেশীর সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইনি যা প্রত্যক্ষ লাভ করেছিলেন সেটা তাঁর স্বযূথচারী দেশবাসীদের অনুকারিতার পাশে আমার চোখে বেশী করেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি এই উদার, নানাভাষাবিদ্ ও চিন্তাশীল ভদ্রলোকের সঙ্গে শুধু যে তাঁর পরিবারে থেকে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম তাই নয়, এঁর প্রতি আমার যাকে বলে একটা instinctive liking জন্মেছিল যার প্রজনন ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কমেই আস্‌তে থাকে দেখা যায়। কাজেকাজেই এঁর কাছ থেকে আমি যথেষ্ট শিখেছিলাম। স্বাধীনচিন্তার আদানপ্রদানে মানুষের লাভ ও পরস্পরের প্রতি প্রভাব যে প্রীতির বন্ধনের যোগাযোগে শতগুণ গভীরতর হয়ে উঠে এটা নিতান্ত জানা কথা।

এই ইংরাজ ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদেশী ছাত্রকে তাঁর পরিবারে নিমন্ত্রণ কর্ত্তেন। অর্থাভাবে নয়—কারণ ইনি নিজে একটি ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও এঁর অবস্থা খুব সচ্ছল। সমুদ্রতীরে একটি সুন্দর বাড়ী কিনে সেখানে সপরিবারে বাস করেন। ইনি বিদেশী অতিথির জন্য গৃহদ্বার খুলে রাখতেন শুধু তাদের পরিচয় লাভ কর্ত্তে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁদের জীবিকানির্ব্বাহ কর্ত্তে হয় তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষ বলেই এতটা interest

* এ বিশেষণ শুধু আমার ও আমার কতিপয় বন্ধুর অভিজ্ঞতার ফল নয়। Keynes তাঁর সুবিখ্যাত Economic Consequences of Peace পুস্তকে ইংরাজের একদেশদর্শিতার কারণ তাদের দ্বীপাবদ্ধতা বলে উল্লেখ করেছেন।

নেওয়ার প্রবৃত্তি উদ্বৃত্ত থাকে না। কাজে কাজেই যে দুচারজনের ক্ষেত্রে এর দর্শন মেলে সে কতিপয় জনের হৃদয়ের তারুণ্যের একটু বেশী পরিচয়ই কর্ত্তে হয়। এঁর বিদেশী বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশী। রুষ, আইরিশ, পোলিশ, ফরাসী, জার্ম্মাণ এমন কি লিথুয়ানিয়ান পর্য্যন্ত। ইনি আমাকে একদিন বলেছিলেন যে বিদেশীকে তাঁর পরিবারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্থান দেওয়ার এঁর আরও একটা উদ্দেশ্য এই যে ইনি নিজের ছেলেমেয়েদের অল্পবয়স থেকেই জাতিগত কুসংস্কার ও অন্ধ সঙ্কীর্ণতার হাত থেকে মুক্তি দিতে চান। আমি একবার আমার এক উচ্চহৃদয় বন্ধুকে এঁর পরিবারে পরিচয় করে দেই। এঁরা তাঁকে তাঁদের ওখানে সপ্তাহকাল থাকতে নিমন্ত্রণ করেন। দুইজনেই পরস্পরের ব্যক্তিত্বে খুব impressed হন। আমি তারপরে একদিন এঁকে বলেছিলাম "I had a twofold object in introducing my friend to your family. I wanted first of all to shew you that good-breeding, refinement and so forth are not your monopoly and secondly that we dark Indians too have got some fine people among us." (ঠিক এইকথাগুলিই যে বলেছিলাম তা নয় তবে যা বলেছিলাম তার ভাবার্থটি এইরূপ)। তিনি এককথায় বেশ সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন মনে আছে। "You need hardly have taken so much pains to prove that home to me for I have always taken that for granted." এঁর মন যে কতটা উদার তা সেদিন তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে আরও প্রমাণ হয়। তাতে শেষে লিখেছিলেন I have been thinking of including German students in my plans but the exchange rates make that impossible." ইংলণ্ডে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ বিদ্বেষের মাঝখানে থেকে জার্ম্মাণছাত্রকে নিজপরিবারে স্থান দেওয়ার কল্পনা করাটাও যে কতটা উদারতার পরিচায়ক তা আমাদের দেশে অনেকে হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না। ইনি শুধু যে উপর উপর উদার তাই নয় গভীরভাবে চিন্তাও করেন। ইনি নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন। এঁর ধারণা—বিকাশের বিকাশ ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। মানুষের দুঃখকষ্টকে অলীক বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে একরোখাভাবে optimist থাকার মত সঙ্কীর্ণমনা ইনি নন্; কারণ ইনি বোঝেন যে দুঃখ সুখের চেয়ে কম সত্য নয় বরং বেশী। তবে সংসারে যে ভালও মন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান এটা আনন্দের কথা বলে স্বীকার করেন। এঁর ব্যক্তিত্বের আরও অনেক ছোটবড় আকর্ষণী দিক্ আছে কিন্তু তার একটা মস্ত দিক্ এই যে সার্ব্বভৌম মানুষের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব এঁর মনে গ্রথিত হয়ে গেছে। নানাজাতির লোকের সঙ্গে মিশে এ উপলব্ধিটা যে ভাবে সহজলভ্য হয় বই পড়ে তেমন হয় না বলেই মনে হয়। এঁকে আমার আরও ভাল লেগেছিল এই জন্য যে jingoism (অর্থাৎ আমরাই ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র এইরূপ দৃঢ় ধারণা) যে ইংরাজজাতির একটা মস্ত দোষ একথা এঁকে আমি প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিলেও ইনি

তাতে আহত বোধ কর্ত্তেন না। গর্ব্বিত জাতির অংশে জন্মেও বিদেশীর কাছে স্বদোষ স্বীকার কর্ত্তে কুণ্ঠা বোধ না করা যে একটি অত্যন্ত বিরল জাতীয় গুণ তা ইংরাজ জাতির সঙ্গে বছর দুই মিশে বেশী করেই আমার চোখে পড়েছে। তবে বিদেশীকে একটু কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলে তাদের অনেক গুণ যখন প্রত্যহ আমাদের চোখে নিতান্তই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তখন, এবং কেবল তখনই, নিজেদের মধ্যে বিরল কোনও গুণ বিদেশীর মধ্যে দেখলে তাতে ঈর্ষান্বিত না হয়ে তার দরুণ বিশ্বমানবের লাভের কথা ভেবে আনন্দ বোধ কর্ত্তে পারা সম্ভব। অথচ একথা জোর করে বলা যায় না যে এটা অন্যথা একেবারেই অসম্ভব। আমি বল্‌তে চাই শুধু এই কথা যে সার্ব্বভৌম মানুষকে শ্রদ্ধা কর্ত্তে শেখার পক্ষে আমরা চোখের পরিচয়ের মূল্যকে সচরাচর একটু ছোট করে দেখি। য়ুরোপে এই ইংরাজ ভদ্রলোকের কাছে আমি এই উদার ভাবটি সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করি ও তাতে আন্তরিক প্রীত হই। পরে আমাদের মধ্যে এমন একটা প্রীতির ভাব জন্মেছিল—যেটা আমার ইংলণ্ড জীবনের সুন্দর স্মৃতিগুলির অন্যতম বলে গণ্য হবে—যে ইনি আমাকে ছুটিতে মাঝে মাঝেই তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কর্ত্তেন এবং দুচারদিন ধরে রাখতেন, খবরের কাগজের নানান্ রকম লেখা—যা আমার চিত্তাকর্ষক হতে পারে—কেটে পাঠাতেন ও নানা রকম ছোট খাট স্মৃতিচিহ্ন পাঠাতেন। এ থেকে আমি সিদ্ধান্ত কচ্ছি যে ইনি এঁর অন্যান্য বিদেশী বন্ধুর প্রতিও তাঁর lively interest এর এবম্বিধ বাহ্য অভিব্যক্তি নিয়মিতভাবেই প্রকাশ কর্ত্তেন। এঁদের পরিবারে আমার বেশ সুখেই সময় কাটত। এঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেড়ান ও দৌড়াদৌড়ি করা, বড়দিনের সময় নানারকম খেলা নানাবিধ ছোটখাট উপহার পাওয়া ইত্যাদি ক্ষুদ্র অথচ সরল আমোদে রসের উপাদান বড় কম থাকত না।

ইনি একদিন আমাকে একটা ভারি বিস্ময়কর কথা বলে মনে আঘাত দিয়েছিলেন মনে আছে। আমি তখন দেশথেকে সবে এসেছি। পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার প্রযত্নে সব সময়ে সফলতা লাভ না কল্লেও সে জন্য আত্মগ্লানি বোধ করবার আর অবধি ছিল না। এবং যে সময়ে আমি অপাঠ্য পুস্তক (অর্থাৎ যা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দেশ করেন নি এরূপ পুস্তক) পড়ছি, তর্ক কচ্ছি, বা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি সে সময়ে সহপাঠীরা বেশী পড়ে ফেলছে এই আতঙ্কের প্রস্তরভার নিদ্রায়ও আমায় সরল শ্বাসপ্রশ্বাসের অন্তরায় হতে ছাড়ত না—ইত্যাদি ইত্যাদি, (অর্থাৎ পড়াশুনার বিরামে "ভাল ছেলের" যা যা মনে হওয়া শাস্ত্রসম্মত তা যথাযথভাবেই আমার বিবেককে দংশন কর্ত্ত) ; এ হেন মনের অবস্থায়—যখন কেম্ব্রিজের tripos রূপ জীবনের মহা পরীক্ষায় ভাল করে পাশ করার কল্পনা আমার মনোজগতে পুলকশিহরণ জাগিয়ে দিত তখন—তিনি একদিন নিতান্ত অকবির মতনই পরীক্ষায় পাশের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-দানের ক্ষমতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসসূচক ভ্রূকুঞ্চন করেছিলেন। তখন আমি মনে করেছিলাম যে এ উদ্বাহুবামন ভদ্রলোকটার কাছে হয়ত দ্রাক্ষাফল প্রাংশুলভ্য বলেই কটু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরে যখন নিকট পরিচয়ে জান্‌লাম যে ইনি বিদ্বান

ও নানাভাষাবিদ্ এবং সাহিত্য-চর্চ্চা এঁর কাছে একটা সখ মাত্র নয় একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ তখন এঁর পরীক্ষা-নাস্তিকতা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল মনে আছে।

তারপরে একটু বেড়াবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ও নানান্ রকম লোকের সঙ্গে সাধ্যমত মেশার পর এই সত্যটির পরিচয় পাই যে বিদেশীকে যেমন উপর উপর দেখায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশী, তেমনি একটু পড়ার ক্ষতি করেও নিকট থেকে দেখায় লোকসানের চেয়ে লাভ বেশী। অবশ্য এখানে আমি আমাদের দেশের গুরুজন সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ শিরঃসঞ্চালনের কথা ভেবে শিহরিত হচ্ছি—পুলকে নয়, ভয়ে, তা বলাই বাহুল্য!—কিন্তু যেহেতু আজকালকার ছেলেরা চিরকালই সেকালকার তত্ত্বদ্রষ্টাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র সেহেতু আশা করা যায় যে এসব উক্তিকে শেষোক্ত সম্প্রদায় যৌবনের হঠকারিতারই অভিব্যক্তি ভেবে কৃপার চক্ষে দেখবেন।

এখানে কেবল একটি "কিন্তু"-র বিশেষ করে অবতারণা করার প্রয়োজন বোধ কর্চ্ছি, কারণ নৈলে হয়ত অনেকে আমাকে ভুল বুঝ্বেন। আমাদের মধ্যে যে সব ছাত্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভাল ফললাভ করাটা এই পাশ করায় তুক্‌তাক্ জানার ফল নয়, সত্য সত্যই অধীত বিষয়ে পারদর্শিতার ফল তাঁদের পরীক্ষাব্রত উদ্‌যাপনের সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত কথাগুলি তত প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমি দেশে অপিচ কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করেছি যে যে সব ছেলে পরীক্ষা ভাল করে পাশ করে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অধীত বিষয়ে বিশেষ কোনও অনুরাগ বোধ করেন না। এ বিষয়ে হয়ত আমি অজ্ঞাতসারে একটু অতিরঞ্জন দোষে দায়ী হতে পারি কিন্তু যেহেতু আমার এরূপ ধারণার মধ্যে যথেষ্টপরিমাণে সত্য আছে একথা মনে করবার অনেক কারণ বিদ্যমান ও যেহেতু আমি নিজেও ভুক্তভোগী সেহেতু বোধ হয় এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকাও অনুচিত।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। যে সব ছাত্রের ক্ষেত্রে বিলাতে এসেও ছুটীতে বিদেশ ভ্রমণ ও পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশাটা অর্থাৎ ভাব সাধ্যায়ত্ত নয় তাঁদের কথা মনে করেও আমি আমাদের বিদেশীর সঙ্গে মেশার আগ্রহের অভাবের কথা লিখিনি। তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও এ সুবিধা বা সুযোগের অভাবকে আমি জাগতিক নিয়মে একটা ট্র্যাজিডি বলে মনে কর্ত্তে পার্চ্ছি না এইজন্য যে আমি দেখেছি যে এটা আমাদের একটা সংক্রামক ও বদ্ধমূল গুণ যে আমরা বিদেশী মানুষকে মানুষ হিসেবে জান্‌তে চাই না, তা আমরা সচ্ছলই হই বা দুঃস্থই হই। কৌতূহল গুণটি মানব মনের স্বাস্থ্যবত্তারই সূচনা করে। আমার ভয় হয় যে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দারিদ্র্য, দাসত্ব ও আচারানুবর্ত্তিতার চাপে কৈশোরেই হয় ক্লান্ত না হয় বিজ্ঞ হয়ে পড়ার রুণ সুযোগ পেলেও মানবপ্রকৃতিরূপ এত বড় একটি মনোজ্ঞ বস্তুর সংস্পর্শে আস্‌বার জন্য কৌতূহল বা ঔৎসুক্য বোধ কর্ত্তে অসমর্থ হয়ে পড়ি।

তা ছাড়া এতৎসম্পর্কে আমার আরও একটা কথা মনে হয়, যদিও আমাদের বিদেশীর সঙ্গে

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মেলামেশার সে যুক্তিটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর। তবে আমি মানুষের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার প্রয়োজনীয়তাকে একটু বড় করে দেখি বলে, এবং আমার দেশবাসীদের এদিকে কম বেশী উদাসীন্য দেখে একটু ব্যথা পেয়েছি বলে, সে যুক্তিটিও লেখা বোধ হয় মন্দ নয়।

কথাটি হচ্ছে এই যে দেশে আমরা আমাদের ভূতগরিমার যতই গৌরব করি না কেন বিদেশে এলে দেখি যে আমাদের কেউই জানে না, শোনে না, চেনে না। এ চিন্তাটা যে আমাদের অহমিকার মূলদেশে একটু আঘাত করে না তা নয়। কিন্তু এটা যখন সত্য তখন একে গোপন করে আত্মপ্রসাদ লাভের বৃথা চেষ্টা করার চেয়ে একে স্বীকার করে নিয়ে এর প্রতিকারের কথা ভাবা বোধ হয় মন্দ নয়—অবশ্য যদি মানুষের মানুষের সঙ্গে নিকট সংস্পর্শে আসাটা স্পৃহনীয় বলে ধ'রে নেওয়া যায়। যদিও ফরাসীদেশে ও জার্ম্মাণীতে সাধারণের মধ্যে ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা ইংরাজ জনসাধারণের মত গভীর ও বিস্তীর্ণ নয়, তাহলেও আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে আজও কোনও জীবন্ত সম্পৎ থাকৃতে পারে এ ধারণা এ দুই দেশের লোকের মধ্যেও কম। এটা প্রতীচ্যের অহমিকার দরুণও খানিকটা এবং আমাদের বর্ত্তমান হীনাবস্থার দরুণও খানিকটা। কিন্তু সে কারণ যাই হোক্ সত্য এই যে অভিজ্ঞ ও উদার দু'চারজনের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ আমাদের সম্বন্ধে লোকে হয় বড় বেশী জানে না, না হয় ইংরাজ মিশনারিদের উদার সত্যনিষ্ঠার ও propagandaর ফলে মন্দ দিকটাই জানে—যথা সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি—এবং সেটাও পূর্ব্বোক্ত মহানুভব খ্রীষ্ট শিষ্যগণের সোৎসাহ প্রচারের দরুণ নিতান্ত বিকৃত করে জানে। তাই আমাদের মধ্যে যে দু'চারজন য়ুরোপে আসার সুযোগ পান তাঁদের এদের সঙ্গে একটু মেশা বোধ হয় বাঞ্ছনীয়; কারণ এই মেলামেশার দরুণ যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধন জন্মায় সেটা একটা সত্য বস্তু। সুতরাং আমাদের সভ্যতার এই propaganda বোধ হয় একটা শ্রেষ্ঠ propaganda একথা বলা অত্যুক্তি হবে না। পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য ও বিদ্বেষের কতটা যে সচরাচর অজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে থাকে তা আমরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করি না বল্লেই চলে। কিন্তু এই নিকট পরিচয়ে যে সহানুভূতি জন্মায় তা এক মুহূর্ত্তেই পরস্পরের চরিত্র বুঝ্‌বার পক্ষে একটা মহতী অন্তর্দৃষ্টি দান করে; কারণ এটা নিতান্ত জানা কথা যে জটিল মানুষকে বুঝ্‌বার পক্ষে বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও বৈষয়িক জ্ঞানও ততটা অন্তর্দৃষ্টি দান কর্ত্তে পারে না যতটা পারে প্রীতি ও সহানুভূতির অঞ্জন। একথা কে না জানে যে আমরা বন্ধুর ক্ষেত্রে কত সূক্ষ্ম গুণ ও দুর্ব্বলতা দৈনিক জীবনে অভ্রবৎ স্বচ্ছ দেখ্‌তে পাই যার আভাষও মাত্র পরিচিত লোকের চরিত্রে জান্‌তে পাই না—যতদিন ধরেই আমরা তার সঙ্গে মিশি না কেন। তাই ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিদেশী বা বিদেশিনীর সঙ্গে প্রীতির বন্ধনের মধ্য দিয়ে একটু নিকট সংস্পর্শে এলে যেমন আমরা তাঁদের জাতিগত গুণাগুণ ও আচার ব্যবহারের যথার্থ মূল্য ধারণ কর্ত্তে সমর্থ হই তেমনি তারাও আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যটির যথার্থ রূপ ধর্ত্তে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়।

আমাদের মধ্যে একটা গুণ আমার ভারি চোখে পড়ে যেটা মোটের ওপর আমার কাছে ভালই লাগে যদিও এ গুণের ভাল ও মন্দ দুটো দিক্ আছে। এ গুণটি হচ্ছে এই যে আমরা এত শীঘ্র নিজেদের এদের আদব কায়দার (etiquette) সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি। একজন ইংরাজ মহিলা আমাকে এ কথাটি প্রথম বলেন। তবে তিনি সহানুভূতির চোখে দেখেছিলেন বলে এ জাতিগত গুণটির ভাল দিক্‌টাই তাঁর চোখে পড়েছিল এটা যে আমাদের বিলাতী অনুকরণ প্রবৃত্তির একটা অভিব্যক্তি হিসেবেও দেখা যেতে পারে সে কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি। কিন্তু সে যাই হোক্ মোটের উপর বিদেশে এসে বিদেশী আচার ব্যবহার ও আদবকায়দাকে নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষমতাকে আমি মোটের উপর ভাল বলেই মনে করি যদি একে একটা মস্ত গুণ বলে ভুল করে না বসা যায়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনেকে বিদেশে স্বাচ্ছন্দ্যের ওজন তুলাদণ্ডে অনুপরিমাণে কম হলেই অত্যন্ত অনুযোগপরায়ণ হয়ে ওঠেন এটাও লক্ষ্য করেছি। কেম্ব্রিজে একটি নবাগত ছাত্র প্রথম বৎসর তাঁর ল্যাণ্ডলেডী ও বাসাবাটীর কুখ্যাতিতে "পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ" হয়ে উঠেছিলেন যাতে আমরা মোটের উপর হৃষ্ট হয়েই উঠ্‌তাম, কারণ আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর জীবনের দুর্ব্বহতার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দাখিল করা ছিল তাঁর একটি নিত্যকর্ম্ম। বার্লিনেও এরূপ একটি মারাঠী ডাক্তার মহোদয়কে নিয়ে আমায় একবার একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হয়েছিল। আমি তাঁকে একটি নিতান্ত ভদ্র পরিবারে পরিচয় করে দিই কিন্তু সেখানে সুস্থির হয়ে বসতে না বস্‌তে তাঁর দিনগত পাপক্ষয়ের খুঁটিনাটি অসুবিধা কীর্ত্তন "কর্ণাধঃকরণ" কর্ত্তে আমার হাসিও পেত দুঃখও হ'ত। কিন্তু শেষাশেষি যখন তিনি তাঁর বর্ত্তমান জীবনের লোমহর্ষক অসুবিধা বিবৃতির অনর্গলতায় বেদব্যাসের সঙ্গে সত্য সত্যই টক্কর দিতে প্রয়াস পেলেন তখন আমি বিজৃম্ভনপরায়ণ না হয়েই পার্ত্তাম না—তার অনুযোগ অভিযোগের কারণ ছিল এতই তুচ্ছ ও হাস্যকর। ইনি একজন ডাক্তার ও ধনী বল্লেই হয়। তবু দুই এক মার্কের জন্য (= আধ পয়সা) নিজের ও পাঁচজনের জীবন দুর্ব্বহ করে তোলার পক্ষে এঁর খরদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও হীনপ্রভ হ'ত না। যে পরিবারে ইনি ছিলেন তাদের সুবিধার দিকে এঁর ঔদাসীন্যের গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী, অথচ তিনি মনে কর্ত্তেন যে অপর সকলের প্রতিই বিধাতা কৃপাকটাক্ষপাত করে থাকেন, কেবল, তাঁরই অদৃষ্টচন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত। কারণ ইনি আমাকে মাঝে মাঝেই বল্‌তেন যে আমি বেশ সুখে আছি ও রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি সকলেই বেশ সচ্ছন্দে আছে, অর্থাৎ "বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট রুষ্ট কেবল তাঁহার বেলা।" আমাকে একদিন জিজ্ঞাস কর্লেন "কঃ পন্থাঃ"? আমি বল্লাম "একটি মাত্র"। ইনি সাগ্রহে—"যথা!" আমি—"একটি বাড়ী কিনে চতুষ্টয় পরিচারিকা দ্বারা নিষেবিত ও প্রসাধিত হওয়া"। তাঁর জীবন মরণের সমস্যা নিয়ে আমার এরূপ শোচনীয় হৃদয়হীন পরিহাসে তিনি মর্ম্মাহত হয়েছিলেন কিনা সেকথা "মর্ম্মযামীই" জানেন। কিন্তু সে যাই হোক তিনি

শেষটায় লণ্ডনে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। এখন আশা করা যায় সেখানে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা আশাতীতরূপে সন্তোষজনক। যেহেতু hope springs eternal in the human breast সেহেতু ঈদৃশ আশাও হয়ত নিতান্ত দুরাশা না হ'তেও পারে। আর একটি মান্দ্রাজের প্রফেসার আমার বার্লিনে অবস্থান কালে একদিন এক খ্যাত পিয়ানোবাদকের সান্ধ্যপার্টিতে গিয়ে আমাদের সাম্‌নে পেয়ে তাঁর দৈনিক জীবনের অসুবিধাকীর্ত্তনে "নীলকণ্ঠ" হয়ে পড়বার উপক্রম আর কি! এবং শুধু তাই নয় তিনি এমনই পণ্ডিত-মূর্খ যে গৃহকর্ত্তাকে একটু ব্যস্ত কর্ব্বার চেষ্টায়ই ছিলেন যখন তিনি তাঁর (অর্থাৎ গৃহকর্ত্তার) চা ও রুটি মাখন প্রত্যাখ্যান কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলেন। যেহেতু দুগ্ধাভাবে চা, ও জ্যাম অভাবে রুটি মাখন নাকি তাঁর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষে কখনও গ্রহণ করেন নি।

এরূপ সদাই অনুযোগপরায়ণ লোক আমি একটি আধটি নয় অনেকগুলি দেখেছি বলেই এ বিষয়ে এতটা টীকাটিপ্পনা করাটা বাহুল্য বলে মনে কর্লাম না। এ শ্রেণীর লোকের সালোক্য বা সাযুজ্য লাভের একমাত্র পন্থা বোধ হয় স্ব স্ব সৌধে স-তাকিয়া ও সগুড়গুড়ি বিরাজমান থাকা। বিদেশে আসাটা এঁদের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি?

তবে শেষে এইটুকু আশার কথা জ্ঞাপন করে এ প্রবন্ধের শেষ কর্ত্তে চাই যে সংপ্রতি একটা পরিবর্ত্তনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে বলে ভরসা হয়। আজ কাল দেখি কেউ কেউ ছুটিতে ইংলণ্ডেতর স্থানেও বেড়াতে আস্‌তে আরম্ভ করেছেন ও তার চেয়েও যেটা বড় কথা—আজ কাল অনেকে ইংলণ্ডেতর বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতেও পাঠার্থ আস্‌তে চাইছেন। তাঁরা অভিনন্দনার্হ যাঁদের মনে আজ কাল পাঠাবসানে এক নিঃশ্বাসে পারিস, সুইজর্ল'ণ্ড ইতালী প্রভৃতি দেশে পাড়ি মারার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের কীট প্রবেশ কর্ত্তে আরম্ভ করেছে। আনন্দের কথা যে সার্ব্বভৌম মানুষের সংস্পর্শ যে জগতের মানুষের কাছে আজ কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু মাত্র নয়—প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এ ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌তে দেখা যায়; সুখের কথা, যে ডিগ্রি নেওয়ার আদর্শেই যে আমাদের চিরকাল য়ুরোপে আস্‌তে হবে কঠিন চাকরী সমস্যা সত্ত্বেও এ কথাকে অনেকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে অস্বীকৃত হচ্ছেন দেখা যায় (যেমন শ্রদ্ধেয় মেঘনাদ সাহা মহাশয়ের ক্ষেত্রে—যিনি য়ুরোপে কাজের আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন —ডিগ্রির নয়); এবং সবচেয়ে বড় আশার কথা এই যে কোনও সনাতন গতানুগতিকের অনুবর্ত্তনেই যে একটা বর্দ্ধিষ্ণু জাতির চিত্রবিচিত্র জীবন-সমস্যার চিরন্তন সমাধান মেলা সম্ভব নয় এ কঠোর সত্য আমাদের মধ্যে অনেকেই একটু বিশেষ রকম নাড়া দিয়েছেন বলে মনে হয়।

পারিস, মে, ১৯২২

শ্রীদিলীপকুমার রায়

“পেছন ভারী”
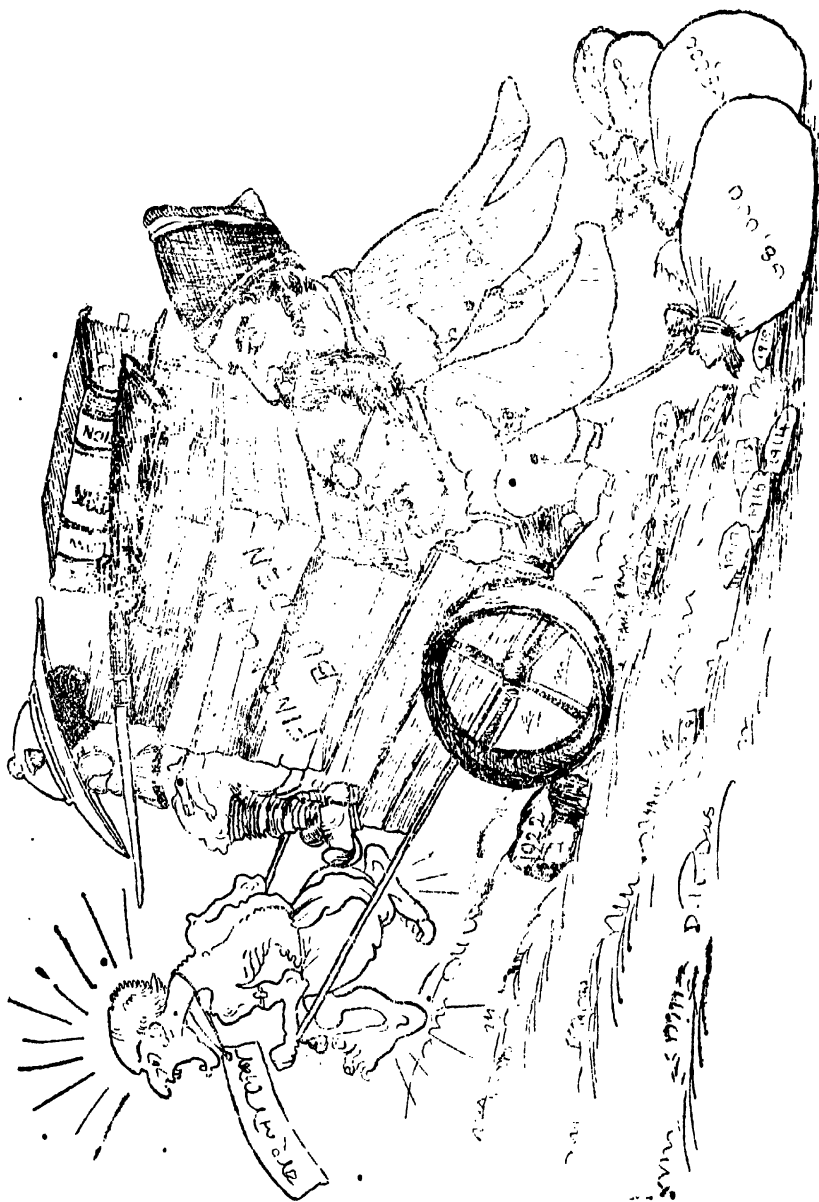
শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস।

আবার তোরা মানুষ হ!

"কিসের শোক করিস ভাই! আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই, —আবার তোরা মানুষ হ!"

—যে উত্তেজনায় ক্ষিপ্ততা নাই, বরং যাহা মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তোলে, সেই উত্তেজনা, কবি দ্বিজেন্দ্র লালের অনেকগুলি গানের প্রাণ। আমাদের আত্মাভিমানের মোহ এখনও কাটে নাই, তাই এখনও আপনাদের দোষ, পরের ঘাড়ে চাপাইয়া পর-বিদ্বেষে আপনাদের চিত্ত নিরন্তর কলুষিত করিতেছি। আমার কপালে যে সাংসারিক উন্নতি ঘটিল না, সে কি "কেবল ফেল্লাম ব'লে জন্মে ভুলে বিষ্যুৎ বারের বার বেলায়?" আত্মপ্রতারিতেরা মনে করে যে, তাহাদের ঘরের ছেলেরা পাড়ার দশজনের দোষেই বয়ে যায়; অধম কাপুরুষেরা মনে করে যে, চক্ষুশূন্য একটা গ্রহের দৃষ্টিতে, অথবা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দোষেই তাহাদের যত অধোগতি। এই মোহে, ভ্রান্তিতে, কুসংস্কারে, আমরা নিজের দোষ দেখিতে পাইনা। শিশু আছাড় খাইয়া পড়িলে মাটিতে পদাঘাত করিয়া ব্যথা ভোলে; শিশুর পিতা পিতামহেরাও সেই পদ্ধতিতে পরকে গালি দিয়া আর্য্য-গৌরব-সুখ অনুভব করেন: কবি এই আত্মপ্রতারিতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

পরের পরে কেন এ রোষ, —নিজেরাই যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরি দোষ; আবার তোরা মানুষ হ।

ভারতবর্ষ যে একদিন ভারি বড় ছিল, সে কথা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু আমাদের দেশের যে সাধারণ বিশ্বাস আমাদের জাতির মত জাতি নাই, সে কি কোন প্রাচীন কালের যথার্থ গৌরবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? অরণ্যচারী লোকেরাও বলে যে, তাহাদের মত শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীতে নাই; তাহারা যে কেন শ্রেষ্ঠ, সে কথা তাহারা বুঝাইতে পারে না। প্রাণের প্রতি মমতার মত, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের এই অভিমান, সকল জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বরং যে জাতি বা লোক-সাধারণ যত বেশী মূর্খ, তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস তত অধিক। আমাদের দেশের যে শ্রেণীর লোক বিদেশের সাহিত্য এবং অবস্থার সহিত অত্যন্ত অপরিচিত, তাহারাই আপনাদের অত্যন্ত গৌরবে বেশী বিশ্বাস করে। যে কারণে আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার কথা, প্রাচীনের সে কাহিনী ত সেদিন পর্য্যন্তও এ দেশে অনেকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। যে সাহিত্যে অতি প্রাচীন কালের স্বাধীন চিন্তা, সুশিক্ষা এবং চরিত্রনিষ্ঠার ইতিহাস পাই, তাহা ত এখনও রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়া ইউরোপেই পড়িয়া আছে। মৌর্য্যকুলের গৌরব ত বিদেশের যত্নে সেই সে দিন প্রকাশিত হইয়াছে; গুপ্ত সম্রাটদের মহিমাও এখনও ফ্লীট সাহেবের খোদিত লিপিগ্রন্থে ডুবিয়া

আছে। বৃথা বচন-দম্ভে কেহ কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না ; "আমাদের সব ভাল" বলিয়া কেহ কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহা যথার্থ মাহাত্ম্যের জিনিস, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিলে স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে মাহাত্ম্য জিনিসটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। যে কারণে এই প্রাচীন মাহাত্ম্য ডুবিয়া গেল, তাহাও সযত্নে বুঝিয়া লইতে পারিলে "সব ভালোর" অন্ধতা চলিয়া যায়, এবং উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়। কবির গানের একটি ছত্রে এই দোষের কথার পরিস্ফুট আভাস আছে :—

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
হৃদয়ে তোর জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান্।

আমরা বড় ছিলাম, সেত ভাল কথা ; কিন্তু এখন যে কত দিক দিয়া কত ছোট হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা ভাবিতে কুণ্ঠিত হই কেন ? সত্যের ভিত্তিতে হউক, মিথ্যার ভিত্তিতে হউক, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই স্বদেশ-হিতৈষণা জাগিয়া উঠিবে, এবং মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে, এ কথায় কোন সমাজ-তত্ত্ববিদ্ বিশ্বাস করিতে পারেন না। ধর্ম্ম তত্ত্বের কথায়ও শুনিতে পাই (সেটা আমার মত লোকের শোনা কথা বই নয়) যে, পূর্ণমাত্রায় পাপ এবং অপরাধ বোধ না জন্মিলে, কোন ব্যক্তি মুক্তি-পথের প্রয়াসী হইতে পারে না। যাহা সর্ব্বত্র নিয়ম, তাহা কেবল স্বদেশ-হিতৈষণার বেলায় অনিয়ম, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?

কবির "রাণা প্রতাপ" নাটকের নায়ক আদর্শ ক্ষত্রিয় ; প্রতাপের শৌর্য্য, তিতিক্ষা, বীর্য্য, ক্ষমা, স্বদেশ-ভক্তি, এ সকল অতি অধিক, অতি গভীর। কিন্তু মেওয়ার পতনের যাহা মূল কারণ, যে বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পরে সকল দেশকে জর্জ্জর করিল, তাহাও যে প্রতাপ চরিত্রে নিহিত ছিল, কবি সুকৌশলে তাহা তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন। শক্ত-সিংহ প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত ; যাহা শক্তের শৌর্য্যে এবং বুদ্ধিমত্তায় আয়ত্ত হইতেছিল, তাহা প্রতাপের কাছে অমূল্য, স্বদেশের লাভের বিবেচনায় অমূল্য। তবুও প্রতাপ, শক্ত-সিংহকে পরিত্যাগ করিলেন, কেন না শক্ত-সিংহ মুসলমানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রতাপ যখন বলিলেন, তিনি এতদিন "বংশ-গৌরব" রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তখন বুঝিতে পারা গেল যে, এ দেশের কপাল পুড়িয়াছে। কোথায় জাতির সর্ব্ব-ব্যাপী স্বার্থ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বংশ-গৌরব ! এত নিঃস্বার্থতা, এত ত্যাগ, এত মাহাত্ম্য, ঐ সঙ্কীর্ণতায় গ্রাস করিল। আমাদের সঙ্কীর্ণতা এবং আত্ম-কলহ, কবিকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল। গীতে তিনি গভীর দুঃখে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন :—

ভুলিয়ে যারে আত্ম-পর, পরকে নিয়ে আপন কর ;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর,——আবার তোরা মানুষ হ'

"মা সত্যবতী, মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হোল? তার পতন, যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে,—যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে; কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাহাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃ-দ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার, অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম, আজ প্রাণ-হীন একখানি আচারের কঙ্কাল। জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা দেখ্‌বার কেউ অবসর পায় না। মেওয়ার গেল বলে ক্রন্দন কল্লে কি হবে মা!"

মহাবৎ খাঁ মহৎ, মহাবৎ খাঁ বীর। সে জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে মুসলমান। একজনের যদি আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিল, যে অমুক ধর্ম্ম সেবা না করিলে মুক্তি নাই, তখন সে তাহা করিতে পারিবে না কেন? ধর্ম্ম মতের বিষয় হইল যখন পরলোকের কথা লইয়া, তখন যে যাহা ভাল বুঝিল, তাহার অনুসরণ করিলে তোমার আমার ক্ষতি কি? ঈশ্বর বলিতে আমি যাহা বুঝি, দেব পূজার পদ্ধতি আমি যেটা মানিয়া থাকি, সেইটি যদি অপর ব্যক্তি না মানিয়া লয়, তবে সে কি দূর হইয়া চলিয়া যাইবে? যদি কোন লোক দেশ-প্রচলিত দেব-পূজা পরিত্যাগ করে, তখন, সগর সিংহ মহবৎকে যাহা বলিয়াছিলেন, অবিকল সেই কথাই আমরা বলিয়া থাকি। আমরা বলি,—তুমি কি দুপাতা পড়েই এত বড় শাস্ত্র অগ্রাহ্য কর? হিন্দু ধর্ম্মের মত সনাতন ধর্ম্ম আর আছে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এগুলি কি একটা দম্ভ এবং অহঙ্কারের কথা মাত্র নয়? ধর্ম্ম কি দম্ভ এবং অহঙ্কার? আর না হয়, তোমার মতই পরম সত্য, এবং তুমিই অগাধ পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু সকলে তোমার মতে মত দিবে, এবং তুমি যেমন করিয়া ভাব, তেমনি করিয়া ভাবিবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা এবং অহঙ্কার তোমার জন্মিল কেন? মতবিরোধের জন্য মহাবৎকে যদি তাড়াইয়া দাও, তবে সে একটা আশ্রয় গ্রহণ করিবেই ত! মনে কর যে সে না বুঝিয়াই মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার পাপ হইল কি? সে যদি হিন্দু হইতে চায়, তুমি তাহাকে হিন্দু করিয়া লইতে পার? যে শরীরে ক্ষয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বৃদ্ধির পথ নাই, বিনাশই যে তাহার একমাত্র ভাগ্য, তাহাও কি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে? যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে কি প্রতিভা ফুটিতে পারে? হায় স্বদেশ!

আমরা এত মূর্খ যে, এ কথাও দম্ভ করিয়া বলি যে, নানা ধর্ম্ম, নানা মতের স্রোত বহিয়া গেল, কিন্তু হিন্দু তাহাতে হিন্দুয়ানি ছাড়ে নাই। সত্যসত্যই কি আমাদের সমাজ, ক্ষয়ের সেই শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন জড়তার কঠিন অবস্থায় কোন নূতন ভাব সংক্রামিত হইতে পারে না, পরিবর্ত্তন অসম্ভব হয়, এবং বিনাশই একমাত্র পরিণামে অবশিষ্ট থাকে? যাহারা মৃত আচারের কঙ্কালকেই পূজা করে, তাহারা মহাবৎকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলে; এবং ফোঁটা কাটিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিলে (এবং না করিলেও)

গজ সিংহের মত মহা পাপিষ্ঠকে সমাজের একজন বলিয়া সন্তুষ্ট থাকে। স্বদেশ-বাসি, একবার কবির কথা শোন :—

শক্র হয় হোক্ না,—যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভাল বাসিতে শেখ্ তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্ ভণ্ড যে,—তাহারে দূর করিয়া দে ;
সবার বাড়া শক্র সে !—আবার তোরা মানুষ হ।

মহাবৎ খাঁ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন না। কিন্তু মেওয়ার পতনের পূর্ব্বাহ্নে যে দিন সগর সিংহ উদার হিন্দু ধর্ম্মের চরম মাহাত্ম্য বর্ণনার পর মহাবৎকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার হিন্দু পত্নী তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করে বলিয়া তিনি পিতার গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়াছেন, তখন তিনি মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মহাবৎ খাঁর প্রতিজ্ঞা যে বিশুদ্ধ যুক্তি অনুমোদিত নয়, একথা তাঁহার হিন্দু-পত্নী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া লজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবৎ রক্তমাংসে গড়া মানুষ। নারীর প্রতি অত কঠোর অবিচারের কথা শুনিলে নিঃসম্পর্কীয়েরও রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত বলিয়াই গোঁয়ার, তাহারা যে সকল অনাচার অত্যাচারের সৃষ্টি করে, তাহা অত্যন্ত গর্হিত এবং পাপ-দুষ্ট। কিন্তু তাহারা যে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, তাহার মূলে কি আমাদের বহু-কালসঞ্চিত বিদ্বেষ এবং পাপ নাই? হিন্দু মুসলমানের বিবাদে উভয় পক্ষই, যাহা পরম কল্যাণ-প্রদ, তাহা পায়ে দলিতেছে। ভ্রাতৃ-বিরোধে "কল্যাণী"-ই একা পিশিয়া মরিল।

এই ভ্রাতৃ-বিরোধ রহিত করিতে গিয়া, কি করিয়া মানুষ হইতে হয়, তাহা মানসী, রাণাকে বলিয়াছিলেন। মানুষ হইতে হয়, "বিদ্বেষ বর্জ্জন করে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্ব-প্রেমে ধৌত করে নিয়ে।" একি বড় আস্‌মানি রকমের কথা? বিশ্ব-প্রেম বিকশিত হইলে কি স্বদেশ-প্রেমের প্রগাঢ়তা থাকিবে? ধর্ম্মের কথায়ও ঠিক এই রকম সন্দেহই উপস্থিত হয়। যদি সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরকে ভাল বাসিতে যাই, তাহা হইলে আমার সাধের সংসারটি কোথায় পড়িয়া থাকিবে? সংসারকে ভাল বাসিতে না পারিলে, যে সংসারের পরপ্রান্তে জগদীশ্বরের চরণে আমাদের ভালবাসা পৌঁছায় না, এবং অন্যদিকে আবার তাঁহাকে পাইলেই যে, সব পাওয়া যায়, এ কথা আমরা ভোগাসক্তিতে বুঝিতে পারি না।

বিশ্ব-প্রেম একটা লোকাতীত পদার্থ নয়। যে নিজের পরিবারকে ভাল বাসিতে পারে না, স্বদেশকে ভাল বাসিতে শিখে নাই, তাহার মনে বিশ্ব-প্রেম জাগিবে কেমন করিয়া? জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতির অনুবৃত্তিতে এখানেও এই কথা খাটে যে, বিশ্ব-প্রেম জন্মিলে স্বদেশ-প্রীতি এবং আত্ম-প্রীতি বিশুদ্ধ হয়। যাঁহাদের অল্পমাত্রও বিশ্ব-প্রীতি আছে, তাঁহারা আট্‌লাণ্টিকের পরপারেও দাসত্ব প্রথার অত্যাচার দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। যদি কোন প্রকারে নিজের দোষে কিম্বা পরের অত্যাচারে কোন জাতি মাথা তুলিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে না পারে, তবে কি সেই জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্ব-প্রেমিক, তিনিই সর্ব্বাগ্রে সে বাধা তিরোহিত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন না? উদাসীন শ্রেণীর ফকিরি, ধর্ম্ম-ক্ষেত্রেও মহাপাপ, সংসারক্ষেত্রেও মহাপাপ। পবিত্রতার অর্থ ফকিরি নয়; পবিত্রতা জ্ঞানকে মাজিয়া উজ্জ্বল করে, ভক্তিকে সরস করে, এবং শক্তিকে সবল করে। কবি যথার্থই লিখিয়াছেন:—

জগৎজুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পরে রাঙ্গায় চোখ্;
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক্।
ধর্ম্ম যেথা সে দিকে থাক; ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্, আবার তোরা মানুষ হ।

কবির মেওয়ার পতনের মূল মন্ত্রটি মানসীর ঐ গানে। সেই জন্য জাতীয় সাহিত্যের ঐ অমূল্য গানটির সমালোচনা করিলাম। ঈশ্বরকে মাথার উপরে আসন দিয়া, ধর্ম্ম পথে থাকিয়া, স্বদেশ সেবা করিতে গেলে যদি পদে পদে বাধা পড়ে, তবে নিশ্চয় জানিও, তুমি পাপের কুহকে পড়িয়া অপূজ্যকে পূজা করিতে বসিয়াছ; স্বদেশের চরণপ্রান্তে তোমার পূজার অঞ্জলি পড়িতেছে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং নীচ সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া ফেলিয়া দাও; বিধাতার আশীর্ব্বাদে সুদিন আসিবে। শুধু—

আবার তো'রা মানুষ হ।

আবার তোরা মানুষ হ'

[রচনা ও সুর——————স্বর্গীয় মহাত্মা ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ'।
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হো'স্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান ;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর ;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে ;—
সবার বাড়া শত্রু সে ;—আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দুইটী সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক ;
পুণ্যসেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক্ ;
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক্, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ ;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'॥

[স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

খাম্বাজ মিশ্র——————দাদরা। *

	১´				০			১´			০			
১ II	সা	রা	-গা	| গা	গমা	-ররা	I রগা	-রগা	-মা	| মা	-া	-া	I
	আ	বা	র্	তো	রা৹	৹মা	নু৹	৹৹	ষ্	হ'			

* এ গানখানি একতালা তালের ঠেকার সহিতও গীত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় নিম্নলিখিত :—

২´			৩			০			১		
I ধিন্	ধিন্	ধা	| ধা	থুন্	না	I ক	তে	ধাগে	| তেরেকেটে	ধিন্	ধা I

একতালার ঠেকার সহিত খাপ্ খাওয়াইয়া গেয়।——লেখিকা।

১´ ০ ১´ ০
২ I ধা ধা -া | ধা -া -মা I পা পা -া | সা -া সা I
কি সে র্ শো: • কৃ ক রি স্ ভা • ই

[১´ ০ ১´ ০
৪ I [মা পা -ধা | ধা ধা -পধ৷ I ধা -ণা -া | র্সধর্সা -ধপমা -গরসা] I
৩ I {সা রা -গা | গা গমা -রবা I বগা -রগা -মা | মা -া -া} I
{আ বা ব তো বা• •মা মু• •• য্ হ’ • •}

১ ০ ১ ০
৫ I সা রা -গা | গা গমা -ররা I রগা -রগা -মা | মা -া -া I
আ বা ব্ তো রা• •মা মু• •• য্ হ’ • •

১´ ০ ১´ ০
৬ I মা মা -া | মা পা -া I ধা া ধা | ধা -া ধা I
গি য়ে • ছে দে শ্ ছ : খ না • ই

[১´ ০ ১´ ০
৮ I [মা পা -ধা | ধা ধা -পধা I ধা -ণা -া | র্সধর্সা -ধপমা -গরসা] I
৭ I {ণা ণা -া | ণা ধা -ধধা I পা -ধা -ণা | ধা -া -া} II
{আ বা ব তো বা •মা মু • য্ হ’ • •}

{১´ ০ ১´ ০
৯ II {মা মা -া | মা পা -া I ধা -া ধা | ধা ধা -া I
প রে র্ ’প বে • কে • ন এ রো য্

১´ ‥ ০ ১´ ‥ ০
১০ I ণা ণা ণণা | ণা ধা -া I পা -া ণণা | ধা -া -া} I
নি জে রই য দি • শ • ক্র• হো • স্

১´ ০ ১´ ‥ ০
১১ I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I র্রা র্সা ণণা | ধা -া -া I
তো দে র্ এ ’ যে : নি জে রই দো. • য্

১' ০ ১' ০
১৩ I [মা পা -ধা | ধা ধা -পধা I ধা -ণা -া | র্সধর্সা -ধপমা -গরসা] I
১২ I {ধা ধা -া | ধা ধা -ধধা I পা -ধা -পধনা | ধা -া -া} I
{আ বা র্ তো রা • মা নু • • • ষ্ হ' • • •}

১' ০ ১' ০
১৪ I সা রা -গা | গা গমা রা I রগা -রগা -মা | মা -া -া II
আ বা র্ তো রা• মা নু • • • ষ হ' • •

১' ০ ১' ০
II {সা -া সা | সা রা -া I গা -া গা | গা গা গা I
ঘু • চা তে চা স্ ষ • দি রে এ ই
শ • ত্রু হো ক্ না য • দি সে থা য়
জ গ ৎ জু • ড়ে চ্ ই টী সে • না

১' ০ ১' ০
I মা মা মা | গা -া গা I রা -গা মা | গা -া -া I
হ তা শা ম • য় ব র্ ত মা • ন্
পা • • • • স্ ম হ ৎ প্রা • ণ্
প র স্ প • রে রা ঙা য় চো • ক্

১' ০ ১' ০
I পা -া পা | পা -া পা I পা ধা পা | মা -া -গা I
বি • শ্ব ম • য় জা গা য়ে তো • ল্
তা • হা রে ভা • ল বা সি তে শে • খ্
পু • ণ্য সে • না নি জে র্ ক • র্

১' ০ ১' ০
I গা গা -া | গা -মা রা I রা গা -মা | মা -া -া} I
ভা য়ে র্ প্র • তি ভা য়ে র্ টা • ন্
তা হা রে ক • র্ হৃ দ য়• দা • ন্
পা পে র্ সে• • না শ • ত্রু হো • ক্

১' ০ ১' ০
I {মা মা মা | মা -পা পা I ধা -া ধা | ধা -া -া I
ভু লি য়ে যা ০ রে আ ত্ ম প ০ র্
মি ০ ত্র হো ০ ক্ ভ ন্ ড যে ০ ০
ধ র ম যে ০ পা সে দি ক্ থা ০ ক্

১'
I ণা -া ণা | ণা -ধা পা I পা ধা -ণা | ধা -া -া} I
প র্ কে নি ০ য়ে আ প ন্ ক ০ র্
তা হা রে দূ ০ র্ ক রি য়া দে ০ ০
ঈ ০ শ্ব রে ০ রে মা থা য় রা ০ খ্

১' ০ ১' ০
I র্সা -া র্সা | র্সা -া -া I র্রা র্সা -ণা | ধা -া -া I
বি ০ শ্ব তো ০ র্ নি জে র্ ঘ ০ র্
স বা র্ বা ০ ড়া শ ০ ক্র সে ০ ০
স্ব জ ন্ দে ০ শ্ ডু বি য়া যা ০ ক্

১' ০ ১' ০
I ণা ণা -া | ধা ধা ধা I পা -ধা -ণা | ধা -া -া I
আ বা র্ তো রা মা নু ০ ষ্ হ' ০ ০

১' ০ ১' ০
I মা পা -ধা | ধা ধা -পধা I ধা -ণা -া | র্সধর্সা -ধপমা -গরসা I
আ বা র্ তো রা ০মা নু ০ ষ্ হ' ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১' ০ ১' ০
I সা রা -গা | গা গমা রা I রগা -রগা -মা | মা -া -া IIII
আ বা র্ তো রা০ মা নু ০ ০ ০ ষ্ হ' . ০ ০

শ্রীমতি মোহিনী সেন গুপ্তা

বেলুড়

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ স্বামী প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন। ঐ বৎসর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে সম্পাদিত হয়। কিন্তু পর বৎসর সেখানে তাঁহার জন্মতিথির দিনে উৎসব হওয়ার বিঘ্ন ঘটে। তার পর ঠিক হয় পরমহংসদেবের মঠ আর আলমবাজারে থাকিবে না। গঙ্গার অপর পারে বেলুড় স্থানটি বিবেকানন্দ মনোনীত করেন। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ভাড়া করিয়া মঠের জিনিষ-পত্র সেইখানে উঠাইয়া আনা হয়। এই বাড়ীতে আসিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "এমন গঙ্গা, এমন বাড়ী, এই ত তীর্থের মত জায়গা!" তাঁহার মঠের যে আদর্শ ছিল, তাহা এক সঙ্গে কবি-কল্পনা ও ধর্ম্মভাবে গড়া ছিল; এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত স্বামি-শিষ্য সংবাদ নামক পুস্তকের ৮৬।৮৭ পৃষ্ঠা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"অনন্তর স্বামিজী, ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও মঠ যে ভাবে নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, তাহারই একখানি চিত্র (drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামিজীর পরামর্শ মত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন "এই ভাবী মঠ মন্দিরটির নির্ম্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করিবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহ-শিল্প সম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তাহার সবগুলি এই মন্দির নির্ম্মাণে বিকাশ কর্‌বার চেষ্টা করব। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। উহার দেয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাক্‌বে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যান জপ কর্‌তে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় ক'রে নির্ম্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাট-মন্দিরটি এমন বড় করে নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে যে দূর থেকে দেখ্‌লে ঠিক "ওঁ"-কার বলে ধারণা হবে। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্ত্তি থাক্‌বে। দোরে দুটি দুটি ছবি এই ভাবে থাক্‌বে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধু-ভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাট্‌ছে অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলায় ত কার্য্যে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐ গুলি ক্রমে কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পারে ত করবে। আমার মনে হয় ঠাকুর এসেছিলেন, দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভিতরেই প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে। সে জন্য ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি, সমস্তই যাতে এই মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুল্‌তে হবে।"

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পরমহংসদেবের জন্মোৎসব বেলুড়ে দাঁয়েদের ঠাকুর বাড়ীতেই সম্পাদিত হয়। মঠের জন্য যে জায়গাটা ক্রয় করা হইয়াছিল তাহা তখনও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে পরমহংসদেবের জন্ম তিথির পূজোপলক্ষে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে তাঁহার বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ব্যাপারটিতে খুব ধূমধাম হইয়াছিল। বিবেকানন্দের সুগৌর মূর্ত্তি সন্ন্যাসীরা মনের মতন করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, তাঁহার দুই কাণে শাঁখের কুণ্ডল, বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষবলয়, গায়ে খুব সাদা রংএর ছাই, মাথায় জটা আপাদ-লম্বিত, রুদ্রাক্ষের মালার তিনটি লহর খুব জাঁক করিয়া গলায় দুলিতেছিল, বাম হাতে ছিল একটা ত্রিশূল। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে সাজিয়া তিনি "কুজন্তং রামরামেতি" এই শ্লোকটি গাহিতেছিলেন। এদিকে সেই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে দুইটি পান্তুয়া লইয়া উপস্থিত হইলেন, সন্ন্যাসীরা তখন "রাম" নাম ভুলিয়া পান্তুয়া দুটি দেখিতে ছুটিলেন। ঐ দুইটি পান্তুয়া দেখিবার জিনিষ বটে। দুইটির ওজন দেড় মণ।

স্বামিজী যখন তানপুরার সুরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া "রাম"-নাম গাইয়া সেই স্থানটি মুখরিত করিতেছিলেন, তখন সেখানে নট-রাজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিবেকানন্দ সোল্লাসে গান থামাইয়া তাঁহার নিজের সাজটি নট-রাজকে পরাইয়া দিলেন। ঘোষ মহাশয়ের সেই নটাধিরাজের মত দেহে বিভূতি, রুদ্রাক্ষবলয় বেশ মানাইয়াছিল, তিনি যখন বামহাতে ত্রিশূলটি ধরিলেন, তখন তাঁহাকে রুদ্রদেবের অবতার বলিয়াই মনে হইল। বিবেকানন্দ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"পরমহংসদেব ইঁহাকে ভৈরবের অবতার বলিতেন,—এই চেহারা দেখিয়া সে কথা ঠিক মনে হয়।" অতঃপর স্বামিজী গিরিশ বাবুকে কিছু ঠাকুরের কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। গিরিশ বাবুর চোখে জল এল, তিনি বলিলেন, "আপনারা তরুণ বয়সে কুমার, চরিত্র তুষারশুভ্র, কামিনী-কাঞ্চন আপনাদের ছায়া মাড়াইতে পারে নাই, এই পবিত্র সমাজে যে আমার মত লোক স্থান পাইয়াছে, ইহা হইতে ঠাকুরের কৃপার বড় কথা আর তো কিছু আমি জানি না"—এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

এই সকল মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ভক্তি, অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর ও অপূর্ব্ব চোখের জলের উপর রামকৃষ্ণ মঠের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই বেলুড়ে বাস করিয়াই বিবেকানন্দ নিজের নিকটে যে এক হাজার টাকা ছিল এবং স্বর্গীয় হরমোহন মিত্রের প্রদত্ত এক সহস্র টাকা—এই মূলধন লইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতের সাহায্যে উদ্বোধন পত্রিকা প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয়। ১৯০১ সনে বেলুড়ের মঠ-নির্ম্মাণ শেষ হয়। অতঃপর স্বামিজী গঙ্গার ওপারে মেয়ে সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটা মঠ স্থাপনার সংকল্প করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শরৎ বাবুর পুস্তকে স্বামিজীর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে দিতেছি :—

"গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাক্‌বে, আর বিধবা ব্রহ্ম-চারিণীরাও থাক্‌বে। আর ভক্তিমতী গেরস্থের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান কর্‌তে পারে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংশ্রব থাক্‌বে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রীমঠের কার্য্যভাব চালাবে। স্ত্রীমঠে মেয়েদের একটা স্কুল থাক্‌বে। তাতে ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ—চাই কি অল্প বিস্তর ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশু-পালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। যারা বাড়ী ছেড়ে একবারে এখানে থাক্‌বে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীস্বরূপ পড়াশুনা কর্‌তে পার্‌বে।·········তোদের মেয়েরা যে এখন কি হয়ে দাঁড়িয়াছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝ্‌তে পারতিস্‌। আবার দেশের মেয়েদের জাগিয়ে তোলা তোদের হাতে আছে। তাই বল্‌ছি কাজে লেগে যা। কি হবে শুধু কতকগুলি বেদ বেদান্ত মুখস্থ করে ?"

স্বামিজী অনেক আশাভরসা লইয়া স্বীয় সন্ন্যাস-কঠোর কর্ম্মজীবন দেশ-সেবায় পূর্ণভাবে লাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কালের কুঠার তাঁহার জীবন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এখনও বেলুড় মঠ বাঙ্গালীর আদর্শ কর্ম্মজীবনের কেন্দ্র হইয়া আছে। এখান হইতে লোক-সেবা মহিমা-মণ্ডিত হইয়াছে, ধ্যান ধারণার নূতন আদর্শ, প্রাচীন ও আধুনিক ভাবের সমন্বয়, ত্যাগ ও কর্ত্তব্য পালন ও প্রীতির নূতন বার্ত্তা সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা বেলুড়ের প্রতি ধূলিকণাকে পবিত্র মনে না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পুরীর মত এখানে সর্ব্বজাতির সমন্বয়, বৃন্দাবনের মত এখানে ভক্তির খেলা, য়ুরোপের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিকিৎসাশালার ন্যায় এখানে সেবা-ব্রতের অনুপ্রাণনা—সমস্তই প্রাচীন তীর্থের নবকলেবর ধারণের ন্যায়, এই তীর্থকে জীবন্ত ভাবের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে।

অতিথিশালা
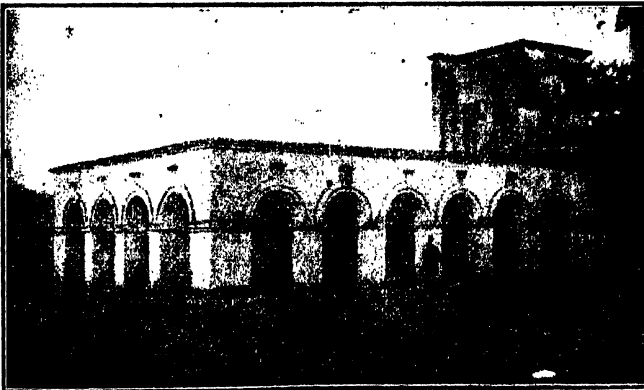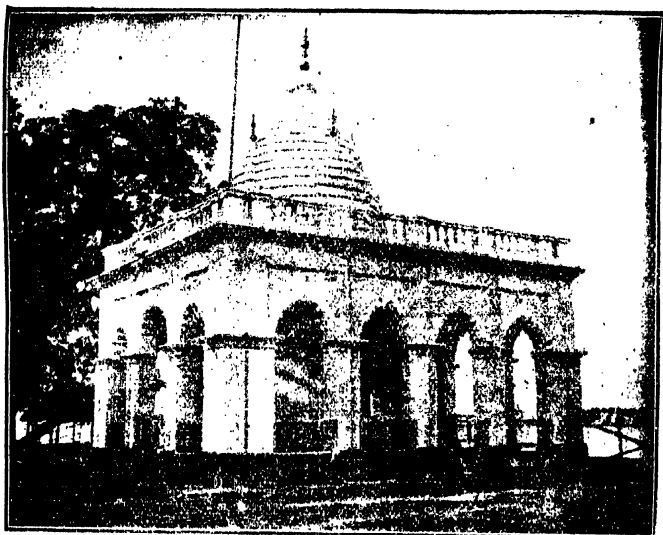
মাতাঠাকুরাণী ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্মৃতিমন্দির

ঠাকুরবাটী

গঙ্গাতীরে সূর্য্যাস্ত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
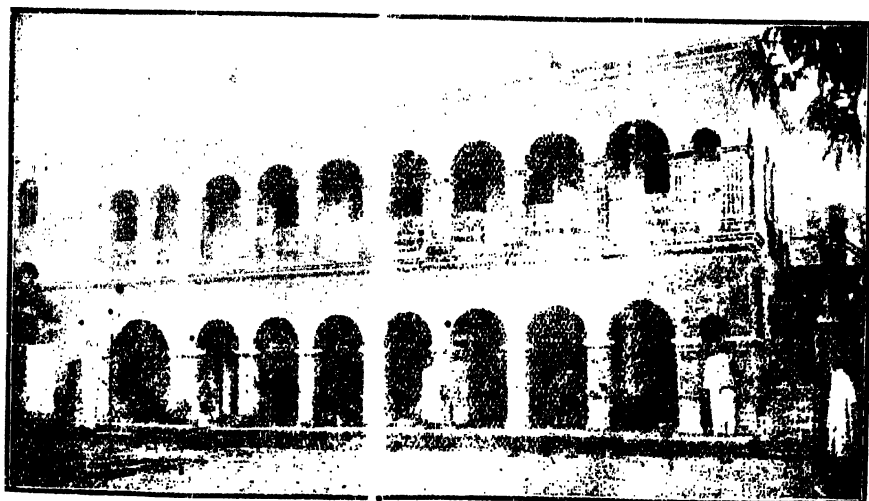
গ্রন্থ পরিচয়

জাতকের বাঙ্গালা অনুবাদ—দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা; শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, কর্ত্তৃক অনূদিত। পালি ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীনকালের এক সময়ের মগধের প্রচলিত ভাষায় অনেক উপকথা পাওয়া যায়; এই উপকথাগুলি মোটা মোটা ছয় খানা বলামে বিলাতে মুদ্রিত আছে। সুপণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ উহার দুইটি বলাম বা খণ্ড অতি সুন্দর ও সুখবোধ্য অনুবাদ করিয়াছেন। এই উপকথার গ্রন্থ বা জাতক-গ্রন্থগুলির উপন্যাসে প্রাচীনকালে সকল শ্রেণীর লোকের সামাজিক অবস্থার যেরূপ নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঈশান বাবু প্রতি খণ্ডের প্রথমে যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে, প্রাচীনকালের সামাজিক তত্ত্ব প্রভৃতি জাতকগুলিতে যেরূপে পাওয়া যায়, তাহা অতি বিশদভাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপক্রমণিকার অংশ পড়িলে, পাঠকেরা প্রাচীন কালের যে ছবি পাইবেন, কেবল তাহারই জন্য এই গ্রন্থ পড়িলে অত্যন্ত উপকৃত হইবেন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—(১) **ধর্ম্ম-কর্ম্ম** মূল্য তিন আনা, (২) **ঊনপঞ্চাশী** মূল্য এক টাকা।—আমাদের সৌভাগ্য, যে উপেন্দ্রনাথের মত কৃতী লেখক, বোমার মোকদ্দমায় ফাঁসী কাঠ এড়াইতে পারিয়াছেন, এবং বহু বৎসর দ্বীপান্তরে আবদ্ধ থাকিবার পর দেশে ফিরিয়া সুস্থশরীরে এবং প্রফুল্ল মনে দেশের সেবা করিতেছেন। বঙ্গবাণীর পাঠকেরা এখন প্রতি মাসেই ইঁহার সুরচিত প্রবন্ধ পড়িতে পাইতেছেন। "ধর্ম্ম-কর্ম্ম" বই খানিতে সহজ ভাষায় যাহা লিখিত হইয়াছে, সকলেই তাহা পড়িলে উপকৃত হইবেন। এই পৃথিবী, এই সমাজ, এই ঘর-কন্না যে একটা ফাঁকি বা অসত্য নয়, বরং উহা যে ভগবানের গড়া খাঁটি পদার্থ—ভগবান যে একটা ধোঁয়াটে রকমের অবোধ্য নির্গুণ পদার্থ নহেন,—আর ঘর সংসারের ও রাষ্ট্রের কাজ করিয়াই যে, মানুষ ভগবানকে পায়, অর্থাৎ আপনার মাঝখানেই তাঁহাকে চিনিতে পারে, এই সকল কথাই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

কমলাকান্তের দপ্তরের পর বঙ্গ ভাষায় "ঊনপঞ্চাশীর" মত বই আর পড়ি নাই। অতি উপভোগ্য হাস্যরসে মজিয়া পাঠকেরা এই গ্রন্থে যে কত অমূল্য শিক্ষা পাইবেন,—চরিত্র গড়িয়া মানুষ হইবার যে উপাদান পাইবেন তাহা বইখানি কিনিয়া নিজেরাই দেখিয়া লউন।

রূপরেখা—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থখানির নাম সার্থক হইয়াছে। গোটা শরীরকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া ছবি আঁকা হয় নাই; কাব্য-শিল্পীর রঙ্গিন তুলিতে চমৎকার দু-চারিটি রেখা পড়িয়াছে, আর তাহাতেই বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের অনুরূপ ভাষা মধুর ও কবিত্বময় হইয়াছে।

চতুর্ব্বেদ—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন প্রণীত। মূল্য আট আনা। কল্পিত নাম ঘুচিয়া রচয়িতার নাম প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বেদের কথা লেখেন নাই, চারিটি গল্পের সমষ্টিকে চতুর্ব্বেদ নাম দিয়াছেন। লেখকের ভাষা মোটেই নিন্দনীয় নয়; তবে যে রকমের রঙ্গিন ভাষায় গল্প লেখা হয়, ইহাতে সে ভাষা নাই। একটুখানি পড়িবার পরেই গল্পের সরসতা উপলব্ধ হয়, এবং এই চিত্তাকর্ষক গল্পগুলি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করা যায়। ব্রহ্মদেশের গল্পে ঐ দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বেশ ফুটিয়াছে।

ছিটে-ফোঁটা

স্বদেশী ইমারত—'দুর্ভিক্ষ-দলনী-সভা'র সভাপতি হবার পর থেকেই হলধর খুড়োর বরাত খুলে গেছে। ঘরে বাইরে দুর্ভিক্ষ দলন ত হলোই; অধিকন্তু যা বাঁচলো তাতে বড় মেয়েটার বিয়ের খরচও কুলিয়ে গেল। এবারে তাই পরম উৎসাহে খুড়ো কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। দিন নেই, রাত নেই, খুড়ো কোমরে চাদর বেঁধে চাঁদার খাতা বগলে করে স্বরাজের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন। চারদিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বরাতের এমনি জোর, ঠিক সময়মত পুলিসের দারোগা হিসাবের খাতা পত্র ত কেড়ে নিয়ে গেলই; অধিকন্তু খুড়োর শিষ্য লোকগুলিকে ছ-মাস করে জেলে পুরে দিলে। খুড়ো খুব দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজনীতির চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে পাকা ইমারত তুলতে মনোযোগ দিলেন। খুড়োকে একদিন আড়ালে পেয়ে বললুম—'খুড়ো ছেলেগুলো ফিরে এসে যে মাথা ভেঙ্গে দেবে।' খুড়ো ঈষৎ হাস্য করে বললেন—'বাবাজী, মহাত্মাজীর কৃপায় সেটি হবার জো নেই। আদালতে যদি যেতে চায়, তা হলে বলবো তারা নন্-কো-অপারেটর নয়; আর যদি মারতে আসে, তা হলে বোলবো তারা non-violence-এর মর্ম্ম এখনো বোঝেনি। হাত তুললেই যে স্বরাজ পেছিয়ে যাবে!'

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

বিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর—(১) (ভূগোল) প্রশ্ন—টাইগ্রিস্ কি ও কোথায়? উত্তর—বাঘিনী—সুন্দর বনে থাকে। (২) (বিজ্ঞান) প্রঃ—সূর্য্য বড় না চন্দ্র বড়? উঃ—চন্দ্র বড়; কারণ সূর্য্য দিনের বেলায় আলো দেয়,—তাহা অতি সহজ কিন্তু চন্দ্র রাত্রের অন্ধকারে আলো দেয়। (৩) (ইতিহাস) প্রঃ—ওলন্দাজেরা কে ও কেন চলিয়া গেল? উঃ—উহারা রাজমিস্ত্রী আন্দাজে ওলন্ চালাইত বলিয়া কাজ জুটিল না,—তাই চলিয়া গেল। (৪) (সংস্কৃত) স্ত্রী শব্দের সম্বোধনে কি হইবে? উঃ—"ওগো!" হইবে। (৫) (রচনা) বাল্য বিবাহের দোষ কি? উঃ—দু-একটা পাশ না করিয়া ছেলেবেলায় বিবাহ করিলে অনেক টাকা পাওয়া যায় না; কাজেই দোষ ঘটে।

* * *

উঃ বা

উন্নতি চাই? এস সবাই, সুরু করি চলা;
উল্লাসেতে নাচিয়ে ধরা, চেঁচিয়ে ফাটাই গলা।
উদ্দাম পথে কোথায় গতি, ভাবিস্‌নে তুই বোকা;
উচ্চে শুধু গর্জ্জে চল, বৃদ্ধ, যুবক, খোকা।
উপ্‌ড়ে ফেল গাছের শিকড় পাকড়ে পাহাড় পীঠে;
উজাড় কর বাজার এবং ঝুপ্‌ড়ি সহ ভিটে।
উল্টে দিয়ে বিশ্বখানা নস্য করিস পরে;
উগ্র কিন্তু হোস্‌নে তোরা,—হিংসা যেন মরে।
উপোস্ করে থাকিস্, দিতে সয়তানকে ফাঁকি;
উড়বে বাধা; পড়বে খাসা আত্মারামের পাখী।
উদার বক্ষ, চওড়া পৃষ্ঠ বাড়াও ঘুষি-কীলে;
'উঃ' শব্দটি করিস্‌না কেউ, ফাটে যদি পীলে

আইন আদালত

হিন্দু-আইন—একালের আইনের ভাষায় যাহার নাম "হিন্দু-ল," তাহাতে কে কে শাসিত, সে বিষয়ে অনেক মত ভেদ দেখা যায়। হিন্দু শব্দটি এদেশের নয়,—বিদেশীয়দের অধিকারের পর ঐ শব্দের আমদানী হইয়াছে। ইউরোপে ও পশ্চিম এসিয়ায় ভারতবাসী মাত্রকেই আগে হিন্দু বলিত,—এখনও না বলে তাহা নয়; তবে এখন যাঁহারা পৌরাণিক ধর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম মানেন, তাঁহারাই হিন্দু নামে বিশেষভাবে পরিচিত। আইনের শাসনের হিসাবে কিন্তু ঐ শব্দটি অত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না; যাঁহারা বিদেশ হইতে আগত মুসলমান বা খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি মানেন, তাঁহারা হিন্দু নহেন, অর্থাৎ হিন্দু আইনে শাসিত হয়েন না, এবং যে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন জাতীয় রীতিতে ব্রাহ্মণ্য শাসন মানেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে দায়াধিকারাদি বিষয়ে সম্প্রদায়নিষ্ঠ নিয়মে শাসিত তাহারাও হিন্দু আইনের শাসনের বাহিরে। যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু আইনে শাসিত হইতেন এবং এখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম মানেন না, তাঁহারা কেবল ধর্ম্মের হিসাবে, হিন্দু নহেন, কিন্তু দায়াধিকারাদি বিষয়ে হিন্দু আইনে শাসিত বলিয়া বিচারিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্রাহ্মদের কথা উল্লেখ যোগ্য। গত মাসের 'বঙ্গবাণী'তে উল্লেখ করা হইয়াছে, যে আইনের হিসাবে ব্রাহ্মেরা হিন্দু আইনে শাসিত বলিয়া হাইকোর্ট স্থির করিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান হইলেই, তাঁহারা অন্যবিধ আইনে শাসিত হইবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বিধান আছে। এদেশের লোক মুসলমান হইলে তাঁহাদিগকে দায়াধিকার সম্বন্ধে কোরাণাদির বিধান মানিতে হয়, তবে আইনে কোন কোন স্থলে উহার ব্যতিক্রমও করা হইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশের খোজা মুসলমানেরা প্রায় হিন্দু আইনে শাসিত; এখন আবার প্রিভি কৌন্সিলের বিচারে স্থির হইয়াছে যে, মাদ্রাজের লুচ্চাই সুন্নী সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মুসলমান আইন না মানিয়া স্থানীয় ও বংশগত নিয়মে শাসিত হইতে পারেন।

গত ১৯শে জুলাই তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারিত হইয়াছে যে মালদহ অঞ্চলের দেশী নামক জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্য শাসনের অধীন না হইলেও বাঙ্গালার প্রচলিত হিন্দু আইনে শাসিত হইবে। সকলগুলি বিচারের প্রতি লক্ষ্য করিলে ধরিতে পারা যায় যে, যে সকল স্থলে এদেশের লোকেরা কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় গত বা বংশগত নিয়মে শাসিত নহে অথবা যেখানে তাহারা ভিন্ন দেশীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও সেই সেই ধর্ম্মানুমোদিত উত্তরাধিকারের নিয়ম মানিয়া লয় নাই, সে সকল স্থলে তাহারা সকলেই "হিন্দু-ল" কর্ত্তৃক শাসিত হইবে; অর্থাৎ বিশেষ নিয়ম বা বিধান না থাকিলে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণ হিন্দু-ল কর্ত্তৃক শাসিত হইবে, Indian succession Act কর্ত্তৃক নহে।

* * *

প্রতিধ্বনি

গৌরীশঙ্কর বা এবারেষ্ট আরোহণ কবির উক্তি, কবিতাতেই রহিয়া গেল; আমরা সিন্ধুনীরে যাই নাই, ভূধর শিখরেও নয়,—আর গগনের গ্রহের দিকে তাকাইবার সুবিধা ঘটে নাই। নিঃস্বার্থ কৌতূহল হইতে যে জ্ঞানের জন্ম, আর সেই জ্ঞানেই যে সর্ববিধ মুক্তি, সে কথা লইয়াও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে দেশের কৃতী পুরুষদের সঙ্গে তর্ক করিতে হয়। আমরা বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিতে পারি, যে ইউরোপীয়েরা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতেছে,—বৃথাই মেরু প্রান্তের বরফের মধ্যে গিয়া মরিতেছে, আর দূরারোহ গৌরীশঙ্করের ২৭০০০ ফীট উঠিয়াও থামিতেছে না। মৃত্যুঞ্জয় হইতে না পারিলে কোন কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ অসম্ভব; আর মরণের ভয় গিয়াছে কিনা, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এইখানে যে, সম্পূর্ণ উত্তেজনাহীন কর্ম্মে মরণকে বরণ করিয়া নীরবে অগ্রসর হইতে পারা যায় কিনা। যাহাই হউক, যাঁহারা গৌরীশঙ্করে উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ফিরিতে পাইয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহারা হিমালয় প্রদেশে অনেক প্রাকৃতিক তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন। যথা সময়ে আমরা উহার সারমর্ম্ম পাঠকদিগকে উপহার দিব।

* * *

ধ্বংসের আতঙ্ক—অতি বিস্তৃত শূন্য সাগরের অতি সূক্ষ্ম ইথরের তরঙ্গে বিদ্যুদ্‌গর্ভ "ইলেক্‌ট্রন্" জন্মিয়া অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র পরমাণু উদ্ভূত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, তাঁহারা এই পরমাণুকে ফাটাইয়া দিতে পারেন, আর তাহার ফলে আমাদের প্রয়োজন মত অনেক দুঃসাধ্য বড় বড় কাজ অতি সহজে করিতে পারেন; তবে ভয় এই যে একটি পরমাণু ফাটিলে হয়ত সকল পরমাণুই ফাটিতে থাকিবে, এবং তাহার ফলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইবে। পৃথিবীর উপাদানে এই পঞ্চভূতের কথায় সে কালের ভূতের ওঝার কথা মনে পড়ে; ভূতের ওঝা ভূতকে কাজে খাটাইতে পারিত, আর অসতর্ক হইলেই ভূতের হাতে তাহার মরণ হইত। যাহা হউক, যাঁহারা রুদ্রের মহাপ্রলয়ের মন্ত্র পাইয়াছেন, শুনিতেছি তাঁহারা এখনও কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখান নাই।

অন্যদিকে আবার একজন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এক মাস পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই ভূমিকম্পে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগ, আফ্রিকার অংশ বিশেষ, এবং আমাদের সমগ্র এসিয়া মহাদেশটি একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। বিজ্ঞানের হাটে এ রকমের কুপরিক্ষীত কথার গুজব উঠিলে লোকসাধারণের মনে বিজ্ঞানের উপর অভক্তি বাড়ে।

* * *

শত্রুজীবাণুর মরণ—আমাদের শরীরে হাজার রকম জীবাণুর বাসা; উহাদের কেহ বা শত্রু কেহ, বা মিত্র। ইটালির ডাক্তার পুন্টোনি, স্বাস্থ্য বিবরণের পত্রে লিখিয়াছেন যে,

তামাকের ধোঁয়ায় আমাদের মুখের মধ্যকার অনেক শক্রজীবাণু মরিয়া যায়। ইনি তামাক ব্যবসায়ীদের বাঁধা বৈজ্ঞানিক নহেন ত ? আর একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন যে আমাদের চোখের জলে এক রকমের সূক্ষ্ম পদার্থ আছে যাহাতে মুখের চামড়ার উপরকার অনেক শক্রজীবাণু মরিয়া যায়। আমাদের মত যাহাদের রোদনই বল, তাহারা ঐ বল বাড়াইয়া দীর্ঘ জীবন ভোগ করুন।

* * *

চাষবাসের জমি—ভারতে এখনও চাষের জন্য, বাসের জন্য অনেক জমি পড়িয়া আছে। আসামে অনেক চা বাগান হইয়াছে ; সকলগুলি চা বাগান একত্র করিলে যত জমি হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমি এখনও অব্যবহৃত পড়িয়া আছে। চাষারা মধ্য প্রদেশের যে সকল পাহাড়ে জমি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মনে করে, সেই রকমের জমির পাট্টা লইয়া একজন ইউরোপের লোক "সেসিল্ হেম্প "চাষ করিয়া ভাল জমিতে শস্যের চাষ অপেক্ষা অধিক লাভ করিতেছেন ; আর দেশের লোকেরা জ্ঞানের অভাবে হঠিয়া যাইতেছে। নিজামের মুল্লুকে ৪০,০০০০০ একার পতিত জমিতে নূতন উপনিবেশ বসাইবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। একদিকে দেখিতেছি যে, গোটা ভারতবর্ষ আমাদের দেশ মনে করিয়া দেশের যে কোন স্থানে বাস করিবার উৎসাহ আমাদের নাই, কেননা প্রদেশ বিশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছাড়িয়া সামাজিক স্থিতি রক্ষা করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব ; অন্যদিকে আবার জ্ঞানের অভাবে যাহা আছে তাহারও উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে না। আমাদের অধোগতির জন্য কেবল পরকে দায়ী করিলেই চলিবে না।

* * *

আহার্য্যাদির মূল্য বৃদ্ধি—গত জুলাই মাসে প্রকাশিত একটি ইউরোপীয় বিবরণীতে জানা গেল যে, মহাযুদ্ধের পর কি হারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে সাধারণ জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িয়াছে শতকরা ৮০ গুণ আর ফরাশী দেশে বাড়িয়াছে প্রায় ২০০ গুণ। ইহার সঙ্গে তুলনায় ভারতের ভাত কাপড়ের কষ্ট অধিক হয় নাই মনে হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকের উপার্জ্জনের পথ ইউরোপীয়দের অপেক্ষা প্রায় ১০০০ গুণ কম ; কাজেই অল্প মূল্য বৃদ্ধিতেই আমাদের দুর্দ্দশা বড় অধিক হয়। শুধু জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাত ধরিয়া তর্ক করিলে আমাদের ঘরে বসিয়া কাঁদিবার দাবীটুকুও থাকে না ; কিন্তু খাদ্যাদির দাম দশগুণ বাড়িলে যাহারা বিশ গুণ উপার্জ্জনের পথ পায়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কষ্টের তুলনা করা বিড়ম্বনা। না খাইয়া মরার কথা দূরে থাকুক, একজন কার্য্যক্ষম লোক বেকার বসিয়া থাকিলে যে দেশের রাষ্ট্র পরিচালকেরা আপনাদিগকে কলঙ্কিত মনে করেন, এবং একটা উপায় না করা পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারেন না, সে সকল দেশের কষ্টের সঙ্গে, আমাদের কষ্টের তুলনা করিতে যাওয়া নিতান্ত ভুল।

ভাদ্রে

ইউরোপের কথা।—পাঠকেরা জানেন যে, যুদ্ধ বাধাইবার দণ্ড স্বরূপে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের অনেক অংশ কাটা গিয়াছে, আর এখন অষ্ট্রিয়া দাঁড়াইয়াছে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে। টাকার অভাবে যে উহার দৈনন্দিত শাসন কাজও ভাল চলিতেছে না, এবং অতি সুন্দর বিয়েনা নগরটি ধসিয়া পড়িতেছে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি। নগর রক্ষকেরা টাকা পাইতেছেনা, শ্রমজীবীদের অন্ন জুটিতেছে না, প্রজা সাধারণও প্রয়োজনীয় টেক্স দিতে পারিতেছে না। সমুদ্রকূলে আর রাজ্য নাই বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হইয়াছে। জর্ম্মাণদের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াও আইনের বিধানে অসম্ভব ; আর জর্ম্মাণি নিজেই হয়ত বিকলাঙ্গ ও হতশ্রী হইতে বসিয়াছে।

জর্ম্মানিতে যে সাধারণ তন্ত্রের শাসন চলিতেছে তাহা উহার অনেক প্রদেশ অনাদৃত। পূর্ব্ববারে বলিয়াছি, যে একদল লোক আবার সম্রাটের শাসন বরণ করিতে চায়। এখন আবার কথা উঠিয়াছে যে, দক্ষিণদিকের প্রকাণ্ড বেবেরিয়া প্রদেশটি নাকি আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যুক্ত-জর্ম্মানিতে মিলিবার আগেকার মত স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িতে চায়। এ ইচ্ছায় স্বাভাবিকতা আছে। মনে করুন যে গোটা ভারতবর্ষে একটা সাধারণ-তন্ত্র রাজত্ব স্থাপন করা গেল আর নিজাম, বরোদা প্রভৃতি সেই সাধারণ-তন্ত্রের অধীনে পড়িলেন ; এস্থলে নিশ্চয়ই ঘটিবে, যে, যাহারা চিরকাল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজার শাসন পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা প্রজার দরের লোকের শাসন মানিতে ক্ষুণ্ণ হইবে। এদেশের ফিউডেটরী রাজ্যগুলি প্রজা সাধারণের রাজ্যের সঙ্গে মিলাইতে গেলে যেমন বিনা সম্রাট শাসন চলিতে পারে না মনে হয়, জর্ম্মানিতেও হয়ত বা বিভিন্ন প্রদেশের একত্র শাসনে সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। পদচ্যুত কাইজার বলিয়াছেন যে তিনি কিছুতেই আর জর্ম্মানির কর্ত্তৃত্ব লইবেন না।

এখন যদি জর্ম্মান রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসিয়া পড়ে তবে জর্ম্মনির গৌরবের চির অবসান হইবে। সকল দেশেরই রাজ্যনীতির অতি ক্ষুদ্র মতবাদ তিরোহিত করিয়া একদিন জর্ম্মানি উদার নীতি প্রচার করিয়াছিল ; সেদিন হয়ত আর ফিরিবে না। মনে পড়ে নবোত্থিত জর্ম্মানিতে হের্দেরের (Herder) সেই মহামূল্য বাণী—যাহারা ক্ষুদ্র জাতীয়ত্বের বড়াই করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ আহাম্মক—"Among all vainglorious men, he who is vainglorious of his nationality is the completest fool" এখনও সকলে লেসিংএর প্রাচীনোক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই—Patriotism is a heroric weakness which it is well to be without এই বিশ্ব প্রাণতার কথায় সাহিত্য ক্ষেত্রে শিলারেব কথা মনে পড়ে—"It is poor ideal only to write for one nation." সকল জাতিরই যথার্থ উন্নতির এই একই মন্ত্র ; জর্ম্মানির দুর্দ্দশার দিনে তাহার প্রাচীন জীবনপ্রদ মন্ত্রগুলি স্মরণ করিতেছি। গ্রীকে তুর্কীতে হাড়ে হাড়ে প্রাচীন শত্রুতা ;

পশ্চিম এসিয়ায় (ইউরোপীয় সন্ধির কৃপায়) স্মির্ণা দখল পাইয়া গ্রীসের খুব বাড় বাড়িয়াছে, তাই সে তুরস্ককে দুঃস্থ দেখিয়া কন্‌স্তান্তিনোপল্ দখল করিতে ছুটিয়াছিল ; ইংরেজেরা গ্রীসকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার গোস্তাগীর মূল একটুও না ভাঙ্গিয়া দিলে যখন তখন বিপদ ঘটিতে পারে।

* * *

প্রাথমিক শিক্ষা—কি পদ্ধতিতে লোক সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহা স্থির হয় নাই, স্থির হইতে হয় ত এক বৎসরের অধিক সময় কাটিয়া যাইবে ; তবুও প্রাথমিক শিক্ষার দোহাই দিয়া উচ্চতম শিক্ষার উপস্থিত প্রয়োজনের টাকা কাটা হইতেছে। যে অনুষ্ঠান হাতে লওয়া হয় নাই তাহার খরচের টাকাটা আগামী বৎসরের আয় হইতে লইলে হইত না কি ? যাহা হউক লোক সাধারণের শিক্ষার জন্য যেন জাতি ও সম্প্রদায় হিসাবে টাকা ভাগ করা না হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলিতে পারা যায় যে, পল্লীর চাষাদের বা অন্য শ্রমজীবীদের জন্য পাঠশালা খুলিবার সময় যেন মুসলমান, নমঃশূদ্র প্রভৃতির শ্রেণীর বিচার না করা হয় ; যাহারা দরিদ্র—যাহারা শ্রমজীবী অথবা চাষা তাহাদের সকলেরই এক অবস্থা,—আর সেই অবস্থার সঙ্গে ধর্ম্ম-ভেদের কোন সম্পর্ক নাই।

আর একটি আতঙ্কের কথা এই যে, কয়েকবার পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ পাঠশালা খুলিবার কথা হইয়াছিল, যাহাতে চাষা ও শ্রমজীবীদের ছেলেরা চিরদিন চাষা ও শ্রমজীবী থাকিবার শিক্ষাই পায়। প্রথমে ত চাষ প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষার স্থান, পল্লীর পাঠশালা নয় ; তাহার পর পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় বালকদিগকে জোর করিয়া শ্রেণী বিশেষে আবদ্ধ রাখিবার বন্দোবস্ত অতি কুৎসিৎ। যাহারা এখন চাষ ও শ্রমশিল্প প্রভৃতি অগ্রাহ্য করে, তাহারাও উহা শিখিবে, আর যাহারা চাষের কাজ করে, তাহারাও অন্য পথে যাইতে অধিকারী থাকিবে। কোন শ্রমের কাজ ও শিল্প যে হেয় নহে, এ শিক্ষা এ দেশের সকল লোকেরই পাওয়া চাই ; কাজেই ভদ্র-অভদ্র সকল পল্লীর পাঠ-শালাতেই এই মনুষ্যত্ব-বিধায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

* * *

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা—রঙ্গরসের সাহিত্যে বীরবল নামধারী সুবুদ্ধি ও সুপণ্ডিত প্রমথনাথ চৌধুরী যথার্থই বলিয়াছেন যে, এদেশে এক দল লোক আছেন, যাঁহারা বড় একটা জিনিস্ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিলেই সুখী হয়েন,—ফলাফলের বিচার করেন না। সৌভাগ্যক্রমে এখন এই "আত্ম-শ্রী-কাতর" সমালোচকেরা দেশের অধিকাংশের কাছেই উপহাসিত হইতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নূতন ধরণের অবস্থা ও কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারের জন্য যে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট দায়ী, এবং উহা যে ব্যক্তি বিশেষের দণ্ডার্হ অপরাধের ফল নয়, তাহা এখন প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন ;

যাহাদের মনে কোনও জিদ নাই তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় যে লক্ষ্য লইয়া অগ্রসর, তাহা, জাতির যথার্থ উন্নতি বিধায়ক ; একথাও সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রক্ষার জন্য সেড্‌লার কমিশন যখন বিশ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা দেওয়া অতি অল্প কথা। জাতীয় যথার্থ উন্নতির অনুষ্ঠানে এত অল্প টাকা দেওয়ার কথায় যে কেন এত গোল উঠিয়াছিল, তাহাই আশ্চর্য্য। এই টাকাটা যে বড় বিশেষ কিছু নয় এবং দেওয়াই উচিত, এ কথা প্রবাসী সম্পাদকও শেষটা স্বীকার করিয়াছেন, তবুও তাঁহার প্রাচীন সমালোচনার দুএকটা কথা, তাঁহার এখনকার মতের বিরোধী হইলেও, বলিতে ছাড়েন নাই। কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি।

উচ্চতম শিক্ষার আর্টস্ বিভাগের জন্য যদি পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্তই উচিত, তবে আবার ঐ বিভাগের কয়েকটি বিষয় বাদ দিয়া অঙ্গহানি করিতে বলা হইল কেন? ঐ অতি অল্প টাকাতেই যখন সকল বিষয়ের অধ্যাপনা চলিতে পারে, আর সেই বিষয়-গুলিও যখন অপ্রয়োজনীয় নয়, তখন সে বিষয়গুলি বাদ দিতে বলেন কেন? দুর্ভাগ্যক্রমে সুধী সমালোচক মহাশয় কয়েকটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়কে বাদ দিতে বলিয়াছেন ; উহার ফলে যদি একজন লোকেরও মনে ঐ বিষয়গুলি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, তবে তাহা অনিষ্টের কথা। সুশিক্ষিত সমালোচক জানেন, যে তুলনা মূলক ভাষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে নৃতত্ত্বের ও সমাজ-তত্ত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ; সেই জন্যই হয়ত দুইটিকে এক সঙ্গে বাদ দিতে বলিয়াছেন। এখন স্বরাজ সাধনার জন্য সকলেই ব্যগ্র,—প্রবাসী সম্পাদকও ব্যগ্র। এই স্বরাজ-সাধনা করিতে হইলে, যে সমাজ সংস্কারের অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? ঠিক কোন পথে ও কি পদ্ধতিতে আমাদিগকে না চালাইলে ও সমাজকে না চালাইলে,—আমাদের সকল উদ্যোগ ও কোলাহল ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা বিশুদ্ধ ভাবে না ধরিলে, যে আমাদের কৌশলে গড়া উপার্জ্জনের কলগুলিও বিকল হইয়া যাইবে তাহা কি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে? সমাজ তত্ত্বের বিশুদ্ধ মন্ত্রগুলি ভাল করিয়া না ধরিয়া লইবার ফলেই যে, কর্ম্ম-পদ্ধতি লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে, এবং অকপট হিতৈষীরা অনেকে ভ্রান্তিবশে যথার্থপথে চলিতেছেন না, তাহাত সর্ব্বাগ্রে প্রবাসী সম্পাদকেরই বোঝা উচিত ছিল। আমাদের সরলচিত্ত যুবকেরা যাহাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য-পথ না ছাড়েন, সে সংকল্পে নৃতত্ত্বের সুশিক্ষার মত অন্য কোন সুশিক্ষা নাই। প্রয়োজন হইলে কেবল এই বিষয়-টুকুর ব্যাখ্যায় অনেক কথা লিখিতে প্রস্তুত আছি। সমাজ যে কাহারও খেয়ালে গড়া নয়, অথবা কাহারও খেয়ালে ভাঙ্গে না, এবং সমাজ-তত্ত্ব শিখিয়াই যে সংস্কারের অমোঘ উপায় ধরিতে হয় তাহার যথার্থ শিক্ষা হয় নৃতত্ত্বে বা Anthropologyতে।

আজ যদি সংস্কৃত হইতে আরবী পর্য্যন্ত বিষয়গুলি বাদ দেওয়া যায় অথবা উহাদের অঙ্গহানী করা হয়, তবে কি যাহারা জাতীয় শিক্ষার নামে বড় ব্যস্ত, তাঁহারা এই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ত্যজ্য

মনে করিবেন না ? আরবী প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ফজলুল হকের মত শিক্ষিত ব্যক্তি অযথা উহার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাহউক গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহা প্রার্থিত তাহা যখন অল্প টাকা, এবং সেই টাকাতেই যখন সকল দিক পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকিতে পারে, তখন এ সকল কথা লইয়া আবার তর্ক ও বাদ বিবাদ না চলিলেই ভাল হয়।

* * *

দেশের ভাষা।—যিনি বিদ্যায় "ফাজল্" এবং দেশের "হক" রক্ষার জন্য উদ্যোগী তিনি অশুভ মুহূর্ত্তে একটু সংযম হারাইয়াই ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি কাঁচা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; দেশের সুবুদ্ধি মুসলমানেরাও ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং হয়ত শ্রীযুক্ত হক সাহেব এখন নিজেই তাঁহার ভূল বুঝিয়াছেন। তবে কথাটা একবার উঠিয়াছে বলিয়া সেই প্রসঙ্গে বিষয়টির অতি অল্প আলোচনা করিব।

কোন্ ভাষা কাহার মাতৃভাষা, কি পিতৃভাষা তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই; যাহা একটি দেশ বিশেষের ভাষা, তাহা যদি দেশের স্থায়ী অধিবাসীরা পরিহার করিতে চাহেন, তবে বিদ্যা উপার্জ্জন দূরে থাকুক, তাঁহাদের সাধারণ মানসিক উন্নতিতেও গুরুতর বাধা পড়িবে। দেশের জল বায়ুর মত, এক একটি দেশে এক একটি ভাষার অটল আব-হাওয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে; নিঃশ্বাস নিতে গেলে যেমন দেশের বাতাসই নাকে ঢুকিবে, তেমনই দেশের ভাষা মানুষকে অধিকার করিবে। কৃত্রিম উপায়ে আমাদের মন হইতে এই স্বতঃজাত ভাষাকে ফেলিয়া দিতে গেলে মন পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, যে সকল কৃতবিদ্য ও প্রতিভা সম্পন্ন দেশীয়েরা, ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাদের পরিবারে বিদেশী ভাষা চালাইয়াছেন, এবং চাকরদের সহিত কথা কহিবার সময়েও বাঙ্গলা সরাইয়া হিন্দী চালাইয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারে পিতার অনুরূপ পুত্র পাওয়া যাইতেছেনা। এ সকল স্থলে প্রতিভা বিকাশের একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে। উঁহারা যদি একেবারে চাটি বাটি তুলিয়া "হোমে" যাইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কোন গোল ঘটিত না। এই জন্যই হালে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত সম্প্রদায়ের লোকেরা যথার্থ উন্নত হইতেছেন না; ভারতের এই স্থায়ী অধিবাসীরা কাল্পনিক দম্ভে ও ভ্রান্তির মোহে পড়িয়া আত্ম সংহার করিতেছেন। এদেশে থাকিয়া কোন উপায়ে ইঁহারা বিদেশের ভাষাকে আপন করিয়া উন্নত হইতে পারিবেন না। কথাটি অতি সহজ আর উহাতে ভুল হয় অতি বেশী।

* * *

শিল্পাদির শিক্ষা।—আসাম প্রদেশ হইতে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দত্ত আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। দত্ত মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে এদেশে শিল্পাদির উন্নতি হইতেছে না এবং

আমাদের চাষী, শিল্পী, মিস্ত্রী, মজুর, মান্ধাতার আমলের কাজ করিবার পদ্ধতি হইতে বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই।" সমাজ-তত্ত্ব-বিদ্‌দের মত এই যে শিল্পাদি এক সময়ে সম্প্রদায়নিষ্ঠ হইয়াই উন্নতি লাভ করে, এবং পরে, ঐরূপ সম্প্রদায়-নিষ্ঠ হইবার ফলেই শিল্পাদির নূতনত্ব জন্মে না ও উহার উন্নতি হয় না। ইহার প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া প্রার্থনীয়, কারণ এখন এদেশে যেরূপ ব্যবসায় মূলক শিক্ষার কথা উঠিয়াছে তাহাতে পরিচালকদের ভুল ভ্রান্তি না ঘটা উচিত।

* * *

কৈবর্ত্ত জাতি—মাহিষ্য কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে বঙ্গবাণীতে দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কেন এমন হইল বুঝিলাম না। ইঁহারা স্বীকার করেন যে দক্ষিণেশ্বর বিষয়ক প্রবন্ধে সেখানকার মন্দির প্রতিষ্ঠাত্রীর নাম সসম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার কীর্ত্তির কথা প্রশংসার ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে পৌরোহিত্য গ্রহণের পূর্ব্বে যদি ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যায় করিয়াই পৌরোহিত্য গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে, ইতিহাস লেখক সে কথার উল্লেখে কোন অপরাধ করেন নাই। কৈবর্ত্ত নাম অসম্মানিত নাম নয়; তবুও প্রাচীন দাশ (দাস নহে) সম্প্রদায়ের লোকেরা মাহিষ্য নাম লয়েন কেন, ইহাই দ্বিতীয় প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধ লেখক এই জাতিনিষ্ঠ চাষের কাজকে গৌরবযোগ্য কাজই বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে পরাশর গোত্রীয় কৈবর্ত্ত মহাশয়েরা বলেন যে, অন্যান্য জাতির লোকেরা তাঁহাদের কোন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া আপনাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তাঁহারা মাহিষ্য নাম লইয়াছেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। বঙ্গের কৈবর্ত্তদের প্রাচীন গৌরব-কাহিনী লইয়া ইঁহারা যে সকল প্রবন্ধ লিখিবেন বলিতেছেন, তাহাতে বাদবিবাদের কথা কিছু না থাকিলে ভাল হয়।

* * *

তিব্বতের বিলাতী যাত্রী—ইংরেজ বৌদ্ধেরা দল বাঁধিয়া তিব্বতে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; উদ্দেশ্য—সেখানকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের খাঁটি প্রকৃতি-নির্ণয়, সাধারণ ইতিহাসের ও ভারত-ইতিহাসের লুপ্ত তথ্যের উদ্ধার, "এক-ঘরে" তিব্বতকে জগতের সঙ্গে মিলাইয়া উন্নত করা এবং নৃ-তত্ত্ব ও ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিদ্যায় আপনাদিগকে এবং সে দেশের লোককে পারদর্শী করা। আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার পূরণের জন্য যে তিব্বতের জ্ঞানের খনি না খুঁড়িলে চলে না, তাহা বিশেষরূপে জানিয়াই সার আশুতোষ অসাধ্য-সাধন করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিব্বতীয়

আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে

বঙ্গের মাতৃ-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত

বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন

সদ্যঃ কারামুক্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা। ১০২৪।২২

প্রোফেসার আনিয়াছেন, কিন্তু এদেশের কয়েকজন সমালোচক এমন-ই সমজদার, যে সেই অমূল্য কাজটিকে ক্রমাগত নিন্দনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং তিব্বতীয় প্রোফেসারেরা কোথায় কিরূপে ইংরেজীভাষায় ভুল করিতেছেন, তাহার-ই সমালোচনায় লাগিয়াছেন। বিলাতের লোকে না বলিলে যাঁহারা কিছু বুঝিতে পারেন না,—এবারে সেই পাকা স্বদেশীদের চোখ খুলিতে পারে। তিব্বত, ভারতের জ্ঞানে ও সভ্যতায় উন্নীত, এবং বহুপূর্ব্বকাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তিব্বতে ভারতে পূর্ণ মিলন ছিল। ভারতবাসীদের মধ্যে আবার বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাই বেশীর ভাগ তিব্বতে গুরুগিরি করিয়াছেন, যে কারণে দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে এ পর্য্যন্ত তিব্বতীরেরা আপনাদিগকে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের বেষ্টনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এখন সে ইতিহাসের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

তিব্বতে এদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির বিবরণ সম্বলিত যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহা ছাপাইলে "শব্দ-কল্পদ্রুম"-এর মত এক হাজার গ্রন্থেও শেষ হয় না; এই সকল গ্রন্থে বঙ্গ দেশের প্রাচীন কালের নিম্নস্তরের ধর্ম্মানুষ্ঠাদির এবং অন্যান্য ছোট খাট কথার অনেক বিবরণ ও পরিচয় আছে। আর আশুতোষের নিয়োজিত অধ্যাপকেরা বাছিয়া বাছিয়া অনেক অতি প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপীয়দের উদ্যোগে এখন যাহা আরম্ভ হইতে চলিল, তাহার আগেকার উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানের জন্য সার আশুতোষকে যাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন, এবারে দেশের লোকেরা তাঁহাদের সমালোচনার গৌরব বুঝিয়া লউন।

* * *

কারামুক্তি—দেশের জন্য মহান্ ত্যাগ স্বীকারের ফলে ছয় মাস কারাবরণ করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়গণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র নিজের স্বার্থে বলিদান দিয়া দেশের স্বার্থ মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাই কারামুক্তির পরই আবার তিনি কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ কারাগৃহ হইতেই জ্বর লইয়া আসিয়াছেন সুতরাং দেশবাসী এখনও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের কোন সংবাদ পায় নাই। দেশবন্ধুর কারামুক্তির পূর্ব্ব হইতেই তিনি কিরূপে স্বদেশের সেবা করিবেন, এই কথা লইয়া ত নিত্যনূতন জল্পনা, কল্পনা, কোলাহল ও ভবিষ্যদ্বাণী শুনা যাইতেছিল। কিন্তু দেশবন্ধু প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশের অবস্থা না বুঝিয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে এক্ষণে কোন আভাষই তিনি দিতে পারিবেন না। তবে একথা সত্য যে, তিনি আর ব্যারেষ্টারি করিবেন না। তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়ের নেতৃত্বে ভবানীপুর হরিশ পার্কে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

শুদ্ধি-পত্র *

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৭২	১ম	১ | মা -র্রা | ঘো ॰	১' | র্মা -র্রা | ঘো ॰
,,	৩য়	২ | -র্সা -া} II ॰ ॰	২ | -সা -া} II ॰ ॰
৬৭৩	১ম	0 I র্রা মা -া | 'জা নি ॰	0 I র্রা -র্মা -া | জা নি ॰
,,	৩য়	১ ২ | -ণ্া -া | -মা -প্া} I ॰ ॰ ॰ ॰	১ ২ | -ণা -া | -মা -পা} I ॰ ॰ ॰ ॰
,,	৬ষ্ঠ	২ | মরা -ণ্া I না॰ র্	২ | ম্রা -ণ্া I না॰ র্
,,	৯ম	0 | র্রা -মা মা | স ম্ মা	0 I রা -মা মা | স ম্ মা
৬৮১	৪র্থ	১৩ই মাঘ	৩রা মে

* শ্রাবণ সংখ্যার 'বঙ্গবাণী'তে 'কাজের সাড়া' শীর্ষক গানটীর স্বরলিপিতে, দুঃখের বিষয়, কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। 'বঙ্গবাণী'র সঙ্গীতপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ একটু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এ শুদ্ধিপত্রানুযায়ী স্বরলিপিটী সংশোধন করিয়া রাখিলে, বাজাইবার সময় কোনরকম অসুবিধা ঘটিতে পারিবে না।

শ্রীমতি মোহিনী সেন গুপ্তা

বাল্মীকি আশ্রমে লব কুশ

"আবার তো'রা মানুষ হ"

প্রথম বর্ষ
১৩২৮-'২৯

আশ্বিন

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
২য় সংখ্যা

বিশ্বকর্ম্মা পূজা

সরস্বতী-প্রদত্ত 'চেকে'র মূল্য বাজারে কমিতে কমিতে ক্রমে এখন এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে কমলার 'ব্যাঙ্কে' সে চেক প্রেজেণ্ট করিলে সেখানকার ম্যানেজার শ্রীযুত কুবের চাঁদ যক্ষরাজ নব্বই হইতে পঁচানব্বই পারসেণ্ট ডিসকাউণ্ট কাটিয়া লয়েন,—বি,এ, বি, এল, এম, এ প্রভৃতি চেকের এক সময়ের অতি মূল্যবান মার্কা-ও এক্ষণে জার্ম্মাণীর 'মার্কে'র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বেদান্তের নিরাকার ঈশ্বরকে যদি পৌরাণিকেরা সাকার মূর্ত্তিতে গঠিত করিয়া উপাসকের সম্মুখে উপস্থাপিত না করিতেন অথবা নিরাকারের উপাসকেরাও যদি না কল্পনায় শ্রীভগবানের চরণ, নয়ন, কর প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে জগতে ঈশ্বর পূজা থাকিত কি না এই সমস্যা যেমন সন্দেহজনক, তেমনই পুঁথিতে লেখা 'বিদ্যা অমূল্য ধন' রূপ জ্ঞানবাক্য সংসারের খাতায় একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া অঙ্কপাত না করিলে কোথায় থাকিত তোমার হ্রস্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়, কোথায় থাকিত তোমার গ্রন্থগত 'নলেজ' বা ছাত্রপূর্ণ কলেজ, এবং এদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুল নির্ব্বংশ হইলেই টোলে নিলামের ঢোল বাজিত আর ইংলণ্ডের ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের অস্তিত্ব লোপ পাইত।

বিদ্যার যে নগদ মূল্য আছে ইহা বিদ্যার্থীকে প্রথম বুঝাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে বৃত্তি দিয়া। ইউ, পির এক টাকা বৃত্তি হইতে মাইনরে চার টাকা, পরে এণ্ট্রান্সে ১০৷২০ হইতে বি, এ, এম, এতে ৪০৷৫০ পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইতে পাইতে ছাত্রের হাড়ে মাসে সংস্কার জন্মাইয়া যায় যে অমূল্য ধন বিদ্যা কেবল নগদমূল্য লাভের জন্যই প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন মাসী পিসি গুরুদেবীরা-ও যাদুকে কোলে তুলিয়া নাচাইতে নাচাইতে কাণে বীজমন্ত্র দেন "লেখা পড়া শেখে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"——ইতি গোস্বামী মতে; অথ শাক্ত মতে "পড়লে শুনলে দুধি ভাতি, না পড়লে 'অশ্লীলে'র লাথি।"

এইরূপে গাড়ী ঘোড়ার স্বপ্নে এবং বৌ-এর লাথির ভয়ে বালক বৃত্তি পকেটস্থ করিতে করিতে অন্তরস্থ পুরুষকে ভবিষ্যতে অর্থপ্রদায়ী চাকরি বা উকিলি প্রভৃতি 'বাকরি'র জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে।

এক্ষণে সেই চাকরির বা বাকরির গাছে একেবারে সার ভাঁটা পড়ায় এবং সরস্বতীর 'চেক' প্রায়ই অনেক ব্যাঙ্কেই dishonoured হয় দেখিয়া বাবাগণ ও বাবালোকগণ ভাবিতেছেন যে তাঁহারা সরস্বতীকে একখানি কুচা নৈবেদ্য উচ্ছুগ্যু করিয়া দিয়াই মহা নৈবেদ্যের আয়োজন করিবেন বিশ্বকর্ম্মার পূজার জন্য। ইংরাজী পড়িয়া জাতে উঠিবার এবং চেয়ারে বসিয়া মাসিক নির্দ্দিষ্ট নগদ মুদ্রা উপার্জ্জনের নেশাটা এ দেশে এমন জমিয়া গিয়াছে যে জাতিগত বৃত্তি অধিকাংশ বাঙ্গালীই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

'কলিকাতা রিভিউ' প্রভৃতি প্রাচীন সন্দর্ভ পত্রিকা ও অন্যান্য ইংরাজী পুস্তকে দেখিয়াছি যে সেকালের ইংরাজী লেখকেরা বাঙ্গালার নৌ বিদ্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; শ্রাবণ ভাদ্রে পদ্মাপারকারক মাঝির কৃতিত্ব চক্ষে দেখিয়াছেন এমন লোকও কেহ কেহ জীবিত আছেন; কলিকাতার নিকটে বালী কোন্নগরে মাঝিদিগের গুণপণা আমিও স্বচক্ষে দেখিয়াছি কিন্তু পদ্মা মেঘনার ভীষণ তরঙ্গ এবং 'ঘুষড়ির টাঁকে' সর্ব্বগ্রাসী বাণ যে মাঝিকুলকে উদরস্থ করিতে পারে নাই—রেল ও ষ্টীমারের বিকট বংশীরব তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়াছে। বাংলায় নৌকার অস্তিত্ব এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় প্রায় আর বাঙ্গালী মাঝি দাঁড়ী দেখা যায় না। কলিকাতার উত্তরে চিৎপুর হইতে দক্ষিণে কেল্লার নীচে পর্য্যন্ত যতগুলি নৌকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ভিতর একটিও বাঙ্গালী দাঁড়ী বা মাঝি নাই। বাঙ্গালী রাজমিস্ত্রী ছিল—হিন্দু মুসলমান দুই রকমই—এখনও এই কলিকাতার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে—প্রাচীন বাটীতে যে সকল পূজার দালান আছে—তাহা প্রায়ই বাঙ্গালী হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সে জোড়া থাম, সে খিলান, সে পঙ্কের কাজ—যাহা পাথরের ন্যায় কঠিন এবং দর্পনের ন্যায় যাহাতে মুখ দেখা যাইত, সেই সব দেবমূর্ত্তি লতাপাতা ফুল পক্ষী মৎস্য প্রভৃতির প্রতিকৃতিপূর্ণ বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত স্থপতিশিল্পের উচ্চ প্রাচ্য আদর্শ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার পরিচালিত এখনকার মিস্ত্রিদের কণিক কচিৎ প্রস্তুত করিতে

পারে। বড় বড় ইংরাজ ইঞ্জিনিয়াররা এবং তাঁহাদের দেশীয় শিষ্যগণ করিন্থিয়ান, গথিক, মূরীস প্রভৃতি স্থপতি বিদ্যার বিস্তর পরিচয় দিয়া থাকেন বটে কিন্তু সেই সব দালানের একটা খিলান ফাটিয়া গেলে অন্যগুলির সঙ্গে যোড় মিলাইয়া দিবার শক্তি ইঁহাদের আদৌ নাই। এই কলিকাতা নগরে কয়টী বাঙ্গালী সূত্রধর আর দেখিতে পান? পুরাতন ইমারৎ যাঁহারা দেখিয়াছেন বা যাঁহাদের ঘরে আজও এক আধটা সেকালের সিন্দুক বাক্স ইস্কাতর আছে, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে কি নিপুণহস্তে গোবে বাটালী চালাইয়া সেকালের ছুতারেরা কড়িকাঠের গায়ে ফুল কাটিয়াছে, তাহার মুখে সিংহ মৎস্য মকরাদি গড়িয়াছে, সিন্দুক বাক্স চৌকি প্রভৃতি কেমন মজবুত, কেমন সুন্দর, শিল্প কৌশলে কেমন বিবিধ ব্যবহারোপযোগী। বাঙ্গালী কামারকুলও প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে, কোন কোন গ্রামেও যদিও বা দুই একজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় আজও তাহারা কি সুন্দর তীক্ষ্ণধার ছুরী, কাঁচি, কুড়ুল, কাটারি, মোসকাটা খাঁড়া, মাছধরা বঁড়শী গড়িতে পারে। কোথায় গেল সেই বাগবাজার অঞ্চলের বারকামারেরা যাহারা দুই হস্তে আধমণী হাতুড়ী তুলিয়া রক্তবর্ণ তপ্ত লৌহদণ্ডকে ঘাতে ঘাতে নোঙ্গরে পরিণত করিতে পারিত? এই কলিকাতা সহরে হিন্দুস্থানী ও উড়ে নাপিতের ভিড়ের মধ্যে যা দু দশজন বাঙ্গালী নাপিত এখনও দেখা যায় তাহাদের কাছে নখ কাটিলে প্রায় পনের দিন আঙ্গুল টাটাইয়া থাকে এবং নব্য বাবুদিগের চুল তাহারা যতই বেমানানসই পাঁচচুলো করিয়া ছাঁটিয়া দেয় বাবুরা খুসী হইয়া ততই তাহাদিগকে চারি আনা হইতে ছয় আনা বাণি দিয়া থাকেন। এইরূপে বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালী মিস্ত্রী, বাঙ্গালী কারিগর, বাঙ্গালী ধোপা নাপিত আজকাল অতি অল্পই দেখা যায়; পশ্চিমের কুম্ভকার আসিয়া এখনও কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়িতে বসে নাই বটে কিন্তু চাক ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার অন্যান্য স্থানের কথা থাক এককালে বড়বাজারেরই সমস্ত দোকান বাঙ্গালীরই অধিকৃত ছিল। আজ বড়বাজার ঢুকিলে মনে হয় এটা বাঙ্গালার কলিকাতা নয় কাশীর লক্ষ্মাচৌতারায় ঘুরিতেছি।

কোথায় গেল সেই সব বাঙ্গালী দোকানী—বাঙ্গালী কারিগরের বংশধরগণ? সবাই কি মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, মোক্তারী বা আদালতের পাইকগিরি করিতেছে! না, ম্যালেরিয়াজ্বর বা দুর্ভিক্ষের করে তাহাদের বংশ একেবারে লোপ পাইয়াছে?

আমি মোটামুটি গৃহস্থ-জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় গুটিকয় শ্রেণীর কর্ম্মীর কথা উল্লেখ করিলাম এতদ্ভিন্ন চিত্রকার্য্যে, সীবনকার্য্যে, সূচী-শিল্পে বাঁশ বেত কড়ি প্রভৃতি শিল্পকার্য্যের প্রস্তর কাঁসা পিতল প্রভৃতি ধাতু এবং অনুরূপ কত কার্য্য বাঙ্গালী কর্ম্মীর করায়ত্ত ছিল। বাঙালীর অন্ন, বস্ত্র, ভোজ্যপাত্র, জলপাত্র, গৃহ নির্ম্মাণের কাঠ-কাটরা, চৌকী, পালঙ্ক, খাট, অন্যান্য গৃহ-সজ্জা, অঙ্গরাগের প্রয়োজনীয় বস্তু এক কথায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বাঙ্গালী যাহা কিছু ব্যবহার করিত তাহাই বাংলাদেশে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইত এবং জাতি-বিভাগের দ্বারা তাহাদের করণীয় কর্ম্মও বিভক্ত ছিল; জাতিগুলি নামতঃ বর্ত্তমান আছে কিন্তু

তাহাদের মধ্যে কয় জন এখন স্বজাতীয় কর্ম্ম করিতেছে ? আমার বোধ হয় এই বঙ্গদেশ এক সময়ে সম্পূর্ণরূপ আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিল বা হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অনেকেই ভাবেন আমিও ভেবেছি যে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক বাঙ্গালী পুরুষদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট শিরোভূষণ নাই কেন ? একবার আমার এক ইংরাজবন্ধু আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—আমি রহস্যচ্ছলে উত্তর দিয়াছিলাম যে, "এক বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ'দ্বারা বাঙ্গালীরা তাহাদের মস্তক ভারগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করে না।" কিন্তু আমার বোধ হয় এক সময় বাঙ্গালীরা ভাবিয়াছিলেন যে, বস্ত্রের জন্য পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেরও মুখ চাহিয়া থাকিবেন না ; বাংলা বাঙ্গালীকে যতটুকু কাপড় সরবরাহ করিতে পারে তাহাতেই তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া লইবেন ; এই জন্যই জামাজোড়া, টুপী, পাগড়ী সব ছাঁটিয়া ফেলিয়া মাত্র এক খণ্ড ধুতি ও এক খণ্ড উত্তরীয়ই ইতর ভদ্র সমস্ত বাঙ্গালীরই সামাজিক পরিচ্ছদ হইয়াছিল ; এই পাতলা উত্তরীয় বা চাদরখানি যেন বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনাইয়া দিবার নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। বাল্য-কালে আমিও দেখিয়াছি যে তখনকার প্রাচীনেরা শীতের সময় শাল বা বনাতে দেহ আবৃত করিলেও তাহার উপর একখানি কার্পাস নির্ম্মিত সূক্ষ্ম উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন ; পল্লীগ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। এই জিদ্ একদিন বাঙ্গালীর ছিল যে, প্রতিবেশী বিহার উৎকল বা আসামের নিকটেও অঙ্গ-বস্ত্রের জন্য প্রত্যাশী হইয়া থাকিব না ; আর আজকাল আমার সন্দেহ হয় বস্ত্রের কথা ত দূরে থাক্, গায়ের চামড়াখানাও বোধহয় বা স্বদেশী নয়—জার্ম্মানী হইতে আমদানি করা হইয়াছে। কোনও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যদি এরূপ একটা সাদা চামড়া আবিষ্কার করিতে পারেন যাহা আমাদের এই শ্যাম অঙ্গে লাগাইলে খোলসের ন্যায় আঁটিয়া যায় তাহা হইলে মনে হয় এখন অনেক বাঙ্গালী তাহা ভিটা বাঁধা দিয়াও ক্রয় করেন।

বিলাতী বাগ্‌বাদিনীর বদান্যতায় আমাদের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সুতরাং বিশ্বকর্ম্মার পূজার আয়োজন আমাদিগকে করিতেই হইবে। এবং প্রথমেই করিতে হইবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি যে সব জাতি ভদ্রতার অভিমানে শ্রমশীল করদক্ষতাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণকে। এই ভদ্রেরা সমাজের অতি প্রয়োজনীয়, অতি উপকারী, অতি মিতব্যয়ী, স্বল্পে সন্তুষ্ট শ্রমজীবিগণকে অবজ্ঞায় অভদ্র উপাধি দিয়াছিলেন তাহাতেই তাহারা নিজ নিজ সন্তানগণকে দুপাতা ইংরাজী পড়াইয়া জাতে উঠাইয়া ভদ্র করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ফলে আজ বাঙ্গালীর হাতে র‍্যাঁদা নাই করাত নাই হাতুড়ী নাই কাঁচি নাই তুলি নাই কর্ণিক নাই—একমাত্র আছে কলম—টাইপরাইটারী কল তাহাও কাড়িয়া লইতেছে। আলস্য ও দাম্ভকে ভদ্রতাভাষ্য করিয়া যাঁহারা বাংলার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন সেই বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, বোস, ঘোষ, দত্ত, সেনগুপ্ত মহাশয়গণকে আজ অভাবের তাড়নায়, নৈরাশ্যের বেদনায় নিজ নিজ পুত্রপৌত্রগণকে সূত্রধর

কর্ম্মকারাদির করদক্ষ শিল্প শিখাইয়া অন্নার্জ্জনের জন্য পাঠাইতে হইবে; এই সব যুবকগণ কতকটা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে করদক্ষতালাভ করিয়া এবং কুলগত সংস্কারবশে সদাচারী হইয়া যখন দেখাইতে পারিবে যে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম এবং সমাজের সমস্ত স্তরে সমাদৃত ও সম্মানিত তখন আবার কামারের ছেলে কামারী করিতে ছুতারের ছেলে ছুতারী করিতে ছুটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ কেতাবী বিদ্যাও শিক্ষা করিবে। শোনিতের সঙ্গে জাতিগত সংস্কার তাহাদের প্রকৃতিতে জড়িত থাকায় তখন বন্দ্য-বসু-সেন-সুতেরা করদক্ষকার্য্যে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে।

আমার এই ধারণা নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত নহে; প্রমাণ-স্বরূপ মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি; প্রথমতঃ যখন এদেশে এঞ্জিনচালিত তৈলের কল স্থাপিত হয় তখন কলওয়ালা হইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায় জাতিই ছিলেন; তৈলকগণের বলদ-চালিত ঘানি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থাও হীন হইয়া পড়িতেছিল। এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বংশোদ্ভূত কলুগণের দৌলতবৃদ্ধি দেখিয়া তৈলক মহাশয়দিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল—তাঁহারা তাঁহাদিগের সেভিংব্যাঙ্কে অর্থাৎ স্ত্রীর গহনায় হাত দিলেন,—বয়েলার আসিল, এঞ্জিন আসিল, উচ্চ চিম্‌নি ধূমোদ্গারে প্রচার করিল যে তৈলকগণের জাতিব্যবসায় আবার ধুমধামে চলিতেছে। এখন অনেক তেলের কলের স্বত্বাধিকারী জাতিতে তৈলক, ব্যবসায়েও তৈলক। এবং যে সব চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে দে দত্তর কল এখনও আছে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই বোধ হয় জানিতে পারিবেন যে তাঁহারা তৈলের ব্যবসায়ে লাভবান্ হইলেও জাতকলুর সহিত পাল্লা দিতে পারেন না। এই যে পারেন না ইহার কতকগুলি কারণ আছে তাহার মধ্যে প্রধান দুইটী :—প্রথম তাঁহাদের রক্তের মধ্যে সর্ষে ভাঙ্গার সংস্কার নাই, এই অমূল্য সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহারা পিতৃপুরুষের নিকট হইতে লাভ করেন নাই—আর দ্বিতীয় হইতেছে—তাঁহাদিগের ভদ্রতাভিমান, লাভের লোভে তৈলকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও ঘানির অধিকারীর ন্যায় বড়কর্ত্তা মেজকর্ত্তা নামের পরিবর্ত্তে তাঁহারা "বাবু" উপাধি গ্রহণ করেন সুতরাং অনেক স্থলে তাঁহাদিগের কর্ম্মী চাকরদিগের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যতঃ তাঁহারা তাঁহাদিগের চাকরের চাকর হয়েন। এইরূপে বাবু ক্যাবিনেট্ মেকারেরা তাঁহাদিগের সূত্রধর কর্ম্মীর মুখাপেক্ষী; বাবু টেলারেরা—তাঁহাদিগের দর্জ্জির মর্জ্জিতে চলিতে বাধ্য, বাবু "ডাইনিং ক্লিনিং"-রা তাঁহাদের উড়ে ও খোট্টা ধোপার আজ্ঞাকারী। দর্জ্জি যখন সেন মল্লিক কোং কে বলে—"এ কোটটা কি মশায় তিন দিনে তৈয়ারী হতে পারে?" তখন যদি কোং বলিতে পারেন যে—"নিয়ে এস দেখি আমার কাছে কাঁচি—দেখিয়ে দি পারে কি না," আর নিজে গিয়ে কলে বসেন তাহলে ওস্তাগরের পো তখনই বলিতে বাধ্য হয়—"দিন্ দেখি—দিন্ দেখি—চেষ্টা করে দেখি—।" আমাদের গ্রাডুয়েট অন্‌ডার গ্রাডুয়েট্ 'টেক্‌নিক্যাল্ এডুকেশান্' লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই

স্বপ্ন যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কলেজলব্ধ করদক্ষবিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা ভাল করিয়া কারিগর খাটাইয়া লইবেন—'সুপার ভাইজিং ওয়ার্ক' করিবেন—কিন্তু তা নয়—যেমন হাঁসপাতালে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া পুঁজ রক্ত শ্লেষ্মাদি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া না ঘাঁটিলে কখনই কেহ ডাক্তারী করিতে পারে না, তেমনিই যে রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া কাদায় কোমর ডুবাইয়া মাঠে খাটিতে না পারে সে কখনও কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তুমি সূত্রধরের কর্ম্ম শিখিলে হাতে নাতেও শিখিলে—তার পর যে মনে করিতেছ যে ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যানের নীচে বসিয়া সবুজ বেজ্ আঁটা টেবিলের ধারে বসিয়া ঘণ্টা টিপিয়া চাকর ডাকিবে আর মাঝে মাঝে "মধু তোমার আল্‌মারী পালিশটা হল?—কুঞ্জ যে কৌচখানা নিয়ে সাতদিন কাটালে!" এই রকম লম্বা চাল চালিবে তাহা হইবে না। তোমায় নিজে মাল্‌কোঁচা মারিয়া র‍্যাঁদা ধরিতে হইবে—নিজে বাটালী চালাইতে হইবে—এক দিকে মধু ধরিবে, অন্য দিকে তুমি ধরিবে—ধরিয়া আল্‌মারী সরাইবে, কুলী ডাকিবে না। তাহার পর বাগ্‌বাজার থেকে বউবাজারে হেঁটে যাবে হেঁটে বাড়ী আস্‌বে—নিজের গাড়ীতে ত নয়ই—ট্রামেও নয়; তোমার মিস্ত্রীদের যদি দুপুর বেলা দুপয়সা জলপানি বরাদ্দ থাকে—তুমি সদ্দার তোমার নয় আর এক পয়সা বেশী—এর ওপর নয়; আবার তুমি শিক্ষিত—হিতাহিতজ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি আছে সুতরাং—"ছুতুরে কীর্ত্তি" হইতে তুমি আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবে—দুই টাকা রোজ পাও তা ব'লে ভাদ্র সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিনে নিয়োগকর্ত্তার নিকট চার রোজের আগাম দাম লইয়া চারটী ইলিশমাছ কিনিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া হাঁড়িতে চাল নাই শুনিয়া বসিয়া পড়িবে না।

বাঙ্গালা ভদ্রলোকের ছেলেরা অল্প পুঁজিতে সামান্য ব্যবসায় করিতে যাইয়া অনেক সময়েই যে সাফল্যলাভে বঞ্চিত হয় তাহার কারণ এক তাহারা ব্যবসায় শিক্ষা করে না, কোন্ সময়ে কোথায় কি কিনিতে হয় কোন্ সময়ে কোথায় কি বেচিতে হয় তাহা জানে না, খাতা রাখিতে শিখে না,—আর শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ্যাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত অভিভাবক অভিভাবিকারা আদর ও সম্ভ্রমভ্রমে তাঁহাদের দেহমনে যে আলস্য ও দাস্যের অভ্যাস প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন বয়ঃপ্রাপ্তে তাহা ছাড়া দুষ্কর হইয়া উঠে। বাটী হইতে আট দশ মিনিটের পথ স্কুলে পাঠাইবার সময় যখন বালকের শিশুশিক্ষা ও ধারাপাত বহন করিবার জন্য তাহার সঙ্গে একটা ঝি বা চাকর ঠেকাইয়া দিই—তখন কি আমরা ভাবি যে শিশুর কি সর্ব্বনাশ করিতেছি। কলেজের আঠারো বছরের জোয়ান ছোকরাকে যখন আমি হেদোর মোড়ে ট্রামে উঠিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামিতে দেখি তখন আমার কান্না আসে। যে ছেলে বাড়ীতে কখনও একটা মশারি টাঙ্গাবার পেরেক দেয়ালে মারেনি সে কি জাহাজ ভাড়া দিয়া জাপানে যাইলেই সদ্য সদ্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া যাইতে পারে? খাট্‌তে হবে—খাট্‌তে হবে—খাট্‌তে হবে—আগে খাট্‌তে শেখ, খালি পায়ে চল্‌তে শেখ, শ্রমকে সম্মান দাও তবে টেক্‌নিক্যাল এডুকেশনের কথা ভেব। যদি কাহারও ঘরে পুরাতন গ্রাফিক্ আদি বিলাতী সচিত্র পত্রের ফাইল থাকে তবে খুলিয়া দেখিবেন যে

তাহাতে আজ যিনি পঞ্চম জর্জ্জরূপে ইংলণ্ডেশ্বর ভারতেশ্বর তাঁহার একখানি চিত্র আছে। সে চিত্র তাঁহার মানোয়ারী জাহাজে 'মিডি' অবস্থার প্রতিকৃতি,—সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র কামিজের আস্তীন গুটাইয়া কোমরে গামছা জড়াইয়া সভেলে করিয়া কয়লা তুলিতেছেন। যামিনী বাবু! আপনার নলিন ছেলেটী যত আদরেরই হোক্ যত বড় ধনীর ছেলেই হোক্ ছত্রধারী রাজার পুত্র নয় এটি মনে রাখিবেন। খাটান না একটু তারে, চাকর ত বাড়ীর ঢের আছে, কেউ ত বলবে না আপনি গরীব, দিলেই বা বাবাজী তার পড়বার ঘরটা ঝাঁট, নে গেলই বা দু'বাল্‌তী জল তুলে দোতালায়; শ্রমটা যে নীচের কাজ সে সংস্কারটা দূর হবে আর শরীরটাও বনে যাবে। বাড়ীতে ত রাজমিস্ত্রী লাগে, দেখ্‌বেন দিখি একবার মজুর মুজুরানীদের শরীরের দিকে চেয়ে। কি স্বাস্থ্য, কি বুকের ছাতি, কি সুডৌল হাতের গুলি, সর্ব্বাঙ্গের গড়নে কি সৌষ্ঠব! তারা দুধ ঘিও খেতে পায় না, ফাউল মটনও তাদের জুটে না।

যেমন স্বরস্বতী পূজার প্রারম্ভে শিশুর পঞ্চম বষে 'হাতে খড়ি' দিতে হয়; নিপুণা গৃহিনী প্রস্তুত করিতে হইলে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার কোলে পুতুলের ছেলেমেয়ে দিতে হয়, হাতে খেলা-ঘরের হাঁড়িবেড়ী দিতে হয়, তেমনি গন্ধেশ্বরী বা বিশ্বকর্ম্মার পূজার উদ্যোগেও ছেলের শৈশবেও তার হাতে খেলাঘরের দাঁড়ি বা হাতুড়ী দিতে হয়। উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্যাড দেওয়া জুতার মধ্যে পা পুরিয়া মল্‌মলের পাঞ্জাবীতে ল্যাভেণ্ডার মাখিয়া সিল্কের ছাতা মাথায় ধরিতেও যার হাতে ব্যথা হয়, সে কি আর বড় হয়ে তিসি ভূষির ধূলো মেখে ব্যবসাদার হ'তে পারে, না, করাত ধরে কাঠ চিরে কয়লা মাখা হাতে ইঞ্জিনে তেল ঢেলে মিস্ত্রী হ'তে পারে?

যাদের দফা রফা করেছি, তাদের কি সত্য সত্যিই একেবারে শেষ রফা করে দিয়েছি? আমার বোধ হয়, না। এখনকার কিশোর বা যুবকদিগের মনের যা অবস্থা দেখ্‌তে পাই তাতে অনেকটা আশা আছে; অন্ধ সংস্কারে তাঁদের জীবনরথের গতি বিপথে চালালেও তাঁরা নিজের মনের জোরে বোধ হয় এখনও মোড় ফিরিয়ে নিলেও নিতে পারেন। তাঁরা এখন স্কুল কলেজে মামুলী পড়া পড়্‌ছেন পড়ুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেলার ছলে একটু হাত পা খেলান কাজ করে একটা নূতন খেলাও খেলুন।

ইদানীং বিজ্ঞানের কথা ভদ্দরলোকের ছেলেদের হাতের কাজ শেখবার কথা, স্কুল কলেজে সভা সমিতিতে, বেড়াবার বাগানে, হাওয়া খাওয়ার পার্কে, ক্লাবে বৈঠকে চল্‌ছে। আমাদের বাল্যাবস্থায় ওসব কথার উচ্যবাচ্যই ছিল না; তবু আমরা নিজ প্রয়োজন সাধন জন্য অথবা খেলায় ধূলায় যত হাতের কাজ করিতাম, এখনকার বালক বা কিশোরদিগকে তাহার ত কিছুই করিতে দেখি না। তখন বাঙ্গলা লেখা হইত সরের খাঁক্‌ড়ায়, ইংরাজী লেখা হইত goose quillএ, দুই রকম কলমই আমাদের নিজের হাতে লেখ্‌বার উপযুক্ত করে কেটে নিতে হত; দোকান যেমন মেয়েদের সুপারি কাটা, চন্দ্রপুলি তৈয়ারী করা ঘুচিয়ে দিয়েছে, exercise বই বিক্রি করে তেমনি ছেলেদের

খাতা বাঁধার পরিশ্রমটুকুও শেষ করে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়ার বই নিজের হাতে দপ্তরীর মতই বাঁধিতে পারিত; আমারই একজন সহপাঠী ছিলেন তিনি বছর বার তেরর সময়ই বেশ বই বাঁধিতে পারিতেন; তাঁদের বাড়ীতে দুর্গা পূজা হইত; ডাক্‌ওয়ালা প্রতিমা সাজাইতে আসিলে তাহাদের নিকট হইতে লাল সালুর টুক্‌রা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। পুরাতন বইএর মলাটের পেষ্টবোর্ড প্রায় সকল বাড়ীতেই পাওয়া যাইত দুএক পয়সা দিলেই দুএক তা মার্ব্বেল কাগজ দোকানে মিলিত, অথবা আমরা শ্রীরামপুরের সাদা কাগজের উপর জবাফুল ঘষে তার উপর লেবুর রস ছড়িয়ে এক রকম গেরস্থ গোছের মার্ব্বেল কাগজ তৈয়ারী করে নিতুম—স্কুলের বই তাতেই বেশ চলনসই বাঁধা হত; কালি, কি ইংরাজী কি বাঙ্গলা কখনই বাজার থেকে কিনিনি, ঘরেই তৈয়ারী করে নিতুম।—তারপর খেলা—পাঁকাটী বা পেঁপের ডালের নল দিয়ে সাবানের ফেনা ফুলিয়ে ওড়ান একটা বৈজ্ঞানিক খেলা ছিল; মাটির পুঁতুল গড়ে বোনেরা ত খেলা কর্‌তই; আমরাও মাটির হাতী গরু প্রভৃতি হাতে প্রস্তুত করতুম। কয়টী বাল্যবন্ধু মিলে পুরা দুর্গা প্রতিমাও গড়ে আমরা খেলাঘরে পূজা করেছি। এক সময়ে স্কুলের অনেক ছেলের হাতই ঘোড়ার লেজের চুলের চেন কিম্বা একটা কর্কে ছেঁদা করে তার ওপর চারটে আল্‌পিন পুঁতে পশমের চেন্ প্রস্তুতে ব্যস্ত থাকিত; একটা ছোট পাঁকাটী ও আর একটা বড় দুটাকে কলমের মত কেটে মুখ দুটো একটু পিচ্ দিয়ে জুড়ে আমরা সাইফন্ তৈয়ারী করতুম। এক কলসী জল একটা উঁচু জায়গায় রেখে ছোট পাঁকাটীটা কলসীর ভেতর ডুবিয়ে বড় পাঁকাটীর আগাটা মুখ দিয়ে একবার টেনে দিলে সব জল কলসী থেকে ক্রমে নল দিয়ে পড়ে যেত। নস্যির ডিবের ডালা ও তলাটা ভেঙ্গে ফেলে ফর্‌মা করেছি, সেই ফর্‌মায় ইঁট গড়ে তাকে পাঁজা সাজিয়ে পুড়িয়েছি, সেই ইঁটে ঘর গড়েছি। আমার এক সহপাঠী উল্টাডিঙ্গির বারোয়ারীতে কলের সঙ্ নাচান দেখে এসে নিজে বাড়ীতে বেশ ছোট ছোট নাচুনে বাউল, পাঁটা বালির সঙ্ তৈয়ারী করেছেন। আর একটু বড় হয়ে বছর পনেরর সময় আমার আর এক সহপাঠী জোটে যিনি হাতে হেতেড়ে একটু আধটু কাজ কর্‌তে পার্‌তেন। Joyce's Scientific Dialogue বলে আমাদের একখানা বই ছিল, তা দেখে আমরা ওল্‌তার নল আর magnum bonumএর সাহায্যে Sucking pump তৈয়ারী করেছি—টিনের নল গড়ে frogging pump তৈয়ারী করেছি কিন্তু বোধ হয় ছেলেখেলা বলেই ছেলেরা এখন এসব খেলা খেলে না।

যাঁরা পড়বেন আশা করে এই ছত্রগুলি পত্রস্থ করছি আমি তাঁদের প্রায় সকলেরই ঠাকুর-দাদার বয়সী—কাজেই তাঁরা আমার ভাই, তাই বলছি ভাই, সংসারে বড় হয়ে যে খেলাই খেল, তার হাতমক্স ছেলেবেলায় ছেলেখেলা করেই করতে হবে'; দেখনা বড় ফ্যাক্টরীর বড় বয়লারের তিনশ' ঘোড়ার জোর এঞ্জিনের স্বপ্ন; বেশ ত, কিন্তু এখন একটু ছোট বয়লার টিনের এঞ্জিন নিয়ে খেল; আঠার বছর বয়সে আপনাকে এত বুড়ো ঠাওরাও কেন? পুরুষ বুড়ো বুড়ো মনে করলেই বুড়ো হয়ে

যায়—A woman is as old as she looks herself, a man is as old as he thinks himself ;—এই ত ছুটোছুটি করে কাদায় আছাড় খেয়ে ফুটবল খেল, পল্লীগ্রামে সকলেরই বাড়ীতে ত একটু কাদা মাটি আছে, কলকাতায় বড়মানুষের বাড়ীতেও এখনও সব সিমেণ্ট নয়—মেদিনী দেখা যায়—একটু কোদাল ধরে কোপাও না,—দুটা লাউ, কুমড়া, শশা পোঁত না। একখানা তাতাল একটু রাঙ্ বাড়ীতে রেখ। ঘটী বাটী ঘড়া ফুটো হচ্ছেই একটু চেষ্টা কর্‌লেই বেশ তাতে রাঙ্ঝাল দিতে পার্‌বে। প্রথম প্রথম নাই-ই হল অত পরিষ্কার, পিসিমা মানা করে শুনো না, একখানা কর্ণিক যোগাড় করে রেখো। সিঁড়ি রক টকের দু'একখানা ইট খসে গেলে বা বারাণ্ডার সিমেণ্ট চটে গেলে রাজমিস্ত্রী ডেকো না। একখানা ছোট করাত, একটা ছোট হাতুড়ি, একটা ত্রিপুণ, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, একখানা বাটালি তোমার চোখ তৈয়ারী কর্‌বে, তোমার হাত তৈয়ারী কর্‌বে, বাড়ীর পয়সাও কতক বাঁচিয়ে দেবে।

সব ইংরাজ বাবাই তাঁদের ছেলেদের এক একটা ছোট একসেট কারপেণ্টার সেট্ কিনে দেন ; Ferret workএর এক সেট যন্ত্রও কিনে দেন ; মেয়েদের ছোট চায়ের সেট, Doll's house, খেলনার drawing room suit, tea সেট্, সেলায়ের হাজিফ্ বাক্স, রঙের বাক্স এসব কিনে দেন। টিনের সেপাই, টিনের Cavalry সোওয়ার, টিনের গোলন্দাজ নিয়ে ইংরাজ বালক যুদ্ধের খেলা, ঘরের টেবিলের উপরে আরম্ভ করে। আমরা খেলি চোর চোর, ইংরাজেরা সেটাকে বলে hide and seek খেলার ছলেও চোর হতে নেই। তামসা করেও মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই। একদিন আমাদের খেলা ছিল তীর ধনুক নিয়ে রাম রাবণের যুদ্ধ করা, মোগল পাঠানে যুদ্ধ করা, খেলা ঘরের চড়ক করে ছোট ভারা থেকে ঝাঁপ খাওয়া আর এখন আপনাদের খেলা যে আমরা আপনার করে গড়ে নেবো এ মাথাও জাতের ভেতর একটা নেই, ছেলে-মেয়ের খেলনাও ধার করবার জন্যেও চৌরঙ্গী চরণে চুমিতে হয়।

প্রবন্ধ বন্ধ করবার সময় এসেছে আর গোটা দুই কথা বল্‌লেই এখনকার মতন ছুটী পাই ও ছুটী দিই। আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার প্রধান দোষ হয়েছে শুধু সংযমের অভাব নয়, অসংযমের আধিক্য; বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিলাস, দুশ্ছেদ্য উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হয়ে জাতির উদ্বন্ধনের পন্থা প্রশস্ত করে দিচ্ছে। এই বিলাসিতা বিদূরিত করিতেই হইবে, পিতা পিতামহকে জোর করিয়া সংযমী হইতে হইবে তাহা হইলে পুত্র-পৌত্র আপনা আপনি সংযম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিবে। শিক্ষককে সংযমী হইতে হইবে কর্ত্তব্য পরায়ণ, পরিশ্রমী, সত্যবাদী হইতে হইবে তবে ছাত্রের হৃদয়ক্ষেত্রে সকল সৎপ্রবৃত্তির বীজ উপ্ত হইবে ; দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শিক্ষাদাতা জগতে নাই, দৃষ্টান্তের দ্বারা যাহা শিক্ষা হয়, রসনার ভাষায় তাহা কখনই হইতে পারে না।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

দেবীর নৌকায় আগমন—ফলং শস্যবৃদ্ধি

বাংলার নবযুগের কথা

সপ্তম কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—দ্বিতীয় অধ্যায়

(১)

স্বাধীনতার নামেই কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গিগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে মহর্ষি নিতান্ত স্বাদেশিক ছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদ হইতেই সংগৃহীত হয়। কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন গ্রন্থ প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা বেশী উদার করিবার চেষ্টা হয়। রাজা রামমোহন জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের পরস্পরের বৈরিতা নষ্ট করিয়া একটা উদার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র রাজার সেই ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসকলের মধ্যে একটা সমন্বয়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রাজা এই বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়া তাহাদের মধ্যে যে মিলটুকু ছিল, তাহারই উপরে তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এরূপভাবে একপ্রকারের মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু এপথে সত্য সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। রাজা সে চেষ্টা করেন নাই; সে চেষ্টা করিবার সময়ও তখন আসে নাই। কেশবচন্দ্র এই সমন্বয়ের চেষ্টাই করিয়াছেন। যে পথে কেশবচন্দ্র এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন হইয়াছিল কিনা, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে এই ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা ঠিক প্রাসঙ্গিকও হইবে না। তবে কেশবচন্দ্র এই সমন্বয় করিতে যাইয়া ভারতবর্ষের এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একটা অতি বড় স্বাধীনতার সনন্দ দিয়াছিলেন, একথাটা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বলা নিতান্তই প্রয়োজন। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার ইতিহাসে ইহা অতি বড় কথা। প্রথম কথা ছিল, আমার ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম সকল মিথ্যা। দ্বিতীয় কথা হইল, আমার ধর্ম্ম সত্য, অন্য ধর্ম্মসকল একেবারে মিথ্যা নহে, তাহাতেও সত্য আছে; জগতের সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কথা ছিল। এই সূত্র ধরিয়াই বেদ ও উপনিষদাদি ছাঁকিয়া তাহার সত্য সংগ্রহ করিয়া মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করেন। এই সূত্র অবলম্বনেই কেশবচন্দ্রও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের "শ্লোকসংগ্রহ" রচনা করেন। সত্য ও অসত্য মিশ্রিত শাস্ত্র হইতে সত্যগুলিকে বাছিয়া লইতে হইলে সত্যের একটা কষ্টিপাথর আবশ্যক হয়। মহর্ষি এবং

কেশবচন্দ্র উভয়েই নিজের বিচার-বুদ্ধিকে এই কষ্টিপাথররূপে ব্যবহার করেন। সকলে এ কষ্টিপাথর গ্রহণ করিবে না, করিতে পারেও না। এইজন্যই জগতে এত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র পরজীবনে সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, এই মতকেও ছাড়াইয়া যান। নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি কহেন, জগতের সকল ধর্ম্মে কেবল সত্য আছে, তাহা নহে, জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য; নিজ নিজ অধিকারে নিজ নিজ দেশকালপাত্র-বিবেচনায় সকল ধর্ম্মই সত্য। সকল ধর্ম্মই ভগবদ্‌প্রতিষ্ঠিত। সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের বিধান। এইরূপে কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্ম্মকেই একটা অতি বড় স্বাধীনতার সনন্দ প্রদান করেন। যতক্ষণ না জগতের ধার্ম্মিকেরা এই সূত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ কিছুতেই নষ্ট হইবে না। সত্য অসাম্প্রদায়িকতা এইভাবেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। আধুনিক ভারতের জাতীয় একতা ও জাতীয় জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ভিত খুঁড়িয়াছিল মাত্র; কেশবচন্দ্র 'সকল ধর্ম্মই সত্য' এই সূত্র প্রচার করিয়া সেই পবিত্র মিলন-মন্দিরকেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। হিন্দু যেদিন বুঝিবে, তার নিজের ধর্ম্ম তার নিজের নিকটে যেমন সত্য, বৈজিক নিয়মাধীনে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারাতে তাহার ব্যক্তিগত সাধন ও সিদ্ধির সঙ্গে এই ধর্ম্মের যেমন অতি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ মুসলমানের নিকটে মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টীয়ানের নিকট খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ও জৈনের নিকটে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ সত্য, ঐ সকল ধর্ম্মের আশ্রয়েই তাহারা নিজেদের জীবনে ধর্ম্ম সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ করিবে; সেইদিন ভারতবর্ষে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ নিরস্ত হইয়া আধুনিক ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বের একটা বিরাট স্বাধীনতার ভূমিতে আমাদের জাতীয় একতা গড়িয়া উঠিবে। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অধিকারে নিজ নিজ দেশকালপাত্রভেদে সকল ধর্ম্মই সত্য, এই উদার ভূমিতেই সমুদয় সাম্প্রদায়িক বিরোধ নষ্ট হইতে পারে। কেশবচন্দ্র এই সূত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্য ভাবেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পথ খোলসা করিয়া গিয়াছেন।

(২)

কিন্তু কেশবচন্দ্র মহর্ষির সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধরিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও গুরুতর বিরোধ প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেশবচন্দ্র অল্পদিন মধ্যেই "প্রেরিত মহাপুরুষ-বাদ" প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। "যীশুখৃষ্ট—য়ুরোপ ও এসিয়া" এই বক্তৃতা দিবার পরে অনেকে ভাবিল কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয়ান হইয়া যাইতেছেন। লোকের এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তিনি ইহার কিছুদিন পরে "মহাপুরুষ" বা "Great Men" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি

কহেন যে জগতে পরিত্রাণের সম্বাদ প্রচারের জন্য মাঝে মাঝে মহাপুরুষেরা প্রেরিত হন। ইঁহাদের দ্বারাই জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইঁহারা ঈশ্বরের অবতার নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যীশু যেমন একজন এই শ্রেণীর প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ আরও অনেকে ছিলেন। সক্রেটিশ, বুদ্ধ, মহম্মদ সকলেই 'প্রেরিত মহাপুরুষ' ছিলেন। এই বক্তৃতার দ্বারা, কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয়ান হইয়া যাইতেছেন এই আশঙ্কা দূর হইল বটে, কিন্তু ইহার দ্বারাই ভিতরেই আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ রোপিত হইল। কেশবচন্দ্র ক্রমে নিজেকে 'ঈশ্বর-প্রেরিত' বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারকদল প্রকাশ্যভাবেই এই মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মেরা দেখিলেন যে ব্রাহ্মসমাজেও ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য আবার একটা নূতন আয়োজন হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্র ক্রমে 'আদেশবাদ' অর্থাৎ সাধকেরা ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন, এবং ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া তাঁহারা যে কর্ম্ম করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্মসঙ্গত, এ বিষয়ে প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধির সমালোচনার অধিকার নাই,—এই মতবাদও প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রবৃত্তি-মূলক সহজ কর্ম্মচেষ্টাকে ধর্ম্মের নামে সঙ্কুচিত করিয়া প্রাচীন বৈরাগ্যের আদর্শও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাও আর একটা বিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র নানাদিকে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাই এই সংস্কারের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন—এ সকলের চেষ্টা হয়। ক্রমে এখানেও বিরোধ বাধিয়া উঠিল। একদল ব্রাহ্ম স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে দেশ-প্রচলিত অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। মহর্ষির কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহিলাদিগের যাইবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে পর্দ্দার আড়ালে মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। ক্রমে একদল ব্রাহ্ম নিজেদের পরিবারের মহিলাদিগকে এইরূপ পর্দ্দানসীন করিয়া রাখিতে রাজী হইলেন না। যাহাতে ইঁহারা পর্দ্দার বাহিরে বসিতে পারেন, ব্রহ্মমন্দিরে তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। এই লইয়া কেশবচন্দ্র ও তাঁহার প্রচারকদিগের সঙ্গে ইঁহাদের বিষম বিরোধ বাধিয়া উঠিল। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সংগ্রামের অধিনায়ক ছিলেন। স্বাধীনতাবাদীরা জয়লাভ করিলেন বটে; ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য প্রকাশ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; কিন্তু এ বিরোধের বীজ নষ্ট হইল না। ফলতঃ এই সংগ্রামটা কেবল স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়াই ছিল না। ইহার মূল কারণ ছিল, কেশবচন্দ্রের একনায়কত্ব বা একাধিপত্য। মহর্ষিকে ছাড়িয়া আসিবার সময় কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-পরিচালনায় একরূপ

গণতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সময়ে ব্রাহ্ম সাধারণের প্রকাশ্য সভায় কেশবচন্দ্রের নিজের রচিত এই মন্তব্যটী গৃহীত হয়।

"Whereas the trustees of the Calcutta Brahmo Samaj have taken over to themselves the charge of the whole property of the said Samaj and the connections of the public with the said property have ceased, and whereas the money subscribed by the public should be spent with the consent of the public, it is resolved at this meeting that the subscribers or members of the Brahmo Samaj be formally organised into a society, and that subscriptions be spent in accordance to their wishes for the propagation of Brahmoism."

এই আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসাধারণের এক প্রতিনিধি সভাও গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কাজে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপরিচালনায় এই গণতন্ত্র আদর্শ গড়িয়া উঠিতে পারিল না। কলিকাতাসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও সেইরূপ কেশবচন্দ্রের একতন্ত্র-শাসন বা অটোক্র্যাসি (autocracy) প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মেরা এই জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত "সমদর্শী" নামক বাঙ্গলা পত্র এই প্রতিবাদী দলের মুখপত্র হইল। যে যুক্তির ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধির বা conscienceএর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল, "সমদর্শী" সেই আদর্শেরই প্রচার করিতে লাগিল। এই পত্রের লেখকেরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল মতবাদের উপরে প্রখর যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্যাসত্যের বিচার করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর আছেন কি না, ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা কি, প্রার্থনার যুক্তিযুক্ততা এবং উপকারিতা, পরলোক আছে কি নাই, ধর্ম্মের এই সকল মূল প্রশ্ন লইয়া ইঁহারা নির্ভীকভাবে সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র যে বৈরাগ্যের সাধন করিতেছিলেন এবং যে ভাবুকতাপ্রবণ ভক্তিবাদ ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহারাও তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র যে নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই জন্য 'প্রেরিত মহাপুরুষবাদ' ও 'ঈশ্বর আদেশবাদ' প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মমতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, "সমদর্শীর" দল সেই নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকেই ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যেও একটা রক্ষণশীলতা ছিল। এই রক্ষণশীলতার প্রেরণায় তিনি ধর্ম্মনীতির নামে মানবপ্রকৃতির সহজ স্বাধীনতাকে কোনও কোনও দিকে আটকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও একটা স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। কুচবেহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইলে এই বিরোধটা ফুটিয়া উঠে। এবং মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজ একদিন যেমন ভাঙিয়া দুইভাগ হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ ভাঙিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। কেশবচন্দ্র স্বাধীনতার সংগ্রামের সেনানায়করূপেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিলে, বিশেষতঃ তিনি যে পরিমাণে ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মজীবন-গঠনে যুক্তিকে বর্জ্জন করিয়া বিশ্বাসকে আশ্রয় করিতেছিলেন, সেই কারণে ও সেই পরিমাণে দেশের শিক্ষিত সাধারণের উপরে তাঁহার প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। ব্রাহ্ম মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়াও সেকালে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে স্বাধীনতার সাধকরূপে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ সে শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। এই জন্য কুচবেহার বিবাহের পরে ব্রাহ্মসমাজে যখন আবার একটা স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, তখন দেশের শিক্ষিত লোকমত স্বাধীনতার পক্ষপাতী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুকিয়া পড়িল। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে লাগিল।

(৩)

ব্রাহ্মসমাজে যখন এইরূপে ভাঙ্গাভাঙ্গি ও ভাগাভাগি হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারিদিকে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংস্কার-কার্য্যে ব্রাহ্মেরা দেশের রাজপুরুষদিগের সহানুভূতিলাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের সঙ্গেই এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ ছিল। হিন্দুসমাজ যথাসাধ্য ব্রাহ্মদিগকে নির্য্যাতনও করিতে ছাড়েন নাই। ব্রাহ্মেরা দেখিলেন যে হিন্দু যদি দেশের রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে খৃষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে রোমক সাম্রাজ্যে খৃষ্টীয়ানদিগের যে দশা হইয়াছিল, এই হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মদিগেরও সেই দশাই হইত। ইংরাজরাজ এ দেশে প্রত্যেক প্রজাকে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়াই ব্রাহ্মেরা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলিতে পারিতেছেন। ইংরাজ-রাজপুরুষেরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের এই সংস্কার-ব্রতের প্রশংসা করিতেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা প্রথম প্রথম ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যখন কেবল ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অল্পে অল্পে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের প্রতিবাদিগণ অনেকেই একটা সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁদের কেহ কেহ সেকালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও নায়কত্বলাভ করেন।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ভারতসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। কুচবেহার বিবাহের বৎসরেই (১৮৭৮) ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভারত-সভার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভারত-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইহাঁরা সকলেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, ইঁহারা তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে নূতন স্বাধীনতার আদর্শ যতটা না প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাহা তদপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়ের মধ্যেই একটা গভীর স্বদেশ-প্রেমেরও প্রেরণা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে সর্ব্ব-প্রথমে স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত উপাসনা প্রণালীতে জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে প্রথম প্রথম সামাজিক উপাসনাতে স্বদেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। এ সময়ে তিনি স্বদেশের মুক্তি-কামনায় যে সঙ্গীত রচনা করেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে বোধ হয় সেইটীই একমাত্র স্বদেশী সঙ্গীত। এখনকার ব্রাহ্মেরা সেই সঙ্গীতটী প্রায় ব্যবহার করেন না বলিয়া লোকে তার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এইজন্য সেই সঙ্গীতটী তুলিয়া দিলাম।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারত ভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তার করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্য্যামি জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে দেখি শুভক্ষণে
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন॥

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথাই ভাবি নাই কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। নূতন ব্রাহ্মসমাজে আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে

ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নমুনা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের আমেরিকার এবং ফরাসীসের রাষ্ট্রীয় শাসন-যন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া তাহারই ছাঁচে আমাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Constitution (কনষ্টিটিউসন) গড়িবার চেষ্টা চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা কেবল একটা সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মসমাজই গড়িয়া তুলিতে চাহি নাই। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ যে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বা Stateএর আসনে যাইয়া বসিবে, গোটা দেশটা ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্র ও ধর্ম্মসমাজ এক হইয়া উঠিবে এরূপ অদ্ভুত কল্পনাও করি নাই। কিন্তু স্বাধীনতার এবং মানবতার সাধকরূপে ব্রাহ্মসমাজ যেমন একটা আদর্শ-পরিবার ও একটা আদর্শ-সমাজের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সেইরূপ সেই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা আদর্শ রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রও গড়িয়া তুলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। এইভাবের প্রেরণাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কনষ্টিটিউসনের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কনষ্টিটিউসনের একটা ছোট খাট নমুনা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মেরা গণতন্ত্রতা মক্স করিবে। দেশের লোকেও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর ভিতর এই গণতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ লাভ করিবেন। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অতি উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাও বিস্তার করিতে পারিবেন। নিজেদের কর্ম্ম-দোষে এ আশা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু এইজন্য চেষ্টার মূল্যও নষ্ট হয় নাই।

(৪)

ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভিতরে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আর কাহারও মধ্যে ততটা ফোটে নাই। প্রথম যৌবনাবধি এই স্বাধীনতা এবং মানবতাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল উপাদান হইয়াছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জন্মিয়া, পরানুগ্রহে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া, শিবনাথ শাস্ত্রী সেই শিক্ষাকে কোনও দিন নিজের সাংসারিক উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করেন নাই। মহর্ষি এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ধনসমৃদ্ধির মধ্যে জন্মিয়া বাড়িয়া-উঠিয়াছিলেন, জীবনে "গুণরাশি-নাশী" দ্রারিদ্র্য-দুঃখ যে কি ইহা ভোগ করেন নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী ইচ্ছা করিলে ধনকুবের না হউন কিন্তু সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে অনায়াসে দিন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে কোনও দিন তাঁহার লোভ ছিল না। তাঁহার নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা। তাঁহার নিকটে এই স্বাধীনতাই ধর্ম্ম ছিল। প্রথম বয়সে তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন; হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে হেয়ার স্কুলে পড়িয়া থাকিতে হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়া

পড়িয়াছেন, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার অবসর লইবার কথা। তিনি অবসর লইলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে শিবনাথ শাস্ত্রীই প্রতিষ্ঠিত হইতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। আর সেখান হইতে ক্রমে তিনি যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে যাই বসিতেন, এ কথাও ঠিক। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী এই লোভে পড়িলেন না।

স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই তিনি ছটফট্ করিতেছিলেন। সময়ে আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতায়, শিশিরকুমারের অমৃতবাজার, বিদ্যাভূষণে সোমপ্রকাশ, এবং অক্ষয়চন্দ্রের সাধারণীর লেখায়, বঙ্গদর্শনের ও আর্য্যদর্শনের আলোচনায় রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এবং নবীন চন্দ্রের কবিতায়, দীনবন্ধু এবং উপেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনে নাটকে এবং কলিকাতার ন্যাস্ন্যাল্ থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেমের বন্যা ছুটিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্ম্মসাধনে ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাকেই রাষ্ট্রী শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার সাধকেরা এই স্বদেশপ্রেমকে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের এই স্বাধীনতার সাধকদিগের অগ্রণী হইয়া উঠেন।

এই সময়েই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশ-চর্য্যের প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটা ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—"স্বায়ত্ত-শাসনই (তখনও স্বরাজ-শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।" অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্ত-শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্ম্মতঃ তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। "তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল—"আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্ব্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।" তৃতীয় কথা ছিল—"লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।" চতুর্থ কথা ছিল—"অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।" পঞ্চম কথা ছিল—"আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন বা রক্ষা করিব না; যে যাহা অর্জ্জন করিবে তাহাতে সকলের

সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"

শাস্ত্রী মহাশয় তখনও হেয়ার স্কুলে পণ্ডিতী করেন। এইজন্য প্রথম দীক্ষার দিনে তিনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার ছয়মাস পরে সরকারের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া তিনি নিয়মমত দীক্ষা লইয়া এই দলভুক্ত হয়েন। দলটা যে খুব বড় ছিল তাহা নহে। স্বর্গীয় কালীশঙ্কর সুকুল, হেলেনা কাব্য, মিত্রকাব্য, ভারতমঙ্গল প্রভৃতি রচয়িতা স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র, সেকালের ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী, (ইনি এখন ব্রজবিদেহী শাস্ত দাস নামে ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত), শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এবং আমি—আমরা এই কয়জনই প্রথমদিন এই দীক্ষাগ্রহণ করি। ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়, ইঁহারা এই দলভুক্ত হয়েন। ইহা ১৮৭৬-৭৭ ইংরাজীর কথা। আমরা এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলিই যে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, একথা বলিতে পারি না। যে কমিউনিসিমের (Communism) আদর্শে আমরা এই দলটা বাঁধিতে গিয়াছিলাম, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণ অর্থভাণ্ডারে নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থ দান করিব, এবং সেই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনোপযোগী বৃত্তি লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব,—এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের দীক্ষাগ্রহণের কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মসমাজে কুচবেহার বিবাহ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সমাজের আচার্য্য ও প্রচারক নিযুক্ত হন। সমাজের কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে আমাদের এই দল-গঠনের প্রতি তিনি আর মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। আমরাও অনেকে অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থী যুবকমাত্র ছিলাম। সুতরাং এই দলটী আর গড়িয়া উঠিল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে যে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের পানে ছুটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের সে মুক্তধারা আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই দেশের উপরে তাহার প্রভাবও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ একদিন এদেশে এই যুগে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, ইতিহাস কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

অমিতাভ

নমি অমিতাভ বুদ্ধ-বিভূতি, হে মূর্ত্ত ত্যাগ, করুণাময়,
সত্য-সন্ধ বিবেক-দীপকে নিখিল-কুহেলি কর গো ক্ষয়।
কোন্ পশুঘাত যজ্ঞ-শালায় খড়্গের তলে লুটালে শির,
উপাড়ি' ফেলিলে যূপদারু-মূল, নিছিয়া মুছিলে বলি-রুধির।
বাজালে শঙ্খ বিসর্জ্জনীর, অলকার ভোগে দিলে বিদায়,
কুমারের আঁখি, প্রেয়সীর রাখী টলাতে তোমারে পারিনি হায়।
'ফল্গু'-বেলায় গহন গুহায় মৌন-হাসিটি ধ্যান-মগন,—
জটাজূটে তব বাকল-জোয়ানে নীড় বেঁধেছিল চাতকগণ।
নিরঞ্জনার অভিষেক-জলে কবে সারা হ'ল অবগাহন?
আভীরা মেয়ের পরম-অন্নে হ'লে প্রসন্ন, ভয়-বারণ।
জীবনের মরু-নিদাঘ জুড়ালে ত্রিতাপহরা সে চন্দ্রিকায়,
বিশ্ব-বোধনী মহাবেদ-বাণী মুক্ত অশোক-পূর্ণিমায়!
নমি নির্ব্বাণ-তন্ত্রের ঋষি, তোমার তপের ভর্গ-দীপ
ফলিত গৌরীশঙ্কর-চূড়ে উজলি' পূরব-অন্তরীপ।
বাজিছে মৈত্রী জয়-জয়ন্তী, পুণ্য পবনে পাবন গীত,
শত মঠে শত হৈম-দেউলে আরতি তোমার বিধাতৃজিৎ।
তিমির-হরণ রসাঞ্জনে গো অকলুষ করি' দাও এ চোখ,
সপ্ত-দ্বীপার পদ্ম-বেদীতে দীক্ষা তোমারি ধন্যা হোক্।
স্বপ্নাহতের তন্দ্রা টুটিলে পলাবে স-লাজে অলীক দুখ;
মায়া-সরসীর মরীচি-পানীয়ে জুড়ায় কি কভু তিয়াষী বুক?
দুঃখ কখন্ অ-দুঃখ হয়? দ্বিধা-চঞ্চল কাঁপে না প্রাণ!
সৎ-ধরমের পূর্ণ স্বরাট্ কর' 'ভিক্ষু'রে বর-প্রদান।
কোথা এ 'চড়াই'-'উৎরাই' শেষ? পথের আরতি কোথা ফুরায়?
আচম্বিতে সে যবনিকা-পট খসে' পড়ে এই নটলীলায়।
বাসনার বীজে ভ্রূণ-রূপে আর কে চায় হইতে পুনর্জাত?
কোথা জ্বালামুখী শিখা নির্ব্বাণ? দাও জয়-ধ্বজা হে মহাতাত।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

হারানো খাতা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আশা রেখো মনে, দুর্দ্দিনে কভু নিরাশ হ'য়োনা ভাই,
কোন দিনে যাহা পোহাবে না, হায়, তেমন রাত্রি নাই।
রেখো বিশ্বাস, তুফান বাতাসে, হ'য়ো না গো দিশাহারা,
মানুষের যিনি চালক, তিনিই চালান চন্দ্র তারা।
রেখো ভালবাসা সবার লাগিয়া ভাই জেনো মানবেরে,
প্রভাতের মত প্রভা দান করো, জনে, জনে, ঘরে, ঘরে।

—তীথরেণু

কলিকাতা মহানগরী এক্ষণে সুপ্তিমগ্ন। সেই নিয়ত কর্ম্ম কোলাহলময়ী রাজধানীর মধ্যে এক্ষণে কদাচিৎ একটা শব্দ শোনা যায়। পথ প্রায় জনহীন; ভাড়াটে গাড়ী কচিৎ একখানা ষ্টেশনের পথে বাহির হইয়াছে, অথবা ফিরিতেছে। একটা মাতাল কোথাও স্খলিতপদে গ্যাস-পোষ্টে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। দু'একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী এবং হাতের 'বেটন' এক আধ বারের মত রাস্তার উপর দেখা গেল, তাহার জন্য কিন্তু গলির মধ্যের কোকেনের দোকানে কোন ব্যস্ততাই দেখা গেল না।

বড় রাস্তার উপরকার প্রায় সকল দোকানই বন্ধ, একখানা ময়রার দোকানের সাম্‌নে তখনও আলো জ্বলিতেছে এবং ভিয়ান তখনও বন্ধ হয় নাই তার তাড়ু চালানর খরখরানি শোনা যাইতেছে। কোন সময় হয়ত একখানা চলন্ত মটর সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে থিয়েটার ফেরৎ নরনারীদের হাস্যকৌতুক অকস্মাৎ একবার যেন অন্ধকারের বুকে আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়ার মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কদাচ পকেটে ষ্টেথিস্‌কোপ রাখিয়া কোন ডাক্তারবিশেষ কোন রোগীর জন্য আহুত হইয়া ছুটন্ত মটরে বসিয়া আছেন দেখা গেল।

বড় বড় সাহেবী হোটেলের ও দেশী বিদেশী থিয়েটার বাড়ীগুলার সাম্‌নে গাড়ী মোটর কতকগুলা করিয়া তখনও জমিয়া আছে। উর্দ্দিপরা আর্দ্দালীরা সোফারের পাশে বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুনীবদের দল আহার অথবা বিহারে মত্ত, তাঁদের কাছে রাত্রির খবর পৌঁছিতেছে না; দুরবস্থার একশেষ এই গরীব ভৃত্যের জাতির। তাদের রাত নির্জ্জন পথের ধারেই পোহাইবার উপক্রম করিতেছিল।

আরও এক জায়গায় কিছু আলো, কিছু শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। একটু বড় রকম বাড়ীর সাম্‌নে সাম্‌নে এক আধখানা গাড়ী মোটরও দাঁড়াইয়াছিল। সেগুলা ইংরাজ বাঙ্গালী মাড়ওয়ারি ভাটিয়াল সকল জাতির।

গঙ্গাতীরে এখন কল কারখানা ও ষ্টীমার ষ্টীমলঞ্চের ঝক্‌ঝকানি ফোঁসফোঁসানি সব নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই তীরের বড় বড় আফিস বাড়ীর জানালা দরজা সব বন্ধ, নিরালোক এবং স্তব্ধ। সারাদিনের কঠোর শ্রমের পর যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যগুলা তাদের বিপুল দেহগুলাকে যেখানে সেখানে মেলিয়া দিয়া ঘুমে এলাইয়া পড়িয়া আছে। কে জানে কখন বাঁশির উর্দ্ধস্বরে সারা সহরকে চকিত করিয়া দিয়া জাগ্রত হইবে!

নিরঞ্জন এই সমস্ত দীর্ঘ পথ নীরবে অতিবাহিত করিয়া আসিল। এক পাশে বিপুলায়তন গড়ের মাঠ, হীরক ও মরকত মণির মালা গলায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে। 'অপ্সরজাতীয়' নরনারীর রূপের আলো, পোষাকের চমক সেখানে আর ছিল না। 'ইংরাজের স্বর্গোদ্যান' স্তব্ধ স্থির। 'কিন্নরের' কণ্ঠরব আর তথা হইতে শ্রুত হইতেছিল না। গন্ধর্ব্বলোকের সকল জাঁকজমক ঘুমের কোলে-চাপা পড়িয়াছে। কেবল জলের বুকে জাগিয়া আছে শুধু নৃত্যশীল তারার মালা, আর একখানা মহাজনী নৌকার বুকে জাগিয়া জাগিয়া একটা চাটগেঁয়ে মাঝি তাললয়বিহীন এক অপূর্ব্ব রাগিনীর সৃজনতৎপর হইয়াছিল। নিরঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া সেই গীত সুধা উপভোগ করিল—

"এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপকুলে, চাঁদের হাট মিলাইত গো—
সেরূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো ও—ও—ও——।"

রস ইহাতে যতই থাক না থাক, নিরঞ্জনের অন্তরের পিপাসা যেন অকস্মাৎ ভরিয়া উঠিল। ওই যে পশ্চিম বঙ্গের নিকটে অনাদৃত উপহসিত উহাদের পক্ষে একটুখানি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় এই জনসম্পদশূন্য নিঃসঙ্গ রাত্রে ওই নিরক্ষর মাঝি নিজের মনের ভাবটী কাহারও কাছে নয়, শুধু নিজের কাছেই প্রকাশ করিতেছিল; নিরঞ্জনের বোধ হইল উহার ভিতর দিয়া সে যেন সাহেবের আফিস হইতে বাহির হইয়া নিজের বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছে। এই উচ্চারণের বৈসাদৃশ্য, এই শব্দ বিকৃতি, এ যে তার বুকের মণি, এই যে তার মায়ের দান। সে কাঙ্গালের মত উৎকর্ণ হইয়া রহিল কিন্তু গায়কের তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর শুধু রহিয়া রহিয়া ঐটুকুকেই ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল। গান আর অগ্রসর হইতে পাইল না।

নিরঞ্জন কিনারায় কিছুক্ষণ পাইচারী করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। ততক্ষণে চাটগেঁয়ে মাঝির সঙ্গীতসাধনা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণভাবেই সমুদয় বিশ্বচরাচর নিঝুম নিস্তব্ধ এবং নিদ্রিত। ভোরের আলো লাগিয়া আকাশের তারাগুলা শুদ্ধ যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। গঙ্গার জল মূর্চ্ছাতুরের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে।

নিরঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিল, আপনাকে আপনিই বুঝাইতে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, "কিছুতেই ভুলতে পারচিনে কেন? অথবা নাই বা ভুল্লেম, মন কেন আমার স্থির হচ্চে না? আমি তো তার অহিতাকাঙ্ক্ষা করিনি, তার ভালই চেয়েছিলুম, আমার জন্য আমার সেবা করতে গিয়ে তার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে গেল, এতে আমার তো হাত ছিল না। তবে কেন নিজেকে তার হত্যাকারী বলে মন আমার নিজের কাছেও মহাপাপীর মনের মতন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে, জীবন দুর্ব্বহ হয়ে পড়েছে।"

চারিদিকে কেবল সেই ছায়া—সেই ছায়াই দেখছি। তার কণ্ঠ নিয়তই কানে বাজ্‌ছে। একি হলো আমার! কালীপদ! ভাই! বন্ধু! তোমার শেষ অনুরোধ রাখতে পারিনি বলেই কি এমন করে পাগল হয়ে যাচ্ছি? চেষ্টা তো করেছিলুম, বিয়ে করবো, সুখে যথাসাধ্য রাখবো ইচ্ছাই তো ছিল, পারলুম না সে কি আমার হাত? কেন আমার এ দণ্ড? সব তো হারিয়েছি, নিজেকে শুদ্ধ, তবে শুধু তাকেই দেখি কেন? এবার আর স্বপ্ন নয়! বাস্তব মূর্ত্তি ধরেই সে দেখা দিচ্চে। কিন্তু কি কুৎসিত কি জঘন্য কি সঙ্কটের পথ দিয়েই তার ছায়া আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে! ওঃ কার মধ্য দিয়ে, কার! আর কি কোন রাস্তা সে পেলে না? নাঃ, আর সইতে পারচিনে! পালিয়ে তো এসেছি, আর ফিরবো না, একেবারেই পালাই! কোন দিন হয়ত কি বলেই বসবো। নিজেকে তো আমার বিশ্বাস কত! না হলে আমি এই এণ্ট্রেন্স, এফে, অনার নিয়ে বি এ পাশ, ফার্ষ্ট ক্লাশ এমে ——

অ্যাঁ—এই কি সেই আমি? নাঃ, নিশ্চয় না। নিশ্চয় সেই আগের আমি মরে গেছি। এ তার——কে?——

নিরঞ্জনের প্রতি লোমকূপটী পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ অবোধ শিশু যেমন ভূতের ভয়ে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, তেম্‌নি করিয়া নিজের সঙ্গকে সে একান্ত ভয়ে অসহ্য বোধ করিয়া যেন নিজের কাছ হইতে পালাইতে চাহিয়াই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। ছুটিতেও আরম্ভ করিত, হঠাৎ তাহার কাণে যেন দৈববাণীর মতই কোথা হইতে সেই বিজন নদীপুলিনে এক মানবকণ্ঠের স্বর ভাসিয়া আসিয়া ঠেকিল। আকুল হইয়া কান খাড়া করিতেই বোঝা গেল, সে একটা গান এবং নদীতীরেই তাহার নিকট হইতে সামান্য একটুখানি দূরে থাকিয়াই কেহ সে গান গাহিতেছে। বংশীরবাকৃষ্ট সর্পের মতই সে শব্দ লক্ষ্যে অগ্রসর হইল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে, শব্দ হইতেছিল কল কল কল। জল কিনারায় অনেক দূর অবধি উঠিয়া আসিয়াছে। স্রোতের মুখে দূরগামী পণ্যবাহী কয়েকখানি নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাদের দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল ছপ্পাৎছপ্‌। নিরঞ্জনের ভয়ার্ত্ত বক্ষ চিরিয়া একটা আশ্বাসের আর্ত্তশ্বাস উঠিয়া পড়িল।

গান গাহিতেছিল একজন স্ত্রীলোক এবং ওই বিদ্যায় কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও নিরঞ্জন স্পষ্ট বুঝিল এ শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট দখল আছে। গানটা এই——

"যে জানে আনন্দময়ী! তোমাকে।
ও সে কি অন্তরে কি বাহিরে আনন্দময় সব দেখে।
যারা দুঃখে হয় ব্যাকুল, ভাবে বিপদের নাই কুল,—
তারা জানে না সে গাছে কেবল ফুটিতেছে ফুল ;—
সংসার নিরানন্দের ফুল—
শেষে আনন্দময় ফল পাকে।"—

নিরঞ্জন এক পা এক পা করিতে করিতে কোন্ সময় একেবারে ইহার গায়ের কাছে গিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটী ইহার সঘন নিশ্বাসের শব্দে বারেক চাহিয়া দেখিল ; তারপর ঘাড় ফিরাইয়া হাত দশেক দূরের একটা গাছ তলায় তাহার বিশ্বাসী দ্বারবানকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে যে গান গাহিতেছিল তাহাই গাহিতে থাকিল। নিরঞ্জনকে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার পাগল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় নাই। সে গাহিল—

"বিপদ সম্পদের তরে, দিতে পরম পদ তারে,
ওমা, বিপদ নৈলে জন্মান্ধ জীব ডাকে না তোরে ;—
মা, তোর করুণার ফল কেবল, জাগায় অবোধ বালকে।"—

এ গান শুনিয়া নিরঞ্জন চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আচম্‌কা বলিয়া উঠিল, "একি সত্যি কথা, না খালি গান ?"

মেয়েটী গান বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি সত্যি কথা বাবা ?"

কম বয়সী মেয়েটীর মুখে এই গম্ভীর সম্বোধনটী তাপদগ্ধ ছন্নছাড়া নিরঞ্জনের আরও মিষ্ট লাগিল। সে মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিয়া আবার ছেলে মানুষের মতন প্রগলভ্ প্রশ্ন করিয়া বসিল। "ওই যে বল্লেন, "বিপদ সম্পদের তরে", একি সত্যি ?"

নারী কহিল, "হ্যাঁ বাবা! খুব সত্যি।"

নিরঞ্জন কহিল "আপনি কখনও বিপদে পড়ে কি এর সত্যতা যাচাই করে নিতে পেরেছেন ?"

সে কহিল, "পেরেচি বই কি! বিপদ সঙ্গে করে নিয়েই তো আমি জন্মেছিলুম, কিন্তু দিনকের দিন যত বিপদ ঘন হয়ে এলো, ততই সম্পদও নিকটতর হতে লাগ্‌লো। শেষে যখন সর্ব্বনাশ এসে আমায় গ্রাস করতে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এম্‌নি সময় একেবারে তিনি ছুটে এসেই আমায় কোলে তুলে নিলেন। এই যে গাইচি শুনুন না।"—

এই বলিয়া সে পুনশ্চ গাহিতে লাগিল—

" পড়ে বিপদের ফাঁদে, ছেড়ে সংসারের সাথী
যখন কাতর প্রাণে, কুসন্তানে মা' বলে কাঁদে—
তখন, ত্বরায় গিয়ে কোলে নিয়ে স্তন্য সুধা দাও তাকে।
মাগো, তবে আর এ সংসারে আনন্দ নাই বলে কে ?"

নিরঞ্জন নিস্পন্দ হইয়া গান শুনিল, তারপর বিমোহিতভাবে সে ঐ অপরিচিতা মেয়েটীর দিকে মুখ ফিরাইয়া উহাকে বলিল, "তোমায় আমার মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করচে! মার মতন তুমি আজ আমাকে, যে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলুম, সেই মহাশিক্ষার মধ্যে হাতে ধরে টেনে এনে দিলে।"

মেয়েটী জোড়হাত নিজের কপালে ঠেকাইয়া জবাব দিল, 'মা' হবার যোগ্যতা আমার একটুও নেই। তবে আপনি আমার বাবা। মেয়েকেও তো লোকে আদর করে 'মা' বলে, সেই হিসেবে আমায় আপনি 'মা'ই বলবেন! আমার নাম সুষমা। আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এক একদিন এখানের খোলা হাওয়া আর আমার বড় মায়ের রূপ দেখতে আসি। থাকি কিনা আদি গঙ্গার ছোট্ট মাটীর বুকে। আপনিও হয়ত আমার মতই উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই এসেছেন। আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগছে। আপনি এখন বাড়ী যাবেন তো ? আমিও তাহলে এখন বাড়ী যাই।"

নিরঞ্জন মুগ্ধ হইল, একটু যেন সে তৃপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমিও খুব বিপন্ন হয়েছিলে বল্লে। তোমার কথার ভাবে বোধ হলো আজও তোমার সে বিপদের মেঘ সম্পূর্ণ কাটেওনি। কিন্তু তুমি তো বেশ শান্তভাবেই কথা বল্‌চো,—সংসারকে শ্মশানের পরিবর্ত্তে আনন্দ-কানন বলেও উল্লেখ করতে তোমার বাধছে না! আমি যে তা ভাবতেও পারিনে।"

সুষমা বলিল, "দেখুন, আনন্দ তো বাইরে পাবার জিনিষ নয়, আর কুড়িয়ে বেড়াবারও বস্তু নয়। ওটাকে নেই নেই ভাবতে ভাবতে ওটা একেবারেই মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়। আর আছে আছে জপ করতে করতে নিজের মনের মধ্য থেকে সে সহস্রদলে বিকশিত হয়ে ওঠে। আমার সাধুজী আমায় এই রকম করেই ভাবতে শিখিয়েছিলেন। আহা, আবার যদি আমি তাঁকে ফিরিয়ে পেতুম! সংসারে কতই যে শেখবার রয়েছে। কিছুই তো শিখতে পেলুম না। ছার মেয়ে হয়ে জন্মেছিলুম, তাও আবার একেবারেই অধমের চেয়েও অধম হয়ে!"—

ভোর না হইতেই কলিকাতা মহানগরীর নিদ্রাভঙ্গ আড়ম্বরেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকজন গাড়ী ঘোড়া মটর রিক্‌সা হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। এখানে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁটাইতেছে, ওখানে আবর্জ্জনার স্তূপ বোঝাই হইতেছে। দোকান ঘরের দরজা জানালা খটাখট খোলা হইতেছে, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা আসা যাওয়া করিতেছে। রাতভিখারীরা ঘরের পানে এবং

ভোরের কীর্ত্তন গাহিয়া বৈরাগী বৈষ্ণব বা বাউলেরা ফুটপাথের উপর চলাচল করিতেছিল। ফলের ঝুড়ি, মাছের বজরা মাথায় লইয়া ও দুধের ভার কাঁধে বহিয়া মুটেরা বাজারের দিকে চলিয়াছে। নিরঞ্জনকে এত ভোরে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া রাজবাড়ীর দ্বারবানেরা কিছুই বিস্ময় বোধ করিল না। এ বাড়ীর সবাই জানে সে পাগল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মরমে পেয়েছি পরশ মাণিক সোনা হয়ে গেছে মন।

—তীর্থরেণু

পড়াশোনা চুকাইয়া দিয়া নিরুপদ্রব শান্তি উপভোগ করিতে করিতে একদিন পরিমল হঠাৎ চমকভাঙ্গা হইয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে নরেশের মুখ আজকাল বেজায় গম্ভীর হইয়া থাকে এবং তিনি ইদানীং তাহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরিমল যুক্তি দিয়া স্থির করিল যে ওটা ঠিক বৈরাগ্য নহে, ক্রোধই হইতেছে উহার উচিত অভিধান। নিরঞ্জনের ছাত্রাবস্থা হইতে ছুটী লওয়ায় তিনি তাহার উপর চটিয়াছেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ তিরস্কারকে সে অত্যাচার বোধ করিয়া মনে মনে নিজেও রাগ করিত, অভিমান করিত; কিন্তু তাহার নিছক ভয় ছিল তাঁহার ওই নিস্তব্ধ ক্রোধের মৌন অভিনয়কেই। সে জানিত, মনের ভিতর হইতে রাগ না করিলে তেমনটা প্রায়ই ঘটিত না। যেহেতু সমস্ত উদার স্বভাবের লোকের মতই নরেশের মনে বড় অল্পেই ঘা লাগে। পরিমল ভয় পাইল।

'কর্ণধার' প্রেসের ম্যানেজার গাদাখানেক কাগজপত্র লইয়া আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব তর্কাতর্কি করিয়া এই সবে মাত্র চলিয়া গিয়াছেন। নরেশের একখানা 'তরুণ' নামক মাসিক পত্র এবং একখানা 'নবীন জগৎ' নামক সাপ্তাহিক ছিল। এই সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে দুজনে একটু মতের অনৈক্য ঘটিতেছে। ম্যানেজার সেদিন এমন একটুখানি আভাস দিলেন তার ভাবটা যেন নরেশ তাঁহার স্বাধীন ও নির্ভীক ভাব সর্ব্বদা বজায় রাখিতে চাহিলে উঁহার এখানে চাকরী করা একটু অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, এই রকমেরই। নরেশ এই বিষয়েই কিছু ভাবিতেছিলেন।

পরিমল আসিয়া প্রবেশ করিল।

"নিরঞ্জনের কাছ থেকে এই এক্ষুণি পড়া শেষ করে এলেম। ওর কাছেই আমি পড়বো, তুমি রাগ করো না৭"

নরেশ একটা অপ্রিয় আলোচনার পরেই অপ্রিয় চিন্তার (এবং শুধু এই একটীই নয় আরও

অনেকগুলারই) হাত হইতে মুক্তি পাওয়ায় হয়ত মনের মধ্যে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্যানুভবই করিলেন। চোখ না ফিরাইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কই না, রাগ তো করিনি।"

পরিমল তাঁহার গা ঘেঁসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল "তা বই কি, রাগ নাকি আবার তুমি করতে বাকি রেখেছিলে! কদিন ধরে দেখাই পাইনে, কথাই কও না; আবার বলা হচ্চে, রাগ করেননি! মাগো! এম্‌নি করেই কি তা বলে শাস্তি দিতে হয়? ওর চাইতে যে কান মলে দেওয়াও ঢের ভাল ছিল।"

নরেশ নিজের মনের চিন্তা তন্ময়তায় যে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যে ত্রুটী ঘটিতে দিয়া ফেলিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া মনে মনে লজ্জিত ও ঈষৎ দুঃখিত হইয়া পড়িয়া তাহার হাত দুটি নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া দিলেন ও তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিবারভাবে কহিলেন, "এসো তাহলে কান মলেই দিই।" এই বলিয়া তাহার লজ্জায় রাঙ্গা কর্ণমূল দুই আঙ্গুলে ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

পরিমল ওইটুকু আদরেই একেবারে গলিয়া পড়িল। তারপর অনেকখানি দানের একটু একটু প্রতিদান কাড়িয়া ছিনাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল "বল রাগ ভাল হয়েছে বল? রাগ করোনি বল্লে তো আমি মান্‌বোনা, আমি জানি যে তুমি আমার উপর খুব বেশী রকম রাগ করেছিলে। এত শীগ্‌গির যে আমায় আদর করবে সে আমি ভাব্‌তেই পারিনি!"

নরেশ তখন আদরের গৌরবে গরবিনীকে আর একটু 'উপরি' পাওনা পাওয়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আহা, এমন জান্‌লে না হয় একটু রাগ করেই থাকতুম যে! তা আমার রাগটা কেন হয়েছিল বলো তো? আচ্ছা দাঁড়াও মনে করি। নাঃ পারলুম না। তুমিই মনে করে দাও দেখি। কিন্তু দেখ, যেন মিথ্যে যা' তা' বলে দিও না।"

পরিমলও এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে লুটোপুটি খাইয়া শেষে বলিল, "উনি রাগ করে জব্দ করবেন, আবার উল্টে তার হিসেব নিকেশ করতে হবে আমাকেই। মজা তো বড় মন্দ নয়! আমি বল্‌বো কেন?"

নরেশ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল "বেশ মশাই, বেশ! না হয় বল্‌বেন না। না হয় এবার থেকে আমার রাগের হিসাব রাখবার জন্যে আর একটা হিসাবনবিশই রেখে দেবো, তার জন্যে আর হয়েছে কি।"

পরিমল আর এক চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিল, তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিলে পর স্মরণ করাইয়া দিল যে, সেদিন সে নিরঞ্জনের কাছে আর পড়িবে না বলিয়াছিল, এবং তারপর হইতেই নরেশের মুখ ভার ভার দেখা যাইতেছে।

নরেশ তখন যেন চমকভাঙ্গা হইয়াই বলিয়া উঠিলেন "ওহো তাও তো বটে! তাহলে এখন তাকে নিয়ে কি করা যায় বলো দেখি? তা ওকে তুমি যদি বরখাস্তই করলে তাহলে না হয় ওকেই আমার রাগ কর্ব্বার হিসাব রাখবার জন্য রাখাই যাক্ না কেন? একটা কাজ তো ওকে দিতে হবে।"

হাস্যের কল ঝঙ্কারে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিমল বেদম হাসি হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ তাই দাও। আমি হরির লুট মেনেচি, তুমি ওকে যাতে নিজের কাজে লাগাও তারই জন্যে। তা হলেই তোমার হিসাবের কড়ি আর বাঘেও খেতে পারবে না।"

নরেশচন্দ্রও প্রথমটা তাহার হাসিতে যোগ দিলেন, তারপর একটু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন "সত্যি কি নিরঞ্জন বড্ড বেশী অন্যমনস্ক?"

"তুমি দিন কতক পরীক্ষা করে দেখ। তোমার পায়ে পড়ি।"

নরেশ কহিলেন "তাই দেখবো, প্রেসের ম্যানেজার বোধ করি চল্লো। যে কদিন নতুন না পাই ওকেই সঙ্গে নিয়ে চালাবো।"

পরিমল পরম পরিতোষ লাভ করিল, সম্বন্ধটা অন্য রকম না হইলে হয়ত বলা যাইত প্রাতর্বাক্যে তাঁহাকে রাজা হওয়ার জন্য আশীর্ব্বাদ করিল। তা অবশ্য করিল না; কিন্তু বিশেষ রকম যত্ন করিয়া সে স্বামীর কপালের ঘাম নিজের শান্তিপুরে সাড়ীর আঁচল দিয়া মুছিয়া দিল। 'কত ঘামচো?' বলিয়া ঘরে ইলেকট্রিক পাখা খোলা থাকা সত্ত্বেও নিজের আঁচল ঘুরাইয়া তাঁহাকে হাওয়া দিতে লাগিল এবং আরও পতি সেবার কি কি খুঁটিনাটি সমাধা করিতে মনোনিবেশ করিয়া দিল, তার খবরে কাজই বা কি?

কিন্তু দুদিন যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পারা গেল যে, নিরঞ্জনের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়ার মধ্যে অসুবিধা তার যতই থাক, বুঝি আনন্দও একটুখানি ছিল। সেই আপনাভোলা অসহায় ও নিঃসঙ্গ জীবটীকে সে যে ঘণ্টাখানেকও একটুখানি কাজ দিয়া রাখে; এইটুকু হইতেও সেই কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসরের ক্লান্ত জীবনটীকে বঞ্চিত করা তার কাছে হঠাৎ যেন চৌর্য্যের মতই অপরাধজনক ঠেকিল। আর এই অবসরে এই বিপুল রাজপ্রাসাদের অসংখ্য দাসদাসীবর্গের দ্বারায় উৎপীড়িত উপদ্রুত মানুষটীকে সে যে কতকটা রক্ষা করিয়াও চলিতেছিল, সেইটুকুকে হারাইয়া ফেলায় তার মন আজ পীড়া বোধ করিতে লাগিল। আহা, ভাগ্যচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে কি নিপীড়িত কি ভীষণরূপেই নিপীড়িত সে; আর কি তাকে পীড়ন করিতে দিতে আছে? নিজের স্বামীর মহত্ত্ব অনুভব করিয়া সেদিন এম্‌নি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, রাত্রে নরেশ শয়ন করিতে গেলে, সেও আর এক দিক দিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। নরেশের মন যদিও সে সময় পত্নী সম্ভাষণের ঠিক অনুকূল ছিল না,—বড়ই চিন্তাম্লান ও ভারাক্রান্ত—তথাপি স্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "এসো।"

স্ত্রীর সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটুখানি ত্রুটী বোধ থাকার কুণ্ঠাতেই তাহার 'পরে সময় সময় আদরের মাত্রাটা কিছু বেশী করিয়াই বর্দ্ধিত করিতে হয়, সেখানে নিজের শরীর মনের আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই চলে না।

পরিমল আসিয়া ঢিপ করিয়া তাঁহার পায়ে একটা প্রণাম করিল, আর একদিনকার একটা

অবিস্মৃত দৃশ্য স্মরণ করিয়া নরেশের হৃদ্‌পিণ্ড প্রমত্তবেগে দুলিয়া উঠিল, তিনি কষ্টে সংযত হইয়া উহাকে নিজের বুকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ধরিলেন।

"ঈস্!—আজ হঠাৎ এত ভক্তি কেন?"

"অভক্তিই বা কবে ছিল? ভক্তিভাজনকে ভক্তি করবো না?" বলিয়া পরিমল স্বামীর আদরটুকু নিঃশেষে উপভোগ করিয়া লইল। নরেশ তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—"আমি বলবো, কেন প্রণাম পেলুম?"

পরিমল বলিল "বল তো দেখি?"

"আদর খাবার জন্যে।"

"যাও, হ্যাঁঃ,—তা বই কি?" পরিমল এই অনুযোগ জানাইলেও নিজের পাওনা গণ্ডা ছাড়িয়া যাইবার কোন ত্বরা দেখাইল না। "তা'হলে নিরঞ্জনের চেলাগিরি ছাড়িয়ে দিয়েছি বলে?"
"তাও না।—ভাল কথা। নিরঞ্জন তোমার কাজ করচে কেমন বল তো?"

"চমৎকার! নিরঞ্জন যে এতটা বিদ্বান তা আমি মনেও করতে পারিনি। ইংরাজী বাংলায় হিসাবে পত্রে সকল দিক থেকেই ওর সমান শক্তি। বি, এ, এম, এ পাশ না করলে কখনই অমন হ'তে পারে না, অন্ততঃ অতদূর পড়া চাই। কে জানে ওর কি রহস্য! একি কোন দিনই জান্‌তে পারা যাবে না?"

কথাগুলা নরেশচন্দ্র পরিমলের চেয়ে বোধ করি নিজের মনকেই শুনাইতে চাহিয়া বলিলেন।—

"যত ওকে দেখ্‌ছি ততই নূতন নূতন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্চি! ও যেন সত্যিকার সারনাথ বা সাঁঞ্চির ভগ্নস্তূপ। বাহিরেরটা সব মাটির ঢিপি হয়ে গেছে। কিন্তু যতই খুঁড়ে তোল, অভিনব অভিনব ভাস্কর্য্যের আবিষ্কারে মন যেন বিস্ময় সাগরে কুলহারা হয়ে যায়! ও' কে? কে জানে ওর পরিণাম কেমন করে অমন হলো!"

সহসা বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতই কোন্ কথা স্মরণে আসিয়া পরিমল স্বামীর বক্ষে চঞ্চল হইয়া মুখ তুলিল, "ওর একখানা ডায়ারি আছে। আমি দেখেছি ও তাতে কি সব লেখে। সেইখানা পেলে হয়ত ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়।"

অবিশ্বাসের মৃদু হাস্যে নরেশচন্দ্রের অধর কুঞ্চিত হইল। "তুমি যেমন পাগল!—পাগলের আবার ডায়ারি! আর থাকলেই বা ও আমাদের সে দেখাবে কেন? তাহলে তো সব বলতেই পারতো।"

পরিমলের মনের মধ্যে যাই থাক, তাহা প্রকাশ না করিয়া মুখে সেও সায় দিল "তা বটে।" কিন্তু সেটা তার মনের কথা নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয়

বাঙ্গালীর জাতি ও কুল পরিচয় লইবার পূর্ব্বে একটা বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। তাম্রলিপ্তি বা তমোলুক ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব হইতে একটা শ্রেষ্ঠ সাগর-তীর্থ বা বন্দর বলিয়া প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। চীন-জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ হইতে সাগরপথে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে তমোলুকেই সকল জাহাজ ভিড়াইতে হইত। ভারতবর্ষ হইতে সাগরপথে প্রাচ্য দেশে যাইতে হইলে এই তাম্রলিপ্তির বন্দরে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হইত। বালী-লম্বক, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপসকল এবং ব্রহ্ম, শ্যাম, কোচীন, এনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি প্রদেশ সকল পর্য্যটন করিলে এবং ঐ সকল স্থানের হিন্দু ও বৌদ্ধ ভগ্নস্তূপ সকলের পর্য্যবেক্ষণ করিলে এখনও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারতবর্ষ হইতে এই সকল দেশে ভারতবাসীর গতাগতি ঘন-ঘন হইত; অনেক ভারতবাসী ঐ সকল প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ঐ সকল দেশের বহু নর-নারী ভারতবর্ষে আসিতেন। তাম্রলিপ্তি এই গতাগতির দ্বারস্বরূপ ছিল। ফলে বাঙ্গালা দেশ এই নর-প্রবাহের প্রণালীস্বরূপ ছিল। উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা প্রাচ্য দেশে যাইতেন, তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন; প্রাচ্য দেশ হইতে যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, অথবা বিদ্যা এবং ধর্ম্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালায় কিছু কালের জন্য অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার তমোলুক ভারতবর্ষের পূর্ব্বদ্বারস্বরূপ ছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধ যুগে এই গতাগতি প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তমোলুকও তখন সভ্য-জগতে একটা বড় বন্দর বলিয়া গ্রাহ্য ও মান্য হইত। তমোলুকের কল্যাণে বৌদ্ধ কালের সকল সভ্যদেশের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতা, মানবতা প্রভৃতি সবই সর্ব্বাগ্রে বঙ্গদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইত। বাঙ্গালী সে সকলের রসাস্বাদন করিয়া লইলে, অনেক বিদ্যা এবং তত্ত্ব আত্মসাৎ করিলে পরে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ ও প্রাদেশিক জাতিসকল তাহার ভাগ পাইতেন। তমোলুক বাঙ্গালীকে একটা অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়া রাখিয়াছে। সে বিশিষ্টতা এখনও আমরা হারাই নাই, এখনও সূক্ষ্মভাবে তাহা আমাদের প্রকৃতিতে গ্রথিত রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবকালে জাতি-বিচার এবং বর্ণ-বিচার তেমন সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। এখন মুসলমানদের মধ্যে যে পদ্ধতি অনুসারে বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্য নষ্ট করা হয়, গোড়ায় বৌদ্ধগণও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জাতি ও বর্ণের একাকার সাধন করিতেন। এই একাকারের খেলা মগধে এবং বঙ্গে পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালায় "বাশিষ্ঠ্য পদ্ধতি" অনুসারে পীত মঙ্গোল জাতি সকলের সহিত বাঙ্গালার আদিম দ্রবিড় জাতির এবং মুষ্টিমেয় আর্য্যজাতির বৈবাহিক আদান-প্রদান সাধারণভাবে চলিয়াছিল। বশিষ্ঠ নামের একজন তান্ত্রিক সাধক বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন ; তিনি বজ্রযানী বৌদ্ধ-সমাজের নেতৃপুরুষ ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা দিয়া যান যে, পূর্ণাভিষিক্ত ভারতবাসী তান্ত্রিক বৌদ্ধ স্বচ্ছন্দে চীনে, ভুটিয়া, অহম প্রভৃতি জাতীয়া যুবতীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন ; অবশ্য এমন নারীকে প্রথমে সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে, তবে তাহার সহিত শৈব-বিবাহ করা চলিবে। বাশিষ্ঠ্য পদ্ধতিতে নারীর গোটাকয়েক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল লক্ষণ যে নারীদেহে পরিস্ফুট থাকিত, তাহাকেই অবাধে শক্তিরূপে গ্রহণ করা চলিত। এই শৈব-বিবাহ পদ্ধতি ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে প্রায় দেড় হাজার বৎসরকাল বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল। রাজা রামমোহন স্বয়ং শৈব-বিবাহ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত সকল তন্ত্র-সাধক ব্রাহ্মণেরই শৈব-বিবাহ-সম্মত একটি করিয়া শক্তি ছিল। অনূঢ়া গৃহস্থ কন্যা শক্তি হইতে পারিতেন না। প্রায়ই মগ, আরাকানী, মণিপুরী, অহম, ভুটিয়া, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতীয়া কন্যাই শক্তি হইতেন। ইহাদের পুত্র-কন্যা হইত, তাহাদের আবার সমাজে বিবাহ হইত ; তাহারা হেয় বা জঘন্য বলিয়া গ্রাহ্য হইত না। শোণিতগত এই মেলা-মেশা বঙ্গদেশে অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। তমোলুকের প্রভাবে এই শোণিতগত মেলা-মেশা বাঙ্গালার বাহিরে প্রাচ্য দেশের পীত জাতি সকলের সহিত ঘটিয়াছিল।

একটা মজার গল্প কুলজী গ্রন্থ হইতে বলিব। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের সমসময়ে বাঙ্গালায় "গুরু ডুম্বো" বলিয়া একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ইঁহার শতাষ্টক শক্তি ছিল, তাহারা সবাই ভৈরবীর সাজে সজ্জিতা থাকিতেন। এই গুরু ডুম্বো এক শ্রেণীর কাপালিক ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, গুরু ডুম্বো আর কেহ নহেন, তিব্বতের Dum Pa ; টেঙ্গুরে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক খবর বাহির হইয়াছে। ইংরেজী আমলের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা হইতে বহু পণ্ডিত তিব্বত, ভুটান, চীন, মহাচীন প্রভৃতি দেশে যাইতেন ; সে দেশের অনেক পণ্ডিত বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শঙ্কর তর্কবাগীশের আমল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার পণ্ডিতগণকে বিদেশে তীর্থ-ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যাইতেই হইত। রাজা রামমোহনকেও ভুটানে এবং তিব্বতে যাইতে হইয়াছিল। এই ভ্রমণ-জন্য কাহারও জাতিনাশ ঘটিত না, কেহ একঘরিয়া হইতেন না। তিব্বতে ও ভুটানে গিয়াছিলেন বলিয়া রাজা রামমোহনকে একঘরিয়া হইতে হয় নাই ; মহারাজ নন্দকুমারের পাঠান রমণী শক্তি ছিল বলিয়া তাঁহার গ্রামস্থ কেহই তাঁহার সহিত ভুজন্যতা ত্যাগ করে নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে নারীর স্থান বড়ই নীচে ; নারী যে মারের সৃষ্টি, তাই হীন। বৌদ্ধ সমাজে নর-নারীর বিবাহ সম্বন্ধ বড়ই আল্গা ছিল। চীনে, জাপানে, ব্রহ্মে, শ্যামদেশে এখনও বিবাহ-বন্ধন বড় শিথিল। বাঙ্গালার বজ্রযানী বৌদ্ধগণ নারীকে শক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, শৈব-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলন করিয়া নর-নারীর বিবাহ-বন্ধনটা অধিকতর স্থায়ী করিয়াছিলেন। পরন্তু শৈব-বিবাহে বর্ণ-বিচার আদৌ ছিল না, এখনও নাই। বৌদ্ধ বজ্রযানী সিদ্ধান্ত সকলের দ্বারা

বাঙ্গালার সমাজ-ধর্ম্ম এখনও যে কতটা সঞ্জীবিত তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। বাঙ্গালীর ব্রত, নিয়ম, পূজা, পাঠ, উৎসব-আনন্দ, সংস্কার প্রভৃতি সকল কর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ পদ্ধতি প্রচ্ছন্নভাবে এখনও রহিয়াছে। একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা বাঙ্গালী এখনও দশ আনা বৌদ্ধ রহিয়াছি। এই বৌদ্ধ প্রভাব বশতঃ বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জাতি-সমন্বয় ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালায় অত্যধিক মাত্রায় শোণিত-সমাবেশ ঘটিয়াছিল,—বাঙ্গালা প্রাচ্য দেশের মিলন ক্ষেত্র ছিল, এই বঙ্গদেশেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলন সাধন হইয়াছিল। সে সম্মেলনের ফলে প্রাচ্যের প্রভাব পরিস্ফুট, পাশ্চাত্যের—পশ্চিম ভারতের প্রভাব যেন অনেকটা সম্মূঢ়।

গু-ভজু এবং দে-ভজু

নেপালে এখনও প্রকটভাবে হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। নেপালে হিন্দুদিগকে বলে দে-ভজু বা যাহারা দেবতার ভজনা করে; আর বৌদ্ধদিগকে বলে গু-ভজু বা যাহারা গুরুর উপাসনা করে। বাস্তবিক বেদে ঠিকমত গুরুবাদ নাই; যিনি গায়ত্রী মন্ত্র শুনাইয়া থাকেন তাঁহাকে আচার্য্য পদবী দেওয়া হয় মাত্র, তিনি গুরু নহেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মেই প্রথম গুরুবাদ প্রচারিত হয়। গুরু দেবতা—দেবতাই কেবল নহেন, ইষ্ট দেবতার অপেক্ষাও তিনি বড়, কেন না ইষ্ট দেবতা ত তাঁহারই সৃষ্ট। অতএব গুরুকে জগতের সার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। অবিচারিতচিত্তে গুরুর আদেশ পালন করিবে, গুরু যাহা আদেশ করিবেন তাহা পাপ-পুণ্যের অতীত, তাহাকেই পুণ্যময় বলিয়া বিবেচনা করিবে। এই গুরুবাদ বেদে নাই। বেদের গুরু অনেকটা আজ-কালকার মাষ্টার বা অধ্যাপক। তন্ত্রের ও বৌদ্ধের গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ—চলদ্বিষ্ণু, সচল ও সজীব ঈশ্বর। গুরু জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মের অতীত। এই গুরুবাদ যেখানে আছে, বুঝিবে তাহার বেদী বৌদ্ধ ধর্ম্ম, তা সে বৌদ্ধভাব প্রকট হইতে পারে, প্রচ্ছন্নও থাকিতে পারে। বাঙ্গালায় এক সময়ে গুরুবাদটা খুব প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কি বৌদ্ধ, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, বাঙ্গালার আধুনিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর আসন সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। গুরুকে কিছুই অদেয় থাকিতে পারে না; গুরুর জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম বিচার করিতে নাই। বাঙ্গালায় সকল জাতীয় মানুষই গুরুর পদ পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ গুরুত আছেনই; তাহা ছাড়া মেহেরপুরের বলা হাড়ী (বলরাম হাড়ী), ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজার দলের কর্ত্তা, কিশোরী-ভজা দলের ঠাকুর, সহজিয়াদের গোঁসাই, আউল-বাউল সম্প্রদায়ের বাবাজীউ প্রভৃতি গুরুর জাতি-পরিচয় লইতে নাই। সকল জাতির ভিতর হইতে এই সকল সম্প্রদায়ের গুরু হইতে পারেন। বলা হাড়ি'ত প্রকাশ্যে নিজের জাতির পরিচয় দিত। এই সকল সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ আদি সকল জাতীয় শিষ্য বা উপাসক পাওয়া যায়। ইহাদের সাধন চক্রে একেবারে কোন প্রকারের

জাতি-বিচার নাই ; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে যৌন বিচারও থাকে না। এ সকলই ত সমাজে রহিয়াছে এবং চলিতেছে, এজন্য কেহ ত জল-অচল হয় না।

বাঙ্গালায় এক সময়ে গুরুবাদটা অতি ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। যাহা কিছু শিখিতে হইত, —শিল্প-কলা, মন্ত্রতন্ত্র, চাতুরী-হুনরী,—সকল ব্যাপারেই "গুরুকরণ" করিতে হইত। আর সে গুরুকে দেবতার আসন দিয়া অর্চ্চনা করিতে হইত। নমঃশূদ্র বা পোদ, তেঁতুলে বাগ্দী বা আগুরী লাঠিয়ালের কাছে আমাদের পিতা-পিতামহ আদিকে লাঠিখেলা শিখিতে হইত। আখড়ায় নামিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের সন্তানকে কোমরে পৈতা জড়াইয়া লুকাইয়া রাখিয়া, সর্ব্বাগ্রে লাঠিয়াল সর্দ্দার গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইত, তাঁহার সম্মুখে লাঠিগাছটা ফেলিয়া রাখিয়া, দুই হস্তে তাঁহার জানুযুগল স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিতে হইত। তিনি অনুমতি করিলে লাঠিগাছটা মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া, লাঠিসমেত দুই কর যুক্ত করিয়া সর্দ্দারকে নমস্কার করিতে হইত এবং "জয়গুরু" বলিয়া আখড়ায় নামিয়া লাঠি খেলা আরম্ভ করিতে হইত। ইহা করিতে ব্রাহ্মণাদি ভদ্রজাতির অপমান বোধ ছিল না, কাহাকেও স্ব-স্ব সমাজে হীন হইয়া থাকিতে হইত না। শতবর্ষ পূর্ব্বে "গুরুকরণ" না হইলে কেহই কোন বিদ্যা, কোন চাতুরী অর্জ্জন করিতে পারিত না। শিল্পী বা কুশলীর জাতিবর্ণ-ধর্ম্মের বিচার কেহ করিত না। একবার কাহাকেও কোন বিদ্যা বা চাতুরীর জন্য গুরুর আসন দিলে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় পুরুষই তাঁহাকে দেবযোগ্য অর্চ্চনা করিতেন। বাঙ্গালার গ্রাম্য পাঠশালা-সকলের "গুরুমশাই" প্রায়ই ব্রাহ্মণ ছিলেন না ; অনেক গ্রামে কায়স্থ "মশাই" থাকিতেন, চন্দননগরে এক বাগ্দী মশাই ছিলেন, তাঁহাকে ছাত্রের দল "বাগ মশাই" বলিত ; বর্দ্ধমান জেলার বহুগ্রামে আগুরী, কৈবর্ত্ত ও সদ্গোপ জাতীয় মশাই-সকল পাঠশালা চালাইতেন। ব্রাহ্মণের ছেলেরা অবাধে এই সকল পাঠশালায় লেখা-পড়া করিত এবং মশাইয়ের প্রাপ্য সম্মান মশাইকে দিতে কৃপণতা করিত না। এই গুরুবাদের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে "ছুৎমার্গ" টা তেমন প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

এক কালে নেপালের সহিত বিহার এবং বাঙ্গালার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মুসলমানদের আমলে অনেক বাঙ্গালী সপরিবারে নেপালে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বাঙ্গালীর পুরাতন জাতি-পরিচয় লইতে হইলে নেপালে যাওয়া কর্ত্তব্য, নেপালের পুঁথি-পত্র আলোড়ন করা প্রয়োজন। ইদানীং একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত ছাড়া এ কাজ আর কেহ তেমন মন দিয়া করিতেছে না, এদিকে বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজের তেমন দৃষ্টিও নাই। অথচ নেপাল-ভুটান-তিব্বত এই তিন দেশের ঠিক খবর জানিতে না পারিলে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের গোড়ার পৃষ্ঠাগুলি উন্মুক্ত হইবার নহে। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে কত নেপালী, ভুটানী এবং তিব্বতী শব্দ কিঞ্চিৎ আকারান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে, তাহার খবর কোন শব্দবিদ্ বা ভাষাবিদ্ রাখেন কি ? বলিয়াছি ত, বঙ্গদেশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ক্ষেত্র ; বাঙ্গালী জাতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলনে উদ্ভূত। বঙ্গ ও

বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে প্রতিবেশী অনেক দেশের খবর ঠিকমত রাখিতে হইবে। এখনও বাঙ্গালায় অনেক জিনিষ লুকান আছে, এখনও অনুসন্ধান করিলে অনেক খবর ঠিকমত পাওয়া যাইবে।

জাতি-তত্ত্ব

জীবতত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে, ইয়োরোপীয় এবং এশিয়াবাসীতে, খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোতে জাতি-বিচার করা হয়, তেমন উৎকট জাতি-বিচার কোন কালে ও যুগে এশিয়ার কোন দেশে ও জাতির মধ্যে ছিল না, এখনও নাই। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, বর্ণগত ও বীজগত জাতি-বিচার বৌদ্ধগণ উঠাইয়া দিয়াছিলেন; মুসলমান সে সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ উদারতা দেখাইয়া সকল বর্ণ ও সকল জাতির সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ যুগের পরে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ও জাতির মধ্যে যে জাতি-বিচার ও বিভাগ প্রচলিত হইয়াছে এবং এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, সে জাতি-বিচার বর্ণগত বা বীজগত নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় এবং বৃত্তিগত। উহাকে স্যর হর্ব্বার্ট রীজলী "প্রফেশন কাস্ট্‌স্‌" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কামার, কুমার, ছুতার, চামার, তিয়র, জালুক, মালো প্রভৃতি সকল জাতি-বিভাগই ব্যবসায়গত। উহা বৈদিক চারি বর্ণের হিসাবে জাতির হিসাব নহে। কেবল শিল্পী জাতির কথা বলি কেন। শাস্ত্র ব্যবসায়ী বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এক স্বতন্ত্র জাতি। ব্রাহ্মণ জাতি আবার ছচল্লিশ ভাগে বিভক্ত; সে বিভাগও ব্যবসায়গত। যেমন মালাকার এবং দেবল ব্রাহ্মণ, মিঠুইকর ব্রাহ্মণ, নট ব্রাহ্মণ, নর্ত্তক ব্রাহ্মণ, পটুয়া ব্রাহ্মণ, শীতলার ব্রাহ্মণ, শল্য ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মযাজী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। লেখক ও করণ হেতু কায়স্থ এক স্বতন্ত্র জাতি; চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়া বৈদ্য এক স্বতন্ত্র জাতি। বলা বাহুল্য আধুনিক জাতি-বিচার সবটাই ব্যবসায়গত বৈষম্যের উপর বিন্যস্ত। আবার মজা এই, বাঙ্গালার এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। কুম্ভকার জালুক হইয়াছে, কামার ছুতার হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য সমাজে স্থান পাইয়াছে, এমন কি বৈদ্য ও কায়স্থ গুরুগিরি করিতে করিতে ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে কত রকমের ব্রাহ্মণ ছিল তাহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইলে অনেক ইংরেজি-শিক্ষিত পুরুষ বিস্ময়ে অবাক্ হইবেন। এই বর্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব বাবাজীউ হইয়াছেন, অনেকে কায়স্থ সমাজে স্থান পাইয়াছেন, অনেকে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত, অনেকে চণ্ডাল সমাজে আশ্রয় পাইয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস অপূর্ব্ব। ব্রাহ্মণ বলিলে যে Priestly Caste বুঝিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ নরপতিগণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে খেলো করিবার উদ্দেশ্যে অনেক রকমের বিশিষ্ট কর্ম্মী মানুষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন।

আরও একটা মজার তথ্য প্রকাশ করিব। মধু কাণের সুর ও গান বাঙ্গালায় খুব প্রসিদ্ধ। "কাণ" শব্দ কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেক পণ্ডিতে বলেন। প্রকৃত পক্ষে "কাণ"

শব্দ "কাহ্ন" শব্দের অপভ্রংশ। কাহ্ন বা কাণ্হ্ পণ্ডিত একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন; তিনি গায়ক, গীত রচয়িতা এবং নর্ত্তক ছিলেন। জাতিতে তিনি বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ "শ্রমণ পণ্ডিত" বা বৌদ্ধ পূজক ছিলেন। তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত বা বংশধরগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজেদের জাতি-পরিচয় দিবার সময়ে বলিতেন, আমরা কাণ-বামুন। এই কাণ-জাতি এখন লোপ পাইয়াছে, অর্থাৎ বিশাল সমাজ-অঙ্গে অন্য জাতির আবরণে আত্মগোপন করিয়াছে। ইহাদের মহিলা সকল কীর্ত্তন করিতেন, তাহারা কেহই বেশ্যা বা বারমুখী ছিলেন না। বাঙ্গালার শতবর্ষ পূর্ব্বেকার বড় বড় কীর্ত্তনীয়া নারী কাণ বা গাধ্ জাতীয়া ছিলেন। স্বয়ং কবি জয়দেব, মনে হয়, কাণ জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নীসহ স্বরচিত "গীত গোবিন্দ" পদাবলী নাচিয়া-নাচিয়া গান করিয়া বেড়াইতেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, যাজ্ঞিক ও কুলীন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক নাচিয়া গান করিয়া বেড়াইতে পারেন না। এমন কর্ম্ম করিলে পাতিত্য ঘটে, অর্থাৎ স্বসম্প্রদায় হইতে পতিত বা চ্যুত হইয়া তাহাকে অন্য সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইতে হয়। জয়দেবের পাতিত্যের কথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই; কেঁদুলীতে তাঁহাকে অনেকে কিন্নর-ব্রাহ্মণ বা "কাণ" বলিত। কাহ্নুর রচিত অনেক দোঁহা ও গানে স্বজন বলিয়া জয়দেবের উল্লেখ আছে। যাউক সে কথা, ঘরের মেয়েরা, কন্যা, ভগিনী, পত্নী প্রভৃতি নাচ-গান করিত বলিয়া জাতির পরিচয় দিতে অধুনা অনেকের সঙ্কোচ বোধ হয়; তাই ইংরেজি সভ্যতার সজ্বাতে অনেক "কাণ" ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে আত্ম গোপন করিয়াছে। অনেকে "জাতি-বৈষ্ণব" হইয়াছে। গাঁধ্ জাতিও এই পদ্ধতি অনুসারে রাঢ়দেশে অন্য জাতির সামিল হইয়াছে। গাঁধ্ বা গন্ধর্ব্ব-জাতি, অথবা "গন্ধা" সিদ্ধাচার্য্যের বংশধর ও সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি-সকল কাণেদের মতন আত্মগোপন করিয়াছে। এমন যে কত রকমের মেলা-মেশা বাঙ্গালার জাতি সকলের মধ্যে হইয়াছে তাহার এখন হিসাব রাখা চলে না। কুলজী গ্রন্থে এক জাতি হইতে অপর জাতির মধ্যে প্রবেশের দৃষ্টান্ত অনেক আছে; আমরা ব্যক্তিগতভাবে অমন দুই একটা জাত্যন্তর গ্রহণের উদাহরণ স্মরণ রাখি। সেকালের সমাজপতিগণ দম্ভের বশে এক জাতীয় পুরুষকে নিম্নতর শ্রেণীতে নামাইয়া দিতেন। নাম-ধাম ধরিয়া কোন কথা বলিবার ত উপায় নাই, অমনি মানহানি ও নালিশ। কেন না ইংরেজের আমলে Respectabilityর আবরণে যত গোঁড়ামী বাড়িয়াছে, এত গোঁড়ামী কোন কালে, কোন যুগে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। সে ঘটকের দল নাই, সে বিশাল বিরাট কুলজী পুঁথি সকল নাই। বাঙ্গালায় প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তির বংশের ইতিহাস কুলজী গ্রন্থে নিবদ্ধ ছিল; ভাল, মন্দ, উন্নত, অবনত সকলের সকল কথা কুলজী ঘাঁটিলেই জানা যাইত। কাঞ্চন কৌলীন্যের প্রভাবে ইংরেজ-আমলে অহংকারের ও মাৎসর্য্যের কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে সত্য আত্ম-গোপন করিয়াছে। অতীতের অবগুণ্ঠন এখন কেহই উন্মোচন করিতে চাহে না। কাজেই সাধারণ ভাবে অনেক কথা কহিতে হয়। বলিতে হয়, বাঙ্গালায় ব্যবসায়গত জাতি ছাড়া অন্য জাতি ছিল না—

নাইও। বলিতে হয়, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল না, এখনও নাই। বলিতে হয়, আধুনিক বাঙ্গালী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলনে উদ্ভূত। এই সম্মেলন-বার্ত্তা রকম করিয়া শিবায়ন গ্রন্থে কবি লিখিয়া গিয়াছেন। শিবের কুচুনী পাড়ায় গতাগতি, রঙ্গপুরের রঙ্গ ত আর কিছুই নহে, বাশিষ্ঠ্য পদ্ধতি অনুসারে শৈব বিবাহ প্রচলনের ইঙ্গিত। শিবই যখন এমন কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলেন, তখন অন্যে পরে কা কথা। যদি পরে কখনও শিবায়ন-প্রমুখ শিব সম্পর্কীয় মহাকাব্য সকলের আলোচনা করিবার অবসর পাই, তাহা হইলে তখন এক একটি বাংলা শ্লোক তুলিয়া আমার তাবৎ সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে পারিব। এখন এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও বচন সংগ্রহ করিয়া তবে এই সন্দর্ভ সকল লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ

বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, ইহারা কেহই খাঁটি বাঙ্গালী নহে। ইহারা কান্যকুব্জ হইতে আমদানী করা মানুষ। একটা নূতন কথা বলিব। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগের পরে, পুনঃ ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রাহ্মণ মান্য ও গ্রাহ্য হইয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চ গৌড় এবং দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে—গৌড়, উৎকল, মৈথিল, সারস্বত এবং কান্যকুব্জ, এই পঞ্চ শ্রেণী মান্য। গৌড় ব্রাহ্মণই খাঁটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ; অথচ এখন বাঙ্গালা দেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবে না। রাজপুতানায়, পঞ্জাবে, মণ্ডী রাজ্যে, ঘড়ওয়ালে এখনও অনেক গৌড় ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ এবং ডোগরা ব্রাহ্মণ গৌড় ব্রাহ্মণদের বংশধর। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরে মগধে এবং গৌড়ে অর্থাৎ বাঙ্গালায় গৌড় ব্রাহ্মণদের উপর উৎপাত-উপদ্রব হয়। সেই সময়ে গৌড় ব্রাহ্মণ সকল দলে দলে বঙ্গ ও মগধ ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। একদল উত্তরাখণ্ডের পার্ব্বত্য পথ অনুসরণ করিয়া নেপালে, মণ্ডী রাজ্যে, টিহিরীতে যাইয়া বাস করে; তাহাদের অনেকে পরে ঘড়ওয়াল ও রোহিল খণ্ডে নামিয়া বসবাস করে। আর একদল গঙ্গার তট ধরিয়া পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া যায়। বৌদ্ধপ্রভাব যেমন যেমন পশ্চিম ভারতবর্ষে এবং আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, উহারাও তেমনি হটিয়া যাইতে লাগিল। শেষে রাজপুতানার মরু প্রদেশে এবং পঞ্জাবের উত্তরাংশে এবং কাশ্মীরে যাইয়া উহারা আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজপুতানার সকল রাজ্যে এখনও গৌড় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রহিয়াছে। গৌড় ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধার্থের ধর্ম্মমতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। উহাদের অনেকে জীনাচার বা জৈন মত মান্য করিতেন। জৈন মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিত এখনও প্রায় গৌড় ব্রাহ্মণ; জৈন মুনিও অনেকে গৌড় ব্রাহ্মণ। এই গৌড় ব্রাহ্মণের Trek বা দেশান্তরে গমন-বার্ত্তা স্কন্দ পুরাণে উপাখ্যানের আবরণে বেশ মজা করিয়া বলা আছে।

এই সঙ্গে আরও একটা মজার কথা শুনাইয়া রাখিতে হইবে। বৈশ্য বা শ্রেষ্ঠীদিগের মধ্যে তিনটি শ্রেণী প্রধান ছিল; যথা—গৌড়ী, মাগধী এবং মাথুরী। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের সহিত গৌড়ী শ্রেষ্ঠী বৈশ্যের দলও বৌদ্ধের উপদ্রবে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়। গৌড়ী শ্রেষ্ঠী তমোলুকের ব্যাপার-বাণিজ্য পরিচালন করিত; তাহারাই আমদানী-রপ্তানীর কাজের গোড়া বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই শ্রেষ্ঠীর দল প্রধানতঃ জৈনাচারী বা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। গৌড়ী শ্রেষ্ঠীর দল দেশত্যাগ করিয়া প্রধানতঃ রাজপুতানা এবং গুর্জ্জর দেশে বাস করে। এখন বড়বাজারে (কলিকাতায়) যে সকল মারবাড়ী ও ভাটিয়া বণিক আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে, ইহাদের প্রায় চৌদ্দ আনা অংশ গৌড়ী অথবা মাগধী বৈশ্য,—পঞ্চ গৌড়ের আদিম অধিবাসী, পুরাতন বাঙ্গালী।

তাই মারবাড়ী ও ভাটিয়াদিগকে বিদেশীয় বলিয়া একবার খবরের কাগজে ব্যঙ্গ করাতে মারবাড়ের একজন পণ্ডিত আসিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"অন্যে যাহা বলে বলুক, তুমি ত রাজবাড়ার সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছ, সিদ্ধচারণদের গাথা শুনিয়া আসিয়াছ, আমাদের পুঁথীপত্র পড়িয়া আসিয়াছ, তুমি এতবড় কথাটা কেন বলিলে? আমরা গৌড় ব্রাহ্মণ ও গৌড়ী ও মাগধী শ্রেষ্ঠীর দল, আমরাই ত বাঙ্গালার আদিম নিবাসী। বাঙ্গালা আমাদের, আমরাই আসল বাঙ্গালী। তোমরা ত কনৌজীয়া ও ব্রহ্মাবর্ত্তের অধিবাসী, হিন্দু রাজার আনুকূল্যে তোমরা এদেশে মোট হাজার বৎসরকাল বাস করিতেছ।"

কথাটা খুব সত্য। আদিশূরের সময়ে আসিয়া থাকি, বা তাহার পূর্ব্বে বা পরে দলে দলে আসিয়া থাকি, আমরা এদেশের আদিম অধিবাসী নহি। বাঙ্গালাদেশে বৈদিক আচার প্রবল রাখিবার উদ্দেশ্যে, আর্য্যভাবে বাঙ্গালী জাতিকে মণ্ডিত রাখিবার চেষ্টায়, মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আমদানী করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালায় "আর্য্যামীর" চাস প্রবল রাখিবার বাসনায় এই আমদানী হয়। আমরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ,—আমরা প্রধানতঃ কনৌজিয়া। বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য তাহারা প্রধানতঃ মৈথিল বা অযোধ্যার সরযুপারী ব্রাহ্মণ; যাহারা দাক্ষিণাত্য শ্রেণীভুক্ত তাহারা প্রধানতঃ উৎকল বা আন্ধ্র ব্রাহ্মণ। প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কনৌজিয়া ও পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বঙ্গদেশে বাস করিলেও, এদেশের কোন ব্রাহ্মণের সহিত সাধারণভাবে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতেন না। অনেকে কান্যকুব্জ হইতে বিবাহ করিয়া পত্নীসহ বাঙ্গালায় আসিতেন, কেহ কেহ বাঙ্গালায় প্রবাসী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ করিতেন। মোগল-পাঠানের সংগ্রামের সময়ে, শের শাহের শাসনকাল পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে ঘোর অশান্তি বিরাজ করে। তখন আর কথায়-কথায় কাহারও কনৌজে যাওয়া চলিত না। সেই সময়ে, আকবরের শাসনকালের সূচনা পর্য্যন্ত, বাঙ্গালায় কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে একটা বিষম সামাজিক গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। দেবীবর সেই গণ্ডগোলের সমাধান করেন, তাঁহার মেলবন্ধন ও কৌলীন্য প্রথার

প্রচলন আর কিছুই নহে, উহা বাঙ্গালার পুরাতন ব্রাহ্মণ এবং করণ জাতিসকলের সহিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বৈবাহিক সম্মেলনের নামান্তর মাত্র। কেবল ইহাই নহে। প্রথম পাঠান অভিযানের পরে, নীলচক্ষু, গৌরবর্ণ সুন্দর ও সুরূপ কনৌজিয়া ব্রাহ্মণজাতির অনেক কন্যা পাঠানগণ হরণ করেন। তখন কনৌজিয়াদিগের মধ্যে নারীর অভাব অতি মাত্রায় হইয়াছিল, তাই অনেক পাঠান-অপহৃতা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ কন্যাকে ছিনাইয়া আবার ঘরে আনা হয়। এই হেতু জাতির মধ্যে এক-একটা "দোষ" ঘটে। যথা যবন দোষ, কৈসরখানী দোষ, রোহেলা দোষ, চাঁদাই দোষ, ইত্যাকার ছাব্বিশরকমের দোষের সমাধান দেবীবর করিয়াছিলেন। বিলাতী সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে এখনকার বিজ্ঞান-সঙ্গত ভাষায় যাহাকে Cauterisation, Insulation, Absorption এবং Trans-mogrification বলা হয়, তাহার সকল গুলির সমন্বয়, ব্যাখ্যা এবং সমাধান দেবীবর করিয়াছিলেন। দেবীবরের তুল্য সমাজ-সংস্কারক ইদানীং আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ অনেক জিনিষ আত্মসাৎ করিয়াছিল। পাঠানীর গর্ভজাত পুত্র-কন্যা ব্রাহ্মণ সমাজে চলিয়া গিয়াছিল। এমন Absorption বা একাঙ্গীকরণের পদ্ধতি দেবীবরের পরে আর কেহ এদেশে চালাইতে পারেন নাই। দেবীবরের "মেলবন্ধন" "মেলমালা" প্রভৃতি কুলজী গ্রন্থসকল ভাল করিয়া অভিনিবেশসহ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্বের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইবে। ছয় সাত বৎসরের পূর্ব্বে "বিজয়া" নামক একখানি মাসিক পত্রে বাঙ্গালার সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি সাত আটটি সন্দর্ভ উপর্য্যুপরি লিখিয়াছিলাম। তখন সে সকল লেখার জন্য বিদ্বজ্জন-সমাজে তেমন কোন সাড়া পড়ে নাই; অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে পারি নাই; তাই নিরস্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক ইহা সত্য যে, দেবীবর বাঙ্গালার পুরাতন ব্রাহ্মণ এবং আগন্তুক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, এবং সে পক্ষে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া বাঙ্গালার আধুনিক হিন্দু সমাজের পুষ্টি ও বিস্তৃতি সাধন এবং পারম্পর্য্য রক্ষা করেন। তাঁহার মেলবন্ধন, পালটি ও প্রকৃতি নির্দ্দেশ ব্রাহ্মণ সমাজের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সাধন করে। একদমে পঞ্চ ব্রাহ্মণের মুষ্টিমেয় বংশধরগণ পনর লক্ষে পরিণত হয়। কুলজী গ্রন্থরাশিতে অনেক বাজে ও মেকী মাল আছে বটে, পরন্তু উহার বাছাই করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, বিভাগ-বিচার করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিলে এমন সকল অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে, যাহার প্রভাবে আমরা বাঙ্গালার তথা সমগ্র উত্তর ভারতের সকল প্রদেশের জাতি-তত্ত্ব ও বিস্মৃত এবং উপেক্ষিত লৌকিক ইতিহাস ঠিকমত জানিতে ও বুঝিতে পারিব।

এই সঙ্গে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের উল্লেখও একটু করিতে হয়। বৌদ্ধ একাকারের পরে পাঠান/উপদ্রবগত একাকার হয়। সেই নানা জাতির এবং নানা শোণিতের সম্পিণ্ডিত সমাজকে হিন্দুত্বের আবরণ দিবার উদ্দেশ্যে, উহাকে পুরা মাত্রায় Nationalise করিবার

চেষ্টায় বাঙ্গালার তিন ব্রাহ্মণ তিন দিক্ হইতে তিন রকমের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজের সকল দোষ দূর করিতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়—দেবীবর, সমাজের সংস্কার করিয়া, মেল—থাক্, জাতি-কুলের নির্দ্দেশ করিয়া বৈবাহিক আদান-প্রদানের পদ্ধতি স্থির করিয়' সামাজিক শুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করেন। তৃতীয়—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, হিন্দুর Typical Evolution বা ব্যষ্টিগত আদর্শের উন্মেষ চেষ্টায় আচার-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন। প্রথম দুইজন Social cohesion বা সামাজিক ও জাতিগত সংহতি শক্তির উন্মেষ সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। রঘুনন্দন আকারগত, ব্যবহারগত, আচারগত আদর্শের সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি আচার-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-ধর্ম্ম লইয়া সবিস্তর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় দুই জাতি আছে—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। শূদ্রের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, (১) সৎশূদ্র বা ব্রাহ্মণ আচার অনুকারী, (২) সাধারণ শূদ্র, ইহাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ-আচার অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা না করিবে, পুরাতন বৌদ্ধ আচার ধরিয়া থাকিবে, কেবল তাহারাই জল-অনাচরণীয় হইবে। ব্রাহ্মণের যে সকল বৃত্তিগত সম্প্রদায় বা "প্রফেশন কাষ্ট" আছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারিবে, শূদ্রদিগের যে সকল "প্রফেশন কাষ্টস্" আছে তাহারাও নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারিবে, এমন বিবাহবৈধ বা স্মৃতিশাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। ইহাই রঘুনন্দনের বড় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হওয়াতে, পুরাতন বজ্রযানী বা মহাযানী বৌদ্ধ এবং নবীন হিন্দুর মধ্যে সমন্বয় সাধন হওয়াতে বাঙ্গালায় এককালে চারি কোটি হিন্দু হইয়াছিল। Social cohesiveness সাধনের এমন প্রশস্ত উপায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ইহা একটা বড় উপাদান।

বাঙ্গালীর জাতিগত প্রকৃত পরিচয় লইতে হইলে যে, কত বিষয়ের আন্দোলন-আলোচনা করিতে হইবে, কেমন Scientific পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কত বিষয়ের বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত এই সন্দর্ভে করিয়া রাখিলাম। বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজের এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না বলিয়া, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্ম-পরিচয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া আমি এই প্রকারের প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি। জানি না, আমার চেষ্টা সার্থক হইবে কি না। ইংরেজি শিক্ষিত সুধী সমাজ অনুসন্ধিৎসু হইয়া বাঙ্গালার অতীত ও বর্ত্তমান জাতি ও কুল পরিচয় গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কি না তাহাও বলিতে পারি না। তবে আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রমে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত পাঠকগণের গোচর করিবার প্রয়াসে এই সকল সন্দর্ভ আমাকে লিখিতে হইতেছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

চাষীর প্রতি

(১)

তোর মাটি তোর ভুঁই,
ক্ষেত ভরা ধান তোর,
তুই তবু জোচ্চোর,
দিনরাত শ্রান্তি !
তুই মুঠো ভাত তুই,
দুই বেলা কই পাস্ !
নাই দৃঢ় বিশ্বাস,
নাই তোর শান্তি !
পাট গেল পর্‌দেশ,
শাল হোলো তাই ফের্,
তোর বৃথা দুঃখের
তুই খুব টান্‌বি !
হায় বোকা হায় মেষ !
ছাখ্ ভেবে একবার,
এই ধোঁকা ভাঙ্‌বার,
একবার জাগ্‌বি !
তোর ধনে রাম শ্যাম
লাখ্‌পতি ধন্‌বান্,
পাস্ কবে সম্মান,
বস্‌বার চৌকি ?
সেই বড়, তার নাম
গায় সবে দিনরাত,
তুই 'চাষা' 'বজ্জাৎ',
তোর বৌ বৌ কি !

(২)

আর কিরে ভুল হবে ?
হাল কসে' ধর্‌বি !
এই দিনে ভাত বিনে
আর কত মর্‌বি ?
তুই 'বাবু' হোস্ নারে,
থাক্ চাষী শক্ত ;
দেখ্‌লি নে বা'র হলো
মুখ দিয়ে রক্ত !
দুর্দ্দিনে পাস্ না তো
ভাত কভু চাট্টি !
কই ছিল বৌ-ঝিরা,
ঘর বেড়া টাট্টি !
কোন্ ধনী দ্যায় তোরে
একটুকু নেংটি !
তুই যদি যাস্ কাছে
খুব মারে খেংটি !
তোর খেয়ে তোর পরে'
সব ছিরিমন্ত !
তোর নোড়া তোর শিলে
তোর ভাঙে দন্ত !
তুই কবে টের পাবি—
তোর মহাশক্তি !
চায় কবি তোর কাছে
দেশ-অনুরক্তি ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পুরাতন কলিকাতা

(১৮২৬ খৃঃ অঃ)
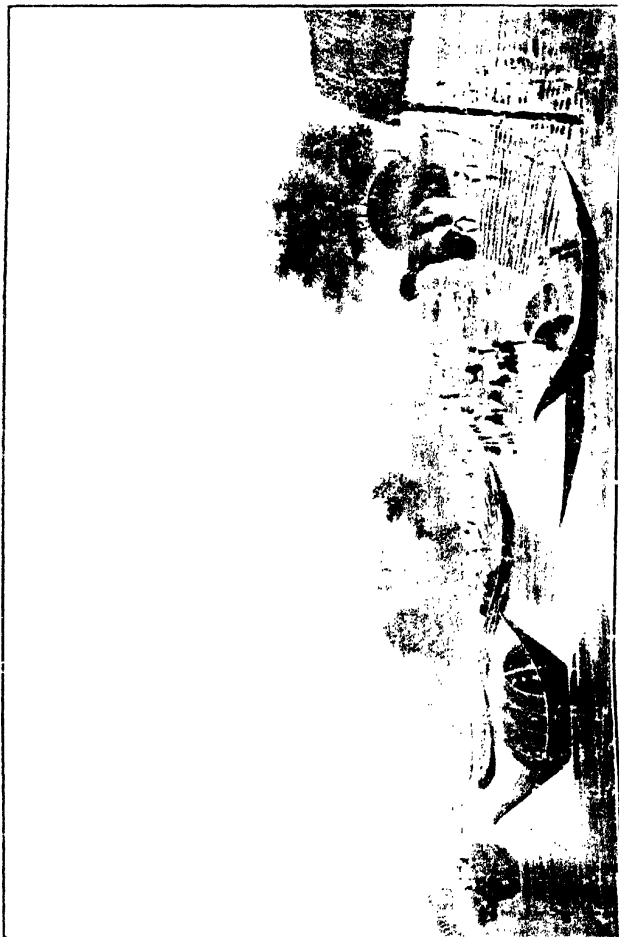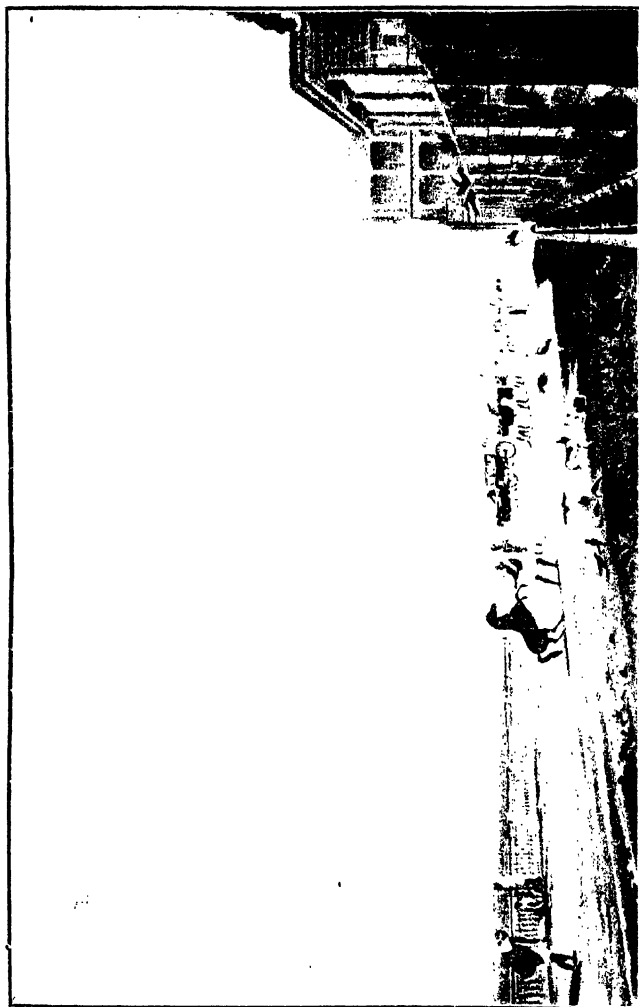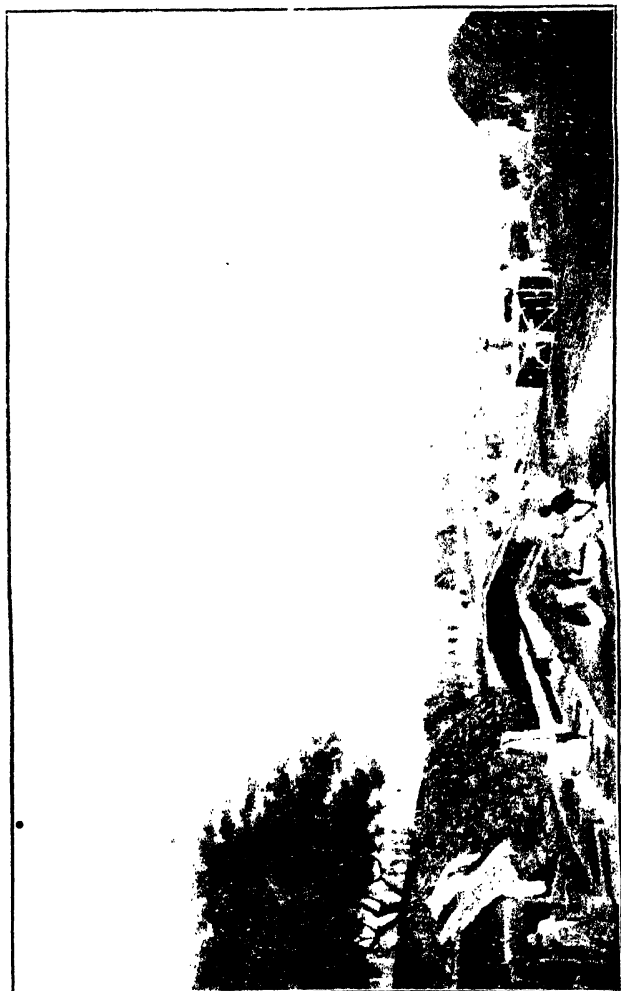
চিত্রকর: জেমস্ ফ্রেজার

চাঁদপাল ঘাট

এস্‌প্লানেড্‌ রো (চৌরঙ্গী রোড হইতে)

এসপ্ল্যানেড রো পশ্চিমদিক। চাঁদপাল ঘাট হইতে।

মহেশ

(১)
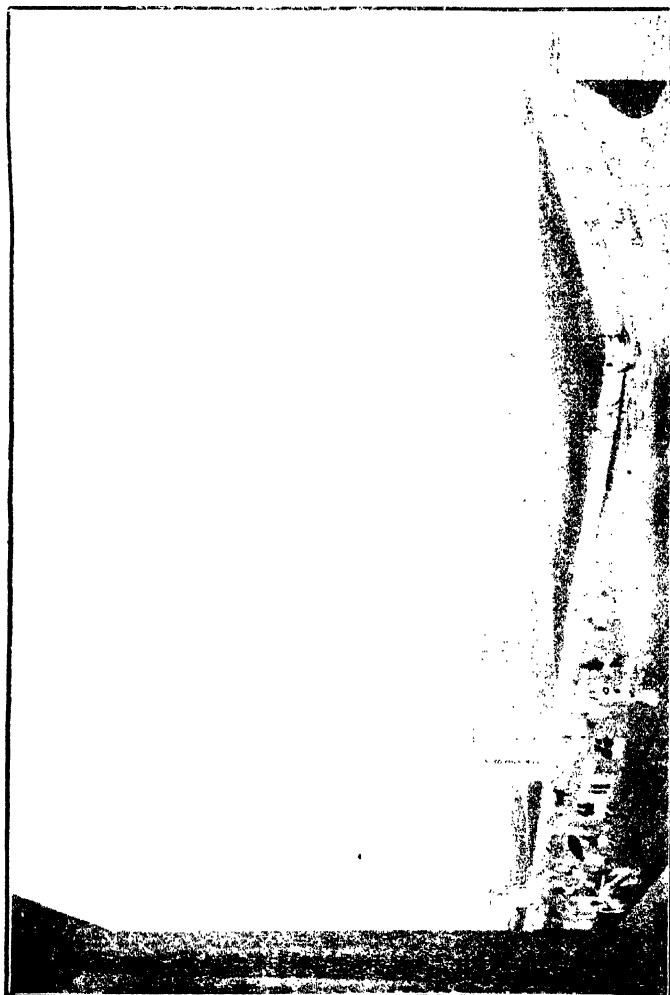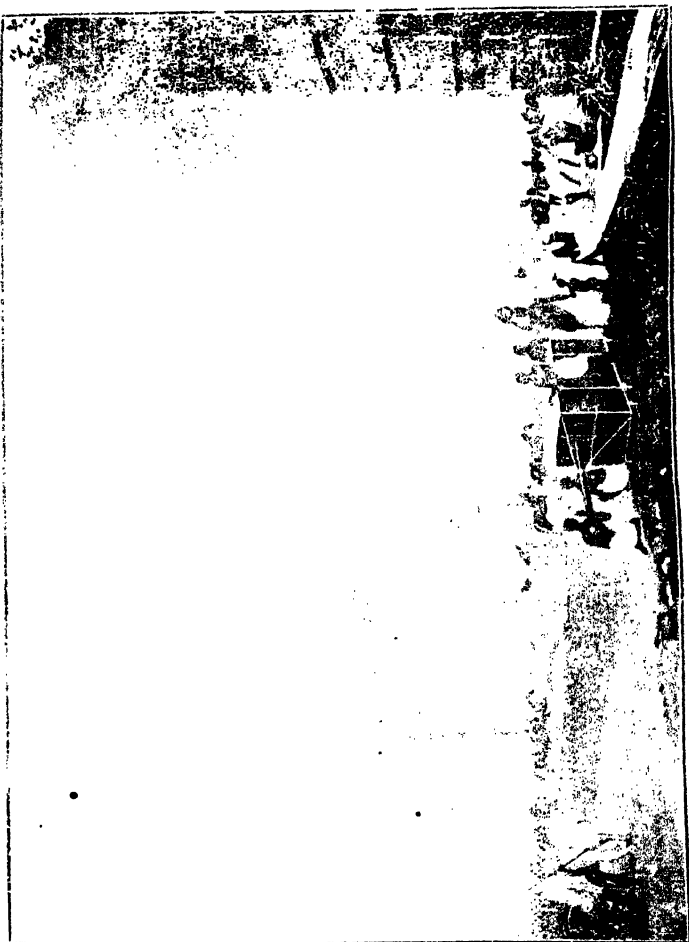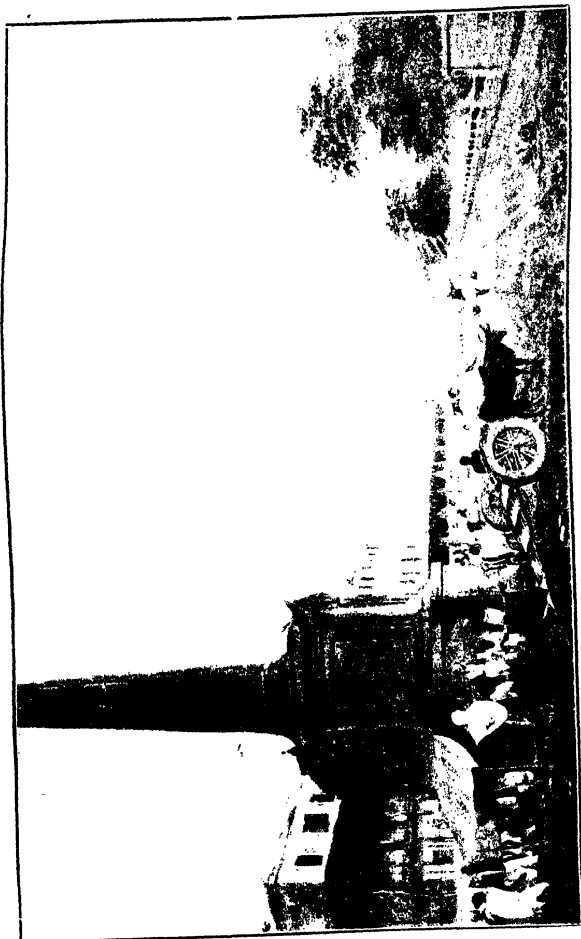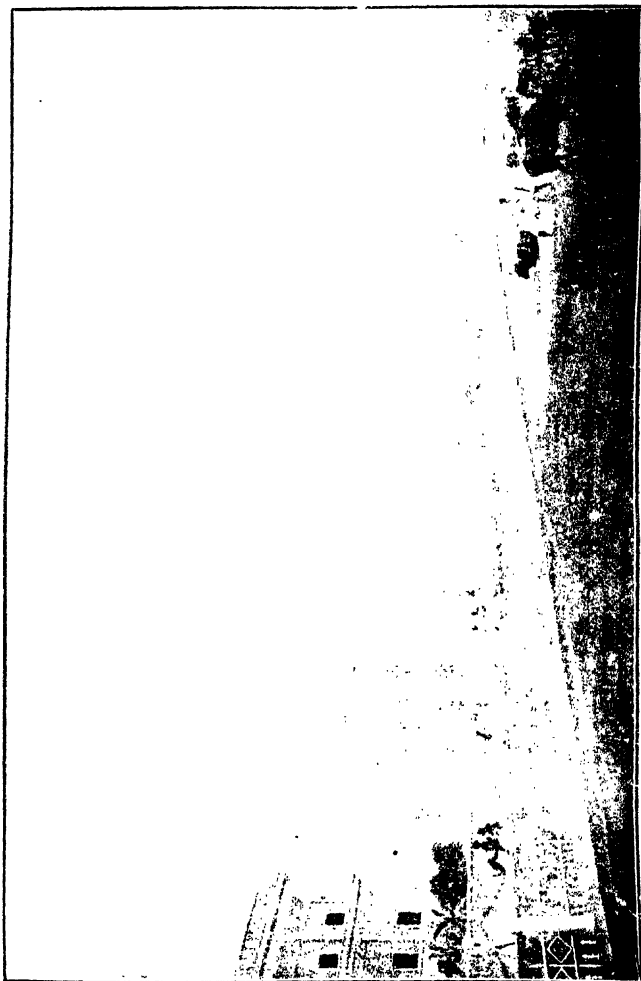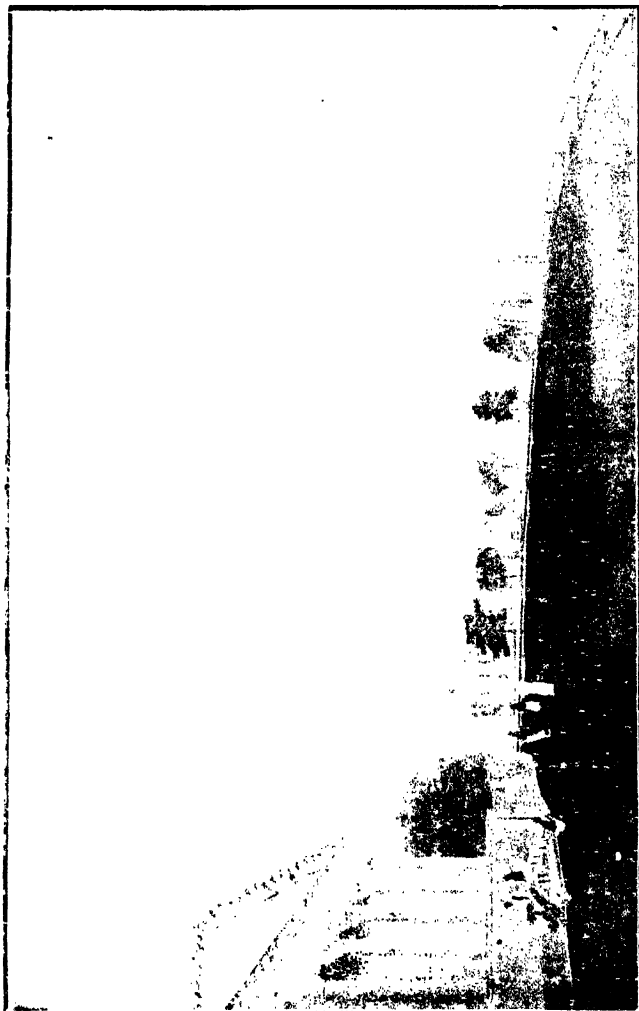
গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু, দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না,—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু, মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধূঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্দ্ধ গতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে,—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস্?

তাহার বছর দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর।

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাব্‌লা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খর বাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফের্‌বার পথে দেখ্‌চি তেম্‌নি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্ত্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কি কোর্‌ব বাবা ঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আন্‌ব,—তা' মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে, ছেড়ে দে না, আপ্‌নি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবা ঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি,—খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আল গুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে,—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবা ঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ ত ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু'আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক্। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি? ফ্যানে-জলে দেনা এক গাম্‌লা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি কর্‌লি খড়? ভাগে এবার যা' পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্যেও এক আঁটি ফেলে রাখ্‌তে নেই? ব্যাটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহণ খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেলসনের বকেয়া বলে কর্ত্তা মশায় সব ধরে রাখ্‌লেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে পড়ে বল্‌লাম বাবু মশাই হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই, একখানি ঘর, বাপ বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু, না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচিনে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস দুয়ের খোরাকের মত ধান দু'টি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না—বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই,—খেয়ে রেখেছিস্ দিবিনে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস্,—ছোট লোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস্!

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কোরব কেন বাবা ঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করিনে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত? বিঘে চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপ্‌রি উপ্‌রি দু'সন অজন্মা,—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল,—বাপ বেটিতে দু'বেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ বিষ্টি বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজ্‌রা গোণা যাচ্ছে,—দাও না, ঠাকুর মশাই কাহণদুই ধার, গরুটাকে দু'দিন পেটপুরে খেতে দিই,—বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু'পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্, ছুঁয়ে ফেল্‌বি না কি?

না, বাবা ঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহণদুই খড়। তোমার চার চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেচি,—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব,—কথা বল্‌তে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি, শুধ্‌বে কি কোরে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধ্‌বো বাবা ঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুলকণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না! যেমন করে পারি শুধ্‌বো! রসিক নাগর! যা যা সর্, পথ ছাড়। ঘরে যাই বেলা বয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্ শিঙ্ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি!

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফল মূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা' বটে! যেমন চাষা তার তেম্‌নি বলদ। খড় জোটে না, চাল কলা খাওয়া চাই! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ্। যে শিঙ্ কোন্ দিন দেখ্‌চি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দু'টি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্‌গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রিতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস্, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারিনে,—কিন্তু, তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিটের উপর রগ্‌ড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেম্‌নি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন কোরে বাঁচিয়ে রাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি,—তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দু'চোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরাণো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শীগ্‌গীর করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা ?

কেন মা ?

ভাত খাবে এসো—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েচ বাবা ?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোণো পচা খড় মা আপনিই ঝরে যাচ্ছিল——

আমি যে ভেতর থেকে শুন্‌তে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কোরচ ?

না মা ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা,—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে, এবং এমন ধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশী জানে। অথচ, এ উপায়েই বা ক'টা দিন চলে !

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান্ যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই ? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে, মা,—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল ?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড় ক্ষিধে পেয়েচে ?

তখন ? তখন হয়ত জ্বর ছিল না মা।

তা'হলে তুলে রেখে দি, সাঁজের বেলা খেয়ো ?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়্‌বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে ?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল ; কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে

দিতে পারবি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পার্‌ব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দু'টি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

(২)

পাঁচ সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই, আমিনা সকাল হইতে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মাণিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর্ পাগ্‌লি!

হাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বল্‌লে, তোর বাপ্‌কে বল্‌গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকার দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার হয় নাই। বিশেষতঃ, মাণিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আন্‌তে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বল্‌লে তিন দিন হলেই পুলিসের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌বে?

গফুর কহিল, ফেলুক্‌গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখ মাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর দু'য়ের মধ্যে সে বার পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব, আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাব্লাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার। সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়া গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্রচক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙ্‌ব না, এই পুরোপুরিই দিলাম,—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেম্‌নি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বল্‌চি,—খবরদার বল্‌চি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেম্‌নি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি! আমার জিনিস আমি বেচ্‌ব না,—আমার খুসী। এই বলিয়া সে নোটখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আস্‌তে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাওনা তোমাদের বায়না ফিরিয়ে! এই বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দু টাকা বেশী নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশী কেউ একটা আধ্‌লা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চাম্‌ড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে, মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটুকথা বাহির হইয়া গেল, এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্ত্তার কাণে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল, শিবু বাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাইনে। কোথায় বাস করে আছিস্, জানিস্?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাইনে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতে, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদ-মেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো কোরবনা কর্ত্তা! এই বলিয়া সে নিজেই দুই হাত দিয়া নিজের দুই কাণ মলিল, এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত নাকখত্ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবু বাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস্‌নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন, এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্ত্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসন ভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন, এবং যে জন্য এই ধর্ম্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল, এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারম্বার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

(৩)

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্ত্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ এ কথা ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই,—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এম্‌নি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয়, এবং মাত্র দিন চার পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্ব্বল তেম্‌নি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র

কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েছে রে ?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত ? কি বল্‌লি,—হয়নি ? কেন শুনি ?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই ? সকালে আমাকে বলিস্‌নি কেন ?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম! রাত্তিরে বল্‌লে কারু মনে থাকে ? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাক্‌বে কি করে ? রোগা বাপ খাক্ আর না খাক্, বুড়োমেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিল্‌বি। এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো। দে এক ঘটি জল দে,—তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই।

আমিনা তেম্‌নি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস্ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া, হারামজাদা মেয়ে সারাদিন তুই করিস্ কি ? এত লোকে মরে তুই মরিস্‌নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল এই তাহার স্নেহশীলা কর্ম্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্য্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোন দিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেম্‌নি মিথ্যা। এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণ বাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া যা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেম্‌নি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। ঘণ্টার পরে ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেই টুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিম্বা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই,—এম্‌নিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া

তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এম্‌নি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চিৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস্‌?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাক্‌চেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি, পরে যাবো।

এতবড় স্পর্দ্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবোনা।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয় বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণকণ্ঠ অতবড় কাণে গিয়া পৌঁছায় না,—না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুইই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়,—ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরিব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয়, বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে প্রজার মুখের এতবড় স্পর্দ্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণ বাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেম্‌নি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁস ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্ত্তকণ্ঠ কাণে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

একটিবারমাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কাণ বহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্ণিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালোচক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচ্‌তে হয়।

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায় বাবা ?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চট্‌কলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই,—সেখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত্ আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরী করিস্‌নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁট্‌তে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাব্‌লা তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরোনা।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বসিয়া থাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে একটী প্রধান অভিযোগ এই যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রেরা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জ্জিত বিদ্যা অর্থকরী নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য অপরাধ এই যে, ভারতবর্ষে উহা শ্রেষ্ঠ এবং উহার সমকক্ষ দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নাই! বড় হওয়া মহা অপরাধ, উহার মার্জ্জনা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য ও উহার অঙ্গসৌষ্ঠব যে বাঙ্গালীর গৌরব এ কথা কে ভাবিয়া দেখে? প্রকৃতপক্ষে এরূপ বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা নহে, আত্মশ্রীকাতরতা, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী উন্নতি বাঙ্গালী জাতির গৌরব, কেন না বাঙ্গালীর একনিষ্ঠতায় ও বাঙ্গালার প্রতিভায় এই বিশ্ববিদ্যালয় এত উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

কোন কালে, কোন দেশে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন নহে। লক্ষ্মী সরস্বতীতে সম্প্রীতি সাধারণ নিয়ম নহে। এই বাংলা দেশে পণ্ডিতেরা দরিদ্র ছিলেন, অর্থের লালসা তাঁহাদের ছিল না। তবে এদেশে অথবা ভারতের অন্যদেশে ইংরাজি শিক্ষার অনুষ্ঠান কেবল বিদ্যা দানের জন্য নহে, কতকটা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বটে। রাজকার্য্যের জন্য ইংরাজিশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন, এই কারণে যাহারা ইংরাজিশিক্ষিত তাহারা বিনা আয়াসে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইত। তাহা ছাড়া, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিত। কিন্তু অসংখ্য লোকে এ সকল কার্য্য করিতে পারে না। যেখানে এক হাজার লোকের আবশ্যক সেখানে দশ হাজার লোকের স্থান হয় না, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অবারিত, যে পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে সেই উপাধি লইয়া বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু উপাধি পাইলেই ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না। সরকারী বা অপর চাকরী, ওকালতী, ডাক্তারীতে কত লোকের স্থান হইবে? পাস করিলে বিবাহের বাজারে ছেলের দর বাড়ে কিন্তু রোজগারের হাটে ত পাসের মার্কার কোন দাম নাই, সংসারের চৌরাস্তায় ত পাস করা দেখিয়া কেহ পথ ছাড়িয়া দেয় না! এখন উপায়? উপায়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে গালি দেওয়া। তাহাতে আমরা খুব মজবুত।

এই এক অদ্ভুত আবদার! কোথাও ত শুনি নাই যে বিদ্যার আগার অর্থ উপার্জ্জনের কারখানা বা শিক্ষানবীশের চণ্ডীমণ্ডপ! বিদ্যা না শিখিয়া কত লোক, কত জাতি, ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন করে, বিদ্যা শিখিয়া কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারা যাইবে না কেন? দেশের এবং বাঙ্গালী যুবকদিগের হিতৈষিগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে মরুভূমি হইতে মাড়ওয়ারি,

দেশ বিদেশ হইতে নানা জাতি আসিয়া সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে,—কলিকাতার জমি, বাড়ী, ভদ্রাসন অর্দ্ধেক অন্য জাতির হাতে,—পল্লীগ্রামে খোট্টারা মিল, হাট, বাজার, নৌকা, পান্সী প্রায় সমস্ত হস্তগত করিয়াছে,—কিন্তু বাঙ্গালীর কিছুমাত্র হুঁস নাই। ইহাও কি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ? যদি সকল পাসকরা ছেলেই কাজ কর্ম্ম পাইত, চাকরীর জন্য হাহাকার না করিতে হইত তাহাহইলেই বা কে অন্য বিপদ ঠেকাইত? চাকরী, ওকালতী, ডাক্তারী অর্থাগমের সুলভ উপায়। বাঙ্গালী আর কোন উপায় শিখে নাই। এখন যদি দায়ে পড়িয়া কিম্বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে বাঙ্গালী অন্যদিকে মন দেয়, ব্যবসা বাণিজ্য, দোকান পসার করিতে শিখে তাহা হইলে তাহাকে কি কেহ নিষেধ করিবে, না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অথবা পদবীলাভের কারণে কোন অন্তরায় ঘটিবে? দোষ কাহারও নয়, দোষ কেবল আমাদের জাতিগত আলস্যের, আমাদের পুরুষকারের অভাব। যদি পুরুষকার থাকিত তাহা হইলে নিজের উদ্যমে, চেষ্টায় ও পরিশ্রমে আমরা আমাদের অর্থাভাব মোচন করিতাম, চাকরীর মুখাপেক্ষা করিতাম না, নির্দ্দোষী বিশ্ববিদ্যালকে গালি পাড়িতাম না।

একটা হিন্দুস্থানী বচন আছে——

পীর মূসা পীর ইসা,
বড়া পীর পইসা।

মূসা এবং ইসা,—মোজেস ও যীশু—পীর বটে, কিন্তু পয়সা ইঁহাদের অপেক্ষা বড় পীর। এ পীরের উপাসনা চাকরীর উমেদারী করিয়া হয় না, অপর কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলিয়াও হয় না। অনবরত পরিশ্রম করিয়া, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। সে ক্ষমতা যদি বাঙ্গালীর থাকিত তাহা হইলে কি মাড়ওয়ারি আসিয়া বড়বাজার নিজস্ব করিত, না সহরের যেখানে সেখানে বড় বড় অট্টালিকা ও ইমারত তৈয়ারী করিত? রাজপুতানা হইতে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই নিকটে; কিন্তু মাড়ওয়ারিরা বোম্বাই গিয়া ভাটিয়া পার্সিদিগকে কোণ ঠেসা করিয়া সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্য দখল করিতে পারে না কেন?

কেবল এক বাংলা দেশেই দেখিতে পাই শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যুবকেরা বসিয়া থাকা লজ্জার কথা মনে করে না। যদি বাপের টাকা থাকে তাহা হইলে ত কথাই নাই। অমুকের বাপের পয়সা আছে সে আর কি করিবে? পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইতেছে। যদি বাপের টাকা না থাকে ও অল্প আয়াসে চাকরী না জোটে তাহা হইলে আর কাহারও অন্ন ধ্বংস করে। ভাইয়ের, ভগিনীপতির, শ্বশুরের, শ্যালার,—যে কেহ হউক তাহার কোন দ্বিধা নাই,—অন্নবস্ত্র গ্রহণ করে। পরান্নভোজী হইয়া আলস্যে, পরম সুখে কালযাপন করে। সহরে নিষ্কর্ম্মা হইলে মাছ ধরাও হয় না, ধরিবার মধ্যে আড্ডা আর ফুঁকিবার মধ্যে গুড়ুক। এমনটি আর কোথাও

দেখিতে পাইবে না। রামকান্ত দিব্য জোয়ান পুরুষ, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি করিতেছে ? সে অম্লানবদনে উত্তর দিবে, বসিয়া আছি। বসিয়া থাকাও একটা কাজ ! একটা হিন্দী দোহা আছে—

> অজগর করে ন চাকরী পঞ্ছী করে ন কাম,
> দাস মলুকা কহ্ গয়ে সবকে দাতা রাম।

———দাস মলুকা কহিয়া গিয়াছেন, অজগর চাকরী করে না, পাখী কাজ করে না, রাম সকলের দাতা।

ইহার অর্থ পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ কাহারও আনুগত্য বা দাসত্ব করে না, কিন্তু কোন জীবই নিশ্চেষ্ট নহে। অজগর তাহার প্রকাণ্ড দেহ বনের ভিতর টানিয়া বহন করে, চক্ষের আকর্ষণে পক্ষী অথবা অন্য জীবকে মুখের কাছে টানিয়া লইয়া উদরসাৎ করে। পাখী কাজ করে না, ছাতি মাথায় দিয়া রৌদ্র বৃষ্টিতে আফিসে যায় না, কিন্তু পাখীর মত আলস্যশূন্য অক্লিষ্টকর্ম্মা কে ? ভোর বেলা সমস্ত জগৎকে জাগাইয়া দিয়া সে সারাদিন আহার সংস্থানের চেষ্টা করে। ঘরে ঘরে চড়াই পাখীর কাণ্ড দেখ। সারাদিন খুঁটিয়া খায়, ঘরে দুয়ারে, ভাণ্ডারে, খাবারের ঘরে কোথাও তাহার দৌরাত্ম্য শেষ হয় না। জানালায়, দরজার মাথায় বাসা বাঁধিবে, দশবার ভাঙ্গিয়া দাও, দশবার খড় কুটা জড় করিয়া আবার বাসা বাঁধিবে। এমন অধ্যবসায় কাহার আছে ?

শুধু বসিয়া থাকিলে রাম কাহাকেও কিছু দান করেন না—

> রাম ঝরোখে বয়ঠ্ কর সবকা মোজরা লে,
> জিসকী জয়সী চাকরী উসকো ওয়েসাহি দে।

———জানালায় বসিয়া রাম সকলের কাজের নিকাস দেখেন, যাহার যেমন কাজ তাহাকে তেমনি দেন। নিষ্কর্ম্মা অলসের জগতে কোথাও স্থান নাই।

বিশ্বচরাচরে কুত্রাপি বসিয়া থাকিবার নিয়ম নাই। চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্রতারকা অচিন্ত্যবেগে মণ্ডলাকারে অসীমে আপন আপন পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে। যদি একদিন এই ঘূর্ণায়মান বিপুল বসুন্ধরা অলস যুবকের মত বসিয়া থাকে, কিম্বা প্রাতে সূর্য্যের নিদ্রাভঙ্গ না হয়, উদয়াচলে আরোহণ করিতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে জগৎবাসীর ও সৌরজগতের কি দশা হয় ! কিন্তু ইঁহাদের ত বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, ধর্ম্মঘট করিতেও পারেন না, কারণ আকর্ষণ ও প্রক্ষেপণ নামক দুইটা অসুর ইঁহাদের নাকে দড়া দিয়া ঘোরায়। যাহারা শুধু বসিয়া থাকে তাহাদিগকে কাজে লাগাবার জন্য এই রকম কিছু একটা উপায় করা যায় না ?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সোনার ফুল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১০)

একদিন সন্ধ্যাবেলা মন্মথনাথ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহ'লে, তোদের 'কত' হলে এখন একরকম করে চল্‌তে পারে বল্‌ত অপু ?

অপর্ণা বলিল—দেখ বাবা, তুমি যদি ওকে একটি পয়সাও দাও তাহলে আমি গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌ব।

মন্মথনাথ বলিলেন—তোকে যদি গলায় দড়ীর হাত থেকে বাঁচাই, তাহ'লে তুই না খেয়ে মর্‌বি।—তোর মরণের পথটা আমরা দিব্যি 'সাফ্' করে রেখেছি!

কে তোমাকে বল্‌ল, যে ওর হাতে একটিও পয়সা নেই ?

কেন, মহাপ্রভু স্বয়ং। আর তাঁর একটি ব্যবসা কর্‌বারও যে ইচ্ছে আছে, তা'ও আমায় জানিয়ে এসেছেন সেদিন সন্ধ্যাবেলা। যাই হোক, ওর হাতে কত টাকা আছে আমায় বল্‌তে পারিস ?

প্রায় দশ হাজার, বাড়ী বন্ধকের টাকা। বটে! সে টাকা কোথায় আছে? আমার হাতে কোন রকমে একবার এনে ফেল্‌তে পারিস? তাহ'লে, তোর সম্বন্ধে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হই।

ওর কাছেই আছে, কিন্তু সেটাকা আমার। কারণ, শ্বশুর মারা যাবার সময় ও বাড়ীটা আমার নামে লিখে দিয়ে যান।

মন্মথনাথ সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়া বলিলেন—আচ্ছা দেখা যাক ;—আর আমি ত কাছেই আছি, কোন অসুবিধে হলে ডেকে পাঠাস,—কেমন ?

অপর্ণা বলিল—কোনই অসুবিধে হবে না বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সে রাত্রে গোবিন্দ যখন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—কিছু হ'ল ?—

অপর্ণা বলিল—কি ?

গোবিন্দর নেশায় তখন সবে রং ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্ত্রীর 'কি' কথাটি তাহার কাণে কেমন যেন 'বেসুরো' ঠেকিল! সে বিরক্ত হইয়া বলিল—কি ?—ন্যাকা, জানেন না যেন কি!—টাকা—টাকা, আদায় কর্‌তে পার্‌লে নেকারাম ?

অপর্ণা বলিল—তুমি কারো কাছে টাকা পাবে নাকি ?

গোবিন্দ ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—হাঁ পাব, 'আলবাৎ' পাব, তোমার বাপের কাছে পাব।—ছোট লোক কোথাকার, ফাঁকি দিয়ে 'মুখ্যি কুলীনের' ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে চোদ্দপুরুষ স্বর্গে পাঠিয়েছে, 'নেমোখারাম' কোথাকার—'

রাস্তায় কে ডাকিল—গোবিন্দ, ঘুমালে নাকি হে ?

পরিচিত গলার স্বরে বিস্মিত হইয়া জানালার কাছে আসিয়া গোবিন্দ বলিল—কি ভাই হারাণ, কি খবর ?

হারাণ বলিল—নেমে এস, বল্‌ছি।

গোবিন্দ নীচে আসিতেই হারাণ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—বন্ধু, একটি নিরীহ মানুষের প্রাণে এমন করে কষ্ট দেওয়া কি তোমার সাজে ? বেচারা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো জবাফুল করে ফেলেছে !—ঐ গলির মোড়ে কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছ কি ?

গোবিন্দ নেশার ঘোরে 'আধবোজা' চোখে দেখিল, অন্ধকারের মধ্যে একটা সাদা কাপড়ের 'পুঁটুলির' মত কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে ! সে তাহার কাছে আসিতেই, সেই সাদা কাপড়ের 'পুঁটুলি' মসীনিন্দিত দুখানি হাত বাহির করিয়া গোবিন্দর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—মাইরি গোবিন্দ, তোকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডও বাঁচ্‌ব না।—তখন তুই রাগ করে চলে এলি, আর আমি—আচ্ছা আমার কি দোষ বল্‌ ? আমি ত আর ইচ্ছে করে তোর মনে কষ্ট দেবার জন্যই ওটা করিনি, কার্ত্তিকটাই ত আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়ে—'

তাহাদের পিছনে কাহার পায়ের শব্দ হইল ! গোবিন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল একজন লোক চলিয়া যাইতেছে। গোবিন্দ তাহাকে চিনিল, কিন্তু লোকটি যে কিছু দেখিতে পাইয়াছে বা তাহাকে চিনিয়াছে তাহা মনে হইল না। তবু গোবিন্দ চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—ইঃ শালা হয়ত দেখ্‌তে পেয়েছে !—দেখ্‌, তুই আজ যা, আজ আমি বাড়ীতেই থাক্‌ব।—শরীরটা ভাল নেই, সেই পেটের ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে।

গোবিন্দ হারাণকে ডাকিয়া বলিল—তুমি ওকে নিয়ে যাও। কিন্তু তাহারা দুজনেই আপত্তি করিল—তোমাকে না নিয়ে এখান থেকে আমরা কিছুতেই নড়্‌ছি না।

সাদা কাপড়ের পুঁটুলির ভিতর হইতে আবার দুখানি হাত বাহির হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, গোবিন্দ তাড়াতাড়ি তাহার 'পকেট' হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া হারাণের হাতে দিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। তাহার পর আর কোন গোল রহিল না। হারাণ সেই সাদা কাপড়ের 'পুঁটুলিটি'কে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘরে আসিয়া গোবিন্দ স্ত্রীকে বলিল—দেখ, কাল ত রব্বার। মনে আছেত ? ওদের সকলকে খেতে ডেকেছি, আর এবার লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে না, ওদের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হবে।

একটা কোন বীভৎস কথা শুনিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, সেই রকম করিয়া অপর্ণা বলিল—তোমার বন্ধুদের সঙ্গে ?—সে আমি পারব না—'

প্রতিবাদ গোবিন্দ একেবারে সহ্য করিতে পারে না, সে বলিল—আমি যে কথাটি বলি, তাতেই তোমার অমত দেখ্‌তে পাই! 'না' আর 'কেন' যেন মুখে বাসা বেঁধেছে! আমার বন্ধুদের সাম্‌নে বার হতে তোমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আর মোহন উকিলের 'রাঁধুনীগিরি' করতে তোমার সম্মান বাড়ে, না ?

অপর্ণা বলিল—তুমি যাদের সাম্‌নে আমায় বা'র হতে বল্‌ছ, তাদের সাম্‌নে আজ পর্য্যন্ত কোন ভদ্র লোকের মেয়ে বা'র হয়েছে কি ?

তাদের বৌরা বুঝি সব মুদ্দোফরাসের মেয়ে ?

মুদ্দোফরাসের মেয়ে না হ'লেও ওরা তোমাদের বন্ধুদের বিয়ে করে তা হয়েছে।

গোবিন্দ এবার ভীষণ হইয়া উঠিল। শ্লেষের সঙ্গে বলিল—মোহন উকিলের প্রতি 'দরদ'টা তোমার ক্রমেই বাড়্‌ছে দেখ্‌ছি! সেদিন দেখ্‌লাম, ছাদ্‌থেকে তার কাপড়গুলি তুলে পাট করে দেওয়া হচ্ছে—'তলব' পাও কত ?

এতখানি বিষ ঢালিয়াও গোবিন্দ বিশেষ ফল পাইল না! বেশ সহজ ভাবেই অপর্ণা বলিল—তা দিই সময় সময়, আহা বেচারা একা থাকে, আর 'তলব' যা পাই তা ত তোমার অজানা নেই।

অপর্ণা গোবিন্দর মুখের দিকে চাহিয়া একটু দুষ্টামি করিয়া হাসিল। সে হাসি দেখিয়া গোবিন্দ বলিল—এক ছুরিতে তোমার ঐ হাসি, চিরদিনের মত হাসিয়ে দিতে পারি।

তাতে অসুবিধেটা তোমারই হবে বেশী, সুবিধের চেয়ে!—সে যাক্‌, এখন ঠিক করে বলত, তোমার পেটের সেই ব্যথাটা কেমন আছে ?

গোবিন্দ যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে বলিল—আমার শরীর সম্বন্ধে আমি যা জানি, তুমি তার চেয়ে ঢের বেশী জান দেখ্‌ছি!—কিন্তু তোমার সঙ্গে 'বক্‌' 'বক্‌' করতে পারি না অত। একটু ঘুমাতে দেবে ? না, না ?

অপর্ণা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সমস্ত দিক স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা তীব্র গন্ধযুক্ত বাতাস সমস্তক্ষণ যেন তাহার বুকে পাষাণের ভার লইয়া চাপিয়া রহিয়াছে। তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কিছু ভাবিবারও যেন শক্তি নাই। তাহার পাশে, গোবিন্দ নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া আছে। ঘৃণায় তাহার শরীর মন যেন মরিয়া যাইতেছিল। একটুখানি কান্না তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইল—এই জীবন!…ওঃ—

(১১)

পরদিন বন্ধুগণ পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া গোবিন্দকে বলিল—দেখ গোবিন্দ, তোমার বৌ সাক্ষাৎ দ্রৌপদী ! এমন চমৎকার রান্না,—সত্যি কতকাল যে খাইনি !

কার্ত্তিক বলিল—শুধু দ্রৌপদীর সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে তাঁর ছিল পাঁচটি, এঁর একটি—

হাসির শব্দে ঘরখানি কাঁপিয়া উঠিল। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া অপর্ণা লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পর আবার পরামর্শ চলিল—কি উপায়ে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া যায়।

হারাণ বলিল—একটা খুব সহজ উপায় আছে তবে তাতে একটু সাহসের দরকার।—এই দেখনা, সেদিন আমাদের চোখের সাম্‌নে বিধু সান্যেল পাঁচশ টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুল আর ফির্‌ল কুড়ি হাজার নিয়ে ! এখন তার পয়সা খায় কে ? সাহস করে বুঝে লাগাতে পার্‌লে কি আর দেখতে আছে ? জুড়ি, গাড়ী, রাম সিং দরোয়ান রাত না পোহাতেই এসে হাজির হবে। কিন্তু সাহস চাই বাবা—হয় ফকীর, নয় আমীর। কি হে গোবিন্দ, দেখ্‌বে চেষ্টা করে ? আমি নিয়ে যেতে পারি।

গোবিন্দ বলিল—লাগে, আজই সন্ধ্যাবেলা, কি বল ?

চীনা পল্লীতে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে যে সমস্ত জুয়ার আড্ডা আছে তাহারই একটিতে বন্ধুদের লইয়া গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহির হইতে কিছুই বোঝা যায় না যে, লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা ঐ ছোট অন্ধকার ঘরগুলির মধ্যে হইয়া যায়। খুন রক্তপাত বড় কম হয় না।

ঘরে ঢুকিতেই মনে হয় সেটি যেন সাধারণ চা খাইবার দোকান। এইখানে যে একজন লোক থাকে সে মানুষের মন বুঝিয়া, ওজন বুঝিয়া ইসারায় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেয়।

গোবিন্দ ভিতরের কামরায় আসিয়া বসিল। চারিদিকে অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না। একটি ছোট টেবিলের উপর জুয়া খেলিবার সরঞ্জাম লইয়া জনকতক মানুষ বসিয়াছিল। ইহাদের সহিত তাহার খেলা চলিতে লাগিল। প্রথমে গোবিন্দ সাত শত টাকা জিতিল ; তাহার পর দুই শত হারিল, আবার পাঁচ শত জিতিল, এই ভাবে চলিতে লাগিল। শেষে গোবিন্দ যখন দেখিল, 'হারের অপেক্ষা জিৎটা' তাহার তখনও কিছু বেশী আছে, সে খেলা বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল।

বন্ধুগণ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—সাবাস্ ! এই ত 'মরদ'—এম্‌নি ক'রে সপ্তা খানেক চল্‌লে আর পায় কে ?

কিন্তু বাড়ীতে আসিতেই অপর্ণা গোবিন্দর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা শোন—এমন কাজ আর কোর না।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—তুমি বড় ভীরু! এই দেখনা,—আজ প্রায় হাজার বারো'শ টাকা জিতেছি—আচ্ছা কালই তোমায় একটা ভাল নেক্‌লেস্ কিনে দেবো।

অপর্ণা বলিল—তোমার ঐ টাকায় কেনা কোন জিনিসই আমি নেবো না।

কি?—নেবে না! ভারি বয়ে গেল। আমার যদি দেবার মন থাকে, তা'হলে কতজনে কত দিক থেকে হাত বাড়িয়ে দেবে।

বেশ দাও গে তুমি ওদের যা খুসী, আমি কোন কথা বল্‌ব না, কিন্তু আবার বল্‌ছি জুয়া খেলা ছাড়।

এই যে উপদেশ আরম্ভ হয়েছে দেখছি! কিন্তু কথাটা কি জান, আমি কারো বাবার টাকায় জুয়া খেলি না।

কিন্তু ও টাকা কার তা তোমার ভাল করে জানা আছে।

গোবিন্দ আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোপরাও——

ঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডার অন্ধকারে কে দাঁড়াইয়া ছিল, সে দুই হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।.........

(১২)

দিন পনের হইল গোবিন্দ বাড়ী আসে নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিতে না পারিয়া মন্মথনাথ অপর্ণাকে বলিলেন—চল্ মা, তোকে এবার নিয়ে যাই। এখানে থেকে আর লাভ কি?

অপর্ণা বলিল—আরো দু'একদিন থাকি, তারপর যাহা হয় একটা কিছু কর্‌ব। মন্মথনাথ ফিরিয়া গেলেন। আরও কিছুদিন কাটিল।

মা দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিলেন—আমার কপালে যা ছিল তা'হল—আর কি বল্‌ব মা! পত্রপাঠ তোমার ঝিকে নিয়ে এখানে চলে এস।

অপর্ণা উত্তর দিল—মা, তোমাদের কপালে যা ছিল তা হয়েছে, কিন্তু আমার এখনও সবটা হয়নি, কিছু বাকী আছে, সেটা হয়ে গেলেই তোমাদের কাছে আবার ফির্‌বো।......

রাত্রি তখন প্রায় দুইটা হইবে। হাতের উপর মাথা রাখিয়া অপর্ণা মাটিতে ঘুমাইয়াছিল। প্রদীপের আলো তৈলের অভাবে প্রায় নিভিয়া আসিয়াছে। এমন সময় কোথা হইতে গোবিন্দ আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিল—দেখ, তোমার গয়নাগুলো দিতে পার আমায় একবার?—

নইলে আর বুঝি মান সম্ভ্রম থাকে না, ঐ শালারা হাস্‌বে।—ইস্, দশ হাজার টাকা দু'সপ্তায় 'উড়ে' গেল!—লক্ষ্মীটি, দেবে তোমার গয়নাগুলো? তোমাকে আবার ও ফিরিয়ে দেবো, খেলায় জিতে। গয়না না দিতে পারি তার 'দুনো' দাম ধরে দেবো—আঃ শুন্‌তে পাচ্ছ কি বল্‌ছি?

অপর্ণা বলিল—সব কথাই তোমার শুনেছি; কিন্তু তোমার বন্ধুদের বিদ্রূপের হাত থেকে তোমায় রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই।

গোবিন্দ বলিল—কুচ্ পরোয়া নেই।—বৈঠ্ রও চুপ্। আমিই সব করে নিচ্ছি।

গোবিন্দ অপর্ণার আঁচল হইতে চাবির রিং লইয়া আলমারি খুলিয়া সমস্ত জিনিসপত্র উল্টাইয়া একাকার করিতে লাগিল। তাহার হাতের আস্ফালনে একটি মাথায় পরিবার সোনার ফুল অন্য সমস্ত জিনিষের সহিত মাটিতে পড়িয়া গেল, গোবিন্দ তাহা লক্ষ্য করিল না। ঘরের মধ্যে কাপড় জামা, বই ইত্যাদি চারিদিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল! অপর্ণা পাষাণ প্রতিমার মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দ কোথাও গহনার সন্ধান না পাইয়া অপর্ণার কাছে আসিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল—গয়নার বাক্স গেল কোথায়?—

অপর্ণা একবার কাঁদিয়া উঠিল, তাহার মুখ বিবর্ণ। শুষ্ককণ্ঠে বলিল—বাবা নিয়ে গেছেন সেদিন এসে।......

এই কথার পর কি যে হইয়া গেল, অপর্ণা তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। এক সময় কপালে ভীষণ বেদনা অনুভব করিয়া উঠিয়া বসিতে গিয়া সে বুঝিতে পারিল, ঐ রকমের বেদনা তাহার সমস্ত শরীরে রহিয়াছে! ঘরে কেহ নাই! আলোটা কখন নিভিয়া গিয়াছে।

অপর্ণা অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, আলো জ্বালিল, তাহার পরে সেটিকে আরসির সাম্‌নে ধরিয়া নিজের মুখের ছবি দেখিতে লাগিল।......

কপালের এক পাশ বহিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া রক্ত বহিয়া আসিয়া বুকের কাপড়ের এক জায়গায় জমা হইয়াছে......মাথার চুল মুখের অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে.. ...কাপড়খানি শুধু কোন রকমে তাহার দেহের উপর লাগিয়া আছে......চোখের চাহনিতে উন্মাদের লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে......মুখ রক্তহীন......ধীরে ধীরে আরসির উপর হাসির রেখা, অস্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল......যে হাসি অনেক সময় মুমূর্ষুর মুখে দেখা যায়, মৃত্যুর পরও শবের মুখে যে হাসি অনেক সময় লাগিয়া থাকে।

ভয়ে বেদনায় বিস্ফারিত দুটি চোখ আরসির উপর হইতে উঠাইয়া একবার অপর্ণা নিজের শরীরটাকে দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।..... কিছু দূর যাইতেই তাহার পায়ে কি ঠেকিল। অপর্ণা সেটিকে তুলিয়া লইয়া দেখিল, তাহারই মাথার ফুল। সে সেটিকে মাথায় পরিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।......

মোহন তখন আপনার ঘরের ভিতর পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, আর মাঝে মাঝে বলিতেছিল—শয়তান—শয়তান—

হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন কে তাহার ঘরের দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল !...... কে অতি সন্তর্পণে তাহার ঘরের ভিতর আসিল !......

মোহন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও কোন শব্দ নাই।......ঘরের ভিতরে থম্‌থমে অন্ধকার!......কিছুই দেখা যায় না! অথচ তাহারই ভিতরে যেন একটি মহাপ্রলয় হইয়া যাইতেছে!......

দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটি টিক্ টিক্ করিয়া মুহূর্ত্ত গুণিয়া যাইতেছে!......কে যেন নড়িয়া উঠিল......কে তাহার দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে!......কে তাহার পায়ের কাছে মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল!......

মোহন ভুলিয়া গেল-বিশ্বজগৎকে, ভুলিয়া গেল-পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক, সমাজ আর যা কিছু সব, ভুলিয়া গেল আপনাকে, তাহার শেষ শক্তিও যেন চলিয়া গেল। সে শুধু চাহিয়া রহিল, ঐ অস্পষ্ট নারী মূর্ত্তিটির দিকে।......

ঘরের মধ্যে কাহার দীর্ঘ শ্বাসের শব্দ হইল......মোহনের চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে অতি সন্তর্পণে তাহার টেবিলের উপর হইতে একটি দিয়াশালাই লইয়া আসিয়া জ্বালিল।

......মাগো! অন্ধকারের আবরণের মধ্যে একি রক্তস্রোত বহিয়া চলিয়াছে! এ যে সর্ব্বংসহা জগৎমাতার বুকের রক্ত!......বুকের স্পন্দন এখনও তাহার থামে নাই। কিন্তু মুখে তাহার যে প্রাণের কোন চিহ্ন নাই!......নিবিড় কালো কেশের তলায় যেখানে রক্তের উৎস জাগিতেছে, তাহারই উপর শিশির বিন্দুর মত হীরার টুক্‌রা বুকে লইয়া পাপ্‌ড়ি মেলিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে—সোনার ফুল!......আলো নিভিয়া গেল।......

সমাপ্ত

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

বিধান

ধাতার বাহন, কঠোর বিধান! সিংহনাদে গর্জ্জে আয়!
গুঁড়িয়ে দিয়ে আলস ভীতি, উড়িয়ে দিয়ে বিলাস-নীতি
দৈত্যদলের দর্প দলে', দীপ্ততেজে তর্জ্জে আয়।

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৩)

কহিয়াছি যে বার্ণাড ক্লাবেই সর্ব্বপ্রথমে মিসেস্ ওলিবুলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। ইনি পূর্ব্ব বৎসর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। এদেশে আসিয়া আমার বন্ধুবান্ধবদিগের মুখে বোধ হয় আমার কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। এইকারণেই তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। যে কোনও শনি রবিবারে আমার অন্য কর্ম্ম থাকিবে না তখনই তাঁহার বাড়ী যাইতে পারি; আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে।

এক শুক্রবার রাত্রে আমি নিউইয়র্ক হইতে বস্টন যাত্রা করি। অতি প্রত্যূষে বস্টনের উপকণ্ঠে কেম্ব্রিজ সহরে ব্যাক্‌বে ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ী থামিল। মার্কিণের রেলগাড়ীতে শোবার বন্দোবস্ত থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে রেল কোম্পানী এ বন্দোবস্ত করেন না, প্যুলম্যান কার কোম্পানী পৃথক ভাড়া লইয়া এসকল বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। প্যুলম্যান কোম্পানীর গাড়ীতে এক একজন পরিচারক থাকে। তাদের হাতেই যাত্রীদের টিকেটও থাকে। ইহারা যাত্রীদের গন্তব্যস্থানে গাড়ী থামিলেই তাহাদিগকে ডাকিয়া নামাইয়া দেয়। আমার গাড়ীর নিগ্রো পরিচারক মহাশয় আমাকে যখন ডাকিলেন, তখন বোধ হয় ভোর ছ'টা হইবে। বিলাত আমেরিকায় ছ'টাকে আমাদের দেশের ভাষার অর্থে ঠিক ভোর বলা যায় না। অর্থাৎ ছ'টার সময় কোনও লোকই প্রায় শয্যাত্যাগ করে না। আমি চোখ মেলিয়া ষ্টেশনের দিকে জানালার শার্শির ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ষ্টেশন একরূপ জনমানবশূন্য, আর আকাশ হইতে অবিরাম তুষার পড়িতেছে। গাড়ী হইতে নামিয়া যাহা হউক একখানা ঘোড়ার গাড়ী পাইলাম। তাহার আশ্রয়েই তুষার কাটিয়া মিসেস্ বুলের বাড়ীর দিকে চলিলাম। সারারাত্রের তুষারপাতে পথঘাটগুলি তুষারস্তূপে ঢাকিয়া আছে। শীতকাল—গাছের পাতা নাই। ডালগুলি শুক্‌না কাঠের মত দেখায়। এই পত্রপল্লবহীন গাছে তুষার পড়িয়া নূতন শুভ্র কোমল পত্রপল্লবের দ্বারা যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। তুষারপাতে শীতকালে সেদেশে বনস্থলী এই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। তাহার মাঝখান দিয়া যাইবার সময় মনে হয় যেন এক ইন্দ্রজাল পুরীর ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি। কেম্ব্রিজের এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মিসেস্ বুলের বাড়ীর দরজায় যাইয়া হাজির হইলাম। সহরের ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই। চারিদিকে পল্লীতে প্রাণের সাড়া পড়ে নাই, কেবল দু'পাশের বাড়ীর ছাদের উপরের চিম্‌নীর বা ধূম নির্গমন প্রণালীর ভিতর দিয়া ধূম উদ্গীরিত হইতেছে। ইহাতেই

বাড়ীর ভিতরে যে মানুষ আছে, অনুমানখণ্ডে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। মিসেস্ বুলের দরজার ঘণ্টা বাজাইলে একজন পরিচারিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

"আপনি কি মিষ্টার পাল ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

"আপনার জন্য ঘর প্রস্তুত আছে। ঘরের আগুন দিবার জায়গায় আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছি।" এই বলিয়া আমার ব্যাগটা হাতে করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে আমাকে লইয়া গেল।

"সাড়ে আটটার সময় মিসেস্ বুল নীচে নামিয়া আসিলেন। ন'টায় প্রাতরাশের বা ব্রেকফাষ্টের সময়। আপনি ততক্ষণ বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া আমাকে আমার ঘরে ছাড়িয়া গেল। তখন বোধ হয় সাড়ে ছ'টা হইবে।

সাড়ে আটটার কিছু পরে মুখহাত ধুইয়া নীচে যাইয়া মিসেস্ বুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সেই সময়েই মিস্ নোবলের (ভগিনী নিবেদিতা) সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে অদ্ভুত পরিচয়। আমাদের ফলিত জ্যোতিষে মানুষের একটা 'গণ' নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কেহ দেবগণ, কেহ বা নরগণ, কেহ বা রাক্ষসগণ। নিবেদিতার কোন 'গণ' ছিল জানি না, আমারই বা কি 'গণ' সে কথাও মনে নাই। কিন্তু আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই সেই প্রথম দিন অবধি যেরূপ দৈব দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহাতে নিবেদিতার দেবগণ এবং আমার রাক্ষসগণ, এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কারণ দেখা হইলেই একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুণ উভয়ের মধ্যে কাহারওই মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বোধ হয় কোন বৈরিতার লেশমাত্র জাগে নাই। এ সকল ঝগড়ার ফলে আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধারও কোনই ব্যাঘাত কখনও জন্মে নাই। নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলিকাতায় ছিলেন। আমার 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলে তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েন এবং কিছুদিন প্রতি সপ্তাহে তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। সেই প্রবন্ধ-গুলিই পরে Web of Indian Life নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখনই দেখা হইয়াছে তখনই একটা কাল বৈশাখী ছুটিবার উপক্রম হইয়াছে। স্বর্গীয় পি, মিত্র মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে নিবেদিতা আমার কথা উঠিলেই বলিতেন—"পালের দাঁতগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি ? ঐ দাঁত দেখিলেই আমার মনে হয় তাহার ভিতরে বাঘ লুকাইয়া আছে।" কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে একটা অনাবিল সৌহার্দ্দ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করিয়াই নিবেদিতার ভারত প্রবাসের গোটা ছবিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। তাই তারই জন্য এ সকল কথা বলিতে হইল।

প্রাতরাশে বসিয়া স্বভাবতঃই কলিকাতার কথা উঠিল। আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক, নিবেদিতা ইহা জানিতেন। আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর একটা গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। নিবেদিতার

স্বচ্ছচিত্তে কখনও কোন মনোভাব ঢাকা থাকিত না। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অন্তরের অশ্রদ্ধা গোপন করিতে পারিলেন না। একেবারে সোজাসুজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিলেন। ঠিক কথাটা আমার মনে নাই, কিন্তু বোধ হয় কহিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশেষতঃ মেয়েরা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়াছেন ত?"

তিনি কহিলেন, "হাঁ।"

আমি। মিসেস্ পি, কে রায়কে চেনেন?

তিনি। চিনি। অমন মেয়ে অতি অল্পই দেখিয়াছি।—She is admirable.

আমি। মিসেস্ জে, সি বোসকে চেনেন?

তিনি। Oh, মিসেস্ বোস্ রমণীর শিরোমণি—She is superb.

আমি। এঁদের ছোট বোনকে জানেন?

তিনি। She is lovely.

আমি। শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়েকে দেখেছেন—মিসেস্ সরকার?

তিনি। হাঁ দেখেছি। She is very good.

আমি। আপনি বোধ হয় জানেন, এঁরা সকলেই ব্রাহ্ম মেয়ে। আর এঁদের ছাড়া আপনি যে আর কোনও ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে মিশিয়াছেন, এমন ত আমার মনে হয় না।

এই খানেই প্রথম পালা শেষ হইল।

বিকালে মিসেস্ বুল নিবেদিতার সঙ্গে আমাকে তাঁহার প্রতিবেশী ডাক্তার জোন্সের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার জোন্স্ স্বামী বিবেকানন্দের একজন বন্ধু ছিলেন। Comparative Religion সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সূত্রেই তিনি ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন। আমি মিসেস্ বুলের বাড়ী যাইব শুনিয়া অবধি তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। এইজন্যই মিসেস্ বুল আমাকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার জোন্স্ সদ্বিদ্বান ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। তবে তিনি কোনও বিষয়েই গোঁড়া ছিলেন না। বেদান্তের চর্চ্চা করিতেন, কিন্তু বৈদান্তিক হয়েন নাই। খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদ্যারও গভীর আলোচনা করিতেন, কিন্তু গোঁড়া খৃষ্টীয়ানও ছিলেন না। আমেরিকায় য়ুনিটেরিয়ান ও য়ুনিভার্সালিষ্ট —এই দুইটি উদার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। ইঁহাদের মতবাদ ও আদর্শের প্রতি ডাক্তার জোন্সের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি একজন সরল ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রেরণাতেই স্বামী

বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। আমার সঙ্গে দেখা হইবামাত্রই তিনি তাঁহার খবরের কাগজের cuttingএর খাতা খুলিয়া বিলাতের কোন্ কাগজে আমার সম্বন্ধে কখন কি বাহির হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া কহিলেন যে আমি তাঁহার নিকটে সাক্ষাৎভাবে অপরিচিত হইলেও বাস্তবিক অপরিচিত নহি, এই cuttingগুলি তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথার পরে খৃষ্টীয়ান প্রচারকদের কথা উঠিল। তাঁহাদের কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে ডাক্তার জোন্স্ আমার মতামত জানিতে চাহিলেন। আমি কহিলাম যে খৃষ্টীয়ান প্রচারকেরা কোন কোন দিকে আমাদের অশেষ উপকার করিতেছেন। আবার কোন কোন দিকে তাঁহাদের প্রচারের ফলে অনেক অপকারও হইতেছে। এই কথা শুনিয়া নিবেদিতা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। খৃষ্টীয়ান প্রচারকেরা যে কোনও দিকে এদেশের কোনও কিছু ভাল করিতেছেন, একথা তাঁহার সহ্য হইল না। এই প্রসঙ্গে আমাদের উভয়ের মধ্যে আবার ঝগড়া বাধিয়া গেল। তিনি কহিলেন যে আমি আমার দেশের কথা কিছুই জানি না। আমি কহিলাম, "এ মন্দ কথা নহে। আমি আমার সমাজের মাঝখানে থাকি। সুতরাং অত্যন্ত নৈকট্যনিবন্ধন ভাল করিয়া সকল দিক দেখিতে পাই না। য়ুরোপীয় লেখকেরা ভারতবর্ষ হইতে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উভয় দিক দিয়াই দূরে পড়িয়া রহেন, সুতরাং তাঁদেরও ভারতবর্ষের সত্য জ্ঞান হয় না। অতএব বাকী রহিলেন কেবল আপনি। আপনি ভারতবাসী নহেন, অন্যদিকে সাধারণ য়ুরোপের লোকের মতনও নহেন। অতএব কেবল আপনার চোখেই ভারতবর্ষের সত্য স্বরূপটী প্রকাশিত হইয়াছে।" আমার এই শ্লেষবাদে নিবেদিতা আরও চটিয়া গেলেন। কিন্তু জোন্স্ সাহেব মাঝখানে পড়িয়া এই ধূমায়মান ঝগড়াটাকে নিভাইয়া দিলেন। এ দিনের পালা এখানেই সাঙ্গ হইল।

পরদিন (কিম্বা সেদিনই সন্ধ্যায় ঠিক মনে পড়িতেছে না) আমাদের উভয়ের সংগ্রামের তৃতীয় পালার অভিনয় হয়। সেদিন মিসেস্ বুল বষ্টনের স্কুল সমূহের শিক্ষয়িত্রীদিগকে তাঁহার বাড়ীতে চা খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই তিন শত শিক্ষয়িত্রী এই উপলক্ষে মিসেস্ বুলের বাড়ীতে সমবেত হন। ইঁহারা দলে দলে বাড়ীর ঘরে ঘরে ও বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া আমি একটা ঘরে এক পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। দৈবদুর্ব্বিপাকে সে ঘরে নিবেদিতা অনেকগুলি শিক্ষয়িত্রীর নিকটে ভারতবর্ষের কথা কহিতেছিলেন। আমি নীরবে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। ক্রমে জাতিভেদের কথা উঠিল। নিবেদিতা জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার উপরে তাঁহার চোখ পড়িল। আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন:—"ঐ মিঃ পাল বসিয়া আছেন। আমি যে সকল কথা কহিতেছি তিনি হয়ত তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না।"—তখন সকলের চোখ আমার উপরে পড়িল। এ অবস্থায় আমার নীরব থাকা অসম্ভব হইল। আমি কহিলাম, "জাতিভেদ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের একটা ভুল ধারণা আছে। সেটা এই যে এই জাতিভেদ আছে বলিয়াই

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না; এবং যতদিন এই জাতিভেদ উঠিয়া না যাইবে, ততদিন ভারতবর্ষের লোক এক জাতিতে পরিণত হইয়া আত্মশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। এই কথাটা নিতান্তই ভুল। জাতিভেদ থাকা বা না থাকার উপরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিছুতেই নির্ভর করে না। আমাদের দেশে জাতিভেদ বা Caste-distinction আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জাতিভেদ নাই, শ্রেণীভেদ বা class distinction সাংঘাতিক আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে রেষারেষি দেখিতে পাওয়া যায়, কে কাহাকে ঠেলিয়া নীচে রাখিবে বা টানিয়া নীচে নামাইবে, য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই লইয়া যে নিত্য বিরোধ বাধিয়াই আছে, আমার জাতিভেদ প্রপীড়িত দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সেরূপ কোনও বিরোধ নাই, সকলে জাতি-বৈষম্যটা একটা স্বাভাবিক ভেদ বলিয়াই মানিয়া লহে। মানুষের মধ্যে কেহ যেমন খাটো কেহ বা লম্বা হয়, কেহ বা শ্যামবর্ণ কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, কেহ বা স্থূল কেহ বা কৃশ হয়, কিন্তু এইজন্য যেমন কাহারও মনে অভিমান বা ঈর্ষার উদয় হয় না, সেইরূপ ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি ভেদ আছে বলিয়া পরস্পরের প্রতি কোনও ঈর্ষা জন্মে না; অন্ততঃ আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে কোথাও এরূপ ঈর্ষা দেখা যায় নাই। সুতরাং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রেণীভেদ থাকা সত্বেও যেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোনও সাংঘাতিক ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই, সেইরূপ ভারতে জাতিভেদ আছে বলিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের কোনও অন্তরায় হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু অন্যদিকে একথা মানিতেই হইবে যে এই জাতিভেদ হিন্দু ভারতের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতিভেদ আছে বলিয়া আমরা অবাধে আমাদের মানুষ বলিয়া যে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকার সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না।"

নিবেদিতা অমনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ কথা ঠিক নহে। আপনি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপরে এই আক্রমণ করিতেছেন।"

আমি কহিলাম:—"হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। প্রাচীনকাল হইতেই জাতিভেদ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত গুণাগুণকে অগ্রাহ্য করিয়া একটা জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যে বামুন হইয়া জন্মাইল, তাহার ব্রাহ্মণের কোনও গুণ থাকুক আর না থাকুক, সে-ই ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা পাইবে। আর যে শূদ্রের ঘরে জন্মিল, তাহার যত গুণই থাকুক না কেন, শূদ্রত্বের অমর্য্যাদা সে সর্ব্বদাই ভোগ করিবে। বিদ্বান হইলেও সে লোকশিক্ষক হইতে পারিবে না; ধার্ম্মিক হইলেও সে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিবে না। এ সকলই শাস্ত্রের কথা। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের আইন-কানুন এই প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই আমরা আজ ব্রাহ্মণ না হইয়াও বেদ পড়িতে পারিতেছি, বেদান্ত-ধর্ম্মের আলোচনা করিতে পারিতেছি, এবং ধর্ম্ম-প্রচার করিতে পারিতেছি। প্রচলিত শাস্ত্রের প্রাচীন প্রভাব যদি আজ থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নিকটে ধর্ম্ম-প্রচার করিবার অপরাধে

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমার কণ্ঠে চারি আঙ্গুল পরিমাণ গরম গলান সীসা ঢালিয়া দিয়া আমাদের এই অনধিকারচর্চ্চার প্রায়শ্চিত্ত করাইত।"

নিবেদিতা এই কথাতে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "It is a lie. The Swami has been accepted as the Guru of the Hindus—মিথ্যা কথা। স্বামীজীকে হিন্দুরা ধর্ম্মগুরুর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে।" আমি কহিলাম:—"Miss Noble, If you were not a woman I would know how to answer this insult. Orthodox Hindu Society *has not* accepted Swami Vivekananda as their Guru. He is only a religious and social reformer like Ram Mohan Roy.—মিস্ নোবল, আপনি স্ত্রীলোক না হইলে এই অপমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতাম। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদিগের ধর্ম্মগুরু নহেন। হিন্দু সমাজ তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করে নাই। তিনি রাজা রামমোহন প্রভৃতির মতন একজন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক মাত্র।" নিবেদিতার কোমল প্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না। আমার কথায় তাঁর গুরুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে কথা ত মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। কহিলেন, "যখন তখন তোমরা আমাদিগকে স্ত্রীলোক বলিয়া অপমান কর। You always insult us as women in every argument."

আমি কহিলাম, "স্ত্রীলোক বলিয়া অপমান করি না, সম্মান করি। এতটা সম্মান করি বলিয়াই আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী কহিলেন, অথচ তাহার যথাযোগ্য জবাব আমি দিতে পারিলাম না।"

আমাদের এই ঝগড়ায় সেই সান্ধ্য-সম্মিলনের হাওয়াটা গরম হইয়া উঠিল। এজন্য আমি একটু লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম; নিবেদিতাও মর্ম্মাহত হইয়া নীরব হইয়া গেলেন। অভ্যাগতেরা সকলে চলিয়া গেলে মিসেস্ বুল আমার সমক্ষে নিবেদিতাকে কহিলেন, "মিঃ পাল যাহা কহিয়াছেন, তাহা সত্য কথা। তুমি এজন্য রাগ করিয়াছ কেন? বিবেকানন্দ নিজের মুখে আমাকে কহিয়াছেন যে হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া মানে না, তিনি ধর্ম্মসংস্কারক মাত্র।" মিসেস্ বুলের কথার উপরে আর কথা চলিল না। কিন্তু এই একদিনের অভিজ্ঞতাতেই আমার মিস্ নোবলের সঙ্গে মিসেস্ বুলের আতিথ্য সম্ভোগ করিবার সাধ আর রহিল না। আমি দেখিলাম, থাকিলেই আবার কখন অশান্তি বাধিয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই সুতরাং পরের দিন মধ্যাহ্নে আমি ফিরিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে বষ্টনে Congress of Religionএর বার্ষিক অধিবেশন হয়। ডাঃ জোন্স্ এই কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন সহর হইতে অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনীষী এই কংগ্রেসে আসিয়া উপস্থিত হন। হার্ভাড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন এবং তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপকেরা এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। আমাকে হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন

সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পুনরায় নিবেদিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এই কংগ্রেসে আমি যখন বক্তৃতা করিতেছিলাম তখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার গৌরব-কাহিনী শুনিয়া নিবেদিতার দেহ-মন-প্রাণ সকল যেন গরবে ভারী হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে ব্রাহ্মসমাজের লোক নিবেদিতা তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গুরুনিন্দা করিয়াছি বলিয়া আমার উপরে যে রাগ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত তাঁহার মনে রহিল না। ভারতের কীর্ত্তিগাথা বিদেশীয়দিগের নিকটে গাহিতেছি দেখিয়া নিবেদিতার চক্ষে আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালবাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। মিসেস্ বুলের বাড়ীতে আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে মিলিয়াছিলাম। এই কংগ্রেস অব রিলিজিয়নএর অধিবেশনে ভারতের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া আমরা উভয়ে এমন এক সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, যাহা শত মতভেদ সত্ত্বেও চিরদিন অটুট ছিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

আগমনী

[রচনা——————স্বর্গীয় কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

সকল রসের উৎসরূপিনা এস মা, ঈশাণী এস,
সকল হৃদয় মধুর সরস করি'।
তুমি কৃপাময়ী জগৎ-জননী এস মা, অভয়া এস,
করুণাধারায় ভাবনা-বেদনা হরি' ॥
শান্তরসের তুমি মা প্রতিমা এস মা, সারদা এস,
শারদযামিনী বোধন-রাগিণী ভরি'।
বিভীষিকাময়ী ভীমা করালিনী এস মা, রুদ্রাণী এস,
অধম সুতের জীবন-শ্মশান 'পরি ॥
বীরের জননী বীরপ্রসবিনী এস মা, বরদা এস,
হীনতা দীনতা পড়ুক সভয়ে সরি'।
মহা-সাগরের কল্লোল তুলি' এস মা, ভবাণী এস,
ভাসাব অকূলে আজিকে মানস-তরী ॥
বীর ও রৌদ্র রসের মূরতি তুমি মা, শিবাণী এস,
জড়িমা-আঁধারে আলোক-চেতনা গড়ি'।
এস মা, এস মা, সঙ্গীতময়ী, তৃষিত ব্যাকুল প্রাণে,
জুড়াই হৃদয়ে রাতুল চরণ ধরি' ॥

[সুর ও স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

জলধর-কেদারা——————তেওরা।

১´ ২ ৩ ১´ ২

II { র্সা র্সা না | র্সা -া | র্রা র্সা I না -র্সা ধা | না -া |

স ক ল র ০ সে র উ ৎ স ক্ব ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´

| ধা পা I মা গমা রা | সা -া | সা সা I মা -া -গা |

পি নী এ স০ মা ঈ ০ শা নী এ ০ ০

২ ৩ ১´ ২ ৩

| -পা -ক্মা | পা -া } I পা ধা পা | র্সা -া | না র্সা I

০ ০ স ০ স ক ল হৃ ০ দ য়

১´ ২ ৩ ১´ ২

I পা ধা না | পা -মা | ধা পা I মা -গা -পা | মা -পা |

ম ধু র স ০ র্ স ক ০ ০ রি ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´

| -মা -া I { পা ধা পা | পা -া | মা মা I গা মা পা |

০ ০ তু মি কৃ পা ০ ম য়ী জ গ ত

২ ৩ ১´ ২ ৩

| ধা -া | না পা I মা গা পমা | রা -া | রা রা I

জ ০ ন নী এ স মা০ অ ০ ভ য়া

১´ ২ ৩ ১´ ২

I ন্‌া -া -া | -রা -া | সা -া } I সা ন্‌া রা | সা -া |

এ ০ ০ ০ ০ স ০ ক রু ণা ধা

৩　১ʹ　২　৩　১ʹ
| মা -া I গা হ্মা পা | ধা -া | হ্মা পা I মা -গা -পহ্মা |
রা য় ভা ব না বে • দ না হ • • •

২　৩
| ধা -পা | -মরা -সা II
রি • • • •

অন্তরা।

১ʹ　২　৩　১ʹ　২
II{পা -া র্সা | না -া | র্রা না I র্সা র্সা ধা | না -া |
শা ন্ ত র • সে র ভু মি মা প্র •

৩　১ʹ　২　৩　১ʹ
| ধা পা I পা হ্মা পা | গা -া | গা গা I মা -া -রা |
তি মা এ স মা সা • র দা এ • •

২　৩　১ʹ　২　৩
| -ন্া -া | সা -া} I সা ন্া রা | সা -া | মা মা I
• • স • শা র দ যা • মি নী

১ʹ　২　৩　১ʹ　২
I গা হ্মা পা | পা -া | হ্মা পা I মা -া -পা | ধা -র্সা |
বো ধ ন রা • গি ণী ভ • • রি •

৩　১ʹ　২　৩　১ʹ
| -ধা -র্সা I{পা ধা পা | র্সা -া | না র্সা I না র্রা র্সা |
• • বি ভী বি কা • ম রী ভী মা ক

২　৩　১ʹ　২　৩
| ধা -া | না র্সা I না র্রা র্সা | র্মা -া | র্মা র্মা I
রা • লি নী এ স মা রু দ্ রা ণী

১´ ২ ৩ ১´ ২
I না -া -র্রা | -র্সা -া | র্সা -া} I র্সা না র্রা | র্সা -া |
এ ॰ ॰ ॰ ॰ স ॰ অ ধ ম সু ॰

৩ ১´ ২ ৩ ১´
| না র্সা I র্সা ধা না | পা -া | ধা পা I মা -গা -পা |
ভে র জী ব ন শ্ম ॰ শা ন প ॰ ॰

২ ৩
| মা -রা | -ন্‌া -সা II
রি ॰ ॰ ॰

সঞ্চারী।

১´ ২ ৩ ১´ ২
II{সা ন্‌া রা | সা -া | মা মা I গা পা ধা | পা -া |
বী রে র জ ॰ ন নী বী র প্র স ॰

৩ ১´ ২ ৩ ১´
| ক্ষা পা I গা মা গা | পা -া | পা পা I ধা -না -ধা |
বি নী এ স মা ব ॰ র দা এ ॰ ॰

২ ৩ ১´ ২ ৩
| -ক্ষা -া | পা -া} I ধা না ধা | মা -া | ধা পা I
॰ ॰ স ॰ হী ন তা দী ॰ ন তা

১´ ২ ৩ ১´ ২
I মা গা পা | মা -া | মা রা I রা -ন্‌া -রা | সা -া |
প ড়্ ক স ॰ ভ য়ে স ॰ ॰ রি ॰

৩ ১´ ২ ৩ ১´
| -ন্‌া -সা I {সা মা পা | ক্ষা -া | পা পা I ধধা ধা পা |
॰ ॰ ম হা সা গ ॰ রে র ॰ কল্ লো ল

| মা -া | মা -া I রা রা সা | ধ্া -া | ধ্া ধ্া I
তু • লি • এ স মা ভ • বা নী.

১´ ২ ৩ ১´ ২
I ন্া -া -ধ্া | -প্া -া | ম্া -প্া} I ম্া প্া সা | ধ্া -া
এ • • • • স • ভা সা ব অ •

৩ ১´ ২ ৩ ১´
| ন্া সা I সা মা মা | গা -া | পা পা I মা -গধা -পা
কূ লে আ জি কে মা • ন স ত • • •

মা -রা | -ন্া -সা I
নী • • •

আভোগ।

১´ ২ ৩ ১´ ২
I {পা -ধা পা | র্সা -া | না -া I র্সা র্রা র্সা | ধা -া |
বী র্ ও রৌ • দ্র • র সে র মূ •

৩ ১´ ২ ৩ ১´
| র্সা র্সা I র্সা ধা ধা | না -া | না না I র্রা -া -া |
র তি তু মি মা শি • বা নী, এ • •

২ ৩ ১´ ২ ৩
| না -া | -র্সা -া} I র্সা র্রা র্সা | র্সা -া | র্মা র্মা I
স • • • জ ড়ি মা আঁ • ধা রে

I র্গা র্মা র্রা | র্রা -া | না র্সা I ধনা -র্সা -র্রা | না -া |
আ লো ক চে • ত না গ• • • ড়ি •

৩ { ১´ ২ ৩ ১
| -র্সা -া I {র্সা না র্সা | ধা -া | না ধা I পপা ধা পা |
০ ০ এ স মা এ ০ স মা সঙ্ গী ত

২ ৩ ১´ ২ ৩
| মা -গা | পা -া I ধা র্সা ধা | না -া | ধা পা I
ম ০ য়ী ০ তৃ ষি ত আ ০ কু ল

১ ২ ৩ } ১´ ২
I পা -মা -ধা | পা -া | -মা -পা} I র্সা র্সা না | ধা -া |
প্রা ০ ০ ণে ০ ০ ০ জু ড়া ই হৃ ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´
| র্সা ধা I পা ক্সা পা | মা -া | গা মা I রা -ন্া -রা |
দ য়ে রা ভৃ প চ ০ র ণ ধ ০ ০

২ ৩
| সা -া | -ন্া -সা II II
রি ০ ০ ০

সঙ্গীত-শাস্ত্রের (১) ষড়জ, (২) ঋষভ, (৩) গান্ধার, (৪) মধ্যম, (৫) পঞ্চম, (৬) ধৈবত, এবং (৭) নিষাদ, —এই সাতটি স্বরের প্রতিনিধি-স্থলীয় করিয়া, এ গানখানিতে যথাক্রমে (১) ঈশাণী, (২) অভয়া, (৩) সারদা, (৪) রুদ্রাণী, (৫) বরদা, (৬) ভবাণী, এবং (৭) শিবাণী,—ভগবতীর এই সাতটি নামোল্লেখ করা হইয়াছে। তাই নামগুলিকে, যথাক্রমে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি,—স্বরগুলির নীচে, রেখাদ্বারা চিহ্নিত করা হইল। দেখিতে পাওয়া যায় যে, গানখানিতে মা-ভগবতীর প্রতি প্রত্যেক স্বরের একএকটী স্বরূপ আরোপিত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক নামের ভিতর দিয়া প্রত্যেক স্বরের রস নির্ণয় করা হইয়াছে। ভগবতীর এই সাতটি নাম যাঁহারা উচ্চারণ করা আপত্তিযোগ্য মনে করিবেন, তাঁহারা যথাক্রমে স্বরের সম্পূর্ণ নামগুলি উচ্চারণ করিয়া গাহিলেও মাত্রার কোনই অসমতা ঘটিবে না; বরঞ্চ আরও প্রীতিকর হইবে। পুরুষবাচক সাতটি স্বরকে মাতৃ সম্বোধন করা চলে না বলিয়া (হয় ত কোন ভক্ত-সাধক, যিনি সাধনার অতি উচ্চ স্তরে গিয়াছেন, "মা-ভগবান" বলিয়া সম্বোধন করিতেও পারেন) এবং তাহাতে ব্যাকরণগত দোষ হইবে বলিয়া, স্বরগুলির সম্পূর্ণ নামের পরিবর্ত্তে ভগবতীর সাতটি নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক স্বরের রস ব্যাখ্যা করার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা সঙ্গীতপ্রিয় সাহিত্যরসিকেরা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

——লেখিকা

সত্যেন্দ্র কবি

(ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির শোক-সভায় পঠিত)

কবি সত্যেন্দ্রনাথ আর এ সংসারে নেই। যার প্রতিভায় "পৃথিবীর গায় স্বর্গের ছায়া পড়্‌তো"—কঠিন শব্দ "পাষাণ আনন্দরূপে পুষ্পিত হয়ে উঠ্‌তো"—সে আজ বাদলে-ঝরা বকুল ফুলটীর মত "বোঁটার বাঁধন অনায়াসে খুলে" মাটির সঙ্গে মিশে গেছে—কিন্তু একরাশ সুগন্ধ রেখে—যা মাতাল মৌমাছির মত সোনালি ডানায় ভর দিয়ে বাতাসের বুকে নেচে বেড়াচ্ছে। বুঝি মন্মথের সাজি হাতে নিয়ে কোন্ সৌন্দর্য্য-স্বর্গের অপ্সরা পৃথিবীতে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল,—পারিজাত ভেবে সত্যেন্দ্রকে তুলে নিয়ে গিয়েছে তাদের সেই সুদূর ওপারে—কিন্তু এখনো

"এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছ্বসি—
মুগ্ধ হিয়ায়, হাওয়ায় মেলি হাত
ও পারে তার মাল্য রচে উর্ব্বশী
স্বপন-মাখা মৌন আঁখি পাত।"

সত্যেন্দ্রনাথ আমার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আমি আজ এখানে বন্ধু-স্মৃতির মর্ম্মর দেউলের উপর অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তে আসিনি। যে বিশ্বজগতে একটি অনুকণা পর্য্যন্ত হারায় না সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ কখনো হারায়নি। বিফল বিলাপের স্বাভাবিক প্রেরণায় ভিতরকার প্রেমিকটি যখন লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদে—তখন উপরকার জ্ঞানীটি নেবে এসে তাকে হাত ধরে তুলে বলে—"ও মনুষ্যত্বের চেয়েও বড় মনুষ্যত্ব আছে—যাকে দুঃখের দৈন্য, শোকের ক্লীবতা স্পর্শ কর্‌তে পারে না—যা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রেও আলোকস্তম্ভের মত অচল অটল, যা উদ্দাম তাণ্ডবের মশাল-নৃত্যকে 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের' মত সুসংযত করে—যা চিন্তাজড় দর্শনের ঝাপ্‌সা কুয়াসাকে—দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে দেয়—যা বিভল উদ্ভ্রান্তের মুখ দিয়েও টেনে বের করে

"আন বীণা, বাঁধ তার, ঢাল সুরা, গাহ গান
যে গিয়েছে তার কথা কর আজি অবসান।"

কিসের অবসান কর্‌বো? কথার? হাঁ, সেই সব কথার—যা তাকে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে, গর্ব্বের সঙ্গে, মোহের সঙ্গে, আট্‌কে রাখে—সে সব কথার নয় যা তাকে নিখিলের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়—যা চিরন্তনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে নিবিড়তর করে তোলে। তাই আজ আমি সত্যেন্দ্রের সঙ্গে আমার বন্ধুজীবনের—দু একটা আমার কাছে বহুমূল্য হলেও, নগণ্য

ঘটনার উল্লেখ কর্‌তে চাই না—চাই সেই দু'একটা কথার উল্লেখ কর্‌তে যা দিয়ে সে এই বিরাট বিশ্ব পরিবারের সঙ্গে পরিচিত। আমি তার সেই জীবনের জীবনী থেকে দু' একটা কথা উদ্ধৃত কর্‌তে চাই—যে জীবন মৃত্যুহীন অটুট গৌরবে জগতের চিন্তাধারার মধ্যে বিরাজিত—যে জীবন অভ্রভেদী সত্যের পাদমূলে রসস্নেহনিষিক্ত দেহে ভাব-মন্দাকিনীর নির্ঝর প্রপাতে অবগাহিত—সৌন্দর্য্য শিল্পের হিরণ্য রশ্মিতে অনুলেপিত। আমি সে সব কথারও অবতারণা কর্‌তে চাই না যাতে সে নামগোত্রাদি সীমাপরিচ্ছিন্ন হয়ে জগতের একটি ক্ষুদ্র কোণে নিজের পার্থিব অস্তিত্বকে পাতার আড়ালে জোনাকীর মত লুকিয়ে রেখেছিল—সে সব কথারও অবতারণা কর্‌তে চাই না যাতে—সে বিদ্যামন্দিরের স্বল্প-কৃতিত্বে ভূষিত হয়ে সামাজিক বেদীর উপর কঠোর মিতভাষিত্বের বহ্নিশিখাবেষ্টিত হয়ে বসে থাক্‌তো। সে যে সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, সে যে ক্ষণভঙ্গুর দেহের উপর অস্ত্রোপচারের শেষ যন্ত্রণাকেও করুণ প্রসাদের মত মাথায় তুলে নিয়ে অকালে ইহলোকের আকাশ থেকে ছিন্নসূত্র ঘুঁড়ির মত খসে প'ড়ে—অনন্তের কোলে বিলীন হয়ে গেল—এসব তুচ্ছ কথার শোকাঞ্জলিকে আবর্জ্জনার মত দুহাত দিয়ে সরিয়ে—আমি চাই তার সেই জ্যোতির্ম্ময় কবি মূর্ত্তির সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে—যা নাম গোত্রহীন ফুলের মত আপনাতে আপনি বিকসি' নগ্ন-সৌন্দর্য্যের নগ্ন মহিমায় উদ্ভাসিত—যার আরতির শঙ্খ বাজ্‌চে সবুজ পরীর গানে, দীপ জ্বল্‌ছে চাঁপাফুলের আত্মকথায়—ধূপপরিমল উঠ্‌চে নারীবন্দনার উচ্ছ্বাসে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা আড়ম্বরহীন গ্রাম্যবধূর মত। শাঁখা, শাড়ী, কাজল, সিঁদূর, আল্‌তা, টিপ্‌ এই অলঙ্কারই তার সব—এতেই সে মুগ্ধকারিণী। তার অনল শিখার মত ছিপ্‌ছিপে দেহখানি যেমন সতেজ তেমনি কোমল, তেমনি মার্জ্জিত। তার চোখের দৃষ্টি সহজ সরল কটাক্ষহীন—সে ইনিয়ে বিনিয়ে ফেনিয়ে কথা বল্‌তে জানে না—তার গলার স্বরও পরিষ্কার, সঙ্কোচহীন। শুনুন সে কি ভাবে মেঘের কাহিনী গাইচে—

"সম্বর হ্রদে জর্জ্জর দেহে ঘুমায়ে আছিনু ভাই
লবণে জড়িত লহরের কোলে, ঘুমেও স্বস্তি নাই;
সহসা পূরবে তরুণ অরুণ হাসিয়া দিলেন দেখা—
আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম, অরুণ কিরণ লেখা
কিরণাঙ্গুলি ধরি
আমি, উঠিলাম ত্বরা করি
কম্পিত, ক্ষীণ, জর্জ্জরতনু, ললাটে বহ্নি-শিখা"

তারপর একদিন—

"ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ বেশ
গর্জ্জনধ্বনি সহসা উঠিল, ব্যাপিয়া সর্ব্বদেশ
এপারে বজ্র অট্ট হাসিল ওপারে প্রতিধ্বনি
সংজ্ঞা হারানু, কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।
জাগিনু যখন শেষ,—
দেখি, আছি আমি ব্যাপি দেশ
ভূতলে অতলে যেতেছে মিলায়ে আমার সে তনুখানি।"

তারপর দেখুন সে কেমন ছবি আঁকতে পারে। তুলির ডগায় অল্প একটু রং তুলে নিয়ে সে দু' এক আঁচড়ে নিশীথ সমুদ্রের ছবি এঁকে ফেল্লে—

"ভেলার আঠা অন্ধকারে জড়ায় যখন আঁখি
ঘরে যখন ফিরেচে লোক, কুলায় মাঝে পাখী
তখন জলে ঢেউয়ের মালায়, জলের জোনাক্ পোকা
তটের সীমায় চূর্ণ হীরা নেইকো লেখা জোকা।"

কবিতা যে একটা কলা, একটা শিল্প, একটা আর্ট—সে যে কেবল একটা অসম্বৃত অসম্বদ্ধ-ভাবের বন্যা নয়—তা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের ছত্রে ছত্রে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাতে ভাবের সঙ্গে ভাবের রং মাখামাখি, সুরের সঙ্গে সুরের হাত ধরাধরি, শব্দের সঙ্গে শব্দের ফুল ছড়াছড়ি—আর ভাব সুর শব্দ এ তিনের সঙ্গে, তিনের প্রাণ মেশামেশি। স্বীকার করি এটা কৃত্রিমতা—কিন্তু এই কৃত্রিমতার মধ্যেই স্বাভাবিকতার বাস, এই পরাধীনতার মধ্যেই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, এই বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির ঐশ্বর্য্য। আর্টের রঙ্গীন মায়া-কাচের ভিতর দিয়ে কবি কিশোরীর রূপ দেখাচ্চেন—চণ্ডীদাস আর রবীন্দ্রনাথের পর এমন রূপ কেউ আমাদের দেখিয়েচেন কি ?—

"তার জলচুড়িটীর স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল
তার আলতা পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।
করমচা ডাল আঁচল ধরে
ভোমরা তারে পাগল করে
মাছরাঙ্গা চায় শীকার ভুলে
কুহরে পিক অনর্গল—
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল
ও সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁজের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়—
চাঁদমালা তায় ভাসতে থাকে।
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে
কল্মী-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে ;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাসতে থাকে।"

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ইন্দ্রিয়-নেংড়ানো রসই বেশী, এ অভিযোগ আমি অনেকের মুখেই শুনেছি। আঙুর, গোলাপ, কিংখাব, মখমল, ধূপ, কস্তুরী, উষীর চন্দন, প্রবাল মুক্তা, সল্মা চুম্কী, পেয়ালা, সাকী, মহুয়া, ডালিম এই সব নাকি তাঁর কবিতায় রূপরসগন্ধের বাজার বসিয়েচে। হতে পারে, কিন্তু তবু এ অভিযোগ মিথ্যা। তাঁর কবিতা ঠিক সে শ্রেণীর কবিতা নয় যাকে ইংরাজীতে বলে Sensuous—বরং সেই শ্রেণীর কবিতা যাকে ইংরাজীতে বলে Picturesque

and Concrete। তিনি ভোগের লিপ্সাকে উদ্দীপিত করবার জন্য ভোগের বস্তুর অবতারণা করেননি—সুইনবার্ণ, জেবুন্নিসা এবং করুণানিধানের সঙ্গে এইখানে তাঁর তফাৎ। তিনি ইন্দ্রিয়ের উপর দাঁড়িয়ে অতীন্দ্রিয় অন্তরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেচেন। শুনুন তাঁর বর্ষ বরণ—

"মধু যামিনীর মোতিহার ছিঁড়ে
ছড়ায়ে পড়েচে মহুয়া ফুল
তোতার তুতিয়া রঙের নেশায়—
বনভূমি আজ কি মশগুল!
রেশমী সবুজে সাজে দেবদারু
পশমী সবুজে রসাল সাজে
আবৃত ধরার কিশোর গরব
সবুজের মথমলের মাঝে।
* * *

ওগো পুরনারী ভরি হেমঝারি
চন্দন বারি ঢাল লো ঢালো
শিরীষ ফুলের পেলব কেশর
আকাশে বিছায় উষার আলো—
* * *
চন্দনলেখা দ্বারে দ্বারে আজি—
বন্দন-মালা দুলিছে বায়ে
পেয়ারা-ফুলের রেশমী মিঠাই
ছড়ায়ে পড়েছে দখিণে বায়ে।"

কিন্তু কেন? যে সলজ্জ আশা-বধূ অনুরাগ-চেলী পরে হৃদয়ের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে—তার নববর্ষের বরটীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করচে—দেখ্‌চে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত দুনিয়া সুন্দর হয়ে মধুর হয়ে রঙীন হয়ে উঠ্‌চে—তার মন কিন্তু শিরীষ ফুলেও নেই—পেয়ারা ফুলেও নেই—চন্দন বারিতেও নেই—রেশমী সবুজেও নেই—আছে বরের পথ পানে—তাই সে শেষকালে গাইলে—

"উৎসব সুরে বাঁশী বাজে পুরে
অতিথি আলয়ে এস হে তবে
সাক্ষী দেবতা, তোমায় আমায়
সপ্তপদীর অধিক হবে।"

আবার অনেকে সত্যেন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির আসন দিতেও কুণ্ঠিত, কেননা তিনি অনুবাদক তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই পরের ভাল কবিতার অনুবাদ। যাঁরা এ কথা বলেন, আমার মনে হয়, তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদগুলি ভাল করে পড়েননি। যাঁরা পড়েচেন তাঁদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বল্‌তেই হবে—"অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর-প্রাপ্তি। আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়েচে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে—ইহা সৃষ্টিকার্য্য। বাংলা সাহিত্যে এ অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে—ইহাদিগকে পূর্ব্ব নিবাসের পাস্ দেখাইয়া চলিতে হইবে না।" একটা নমুনা দেখুন। জাপানী মেয়ে ওহারু প্রজাপতির মন্দির-কুট্টিমে জানু পেতে বসে উর্দ্ধকরজোড়ে নিজের মনোমত বর প্রার্থনা করচে—

"দাও হেন পতি যাহার মূরতি
হৃদে অহরহ রয়
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয়।
জন্ম-তোরণে জন অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়,
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল মূরছায়।

দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম।
কোন্ সে জনমে, কোন্ সে ভুবনে
কোন বিস্মৃত যুগে
চেরিফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে।"

* * *

একি অনুবাদ! একি চর্ব্বিত চর্ব্বণ! কে বল্‌বে এ কবিতা জাপানী কবি নোগুচি আগে জাপানী ভাষায় লিখেছিলেন। এ যে বাঙ্গালী মেয়ের প্রাণ, বাঙ্গালী মেয়ের সংস্কার—বাঙ্গালী মেয়ের ভাষা; এ এক বাঙ্গালা কবিই লিখ্‌তে পারেন। এ ফটো নয়—তৈলচিত্র!

এইবার কবির ছন্দ। ছন্দকে বাঁকাতে চুরতে ভাঙ্গতে গড়্‌তে এক ভারতচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউই সত্যেন্দ্রের সমকক্ষ ন'ন। তাঁর ছন্দ ত অক্ষরগোনা মাত্রা মেলানো আড়ষ্ট নিয়মের সমষ্টি নয়—যাকে লাজকুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা, চেলার পুঁটুলী বঙ্গবধূর মত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অবরোধ থেকে টেনে বের করা হয়েচে—এ যেন কোন্ নৃত্যপরা উর্ব্বশীর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি—নিত্য-নূতন লাস্য, নিত্য-নূতন পদক্ষেপ, নিত্য-নূতন লীলা বিভ্রম। এ যেন কার চরণ-মঞ্জীরের তালে তালে,

"ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গেরি দল
শস্য-শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।"

একবার সে বসন্ত হাওয়ায় কচিপাতার মত নেচে উঠ্‌চে

"হাস্ তুই, খেল্ তুই, কলরব কর তুই,
সুমধুর হাসি দিয়ে মুখখানি ভর তুই,
বাপমার কোল জুড়ে থাক সুন্দর তুই
খোকা তুই ভাল থাক্‌রে—"

একবার সে ফুলের স্তূপে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্চে

"শেফালি লো সন্ধ্যা গেলো
মুকুল ফুটাও
সুরভি ছিটাও পবনে উঠাও
ভুবনে ছুটাও
মুকুল ফুটাও;

আঁধার গলে জ্যোৎস্না জলে
তুমিও গলাও
হাওয়ারে দুলাও তন্দ্রা বুলাও
পরাণ ভুলাও
গন্ধ বিলাও।"

একবার সে উপল থেকে উপলে গিরিনির্ঝরের মত লাফিয়ে পড়চে—

" কানে সুনীল অপরাজিতা, পাপড়ি চুলে জাফরাণের
পায়ে জড়ায় নুপূর হয়ে শেষ বাসরের রেশ গানের
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন-নীলে উত্তরী
নীল পরী গো নীল পরী।"

আবার একবার সে প্রশান্ত সাগরের হিল্লোলের মত বেদনার ভারে দুলচে—

" বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন
বিদ্যুতের দৌত্য চলে মিলাইতে ছিন্নভিন্ন মেঘে
অন্ধ করা অন্ধকারে বদ্ধ দৃষ্টি যামিনী গহন
বন্দীর মন্দিরে হায় ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা আছাড়িছে বেগে।"

সত্যেন্দ্রনাথ দশের কবি না হলেও দেশের কবি। তিনি যে শুধু বাংলা দেশে জন্মে, বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন বলে দেশের কবি তা নয়—তিনি বাংলা দেশকে ভালবেসে বাংলা ভাষাকে ভালবেসে দেশের কবি। যে প্রাণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গেয়েছিলেন—"সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং, শস্যশ্যামলাং মাতরং,"—যে প্রাণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—"ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি—চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী"—যে প্রাণ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"—সেই প্রাণ নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ গেয়ে গিয়েচেন্—

" কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই দল্‌তে হয়রে দুর্ব্বা কোমল
কোথায় ফলে সোণার ফসল সোণার কমল ফোটেরে
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে।

কোন ভাষা মরমে পশি আকুল করে তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের—কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে।"

দেশ-মাতৃকার উপর সত্যেন্দ্রনাথের এই যে প্রেম—এ কেবল উপাসকের ভক্তি নয়—সন্তানের নাড়ীর টান। তাই তিনি কবিতার বাঁশীকে মাঝে মাঝে কুড়ুল করে নিয়ে দেশাচারের বিষবৃক্ষের মূলে নির্ম্মম জোরে আঘাত করেচেন—কখনো কুড়ুল এমনিভাবে পড়্‌চে—

" সুজলা এই বাংলাতে হায় কে করেচে সৃষ্টিরে
নির্জ্জলা ঐ একাদশী, কোন দানবের দৃষ্টি রে
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল জ্বলে গেল বাংলা দেশ
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভস্মশেষ—"

কখনো বা কুড়ুল এমনিভাবে পড়্‌চে—

"নূতন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারায় চল্‌ল রে
মৃত্যু স্বয়ম্বরের আগুন জ্বল্‌ল দেশে জ্বল্‌ল রে
কুশণ্ডিকার নয় এ শিখা এযে ভীষণ ভয়ঙ্কর
বঙ্গ-গেহের কুমারীদের দুঃখহারী রুদ্রবর;
মানুষ যখন হয় অমানুষ আগুন তখন শরণ ঠাঁই
মৃত্যু তখন মিত্র পরম, তাহার বাড়া বন্ধু নাই।"

সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের আর একটা দিকও আছে। সে দিকে তিনি দীনা ভাষা-জননীর জন্য পথে পথে পয়সা কুড়িয়ে ফিরেচেন। কোথায় গর্ব্বিত পার্শীভাষা, কোথায় "মমি"ত্বে পরিণত সংস্কৃত ভাষা, কোথায় জাতে-ঠেলা চল্‌তি বাংলা ভাষা সকলের কাছেই তিনি ভিক্ষার ঝুলি পেতেছেন—সকলের কাছ থেকেই দু'একটা নতুন শব্দ চেয়ে চিন্তে এনে তাই দিয়ে সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে সাজিয়েছেন—তিনি কখনো লিখ্‌চেন—

"বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা ঝামট্‌ ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি
লাগবে উছট্‌—ছাটের জলে ঝাপ্‌সা হবে দৃষ্টি।"

কখনো বা লিখ্‌চেন—

"হাল্কা হাসির গুল্‌গুলাবি পাপ্‌ড়ি কেবল ছড়িয়ে রে
আমেজে মশ্‌গুল্‌ করে হ্যায় সকল শিকড় নাড়িয়ে রে।"

সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলেই আমি এ প্রবন্ধ শেষ কর্‌বো। তিনি যে কেবল রৌদ্র করুণ শান্ত রসের কবিতা লিখ্‌তেন তা নয় হাস্য রসের রচনাতেও তাঁর বেশ হাত ছিল। তাঁর এক টিকী-মঙ্গলই তাঁকে হাস্যরসের কবি সাব্যস্ত কর্‌তে পারে—সে কি সুন্দর!

"ওগো কারণ সলিলে কুঁকুড়ি শুঁকুড়ি
　ডিম্বে যেমতি হংস,
ছিল চৈতন চুটকী আদিতে
　টিকী হয় যার বংশ,
তারে　চৈ চৈ করে আদিম আঁধারে
　ডাকিল সপ্ত ঋষি গো
তাই চৈতন নাম হল তার
　যে নামে ভরিল দিশি গো;
তারে—ব্রহ্মা কহিল টিকিয়া থাকহ'
　তাই টিকি তার নাম।"

এই পর্য্যন্ত মনে আছে—তারপর, দোহার কি লোহার

"এরিমুম তেরি না
টিকী রাখ দেরী না—"

সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যোজ্জ্বল অশরীরী মুখখানির নিকট আজ এইখানেই বিদায় নিলুম।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

"মহত্তরের মহৎকাজ"

(১)

(২)

(৩)

(৪)

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

অনন্তানন্দের পত্র

ভায়া,
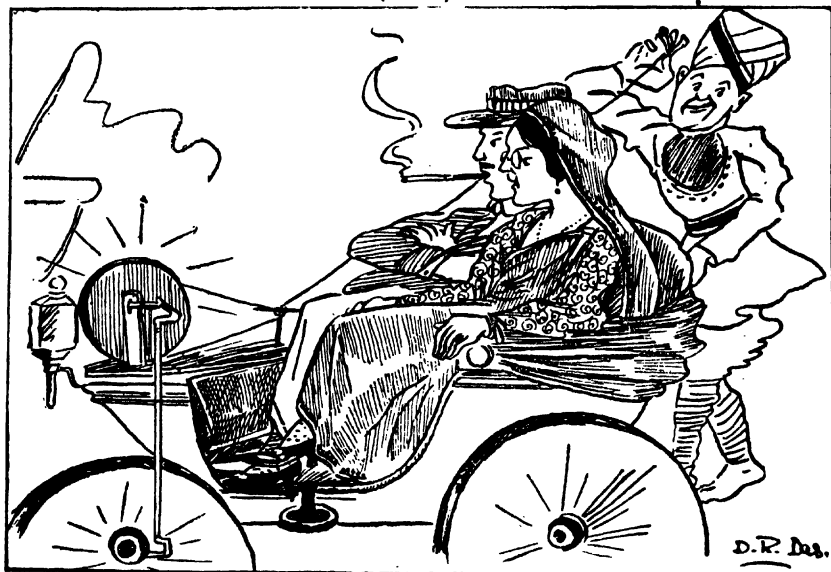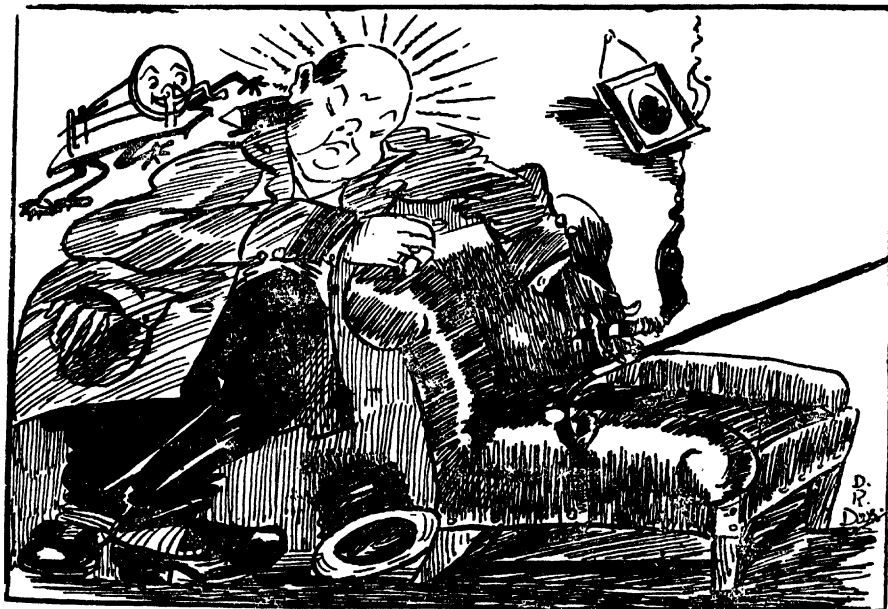
এ দু বছর কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলাম তাই জানতে চেয়েছ। সে অনেক কথা। সবটা বুঝিয়ে বল্‌তে পারব কিনা জানিনে। একেবারে প্রাণের ভেতরকার সুখ দুঃখের কথা কাগজে কলমে ফুটিয়ে তোলা বড় শক্ত। শরৎ চাটুয্যের প্রাণ আর শরৎ চাটুয্যের কলম যদি চুরি করতে পারতুম, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তুম।

তোমরা যেদিন খদ্দর পরে মোটরে চড়ে রিষড়ের কুলিদের কাছে চাঁদা আদায় আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ আর ত্যাগধর্ম্মের মহিমা প্রচার করতে গিয়েছিলে, মনে পড়ে? ফেরবার মুখে তোমরা যখন কেলনারের দোকান থেকে এক এক গ্লাস বরফ আর সোডা খেয়ে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলে, তখন আমি ষ্টেসনের বাইরে এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলুম। মেজাজটা যে খুব ঠিক ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। কেন না তোমাদের ত্যাগধর্ম্মের সঙ্কীর্ত্তন যে আমার কোন কালেই বরদাস্ত হয় না, তা তুমি বিলক্ষণই জান।

কিন্তু যাক্ সে কথা। চুপ করে তোমাদের ত্যাগধর্ম্মের বহরটা দেখে জ্ঞানলাভ কর্‌বার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ পকেটটাতে একটু টান পড়তেই পিছন ফিরে দেখি একটা ছোট্ট ছেলে আমার পকেটের রুমালখানা নিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুট দিচ্ছে। ছেলেটা ত আর আমার মত 'শিল্ড ম্যাচে' ফরওয়ার্ড হয়ে খেলেনি; আমার সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন? ধরা পড়তেই একেবারে ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেল্‌লে। বলে কি না—'ভুখা হ্যায়'!

'বেটা আমার! ভুখা হ্যায়!'—বলেই আমি ধাঁ করে একটা চড় কসিয়ে দিলুম। বলা নেই, কওয়া নেই—ছেলেটা একেবারে লোটন পায়রার মত লুটতে লুটতে পড়ে গেল।

তোমরা ফিরে এলে। আমার ফেরা হলো না। কি মনে হতে লাগলো জানিনে। ছেলেটার মাথার কাছে চুপ করে বস্‌লুম। মরে গেল নাকি ছোঁড়া? না, বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, বুক ধক্ ধক্ করছে।

* * *

ঝম্ ঝম্ করে সেই সময় বেশ এক পশলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা গাছতলায় এসে দাঁড়ালুম। মুখে বৃষ্টির ছাট লেগেই হোক আর যে কারণেই হোক, ছেলেটা দেখলাম সেই সময় চোখ খুলে পিট পিট করে চাইছে। বার তের বছরের ছেলে হবে, কিন্তু হাল্কা যেন সোলা। বুকের পাঁজরগুলো এক একখানা করে গোণা যায়। মাথার ভিজে সপ্‌সপে চুলগুলো মুখচোখের উপর পড়েছিল। সেগুলো সরিয়ে দিতে দেখলাম দুটো বেশ ডাগর ডাগর চোখ অনিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখের চাহনিতে তখনও ভয় মাখান।

"মাৎ মারো বাবুজী, মাৎ মারো।"

"না রে না, মারবো না। তোর বাড়ী কোথা ?"

ঊর্দ্ধমুখ রাক্ষসের মত কলগুলো যেখানে চিমনি মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা হাত বাড়িয়ে সেই দিকে দেখিয়ে দিলে। আমি বল্‌লুম—"চল্, তোকে বাড়ী রেখে আসি।"

তাদের বাড়ীর কাছে যখন এসে পৌঁছুলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাড়ীই বটে! চারটে বাঁশের খুঁটির উপর একখানা গোলপাতার চালা। তিন দিক দরমা দিয়ে ঘেরা; আর এক দিকে একখানা ছেঁড়া চট ঝুলছে। সুমুখে একটু দাওয়া; তার উপরের চালা আধখানা ভেঙ্গে পড়েছে। দাওয়ার এক কোণে একখানা ভাঙ্গা শিল আর একটা নোড়া। কি খানিকটা বাটনা বাটা হয়েছিল; তার অর্দ্ধেকটা জলে ধুয়ে মেজের কাদার সঙ্গে মিশে গেছে। ঘরের কোণে একটা খুঁটির সঙ্গে পা বাঁধা একটী ৮।৯ মাসের মেয়ে খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাতে মুখে কাদা মাখছে; আর তারই কাছে একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর খান দুই জরাজীর্ণ কাঁথা মুড়ি দিয়ে কে একজন পড়ে আছে।

ছেলেটা ঘরের দরজার কাছ থেকে ডাক্‌ল——"মায়ি!"

'মায়ি'র সাড়াও নেই, শব্দও নেই। ছেলেটা তাড়াতাড়ি গিয়ে তার মায়ের মুখের উপর থেকে কাঁথা সরিয়ে নিয়ে কপালে হাত দিয়ে দেখলে। তার পর মায়ের বুকের উপর পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো—'মায়ি মেরি, ও মায়ি মেরি'।

* * *

কেন জানিনে; কিন্তু সেখান থেকে চোঁচা দৌড় দিলুম। পোয়াটাক পথ ছুটে এসে যখন গঙ্গার ধারে পড়্‌লুম তখনও আমার গা কাঁপচে; কপালে পিল্ পিল্ করে ঘাম বেরুচ্চে। পকেট থেকে রুমালখানা বার করতে গিয়ে রুমালে বাঁধা টাকাটা হাতে ঠেক্‌লো। ছেলেটার গালে চড় মেরে ঐ টাকাটাই কেড়ে নিয়েছিলুম। উঃ!

ছুঁড়ে টাকাটা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম।

ভদ্রলোকের পোষাক গায়ে যেন আমার কামড়াচ্ছিল। সেগুলো খুলে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বল্‌লুম——'বস্!'

চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না। আবার সেই গোলপাতার কুঁড়ের কাছে আস্তে আস্তে ফিরে এলুম। উঁকি মেরে দেখলুম ছেলেটা উপুড় হয়ে মেজের উপর পড়ে আছে। তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলুম—'ভেইয়া!'

সেই জীর্ণশীর্ণ অপরিচিত ছেলেটা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে——'ভেইয়া!'

আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। তারপর যখন আরও দু তিন জনকে ডেকে তার মায়ের সৎকার করে ফির্‌লুম তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে গেছে। মনে হলো মনের অন্ধকারও যেন অনেকখানি কেটে গেছে।

* * *

ঠিক করলুম এইবার ছোটলোক হতে হবে। ভদ্রলোকের উপর অরুচি ধরে গেছে। ভদ্রলোক মানে একটা জামা, একখানা চাদর, আর এক জোড়া জুতো বৈ ত নয়! তা থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? তা ছাড়া আমার মা কুলে মাসী নেই, বাপ কুলে পিসি নেই যে খোঁজ করতে আসবে। 'ভেইয়া'র ও আমার আর কেউ নেই। বাপ কলে কাজ করতো। একদিন কাজ করতে গিয়ে আর ফিরল না। কেউ বল্‌লে গুর্খা পুলিসের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল, সে খুন হয়ে গেছে; কেউ বল্‌লে জলে ডুবে গেছে। মোট কথা, সে আর ফিরে এল না। তার মাকে ছ মাসের মেয়ে কোলে করে কুলি লাইন থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে যে রোগ ধরেছিল তা বেড়েই চললো। 'ভেইয়া' কলে চাকরী করতে গিয়েছিল; কিন্তু সর্দ্দারেরা সেলামী চায়। তাই ভেইয়া আমার কখন ভিক্ষা কর্‌তো, কখন বা লোকের পকেটে হাত পুরে দিত।

সকালবেলা ভেইয়াকে বললুম—"কুছ পরোয়া নেই। ডরো মাৎ। তুই খুকিকে নিয়ে বসে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি।"

তার পর একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে সর্দ্দারজীকে একটু তোয়াজ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়্‌লুম। যখন ফিরলুম তখন সতের সিকে হপ্তা হিসেবে তাঁতঘরে একটা মজুরী বাগিয়ে ফেলেছি। ভারি স্ফূর্ত্তি হলো। কলকাতায় মেসের ভাত খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' বলে অনেক আর্ত্তনাদ করে বেড়িয়েছি। বঙ্গজননীর আসল চেহারাখানা এইবার দেখতে পাব এই আশা এতদিনে মনে হলো। সেই গোলপাতার চালার ভিতর ছেঁড়া মাদুরে বসে ভেইয়াকে জিজ্ঞাসা করলুম—'ভেইয়া, রাঁধতে পারবি? ডাল, আর ভাত, আর মুলো ভাতে?' ভেইয়া জিজ্ঞাসা করলে—'আর খুকি?'

"খুকি? ও! তাও ত বটে! কুছ পরোয়া নেই; খুকি খাবে ফেণ আর ডালের ঝোল।"

* * *

দু বছর পরে 'ভেইয়া'কে আমার চাকরীতে ভর্ত্তি করে দিয়ে চলে এসেছি। খুকির পেটে ফেণ আর ডালের ঝোল সইল না। সে যার মেয়ে তার কাছে চলে গেছে।

তুমি চিঠিখানা পড়ে কি ভাবছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মাথা একটুও খারাপ হয় নি। এ দু বছরে বুঝতে পেরেছি ইউরোপে আজ বলশেভিক বাদ উঠেছে কেন; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি তোমাদের মত সৌখিন স্বদেশ-হিতৈষীরা এ দেশকে কস্মিনকালেও নাড়তে পারবে না। তোমরা দেশের কোন ধারই ধার না। ইতি—

'অনন্তানন্দ'

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
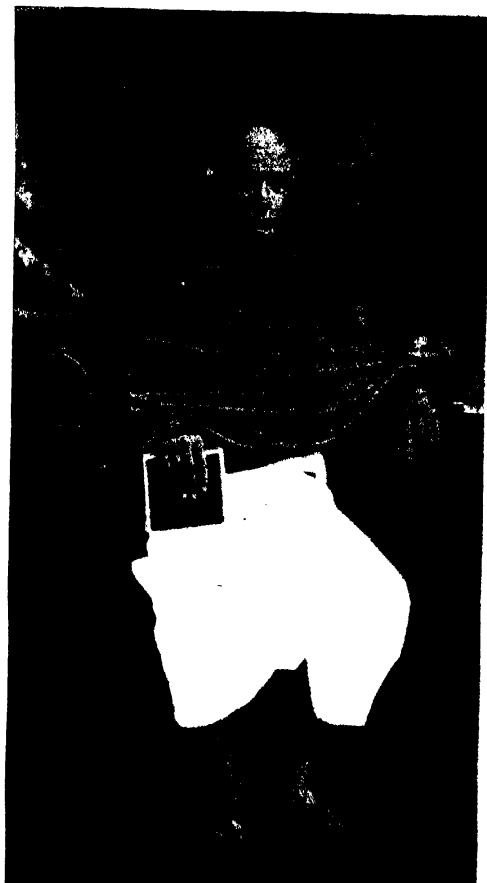
কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাব্য-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত-কলেজে অধ্যাপক-গণের তিনি শিরোভূষণ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার যশঃ ও প্রতিভার কথা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কথায় কথায় তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। বড়ই দুঃখ রহিল যে, তাঁহার একটী-মাত্র সংস্কৃত-কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। একবার বর্দ্ধমান-রাজবাড়ীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তৎকালে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি জয়গোপালের সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার বিনয় ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহারাজ হাসিতে হাসিতে সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে প্রশ্ন করিলেন,—"চন্দ্রে কলঙ্ক কেন?" অনেকে অনেক-প্রকার ভাবে কবিতা রচনা করিলেন; কিন্তু কাহারও কবিতা তাঁহার মনঃপূত হইল না। অবশেষে মহারাজ হাসিতে হাসিতে জয়গোপালের দিকে চাহিবামাত্র জয়গোপাল এই শ্লোকটী তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন :—

ত্বৎকীর্ত্তিশীতকিরণেঽভ্যুদিতেঽতিসাধ্বী
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীবর্দ্ধমাননৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমাঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

তব রম্য 'কীর্ত্তিচন্দ্র' হইলে উদয়,
আকাশে রোহিণী সতী পায় মনে ভয়।
জন্মিল সন্দেহ তার চিনিবারে পতি,
এইবার বুঝি মোর ঘটিল দুর্গতি।
তখন দেখিয়া আর না কোন উপায়
নিজের পতির দেহে চিহ্ন দিতে চায়।
চক্ষের কাজল ল'য়ে চন্দ্রের শরীরে
বেশ করে লেপ দিল চিনিবার তরে।
চন্দ্রে যত কাল কাল চিহ্ন যায় দেখা,
উহা ত কলঙ্ক নয়,—কাজলের রেখা!

অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রেমচন্দ্রের অধ্যাপকতা, তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্রগণের নাম ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-কলেজ স্থাপিত হইলে তাহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সংস্কৃত-কলেজে প্রথম প্রবেশ করেন। সেখানে ৫ বৎসর থাকিয়া তিনি কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাস হইতে ছয় মাসের ছুটী লইলেন। তখন প্রেমচন্দ্র ন্যায়ের শ্রেণীতে নিমাইচাঁদ শিরোমণির নিকটে অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়িতেছিলেন। উইল্সন্ সাহেব একদিন ন্যায়ের শ্রেণীতে আসিয়া নাথুরাম শাস্ত্রীর প্রতিনিধিস্বরূপ অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবার নিমিত্ত প্রেমচন্দ্রকে আদেশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার সমপাঠিগণ আনন্দে

কোলাহল করিয়া উঠিলেন। অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণির আদেশে রামগোবিন্দ শিরোমণি প্রভৃতি কয়েকজন প্রেমচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপকের আসনে বসাইয়া দিলেন। অবশেষে নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হইলে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে প্রেমচন্দ্র অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে কয়েক ব্যক্তি ঈর্ষা-প্রকাশ করিয়া প্রেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে উইল্‌সন্ সাহেবের নিকটে এই মর্ম্মে এক আবেদন-পত্র পাঠাইলেন,—"প্রেমচন্দ্র রাঢ়দেশীয় শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ। এইহেতু গঙ্গাতীরবাসী সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ তাঁহার

গিরিশ বিদ্যারত্ন
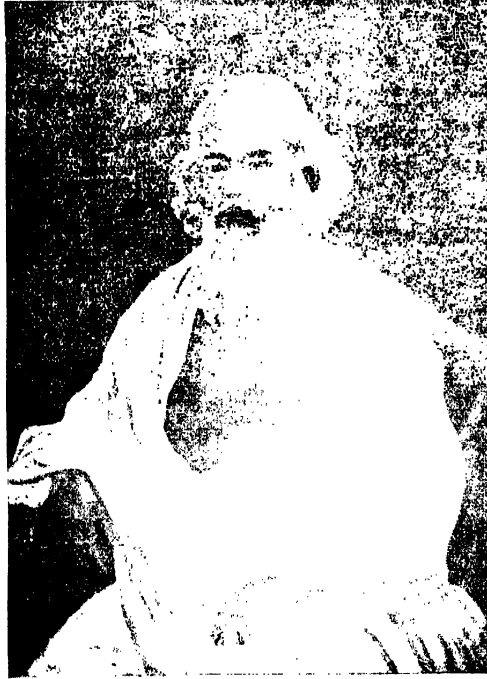
নিকটে পাঠ-স্বীকার করিবেন না।" এই আবেদন-পত্র পড়িয়া মহামতি উইল্‌সন্ সাহেব কহিলেন,—"আমি প্রেমচন্দ্রকে কন্যাদান করিতেছি না। তাঁহার গুণের পুরস্কার প্রদান করিয়াছি। ইহাতে ঈর্ষ্যাকুল হইয়া কয়েকজন অধ্যয়ন না করিলে সংস্কৃত-কলেজের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।"

অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াও প্রেমচন্দ্র অধ্যয়নে বিরত হন নাই। কলেজের নির্দ্দিষ্ট কাল অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়াইয়া অবকাশ-কালে নিমাইচাঁদ শিরোমণির ন্যায়-শ্রেণীতে গিয়া তিনি ন্যায়-শাস্ত্র পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রাতঃকালে শম্ভুনাথ বাচস্পতির বাসায় গিয়া বেদান্ত, বৈকালে হরিনাথ তর্কভূষণের বাসায় গিয়া স্মৃতি এবং সন্ধ্যাকালে নিমাইচাঁদ শিরোমণির বাসায় গিয়া ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রেমচন্দ্র, জয়গোপালের

যেরূপ কৃতী ও যশস্বী ছাত্র হইয়াছিলেন, নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণও প্রেমচন্দ্রের সেইরূপ কৃতী ও যশস্বী ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন,

ডেভিড্ হেয়ার

ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হরানন্দ ভট্টাচার্য্য (শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা), দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, রামময় তর্করত্ন (প্রেমচন্দ্রের ভ্রাতা), চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ, রামকমল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামনাথ

ন্যায়রত্ন, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, (গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র) ও তারাকুমার কবিরত্ন। প্রেমচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে শেষোক্ত দুই জন ঈশ্বরের কৃপায় এখনও জীবিত আছেন। প্রেমচন্দ্র যখন ৺কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ আদিত্য রাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও প্রেমচন্দ্রের ছাত্র হইয়াছিলেন।

যখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত-কলেজে কাব্য-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তখন তিনি প্রেমচন্দ্র প্রভৃতি ছাত্রগণকে নূতন নূতন "উদ্ভট-কবিতা" মুখস্থ করাইতেন। এতদ্ভিন্ন ছাত্রগণের সংস্কৃত-কবিতা লিখিবার অভ্যাস করা উচিত, ইহা বিবেচনা করিয়া জয়গোপাল মহাশয় ছাত্রগণকে "সংস্কৃত সমস্যা-পূরণ" করিতে

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দিতেন। তদনুসারে প্রেমচন্দ্র ও তদীয় ছাত্রগণ "সমস্যা-পূরণ" করিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তী ছাত্রগণ "সমস্যা-পূরণ" করাতে খাতাখানির কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। জয়গোপাল ও প্রেমচন্দ্র এই খাতা খানির নাম "সমস্যা-কল্প-লতা" রাখিলেন। এই "সমস্যা-কল্প-লতার" জন্ম-বৎসর ১৭৬৭ শকাব্দ (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল লোকের নাম করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত প্রেমচন্দ্রের আরও কয়েকটী ছাত্রের নাম এই পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাঁদের নাম,—হরিনাথ শর্ম্মা (শিবপুর), যদুনাথ, কালীপ্রসন্ন, শ্যামাচরণ, তারকনাথ, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর), মাধবচন্দ্র গোস্বামী (বালী), রামকৃষ্ণ, জানকীনাথ, চন্দ্রমোহন, ব্রজমোহন, প্রিয়নাথ, ভোলানাথ, ব্রজনাথ, রমানাথ, বীরেশ্বর, কৈলাসচন্দ্র, উমেশচন্দ্র

নীলকমল ও গৌরচন্দ্র। ইহাঁদিগের উপাধি জানিতে পারা যায় নাই। যে বৎসর "সমস্যা-কল্প-লতার" জন্ম হয়, তাহার পর বৎসরেই (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বর্ত্তমান কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের নিরতিশয় শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কলুটোলা-নিবাসী প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় কিছুদিন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে মেজর ডি. জি, মারস্যাল (Marshall) সাহেব সেন মহাশয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তৎপরে ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ রসময় দত্ত মহাশয় অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তৎকালে মধুসূদন তর্কালঙ্কার নামক একজন পণ্ডিত উক্ত মার্শ্যাল সাহেবের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চতুর ও স্বার্থপ্রিয় লোক। যখন যিনি কলেজের অধ্যক্ষ

মধুসূদন তর্কালঙ্কারের প্রতি প্রেমচন্দ্রের তীব্র কটাক্ষ-পাত।

কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন

থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহারই মনোরঞ্জন করিতেন। মার্শ্যাল সাহেবের পরম প্রিয়পাত্র হইলেও মধুসূদন, তাঁহার বিশেষ নিন্দা করিয়া দত্ত-মহাশয়কে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ হইবার জন্য অনুরোধ ও তাঁহার তোষামোদ করিতে ত্রুটী করেন নাই। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন :——

চ্যুতদলে কমলে জড়তাকুলে
ব্রজতি মারশলে চ মধুব্রতে।
বিধিবশাদধুনা মধুনাদৃতো
রসময়ঃ সময়ঃ সমুপাষযৌ ॥

(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্য)

কমল জড়তাকুল পুনঃ চ্যুতদল,
মারশেল মধুব্রত হ'লেন প্রবল।
বিধিবশে মধ্বাদৃত হন রসময়,
ভাল খেলা খেলিবার প্রকৃত সময় !!!

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে-সাহেব কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান সংস্কৃত-কলেজ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রসিদ্ধ কাব্য-শাস্ত্রাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার বিখ্যাত আলঙ্কারিক ছাত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। হোরেস্-হেম্যান্ উইল্‌সন্ সাহেব সংস্কৃত-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কিছুদিন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইলে তর্কালঙ্কার মহাশয় মনের দুঃখে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া অক্সফোর্ডে উইল্‌সন্ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

অক্সফোর্ডে উইল্‌সন্ সাহেবের নিকটে জয়গোপালের পত্র-প্রেরণ।

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তং যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ॥

(জয়গোপাল তর্কালঙ্কারস্য)

হে সাহেব উইল্‌সন্! করি নিবেদন,
কৃপা করি' তুমি ইহা করহ শ্রবণ,—
"সংস্কৃত-পাঠশালা" রম্য জলাশয়,
নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ওহে মহাশয়!
সুপণ্ডিত-হংস-গণে রেখেছ পুষিয়া,
তাঁদের দুর্গতি আজ দেখহ আসিয়া!
বহুদূরে গিয়া তুমি করিছ বিরাজ,
কাল-বশে পক্ষ-হীন তাঁরা সবে আজ।
হায় রে কয়েক জন দুষ্ট ব্যাধ আসি
লইয়া শাণিত শর তীরে আছে বসি'।
সেই সুধী-হংস-গণে বধিবার তরে
তাহাদের অভিলাষ হ'য়েছে অন্তরে।
সেই হংস-গণে রক্ষা করিয়া এখন
রেখে দাও নিজ কীর্ত্তি, ওহে উইল্‌সন্!

তৎকালে মহাত্মা উইল্‌সন্ সাহেব "অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে" সংস্কৃত-ভাষার "বোডেন্ প্রোফেসর" ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি স্বীয় গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মর্ম্ম-বেদনা-সূচক পত্রখানি পাইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত-ভাষা কখনই উঠিবে না,—এই মর্ম্মে উইল্‌সন্ সাহেব অক্সফোর্ড হইতে নিম্ন-লিখিত ৪টী শ্লোক লিখিয়া কলিকাতায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

জয়গোপালকে উইলসনের প্রত্যুত্তর-প্রদান।

(ক)

বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাতা হংসাস্তৎপ্রিয়বাহনম্।
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি স এব তান্ ॥

যাহা কিছু নিরীক্ষণ কর এই ভবে,
ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে জেনো সেই সবে।
হংসও হইল তবে ব্রহ্মার রচন,
পুনশ্চ ব্রহ্মার তাহা হইল বাহন।
তাই ত ব্রহ্মার হংস দেখি প্রিয়তর,
ব্রহ্মা রক্ষা করিবেন তাঁরে নিরন্তর !

(খ)

অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥

অমৃত মধুর বস্তু জানিও সতত,
তা হ'তে মধুরতর ভাষা সংস্কৃত।
তাই ত দেবতা-গণ পরম-আদরে
সংস্কৃত-ভাষা-রস পিয়ে প্রাণ-ভ'রে।
এই কথা মনে তুমি রেখো অবিরাম,—
সংস্কৃত পাইয়াছে 'দেবভাষা' নাম !

(গ)

ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্য্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥

না জানি বা সংস্কৃত ভাষার কি রস,
এ রস করিলে পান সবাই অবশ।
আমরা বিদেশী লোক বিদেশে থাকিয়া
এই রস পান করি উন্মত্ত হইয়া !

(ঘ)

যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥
(হোরেস্-হেম্যান্-উইল্সন্-সাহেবস্য)

থাকিবে ভারত-বর্ষ যতকাল ধরি,'
থাকিবেক যতকাল বিন্ধ্য-হিম-গিরি,
গঙ্গা গোদাবরী নদী যতকাল রবে,
ততকাল 'সংস্কৃত' জীবিত রহিবে !

যে দিন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অক্সফোর্ডে উইল্সন্ সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই দিনই তদীয় ছাত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ও লর্ড মেকলে-সাহেবের প্রতি কটাক্ষ-পাত-পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া উইল্সন্ সাহেবের' নিকটে অক্সফোর্ডে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

উইল্সন্-সাহেবের নিকটে প্রেমচন্দ্রের পত্র-প্রেরণ।

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো 'মেকলে'-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসনমহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥

(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্য)

কলিকাতা-নগরীতে গোলদীঘি-তীরে
বহুবিধ বৃক্ষগণ রহে থরে থরে।
" সংস্কৃত-পাঠশালা "—নামক কুরঙ্গ
কৃশাঙ্গ হইয়া তথা রহিছে নিঃসঙ্গ।
" মেকলে-সাহেব " নামে এক ব্যাধ-রাজ
লইয়া শাণিত শর করিছে বিরাজ।
কুরঙ্গ প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া
কহিতেছে অশ্রুজল নিক্ষেপ করিয়া,—

হায় হায় প্রাণ যায়, ওহে উইল্‌সন্‌!
কৃপাময়! কৃপা করি' রক্ষ হে এখন!

উইল্‌সন্‌ সাহেব, কিছুদিন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের সতীর্থ্য ছিলেন, কারণ উভয়েই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্র। বাল্যবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের শ্লোকটী পাইয়া তদুত্তরে তিনিও নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

প্রেমচন্দ্রের নিকটে উইল্‌সন্‌-সাহেবের প্রত্যুত্তর-প্রেরণ।

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্ব্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ-
র্দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্ব্বলে ॥ (১)

(হোরেস্‌-হেম্যান্‌-উইল্‌সন্‌-সাহেবস্য)

কি দুর্ব্বল দূর্ব্বা-ঘাস ভাব একবার,
সহিতেছে দিবানিশি কত অত্যাচার!
তাহার উপর দিয়া শত শত প্রাণী
মাড়াইয়া যাইতেছে দিবস-যামিনী।
অগ্নি-সম কর-জাল বিস্তার করিয়া
দিতেছে প্রচণ্ড সূর্য্য তাহা ঝলসিয়া।
মুড়াইয়া খাইতেছে ছাগাদির পাল,
চাঁচিয়া ফেলিছে লোক লইয়া কোদাল।
দূর্ব্বার অদৃষ্টে হায় কত কষ্ট রয়,
তথাপি তাহার দেখ মৃত্যু নাহি হয়।
পৃথিবীতে দুর্ব্বলের না আছে সম্বল,
একমাত্র বিধাতাই দুর্ব্বলের বল!

(১) পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে ৪২ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত শ্লোক গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।—লেখক

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রামবাগান-নিবাসী রসময় দত্ত মহাশয় স্পেশ্যাল কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলেজের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি ১০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার অধীনতায় এক জন এসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রসময় দত্ত মহাশয় "ছোট আদালতের" বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় ঐ সালেই তিনি সেক্রেটারী-পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় "কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন," সেক্রেটারী ও এসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারীর পদ তুলিয়া দিয়া একজন এদেশীয় কার্য্য-পরিদর্শক (Superintendent) নিযুক্ত করিলেন।

রসময় দত্তের সেক্রেটারী-পদে নিয়োগ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রিন্সিপ্যালের পদ সৃষ্ট হইলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে এই পদে নিযুক্ত হয়েন। এই পদে তাঁহার মাসিক বেতন ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২০০৲ টাকা মাসিক বেতনে "বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক" (Special Inspector of Schools) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুই পদ প্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাসিক বেতন ৫০০৲ টাকা হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিন্সিপ্যাল-পদ-প্রাপ্তি।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত-কলেজে 'মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ' পাঠ্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপ্যাল হইয়া এই ব্যাকরণ খানির এবং ইহার টীকাকার দুর্গাদাসের শতমুখে নিন্দা করিয়া "কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনে" রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের' ভক্তগণ কহেন, "'সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ' এবং 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' চালাইবার জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'মুগ্ধবোধের' উপরি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে অনপনেয় কলঙ্ক!"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

শরৎ-রাণী

কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের পুকুর পাড়ে দুপুরে,
একাকিনী শরৎ-রাণী; মৃদু ধ্বনি নূপুরে।
পদ্ম বনের মত্ত বায়ু আঁচলে তার বিহরে;
দূরের গাছের "ঘুঘু-ধ্বনি" বুকের কাছে শিহরে।
কূলে কূলে এলোচুলের ছায়াটুকু জাগায়ে,
জলের তলের নীলাম্বরের ছবির পানে তাকায়ে
দেখ্‌ছে যেন উচ্ছ্বসিত আত্মরূপের গরিমা;
ফুল্ল চোখের পাপড়িতে তার ঘনায় ভাবের জড়িমা।

হরিশ খুড়ো

মানুষের নিয়তি উষার আলোকের মতো, কখনো সহস্র কিরণে উদ্ভাসিত, আর কখনো বা ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আমাদের হরিশ খুড়োর কিন্তু জীবনে কোন দিনই সুখ-সূর্য্য এতটুকু আলোপাত করলে না। সে এমনি নিঃস্ব দুর্ব্বল হয়েই জগতে এসেছিল যে, সকলেই মনে করেছিল, এ ছেলে কখনো বাঁচতে পারে না। কিন্তু তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও সে টিকেই রইল,—তবে রোগে ভুগে ভুগে দিন দিন কদাকার ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। শৈশবে সে এতটুকু শান্তি এতটুকু সুখ পায়নি। দুর্ব্বলতার জন্য ভৎর্সনা, কুরূপের জন্য উপহাস তার নিত্য নৈমিত্তিক বরাদ্দের মধ্যে ছিল। কুঁজো হরিশকে কেউ দুচক্ষে দেখতে পেত না, ছেলেরাও তাকে দলে ভিড়তে দিত না, সকলেই তাকে ঘৃণা করত, আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বিদ্রূপ করত।

একমাত্র মা-ই ছিল তার আশ্রয়স্থল। বাইরের ঠাট্টা বিদ্রূপ অবহেলা সহ্য করেও সে মায়ের কোলে এসে সমস্ত গ্লানি সমস্ত দুঃখ ভুলে যেত। যে সময়টা বালকেরা সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা-ধূলো করে আনন্দে কাটিয়ে দিত, সেই সময়টা বালক হরিশ তার মাকেই একান্ত করে সঙ্গিরূপে পেয়েছিল। সামান্য লেখাপড়া শেখাও তার অদৃষ্টে ঘটেনি। অল্প মাইনেয় এক সওদাগরী আপিশে সে বেয়ারার কাজ নিল। আপিশে তাকে দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ করতে হত, বাকী সময়টা মাকে তার সাংসারিক কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করত। তাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের সুমুখে সে একটি বকুল গাছ লাগিয়েছিল। কয়েক বছরেই গাছটি বেশ ঝাঁকড়া হয়ে বেড়ে উঠেছিল। গ্রীষ্মকালে কোন কোন দিন তার বুড়ো মা সেই বকুল গাছটির তলায় এসে বসে সেলাইয়ের কাজ করত, ছুটীর দিনে হরিশও এসে মায়ের পাশে বসে যত রাজ্যের খবর দিত। মা জবাব না দিলেও তার উপস্থিতিই যুবক হরিশের মনে সান্ত্বনা ও উৎসাহ এনে দিত। কখন কখন হরিশ হঠাৎ উন্মনা হয়ে ম্লানমুখে একদৃষ্টিতে অনন্ত নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত, মা তখন তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিত।

এই সামান্য সুখ ভোগও হরিশ বেশীদিন ভোগ করতে পেল না। একদিন তার মায়ের অসুখ হল, ক্রমে সে অসুখ বেড়ে গেল, তার পর মায়ের বাঁচবার আশাও আর রইল না। হরিশের সামান্য আয়ে মাতা-পুত্রের কোন প্রকারে শাকভাত জুটত, সুতরাং মায়ের ব্যারামে ডাক্তারের খরচ জোগাবার শক্তি ছেলের ছিল না। ছেলের কাছে এ দুঃখও একটা বড় কম দুঃখ নয়। হরিশ শোকে দুঃখে একেবারে মুস্‌ড়ে পড়ল। সংসারে সে কারো কাছেই এতটুকু আদর পায় নি। একমাত্র মায়ের কোলই ছিল তার আশ্রয়স্থল, আজ তাও সে হারাতে বসেছে! মুমূর্ষু মায়ের সুমুখে যেয়ে মাকে সম্বোধন করে সে বল্লে, "মা, মা, আমার কি হবে?" এই বলেই

সে কেঁদে ফেললে। মা একবার তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তখন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন, স্বর ভেঙ্গে গেছে। অতি কষ্টে শেষবারে মা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুটস্বরে হায় কি বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। হরিশ তা বুঝতে পারল না। কয়েকজন প্রতিবেশী তাকে সে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে কিছুতেই নড়ানো গেল না, সে প্রাণহীন দেহটার উপর ঝুঁকে পড়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগল।

তার মনটা বুকের ভেতর থেকে কোঁকিয়ে কেঁদে উঠে বলছিল, "মা, মা, সত্যই কি তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে! সংসারে কারো কাছেই তো এতটুকু ভালবাসা পাই নি; একমাত্র তোমার কোলেই আমার আশ্রয় ছিল, আজ কি আমার সে আশ্রয়ও চিরদিনের মতো চলে গেল! কে এখন আমায় দেখবে মাগো ?"

আকাশবাণীর মতো তার কাণে যেন অস্ফুটস্বরে কে বলে উঠল, "এতদিন যিনি দেখেছেন তিনিই দেখবেন।"

হরিশ ভীত চকিত হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু সে নিজে আর জননীর মৃতদেহ ছাড়া তো আর কেউ সেই ঘরে তখন ছিল না। তবে কি মা-ই শেষ সময়ে ছেলেকে তার শেষ আশ্রয় স্থানের নির্দ্দেশ করে দিল ? সে আর ভাবতেও চেষ্টা করলে না।

মায়ের মৃত্যুর পর, হরিশ বিশ্বের সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে, আপনাকে আপনার কুঁড়ের এককোণে ও আপিশের কাজে একান্তকরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। তার বন্ধু বলতে কেউ নেই, কেউ তাকে ভালও বাসত না। তাই সে নিজে কারো সঙ্গে যেচে পরিচয় করতে চাইত না, পারতও না। তবে কেউ তার কাছে এসে খারাপ ব্যবহার পেয়েছে, এমন কথাও কেউ কখনো শোনে নি। কেউ উপহাস করলেও নীরবে হেসে তার জবাব দিত। প্রাণের ব্যথা-বেদনা বাইরে কখনো প্রকাশ পেত না। তার দেহের বিকৃতির দরুণ তার সাহায্য করতে বড় একটা কেউ ইচ্ছে করত না। আপিশের কাজে যদিও সে চিরদিনই বিশেষ মনোযোগী ছিল, তথাপি কেউ তার পৃষ্ঠপোষক ছিল না বলে আপিশেও তার আর্থিক উন্নতি বড় একটা হয় নি। আপিশের বাবুরা মনে করতেন, তার মতো লোককে যে এই সামান্য চাকরিটি দিয়েছেন, এটাতেই তাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হয়েছে।

সহরের একপ্রান্তে এক বস্তির একটা কুঁড়ে ঘরে একাকী সে বাস করত। তার বাড়ীর আশে পাশে আরো সব কামার, কুমোর, ছুঁতর, দর্জ্জি প্রভৃতি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বাস। তারাও অবশ্য তারই মতো দরিদ্র, কিন্তু তার মতো মোটেই নিঃস্ব অবশ্য নয়।

হরিশের ঘরের পাশের ঘরেই থাকত একটি কিশোরী, সঙ্গে তার এক অন্ধ স্থবির অতি বৃদ্ধা দিদিমা। কিশোরী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা বড় একটা বলতো না। তার রূপও বিশেষ ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল ঘোর দারিদ্র্য। তাকে কেউ কোন দিন কারো সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করতে দেখে নি, তার জীবনের যত কিছু সঙ্গীত, যত কিছু সুখ—সব যেন

চিরকালের জন্যে একেবারে থেমে গেছে। সে দিনরাত এক বাড়ীতে খেটে বৃদ্ধা দিদিমার ভরণ পোষণ করত, তাতে তার বিরক্তিও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। কলের মতো একঘেয়ে খাটুনী সে খেটে যেত, আর তাই দিয়ে কোন দিন একবেলা কোনদিন উপোসে তার দিনগুলি কেটে যেত। তাকে দেখে হরিশ খুড়োর ভারী দয়া হল। খুড়ো তার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগল। একদিন সুযোগও এল, সে বন্ধুভাবেই খুড়োর কথার জবাব দিল, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপে সে তার বক্তব্য শেষ করল। বোঝা গেল কুঁজো হরিশ খুড়োর সহানুভূতির চাইতে সে তার নিঃসঙ্গ জীবন নীরবে যাপন করতে পেলেই যেন বেশী খুসী হয়। খুড়ো এটা বুঝতে পেরে চুপ করে গেল।

কিন্তু কিশোরী এত হাড়ভাঙা খাটুনী খেটেও তাদের জীবিকার সংস্থান করতে পারছিল না, তারপর একদিন কাজটিও তার গেল। হরিশ খুড়ো কিশোরীটির দুরবস্থার কথা শুনতে পেলে এবং এটাও শুনতে পেলে যে, দোকানীও তাকে আর ধারে চাল ডাল দিতে অসম্মত হয়েছে। খুড়ো এ সংবাদ পেয়ে অবিলম্বে দোকানীর কাছে গেল এবং কিশোরীর কাছে গেল এবং কিশোরীর কাছে তারা যে ক'টা টাকা পেত, তার অজ্ঞাতে তা মিটিয়ে দিল। এমনি করে একমাস কেটে গেল, অবশেষে মেয়েটি ঋণের ভয়ে একদিন বিশেষ পীড়িত হয়ে আপনা থেকেই দোকানীর কাছে যেয়ে হিসাব দেখতে চাইলে! দোকানীর জবাবে খুড়োর ব্যবস্থার কথা শুনে সে তৎক্ষণাৎ খুড়োর কাছে ছুটে গেল। যেয়ে সে সজলনয়নে নীরবে খুড়োর সুমুখে দাঁড়াল, একটি কথাও তার মুখ থেকে বেরুল না, শ্রদ্ধা-ভক্তি-কৃতজ্ঞতায় তখন তার অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

খুড়ো মেয়েটিকে আপনার বোন মনে করেই যখন তখন সাহায্য করতে আর সঙ্কোচ বোধ করত না, মেয়েটিও তাকে দাদা মনে করেই তার কাছ থেকে সাহায্য নিতে দ্বিধা করতে পারল না। মায়ের মৃত্যুর পর এ মেয়েটিই প্রথম ও শেষ তার হৃদয় মনকে অধিকার করে বসল। সে যতই কেন না চেষ্টা করুক, কিশোরীর বিষণ্ণভাব আর কিছুতেই বিদূরিত হল না। আগের মতোই সে নির্ব্বাক বিষাদে তার দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করেও খুড়ো কিন্তু মেয়েটির দুঃখের কারণ জানতে পেলে না, এটা তার একটা বিশেষ দুঃখের কারণ হলেও মায়ের অভাবেও সে যে একজনের শ্রদ্ধা প্রীতি অর্জ্জন করতে পেরেছে, এই আত্ম প্রসাদেই সে পরম পরিতৃপ্ত। এর চাইতে বেশী কিছু সে কারো কাছে কোন দিন দাবীর কল্পনাও করে নি, করতে পারেও না। কিশোরীও হরিশের মতোই একরূপ নিঃসঙ্গ, কেননা বৃদ্ধা দিদিমা তার থেকেও নেই। চল্‌বার শক্তি আদপেই তখন তার ছিল না। তবে হরিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তার কুরূপের কথাও মেয়েটি মনে রাখতে পারে নি। হরিশ আর এর চাইতে কি আশা করতে পারে? তার জীবনে যে সে কোনদিন সঙ্গী পাবে এটা সে এতদিন স্বপ্ন বলেই জানত, কিন্তু সে স্বপ্নও যখন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, তখন তার মনে আর কোন দুঃখই নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় হরিশ কি মনে করে মেয়েটির কুঁড়ে ঘরখানার সুমুখে যেয়ে দাঁড়ালে। দরজার কাছে যেয়েই সে একজন অপরিচিতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! অনেকক্ষণ ভেবে মেয়েটির নাম ধরে তাকে ডাকল। মেয়েটি দরজার কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল, তখনো তার চোখে মুখে অশ্রু। খুড়োকে দেখেই সে তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হবার বৃথা চেষ্টা করে একরূপ উচ্ছ্বসিতস্বরেই বল্লে, "এসেছ এস, এস, দেখ কে এসেছে। আমি সুদীর্ঘ এক বছর যে তারই আশায় দিনগুলি গুণছিলুম। একটা মিথ্যা মোকদ্দমায় স্বামীর আমার জেল হয়, আজ সে মুক্তি পেয়েছে!"

হরিশ খুড়ো তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝে নিলে। তার পায়ের নীচেকার পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল, তার বুক ফেটে একটা হাহাকার বের হতে চাইল, কিন্তু আবার তখনই মায়ের মৃত্যুর পর যে অদৃশ্য বাণী শুনতে পেয়েছিল, তা শুনতে পেয়ে প্রকৃতিস্থ হল। অপরিচিত লোকটি তাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্লে যে, তারা তখনই সে স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

তার ব্যর্থ নিঃসঙ্গ জীবনে একটা দিন যেন স্বপ্নের মতো তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠল। যে সুখ তার জীবনে ঘটেনি, যে আশীর্ব্বাদ তাকে কেউ করেনি, সেই সুখ, সেই আশীর্ব্বাদ এই দম্পতী যুগলের জন্যে কামনা করে হরিশ খুড়ো তার সেই মায়ের আশীর্ব্বাদভরা বকুল তলার কুঁড়ে ঘরে ফিরে এল। *

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শিশু-রঞ্জন

বউ—ভোরের বেলায় ছেলে মেয়েরা শিউলিফুল কুড়াইতে গিয়া দেখে, বাতাসের দোলায় চড়িয়া একটি মেয়ে কাশের ফুলের উপর দিয়া মাটিতে নামিতেছে; তাহার পরনে কাশের ফুলের মত শাদা শাড়ী, হাতে পদ্মফুল, আর মুখখানি ফোটা পদ্মফুলের মত সুন্দর। গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা এই বাতাসের দোলার মেয়েকে আনন্দে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কে। সে বলিল, "আমি বউ"। "বউ? কোন্ বাড়ীর বউ?" সে মেয়ে বলিল সে বাঙ্গলাদেশের বউ। ছেলে মেয়েরা আনন্দে বউ-এর সঙ্গে ধানের মাঠের পাশে দীঘির ধারে গেল। হাত পা ধুইবার ছলে বউটি দীঘির জলে পা দিতেই কোথা হইতে হাঁসেরা দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া জলে খেলা করিতে লাগিল, আর দীঘি ছাইয়া পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিল। গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা বলিল,—"তুমি

* M, Emile Souvestre-এর ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে।

বেশ বউ, আমাদের সঙ্গে থাক।” বউ হাসিয়া বলিল,—“মাস দুই তোমাদের সঙ্গে থাক্‌ব, আর তারপর কার্ত্তিক পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্নার দোলায় চড়ে বাপের বাড়ী ফিরে যাব।” বউটি উপরের দিকে আঙ্গুল দিয়া তাহার বাপের বাড়ী দেখাইয়া দিল; ছেলেরা তাকাইয়া দেখিল—অতি গাঢ় নীলে মাজা প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশ।

* * *

চালাকদাস—চালাকদাস হাটে দুইটি পাঁঠা বেচিতে গেল; তাহার মা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সে বড় পাঁঠাটি দু-টাকায় ও ছোট পাঁঠাটি এক টাকায় বেচিবে। হাটের পথে চালাকদাসকে ধরিয়া বসিল এক ধূর্ত্ত; সে যখন পাঁটা কিনিবে বলিল, চালাকদাস তাহাকে দাম বলিল, আর ধূর্ত্ত তাহাতে রাজী হইয়া এক টাকায় ছোট পাঁটাটি কিনিল। চালাকদাস পাঁটাটি বেচিয়া দু-পা না যাইতে ধূর্ত্ত তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—“ওরে আমি বড় পাঁটাটাই চাই ছোট পাঁটাটা নয়।” চালাকদাস দাম চাহিল; ধূর্ত্ত তখন চালাকদাসকে বলিল—“তোকে আগেই আমি এক টাকা দিয়েছি; বটেত? আর এই ছোট পাঁটাটা আমি—কিনেছি,—কাজেই এটা আমার; বটেত? তুই নগদ পেয়েছিস এক টাকা, আর এখন নে আমার এই ছোট পাঁটাটা,—যার দাম হচ্চে এক টাকা; বড় পাঁটার দাম দু টাকা পেলি কি না?” চালাকদাস বলিল “হুঁ পেলাম।” ধূর্ত্ত তখন ছোট পাঁটাটি চালাকদাসকে দিয়া বড় পাঁটাটি লইয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া চালাকদাস মাকে ধূর্ত্তের ভাষায় হিসাব বুঝাইল; মা বেচারীর মুখে আর কথা ফুটিল না।

* * *

ফেলারাম—ছুটির দিনে ফেলারামের বাবা ফেলারামকে পড়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর ফেলারাম উত্তর না দিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল; ফেলারামের বাবা বলিলেন—“যা! তোর কিচ্ছু হবে না।” ফেলারাম নিরুদ্বেগে চলিয়া গেল—আর তাহার পর একটা বড় গাছে গিয়া চড়িল,—মা মাসীদের মানা শুনিল না; পরে আবার সাঁতার কাটিতে কাটিতে মাঝ গঙ্গায় গেল,—কাহারও কথা গ্রাহ্য নাই। ঘরে ফিরিলে মা তাহাকে বলিলেন,—“তুই কবে গাছ থেকে পড়ে', না হয়, জলে ডুবে মরবি দেখ্‌ছি।” ফেলারামের বাবা একটু দূরে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতে-ছিলেন। ফেলারাম মাকে বলিল—“তোমার কোন ভয় নাই,—বাবা বলেছেন—আমার কিচ্ছু হবে না।”

* * *

চোরধরা—গোব্‌রার ইচ্ছা, সে মাঝে মাঝে ইস্কুল পালায়, কিন্তু তাহার বাবার ভয়ে কিছু করিতে পারে নাই; দুয়েকবার লুকাইয়া কামাই করিয়া সাজাও পাইয়াছে। একদিন তাহার

বাবা গিয়াছিলেন সহরে, আর তাঁহার ফিরিতে যে সন্ধ্যা হইবে, এ কথা গোব্‌রার জানা ছিল। সে ইস্কুলে না গিয়া খেলার সঙ্গী খুঁজিল, কিন্তু কাহাকেও পাইল না ; দিক্ হইয়া সে একা-ই মাঠের ধারে চলিয়া গেল, আর সেখানে একটা আমগাছের নীচের দিকের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। সে মহানন্দে ডালে ঝুলিতেছে আর চেঁচাইয়া গান গাইতেছে, এমন সময়ে একটু বৃষ্টি আসিল। গোব্‌রা রৌদ্র বৃষ্টি গ্রাহ্য করিত না—তাহার আনন্দের বাধা হইল না। বৃষ্টিতে কেহ বা রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে, কেহ বা ছাতা মাথায় চলিতেছে ; গোব্‌রা সকলকেই তামাসা করিয়া হাসিয়া খেলা করিতে ডাকিতে লাগিল ; গোব্‌রাকে সকলেই চিনিত,—তাহারা কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সেই সময় গোব্‌রা দেখিল যে একজন লোক তাহার মাথার ও গায়ের কাপড় বাঁচাইবার জন্য ছাতার ভিতরটা প্রায় মাথায় ঠেকাইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। গোব্‌রা খানিকটা তাকাইয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল ;—"চোর, চোর ! আমার বাবার জুতা ও কাপড় চুরি ক'রে পরে কোথায় যাচ্চিস রে চোর ?" লোকটি একেবারে গোব্‌রার কাছে আসিল, আর হেঁচ্‌ড়াইয়া নামাইয়া গোব্‌রার কান ধরিয়া দাঁড়াইল ; গোব্‌রা হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিল, তাহার বাবা।

* * *

গুরুমহাশয়

পণ্ডিত হলেন দণ্ডধারী, হালে-খোলা পাঠশালায় ;
সুরু হ'ল গুরুলীলা চণ্ডীতলার আট্‌চালায়।
বালকগণে মনে-মনে পড়্‌তে উপদেশ দিয়ে,
ঘুমিয়ে পড়্‌তেন গুরু-মশাই চেয়ারটিতে ঠেস্‌দিয়ে।
নাকে যখন ঢাকের মত শব্দ হ'ত গর্জ্জনের
লুপ্ত হ'ত সুপ্ত দেহে চণ্ড-ভাষা তর্জ্জনের।
পড়োরা সব ছেড়ে পুঁথি লাগিয়ে দিত বিষম ধুম্
ভাঙ্গত না সে গণ্ডগোলেও দণ্ডধারীর ভীষণ ঘুম।
কর্‌তে কর্‌তে কোস্তাকুস্তি পুলিন-মাখন-পেয়ারি,
পড়্‌বে ত ছাই পড়্‌ল গিয়ে গুরুর আসন চেয়ারে-ই।
টকাস্ করে' উল্টে গেল গুরুদেবের আসনটি
ধপাস্ করে' যে যার স্থানে বস্‌ল যত পাষণ্ডী।
ডিগ্‌বাজিটি খেয়ে গুরু, রক্তবর্ণ অক্ষিতে
গাবের ডালের ছড়ি নিয়ে গেলেন শিশু ভক্ষিতে ;

কাঁপে যত শিশু ছেলে যেন পাঁটা অষ্টুমীর !
গুরু বল্লেন দিচ্চি সাজা তোদের বেজায় দুষ্টুমীর।
লাঠি খেলান গুরুমশাই, এপাশ ওপাশ গাব-ডালে
ঘুর্ণিপাকে ঘোরে শিশু পুঁথি-শ্লেটের আব-ডালে।
কেউ বা পালায়, পিঠের জ্বালায়, কেউ বা গড়ায় পাঠশালায়।
এণ্ডাবাচ্চার গণ্ডগোল চণ্ডীতলার আটচালায়।

* * *

শাব্দ-পদ্য

গেল

আঃ **গেল** যা! একি ছেলে! **গেল** যে বই! রাখ্‌না ফেলে।
বয়ে **গেল**, এতেই যদি বন্ধ হ'ল পড়া।
চোক্ **গেল** যে? মনের ব্যথায়? **গেল** কি মান একটি কথায়?
কোথায় **গেল**? সইতে নারে একটু কথা কড়া।

* * *

লাগে

কুস্তি কর্‌বে? আচ্ছা **লাগে**! ছাড়না কব্‌জি,—বড় **লাগে**।
হাত খানা যে কাজে **লাগে**, ভুল্লে জেদের টানে?
পিঠে যদি ধূলা **লাগে**, ভাত বুঝি তায় বেশি-ই **লাগে**?
অর্থাৎ কিনা ক্ষিদে **লাগে** ভাব্‌চি অনুমানে।

* * *

পড়া

বাড়ীর কাছে ছিল এক্‌টা **পড়া**
সেইখানেতে হ'ত লেখা **পড়া**;
কাদায় যেদিন পিছ্‌লে সেথায় **পড়া**,
সেদিন থেকে হ'ল সরে' **পড়া**।

* * *

কড়া

এক **কড়ার** মাছ কুট্‌তে হাতে পড়ল **কড়া**;
চড়িয়ে **কড়া**, ভেজে **কড়া**, নামাই ধরে' **কড়া**।

ছিটে-ফোঁটা

হেঁচ্ছ

দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতি হচ্ছি মোরা হিন্দু ;
প্রমাণ,—আছে হিমালয়, বিন্ধ্য, গঙ্গা, সিন্ধু।
ভূগোল দেখ ! অন্য দেশের নাম গুলি সব ম্লেচ্ছ।
বাহাবারে ! ভেবে চিন্তে ঠিক্ বলেছ ! হেঁচ্ছ।

ওরা করে দাপাদাপি, মোরা ভারী ঠাণ্ডা ;
ওদের দুঃখে কাঁদি,—নহে দেখে কারও ডাণ্ডা।
মুখ থাক্‌তে হাতাহাতি, উচ্চ জাতির ত্যজ্য।
বাহাবারে ! ভেবে চিন্তে ঠিক্ বলেছ ! হেঁচ্ছ।

ওরাই বলে,—মোরাই শুধু ধ্রুব লোকে যাত্রী ;
চক্ষু বুজুগ্ ধ্যানে তবে, কিবা চাষী, শাস্ত্রী।
ওরা ভৃত্য ; যোগাক্ নিত্য চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য।
বাহাবারে ! ভেবে চিন্তে ঠিক্ বলেছ ! হেঁচ্ছ।

* * *

অভিজ্ঞতা

এইত খেলা ভবের মেলায় ? জ্ঞান ফুট্‌ল চরমে।
লিখ্‌ছি অভিজ্ঞতার কথা, সুরনামিয়ে নরমে।
দেশোদ্ধারের গুরুভারে পড়্‌ছি ঝুঁকে এক কোণে ;
কাঁপ্‌ছে স্নায়ু, যাচ্ছে আয়ু, নাইক শক্তি back boneএ।
মরদ্ মোরা, দরদ্ চাকি ছেঁড়া হাসির আড়ালে।
দুখের জীবন হয়কি সুখের, মনের কথা ভাঁড়ালে ?

বন্ধু কহেন উপদেশে :—"যাচ্ছে মিছে দিনটাগো !
মোড়লগিরি ছেড়ে কর পরলোকের চিন্তা গো !"
অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে দেখিয়ে যাব কেরামত ?
কর্ম্ম-শূন্য শর্ম্মা আমি কর্‌ব ধর্ম্ম মেরামত ?

কুড়ুলেতে ধর্ম্ম বেঁধে মার্‌ব কি কোপ ঝোপ্‌ বুঝে ?
ছেঁড়া জালে ফাঁদটি পেতে, ধর্‌ব পক্ষী চোখ বুঁজে ?

লিখ্‌ছি অভিজ্ঞতার কথার ছিটে ফোঁটা কুড়ায়ে ;
বল্‌ছে লোকে ; "নয়ক মিষ্ট ; পেসিমিষ্ট বুড়া-এ।"
নিদান প'ড়ে মরেন বৈদ্য, বিশ্বে জয়ী হাতুড়ে ;
অভিজ্ঞতা খোঁজে লোকে বুড়ায় ছেড়ে আঁতুড়ে।
নয় ক জোরে—ঠারে ঠোরে বল্‌ছি আধ সরমে,
বেড়ে গেল অভিজ্ঞতা দুঃখে ব্যথায় চরমে।

* * *

প্রেমের বোধন বা বিলাতি কোর্টশিপ

তোমায় আমি ভালবাসি। "আশ্চর্য্য তাই নাকি ?"
বাজে প্রাণে প্রীতির গীতি। "বাজের বেশি নাই নাকি ?"
নীরব দাহে এই যে ভস্ম—"সিগারেটের ছাই নাকি ?"
মরে' আছি,—স্বর্গে লহ। "এইটি ভূতের ঠাঁই নাকি ?"
এ প্রেম হেমের মতন্‌ উজল। "মতন্‌ ? আসল পাই নাকি ?"
লওগো হৃদয়! "লওগো বিদায় ; তুল্‌ছ একটু হাঁই নাকি ?"
তোমায় পেলে—"টাকা পাবে ? ঘাসের বিচি খাই নাকি ?"
তোমার যাহা—"তোমার তাহা ? বেজাই ঠকের চাঁই নাকি ?"

* * *

যুদ্ধের সময় লোহার ব্যবসা করে গোবিন্দ পোদ্দার যখন হঠাৎ বড় লোক হয়ে উঠ্‌লেন, তখন তাঁর বাড়ী সাজাবার ধূম পড়ে গেল। বন্ধু বল্‌লেন—'গোবিন্দ, আজকাল বড়লোকেদের বাড়ীতে এক একটা লাইব্রেরী থাকে হে।' গোবিন্দ বল্‌লেন—'কুচ পরোয়া নেই। আমি এখনি লিখে দিচ্ছি নিউম্যানের আড়তে, তিন টন বই পাঠিয়ে দিতে।'

দেবীর ঘোটকে গমন—ফলং ছত্রভঙ্গ

রোজ তারিখের যাত্রী

রোজ তারিখের যাত্রী মোরা
মাস টিকিটের যাত্রী,
যাইনে কেন সকাল সকাল,
ফিরতে ত সেই রাত্রি।

(১)

আহার করে হাঁপিয়ে দৌড় ট্রেণখানাকে ধরবো,
জ্ঞান থাকে না তখন মোদের বাঁচবো কি না মরবো।
সন্ সন্ সন্ ট্রেণ ছুটেছে, উঠছে বা কেউ নাবছে,
কাগজ পড়ি, গল্প করি, কে কার কথা ভাবছে।
গল্প করি আফিস ঘরের কোথায় কি যে ঘটলো,
বড় সাহেব বদলী হলো, ছোট সাহেব চটলো।
ষ্টেসন থেকে পাখীর মত দিগ্বিদিকে ধাই গো,
ঘড়ি তখন কাঁটায় কাঁটায় সময় বেশী নাইকো।

(২)

প্রত্যাগমন পুনর্মিলন আবার আফিস ভঙ্গে
গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ বরাত সবার সঙ্গে।
দিবসব্যাপী কালির লড়াই বিরাম মোটে নাই ত
আকাশ বাতাস গন্ধ আলো রেলেই মোরা পাই ত।
রেল গাড়ীতেই এই জীবনের একটু খানি পদ্য,
বাকীটা সব নীরস গণিত, কঠিন কঠোর গদ্য।
বায়স্কোপের ছবির মত, কতই করি লক্ষ্য
জীবন ধরে দাগ রেখে যায় পাঁচ মিনিটের সখ্য।

(৩)

কেউ বা সুদূর দিল্লী যাবে, কেউ বা যাবে বোম্বে,
ঘণ্টা ধরে কতই কথা, কতই আলাপ জমবে।
ছোট্ট ছেলে ওই চেয়ে যায়, হাস্য কি তার মিষ্টি,
মনটী ভুলায় ট্রেণ চলে যায়, আর চলে না দৃষ্টি।
কন্যা যাবে শ্বশুর বাড়ী, জল তখনো চক্ষে,
ভাইটী তাহার নামতে ভোলে, রয় দাঁড়ায়ে কক্ষে।
ঘোমটা ঘামে মুখটী ভেজা, মুক্তা নোলক দুলছে
স্নেহের স্মৃতি নিবিড় হয়ে ব্যাকুল করে তুলছে।

(৪)

পথেই দেখি শ্যামল ক্ষেতে, নামছে কেমন সন্ধ্যা
গরীব গৃহের অঙ্গনেতে চাইছে নিশি গন্ধা।
রাখালরা সব ডাকছে মোদের, উদ্দেশে কিল মারছে
পুকুর ধারে রঙ ধরা জাম ডাল ভেঙ্গে কেউ পাড়ছে।
কৃষক শিশু আসছে চেপে সবল পিতার স্কন্ধে
রথের ফেরৎ খেলনা হাতে আপন মনানন্দে।
কুক্ষ ছাদে নির্নিমেষে চাইছে মাতা একলা,
কই ত ছেলে ফিরলো না কই আকাশ বড় মেঘলা।

(৫)

এম্‌নি করে কুড়িয়ে পাওয়া দুঃখ সুখের মধ্যে
মায়ার 'টানা' 'পোড়েন' বুনি' বৃষ্টি শিশির রৌদ্রে।
সুদূর মোদের দেয় নাক' ডাক নিকট নিয়েই ব্যস্ত,
স্কন্ধে প্রবাস অপ্রবাসের যুগ্ম বোঝাই ন্যস্ত।
সীমার মাঝে অসীম মোরা ঘুরছি ভ্রমানন্দে,
মোদের গীতে 'সম' নাইক, ছেদ নাহিক ছন্দে।
যাতায়াতেই করছি মানব জীবনটাকে নষ্ট,
ভরসা দয়াল আর দেবে না যাতায়াতের কষ্ট।

রোজ তারিখের যাত্রী মোরা
মাস টিকিটের যাত্রী,
যাইনে কেন সকাল সকাল,
ফিরতে ত সেই রাত্রি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পুস্তকপরিচয়

কান্তকবি রজনীকান্ত—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত—বহু চিত্রে শোভিত হইয়া রবীন্দ্রবাবুর আশীর্ব্বাদি ভূমিকাটী মুখপত্র করিয়া ৪০৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই চরিতাখ্যানখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি তিনটী বড় অধ্যায়ে বিভক্ত; ১ম, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র ১১০ পৃষ্ঠা, ২য় হাঁসপাতালে মৃত্যুশয্যায় ১৫৩ পৃষ্ঠা এবং ৩য় বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে ১৪৫ পৃষ্ঠা। নলিনীবাবু লিখিয়াছেন, এই বৃহৎ গ্রন্থখানি লিখিতে তাঁহাকে বার বৎসর চেষ্টা করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাঁহার কথায় আরও জানিতে পারিয়াছি, রজনীকান্ত নলিনীবাবুকে তাঁহার জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রজনী বাবুর পিতা গুরুপ্রসাদ সেন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক পদ রচনা করিয়া "পদচিন্তামণিমালা" নামে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পদগুলির সংখ্যা কম নহে। "পদচিন্তামণিমালা" একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। আমরা ছোট বেলায় তাহা পড়িয়াছিলাম। এখনকার দিনে বৈষ্ণব মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাঁহারা পদ লিখিয়াছেন—তাঁহাদের অনেকের সুর মহাজনদের সুরের সঙ্গে মিশে নাই। আধুনিক ভাব ও ভাষার দৌরাত্ম্যে খাঁটি জিনিষটী মাটী হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র গুরুপ্রসাদ সেন প্রাচীন পদকর্ত্তাদের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারেন। তিনি নিজে শাক্ত হইয়াও, বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পদ লিখিয়াছিলেন।

গুরুপ্রসাদের এই বৃহৎ "পদচিন্তামণিমালা" হইতে দুইটি মাত্র পদও নলিনীবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও খুব শেষের দিকে, দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

পুস্তকখানিতে মাঝে মাঝে দুই একটা ভুল আছে। এত বড় বই নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু গুরুপ্রসাদ সেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দনাথের কন্যা দুর্গাসুন্দরীর স্বামী দ্বারকানাথ রায় সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এমন আজগুবি কথা নলিনীবাবু কোথায় জানিলেন? দ্বারকানাথ রায় ছিলেন আমার স্ত্রীর আপনার মামা। তাঁহার পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ এখনও কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন একটা মিথ্যা কথা প্রচার করিবার পূর্ব্বে নলিনীবাবুর একটু অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। তিনি এই পুস্তকের জন্য বার বৎসর সন্ধান করিয়াছিলেন, না হয় অনুসন্ধানের দরুণ তের বৎসরই লাগিত। অবশ্য দ্বারকানাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (জে, এন, রায়)—যিনি ব্যারীষ্টারী করিতেন ও স্বর্গীয় হইয়াছেন, তিনি—বিবাহ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। কিন্তু এই এক ব্যক্তির কথা সমস্ত পরিবারটীকে আরোপ করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বানান গ্রন্থকারের পক্ষে একটু জবরদস্তি রকমের পৌরোহিত্য হইয়াছে।

পুস্তকখানি যে প্রাণ-ঢালা শ্রদ্ধার সহিত লিখিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আদ্যন্ত পড়িলে রজনীর যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা কবির, এবং তদপেক্ষাও অধিক, সাধকের! গভীর অন্ধকারে আলোহারা পথিক ঘোর অরণ্যে যেরূপ পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে গমন করে, রজনী সংসারের জটিলপথে সেইরূপ ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠান্তে এই সাধক-মূর্ত্তি পাঠকের চিত্তে মুদ্রিত হইয়া পড়িবে। মৃত্যুর সময় তাঁহার কপালে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার মৃত্যু শান্ত, নির্ভরশীল, এমন কি আনন্দময়। জড়কে ধ্বংস করিয়া ভগবান্ সাধকের আত্মার বল পরীক্ষা করেন,—ইহার উদাহরণ রজনীকান্ত। প্রতি কষ্টটি তাঁহার চিত্তকে কর্ষণ করিয়া তাহাকে ভক্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছে। তারপর যখন চরম

কষ্ট উপস্থিত হইল, তখন পাঁক ঠেলিয়া যেরূপ পঙ্কজ উঠে, তেমনই শরীরের সমস্ত বাঁধা ঠেলিয়া পূর্ণ প্রশান্ত ভক্তি দেখা দিল! সেই ভক্তি দেখিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্র, ডাঃ প্রফুল্ল প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। জড়ের শক্তি অপেক্ষা আত্মার শক্তি বেশী এই মহতী শিক্ষা দিয়া কবি চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু রজনীকান্ত! নলিনী পণ্ডিত মহাশয় তোমার রোজনামচায় তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ শক্তি দিয়া তোমাকে যেরূপ আঁকিয়াছেন, সে চিত্র আমার অপরিচিত নহে। এই বই পড়িতে পড়িতে যে কতবার তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি তাহা আর কি বলিব। তোমার ছবিতে, তোমার গানে, তোমার কথা বার্ত্তায়, আবার যেন তুমি জীবিত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়াছ,—যেমন আসিতে বর্ষার গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জনের সময় হারমোনিয়াম লইয়া বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে,—যেমন আসিতে শরৎকালে কত কবিতা কত হাসি কত আমোদ প্রমোদ লইয়া। হারানো রজনীকে নলিনী পণ্ডিত আনিয়া দিয়াছেন, আজ তাই স্বাগত বলিয়া আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। এই বই শুধু ঘটনার শুষ্ক বিবৃতি নহে—ইহা দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্যায় পাওয়া প্রাণ দেওয়ার একখানি যাদু-কাটি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

* * *

রত্নদ্বীপ—শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য দশ আনা মাত্র। একখানি ছেলেমেয়েদের বই। R. L. Stevenson-এর Treasure Island অবলম্বনে লেখা। অনুবাদ বহুস্থলে বেশ সরল, সহজ ও সুন্দর হইয়াছে। ম

* * *

প্রতিভা—হরিহর শেঠ প্রণীত। চন্দননগর পুস্তকাগার হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা। এখানি একখানি পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন " সংসার রঙ্গক্ষেত্রে সচরাচর যে সব অভিনয় দেখিতে পাই তাহারই একটা অপরিস্ফুট অঙ্ক এই সামান্য নাটকখানিতে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।" বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই বেশ ভাল। ম

* * *

হিন্দী শব্দ ও অনুবাদ মালা—শ্রীগোপাল চন্দ্র বেদান্ত-শাস্ত্রী ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত ও ভবানীপুর হিন্দীপ্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত—মূল্য আট আনা। পুস্তকখানি প্রথম বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর বর্ণ ও শব্দপরিচয় হয় এবং ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষার উপযোগী। ক

বোধন

বিশ্বনাথের হাতের দেওয়া শক্তি নিয়ে শক্ত হও ;
রুদ্ধ কারার আড়াল ভেঙ্গে বিরাটপুরে ব্যক্ত হও।

প্রতিধ্বনি

এ প্রতিধ্বনি দেশ-বিদেশের নয়,—অন্তরের ; ঈশ ও উর্জের—আশ্বিন ও কার্ত্তিকের মণ্ডপের দুয়ারে শরতের মৃদু পাদক্ষেপে জাগা মানস প্রতিধ্বনি।

বসন্তের নব চেতনার চঞ্চলতা নাই, নিদাঘের দীপ্ত বেদনার তাপ নাই, বর্ষার ক্ষিপ্ত কামনার গর্জ্জন ও প্লাবন নাই ; আছ তুমি আমার মানস-প্রাঙ্গনে,—অকম্পিত আলোকে ভাস্বর, অপরাজিত আনন্দে সমাহিত ; রসের পুষ্টিতে নয়, স্পর্শের তুষ্টিতে নয়, মদনীয় গন্ধের জড়িমায় নয়, শব্দের মাধুরীর গরিমায় নয়,—কেবল রূপে,—অনুভূত উৎসব-সৌন্দর্য্যে তোমাকে অপলক দৃষ্টিতে দেখিতেছি। এস রূপ ! এস শরৎ !

তোমাকে তরুণ জীবনে দেখিয়াছিলাম উজ্জয়িনীর ফ্রেমে বাঁধা কৃত্রিম চিত্র পটে,—কাশাংশুকাবিকচপদ্ম-মনোজ্ঞ-বক্ত্রা নববধূর বেশে ; দেখিয়াছিলাম বাসন্তী প্রতিমার সহিত অভেদে—হস্তে-লীলা কমল মলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং। তাহার পর দেখিয়াছিলাম কৃত্রিম পট ফেলিয়া প্রাকৃত পটে,—তমালতালী-বন-রাজী-নীলা সাগর-বেলায়। আর দেখিয়াছি প্রভাতে তুষার-ধবল গিরি শৃঙ্গে, মধ্যাহ্নে বিজন কাননের উপকূলে স্বচ্ছ সরোবরের তীরে, ও নিশীথে নক্ষত্রখচিত গাঢ় নীল আকাশে। এখন দেখিতেছি, পটে নয়, ঘটে। নব বধূ নও, প্রমদা নও, তুমি এখন মাতৃমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত। ক্ষুদ্র ঘটে অসীমের আভাস স্পন্দিত হইতেছে—দৃষ্টি পরাভূত হইয়াছে, আর অফুরন্ত চেতনার উন্মেষে ধ্বনিত হইতেছে—

তমসোমা জ্যোতির্গময়

তোমার অনন্তে প্রসারিত আলোকের উর্দ্ধ পথে আমার নিজের হাতের জ্বালা ক্ষুদ্র প্রদীপটি আকাশ-প্রদীপ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছি। এ প্রদীপটি কি দূর পথের নক্ষত্র-লোকে উপহসিত ? এই অসীম লোকে কোন্ দিক্‌টি অধিকতর উচ্চে ? ওই নক্ষত্রের দিক, না আমাদের দিক্ ? হে আনন্দ ! হে উৎসব ! হে রূপ ! তোমাকে এই ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে দেখিব,—সে তোমার অসীমে পরাভূত হইলেও দেখিব। তমসোমা জ্যোতির্গময়।

বন্ধন

শাস্ত্র কারও দেশের কোণার শোনা কথার ভাষ্য নয় ;
সত্যপুরের শিষ্য মোরা ; বিশ্বে কারও দাস্য নয়।

শক্তি পূজার ইতিহাস

মানুষ যখন আদিম অসভ্য অবস্থায় ছিল, যখন জীবিকা সংগ্রহের জন্য মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলে সমবেত হইয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, যখন পর্য্যন্ত যাযাবর হইতে স্থায়ী সমাজবন্ধন হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের পিতৃপরিচয় নির্দ্দিষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। এক দলের সঙ্গে অপর দলের পথে সাক্ষাৎ হইলে উভয় দলের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মিলন ঘটিত; তার পরেই আবার তাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইত। এই অবস্থায় যে সব সন্তানের জন্ম হইত, তারা চিনিত কেবল তাদের মাকে, মামাদের, মামার জ্ঞাতি গোত্রীয়দের। ছেলে যে সম্পত্তি পাইবার প্রত্যাশা রাখিত তাহা মার বা মামার সম্পত্তি; পিতার সে ত পরিচয়ই জানে না, তা তার সম্পত্তির সন্ধান করিবে কোথায়? এইরূপে সমাজে প্রথমতঃ মাতৃপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবের যাযাবর জাতিদের মধ্যে, প্রাচীন ঈজিপ্ট বা মিশরের রাজবংশে, এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যে বহুজাতির ভিতর এই মাতৃপ্রাধান্য, মাতৃনামে পরিচয় ও মাতৃসম্পত্তি দায়াদসূত্রে লাভ প্রথা হইয়াছিল বা আছে এখনো। এই স্ত্রীপ্রাধান্য হইতে আর-একটি প্রথা হইয়াছিল—মার সম্পত্তি মেয়ে পাইত; পুরুষ স্ত্রীর সম্পত্তি হইতে প্রতিপালিত হইত, এখন যেমন স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হইতে প্রতিপালিত হয়। ভাই যে সব সম্পত্তির সহিত আবাল্য পরিচিত ছিল, বড় হইয়া দেখিত কোথাকার একজন কে তার ভগিনীকে বিবাহ করিয়া সে সমস্ত উপভোগ করিতেছে, সে একেবারে বঞ্চিত। আবাল্য-পরিচিত সামগ্রীর প্রতি মানুষের একটা মমতার টান থাকে; এইজন্য পৈতৃক বা মাতৃক সম্পত্তিতে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক টান হয়। এই মাতৃক সম্পত্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অনেক সমাজে সহোদরা-বিবাহ, মাতুলের মৃত্যুর পর মাতুলানী-বিবাহ, মাতুলকন্যা-বিবাহ এবং অপরদিকে আবার ভাগিনেয়ের মৃত্যুর পর মাতুল কর্ত্তৃক ভাগ্নে-বৌ-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরে সহোদরা-বিবাহ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তার জন্যই যুবতী ক্লিয়োপেট্রা শিশু ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া পরে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। শাক্য ইক্ষ্বাকু রাজবংশে সহোদরা-বিবাহ রীতি ছিল। সিংহলী মহাবংশ বলেন তৎকালে বঙ্গদেশে সহোদরা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। দশরথজাতকে সীতাকে রামের সহোদরা করিয়া এই প্রথারই সমর্থন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এখনো মাতুলকন্যা বিবাহ সুপ্রচলিত; মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজেও ভাগ্নীব্য-বিবাহ অবিধি নয়।

এইরূপে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্যের ফলে মাকে কেন্দ্র করিয়াই গৃহস্থালি ও সমাজ গঠিত হইতেছিল। পুরুষ বাহিরের কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত, সে পশু শিকার করিয়া বা বন জঙ্গল হইতে স্বচ্ছন্দজাত ফলমূল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিত; আর সেই সমস্ত রক্ষা বণ্টন রন্ধন পরিবেষণ

প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্ত্রী স্ত্রী বা মাতা। এইজন্য প্রত্যেক পরিবার স্ত্রীনামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। তা থেকে ক্রমে দল গোষ্ঠী গোত্র—clan ও tribe—পর্য্যন্ত স্ত্রী নামেই পরিচিত হয়।

এই সমাজস্তরের লোকেরা যখন ভূত-প্রেত ছাড়িয়া দেবকল্পনা করিতে লাগিল তখন স্বভাবতঃই স্ত্রীদেবতাকেই তারা প্রধান করিয়া তুলিল—এইরূপে স্ত্রী-দেবতা ও মাতৃভাবের দেবতার উদ্ভব।

মানব যেমন অনাদি, মানবের যত কিছু ভাব, শ্রদ্ধা ভক্তি, সব অনাদি। এই অর্থে মাতৃদেবতা অথবা শক্তিপূজা অনাদি।

ভারতবর্ষের লোকেরা বহু মিশ্রণে উৎপন্ন। তার মধ্যে আর্য্য, দ্রবিড়, মোঙ্গল ও কোল এই চার শাখা প্রধান। প্রত্যেক মানববংশের এক একটি স্বতন্ত্র স্বভাব আছে। ভারতবর্ষের লোকচরিত্রে প্রধানতঃ চারি মানবশাখার চার প্রকার স্বভাবের প্রভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। আর্য্যজাতির স্বভাব—ইন্দ্রিয় সংযম, স্ত্রী পুরুষে একনিষ্ঠতা, দেবকল্পনায় বুদ্ধিমার্জ্জিত ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা আরোপ। দ্রবিড় জাতির স্বভাব, সম্ভোগবিলাসিতা, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে বাধাবন্ধন অনাবশ্যক বোধ, দেবকল্পনায় উচ্চভাব বা পবিত্রতার অভাব। কোল স্বভাব—আর্য্য ও দ্রবিড় স্বভাবের মধ্যবর্ত্তী—যতক্ষণ স্বামী স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ততক্ষণ তারা পরম একনিষ্ঠ; কিন্তু বিবাহ-বন্ধন তাদের এ-বেলা ও-বেলা খসে এবং যখন নর বা নারী বিবাহে আবদ্ধ নয়, তখন তারা যা খুসী অনাচার করে; তাদের দেবকল্পনা অত্যন্ত নিম্নস্তরের,—ভূত প্রেত ডাকিনী, তুকতাক মন্ত্র ঝাড়ন মাত্র তাদের সম্বল। মোঙ্গল-স্বভাব—আর্য্য, দ্রবিড় ও কোল এই তিনের মধ্যবর্ত্তী; তারা একনিষ্ঠ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে তারা বাধাবন্ধনহীন; তাদের দেবতা একাধারে মাতার ন্যায় পূজনীয়া আবার স্ত্রীর ন্যায় সম্ভোগসামগ্রী।

এই চতুর্ব্বিধ স্বভাব প্রভাবে পরিকল্পিত স্ত্রী দেবতা ক্রমশঃ শাস্ত্রস্তরে উত্তীর্ণ হইয়া শাক্তধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের আত্মা ব্রাহ্মণ্য এবং দেহ দ্রবিড়-কোল-মোঙ্গল; ইহার অন্তরে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতা বিরাজিত, কিন্তু তাকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিয়া আছে বিবিধ অনুষ্ঠান তন্ত্রমন্ত্র ভূত পিশাচের ঝাড়ফুঁক অনাচার অতিচার।

আদ্যাশক্তি সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের কেন্দ্র ও মূল; তিনি সমস্ত দেবতার জনয়িত্রী। আবার তাঁরই অংশ দেবতাদের শক্তি ও স্ত্রী। এই একাধারে মাতৃকা ও পত্নীভাবে উপলব্ধি তান্ত্রিক সাধনার মূল।

এইরূপে জগতের আদি কারণ শক্তিকে (Primordial or Cosmic Energy) স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে কল্পনা আর্য্য বা ইরাণীয় নহে; আর্য্যসমাজ ছিল পিতৃতন্ত্র; সেইজন্য আর্য্যদের দেবকল্পনায় পুরুষ প্রাধান্য দেখা যায়; বেদে স্ত্রীদেবতার উল্লেখ অল্পই আছে, এবং যাঁরা আছেন তাঁরাও

প্রধান দেবতা নন। স্ত্রী দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায় মধ্যধরণী সাগরের সন্নিহিত জনপদগুলিতে ;—এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, ব্যাবিলন, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশে সৃষ্টিস্থিতি পালনের কারণ-শক্তিকে মাতৃভাবে কল্পনা করা হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই সেই আদ্যাশক্তি বা জগদম্বা পুরুষ বিনা সন্তান প্রসব করিয়াছেন এবং পরে সেই সন্তানের সহযোগে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। Encyclopoedia of Religion and Ethics বলেন :—

"Everywhere is she unwed, but made the mother first of her companion by immaculate conception, and then of the Gods and all life by the embrace of her own son. In memory of these original facts, her cult is marked by various practices and observances symbolic of the negation of true marriage and obliteration of sex. A part of her male votaries are castrated; and her female votaries must ignore their married state when in her personal service, and often practise ceremonial promiscuity."

এই ভাবেরই প্রকাশ, ঈজিপ্টের দেবতা ইসিস, মেসোপটেমিয়ার দেবী ইশতর, বাইবেলের দেবী Virgin Mary হইতে যিশুর উৎপত্তি ও পুত্রপিতার অভেদত্ব স্বীকারে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া দেবীমন্দিরে পুরোহিত ও দেবমন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ হইতে থাকে ; ঈজিপ্টের ইসিস দেবীর মন্দিরে ও মেসোপটেমিয়ার ইশতর দেবীর মন্দিরে পুরোহিতের ও আমাদের দেশের দেবমন্দিরে দেবদাসীর দেবী ও দেবের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক কল্পিত হইত।

Virgin soul অর্থাৎ যে আত্মার কোনো কিছুরই প্রভাব স্পর্শ করে নাই তাকে দেবতার নিকট উৎসর্গ করাই ঐ সব কল্পনা বা অনুষ্ঠানের অর্থ। পূজক ও পূজিত এক অভেদ এই বোধ জন্মিলেই সাধনা সম্পূর্ণ হয় ; সেইজন্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম হইবার আগ্রহে ধর্ম্মাচারে নানাবিধ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের প্রাদুর্ভাব হয়। এই একই ভাবের ত্রিধা প্রকাশ আমাদের দেশে দেখা যায়—শক্তিতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র ও বৈষ্ণবভজনা। এই ভাবটি বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই মাতৃভাবের স্ত্রীভাবে দেবতার উপাসনাপ্রণালী যখন দেশের দ্রবিড় মোঙ্গল অংশ হইতে উদ্ভুত হইয়া বদ্ধমুল হইতেছিল, তখন কোলঅংশ তাতে ভূতপ্রেত-ডাকিনী পিশাচ যোগ করিয়া দিতেছিল এবং আর্য্য অংশ সেই সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার রং লাগাইয়া উজ্জ্বল ও উচ্চ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। যখন স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল তখন অনার্য্য ভূতপ্রেত পর্য্যন্ত দেবীর মহিমা অর্জ্জন করিতে লাগিল এবং আর্য্য ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ধর্ম্ম ও দেবতার সঙ্গে সুসঙ্গতি করিয়া দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গোঁজামিল দিয়া বিবিধ পুরাণ রচনা করিল। যে পুরুষদেবতার প্রাধান্য বৈদিক ধর্ম্মে ছিল, তাহা পুরাণে খর্ব্ব হইল ; কিন্তু বঙ্গ ও কাশ্মীর, ভারতের দুইপ্রান্ত বহুজাতির মিলনভূমি বলিয়া পুরাণ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তারা তন্ত্র সৃষ্টি করিয়া শক্তিপূজাকেই প্রধান ও প্রবল করিয়া তুলিল।

যারা পুরুষদেবতারই ভজনা করিতে লাগিল—যেমন শৈব বা বৈষ্ণব—তারাও তন্ত্রের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইল না ; শৈব তান্ত্রিকতা ও বৈষ্ণব ভজনা স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া উঠিল। আভীর বৃজ্জি জাতি বৈষ্ণব হইল বটে, কিন্তু তাদের স্থানীয় রীতিপদ্ধতি তারা ত্যাগ করিল না, তাহা বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রে পরিগৃহীত হইল। বাংলার তন্ত্রেও দ্রবিড় কলিঙ্গ উৎকলের বহু রীতি-পদ্ধতি স্থান পাইয়া অনুষ্ঠেয় হইল। কারণ, মানুষ ধর্ম্মের কল্পনায় উন্নত হইয়া উঠিলেও অভ্যস্ত অনুষ্ঠান পদ্ধতি আচার সহসা ত্যাগ করিতে পারে না।

একই দেবীকে একবার মাতা ও অন্যবার স্ত্রী কল্পনা হইতে দেবদেবীর যুগলমূর্ত্তির কল্পনা হয়। ঈজিপ্টে ইসিস ও অসিরিস, মেসোপটোমিয়ায় ইশ্‌তর ও তম্মুজ, সীরিয়ার তিয়াবৎ ও মেরোডাক, হিট্টাইটদের বৃষ ও সিংহী যুগলমূর্ত্তি।

ভারতবর্ষে বহু জাতীয় স্বভাবের মিশ্রণের ফলে তিনটি প্রধান যুগলমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল—রামসীতা, শিবদুর্গা, রাধাকৃষ্ণ। আর্য্য আদর্শের সৃষ্টি রামসীতা—পরস্পর অনুরক্ত, একনিষ্ঠ, নৈতিক ধর্ম্মপালনে দৃঢ়ব্রত। রাধাকৃষ্ণ আর্য্যপ্রভাবান্বিত দ্রবিড় আদর্শ—কৃষ্ণ বহুভোগী, গোপীগণ স্বামী সত্ত্বেও কৃষ্ণানুরাগিণী কিন্তু তারা ঐ এক কৃষ্ণেই আসক্ত, বহুতে নহে। শিবদুর্গা এই দুয়ের মাঝামাঝি—শিব একদিকে এক সময়ে মহাযোগী, তিনি মদনকে ভস্ম করেন ; আবার অন্যদিকে অন্য সময়ে শবরপল্লীতে কোচপল্লীতে বা ঋষিপল্লীতে ঋষিপত্নীদের চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া ফিরেন ; কিন্তু দুর্গা সতী, পতিনিন্দা শুনিয়াই তিনি দেহত্যাগ করেন, পতিলাভের জন্য দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি উমা ও অপর্ণা ; কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে ব্যভিচার ভব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং তাঁর কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধিক দেবভোগ্যা ত বটেই, মানুষেরও ভোগ্যা—লক্ষ্মী প্রথমে ইন্দ্রের পরে বিষ্ণুর এবং এখন পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজা ও ভাগ্যবানের ভোগ্যা হইয়া আসিতেছেন ; কমলার সহিত ঋষিসহবাসের কথা কাদম্বরীতে আছে ; সরস্বতী প্রথমে ব্রহ্মার পরে বিষ্ণুর এবং এক সময়ে বাণভট্টের পূর্ব্বপুরুষের অধীন হইয়াছিলেন। দুর্গাকে তন্ত্রে আরো হীন করা হইয়াছে। দুর্গার এক নাম কন্যাকুমারী ; সেই জন্য তান্ত্রিক সাধকেরা চক্রে দেবীপ্রতিনিধি কুমারী ভজনা দ্বারা পূজ্য ও পূজকের একাত্মতার আনন্দ স্থূল ও কৃত্রিম উপায়ে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন।

বেদে রূপক শব্দের আশ্রয় লইয়া ও সাংখ্যদর্শনের পুরুষের পত্নীরূপিনী প্রকৃতি ও মায়াবাদের মিশ্রণে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ও পর প্রথম শতকে শক্তিপূজা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে বলিয়া অনুমান করা হয়। বৈদিকের বিপরীত তান্ত্রিক। বেদের নাম নিগম, তন্ত্রের নাম আগম। আগম অর্থে যাহা আগত, অর্থাৎ যাহা বৈদিক প্রক্রিয়ায় ছিল না। সেই জন্যই তন্ত্র শিবমুখ হইতে আগত বলা হয়। বহুকাল হইতেই হিন্দুধর্ম্ম তান্ত্রিক ; এই বঙ্গদেশে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা।

এই শক্তিপূজার বিবর্ত্তন ক্রমবিকাশ বা পরিবর্ত্তন কতবার কতরকমে হইয়াছে তার সোপান পরম্পরা বৈদিক যুগ হইতে অনুসরণ করিয়া দেখা যাক্।—

বেদ-সংহিতা হইতে গৃহ্যসূত্র পর্য্যন্ত প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে দেবীর নাম থাকিলেও দেবীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রোদসী রুদ্রানী ভবানী নাম আছে বটে কিন্তু সেগুলি রুদ্র ও ভব শব্দের স্ত্রীত্ববাচক শব্দ মাত্র, কোনো স্বতন্ত্র দেবী নহে। একমাত্র হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে ভবানীকে যজ্ঞাহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে। সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি নগণ্য কুচো দেবতার একজন। বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা দেবীর নামমাত্র পাওয়া যায়; তিনি রুদ্রের ভগিনী। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়—ঈজিপ্টের ইসিস ও অসিরিস আদিতে ভাইবোন ছিলেন; পরে স্বামী স্ত্রী হন; এসব মাতৃতন্ত্র সমাজের কল্পনার ফল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা কাত্যায়নী ও বৈরোচনী দেবীর সাক্ষাৎ পাই; তিনি সূর্য্য বা অগ্নির কন্যা। ঈজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা ও দেবী শেখেৎ ভারতবর্ষে আসিয়া রুদ্র ও শক্তি হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মেগাস্থিনিস (৩০২ খ্রীষ্টপূর্ব্ব) লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বৈদিক রুদ্র শাকদ্বীপী মগধের সূর্য্য দেবতার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন। শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণরা তাদের সূর্য্য দেবতাকে শিব বলিত। সারদাতিলকতন্ত্রে শিবের একটি ধ্যানে তাঁকে 'বন্ধুকাভ' বলা হইয়াছে; সে বর্ণ সূর্য্যের এবং সূর্য্যের নামই আগে ছিল শিব। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্রবিড় শাখায় রুদ্রের এক নাম পাওয়া যায় উমাপতি।

সামবেদীয় কেন-উপনিষদে হৈমবতী উমা নাম দেখি, কিন্তু তিনি তখন শরীরিণী ব্রহ্মবিদ্যা, শিবগৃহিণী নহেন। এই উমা নামের সঙ্গে হৈমবতী শব্দ সংযুক্ত থাকাতে তিনি পরবর্ত্তীকালে হিমালয়-দুহিতা হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। হৈমবতী নাম হইতে অনেকে অনুমান করেন উনি হিমালয়বাসীদের দেবতা ছিলেন। (রমাপ্রসাদ চন্দ, Indo-Aryan Races)। যজুর্ব্বেদে গিরিশ রুদ্রের স্ত্রী উমা হৈমবতী। এই উমা তখনো স্বতন্ত্র স্বাধীন দেবতা নহেন, দেবপত্নী মাত্র।

Apparently Uma was not an independent goddess, or at least a kind of divine being, perhaps a female mountain ghost haunting the Himalayas, and was later identified with Rudra's wife.—Prof. Jacobi in Encyclopoedia of Religion and Ethics.

তারপর অথর্ব্ববেদীয় মণ্ডুক-উপনিষদে অগ্নির শিখার সাতটি নাম পাওয়া যাও—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরূপিণী। দুর্গা অগ্নির অপর নাম। বেদে নির্ঋতির পত্নী গৌরী। এইসব নামগুলিই শেষে পার্ব্বতী দুর্গার নাম করিয়া চালানো

হইয়াছিল। দুর্গা হইয়াছিলেন প্রধান দেবী, কালী, করালী, ধূমাবতী, বিশ্বরূপিনী প্রভৃতি তাঁর গুণবাচক অথবা অপর রূপ বা অবতারের নাম হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আচার্য্য রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার বলেন——

Different names indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions, but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে সহস্রাক্ষ মহাদেব রুদ্র, বক্রতুণ্ড গণেশ, নন্দী, ষণ্মুখ কার্ত্তিক ও দুর্গার গায়ত্রী দেওয়া আছে। দুর্গার গায়ত্রীর মধ্যে তাঁর অপর দুই নাম দেওয়া হইয়াছে কাত্যায়ন ও কন্যকুমারী।—"কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যকুমারী ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।" আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন—"যাজ্ঞিকী উপনিষদকে ব্রহ্মবিদ্যা বলাই কঠিন; ইহা মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ;—পাঠের সময় মনে হয়, বেদ পড়িতেছি না, তন্ত্র পড়িতেছি।" আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন এই উপনিষৎ তন্ত্ররচনার পরে দ্রবিড়দেশে তৈয়ারী জাল (বঙ্গদর্শন, ৩য় বর্ষ ফাল্গুন)।

বেদে উষা, পৃথিবী, ভারতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি আরো দেবী আছেন, তাঁদের কেহই শক্তিরূপিণী দেবী নহেন, কাহাকেও মাতৃভাবে অনুভব করা হয় নাই।

মনুসংহিতায় ভদ্রকালী দেবীর নিকট বলি উপহার দিবার ব্যবস্থা আছে সিকি শ্লোকে।

উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাদ্ ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোস্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥

—৩ অ, ৮৯ শ্লো।

কাত্যায়ন সংহিতায় গণেশ, গৌরী, পদ্মা, সচী, সাবিত্রী, জয়া, বিজয়া প্রভৃতি আধুনিক দেবদেবীর উল্লেখ আছে। এইজন্য রমেশচন্দ্র দত্ত এই সংহিতাকে অপ্রাচীন মনে করেন। পাণিনির বার্ত্তিকপ্রণেতা কাত্যায়ন ছাড়াও বহু অপর কাত্যায়ন শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন; সুতরাং সংহিতাকার কাত্যায়নকে পাণিনির বার্ত্তিককার মনে করা যায় না।

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাধীন

(১)

গামছায় মাথা মুছিতে মুছিতেই রান্না ঘরে ঢুকিয়া মতি বলিয়া উঠিল, "ভাত দাও, ঠাকুর, ভাত দাও। ওঃ, এর মধ্যেই এগারটা বেজে গেল!" বলিয়াই একখানা পিঁড়ি পাতিয়া এক গ্লাস জল লইয়া মতি বসিয়া পড়িল। মতির গলা শুনিয়াই পাশের ঘর হইতে গিন্নী একটী ঔষধের শিশি হাতে করিয়া বাহির হইলেন। "এই যে মতি তুমি এখনো কলেজে যাও নি? আমি আরো ভাবচি কাকে দিয়া ওষুধটা আনাই—তুমি কেনই যে রোজ এত দেরী কর তা বুঝি না—তা যাক্ ভালই হয়েছে, চট করে ওষুধটা এনে দিয়েই খেতে বসো।" এই বলিয়া অঞ্চলগ্রন্থী হইতে Prescription খানা বাহির করিতে লাগিলেন। শশব্যস্তে পিঁড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া মতি জিজ্ঞাসা করিল "কার অসুখ হয়েছে---মনুর নাকি?

"হ্যাঁ, কাল রাত্তির থেকেই বেদম জ্বর—হবে না যে দুষ্টু মেয়ে কেবল রোদে পুড়বে আর জলে ভিজ্‌বে।"

"তাইত! মনুর জ্বর হয়েছে—! খুব বেশী জ্বর? ডাক্তার দেখে কি বল্লে?"

"কি আর বল্‌বে? বল্লে দুদিন না গেলে ত কিছু বোঝা যাবে না।"

"বোঝা যাবে না?—খুব বেশী জ্বর? না—আজ আর কলেজে যাবো না—দিন।" বলিয়া Prescription আর ঔষধের শিশি লইয়া মতি কোঁচার মুড়ো গায়ে দিতে দিতে বাহির হইয়া পড়িল।

ঠাকুর ভাতের থালা লইয়া বাহিরে আসিতেই গৃহিণী বল্লেন—"ঢাকা দিয়ে রাখো—যখন হয় খাবে এখন।

(২)

"মতি, জ্বরটা কি আরো বেড়েছে?" আহারান্তে গৃহিণী আসিয়া তাঁহার ভিজে হাতখানা কাপড়ে মুছিয়া লইয়া মনুর কপালে রাখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ—তাইত!"

মনুর মাথায় বাতাস করিতে করিতে মতি উত্তর করিল, "না—এখনই দেখলাম থার্ম্মোমেটার দিয়ে—জ্বর একভাবেই রয়েচে।"

"না—তাহ'লে আর বাড়ে নি। তুমি হাওয়া করচ? তা বেশ—মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা থাক্‌বে ওতে।"

ঠাকুর আসিয়া বলিল—"মতিবাবু খাবেন আসুক।"

পাশের একখানা খাটের উপর গৃহিণী তাঁহার বিশাল দেহভার রক্ষা করিয়া বলিলেন, "ওঃ—তুমি এখনও খাও নি? আজ তাহ'লে বড় দেরী হয়ে গেল! মনুর কিছু হলে খাওয়া দাওয়া অব্দি তোমার মনে থাকে না। তা মনুও তোমার কাছে থাকে ভাল, যেন অসুখের কথাটাও সে ভুলে যায়! তাই বলে অতটাও ভাল নয় মতি—নিজের শরীরের দিকে চেয়ে সব করতে হয়।—মনু, ঘুমো শীগ্‌গির—নইলে তোর মতিদা খেতে যেতে পার্‌চে না। হ্যাঁ মনুও ঘুমুলো বলে—ঘুমিয়ে পড়লেই তুমি খেতে যেয়ো মতি।" একটা হাই তুলিয়া গৃহিণী সেখানেই শুইয়া পড়িলেন।

মনু একটু হাঁপানো সুরে বলিল, "খেতে যাও মতিদা এই আমি ঘুমুচ্চি।" অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া মনু চোখ বুঁজিল।

এমন সময় গৃহকর্ত্তা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনু কেমন আছে?"

"এখন একটু ভালই আছে।"

হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গৃহিণী বলিলেন "দেখ ত গো, মনুর জ্বরের বেগটা কম্‌ছে না কেন?"

গৃহকর্ত্তা কন্যার মস্তকের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "জ্বরটা ত একটু কমেছে বলেই বোধ হচ্চে। মতি, চট্‌ করে চিঠিখানা ডাকে দিয়ে এস ত।"

"না গো মতির খাওয়া হয় নি এখন ও চিঠি ফিঠি ডাকে দিতে পারবে না। যাও মতি, এখন খেতে যাও তুমি।"

"ডাক চলে যায় যে! যাও মতি, ধাঁ করে দিয়ে এসে খেতে বসো।" মতি চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। পথে সন্তোষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল।

"মতিবাবু আজও কলেজে গেলেন না? Percentage short পড়ে যাবে কিন্তু। এখনও এক period আছে—শীগ্‌গির যান, একটা 'p' পাবেন।"

মতি একবার সন্তোষের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "না কলেজ ত নয়। বাবুর চিঠি ফেল্‌তে যাচ্চি।"

"ওঃ তাহ'লে যান্ শীগ্‌গির ঐ যে বাক্স খুল্‌চে। Percentageএর জন্যে ভাববেন না। আপনারা ভাল ছেলেও বটে তাছাড়া বাবা একটু ব'লে দিলেই, বুঝেচেন, Non-collegiate করে allow করে দেবে।"

সন্তোষ গৃহকর্ত্তার জ্যেষ্ঠপুত্র। দুইজনেই স্থানীয় কলেজে পড়ে—তবে মতি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে আর সন্তোষ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে।

(৩)

কৰ্ত্তা আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,—"ওগো শুনেছ, ডাক্তারবাবু আজ দেখে বলে গেলেন মতির নাকি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। সন্তোষকে বলে দিও তারা যেন মতির ঘরে না যায়। যে ছোঁয়াছে রোগ!—কিছু বলা যায় না।"

"ডাক্তার এসেছিল! মনুর বুকটা দেখালে কৈ? কি যে আক্কেল তোমার—মনে ভাব জ্বর সারলে আর ভাত খেলেই সব সেরে যায়। কি হ'তে কি হবে তখন আমার কথা মনে পড়বে।"

"ওঃ তাইত বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে—তা কাল সকালে দেখালেই হবে।"

"তোমার ভুল ঐ রকমই। কাল দেখিও কিন্তু।"

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তা আবার বলিলেন "কোথা থেকে জ্বর নিয়ে এসেছিল তার ঠিক কি? বাড়ীশুদ্ধ না ভোগায়! মনুকে ত একবার ভোগালে।"

গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিলেন হঠাৎ মনুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন "ও মনু বাইরে যেও না ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

মনু এতক্ষণ মায়ের কোলের কাছে বসিয়া বাবার মুখে তাহার মতিদার অসুখের কথা শুনিতেছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার স্নেহভরা মুখখানায় কাতর বেদনা আপনি ফুটিয়া উঠিতেছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে মায়ের নিকট হইতে উঠিয়া রোগক্ষীণ দেহকে ধীর পদক্ষেপে টানিয়া লইয়া যখনই সে দরজার বাইরে পা দিয়াছে অমনিই তাহার মা বলিয়া উঠিলেন "ও মনু বাহিরে যেও না ঠাণ্ডা লাগবে।" বেদনা ভরা মুখখানা বিষাদের ছায়ায় আরও আঁধার হইয়া উঠিল। একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল "মতিদাকে দেখে আসি মা।"

গৃহিণী ধম্‌কাইয়া বলিলেন "নাঃ—সেরে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই বাইরে যাওয়া!"

(৪)

মতি অর্দ্ধসংজ্ঞ অবস্থায় পড়িয়াছিল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে জানলাটী খুলিয়া যাওয়ায় মাতৃহস্তের শীতল স্পর্শের মতই একটা ঠাণ্ডা বাতাস মতির উত্তপ্ত শরীরের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করায় সে পাশ ফিরিয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া শুইল। কিন্তু এ বাতাস ত তাহার পক্ষে ভাল নয়। ইচ্ছা হইতেছিল জানালাটী বন্ধ করিয়া দেয় কিন্তু ওঃ, তাহার সমস্ত শরীরে কি ভীষণ বেদনা—উঠিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। ধীরে ধীরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

চেতনা পাইলে দেখিল জানালাটী, কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার অজ্ঞাতসারে বহিয়া গেল, বাহিরের নিকট হইতে তাহার অন্তর বিদায় গ্রহণ করিল।

"আমাকে একটা খবরও দিতে পারিস্‌নি ? আর জানালাটাই বা খুলে রেখেছিলি কেন ?"

মতি চমকিয়া উঠিল। তাইত, সে ত টের পাই নাই—এতক্ষণ কে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। তাহার চোখ হইতে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল—ডাকিল, "মা!"

"আমি অজিত। বাইরে হচ্চে জল ঝড় আর দিব্যি জান্‌লাটা খুলে রেখেছিস্‌ ?"

"ও! অজিত!" বলিয়াই মতি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। অজিত মতির সহাধ্যায়ী।

হঠাৎ মতি বলিয়া উঠিল, "ভাই অজিত!"—এই আহ্বান একটা দীর্ঘনিশ্বাসের রূপান্তর নয় ত ?

অজিত সান্ত্বনার সুরে বলিল, "জ্বর ত সবারই হয়, অত হতাশ হবার কিছু নেই এতে। বলি পথ্যি করেছিস্‌ কি ?"

"দুধ বার্লী।" এই বলিয়া মতি কক্ষটির কোণস্থিত একটি বাটি ও একটি গেলাস দেখাইয়া দিল। সন্ধ্যার আঁধার ঘনীভূত হইতে সুরু করিলেও তখনও উহার উপর অসংখ্য মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিয়া উঠিয়া বিরক্তির সৃষ্টি করিতেছিল।

অজিত গ্লাস বাটি দেখিয়া বলিল "এ কখন খেয়েছিস্‌ ? ১২ ঘণ্টার দিনের মধ্যে মোট একবার পথ্যি! থাক্‌ গে ছাই—বাবু দেখ্‌তে আসেন্‌নি তোকে ? সন্তোষ বাবু ?"

"এসেছিলেন বৈ কি। আমি ঘুমিয়েছিলাম—দেখ্‌তে পাইনি। তা ভাই, তাঁরা নাই বা এলেন। আমার যে ছোঁয়াচে রোগ!"

"ওঃ সে ত ঠিক কথাই। ছাখ্‌ অত ধামাধরা ভাল নয়। উচিত কথা বল্‌তে ভয় পাবি কেন রে ?—আহা হা! তাঁদের আর হয় না কিনা ?"

"ভাই অজিত! আমার বিছানায় বেশীক্ষণ বসো না। সত্যি ছোঁয়াছে রোগ—বলা ত যায় না।"

"নেঃ—ন্যাকামো রাখ্‌। আমাদের আর ভয় দেখাতে হবে না। ভাই আমরা যে death-proof—এ সংসারে গরীবের মরণ আছে এ শুনেছিস্‌ কবে ? বাবা কুইনাইন অব্দি হেরে যায় এত তেত আমরা—তা যম বেটার এমন কিছু জ্বর হয়ে পড়েনি যে আমাদের খেতে আস্‌বে!"

(৫)

সহসা সন্তোষের ক্রুদ্ধ চীৎকারে অজিত উৎকর্ণ হইয়া বসিল। মতি একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। সন্তোষ বলিতেছিল—"শূয়ারকা বাচ্চা—তোম্‌ কাহে নেই ফিল্টার কা পানি দিয়া হ্যায় ? কাহে দীঘিকা পানি দিয়া ? হাম্‌লোগ্‌ মর্‌ জায়গা ? সহরভর বেমারী তোম্‌ জান্‌তা নেই ? কী মুখে মুখে তোম্‌ জবাব দিতা হ্যায় ? মতি বাবুকা দে দিয়া ত

আচ্ছা কর দিয়া! উল্লুক!" ঝন্ ঝন্ শব্দে গেলাসটী ফেলিয়া দিয়া সন্তোষ বাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

"ওঃ এতদূর?" একটা ঘোর বিরক্তিতে অজিতের মুখ ফিরাইল। মতি ধীরে ধীরে বলিল "কি সন্তোষের কথা বল্‌ছিস্? তুই ত জানিস্ prevention is the better than cure. আমার জ্বর হ'য়ে পড়েচে তার এখনও হয় নি।"

নে রাখ অমন preventionএ দরকার নেই আমাদের। আমি যা বল্‌ছি তোকে শুনতে হবে মতি। চল তোকে আজই আমাদের বাসায় নিয়ে যাই। না, না, আপত্তি করিস্ নে। এখানে থাক্‌লে মরে যাবি—এর চেয়ে hospitalও অনেক ভাল যে!"

ছিঃ অজিত!" বলিয়া মতি নিজের গরম হাতিখানি দিয়া অজিতের ঠাণ্ডা হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় ঘরে আসিয়া একটি ভৃত্য আলো রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কিছু খাবেন?" "দিতে পার",—ভৃত্যটী চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর মতি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল "আচ্ছা অজিত এমন কেন হয়?"

অজিতের মাথায় তখনও সন্তোষের কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিয়া উঠিল "এ সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পারলি না? এ না হ'লে বড়লোকের বড় লোকত্বই যে হয় না। এটা যে ধনীর emblem."

অতি কষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া মতি বলিল, "না ভাই, আমি সেকথা বলিনি। আমি ভাব্‌ছিলাম—"

"নেঃ আর ভাব্‌তে হবে না তোকে—ওকি! তুই অত ঘন ঘন পাশ ফিরছিস্ যে! বুকে টুকে বেদনা হয় নি ত?"

"না—এখন রাত ক'টা?"

অজিত ঘড়ী দেখিয়া বলিল "এর মধ্যেই ন'টা বেজে গেল! তা হ'লে ভাই, আমার উঠ্‌তে হয়। কাল সকালে আবার আস্‌ব।" অজিত চলিয়া গেল। মতি বুকের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিয়া মাঝে মাঝে গোঙ্‌রাইতে লাগিল।

দ্বার সম্মুখ হইতে কর্ত্তা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মতি, এখন কেমন আছ?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন "খাবার এখনও দিয়ে যায় নি বুঝি? আঃ চাকরগুলোও হয়েচে যেমন! তা, আমার মনে হয় এসব রোগে লঙ্ঘনও একেবারে মন্দ নয়, কি বল?"

মতি কি বলে তাহা শুনিবার আগ্রহ কর্ত্তার সেরূপ ছিল না। কারণ তিনি সে জায়গা পরিত্যাগ করিতে কাল বিলম্ব করেন নাই। হঠাৎ তিনি শুনিলেন—মতি বলিতেছে "আপনি যান এখান থেকে—আমার যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।"

(৬)

নরেন ইত্যাদি আরও দু'চারটী ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পরদিন যখন অজিত মতিকে দেখিতে আসিল তখন মতি প্রায় বেহুঁস, নরেন বলিল "এখুনি ডাক্তার আন্‌তে হবে।"

অজিত বলিল "তা হ'লে তুইই ছোট্‌—সাইকেল নিয়ে।"

সুরপতি—"ফিস্ আমি দোব—যা শীগ্‌গির যা।"

নরেশ সাইকেল লইয়া ছুটিল। সুরপতি ফ্ল্যানেল আনিতে গেল। এমন সময় গৃহকর্ত্তার এক খানসামা আসিয়া বলিল "বাবুজী কহ্‌তে হ্যায়—হিঁয়া বহুৎ গণ্ডগোল মাৎ করনা।"

"যা, যা মাৎ বক্‌না"—বলিয়া অজিত একটা আলোয়ান দিয়া মতির গা ঢাকিয়া দিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু রোগী পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই অজিত জিজ্ঞাসা করিল "কেমন দেখ্‌লেন ডাক্তার বাবু?" সুরপতি ৪টি টাকা ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে গেল। ডাক্তার বাবু বাহির হইতে হইতে বলিলেন "ওকি করচো? তোমরা যে একবারে ছেলে ছোকরার দল দেখ্‌তে পাচ্চি। খুব সেবা যত্ন চাই বুঝ্‌লে? বেদানার রস যত পার দেবে। ও দিয়ে বেদানা আনবে বুঝ্‌লে ছোক্‌রা? Double Pneumonia—two sides attacked—না খেয়ে একবারে মুস্‌ড়ে পড়েচে। চল হে আমার সঙ্গে একজন চল, ওষুধ আন্‌বে। তিন ঘণ্টা পরে খবর দিও কেমন থাকে।" অজিত তাঁহার পেছনে আসিতে লাগিল।

"তা বেশ করেছেন অমরেশ বাবু" বলিতে বলিতে গৃহকর্ত্তা ডাক্তার বাবুর নিকটস্থ হইলেন। "আমার house surgeon—আপনি নিশ্চয়ই জানেন তাঁকে—তিনিও দুবেলা দেখ্‌ছেন। হ্যাঁ এখন কেমন দেখ্‌লেন মতিকে—মতি বড্ড ভাল ছোক্‌রা কিন্তু—"

"সময় মত খেতে পায়নি বলেই—"

"একি বল্‌চেন মশায়?—আমি যে দশবার করে চাকরগুলোকে বলে দিয়েছিলাম—মতির খাবারটা যাতে সময় মত দেওয়া হয়—নাঃ আমি দেখাচ্ছি—কেমন মজা—"

"তার ওপর double Pneumonia—নমস্কার!"

"নমস্কার! কিন্তু যাই বলুন মশায় ছোক্‌রাদের দিয়ে কোন কাজ হয় না—এতগুলো ছেলে রয়েচে, আমাকে খবরটাই দিতে পারলে না।"

ইতিমধ্যে ডাক্তার অনেকটা পথ চলে গিয়েছিলেন। অগত্যা কর্ত্তা অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

(৭)

রাত্রি এগারটার সময় গৃহিনী ধম্‌কাইয়া উঠিলেন "তোর হয়েচে কি মনু? কেবল এপাশ আর ওপাশ—শীগ্‌গির ঘুমো বল্‌ছি।"

কর্ত্তা বলিলেন "কে কড়া নাড়চে নয়? এই জল ঝড়—ঐযে অজিতের গলা—চুপ্‌ কর—চুপ্‌।"

অনেক ডাকাডাকির পর "আ! কি জ্বালাতন" বলিয়া কর্ত্তা উঠিয়া দরজা খুলিলেন। "ওঃ—অজিত! এই বৃষ্টিতে ভিজ্‌ছ? তোমাদেরও একটা অসুখ—"

"অবস্থা খুব খারাপ। oxygen দরকার—আপনি একটা চিঠি লিখে দিন তাড়াতাড়ি—যাতে—"

"তাইত! ঘরের মধ্যেও জলের ঝাপ্‌টা আস্‌তে লাগ্‌লো যে! হ্যাঁ—কাগজ পেন্সিল—বুঝি ও ঘরটাতে রয়েছে—যে বৃষ্টি যাইই বা কি করে?"

"আমি এনে দিচ্ছি।"

"না, না, যেতে হবে না তোমায়—আমার নাম করে চাইলেই পাবে। হ্যাঁ তা হ'লে আর দেরী কর না—বুঝেচো ত—"বলিতে বলিতে দুয়ার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

গৃহিনী বলিলেন—"শুয়েও দেখ্‌চি সোয়াস্তি নেই।"

মনু পাশ ফিরিয়া বলিল "অসুখ বেড়েচে—?" নামটাও সে বলিতে পারিল না!

গৃহিনী তাড়া দিলেন "চুপ্‌—ঘুমো শীগ্‌গির!"

* * *

"মনু কোথায় গেল—ওগো কি হবে?" রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় গৃহিনীর আর্ত্ত-চীৎকারে কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি আবার হবে, কি করতে উঠেচে নিশ্চয়।"

আলো লইয়া দুইজনে সমস্ত ঘর টেবিলের তল—চেয়ারের উপর—যেখানে যেখানে লুকাইয়া থাকা সম্ভব তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন মনু কোথাও নাই। গৃহিনী ক্রন্দনস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি হবে তবে, ওগো কি হবে? ঐযে ঐ দোরটা খোলা রয়েচে যে—উঃ বাইরে কি বৃষ্টি!"

শশব্যস্তে দুইজনে দোর গোড়ায় যাইতেই মনু কোথা হইতে ভিজে গায়ে ভিজে মাথায় ছুটিয়া আসিয়া বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা! মতিদা কথা বলে না কেন?"

"হতভাগী—হতভাগী এই জলঝড়ে ভিজে সেই বাইরে গিয়েছিলি ?" বলিয়াই একটা 'ড্যানা' ধরিয়া গৃহিনী মনুকে তুলিয়া লইলেন এবং ঘরের মেঝেয় 'ডুম্' করিয়া বসাইয়া দিয়া গামছায় তার সমস্ত গা মাথা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

"তাড়াতাড়ি একটা জামা পরিয়ে শুইয়ে দাও" বলে কর্ত্তা বিছানায় উঠিলেন। এমন সময় দিগন্তপ্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল "বল হরি—হরিবোল।"

মনু চমকিয়া বলিল—"ওকি! মা ওকি!"

"ও কিছু নয়—শুবি চল" বলিয়া মনুর হাত ধরিয়া গৃহিনী বিছানায় উঠিলেন।

"ওঃ আমি বুঝি নে বুঝি—বলিয়াই মনু মায়ের হাত হইতে সহসা হাত ছিনাইয়া লইয়া "মতিদা—" বলিয়া একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ!"

কর্ত্তা গৃহিনী দুজনেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জলে ভিজিতে ভিজিতে ছুটিয়া গিয়া উঠানের মাঝখান হইতে মনুকে ধরিয়া লইয়া ঘরে আসিলেন।

মনু লুটোপুটী করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল "মতিদাকে দেখ্‌ব ওগো—একটীবার দেখে আসি।"

এমন সময় আবার ধ্বনি উঠিল "বল হরি—হরিবোল।"

শ্রীশ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিনে

নৃ-তত্ত্বের ব্যবহারিক উপযোগিতা—নৃ-তত্ত্ব বা Anthropology অল্প দিন হইল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইয়াছে। এই বিদ্যায় যাহা শিক্ষা হয়, তাহা মোটামুটি এইরূপ :—(১) জীবজন্তুদের কুলে মানুষের জন্মের ইতিহাস; (২) একই মানুষ পৃথিবীর নানা স্থানে গিয়া বিভিন্ন চেহারাবিশিষ্ট হইল কেন? (৩) কি রকমের স্বাভাবিক প্রয়োজনে সকল দেশের মানুষের মধ্যেই সমাজ বাঁধিয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্ম-বিশ্বাস জন্মিয়াছে ইত্যাদি; (৪) কি কি বিষয়ে সকল স্থানের সকল মানুষের মধ্যে মিল দেখা যায়, আর কি কি বিষয়ে বা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকমে মনের ভাব ও প্রথা-পদ্ধতি জন্মিয়াছে; (৫) বহুকালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল স্থানের মানুষ এখন একরকম হইয়া উঠিতে পারে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপর উপর দৃষ্টিতে লোকে ভাবিতে পারে যে, এ বিদ্যাটা খেয়ালি বিদ্যা, ইহা কোনও ব্যবহারের কাজে লাগে না। ইহাতে কাজের কাজ কতখানি হয়, সংক্ষেপে বলিতেছি।

আমরা বাগান করিয়া বনের গাছকে ভাল করিয়াছি, ও ভাল গাছে ভাল ফল পাই; ঘরে

পুষিয়া অনেক জন্তুকে মোটা তাজা করিয়াছি ও তাহারা নানা কাজে লাগে, এবং গরু প্রভৃতি অনেক পরিমাণে ভাল, সারবান দুধ দেয়। গাছপালা ও জীব-জন্তুদের বাড়িবার পক্ষে বিধাতার বাঁধা যে নিয়মগুলি আছে, সেগুলি যত্ন করিয়া যত শিখিয়াছি, ততই উহাদের উন্নতি করা গিয়াছে, এবং আরও যত শিখিব, ততই উন্নতি সাধন করিতে পারিব। মানুষের সমাজ বিধাতার যে নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি নৃ-তত্ত্বে ভাল করিয়া শিখিতে পারি, তবে মানুষের সু-সংস্কার ও কু-সংস্কারের জন্মের ইতিহাস হইতে খুব খাঁটি রকমে বুঝিতে পারা যাইবে, যে কি উপায়ে সহজে সমাজসংস্কার প্রভৃতি করিয়া মানুষকে বেশী ভাল করা যায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে এক সঙ্গে জোটাইয়া বড় রকমের ভাল সমাজ গড়িতে পারা যায়। এ সকল তত্ত্ব না বুঝিয়া শুঝিয়া অনেক সংস্কারকেরা নিজের ব্যগ্রতায় ও জিদে এবং অহঙ্কার বশে, আপনাদের আত্ম-শক্তির বলে, সমাজকে বদলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হইয়াছে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে ও সমাজে সমাজে বিরোধ বিবাদ ও ক্ষয়কারী বিপ্লব। বিধাতার বাঁধা নিয়ম ছাড়িলে, এইরূপ অনিষ্টই ঘটিবে। এখন চারিদিকে সমাজ সংস্কারের চীৎকার ও স্বরাজ সাধনার আন্দোলন; এই সময়ে যদি যুবকেরা অন্যান্য অনেক বিষয় ছাড়িয়া নৃ-তত্ত্ব পড়েন, তবে যে কত উপকার হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এমন বিদ্যাকে কেহ যেন খেয়ালি বিদ্যা না ভাবেন। কারণ সকল কাজের উপর যাহা বড় কাজ তাহা এই বিদ্যায় সাধিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য, যে আমরা এদেশের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিলিয়া নূতন রাষ্ট্র গড়িতে চাহিতেছি। জাতি-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্বের একটি শাখা; এই জাতি-তত্ত্বে এ দেশের সকল স্তরের সকল জাতির সামাজিক অবস্থা ও অন্য রকমের গতিরীতি বিশেষ করিয়া শিখিতে হয়। ইহাতে যে সকলের সঙ্গে পরিচয় বেশী ঘটে, পরস্পরের বিদ্বেষ দূরে যায়, এবং সকলের মিলনের পথ আবিষ্কৃত হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। নৃ-তত্ত্ব শিখিবার উপকারের কথা অতি অল্পই বলা হইল।

* * *

রাষ্ট্র-সংস্কারে মতবাদের অযথা লড়াই—নৈয়ায়িকের তৈলাধার পাত্রের কাণ্ড-জ্ঞান-হীন বিচারের মত অনেক তর্ক ও বিচার উঠিয়াছে; আগে সমাজ সংস্কার, না আগে স্বরাজ-সাধন, এই কথা লইয়া অনেক তর্ক চলিতেছে। যাঁহারা খাঁটি উন্নতির প্রত্যাশী, তাঁহারা যাহা কিছু উন্নতির পথে বাধা, তাহাই সরাইয়া দিয়া উন্নতি চাহেন; এটি আগে ও সেটি পরে, এরূপ অদ্ভুত বিচারে তাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন না। ক্ষণিকের জন্য শোর গোল তুলিয়া যাঁহারা কাজের কাজ করিতেছেন ভাবিয়া প্রতারিত হইতে চাহেন, তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া আগে সেইগুলিতেই হাত দিবেন, যেগুলিতে চট্ করিয়া কোলাহল জন্মে। স্থায়ী উন্নতি সাধনের কিন্তু ইহা পন্থা নয়। কর্ত্তব্যের যে ছোট বড় নাই, ছোট বাধাকে উপেক্ষা করিলে যে সেইটিই বড় হইয়া উঠিয়া সকল

বড় বড় উদ্যোগকে নষ্ট করিয়া দেয়, এ বুদ্ধি না থাকিলেই এরূপ গোল ঘটে। সুচিন্তিত লক্ষ্য না থাকিলেই যত বিভ্রাট ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র [illegible] এরূপ বুদ্ধি কেবল ভাবের উত্তেজনায়ই জন্মিতে পারে।

মনে হয় যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া একদল লোক এই বুলি তুলিয়াছেন, যে কি করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিলাইয়া একটা নূতন সভ্যতা গড়া যায়, তাহাই আমাদের মরণ বাঁচনের সমস্যা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে মিলাইবার ঘটকালী ছাড়িয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, এজাতির উন্নতির জন্য কি চাই। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য যাহা চাই,—যাহা না হইলে নয়, তাহাই অবলম্বন কবিতে হইবে; যাহা অবলম্বনীয়, তাহার গায়ে পূর্ব্বের দেশের কি পশ্চিম দেশের ছাপ আছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজনই নাই। যাহা জীবনের জন্য প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয়,—তাহা আমাব নিজের, আমার জীবন-প্রদ। ঘটকালী করিতে গেলে এটা পূর্ব্বের ও সেটা পশ্চিমের বলিয়া প্রথমে দাগিয়া লইয়া মিলনের জন্য যুক্তি-তর্ক ও বিবাদ বাড়াইতে হয়; ইহাতে দেশের মহিমা সত্যের উপরে আসন পায়। যাহা সত্য, যাহা জীবন-প্রদ, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে, এবং সে কাজে জাতি বা দেশ-ভেদ নাই,—ইহাই শিখাইতে হইবে; মিলন, সামঞ্জস্য, ও ঘটকালীর কথা ছাড়িতে হইবে। লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে প্রখর করিতে হইবে; কি না হইলে না চলে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে লোক বুঝিয়া লউক, তাহা হইলেই লোকে যেমন—জন্মস্থানের পরিচয় না লইয়া আপনাকে বাঁচাইবার জন্য দেশ বিদেশের ঔষধ খায়, তেমনই গ্রহণীয়কে গ্রহণ করিবে।

* * *

বঙ্গের শিল্পী-সমাজের ক্ষয়—মানুষ গন্তির বিবরণে পাই, বহুদিন ধরিয়া এদেশের শ্রম-শিল্পজীবিদের ক্ষয় হইতেছে। সহরে রাজ ও ছুতার মিস্ত্রী প্রভৃতির কাজে বাঙ্গালী বড় অল্প পাওয়া যায়; বিদেশীরাই ঐ কাজ বেশি করে। লোক সংখ্যা কমিয়া কমিয়া যাহাদের উচ্ছেদ হইতেছে, তাহাদের ধ্বংসের একটা বড় কারণ তাহাদের বিবাহ-রীতি। বঙ্গে যাঁহারা শিল্পজীবী, এবং যাহারা নবশাখ জাতীয়, তাহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে বিবাহে কন্যা কিনিবার প্রথা আছে। পূর্ব্বকালে কাছাকাছি জাতিতে আদান প্রদান চলিত, কিন্তু উচ্চ জাতীয়দের দৃষ্টান্তে অনেক দিন হইতে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে; মুসলমানদের আমলেও এ প্রথা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যাঁহারা পাড়াগাঁ চেনেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে উপযুক্ত টাকা দিয়া বিবাহের জন্য পাত্রী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে অনেকের বংশ লোপ হইয়াছে ও হইতেছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কষ্ট-শ্রোত্রিয়দের এই দশা ছিল; যাজক ব্রাহ্মণদের দলের অনেকে বিবাহের অভাবে নির্ব্বংশ হইয়াছে। কুলীনত্বের মর্য্যাদা কিছু কমিয়া "পাশ করা" ছেলের দর বাড়িবার পর, কষ্ট-শ্রোত্রিয়দের দুর্ভাগ্য ঘুচিয়াছে; পাত্রী কিনিয়া লওয়া দূরে থাকুক, তাহারা

অনেকে বিবাহ করিয়া টাকা পাইতেছে। নবশাখ প্রভৃতিতে তাহা ঘটে নাই। পাত্রীর বয়স যত বাড়ে ততই তাহার পণের টাকা বাড়ে; এইজন্য কিছু টাকা রোজগার করিয়া বেশ বয়স্ক হইবার পর, অনেককে নিতান্ত শিশু পাত্রী সংগ্রহ করিতে হয়; অনেক পাত্রীকে মাতৃত্ব লাভের বয়সে বিধবা হইতে হয়। সামাজিক প্রথার ফলে যে অনেক জাতির উচ্ছেদ ঘটিতেছে, তাহা বড় বড় সংস্কারকেরা একেবারেই জানেন না।

* * *

জর্ম্মানির দশা—পূর্ব্ববারে বেভেরিয়ার কথা বলিয়াছি; সে প্রদেশটীতে নূতন গবর্ণমেণ্ট বসিয়াছে, কাজেই জর্ম্মান সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি হইয়াছে। ফরাসীরা আবার যুদ্ধের খেসারতের টাকার জন্য জর্ম্মানিকে বেশী চাপিয়া ধরিয়াছে; অতি অল্পদিনের মধ্যে কয়েক কিস্তির টাকা না দিলে, ফরাসীরা জোর করিয়া রাইন্ নদীধৌতপ্রদেশের খণিগুলি দখল করিয়া লইবে, এবং অন্য রকমে জর্ম্মানির সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিবে; এইরূপভাবে সে দুস্থ জর্ম্মানিকে শাসাইয়াছে। মাতঙ্গ এখন পঙ্কে; তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইবে।

* * *

সিবিল সার্বিস—আগে ত সিবিল সার্বিসে দেশী লোক ক্বচিৎ দুয়েকজন দেখা যাইত, আর তাহারাও বড় বড় বিভাগের উচ্চতম পদগুলি পাইতেন না; এখন দেশী লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, আর দুয়েকজন কমিশনারের পদ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সিবিল সার্বিসের লোকেরাই দেশের সকল বিভাগে কর্ত্তাগিরি করিয়াছেন এবং সকল অবস্থাতেই রাজার মত পূজা পাইয়াছেন। নূতন শাসন সংস্কারে ইংরেজের শাসন কিছুমাত্র কমে নাই, কমিতে পারেও না; তবে ব্যবস্থাপক সভায় দুয়েকটি স্থলে দেশী লোককে কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই সিবিল সার্বিসের ইংরেজকর্ম্মচারীরা আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিতেছে। তাহাদের বেতন ভাতা, পেন্সন, কিছুই কমে নাই, তবুও সেইদিক্‌কার কথার ছল ধরিয়া, মনের জ্বালা জানাইয়া বলিতেছেন যে, ঐ চাক্‌রীতে আর সুখ নাই; কেহ কেহ পদত্যাগও করিতেছেন। ভারতীয়েরা ক্ষমতার একটু ছায়া পাইতেই এতটা ঘটিল। পার্লেমেণ্টে খুব সোরগোল পড়িয়াছে যে, কি করিয়া সিবিল সার্বিসের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করা যায়। বুদ্ধিমান্ ইংরেজেরা দেখিতেছেন যে, খাঁটী শাসনদণ্ডটি, তাহাদের মুঠা হইতে বিচলিত হইবার নয়, আর ব্যবসা বাণিজ্য বজায় থাকিলেই তাঁহাদের কাজের কাজ হাঁসিল হইয়া যায়; তাই চাকুরীতে ভারতীয়দের বাহুল্য হইলে তাঁহারা ক্ষতি বোধ করেন না। তবুও সিবিল সার্বিসের অপ্রতিহত প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজ-মন্ত্রী লয়েড জর্জ অনেক কথা বলিয়াছেন। রাজ-মন্ত্রীর প্রস্তাবই জয়যুক্ত হইতেছে, কাজেই ইংরেজেরা যাহাতে সিবিল সার্বিসে অধিকতর পদ-মর্য্যাদার কাজ করিতে পারেন, এবং এ দেশীয়দের কৃত্রিম ক্ষমতা উপেক্ষা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা হইবে।

* * *

বিচারপতি উড্‌রফ্‌—আমাদের হাইকোর্টের জজ উড্‌রফ্‌ সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাত গেলেন। বহুদিন বারিষ্টারী করিবার পর জজ হইয়াছিলেন; উভয়
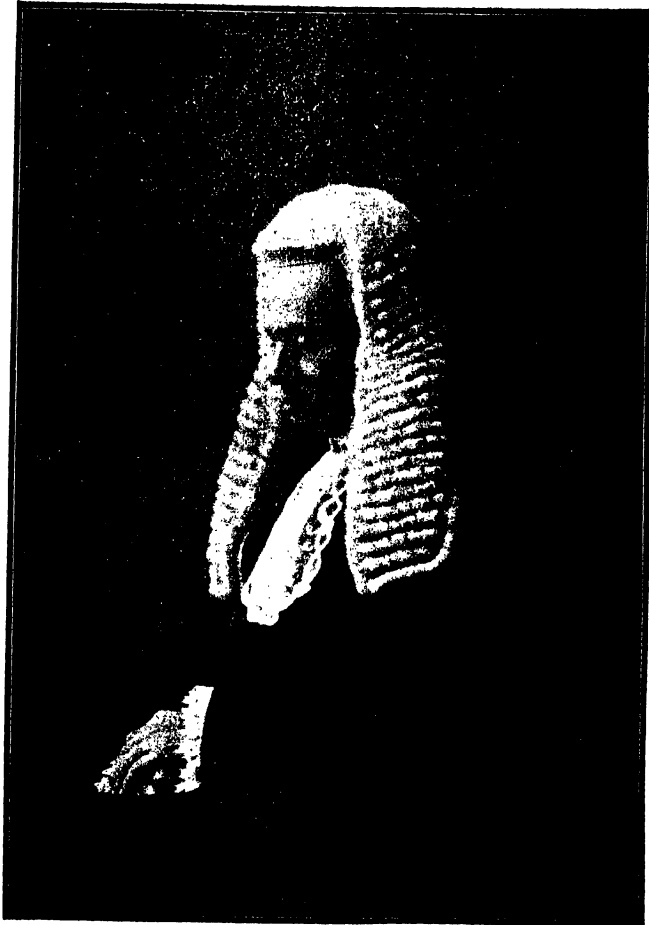
সার জন জর্জ উড্‌রফ্‌

কলিকাতা ল জার্ণাল পত্রের সৌজন্যে

কর্ম্মেই তাঁহার প্রভূত সুখ্যাতি ছিল। তিনি আইনের চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়াও সযত্নে সংস্কৃত শিখিয়া এদেশের তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর আলোচনা করিয়াছেন, এবং অনেকগুলি তন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার এই অধ্যয়নে ও গবেষণায় তাঁহার পত্নীকে সহচরী পাইয়াছিলেন। রাষ্ট্র-শাসনে ভারতীয়দের অধিকতর অধিকারের কথা উঠিতেই কয়েকজন নামজাদা বিলাতি পণ্ডিত প্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন যে, ভারতীয়েরা প্রাচীনতার অত জাঁক করিলেও তাহারা অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য; ইঁহাদের কথার উত্তরে উড্‌রফ্‌ মহোদয় যেভাবে ভারত-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে এ দেশের প্রতি তাঁহার গভীর ও অকপট সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি ও তাঁহার পত্নী যথার্থই ভারতের ধর্ম্মনীতি ও অধ্যাত্মবাদের ভক্ত।

কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি বিদায় অভিভাষণে বলিয়াছেন, "ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা স্বন্ধে আমি যে অনুকূল মত পোষণ করি তাহা ন্যায়ানুমোদিত। ভারতকে আমি ভালবাসি এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ঋণেই আমি ভারতের নিকট জড়িত। ভারতের ঋণ আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে অক্ষম।"

বিচারপতি উড্‌রফ্‌ শেষে বলিয়াছেন যে, এই-ই যেন তাঁহার শেষ বিদায় না হয়। অদূর ভবিষ্যতে তিনি আবার ভারতে ফিরিবার আশা করেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহাদের কল্যাণ কামনা করি।

* * *

ডাকমাশুলের হার—যুদ্ধের খরচ জোগাইবার জন্য ইংলণ্ডের আয়ের দিকও বাড়াইতে হইয়াছিল। ডাকমাশুলও অন্য সব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল—ফল উল্টা হইতেছে। সেই জন্য এই বৎসর হইতে ডাকমাশুল আবার কমান হইয়াছে—কিন্তু কমানসত্বেও চারি মাসেই ২৫ লক্ষের উপর বেশী আয় হইয়াছে। এদেশেও কর্ম্ম-কর্ত্তারা খরচ সংকুলানের অজুহাতে মাশুল বাড়াইয়া একরূপ দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে—তাহাতে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। একখানি পোষ্টকার্ড দু পয়সা ও খাম এক আনা করায় চিঠির সংখ্যা যে কমিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ইংলণ্ড হইতে এখানে চিঠি লিখিতে যাহা লাগে—এখান হইতে ইংলণ্ডে লিখিতে তদপেক্ষা বেশী লাগে—এ অসামঞ্জস্যই বা কিরূপ? এবারকার বজেটে এ বিষয়ে কোন প্রতিকার হইবে কি?

* * *

স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ

অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ—(জন্ম ১২ই কার্ত্তিক ১২৫৪)—গত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগার ঘটিকার সময় "অমৃতবাজার পত্রিকার" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা একনিষ্ঠ সংবাদপত্রসেবী মতিলাল ঘোষ মহাশয় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সত্যানুরাগী, স্বাধীনচিত্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, প্রকৃত স্বদেশবৎসল বাঙ্গালী আজকাল অতি বিরল। আপনাকে জাহির করিবার প্রচেষ্টা তাঁহার কোনকালেই ছিল না; দেশের জন্য, দশের জন্য, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই স্বার্থলেশশূন্য। মতিলালের নাম করিতে গেলে শিশির কুমারের নাম স্বতঃই মনে পড়ে। শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠ, মতিলাল কনিষ্ঠ; শিশিরকুমার গুরু, মতিলাল শিষ্য। এই শিশির-মতিলাল একই যোগে, পরম উৎসাহে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে অমৃতবাজার পত্রিকার সৃষ্টি এই দেশসেবাব্রতের ফল। আজকাল, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে স্বদেশসেবকের ছড়াছড়ি। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এই দুই মহাপুরুষের অঙ্গুলিহেলনে সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইত। সার্ব্বজনীন শিক্ষার যে আবহাওয়া এখন সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, এই শিশিরকুমার ও মতিলালই যে তাহার মূল, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিবে।

এই ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের "অমৃতবাজার পত্রিকা" দেশের যে উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। দেশের জাগরণের জন্য জনসাধারণ যেমন এই দুই ভ্রাতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, রেওয়া, ভূপাল প্রভৃতির দেশীয় রাজন্যবর্গও তাঁহাদের নানা আপদ বিপদে অমৃতবাজার পত্রিকার নিকট নানা উপকার ঋণে আবদ্ধ। এই সম্পর্কে অনেক সময় তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কখনই তাঁহাদের সততা বা একনিষ্ঠায় সন্দেহ করেন নাই। বরং লর্ড মিণ্টো, লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোণাল্ডসে প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃগণ দেশশাসন সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

৭৫ বৎসর বয়সে মতিলালের তিরোধান ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। দীর্ঘ পরমায়ু, যশঃ, সৌভাগ্য, আত্মীয়, পরিজন পশ্চাতে রাখিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি মতিলালের হরিদাস ঠাকুরের তিরোধান দিবসে বৈষ্ণবপ্রার্থিত মৃত্যু ঘটিয়াছে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। ভগবান, স্বদেশ ও অমৃতবাজারের কথা তাঁহার চিত্তে শেষ পর্য্যন্ত জাগরূক ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলেন, "আমি সকলকে individually বল্‌তে পারলুম না। কিন্তু সকলেরই স্থান আমার হৃদয়ে আছে। তোমরা সকলে সদ্ভাবে থাক্‌বে। 'পত্রিকা'কে বাঁচিয়ে রেখ। আমাকে বিদায় দাও—বিদায় দাও—বিদায় দাও।"

অভিনিবেশ

শিল্পী—শ্রীগিরীন্দ্র কৃষ্ণ বসু।

"আবার তোরা মানুষ হ"

প্রথম বর্ষ
১৩২৮-'২৯

কার্ত্তিক

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৩য় সংখ্যা

সৌন্দর্য্যের সন্ধান

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হ'ল মনে না ধরার ঝগড়া! ইমারতে ঘেরা বন্দিশালার মতো এই যে সহরের মধ্যে এখানে ওখানে একটুখানি বাগান অনেকখানিই যার মরা এবং শ্রীহীন, এদের পাখী প্রজাপতির মনে ধরেছে তবেই না এরা এইসব বাগানে বাসা বেঁধে এই ধূলোমাখা রোদে সকাল সন্ধ্যে ডানা মেলিয়ে সুরে ছন্দে ভরে তুলছে সহরের বুকের আবদ্ধ অফুলন্ত স্থানটুকু! আর এইসব বাগানের ধারেই রাস্তায় বসে খেলছে ছেলেরা—শিশুপ্রাণ তাদের মনে ধরেছে বাগানের ফুলকে ছেড়ে রাস্তার ধূলো মাটি তাই তো খেলছে ওরা ধূলোকে নিয়ে ধূলোখেলা! রথের দিনে রথোসামিগ্রী—সোলার ফুল পাতার বাঁশি তার সুর আর রং আর পরিমল ছড়িয়ে পড়েছে বাদলার দিনে—রথতলার আর খেলাঘরের ছেলে বুড়োর মেলায়, তাই না আজ দেখছি নিজেদের ঘর সাজাচ্ছে মানুষ সোলার ফুলে মাটির খেলনায়! তেমনি সে আমার নিজের কোণটি, দেওয়ালের ফাঁকে ভাঙ্গা কাচের মতো একখণ্ড আকাশ—ময়লা ঝাপ্‌সা, প্রাচীরে ঘেরা চারটিখানি ঘাস চোরকাঁটা আর দোপাটি ফুলের খেলাঘর সবই মনে ধরেছে আমার, তাই না কোণের দিকে মন থেকে থেকে দৌড় দিচ্ছে,

চোর কাঁটার বনে লুকোচুরি খেলছে, নয় তো দোপাটি ফুলের রংএর ছাপ নিয়ে লিখছে ছবি, স্বপন দেখছে রকম রকম, আর থেকে থেকে ঠিক নাকের সামনে মাড়োয়াড়িদের আকাশ বাতাস আড়াল করা চৌতলা পাঁচতলা বাড়ীগুলোর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বলে চলেছে বিশ্রী বিশ্রী বিশ্রী! মাড়োয়াড়ি গৃহস্থরা কিন্তু ওদের পায়রার খোপগুলোকে সুন্দর বাসা বলেই বোধ করছে এবং তার নাকের সামনে আমাদের সেকেলে বাড়ী আর ভাঙ্গাচোরা বাগানকে অসুন্দর বলছে! কাযেই বলতে হ'বে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি। কারু কাছ থেকে ধার করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখতে পাবো তার উপায় নেই। সুন্দরকে ধরবার জন্যে নানা মুনি নানা মতো আরসী আমাদের জন্যে সৃজন করে গেছেন সেগুলো দিয়ে সুন্দরকে দেখার যদি একটুও সুবিধে হতো তো মানুষ কোন্ কালে এই সব আয়নার কাচ গালিয়ে মস্ত একটা আতসী কাচের চশমা বানিয়ে চোখে পোরে বসে থাকতো, সুন্দরের খোঁজে কেউ চলতো না, কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতটি।

জীবের মনস্তত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাযকে দেখছে সুন্দর সে দিন রাত কাযের ধন্ধায় ছুটছে, কেউ দেখছে অকাযকে সুন্দর সে সেই দিকেই চলেছে, কিন্তু মনে রয়েছে দুজনেরই সুন্দর কায অথবা সুন্দর রকমে অকায! ধনী খুঁজে ফিরছে তার সর্ব্বস্ব আগ্‌লাবার সুন্দর চাবি কাটি বিশ্রী তালা চাবি কেউ খোঁজে না—আর দেখ চোর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্ধি কাটবার সুন্দর সিঁদ! ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে শাক্ত খুঁজেন শক্তিকে আর নর খোঁজে গাড়ী জুড়ি বি এ পাশের পরেই বিয়েতে সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরী এবং এমন সুন্দর একটি বাসাবাড়ী যেখানে সব জিনিষ সুন্দর করে উপভোগ করা যায়। হাহুতাস কচ্ছেন কবি কল্পনা-লক্ষ্মীর জন্যে এবং ছবিলিখিয়ের হাহুতাস হচ্ছে কলা লক্ষ্মীর জন্যে, ধরতে গেলে সব হাহুতাস যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই এই জন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়! সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে জনে মতভেদ কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে বিষয়ে দুই মত নেই।

যে ভাবেই হোক যা কিছু যার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক আছে—একটা মনে ধরার দিক যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর দিক, আর একটা মনে না ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক, আমাদের জনে জনে মনেরও ঐ দুরকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কু দৃষ্টি! কাযেই দেখি যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখছে তার মন—এই দুই মন ভিতরে ভিতরে মিল্লো তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেল, না হলেই গোল।

রাধিকা কৃষ্ণকে স্বরূপ শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন, তারপর অনঙ্গ ভীমদেব এবং তারপর থেকে আমাদের সবার কাছে রূপক সুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন, এই দুই মূর্ত্তিই আমাদের শিল্পে ধরা হয়েছে, এখন কোন্ সমালোচকের সৌন্দর্য্য সমালোচনার উপর নির্ভর করে এই দুই মূর্ত্তির বিচার করবো ? আ'কা'শ' এই তিনটে অক্ষরেতে আকাশ জ্ঞানটাই রূপকের দল বলবে ভাল, কিন্তু রূপের সেবক তারা বলবে নব নীরদ শ্যাম যা দেখে চোখ ভুল্লো মন ঝুরলো, যার মোহন ছায়া তমাল গাছে যমুনার জলে এসে পড়লো সেই সুন্দর! সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো আমাদের নিজের নিজের মন। পণ্ডিতের কাযই হচ্ছে বিচার করা এবং বিচার করে দেখতে হলেই বিষয়কে বিশ্লেষ করে দেখতে হয়, সুতরাং সুন্দরকেও নানা মুনি নানা ভাবে বিশ্লেষ করে দেখেছেন, তার ফলে তিল তিল সৌন্দর্য্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে তোলবার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রীসে হয়ে গেছে কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে সুন্দর বলে স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথায় গড়া মূর্ত্তিকেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোন আর্টিষ্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই ঐটেই সুন্দর! আমাদের দেশ যখন বল্লে সুন্দর গড় কিন্তু সুন্দর মানুষ গড়োনা, সুন্দর করে দেবমূর্ত্তি গড় সেই ভাল! ঠিক সেই সময় গ্রীস বল্লে—না মানুষকে করে তোলো সুন্দর দেবতার প্রায় কিম্বা দেবতাকে করে তোলো প্রায় মানুষ! আবার চীন বল্লে—খবরদার দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্য্যকে একটুও প্রশ্রয় দিওনা চিত্রে বা মূর্ত্তিতে, নিগ্রোদের আর্ট যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিষ্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য্য রং ও রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিষ্টের নিজের নিজের মনে ছাড়া বাইরেটায় নেই, কোন কালে ছিল না, কোন কালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হ'তো তবে এতদিনে সৌন্দর্য্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোন এক বেরসিক পরম সুন্দর করে সেটা প্রস্তুত করে যেতো তথাকথিত কলা রসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বল্লে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে জনে মনে মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেননি! তাঁর সৃষ্টি এটি সুন্দর অসুন্দর দুইই এবং সব দিক দিয়ে অপূর্ণ এ পরিপূর্ণ নয় এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে যে জানতে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে অশান্তিতে সুখে দুঃখে সুন্দরে অসুন্দরে মিলিয়ে হ'ল ছোট এই নীড় তারি মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশির বিন্দুর মতো নতুন নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে চল্লো। এই হ'ল প্রথম শিল্পীর মানস কল্পনা ও এই বিশ্বরচনার নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে কোন কিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষরূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিষ্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র হয়ে ফুটতে চাচ্ছে

সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইলো মিটলো না। যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যিই কোন দিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার নদীর ভরে ওঠার পাতার ঘন সবুজ হয়ে ওঠার আগুনের জ্বলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা মূর্ত্তি গড়া কবিতা লেখা গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। চাঁদ একটুখানি চাঁচ্নী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠবার দিকে গেলেও যেমন শেষে একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায় তেমনি মানুষের আর্টও কোথাও কখন পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রীস ভারত চীন ঈজিপ্ট সবাই দেখি পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে! আজ যেখানে মনে হ'ল আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হ'তে পারে তাই হ'ল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে হয়নি আরো এগোতে হবে কিম্বা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হ'বে,—পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টেরও গতি ঠিক এই ভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছচ্ছে আর্ট এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে—ঢেউ উঠলো ঠেলে মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে—চল আরো বাকি আছে, এইভাবে সামনে আশেপাশে নানা দিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে—বিছিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চিরযৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন !

মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে মনে ভাবে সুন্দর! ঠিক সেই সময় আর একটি সুন্দর মুখের ছায়া আয়নায় পড়ে যে ভাবছিলো সে অবাক হয়ে বলে—তুমি যে আমার চেয়ে সুন্দর, অমনি স্বপ্নের মতো সুন্দর ছায়া হেসে বলে—আমার চোখে তুমি সুন্দর! এই ভাবে এক আর্টে আর এক আর্টে, এক সুন্দরে আর এক সুন্দরে পরিচয়ের খেলা চলেছে, জগৎ জুড়ে সুন্দর মনের সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে খেলা! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন কালে শেষ হয়ে যেতো। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস্য অবতার উঠে আসতো তবে সে মানুষ কোন দিন আর মাছ ধরাধরি খেলা করতো না, সে তখনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কলম হাতে মাছ বিক্রির হিসেব পরীক্ষা করতে বসতো আর যদি তখনও খেলার আশা তার কিছু থাকতো তো এমন জায়গায় গিয়ে বসতো যেখানে ছিপে মাছ ধরাই দিতে আসে না, ধরি ধরি করতে করতে পালায়! পরম সুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল, আলোর মধ্যে দিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিৎ দিয়ে তিনি আর্টিষ্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিষ্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয় খেলা চলেও সেইজন্যে। এক একটা ছেলে আছে

খেলতে জানে না খেলার আরম্ভেই হঠাৎ কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে রস ভঙ্গ করে দেয় আর সব ছেলেগুলো তার সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে। তেমনি পরম সুন্দরও যদি আর্টিষ্টদের সামনে হঠাৎ বেরিয়ে এসে রস ভঙ্গ করতে বসেন তবে আর্টিষ্টরা তাঁকে নিয়ে বড় গোলে পড়ে যায় নিশ্চয়ই। আর্টিষ্টরা, ভক্তেরা, কবিরা—পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর খেলা খেলেন কিন্তু পণ্ডিতেরা পরম সুন্দরকে অনুবীক্ষণের উপরে চড়িয়ে তাঁর হাড় হদ্দের সঠিক হিসেব নিতে বসেন। কাযেই দেখি যারা খেলে আর যারা খেলে না সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এ দুয়ের ধারণা এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা লিখে ছাপিয়ে গেছেন, সেগুলো পড়ে নেওয়া সহজ কিন্তু পড়ে তার মধ্যে থেকে সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করাই শক্ত। আর্টিষ্ট তারা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে সুন্দরকে ধরে আনে চোখের সামনে মনের সামনে অথচ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় দেখতে পাই। 'সুন্দর কাকে বল' এই প্রশ্নের জবাবে আর্টিষ্ট ডুরার বল্লেন 'আমি ওসব জানিনে বাপু' অথচ তাঁর তুলির আগায় সুন্দর বাসা বেঁধেছিল! লিয়োনার্ডো ভিন্‌চি যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর্ট থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেছে তিনি বলেছেন—পরম সুন্দর ও চমৎকার অসুন্দর দুইই দুর্লভ, পাঁচ পাঁচিই জগতে প্রচুর!

এক সময়ে আর্টিষ্টদের মনে জায়গা জায়গা থেকে তিল তিল করে বস্তুর খণ্ড খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তির রচনা করার মতলব জেগেছিল। গ্রীসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচজন গ্রীক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে সমস্ত গ্রীসকে চমকে দিয়েছিল! কিছুদিন ধরে ঐ মূর্ত্তিরই জল্পনা চল্লো বটে কিন্তু চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এল যে ঐ ভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা একথাও আর্টিষ্টরা বলে বসলো! আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্রসম্মত মূর্ত্তিকেই রম্য বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করলেন! সে শাস্ত্র আর কিছু নয় কতকগুলো মাপ জোপ এবং পদ্ম আঁখি, খঞ্জন নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড, নিম্বপত্র এই সব মিলিয়ে সৌন্দর্য্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেন্ট খাদ্যসামগ্রী! মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না কাযেই আমাদের শাস্ত্রসম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্ম্ম প্রচারের কাযে লাগলেও সেখানেই আর্ট শেষ হলো একথা খাটলো না। একেষাং মতম্ বলে একটা জিনিষ সে বলে উঠলো 'তদ্ রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ' মনে যার যা ধরলো সেই হ'ল সুন্দর! এখন তর্ক ওঠে—মনে ধরা না ধরার উপরে সুন্দর অসুন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কিছু সুন্দর কিছুই অসুন্দর থাকে না সবই সুন্দর সবই অসুন্দর প্রতিপন্ন হয়ে যায়, কোন কিছুর একটা আদর্শ থাকেনা। ভক্ত বলেন ভক্তিরসই সুন্দর আর সব অসুন্দর যেমন শ্রীচৈতন্য বল্লেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকি ত্বয়ি ॥"

আর্টিষ্ট বল্লেন,—"কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে" ইত্যাদি! যার মন যেটাতে টানলো তার কাছে সেইটেই হল সুন্দর অন্য সবার চেয়ে! এখন সহজেই আমাদের মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয়—কোন দিকে যাই, ভক্তের ফুলের সাজিতে গিয়ে উঠি না আর্টিষ্টের বাঁশিতে গিয়ে বাজি? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায়—ঘোরতর বৈরাগী এবং ঘোরতর অনুরাগী দুইজনেই চাচ্চেন একই জিনিষ—ভক্ত ধন চাইছেন না, কিন্তু সব ধনের যা সার তাই চাইছেন, জন চাইছেন না কিন্তু সবার যে আপনজন তাকেই চাইছেন, সুন্দরী চান না কিন্তু চান ভক্তি, কবিতা নয় কিন্তু যিনি কবি, যিনি স্রষ্টা সুন্দরের যিনি সুন্দর তাঁর প্রতি অচলা যে সুন্দরী ভক্তি তার কামনা করেন। আর্টিষ্ট ও ভক্ত উভয়ে শেষে গিয়ে মিলেছেন যা চান সেটা সুন্দর করে পেতে চান এই কথাই বলে। মুখে সুন্দরী চাইনে বল্লে হবে কেন মন টান্‌ছে বৈরাগীর ও অনুরাগীর মতোই সমান তেজে যেটা সুন্দর সেটার দিকে। মানুষের অন্তর বাহির দুয়ের উপরেই সুন্দরের যে বিপুল আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই ধরা যাচ্ছে—শুন্‌তে চাই আমরা সুন্দর, বলতে চাই সুন্দর, উঠ্‌তে চাই, বস্‌তে চাই, চল্‌তে চাই সুন্দর, সুন্দরের কথা প্রত্যেক পদে পদে আমরা স্মরণ করে চলেছি। পাই না পাই, পারি না পারি সুন্দর বৌ ঘরে আনবার ইচ্ছা নেই এমন লোক কম আছে! যা কিছু ভাল তারি সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে দেখা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম, আমরা কথায় কথায় বলি—গাড়ীখানি সুন্দর চলেছে, বাড়ীখানি সুন্দর বানিয়েছে, ওষুধ সুন্দর কায করছে; এমন কি পরীক্ষার প্রশ্ন আর উত্তরগুলো সুন্দর হয়েছে একথাও বলি; এমনি সব ভালর সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে থাকতে যখন আমরা দেখছি তখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে সুন্দরের আকর্ষণ আমাদের মনকে ভালোরদিকেই নিয়ে চলে, আর যাকে বলি অসুন্দর তারও তো একটা আকর্ষণ আছে সেও তো যার মন টানে আমার কাছে অসুন্দর হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, তবে মনে ধরা এবং মন টানার দিক থেকে সুন্দরে অসুন্দরে ভেদ করি কেমন করে? কাযেই সুন্দর অসুন্দর দুই মিলে চুম্বুক পাথরের মত শক্তিমান একটি জিনিষ বলেই আমার কাছে ঠেকছে। সুন্দরের দিকটা হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক এবং অসুন্দরের দিকও হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক! এখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে চুম্বুক যেমন ঘড়ির কাঁটাকে দক্ষিণ থেকে পরে পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে যায় তেমনি সুন্দরের টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ঐহিক নৈতিক এমনি নানা সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে মহাসুন্দরের দিকেই নিয়ে চলে, আর অসুন্দরের প্রভাব সেও মানুষের মনকে আর এক ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চলে কদর্য্যতার দিকেই। কিন্তু 'সত্যিকার একটা কাঁটা আর চুম্বুক নিয়ে যদি এই সত্যটা পরীক্ষা করতে বসা যায় তবে দেখবো সুন্দরের একটা চিহ্ন দিয়ে তারি কাছে যদি চুম্বুকের

টানের মুখ রাখা যায় তবে কাঁটা সোজা সুন্দরে গিয়ে ঠেকবে নিজের ঘর থেকে, আবার ঐ চুম্বুকের মুখ যদি অসুন্দর চিহ্ন দিয়ে সেখানে রাখা যায় তবে ও কাঁটা উল্টো রাস্তা ধরেই ঠিক অসুন্দরে গিয়ে না ঠেকে পারে না ! কিন্তু এমনতো হয়, যে আমি যদি মনে করি তবে অসুন্দরের গ্রাস থেকেও কাঁটাকে আরো খানিক টেনে সুন্দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারি কিম্বা সুন্দরের দিক থেকে অসুন্দরে নেমে যেতে পারি ! সুতরাং সুন্দর অসুন্দরের মধ্যে কোনটাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সমুদয় গিয়ে দাঁড়াবে তার নির্দ্দেশকর্ত্তা হচ্ছে আমাদের মন ও মনের ইচ্ছা। মনে হোলতো সুন্দরে গিয়ে লাগলেম মনে হোলতো অসুন্দরে গিয়ে পড়লেম কিম্বা সুন্দর থেকে অসুন্দর অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড় দিলেম, মন ও মনের শক্তি হল এ বিষয়ে নিয়ন্তা। টানে ধরলে যে চুম্বুক ধরেছে তার মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রয়োজন না রেখেই কাঁটা আপনিই তার চরম গতি পায়, কিন্তু এই গতিকে সংযত করে অধোগতি থেকে উৰ্দ্ধ বা উৰ্দ্ধ থেকে অধোভাবের দিকে আনতে হলে আমাদের মনের একটা ইচ্ছাশক্তি একান্ত দরকার। বিল্বমঙ্গল বারবনিতার প্রেমোন্মাদ থেকে বিভুর প্রেমোন্মাদে গিয়ে যে ঠেকলেন সে শুধু তাঁর মনটি শক্তিমান ছিল বলেই। নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টে, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, যার মন অসুন্দর সেও এই ভাবে চলে ভাল থেকে মন্দে। আর্টিষ্ট কবি ভক্ত এঁদের মন এমনিই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্যে দিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ। ভক্ত কবি আর্টিষ্ট সবাই এক ধরণের মানুষ ; সবাই আর্টিষ্ট, আর্টিষ্টের কাছে ভেদ নেই পণ্ডিতের কাছে যেমন সেটা আছে। আর্টিষ্টের কাছে রসের ভেদ আছে, মনের ও অবস্থাভেদে সু হয় কু, কু হয় সু এও আছে, তাছাড়া রূপভেদও আছে ; কিন্তু সু কু যে নির্দ্দিষ্ট সীমা পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে অপণ্ডিত পর্য্যন্ত টেনে দিচ্ছে এরূপ সেরূপের মাঝে সেই পাকাপোক্ত পাঁচিল নেই, আর্টিষ্টের কাছে নীরসেরও স্বাদ পেয়ে আর্টিষ্টের মন রসায়িত হয় ! এইটুকুই তফাৎ আর্টিষ্টের আর সাধারণের মনে। তুমি আমি যখন খরার দিনে পাখা আর বরফ বলে হাঁক দিচ্ছি আর্টিষ্ট তখন সুন্দর করে খরার দিন মনে ধরে কবিতা লিখলে—"কাল বৈশাখী আগুণ ঝরে, কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে ! গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই !" রসের প্রেরণা সুন্দর অসুন্দরের ধারণাকে মুক্তি দিলে আর্টিষ্টের মধ্যে সুন্দর অসুন্দরে মিলিয়ে এক রসরূপ সে দেখে চল্লো ! আর্টিষ্ট রূপমাত্রকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করলে—কেন সুন্দর কেন অসুন্দর এ প্রশ্ন আর্টিষ্ট করলে না, শুধু রসরূপে যখন বস্তুটিকে দেখলে তখন সে সাধারণ মানুষের মত আহা ওহো বলে ক্ষান্ত থাকলো না, দেখার সঙ্গে আর্টিষ্টের মন আপনার সৌন্দর্য্যের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য সুন্দর উপায় নির্ব্বাচন করতে লাগলো সুন্দরং রং চং সুন্দর ছন্দোবন্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম নিয়ে আর্টিষ্টের সমস্ত মানসিক বৃত্তি ধাবিত হল সুন্দরের স্মৃতিটিকে একটা বাহ্যিক রূপ দিতে, কিম্বা সুন্দরের স্মৃতিটিকে নতুন নতুন কল্পনার মধ্যে মিশিয়ে নতুন রচনা প্রকাশ করতে। সুন্দর বা তথা কথিত অসুন্দর দুয়েরই যেমন মনকে

আকর্ষণ করবার তেমনি মনের মধ্যে গভীর ভাবে নিজের স্মৃতিটি মুদ্রিত করবারও শক্তি আছে—সুতরাং সুন্দরে অসুন্দরে এখানেও এক সুন্দরকেও যেমন ভোলবার জো নেই অসুন্দরকেও তেমনি টেনে ফেলবার উপায় নেই। দুই স্মৃতির মধ্যে শুধু তফাৎ এই, সুন্দরের স্মৃতিতে আনন্দ অসুন্দরের স্পর্শে মন ব্যথিত হয়, সুখও যেমন দুঃখও তেমনি মনের একস্থানে গিয়ে সঞ্চিত হয়, শুধু দুঃখকে মানুষ ভোলবারই চেষ্টা করে আর সুখের স্মৃতিকে লতার মত মানুষের মন জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতেই চায় দিন রাত। সাধারণ মানুষের মনেও যেমন, আর্টিষ্ট মানুষের মনেও তেমনি সহজ ভাবেই সুন্দর অসুন্দরের ক্রিয়া হয়, শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাৎ হচ্ছে মনের অনুভূতিকে প্রকাশের ক্ষমতা বা অক্ষমতা নিয়ে। দুঃখ পেলে সাধারণ মানুষ বেজায় রকম কান্নাকাটি সুরু করে, আর্টিষ্টও যে কাঁদে না তা নয় কিন্তু তার মনের কাঁদন আর্টের মধ্যে দিয়ে একটি অপরূপ সুন্দর ছন্দে বেরিয়ে আসে! অসুন্দরের মধ্যে অসুখের মধ্যে রস আসে আর্টিষ্টের কাছ থেকে বলেই আর্ট মাত্রকে সুন্দরের প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়, এবং সেই কারণে আর্টের চর্চ্চায় ক্রমে সুন্দরের অনুভূতি আমাদের যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক পড়ে কিম্বা শুনে হয় না। আসলে যা সুন্দর তা কখন বলে না আমি এই জন্যে সুন্দর, আমাদের মনেও ঠিক সেই জন্যে সুন্দরকে গ্রহণ করবার বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না যে কেন এ সুন্দর! আসলে যে সুন্দর নয় সেই কেবল আমাদের সামনে রং মেখে অলঙ্কার পরে হাব ভাব করে এসে বলে আমি এই কারণে সুন্দর, মনও আমাদের তখনি বিচার করে বুঝে নেয় এ রংএর দ্বারা অথবা অলঙ্কারে বা আর কিছুর দ্বারায় সুন্দর দেখাচ্ছে কি না! আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিষ্ট কিম্বা সাধারণ মানুষের মন বিচার করতে বসে না, সবাই বলে—সুন্দর ঠেকছে কেন তা জানি না, কিন্তু সুন্দরের সাজে যে অসুন্দর আসে তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আর্টিষ্টের মনে তর্কের উদয় হয়, কিন্তু পণ্ডিতের মন দার্শনিকের মনের ঠিক বিপরীত উপায়ে চলে। অসুন্দরের বিচার সেখানে নাই, সব বিচার বিতর্ক সুন্দরকে নিয়ে! যা সুন্দর আমরা দেখেছি তা নিজের সুন্দরতা প্রমাণের কোন দলিল নিয়ে এল না কিন্তু আমাদের মন সহজেই তাতে রত হল, কিন্তু পণ্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্ত হল—প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠলো সুন্দরকে নিয়ে—তুমি কেন সুন্দর কিসে সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি! সুন্দর সে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরলো বলেই সুন্দর এ সহজ কথা সেখানে খাটলো না। এমন পণ্ডিত নেই যে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছেন—কি নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য্য। সেই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিসেব করলে এই দাঁড়ায়—(১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর (২) কাযের বলেই সুন্দর (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর (৭) বিচিত্র অবিচিত্র সম বিষম দুই দিয়ে ইনি সুন্দর! এই সব প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামত নিয়ে সৌন্দর্য্যের সার ধরবার জন্যে সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে সুন্দরকে

ঠিক যে ধরা যায় তার আশা আমি দিতে সাহস করি না ; তবে আমি এইটুকু বলি—অন্যের কাছে সুন্দর কি বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করছে তা আমাদের দেখায় লাভ কি ? আমাদের নিজের নিজের কাছে সুন্দর কি বলে আসছে তাই আমি দেখবো। আমি জানি সুন্দর সব সময়ে সুখও দেয় না কাযও দেয় না—বিদ্যুৎ শিখার মত বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন বিদ্রুত বিসম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের। সুন্দর এই কথাইতো বলছে আমাদের—আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্দর ওজন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর। আর্টের মধ্যে রীতিনীতি চক্ষু জোড়ানো মন ওড়ানো, প্রাণভোলানো ও কাঁদানো গুণ, কিম্বা এর একটা যেমন আর্ট নয়, আর্ট সেই কারণেই যেমন সে আর্ট, সুন্দরও তেমনি সুন্দর বলেই সুন্দর। সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত্ত, নানা বস্তু নানা ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান ও আরোপ হলে তবে মনরসনা তার স্বাদ অনুভব করে—এমন সুন্দর, তেমন সুন্দর,—সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর ! আমাদের জিব যেমন চাখে মেঠাই সন্দেশ সরবৎ ইত্যাদি পৃথক পৃথক জিনিষের মধ্যে দিয়ে মিষ্টতাকে—ঠিক সেই ভাবেই জীব বা জীবাত্মা মন রসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকাণ্ড পিপাসা রয়েছে সেটা নানা বস্তু ধরে মেটাতে চলে। অতএব বলতে হয় মন যার যেমনটা চায় সেইভাবে সুন্দরকে পাওয়াই হল পাওয়া, আর কারু কথা মতো কিম্বা অন্য কারু মনের মতো সুন্দরকে পাওয়ার মানে না পাওয়াই। মা বাপের মনের মতো হলেই বৌ সুন্দর হল একথা যে ছেলের একটু মাত্র সৌন্দর্য্য জ্ঞান হয়েছে সে মনে করে না। বৌ কাযের, বৌ সাংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না, এবং হয়তো বা ডাক সাইটে সুন্দরীও হতে পারে অন্য সবার কাছে কিন্তু ছেলের নিজের মনের মধ্যে কায কর্ম্ম সংসার সুরূপ কুরূপ ইত্যাদির একটা যে ধারণা তার সঙ্গে অন্যের পছন্দ করা বৌ মিল্লোতো গোল নেই না হলেই মুস্কিল। হিন্দিতে প্রবাদ আছে 'আপ্ রুচী খানা—পর রুচী পহেরনা', খাবারের স্বাদ আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভাবে নিতে হয় সুতরাং সেখানে আমাদের স্বরাজ, কিন্তু পরণের বেলায় পরে যেটা দেখে সুন্দর বলে সেইটেই মেনে চলতে হয়, না হলে নিন্দে, সুতরাং সেখানে কেউ জোর কোরে বলতে পারে না এইটেই পরি পাঁচজনে যা বলে বলুক, আমরা নিজের বুদ্ধিকেও সেখানে প্রাধান্য দিতে পারিনে, দেশ কাল যে সুন্দর পরিচ্ছদের সম্মান করে তাকেই মেনে নিতে হয়। একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই সাজ গোজ পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর অসুন্দরের বোঝা পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে। যদি সত্যিই এই জগৎ অসুন্দরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিছক সুন্দর জিনিষ দিয়ে গড়া একটি পরিপূর্ণ সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্ব্বগুণান্বিত একটা কিছু হতো তবে এর মধ্যে এসে সুন্দর অসুন্দরে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হতো না। আমরা এই জগৎ সংসার চিরসুন্দরের প্রকাশ ইত্যাদি কথা মুখে বল্লেও চোখে তা দেখিনে অনেক সময় মনেও সেটা ধরতে পারিনে কাজেই অতৃপ্ত মন সুন্দরের বাসনায়

নানা দিকে ধাবিত হয় এবং সুন্দরের একটা সাক্ষাৎ আদর্শ খাড়া করে দেখার চেষ্টা করে এবং সুন্দরকে অসুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে আমাদের সৌন্দর্য্যজগৎ যে খণ্ড ও খর্ব্ব হয়ে পড়ে তা আর মনেই থাকে না। সুরূপ কুরূপ দুয়ে মিলে সুন্দরের অখণ্ড মূর্ত্তির ধারণা করা শক্ত কিন্তু একেবারে যে অসম্ভব মানুষের পক্ষে তা বলা যায় না। ভক্ত কবি এবং আর্টিষ্ট এদের কাছে সুন্দর অসুন্দর বলে দুটো জিনিষ নেই, সব জিনিষের ও ভাবের মধ্যে যে নিত্য বস্তুটি সেটিই সুন্দর বলে তাঁরা ধরেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যা কিছু তা অনিত্য, তার সুখ শৃঙ্খলা মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তার সঙ্গে মেলা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। আমাদের মনই কেবল গ্রহণ করতে পারে সুন্দরের আস্বাদ—সুতরাং মনরসনা রোগ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো ভীষণ বিপত্তি মানুষের হতে পারে না। আর্টের দিক দিয়ে যৌবনই সুন্দর, বার্দ্ধক্য সুন্দর নয়, আলোই সুন্দর, অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর দুঃখ নয়, পরিষ্কার দিন বাদলা নয়, বর্ষার নদী শরতের নয়, চন্দ্রকলা নয় পূর্ণচন্দ্রই কেউ একথা বলতে পারে না, সে একেবারেই আর্টিষ্ট নয় শুধু তারি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডভাবের একটা আদর্শ সৌন্দর্য্যকে কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব। কবীর ছিলেন আর্টিষ্ট তাই তিনি বলেছিলেন—"সবহি মুরত বীচ অমূরত, মুরতকী বলিহারী"। যে সেরা আর্টিষ্ট তারি গড়া যা কিছু তারি মধ্যে এইটে লক্ষ্য করছি—ভালমন্দ সব মূর্ত্তির মধ্যে অমূর্ত্ত বিরাজ করছেন! "ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো, মৈঁ কেহি বিধি কথৌঁ গম্ভীরা লো" সুন্দর যে অসুন্দরের মধ্যেও আছে এ গভীর কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত তাই কবীর এক কথায় সব তর্ক শেষ করিলেন "বিছুড় নহিঁ মিলিহো" বিচ্ছিন্নভাবে তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই যে সুন্দরের অখণ্ড ধারণা কবীর পেলেন তার মূলে কিভাবের সাধনা ছিল জানতে মন সহজেই উৎসুক হয়, এর উত্তর কবীর যা দিয়াছিলেন তার সঙ্গে সব আর্টিষ্টের এক ছাড়া দুই মত নেই দেখা যায়—"সংতো সহজ সমাধ ভলী, সাঁঈসে মিলন ভয়ো জা দিনতে সুরত ন অন্তি চলি॥ আঁখন মুদুঁ কান ন রূংধূ, কায়া কষ্ট ন ধারূঁ। খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ॥" সহজ সমাধিই ভাল হেসে চাও দেখবে সব সুন্দর যার মনে হাসি নেই তার চোখে সুন্দরও নেই! যার প্রাণে সুর আছে বিশ্বের সুর বেসুর বিবাদী সম্বাদি সবই সুন্দর গান হয়ে মেলে তারি মনে। আর যার কাছে শুধু পুঁথির সুর সপ্তক স্বরলিপি ও তাল বেতালের বোল মাত্রই আছে, তার বুকের কাছে বিশ্বের সুর এসে তুলোট কাগজের খড় মড়ে শব্দে হঠাৎ পরিণত হয়।

এখন মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর অসুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সুন্দর অসুন্দরের যাচাই করবার আদর্শ কোনখানে পাওয়া যাবে এই আশঙ্কা সবারই মনে উদয় হয়। সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে যাচাই করে নেবার জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাইনে। ধর সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইলো না, প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চল্লেম—

খুব আদিকালে মানুষ আর্টিষ্ট যেভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে মানুষের সৌন্দর্য্য উপভোগ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ধারা কি একদিনের জন্য বন্ধ হ'ল জগতে? বরং আর্টের ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোন জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে নিয়ে ধরে বসলো পুরুষ পরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাক্‌লো। আমাদের সঙ্গীতে সেই তানসেন ও আকব্বরি চাল, ছবিতে দিল্লীর চাল বা বিলাতী চাল সে কুকাণ্ড গীতকলায় ও চিত্রকলায় ঘটাতে পারে, এবং সেই আদর্শকে উল্টে ফেলে চল্লেও যা হতে পারে তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমস্ত আমাদের সাম্‌নেই ধরা রয়েছে সুতরাং আমার মনে হয় সুন্দরের একটা আদর্শের অভাব হলে তত ভাবনা নেই যত ভাবনা আদর্শ টা বড় হয়ে আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও অনুভব শক্তির বিলুপ্তি যদি ঘটায়। কালিদাসের আমলে 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' ছিল সুন্দরীর আদর্শ। অজন্তার এবং তার পূর্ব্বের যুগ থেকেও হয়তো এই আদর্শ ই চলে আসছিল, মোগলানী এসে এবং অবশেষে আরমাণি থেকে আরম্ভ করে ফিরিঙ্গিনী পর্য্যন্ত এসে সে আদর্শ উল্টে দিলে এবং হয়তো কোনদিন চীনই এসে সেটা আবার উল্টে দেয় তারও ঠিক নেই। আদর্শটা এমনিই অস্থায়ী জিনিষ যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুস্কিল! রুচি বদলায় আদর্শও বদলায় যেটা ছিল এককালে চাল সেটা হয় অন্যকালের বেচাল, ছিল টিকি এল টাই, ছিল খড়ম এল বুট এমনি কত কি! গাছগুলো অনেককাল ধরে এক অবস্থায় রয়েছে—সেই জন্যে এই গুলোকেই আদর্শ গাছ ইত্যাদি বলে আমাদের মনে হয় কিন্তু পৃথিবীর পুরাকালের গাছ, পাতা, ফল, ফুলের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—অথচ তারাওতো ছিল সুন্দর সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল বাইরেটার মধ্যে সুন্দর আদর্শভাবে থাকে না। শিশু গাছ, বড় গাছ এবং বুড়ো গাছ প্রত্যেকেরই মধ্যে যে সুন্দরের ধারা চলছে পরম সুন্দর হয়ে দেখা দেবার নিত্য চেষ্টা এবং বিচিত্র চেষ্টা সেই প্রাণের স্রোত নিয়ে হচ্ছে গাছ সুন্দর। এমনি আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে ধরতে পারি আর কিছুকে নয় এবং সেই আদর্শ ই সুন্দরকে যাচাই করার যে নিত্য আদর্শ নয় তা জোর করে কে বলতে পারে! সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্য্যের পরিমাপ হল তাদের মধ্যে নিত্য রস যা তা নিয়ে বাইরের রং রূপ বদলে চলে কিন্তু নিত্য যা তার অদল বদল নাই। সব শিল্পকে যাচাই করে নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের মনে নিত্য সুন্দরের যে একটি আদর্শ ধরা আছে—তার চেয়ে বড় আদর্শ কোথায় আর পাবো? যে ভাবেই হোক যে বস্তুই হোক যখন সে নিত্য তার আস্বাদ দিয়ে আমাদের মনে পরমসুন্দরের স্বল্পাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেল তখনি সে সুন্দর বলে আমাদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করলে! আমার কাছে কতকগুলো জিনিষ কতকগুলো ভাব সুন্দর ঠেকে কতক ঠেকে অসুন্দর এই ঠেকলো সুন্দর এই অসুন্দর, তোমার কাছেও তাই, আমার মনের সঙ্গে মেলেনা তোমারটি তোমার সঙ্গে মেলে না আমারটি। সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ

চলায়মান জীবনে কোথাও নেই, সুতরাং যেদিক দিয়েই চল সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে বিতর্ক মেটবার নয় কাযেই এই অতৃপ্তিকেই এই সুখ দুঃখে আলো আঁধারে সুন্দর অসুন্দরে মেলা খণ্ড বিখণ্ড সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে যে চলতে পারে সেই সুন্দরকে এক ও বিচিত্রভাবে অনুভব করবার সুবিধে পায়। জগৎ যার কাছে তার ছোট লোহার সিন্দুকটিতেই ধরা আর জগৎ যার কাছে লোহার সিন্দুকের বাইরেও অনেকখানি বিস্তৃত ধূলোর মধ্যে কাদার মধ্যে আকাশের মধ্যে বাতাসের মধ্যে তাদের দু'জনের কাছে সুন্দর ছোট বড় হয়ে দেখা যে দেয় তার সন্দেহ নেই! সিন্দুক খালি হ'লে যার সিন্দুক তার কাছে কিছুই আর সুন্দর ঠেকে না, কিন্তু যার মন সিন্দুকের বাইরের জগৎকে যথার্থভাবে বরণ করলে তার চোখে সুন্দরের দিকে চলবার অশেষ রাস্তা খুলে গেল, চলে গেল সে সোজা নির্ব্বিচারে নির্ভয়ে। যখন দেখি নৌকা চলেছে ভয়ে ভয়ে পদে পদে নোঙ্গর আর খোঁটার আদর্শে ঠেকতে ঠেকতে তখন বলি নৌকা সুন্দর চল্লো না, আর যখন দেখলেম নৌকা উল্টো স্রোতের বাধা উল্টো বাতাসের ঠেলাকে স্বীকার করেও গন্তব্য পথে সোজা বেরিয়ে গেল ঘাটের ধারের খোঁটা ছেড়ে নোঙ্গর তুলে নিয়ে তখন বলি সুন্দর চলে গেল!

সুন্দর অসুন্দর জীবন নদীর এই দুই টান একে মেনে নিয়ে যে চল্লো সেই সুন্দর চল্লো আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইলো যে কোনো একটা খোঁটায় বাঁধা। ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে চলে যায় নদীর স্রোত নানা ছন্দে এঁকে বেঁকে, আর্টের স্রোতও চলেছে চিরকাল ঠিক এই ভাবেই চিরসুন্দরের দিকে! সুন্দর করে বাঁধা, আদর্শের খোঁটাগুলো আর্টের ধাক্কায় এদিক ওদিক দোলে তারপর একদিন যখন বান ডাকে খোঁটা সেদিন নিজে এবং নিজের সঙ্গে বাঁধা নৌকাটাকেও নিয়ে ভেসে যায়। আর্ট এবং আর্টিষ্ট এদের মনের গতি এমনি করে পণ্ডিতদের বাঁধা এবং মূর্খদের আঁকড়ে ধরা তথাকথিত দাঁড়া খোঁটা অতিক্রম করে উপড়ে ফেলে চলে যায়। বড় আর্টিষ্টেরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করে তাকেই ভেঙ্গে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন সুন্দর অসুন্দরের মিলে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে! যে পারে সে ভেসে চলে মনোমত স্থানে মনতরী ভেড়াতে ভেড়াতে সুন্দর সূর্য্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে না সে পরের মনোমত সুন্দর করে বাঁধা বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোঁটায় মাথা ঠুকে ঠুকেই মরে, সুন্দর অসুন্দরের জোয়ার ভাটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে!

বাঁধা নৌকা সে এক ভাবে সুন্দর, ছাড়া নৌকা সে আর ভাবে সুন্দর, তেমনি কোন একটা কিছু সকরুণ সুন্দর কেউ নিষ্করুণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর আবার কেউ বা এত বড় সুন্দর কি এতটুকু সুন্দর আর্টিষ্টের চোখে এইভাবে বিশ্বজগৎ সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ বলেই ঠেকে, 'আর্টিষ্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিষটাই অসুন্দর কিন্তু তর্কের সভায়

যখন ঘাড় নড়ছে হাত নড়ছে ঝড় বইছে তার বীভৎস ছন্দটা সুন্দর, সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে কথায় দোলে সুরে দোলে ফুলে দোলে ফলে দোলে বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হোক তাজাই হোক সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে যদি মন দোলালো তো সুন্দর হ'ল এইটেই বোধ হয় চরম কথা সুন্দর অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিষ্ট বলতে পারে নিঃসঙ্কোচে। আদর্শকে ভাঙতে বড় বড় আর্টিষ্টরা যা আজ রচনা করে গেলেন আস্তে আস্তে মানুষ সেইগুলোকেই যে আদর্শ ঠাওরে নেয় তার কারণ আর কিছু নয় আমাদের সবার মন সত্যিই যে সুন্দর তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল থাকে—যে রচনার মধ্যে যে জীবনের মধ্যে তার আস্বাদ পায় তাকেই অন্য সবার চেয়ে বড় করে না বোধ করে সে থাকতে পারে না। এইভাবে একজন ক্রমে দশজন এবং এমনো হয় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত নেই অথচ চেষ্টা রয়েছে সুন্দরকে কাছাকাছি চারিদিকে পেতে সে অথবা সুন্দরের কোন ধারণা সম্ভব নয় শুধু সৌন্দর্য্য বোধের ভাণ করছে সেও আর্ট বিশেষকে আস্তে আস্তে আদর্শ হবার দিকে ঠেলে তুলে ধরে, ঠিক যে ভাবে বিশেষ বিশেষ জাতি আপনার আপনার একটা জাতীয় পতাকা ধরে তারি নীচে সমবেত হয়, সে পতাকা তখনকার মতো সুন্দর হলেও একদিন তার জায়গায় নতুন মানুষ ওঠায় নতুন সজ্জায় সাজানো নিজের Standard বা সৌন্দর্য্য বোধের চিহ্ন এইভাবে একের পর আর এসে নতুন নতুন ভাবে সুন্দরের আদর্শ ভাঙ্গা গড়া হ'তে হ'তে চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে কিন্তু পূর্ণ সুন্দর বলে নিজেকে বলাতে পারছে না কেউ। আর্টিষ্টের সৌন্দর্য্যের ধারণা পাকা ফলের পরিণতির রেখাটির মতো সুডৌল ও সুগোল কিন্তু জ্যামিতির গোলের মতো একেবারে নিশ্চল গোল নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু খুঁৎ আছে, পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, সেই কারণে অনেক সময় বড় আর্টিষ্টের রচনা সাধারণের কাছে ঠেকে যাচ্ছেতাই—কেন না সাধারণ মন জ্যামিতিক গোলের মতো আদর্শ একটা একটা ধরে থাকেই, কাযেই সে সত্যি কথাই বলে যখন বলে যাচ্ছে তাই, অর্থাৎ তার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না আর্টিষ্টের ইচ্ছে! কিন্তু যাচ্ছে তাই শব্দটি বড় চমৎকার, এটি বোঝায়—যা ইচ্ছে তাই, সাধুভাষায় বল্লে বলি যত্র লগ্নংহি যস্য হৃৎ বা যথাভিরুচি, এই যা ইচ্ছে তাই—যা মন চাচ্ছে তাই, সুতরাং রসিক ও আর্টিষ্ট এই শব্দটির যথার্থ অর্থ সুন্দর অর্থ ধরেই চিরকাল চলেছে। মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রজায় রেখে সুন্দরকে মনের টানের উপরে ছেড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে পণ্ডিতানাম্ মতম্-এর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। খোঁটা ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত প্রাণ! যাই দেখছি তারি সঙ্গে সত্যি গিয়ে লাগতে সুন্দর অসুন্দরের বাচ বিচার পরিত্যাগ করে এটার স্বাধীনতা আর্টিষ্টের মনকে বড় কম প্রসার দেয় না।

বড় মন বড় সুন্দরকে ধরতে চাইছে যখন বড় স্বাধীনতার মুক্তি তার একান্ত প্রয়োজন কিন্তু মন যেখানে ছোট সেখানে আর্টের দিক দিয়ে এই বড় স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ছেলের হাতে আগুনের মশালটা ধরে দেওয়া—সে লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেই নিজের সঙ্গে আর্টের মুখ পুড়িয়ে কিম্বা ভরা ডুবি

স্রোতের মাঝে! বড় মন সে জানে বড় সুন্দরকে পেতে হ'লে কতটা সংযম আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে দিয়ে নিজেকেও নিজের আর্টকে চালিয়ে নিতে হয়। ছোট সে তো বোঝে না যে পরের অনুসরণে সুন্দরের দিকে চলাতেও আলো থেকে আলোতেই গিয়ে পৌঁছয় মন, আর নিজের ইচ্ছামত চলতে চলতে ভুলে হঠাৎ সে অসুন্দরের নেশা ও টানে পড়ে যায়—তখন তার কোন কারিগরিই তাকে সুন্দরের বিষয়ে প্রকাণ্ড অন্ধতা এবং আর্ট বিষয়ে সংসার জোড়া সর্ব্বনাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পণ্ডিতরা আর কিছু না হোন পণ্ডিত তো বটে, সৌন্দর্য্যের এবং আর্টের লক্ষণ নিয়ম ইত্যাদি বেঁধে দিতে তাঁরা যে চেয়েছেন তা এই ছোট মনের উৎপাত থেকে আর্টকে এবং সেই সঙ্গে আর্টিষ্টকেও বাঁচাতে! যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ একথা যাঁরা শিল্প বিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা স্বীকার করে নিলেও এই যা-ইচ্ছে-তাই শিল্পের উপরে খুব জোর দিয়ে কিছু বল্লেন না। কেন না তাঁরা জানতেন হৃদয় সবার সমান নয় মহৎ নয় সুন্দর হৃদয়ে ধরে যা তারও ভেদাভেদ আছে, হৃদয় আমাদের অনেক জিনিষে গিয়ে লগ্ন হয় যা অসুন্দর এবং একবারেই আর্ট নয় এবং এও দেখা যায় পরম সুন্দর এবং অপূর্ব্ব আর্ট তাতেও গিয়ে হৃদয় লাগলো না—মধুকরের মতো উড়ে পড়লো না ফুলের দিকে, কাদা খোঁচার মতো নদীর ধারে ধারেই খোঁচা দিয়ে বেড়াতে লাগলো পাঁকে।

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় গিয়ে লগ্ন হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে অন্যে রাধে রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই; এইসব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না ফেলে সৌন্দর্য্য ও আর্টের ধারাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষ পরম্পরায় তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার সাহায্য না নিলে কেমন করে খণ্ড বিখণ্ড তা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে। আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না লাগল তা নিয়ে দু'চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হলে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় করে সবার করে দেবার উপায় নিছক নিজত্বটুকু নয় সেখানে individuality universality দিয়ে যদি না ভাঙ্‌তে পারা যায়, তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পূরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সঙ্গীতে যে কাণ্ড ঘটে, artএও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিষ্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে। ধারা ভেঙ্গে নদী যদি চলে শতমুখী ছোট ছোট তরঙ্গের লীলা খেলা শোভা সৌন্দর্য্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যে শিল্পে পূর্ব্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান্ সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে আর যে অশক্ত সে এই বাঁধাস্রোত বহে আস্তে আস্তে বড় শিল্প রচনার

ধারা ও স্বরে স্বর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে চলে। বাইরে রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে, ভিতরে ভাবে ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য্য বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে গান গেয়েছে নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পড়েছে কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে সে পারবে না। সৌন্দর্য্য লোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুল্লো তো বাইরের সৌন্দর্য্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চল্লো বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর অসুন্দকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অযাচিত

তোমার রূপের মাঝে খোঁজেনি তোমারে
কবির নয়ন কভু; একান্ত বিরলে
যে প্রেম ঘুমায়েছিল—বরি' নিলে তারে
নিরালা হৃদয়-কোণে সে এক বাদলে।

তুমিই বরিলে তারে;—রচি' দিলে তার
বাসর শয়ন সুপ্ত নয়নের পাতে;
সে তো চাহে নাই কিছু—ছিন্ন ফুলহার
সে কি কভু তুলি' লবে বিদায় প্রভাতে!

যে প্রেম জাগালে তার নাহি ছিল ভাষা,
অতৃপ্তিও নাহি ছিল স্বপনের মাঝে;
গোপন প্রাণের তারে এতটুকু আশা
ঝঙ্কারিয়া উঠে নাই জাগরণ-সাঁঝে।

ব্যর্থ সে মিলন সুর; মূচ্ছর্নাটি তার
বিশ্বে তবু জাগি' রবে বহি' স্মৃতিভার!

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

অজানিত

তুমি তো জান না কে যে গেয়েছিল গান,
হৃদয়-নিকুঞ্জে কার বেজেছিল বাঁশি,
বাহিরি আসিল চোখে—নিঙাড়ি পরাণ—
এক ফোঁটা অশ্রু সাথে কার সুখ হাসি!

তোমার শয়ন'পরে মালাগাছি তার
রেখেছিল না জানি সে কোন্ দুরাশায়;
কি ব্যথা লুকায়েছিল কোন্ স্মৃতিভার
তোমার শিথান পাশে অলকের ছায়!

তুমি তো ঘুমিয়েছিলে;—সারা সুপ্ত নিশি
তার সেই লাজ-স্পর্শ ব্যথিত বয়ান,
অকথিত বাণী তার অধরেতে মিশি
ছায় নাই স্বপনেতে ভরিয়া পরাণ?

যে কথা হয়নি বলা—সে কি কভু আর
জাগরণে ছুঁয়ে যাবে হৃদয়ের তার!

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী

সে দিন বোম্বায়ের একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিকে 'স্বরাজ' কথাটির ব্যাখ্যা দেখিতেছিলাম। লেখক প্রথমেই এই কথা বলিয়া মুখবন্ধ করিয়াছেন যে স্বরাজ জিনিসটী যে কি তাহা কথায় বুঝান যায় না। স্বরাজের এইরূপ বাক্যাতীত অবস্থার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তাই বাক্যাতীতকে কথার বাঁধনে লেখক কেমন করিয়া ধরিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য ভারী কৌতূহল হইল। প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখিলাম লেখক বলিতেছেন যে, অল্পকথায় স্বরাজের রূপবর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যদি খদ্দর পরিয়া অহিংসাব্রত গ্রহণ করে ও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যদি মৈত্রী স্থাপিত হয় তাহা হইলে দেশের যে অপূর্ব্ব অবস্থা হয় তাহারই নাম স্বরাজ।

মনের চোখে কল্পনার চশমা আঁটিয়া একবার সখ মিটাইয়া সে রূপ দেখিবার চেষ্টা করিলাম; শেষে হতাশ হইয়া স্থির করিলাম এ স্বরাজ শুধু বাক্যের অতীত নয়, মনেরও অতীত। এতদিন মনে মনে আমার বেশ একটু গর্ব্ব ছিল যে স্বরাজের এরূপ ব্যাখ্যা মানিয়া লইবার মত বুদ্ধি বাংলাদেশে জন্মায় না। কিন্তু কলিকাতা 'সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স' কমিটির নিকট কংগ্রেসের দুই একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে সে ভুলও ভাঙ্গিয়াছে!

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যখন স্বরাজলাভের কথা উঠিয়াছিল তখন মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"আজ যদি দেশের লোকের হাতে তরবারি থাকিত তাহা হইলে দেশের লোকে তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইত না।" আর তাহা নাই বলিয়াই দেশের নেতারা অন্য পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের আবিষ্কৃত পথ ধরিয়া আজ আমরা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

নেতারা তখন স্থির করিয়াছিলেন যে আমাদের বিদেশী কর্ত্তারা যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোদুর্গ দখল করিয়া বসিয়াছেন আগে সেই অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান-গুলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা দরকার। স্কুল, কলেজ, ব্যবস্থাপক সভা আর সরকারী উপাধিগুলা ছাড়িতে পারিলেই অনেকটা মানসিক স্বাধীনতা পাওয়া যায় এই সিদ্ধান্তেই তখন তাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন। মানসিক স্বাধীনতা পাইবার পর কেমন করিয়া তাহা ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহাও স্থির করা হইয়াছিল। প্রথমে বিদেশী ও দেশী কলের কাপড় ছাড়িয়া খদ্দর পরিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে সালিসী আদালত প্রতিষ্ঠা ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে; আর সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া স্বাবলম্বী হইবার

পর স্বরাজ্য ঘোষণা করিয়া দিয়া বিদেশী শাসন যন্ত্রকে সাহায্য করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। খাজনা ট্যাক্স না পাইলে ত আর রাজ্য চলে না; কাজে কাজেই আমরা খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিলেই আমাদের বিদেশী শাসনকর্ত্তারা বাধ্য হইয়া আমাদের স্বাধীনতা মানিয়া লইবেন।

হিসাবটা বেশ সোজা। নৈবেদ্যের চাউল সরাইয়া লইলেই যেমন মাথার মণ্ডা নীচে গড়াইয়া পড়ে এও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু মণ্ডার মত মোলায়েমভাবে নীচে গড়াইয়া পড়িতে ইংরেজ হয়ত সহজে রাজী হইবে না। লাঠি বা বন্দুকের ঠেকনা দিয়া নৈবেদ্যকে খাড়া করিয়া রাখিতে সে হয় ত কিছুমাত্র ইতস্ততঃ নাও করিতে পারে। সেইজন্য নেতারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে লাঠির ঘা বা সঙ্গীণের খোঁচা নির্ব্বিবাদে সহিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে সেরূপ প্রস্তুত হওয়ার নামই অহিংসাসাধন।

গত বৎসর ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে যখন স্বরাজের শুভাগমনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তখন কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ কারণ স্থির করিলেন যে মানসিক স্বাধীনতার যে যে লক্ষণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন সে গুলি আমাদের মধ্যে এখনও সম্যকরূপে প্রকাশ পায় নাই; আর এই স্বাধীনতার বহিরঙ্গসাধনেও আমরা যথেষ্টদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। তাড়াতাড়ি এই ত্রুটিগুলি সারিয়া লইয়া স্বরাজ্যঘোষণা ও খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। স্বয়ং মহাত্মাজী বারদোলি তালুকে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সারাদেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া দিন গণিতে লাগিল—এমন সময় চৌরিচৌরার লঙ্কাকাণ্ডে প্রমাণ হইয়া গেল যে এ দেশের লোকগুলা সাত শত বৎসরের শিক্ষানবিশী সত্ত্বেও অহিংসাসাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক ঘটি দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়িয়া সব মাটী করিয়া দিল।

খাজনা-ট্যাক্স বন্ধের আয়োজন স্থগিত হইয়া গেল। নেতারা নূতন ব্যবস্থা দিলেন যে স্বরাজের ইমারত গোড়া হইতে আবার পাকা করিয়া গাঁথিতে হইবে। তাহার সহিত একটুখানি হিংসার খাদ মিশিয়া গেলেই আবার সব শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে। তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে জাতীয় শিক্ষা, অনাচরণীয় জাতির সামাজিক উন্নতি, সালিসী আদালত, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন ও খদ্দর ব্যবহার—এই গুলিই হইল স্বরাজ গাঁথিবার পাকা মালমসলা।

এই সময় হইতেই অহিংসা কথাটার উপর খুব জোর দেওয়া আরম্ভ হইল। এমন কি কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিলেন যে অহিংসা প্রচার করিয়া জগতে একটা নূতন যুগ লইয়া আসাই এই অসহযোগ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য; ভারতবর্ষে স্বরাজস্থাপন গৌণ লক্ষ্য মাত্র। ক্রমে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিয়া বিদেশী শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিবার

কথাটা দূরে পিছাইয়া যাইতে লাগিল। খদ্দর আর স্বরাজ প্রায় একার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইল। অনেকে খদ্দর পরিয়া অন্তরের স্বরাজ লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলেন।

যাঁহারা অত সহজে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা নানারূপ কূট প্রশ্ন তুলিতে আরম্ভ করিলেন। "বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালীর সহিত অসহযোগের সম্বন্ধ কোথায়? এ ত শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা! ইহার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক কি? শাসনযন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগের নাম যদি অসহযোগ হয়, তাহা হইলে খদ্দর প্রচার, হিন্দুমুসলমান-প্রীতি, অপাংক্তেয় জাতির সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারকে অসহযোগ নাম দিবার ত কোন সার্থকতা নাই। এগুলি ত সমাজ-সেবার অঙ্গ বিশেষ; অর্থনীতির সহিত ইহার একটা সম্বন্ধ আছে; কিন্তু রাজনীতির সহিত সম্পর্ক যে একেবারে নাই বলিলেই চলে! দেশের অর্দ্ধেক লোক যদি খদ্দর পরে, তবেই তাহাদের খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার জন্মিবে। যদি দেশের লোক সে পরিমাণ খদ্দরের ব্যবস্থা না করিতে পারে, তাহা হইলে রাজনীতি চর্চ্চার ঐ খানেই শেষ। স্বরাজলাভ আর এ যাত্রায় হইল না!"

খদ্দরের যাঁহারা পৃষ্ঠপোষক তাঁহারা বলেন—"খদ্দর শুধু একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়। খদ্দর তৈয়ারি করিয়া পরিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তিতিক্ষা সাধনের প্রয়োজন; এবং এই তিতিক্ষা অহিংসালাভের প্রধান উপায়। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিলে যতটা কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত কি না তাহা খদ্দরের প্রচার দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে।"

এ সমস্ত যুক্তিতর্কের সারবত্তা বিচার করিয়া বিশেষ লাভ নাই; কেন না যাহাদের লইয়া দেশ, সেই সব সাধারণ লোক এই সব পণ্ডিতি যুক্তির বড় একটা ধার ধারে না। বারদোলির অনুশাসনের পর হইতেই তাহারা হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। যে স্বরাজলাভের আশায় তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দূরে সরিয়া যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা খদ্দরের ব্যবহারও কমাইয়া দিয়াছে। যাহারা দেশের কাজ করিবে বলিয়া স্কুল কলেজ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল তাহারা আবার আস্তে আস্তে স্কুল কলেজে ফিরিয়া যাইতেছে। উকিল ব্যারিষ্টারদের মধ্যে অনেকেই আবার আদালতে যোগ দিতেছেন। ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিবার প্রস্তাবও কোথাও কোথাও উঠিয়াছে। যে কারণেই হোক, এ পন্থার উপর আর লোকের ষোল আনা আস্থা নাই। জাতিগঠনের (Constructive Programme) যে পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সফলতালাভ করা দুই দশ বৎসরের কর্ম্ম নহে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ প্রীতিস্থাপন, পতিত জাতির উদ্ধার, অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে তাহার পর যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের চেষ্টা আরম্ভ করিতে হয় তাহাহইলে আর এ জন্মে স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা নাই।

মহারাষ্ট্র, বাংলা, মান্দ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশে এ পন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু একটা সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা কোথাও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অথচ দেশের লোকের সম্মুখে সেরূপ একটা না ধরিতে পারিলে আবার নূতন উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রথমে এই কথাই মনে হয় যে বিদেশী শাসনযন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লইলে একদিনেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, 'থিওরি' হিসাবে এ কথা যতই সত্য হোক, কার্য্যতঃ তাহা হইবার বড় একটা সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা উপজীবিকার জন্য এই শাসনযন্ত্রের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও সব সময় সে সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিবেন না। চাঁদার খাতা খুলিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপরও নয়, আর বোধ হয় সমীচীনও নয়। শাসনযন্ত্রের একান্ত আবশ্যক অংশগুলি চালাইবার জন্য যত লোকের দরকার, এ দেশের বিদেশী শাসনকর্ত্তারা যে তেত্রিশ কোটির মধ্যে ততগুলি পাইবেন না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং আদালত বা সরকারী চাকরী ছাড়াইয়া শাসনের কল অচল করিয়া দেওয়ার কল্পনা শুধু কল্পনামাত্র হইয়া থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজগুলি খালি করিয়া দিলে ছেলেদের যে একটা সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, বর্ত্তমান জাতীয় বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অবস্থার দিকে তাকাইলে সে কথাও মনে হয় না। আর রায় বাহাদুরের দল যদি নিরুপাধিক হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হয় ত প্রশস্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে শাসনযন্ত্র অচল হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। বাকি রহিল বিদেশী পণ্য বর্জ্জন। আমাদের স্বদেশী পণ্য রক্ষার জন্য যে বিদেশী বর্জ্জন আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু স্বাধীনতালাভের জন্য তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। যে রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে ইংরেজ এদেশে আপনার বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছে সে শক্তি যতদিন তাহার হস্তগত থাকিবে, ততদিন সর্ব্ববিধ উপায়ে সে আপনার বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিবে। ১৯০৫-৬ সালের বয়কট আন্দোলন যে কারণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল আজও সেই কারণ বর্ত্তমান; এবং যে উপায়ে সে আন্দোলন হীনপ্রভ করা হইয়াছিল সে উপায়ও আজ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। দেশের লোকে সমস্ত বাধা বিপদ তুচ্ছ করিয়া সমস্ত কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে বস্ত্রসমস্যার একটা মীমাংসা হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে স্বরাজ কি করিয়া আসিবে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করাই শাসনযন্ত্র অচল করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জমির উপর যে স্বত্ববোধ থাকিলে প্রজা জমির জন্য,

লড়িতে পারে তাহা জন্মাইবার বা পরিস্ফুট করিবার কোন চেষ্টাই কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আজকাল জন সাধারণের মধ্যে যে উৎসাহের অভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মনে হয় তাহারও কারণ সেইখানে। কৃষকদের মধ্যে যখন স্বরাজের কথা প্রচার করা হইয়াছিল তখন তাহারা ভাবিয়াছিল যে খাজনা ট্যাক্সের বোঝা তাহাদের হাল্কা হইয়া যাইবে, পুলিস বা জমিদারের উৎপীড়নের হাত হইতে তাহারা বাঁচিবে। কিন্তু নেতারা তাহাদিগকে খদ্দর পড়িয়া অহিংসা চর্চ্চার কথাই বলিলেন; তাহাদের অন্যান্য দুঃখ কষ্ট নিবারণের আর কোন ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করিলেন না। হিন্দুস্থান ও রাজপুতানার কৃষকদিগের মধ্যে খাজনা লইয়া অত বড় একটা আন্দোলন হইয়া গেল কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তালুকদারের পুলিসের সাহায্য লইয়া কিরূপে সে আন্দোলন ভাঙ্গিয়া দিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কৃষাণদিগের অভাব অভিযোগের প্রতীকারের জন্য কংগ্রেস যদি কৃষাণদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আর স্বরাজের কথা বুঝাইবার জন্য আজ এতটা বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু কংগ্রেসের ও সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া কৃষাণেরা ঠিক করিল যে তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার আর আমাদের স্বরাজ ঠিক এক জিনিষ নয়। তাই তাহারা দূরে সরিয়া পড়িল।

যাহারা শ্রমজীবী তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাও কংগ্রেস করে নাই। কৃষকেরা স্বহস্তে খদ্দর বুনিয়া পরিলে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে কিন্তু কলের কুলি মজুরদের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহারা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আবার যে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য চরকা কাটিতে বসিবে তাহা মনে করাই ভুল। সুতরাং খদ্দরের দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ খদ্দর পরিয়া তাহাদের আথিক লাভ কিছুই নাই। খদ্দর পরিয়া অহিংসা চর্চ্চা করা যদি স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় তাহা হইলে সে স্বরাজ লাভের জন্য কুলি মজুরেরা যে খুব বেশী আগ্রহ দেখাইবে তাহার সম্ভাবনা বড় অল্প। স্বরাজের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারা যে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইবে ইহা অসম্ভব কল্পনা। অথচ কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের সহানুভূতি না পাইলে শাসনযন্ত্র অচল করিবার কল্পনা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকিবে।

কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী এরূপভাবে যদি পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় যে কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের অভাব ও অভিযোগের প্রতীকার তাহার দ্বারা হইতে পারে তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যাখ্যান

কেন ডাক' হে করুণাময়ি !
আমি ত যাব না তব ঘরে—
আমি যে জগতে দীন, নির্ম্মম, কৃতঘ্ন, হীন
চুপে চুপে ডুবে যাব অনন্ত সাগরে।
শুন যদি কাহিনী আমার,
আর কভু ডাকিবে না কাছে,
শুনিলে সে ইতিহাস, ভাবিবে "কি সর্ব্বনাশ!
এ হেন পাষণ্ড, পশু, নরদেহে আছে!"

আমি ছিনু, অনাথ কাঙ্গাল,
কত দিন গেছে অনাহারে—
একা একা তরুতলে, ভাসিতাম আঁখিজলে,
আমারে "আমার" কেহ বলেনি সংসারে।
একদিন—নিশা-অবসানে
নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলাম চাহি—
করুণাদায়িনী বেশে, শিয়রে রয়েছে এসে,
স্বরগের দেবীরূপা—উপমা ত নাহি!

হায় মোর চিরশুষ্ক মুখ,
মুছাইয়া স্নেহের আঁচলে,
ধরিয়া দু'খানি করে, লইয়া চলিল ঘরে,
করুণা মমতা হেন দেখিনি ভূতলে!
সেই অযাচিত স্নেহ লভি
চমকিত পুলকিত প্রাণ—
জানেন অন্তরযামী, পথের ভিখারী আমি
কি পূজ্য ঐশ্বর্য্য রাশি পাইলাম দান!

দিনে দিনে সেই মাতৃস্নেহ
দিত দেবী যত মোরে ঢালি,
বুভুক্ষু রাক্ষস মত, আমি চাহিতাম তত,
বলিতাম—দাও দাও আরো দাও খালি।
মা আমার প্রসন্নবদনে
কত কি যে যোগাইত নিত্য,
চিনিনি, সে সব রত্ন, করি নাই যোগ্য যত্ন,
স্বার্থ, অহঙ্কারে শুধু ভরি গেল চিত্ত।

হায় আমি মোহমদে মাতি
এনেছি সে মাতৃ নেত্রে জল,
শ্রীমুখ উঠিত রাঙ্গি, হৃদয় পড়িত ভাঙ্গি,
দেখিয়া পাষাণ আমি আনন্দে বিভল!
অত সুখ—অত স্নেহরাশি
স'বে কেন এ পোড়া কপালে,
তাই শত অত্যাচারে, স্বার্থতৃপ্তি-অহঙ্কারে
ছাড়িয়া আসিনু মা'রে বৈশাখী বিকালে।

আগে কত লুকায়েছি বনে
খুঁজেছে মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
সে দিন এল না আর, ভাবিলাম কতবার,
অই বুঝি আসে আসে তেমনি সাধিয়া!
কই এল ?—এল না যে আর
ফিরিলাম সপ্তাহের পরে,
কই মা ত ঘরে নাই, খুঁজিলাম কত ঠাঁই
আর যে দিল না সাড়া সে স্নেহ আদরে!

তাই আমি পথের কাঙ্গাল,
তাই আমি ফিরি বনে বনে,
ফিরে দাও স্নেহময়ি! আমি ত মানব নই
পশুর অধম বলি
রেখ মোরে মনে।

শ্রীমানকুমারী বসু

হারানো খাতা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মনের আবেগে উড়িতে চায়, অক্ষম পাখা পড়িয়া যায়,
বেড়ে ওঠে শুধু হাহাকার।

—তীর্থরেণু

নরেশচন্দ্রকে বিমনা ও ব্যথিত করিতেছিল সুষমার এই চিঠিখানা।

প্রণাম শতকোটী নিবেদন :——

পূজ্যতমেষু! সেদিন ডাকাইয়া আনিয়া সবকথা আপনাকে আমার বলা ঘটে নাই এবং সাম্‌নে বলার ভরসা না রাখিয়াই তাই আজ পত্রে সে কথা জানাইতে বসিয়াছি। এই সাহস ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার জন্য শ্রীচরণে সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। শিশুপালের শত অপরাধের চেয়ে বেশী স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিতে পারেন নাই; আর আপনি তো আমার সহস্র অপরাধকেও সহ্য করিয়া লইয়াছেন, তাই ভরসা আরও না লইয়া থাকিতে পারিবেন না।.........

সেদিনও আপনাকে জানাইয়াছিলাম, আমার বর্ত্তমান জীবনযাত্রার পদ্ধতি আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতেছে। পাখীকে খাঁচায় পুরিয়া মানুষে তার স্বাধীন জীবনের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বিলাসে আদরে তাহাকে ভরাইয়া দিয়াও যেমন তার স্বাধীনতার স্মৃতিকে ভুলাইয়া দিতে পারে না, মানুষের মনকেও তেমনি তার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য শান্তির ও অজস্র সুখের নীড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও বুঝি তাহার উদ্দাম উন্মুক্ত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেও রোধ করিতে পারা দায় হয়। তার মন যখন কর্ম্মের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে; তখন বিশ্রাম শয্যা তার পক্ষে কণ্টকারণ্যের স্থানাধিকার করে। তার পরেও যদি জোর করিয়া তাহাকে সেখানে পড়িয়া থাকিতে হয়, তো সে কাঁটা শুধু তার শরীরকে নয়, তার মনকে শুদ্ধ তীক্ষ্ণ ধারে বিঁধিয়া বিঁধিয়া রুধিরাক্ত ও অসাড় করিয়া দেয় (তাই অধীন জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের দিনে দিনে দুর্ব্বলদেহ ও ক্ষীণ প্রাণ হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়া অনিবার্য্য)।—আমারও সেই অবস্থা। শুধু নিজেকে লইয়া দিন কাটা নয়, নিজের কাছে নিজের দাম এত কম হইয়া গিয়াছে যে কি বলিব,—এটা যদি আমার কোন তৈজস পত্রের সামিল হইত তো এটাকে জঞ্জালের সঙ্গে ঝাঁটাইয়া আমি কোন কালে আদি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিতাম।

আমায় কাজ দিন,—কোন—কোনও একটা কাজ দিন। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরী আমি পাই না কি? বেশী না জানি 'ক খ'ও তো ছোট মেয়েদের শিখাইতে পারিব। কোন ভদ্র পরিবারে গান শিখাইবার অধিকার কি আমার আছে? যেখানে আমি আদরের সহিত অভ্যর্থিতা হইব, সেই আমার স্বজাতি-বর্গের মধ্যে পা দিবার কথা ভাবিতে গেলেও আমার বুক কাঁপে। অথচ আমি জানি সেইখানেই আমার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র। যদি তাদের মধ্যের একটা জীবনও আমার দ্বারা রক্ষিত হয়! জানি আমার মত পুণ্য সঞ্চয়হীনার পক্ষে সে পুণ্যের প্রলোভন নেহাৎ সামান্য নয়। কিন্তু ভরসা হয় না। মনের মধ্যে আমার প্রৌঢ়ত্ব দেখা দিলেও বয়সে আমি আজ কুড়ির সীমা ছাড়াইতে পারি নাই। নিজের উপরে বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইলেও পরের উপর এখনও ভয় রাখিতে হয়। তদ্ভিন্ন যাহাদের আমি পাপ পথ হইতে ফিরাইয়া আনিব, তাদের আশ্রয় কোথায়? সেও যে একটা মস্ত বড় অভাব রহিয়াছে। সবার মনেই কিছু এত বড় বৈরাগ্য জাগিবে না যে, কাশীবাসিনী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া লইবে।

তা'হলে আমার পথ কি? আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি নিজেই একবার সে পথ খুঁজিয়া দেখি। প্রথমে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দেখি যদি ভদ্র পরিবারে কর্ম্ম পাই, অন্য চেষ্টা করিব না। আমার মত অপবিত্রার পক্ষে নিতান্ত স্পর্দ্ধা হইলেও চিরদিনই আমার বড় লোভ হয় যে উঁহাদের পবিত্র সঙ্গে নিজের এই শূন্য নিরালম্ব জীবনটাকে আমার একটুখানিও পবিত্র করিয়া লই। মিশনরী মেমরা ও তাদের আয়ারা যেটুকু পায়, জানি না সেটুকু পাওয়ার যোগ্যতা আমার মত হীনজনের আছে কি না!—কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? বলুন, অনুমতি দিন, আদেশ করুন,—ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি। শ্রীচরণে কোটিকোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণতি।

আপনার সেবিকাধমা

সুষমা

নরেশের মনের মধ্যে এই মিনতি ও বেদনাভরা আবেদন খানির প্রতি পংক্তিটী যেন বিছার কামড় মারিতেছিল। মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তার প্রতি একবার অভিমান হইল, অমন একটী জীবনকে কেন তিনি এমন ব্যর্থ করিবার জন্য অস্থানে পাঠাইলেন!—নিজের অক্ষমতার পরেও রাগ ধরিল; সে যদি উহার রক্ষাভারই গ্রহণ করিয়াছিল, তবে তাহার যশ অকলঙ্কিত রাখিতে পারিল না কেন? লোক চক্ষে তাহার মর্য্যাদাকে এমন নির্দ্দয়ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া তাহার একেবারেই উচিত হয় নাই এবং পরিশেষে সেই অসহায়া বালিকাকে তাহার বন্দীগৃহে একাকিনী দুর্ব্বহ জীবন বহনে বাধ্য করিয়া নিজে সে শত উদ্দীপনা ও আনন্দের জীবনে এই যে সরিয়া রহিল, এর মধ্যেও যে কত বড় কাপুরুষতা বিদ্যমান রহিয়াছে তা' ভাবিয়াও লজ্জায় মাথা তাহার হেঁট হইয়া আসিল।

আরব্ধ কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে যাহার সাধ্যে কুলাইবে না, সে তেমন কাজের ভার মাথা পাতিয়া লয় কেন ?

বিস্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কয়দিন পরে এই পত্র লিখিয়া দ্বারবানের হাতে পাঠাইয়া দিল।

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন :——

সুষমা ! তোমার পত্রে তোমার আগ্রহ ও উদ্যমের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে এ সম্বন্ধে তোমায় নিবৃত্ত করিতে পারি না। তুমি বুদ্ধিমতী ; নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে তোমার বিচার আমার চেয়ে তুমি নিজে ভালই করিতে পারিবে। তোমার অন্তরের পবিত্রতা এবং দৃঢ়তা আমার অবিদিত নয় ; তোমায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস করি। যাহা সঙ্গত এবং সম্ভব বোধ করিবে তাহাই করো। যখন যে সাহায্যের আবশ্যক, অকুণ্ঠিতচিত্তে জানাইতে দ্বিধা করিওনা। ঈশ্বর তোমায় কুশলে রাখুন এবং মঙ্গল করুন এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি।

তোমার চিরশুভার্থী

নরেশচন্দ্র।

সুষমা এই পত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে একবার এবং পরে আর একবার দেবনির্ম্মাল্যের ন্যায় সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় উহা নিজের মাথায় ঠেকাইল। পাঠশেষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া চুপি চুপি চিঠিখানি নিজের বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। তারপর গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া সে একেবারে তাহারই মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিল। যে অনুমতি পাইবার জন্য কয়দিন দিবারাত্রে সে বারিপ্রত্যাশী ঊর্দ্ধমুখী চাতকের ন্যায় আশা পথপানে চাহিয়াছিল, সে প্রত্যাশা তো পূর্ণ হইল। কিন্তু কল্পনা সুন্দর ও মধুর কল্পনা বাস্তবের বেশে যখন দেখা দিবে, তখন তার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য যদি ঠিক সেই মানসীরূপে দেখা না দেয়, যদি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দেখা দেয়, তবে সে যে সহিতে পারা দায় হইবে। তারপরে হঠাৎ সুষমার স্মরণ হইল যে, তার প্রাণে সবই সহিয়া যায়। তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া সে নরেশচন্দ্রের পত্রোত্তর প্রদান করিল।

প্রণাম শতকোটী নিবেদন :——

পূজ্যতমেষু ! আপনার কৃপাপত্র পাইয়া কৃত-কৃতার্থ হইলাম। এইবার চিরদিনের স্বপ্ন সফল করিতে সচেষ্ট হইব। কেমন করিয়া কাজ আরম্ভ করিব কিছুই জানি না। আপনার অবশ্য অনেক বড় ঘর জানা আছে কিন্তু সে সব জায়গায় হয়ত আমার প্রবেশ নিষেধ। কারণ পরিচয় পত্র তো দিবার কিছুই নাই এবং দিলেও সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলেরই আশঙ্কা অধিক। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিতে পারেন কি ? যদি সম্ভব ও সঙ্গত হয় করিবেন।

আপনার সেবিকাধমা

সুষমা।

এই পত্র পাইয়া নরেশচন্দ্র আরও একটু বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলেন এই প্রথম চেষ্টায় সুষমা অকৃতকার্য্য হইবে। তাহার হতাশাকাতর মর্ম্মব্যথা নিজের মনের মধ্যেও অনুভব করিয়া লইয়া তিনি তাহার জন্য অত্যন্ত উষ্ণ ও দীর্ঘ একটা নিশ্বাস মোচন করিলেন। তার সেই যে মুখ আধ অন্ধকারে অর্দ্ধাবরিত, মানসিক সংগ্রামে বিধ্বস্ত অথচ সুদৃঢ় চিত্ত বলে বলীয়ান সেই যে দুটী চোখের দৃষ্টি দীর্ঘ দীর্ঘ কালের লেখাকেও পরাভব করিয়া দিয়া তাঁহার মানসনেত্রে যখন তখন ফুটিয়া থাকে, তাঁহাকে জাগ্রতে বা নিদ্রিতে অনুসরণ করিয়া বেড়ায়, আর একবার তাহাদের মধ্যে তীব্র হতাশার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার শিখা তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। সেদিনের ত্যাগে আত্মপ্রসাদ সব কিছু ক্ষতিকেই জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এযে শুধুই আঘাত ও অপমান। অথচ জীবনের এই লক্ষ্য ধরিয়াই যে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। শুধু স্বেচ্ছায় নয়—ইহারই জন্য যাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে আর তাই করিতে গিয়াই যে আরও বিশেষ করিয়াই লোকলোচনের ও জন রসনার তীক্ষ্ণ ও নির্দ্দয় সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সে পথ হইতে অপরীক্ষিত ভাবেই বা তাহাকে ফিরিতে বলা যায় কেমন করিয়া! বিশেষ সকল দিকের পথই যাহার সঙ্কীর্ণ।—কিন্তু কেমন করিয়াই বা ইহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা যায়? যখন মুমূর্ষ সুগন্ধা নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার আশার কথা জানাইয়াছিল, ভবিষ্যতে সুষমা একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক গৃহস্থ কন্যাদের শিক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করে এই সাধ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিল, তখন সেটাকে নরেশচন্দ্রও খুবই সঙ্গত ও সহজ বলিয়াই বোধ করিয়াছিল, এবং সেই পথেই সে উহাকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছে। তখন ভুলিয়াও তাহার মনে এ সংশয় জাগ্রত হয় নাই যে, তাহার আশ্রয়ে থাকিলে নিষ্কলঙ্ক সুষমাকে জনসমাজে কলঙ্কিতা হইতে হইবে এবং তাহার পক্ষে তখন শিক্ষয়িত্রীর আসন পাওয়া অধিকতরই কঠিন হইয়া পড়াও সম্ভব। সে ভুল ভাঙ্গিল বহু বিলম্বিত হইয়া।—যাহোক্, এখনকার যেটুকু সদুপায় নরেশচন্দ্র তাহাতে আলস্য করিলেন না। সুষমার পত্রের উত্তর না দিয়া তিনি নিজেই প্রথমে এক 'বালিকা বিদ্যালয়ে'র উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন। মহিলা অধ্যক্ষ পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে নরেশের মন যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু দ্বিধার অবসর নাই। তিনি দু'একটা বাদ দিয়া প্রায় সব কথাই উঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। মহিলাটী বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত পূর্ব্বাপর শুনিয়া লইয়া গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, "মাপ করবেন মশাই! আমাদের স্কুলে বিশেষ ভদ্রসংসারের গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের ভিন্ন কাজ দেওয়া হয় না।"

নরেশ অন্তরে অন্তরে লজ্জানুভব করিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন, "যদি সেই মেয়েটী বিনা বেতনে এখানে দু'এক দিন মেয়েদের গান ও বাজনা শিখিয়ে যায়, তাতে আপনার আপত্তি আছে?"

প্রবীণা মহিলা অবিচলিতস্বরে জবাব দিলেন, "সে রকম আমাদের নিয়ম নয়। চরিত্র সম্বন্ধে উঁচু রকম সার্টিফিকেট অন্ততঃ দু'তিন জন বিজ্ঞ ও বিশেষরূপ সম্মানিত ব্যক্তির নিকট হইতে না আন্‌লে স্কুলের মেয়েদের মধ্যে কাকেও মিশ্‌তে দেবার নিয়ম নাই।"

সুষমার জীবন চরিতের সঙ্গে এই আপত্তিটার অকাট্য ও সুদৃঢ় সংযোগ দেখিয়া নরেশচন্দ্র সেখান হইতে নিরুত্তরে প্রস্থান করিলেন।

আরও দু'একস্থলে প্রায় একইরূপ উত্তর লইয়া তিনি ওদিকের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। ছোট খাট অর্দ্ধঅচল প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বিনা বেতনের সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে অবশ্য অতটা তাচ্ছিল্য ঘটা হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু বড়দের কাছে হতাশ হইয়া নরেশের আর ছোট দরবারে হাত পাতিতে প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষ তাঁহার মনে হইল, যদি উচিতের দিক ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বাধ্য করা বা লোভে ফেলা অনুচিতই হইবে। কারণ সুষমা জাতীয় জীবদের বিশ্বাস করিয়া কতকগুলি অপরিণতমতি বালিকার শিক্ষার ভার দেওয়া কতদূর সমীচীন তাহা ভগবানই জানেন। সুষমা যদি তাঁহার এনন পরিচিততমা না হইত, তবে নিজেই তো তিনি ইহার বিরোধী হইয়া উঠিতেন। বড় সমস্যার বিষয়!—এদের পথ দিতে হইবে, কিন্তু সে পথ আবার অন্যের পক্ষে এতটুকু না পিচ্ছিল হইয়া পড়ে, তার উপরও দৃঢ়বদ্ধ দৃষ্টি রাখার একান্তই আবশ্যক।

নরেশের এক উদার মতাবলম্বী বন্ধু ছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'বিশ্ব প্রেমিক' নাম দিয়াছিল; আসল নাম তাঁর, বিশ্বপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়। নরেশের মোটর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড় ফিরিতেছিল, বিশ্বপ্রিয় চীৎকার শব্দে ডাকিল, "রাজাবাহাদুর!"

নরেশ মনে মনে যেন ইহাকেই খুঁজিতেছিলেন, উল্লাসে ব্যগ্র হইয়া গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলে গাড়ীখানা যতটা অগ্রসর হইয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ততক্ষণে বিশ্বপ্রিয় নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চলেছেন?" নরেশ গাড়ীর দরজা নিজে খুলিয়া ধরিয়া উহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছেই। আসবেন একটু?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

না হয় দেবতা আমাতে নাই।—
মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা সাধকেরা পূজা করে ত তাই।
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে চিরদিন তার বিসর্জ্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে আর কি পূজিবে পৌরজন?

—কাহিনী

বিশ্বপ্রিয়কে নরেশ সুষমা সম্বন্ধীয় সমস্যার কথা জানাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। বিশ্বপ্রিয় সব কথাই নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিল কিন্তু সুষমার সঙ্গে নরেশের যে কখন কোন অসৎ সম্বন্ধ ছিল না, এই কথাটা সেও মনে মনে বিশ্বাস করিতে পারিল না। রাজা নরেশের যে প্রবল প্রতাপান্বিতা 'উপসর্গ'টীর জন্য তিনি কলিকাতা মহানগরীর অনেকখানি আত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্থাৎ যথার্থ বড়লোকের ছেলের দলে স্থান লাভ করিবার নেহাৎই অযোগ্য না হন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং অন্য সকলের মত বন্ধুসমাজে তাঁর 'নিজ জনের' পরিচয় করাইয়া দিতে উহাকে পাশে লইয়া কি বাঙ্গলা, কি ইংরাজী আর কি পার্শী থিয়েটারের রিজার্ভ বক্সে বসিয়া অভিনয় না দেখায়, বাগানের মজলিসে তাহার 'মুজুরা' না করানোয় ধনী মহলে যে নিন্দার সীমা ছিল না, এসব তো আর লুকানো কথা নয়। আজ হঠাৎ একেবারে জলজ্যান্ত সেই জীবটীকে বেমালুম উড়াইয়া দিতে চাহিলে সে উড়িবে কেন? বন্ধুদের মধ্যে নরেশের আড়ালে অনেকেই তাহার সম্বন্ধে—অবশ্য যাদের একটু কাব্য-রসোপভোগ সামর্থ্য ছিল—উল্লেখ করিতে হইলে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে 'বসন্ত সেনার চারু দত্ত' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বিশ্বপ্রিয় নিজেও কখন কখন যে না করিয়াছে তা নয়। অতএব সে স্থির করিল, বিবাহিত ও নূতনের আস্বাদপ্রাপ্ত নরেশ পুরাতন ও সুষমাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিতেই ইচ্ছুক হইয়াছেন। প্রবল অনুকম্পাপরবশ হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল "কিছু ভাবনা নেই, আমি তার জন্য ভাল দেখে কাজ ঠিক করে দেবো। গান শেখাবার কাজের আবার ভাবনা! লোকে একটা শেখাবার লোক পায় না।"

নরেশ বিশ্বপ্রিয়কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া চিনিত। সে নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী গেল এবং সুষমাকে লিখিল, স্কুলে সুবিধা নয়, তবে ভদ্র গৃহস্থ ঘরে কাজের জোগাড় শীঘ্র হইবারই সম্ভাবনা আছে। সংবাদ পাইলেই জানাইব।

শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া গেল এবং বিশেষভাবে অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে না পারিলেও অগত্যা এক রকমে মনস্তুষ্টি করিয়া লইয়া নরেশ সুষমাকেও সেই খবর তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন। সে চিঠি পাঠাইতে তাঁহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল।

কিন্তু সুষমার ইহাতে যেন আনন্দের আর অবধি রহিল না। কাঙ্গালে যেন কি নিধি কুড়াইয়া পাইয়াছে, এমন করিয়াই সে নেহাৎ সাত বছরের মেয়ের মতন আহ্লাদে প্রায় নাচিয়াই উঠিয়াছিল। এক বিলাতফেরৎ পরিবারে তাহাকে দু' তিন ঘণ্টার জন্য দু' এক রকম বাজনা শিক্ষা দিতে হইবে। বাড়ীতে কেবল স্বামী স্ত্রী। স্ত্রীটী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন ধনাঢ্য ও নব্য তন্ত্রের ছেত্রী কন্যা, স্বামীটী বাঙ্গালী।

সুষমা উঠি পড়ি করিয়া রান্না খাওয়া সারিল, বরাবর সে নিজেই রাঁধিয়া খায়। নরেশ প্রথমাবধি ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহাতে বিলাসিনীর গর্ভপ্রসূতা সুষমা বিলাস

সুখকে তুচ্ছ বোধ করিতে শেখে সেই শিক্ষাই তিনি তাহার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। সুষমারও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তিবোধ ছিল না।

আহার সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি সে বেশভূষা সমাধা করিয়া লইল। সুষমা বড় একটা লোকসমাজে বাহির হয় নাই। ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া জীবনের মধ্যে এই তার প্রথম। কাপড়ের ট্রাঙ্কটা খুলিয়া ফেলিয়া সর্ব্বপ্রথম তাহার ভাবনা হইল কি করিয়া সে আজ বাহির হইবে! যতদিন সুষমা ছোট ছিল চাঁদনির বাজারে কেনা ফরিদপুরী ছিটের ফ্রকই একমাত্র তাহার জন্য কিনিয়া দেওয়া হইত। বৎসরে একবার পূজার সময়ে একটা সিল্কের পোষাকের মুখ সে দেখিতে পাইয়াছে। তের বৎসর বয়স হইলে প্রথম সে সাড়ী পরার জন্য আবেদন জানায়, তারপর হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর সবচেয়ে মোটা যে কম দামী সাড়ী, টাটা মিলের মার্কিণের সেমিজের সঙ্গে সে আটপৌরে পরিবার জন্য পাইয়া আসিয়াছে। পূজায় একখানা ঢাকাই, শান্তিপুরে নেহাৎ অল্প দামের বাজে বেনারসী এই রকমই কিছু পাইত। সেখানি সে দু'এক দিন পরিয়া সযত্নে ভাঁজ করিয়া গুছাইয়া তাহাতে দু'একটী কর্পূরের চাক্তি আনাইয়া দিয়া রাখিয়াছিল। এই শেষ তিন বৎসর নরেশ তাহাকে পূজার কাপড় কিনিয়া দেন নাই, খরচের টাকা এই তিন বৎসর তার নামে মনিঅর্ডারে আসে। রাজবাড়ীর সরকার বা দরওয়ানেরা আর তাহার মাসকাবারী বাজার করিয়া দিয়া যায় না। কাপড় সে পূর্ব্বের মতই কেনে, পূজার সময় নিজের চাকরদের কাপড় কিনিয়া দেয়, নিজের জন্য কেনে না। মনে মনে এই কথা বলিয়া মন তাহার বিমুখ হইয়া থাকে যে, ওরা আমার চাকর তাই ওদের আমি দিচ্চি, আমি যাঁর দাসী তিনি যখন আমায় দিলেন না, তখন আমার কাজ কি?

তাই আজ বহুকাল পরে ধূলাপড়া ট্রাঙ্কের ডালা তুলিয়া সে চুপ করিয়া তার অনেক দিনের পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারটীর পানে অনেকক্ষণই চাহিয়া থাকিল। এক একটী সাড়ী জ্যাকেটের ভাঁজে ভাঁজে যেন তার এক একটি অতীত বৎসরের স্মৃতির স্তূপ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সে ঠেলিয়া উহাদের যেন নাড়া দিতেও তার বুকে বাজিতেছিল। তারপর অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া এক একটি করিয়া সে সেগুলিকে মাটিতে নামাইতে লাগিল। এই গোলাপী ডুরে সাড়ীখানি সর্ব্বের প্রথম বৎসর তিনি নিজে হাতে করিয়া দিয়াছিলেন! সুষমা কাঙ্গালের মতন সেখানিকে গায়ে বুকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বারম্বার উহাতে চুম্বন করিল। যেন ইহাতে আজও সেই দাতার হাতের সৌরভটুকু পর্য্যন্ত লাগিয়া আছে,—এমনি আগ্রহে উহার ঘ্রাণ লইল। সে কাপড় পরা চলিবেনা—উহা আবার সযত্নে সাবধানে যথাস্থানেই রক্ষিত হইল। আর একখানি সাড়ী তার সঙ্গের জ্যাকেটটীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুষমার বুকের রক্ত যেন হিম হইয়া আসিল। কালিঘাটের মহিলা সভার সেই জ্যাকেট সাড়ী! গভীর ঘৃণায় শুকারজনক জঘন্য বস্তুর ন্যায় সে তাল পাকাইয়া সে দুটাকে বাক্সের মধ্যে দু'আঙ্গুলে ধরিয়া ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। সে'দিনের দুষ্টা স্মৃতি তার দেহ যে

দিন ভস্মাবশেষ হইয়া যাইবে, সেই ছাইএর মধ্য হইতেও মিলাইবে না। নিজের জন্য যত না হোক, সে যে তার আশ্রয়দাতার কত বড় গ্লানির মূল, সে দিন বড় আঘাতেই সে পরিচয় যে সে পাইয়াছে। তার আগে, স্বপ্নেও যে তেমন সম্ভাবনা তার মনের কোণেও জাগে নাই! জাগিলে কি করিত? বলা যায় না!, তার দেবতার চিত্তে তার জন্য ব্যথা বোধ যে বিশেষভাবেই আছে, অন্ততঃ এটুকু জানিবার পূর্ব্বে এত বড় লজ্জাকর দুঃসংবাদটা তার কর্ণগোচর হইতে পারিলে নিঃসন্দেহ সে নিজেকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিত না। কিন্তু এখন! আত্মহত্যার অধোগতি তার এই অধোগতিতে প্রাপ্ত জীবনের শেষ সঞ্চয় করিয়া লইতে যত না মায়া হয়, তার চেয়ে বেশী মনে লাগে, তার শোচনীয় মৃত্যু নিশ্চয়ই নরেশকে বেদনা দিবে।

একখানি ভোমরাপেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী ও একটি সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরিয়া নিজের গলায় পরা একমাত্র সম্পত্তি এক নল সরু গোট হারটুকু জামার উপর তুলিয়া দিতে দিতে হঠাৎ কি মনে হইল। ছোট আরসিখানি পাড়িয়া সে নিজের মুখ দেখিল। তারপর আবার কি ভাবিয়া সেই জ্যাকেট সাড়ী ও হারটুকু খুলিয়া ফেলিয়া আটপৌরে মোটা সাড়ীর সঙ্গে একটী পাবনা ছিটের চেককাটা রংজলা হাতাবড় জ্যাকেট পরিয়া সাজসজ্জা সমাধা করিল। হাতে রহিল দুই গাছি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ও হাতের সঙ্গে আঁটিয়া বসা সোনার চুড়ি। এক সময় উহাদের বরফির মতন কাটুনি ছিল, কিন্তু এখন সে সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে ও দু'এক গাছার মুখ ছুটিয়া গিয়াছে।

নূতন ও সম্পূর্ণরূপে অনাস্বাদিত জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পাইয়া সুষমার আনন্দের আর অবধি রহিল না। এত দিনে যেন তার জন্ম সফল হইল বলিয়া তার মনে হইল। মায়ের শেষও প্রধান ইচ্ছা যে অংশতঃ পূর্ণ হইতে পারিয়াছে ইহা মনে করিয়াও তাহার মনে সুখ ধরিতেছিল না। মা যে নিজের পথ হইতে সযত্নে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তাহার আজিকার এই আনন্দময় জীবনের পথটুকু প্রস্তুত হইবার সুযোগ দান করিয়া গিয়াছেন এই মনে করিয়া সে তাহার উপর একটুখানি কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। নতুবা মায়ের উপরের অভিমান যে তাহার কত বড় তাহা সে নিজেও যেন পরিমাপ করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা নিজেদের পাপ দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধে অপর জীবনকে কলঙ্কের কালি মাখাইয়া পৃথিবীর নগ্নবক্ষে কঠিন বন্ধুর ধূলিশয্যায় শোয়াইয়া দেয় তাদের অপরাধের তুলনা আর কোনকিছুরই সঙ্গে হইতে পারে? মানুষ নিজেকে লইয়া তার যা খুসী করিতে হয় করুক; কিন্তু আর একটি জীবনকে সে নিজের পথে আনয়ন করিতে কোন মতেই অধিকার প্রাপ্ত নহে! সেই মার কাছেই বোধ করি জীবনে এই প্রথমবারই সে মাথা নোয়াইল এই বলিয়া যে, যতই হোক যখন এই জাতীয় নারীর গর্ভেই পূর্ব্বজন্মের মহাপাপে তাহারেও স্থান লইতে হইয়াছিল, তখন ভাগ্যে তার মায়ের মনে ওই ধর্ম্মজ্ঞানের বীজটুকু রোপণ করিয়া ভগবান তাহাকে তাহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন, নহিলে আজ তার কি গতি হইত?

চাকরীর প্রথম ধাক্কা খাইল সে চাকরী করিতে মুনিববাড়ী সর্ব্ব প্রথম পা দিয়া। কর্ত্রী

এবং ছাত্রী অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন " আমি মিসেস গুহ ; তা জানেন বোধ হয়। আপনাকে আমি মিস বা মিসেস কি বলবো অনুগ্রহ করে বলে দেবেন। বিশ্বপ্রিয় বাবু সে কথা ওঁনাকে কিছুই তো বলেন নি।"

সুষমার ললাটে বিচিন্তিত লজ্জার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সে নতমুখে উত্তর করিল, " আমার নাম সুষমা দাসী।"

"কিন্তু পদবীটা না জানলে আপনাকে আমি কি বলে উল্লেখ করবো তারই জন্য সেটা জানার—"

" না না, আমায় আপনি সুষমাই বলবেন, সেই আমার ভাল লাগবে।"

দ্বিতীয় দিন অমনি কাটিল, তৃতীয় দিবসে আর একটা সমস্যা দেখা দিল।

মিসেস গুহ মানুষটা বড়ই সাদাসিদে, ভাল মানুষ গোছের লোক। মনের মধ্যে তাঁর ছল চাতুরী বড় কম। সে দিন সে আন্তরিকতার সহিতই সুষমাকে জানাইল যে, তাহার গান বাজনা শুনিয়া তাহার স্বামী ও তাঁর একজন বড়লোক মক্কেল বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আগত সপ্তাহের প্রথমেই তাঁদের বাড়ীতে একটা বড় রকম 'পার্টি' হইবে তাঁদের বিশেষ ইচ্ছা সুষমা সেদিন নিমন্ত্রিত সভায় গান ও বাজনা শোনায়।

সুষমা শুনিয়া একটু পরে ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সবিনয়ে উত্তর করিল "আমায় মাপ করবেন, আমি সে পারবো না।"

মিসেস গুহ একটু ভুল করিয়া কহিলেন, " কেন পার্ব্বেন না ? আপনাকে তো তেমন 'নার্ভাস্' বলে বোধ হয় না !"

সুষমা মৃদু হাসিয়া কহিল "তা নয়, আমি অপরিচিত পুরুষদের সাম্‌নে গাইবো না তাই বলছি।"

মিসেস গুহ একটু জিদ করিয়া বলিলেন "তাতে দোষ কি ? গান গাওয়া কি কোন মন্দ কাজ ? ওঁনার ভারি সাধ হয়েছে যে অতিথিদের আপনার এই চমৎকার গান শোনান।"

সুষমাকে সম্মত করিতে পারা গেল না।

দিন কয়েক বেশ আনন্দেই কাটিল। সুষমা নিজের মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহার বয়স্কা ছাত্রীর শিক্ষাকার্য্য অতি সত্বরে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইটুকু করিতে যে সুখ যে আত্মপ্রসাদ সে নিজের মধ্যে উপভোগ করিতেছিল, বঙ্গ বিহারের শাসনভার হাতে পাইয়াও তাহা লাট সাহেবেরা পাইয়া থাকেন কিনা সন্দেহ। মাস কাবারে যখন চল্লিশ টাকার হিসাবে দশ দিনের মাহিনায় সে ১৩√৫ হাতে পাইল, বুক যেন গৌরবে তাহার ফুলিয়া উঠিল। নিজের স্বাধীন এবং সৎপথের উপার্জ্জনে সে এখন হইতে নিজেকে পোষণ করিতে পারিবে। প্রথম মাসের টাকায় মা কালীর কিছু পূজা পাঠাইয়া দিল এবং ভিখারীর জন্য কিছু রাখিল।

হাইকোর্ট বন্ধ ছিল ; বাহিরের ঘরে দুই বন্ধুতে বসিয়া বসিয়া চাখিয়া চাখিয়া কোন সুপেয়

পদার্থ পান করিতে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ বাজনার শব্দ ভেদ করিয়া সুস্বর সঙ্গীত লহরী কানের তারে ঝঙ্কার দিল। উৎকর্ণ হইয়াছিলেন দুজনেই, কিন্তু অল্প পরে সুরেশ্বর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "একি! কে গাইচে বলতো? আশ্চর্য্য যে!"

মিঃ গুহ বলিলেন "গাইচে আমার স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রী সুষমা দাসী। আশ্চর্য্য বল্‌চো কেন? হোয়াট অ্যান এক্সকুইজিট রীচ ভয়েস! কিন্তু——"

বন্ধু এসব কথাগুলা কানে না তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ এম্‌নিসুরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন যে মিঃ গুহর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

"কি হয়েছে? গলা ওর খুব ভাল নয়?"

বন্ধু সহাস্যে উত্তর দিলেন "কে বল্‌চে ভাল নয়! তা নয় মাই ফ্রেণ্ড! আমি তোমার জোর কপালের জন্য তোমায় কনগ্রাচুলেট করচি। 'রথ দেখা এবং কলা বেচা' একসঙ্গে তাহলে দুইই বেশ চালাচ্চো? আছ মন্দ নয়।"

"রেখে দে তোর হেঁয়ালি! তুই কি চিনিস ওকে?"

সুরেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "তা আর চিনিনে, সুষমা দাসী যে আমার 'নেক্সডোর নেবার'। ও গলা শুনেই যে তাই ধরে ফেলেছি। কি করে বাগালে ভাই?"

"আপনিই এসেছে। আচ্ছা ওর ব্যাপারখানা কি বলতো?"

"বল্‌চি! রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুরের নাম শুনেছ?"

"উঁ হুঁ, কই মনে পড়ে না। তার?"

"হুঁ"

"তা'পরে?"

"চিরন্তনী। খুব ধুমধাম, বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাওনা বাজনা, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মোটর দাঁড় করিয়ে রাখা। তারপর আর কি, 'প্রস্থানং কুরু কেশব।' কিছুদিন একলা একলা স্বর সাধনা করে করে ইদানীং বোধহয় পেটের নাড়ীতেও কিছু টান ধরে থাক্‌বে তাই শ্রীবৃন্দাবনের পরিবর্ত্তে এই···ষ্ট্রীটে এসে পৌঁছেছেন। তোমায় কিন্তু আমার ভারী হিংসে হচ্চে।"

মিঃ গুহ বিস্ময়সহকারে মন্তব্য করিলেন, "কিন্তু ধরণ ধারণতো সে রকম মনে হয় না। আমার সাম্‌নেই বার হতে চায় না।" বলিয়া গান শুনাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া সুরেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে রেখে দে ভাই ঢের দেখেছি। ওসব চাল। ওঁরাই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বার হন। খুব দাঁও লেগেছেরে ভাই; খুব দাঁও। আমি তো এ পর্য্যন্ত কখন তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি। কিন্তু সেই সঙ্গেই 'মন প্রাণ যা'ছিল তা দিয়ে ফেলেছি।"

কয়েকদিন পরে সুষমা গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ী ও তার বিশ্বাসী দরওয়ানকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ড্রইং রুমে ঢুকিয়া দেখিল ঘর খালি মিসেস গুহ সেখানে নাই। অন্যত্র ব্যাপৃত আছেন মনে করিয়া নিজের আসনের কাছে আসিয়া সে তাঁহাকে জানান দেওয়ার ইচ্ছায় যেমন এসরাজ তুলিয়া লইয়াছে, অমনি পাশের ঘরের পর্দ্দা নড়াইয়া মিসেস গুহর পরিবর্ত্তে বাহির হইয়া আসিলেন মিঃ গুহ।

সুষমা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল তাহার এ ঘরে অবস্থান না জানিয়াই গৃহস্বামী অকস্মাৎ এই ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে দেখিতে পাইয়া এখনি প্রস্থান করিবেন। কিন্তু নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহাকে দেখিতে পাইয়া গৃহত্যাগ করার পরিবর্ত্তে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকিয়া তিনি তাহাকেই উদ্দেশ করিরা সম্বোধন করিতেছেন।

"গুডমর্ণিং ম্যাডাম! আমার গাফিলিতে আপনাকে অনর্থক কষ্ট পেতে হলো। মিসেস গুহ আজ বোনের বাড়ী গেছেন, ফিরতে রাত হবে, তিনি বলেছিলেন আর্দ্দালিটিকে বলে রাখতে যে আপনি আসা মাত্রে খবর জানায়, আমার সেটা মনে ছিল না, মাপ কর্ব্বেন।" মিঃ গুহ ক্ষমা প্রার্থনা শেষ করিয়া অঙ্গুলি-ধরা চুরোট ঠোঁটে চাপিয়া সেকহ্যাণ্ডের জন্য নিজের হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সুষমা রাগে গুম্ হইয়া গিয়া কঠিন হইয়া রহিল, তারপর অন্যদিকে মুখ ও চোখ রাখিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে এই কথা শুধু বলিল, "চাকরদের একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বল্বেন।"

মিঃ গুহ বড়ই বিপন্নভাবে জবাব দিলেন, "বেয়ারাটা আজ ছুটী নিয়ে গেছে, আর্দ্দালীটা এই মাত্র খেতে গেল, মালীটাও বাড়ী নেই, আপনি বসুন না, এক্ষুনি ওরা খেয়ে নিয়ে আসবে, গাড়ী আপনাকে আনিয়ে দেবে।"

অগত্যাই ভয়বিপন্না সুষমা স্পন্দিতবক্ষে ও শঙ্কিতমুখে দূরের একটা আসনে আলগোছ ভাবে বসিয়া পড়িল। স্পষ্ট করিয়া ইঁহার অবাধ্যতা করিতেও তাহার ভরসায় কুলাইল না।

মিঃ গুহ চুরোট টানিতে টানিতে সুষমার আপাদ মস্তক খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। মনে কিছু বিস্ময় ও দ্বিধা জাগিতেছিল। রাজরাজড়ার অনুগৃহীতার মত রূপ তাহার শরীরে থাকিলেও বেশভূষায় সম্পুর্ণ বিপরীতই প্রমাণ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা ও অ-সুখস্পর্শ পোষাকে তাহার সুডোল গঠনের সবটুকুই যেন চেষ্টা করিয়া ঢাকা। তাহার হঠাৎ মনে হইল বাকলবসনে শকুন্তলা যেন তাহারই সম্মুখে! মুগ্ধমন সুরেশ্বরের ব্যঙ্গোক্তি স্মরণ করিল—'ওসব ওদের লীলা কলা, ঠাট ঠমক, বুঝতে পারবেনা।' মিঃ গুহ তখন দ্বিধাশূন্যভাবে উহার সহিত আলাপ সুরু করিয়া দিলেন——

"একটা গান্ না, চমৎকার গলা আর হাত আপনার।" এই বলিয়া সে মুগ্ধচোখে তাহার সত্যসত্যই সুগঠিত ও সুললিত হাত দু'টির পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি চোখে না

দেখিয়াও অনুভব করা যায়। সুষমার ললাট হইতে বক্ষ অবধি সেই মুগ্ধ দৃষ্টির অনুভূত লজ্জায় রং মাখান হইয়া গেল। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিয়া উহাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়া ফেলা হইবে বোধে সে অত্যন্ত বিনীত ও মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ থাক, একটা গাড়ী যদি আমায় আনিয়ে দেন।"—

মিঃ গুহ যথাপূর্ব্ব থাকিয়া উত্তর দিলেন, "ব্যস্ত হচ্চেন কেন, বলেছিতো চাকররা বাড়ী নেই, এলেই গাড়ী পাবেন। ততক্ষণ নাহয় এসরাজটা একটু বাজান না। আমরা কি শোনবার যোগ্যই নই?"

এরূপভাবে একজন অপরিচিত পুরুষকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেখিয়া সে যত বিস্মিত ততই আহত হইল। আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফিরাইয়া বারেক ইঁহার দিকে চাহিয়াই সে পরুষ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা করবেন; কিছুই আমি আজ পারবো না।"

মিঃ গুহ তখন আর এক পথ ধরিলেন।

"সুরেশ্বরকে আপনি জানেন, সুরেশ্বর বোস? আপনার পাশের বাড়ীতেই থাকে।"

সুষমার রাঙ্গামুখ সাদা হইয়া গেল। বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল; অস্পষ্টস্বরে সে বলিল "না"—

"সে কিন্তু আপনার অনেক কথা বল্লে। আপনার গান শুনেই চিন্‌তে পেরেছিল। আদি গঙ্গার উপর......রোডে 'সুষমা কুটিরে'র ঠিক পাশেই হল্‌দে রংয়ের বাঁহাতি বাড়ীখানা তার।...

সুষমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় ধড়ফড় করিতে লাগিল। উঠিয়া পালাইয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছায় তার পা তাহাকে টানিতে লাগিল. এই অপরিচিত পুরুষের চোখে তার মর্য্যাদা যে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, সে কথা সে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইল এবং এও বুঝিল যে তাহার অমন পরিচয় না পাইলে কখনই তিনি তাহার সহিত এই ভাবের সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইতেন না। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল।

"দেখুন, সংসারে এই রকমই নিত্য ঘটচে। সব মানুষ যদি ভদ্র হতো তা'হলে আর ভাবনা কি? কিন্তু তা'বলে আপনার এ বয়সে এই রকম খেটে খাবার দরকারও তো দেখতে পাইনে কিছু। সবাই অবশ্য রাজা নরেশচন্দ্রও নাহতে পারে, কিন্তু আমাদেরও যে মনে কোন সখ নেই, তাও তো নয়। যাতে তোমার কোন দিকে কষ্ট না হয়, হাতে দু'পয়সা জমে, দু'খানা গহনা গাঁটি গায়ে পর্‌তে পারো, তার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা থাক্‌বে। আর এই একজোড়া মুক্তোর দুল এনেছি—"

চেয়ার ঠেলার শব্দে মিঃ গুহকে উত্থিত বোধ করিয়াই তাড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় লাফ দিয়া উঠিয়া দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের মতই সুষমা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। কোথা দিয়া কেমন করিয়া তার হুঁস না রাখিয়াই সে বাড়ী ছাড়াইয়া বাগানের মধ্যে পড়িয়া প্রাণপণে ছুটিল। ইতিমধ্যে

৫

পেছনে একবারও চাহিয়া দেখিল না। তারপর সদর রাস্তায় আসিয়া যখন পড়িতে পড়িতে গ্যাস পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন কাহাকেও অনুসরণ করিতে না দেখিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল ও তখন মনে হইল, অত জোরে না ছুটিলেও হয় ত চলিত। বাস্তবিক তো কেহই তাহাকে ধরিতে আসে নাই। অপর কেহ দেখিতে পাইয়া থাকিলে কি মনে করিয়াছে! তারপর কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া, শুষ্ক অধর ও কণ্ঠ কোনমতে একটুখানি রসসিক্ত করিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে যেদিকে চোখ যায় চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখনও মনের মধ্যে ভয় ও সন্দেহ তুমুল হইয়া রহিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

কে বড় ?

ধর্ম্ম বলে—এ জগতে আমিই প্রধান,
কর্ম্ম বলে—আমা লাগি তোমার সম্মান!
প্রজ্ঞা দাঁড়াইল আসি—নীরব গম্ভীর—
সম্ভ্রমে উভয়ে তবে নোয়াইল শির!

ভুল বোঝা

দুখ বলে—আমি কেন না হইনু সুখ!
কবি বলে—অইটুকু বুঝিবার চুক্!

প্রকৃত মহত্ত্ব

রূপ বলে—আমি বড়, আর সব মিছে,
গুণ বলে—আমি ভাই সকলের নীচে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবিগুণাকর

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

আমাদের দেশে এখনো স্ত্রীশিক্ষা আর স্ত্রীস্বাধীনতা বল্‌তে যা' বোঝায়—(তার মানে অভিধানে যা'ই লেখা থাক্ না কেন) শোভন আর শিষ্ট ভাষায় বল্‌তে গেলে—(যদি সাধারণ 'আখ্যা'গুলি ব্যবহার না করি) স্ত্রীশিক্ষা অর্থে স্ত্রীজাতির 'বিলাসিতা' এবং স্ত্রীস্বাধীনতার মানে তাঁদের—'বাচালতা'। কাজেই ঐ শিক্ষা এবং তার আনুষঙ্গিক ফল স্বাধীনতার কথা উঠ্‌লেই যে রকম বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি আর অর্থসূচক ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়—তা' যিনিই, (নারী ত নিশ্চয়ই, পুরুষও বটে) এই বিষয়ে কথা কইতে যা'ন, নিজের, নিজের স্নেহের শ্রদ্ধার পাত্রীর সম্মানে আঘাত লাগার ভয়ে ভবিষ্যতে আর ওবিষয়ে আলোচনা বা কথা কইতে বড় একটা ইচ্ছা করেন না। করলেও এত ভয়ে ভয়ে অনেকের মন বাঁচিয়ে, সমাজের মন রেখে, (সত্য রেখে নয়) করেন, যে তাতে না থাকে প্রাণ না থাকে যুক্তি।

অথচ সহরবাসী সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, সদ্বংশ, উচ্চবর্ণের—কথা ছেড়ে দিলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি জ্ঞানলাভের একটি আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন মত প্রকাশের ইচ্ছা, স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা সমস্ত নারীজাতিরই অন্তরে জেগে উঠ্‌ছে; এমন কি যাঁরা, যে সব নারীরা স্ত্রীলোকের বিদ্যালাভ ও স্বাধীনতালাভের বিপক্ষে লিখে থাকেন—'মাতৃত্ব' 'পত্নীত্বের' দোহাই দিয়ে,—তাঁদেরও। কেন না তাঁরা ভুলে যা'ন, তাঁরা বিপক্ষে লিখ্‌লেও সেটাও স্বাধীনমতেরই একটা অংশ; শুধু রুচির ভিন্নতা মাত্র। রুচির ভিন্নতার জন্য কারুকে দোষী বা দায়ী করা যায় না কেন না নিজের মত বল্‌বার স্বাধীনতা সকলেরই থাকা উচিত।

কিন্তু যতই রুচির ভিন্নতা থাক, আদর্শভেদ থাকুক, যে জ্ঞান ও বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা সকলের অন্তরে জেগে উঠ্‌ছে তাতে ঐ রকম কোন অসম্মানসূচক অপমানকর 'আখ্যা' দেওয়া আর সমাজের পক্ষে উচিত ত হয়ই না, অশোভনও বটে। ঐ জিনিষটাকে যদি একটু সেকালে গিয়ে দেখা যায় তাহ'লেই বোঝা যাবে কত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে—অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করে—নারীজাতি এই জাগরণের যুগে এসে পৌঁছেচে। যে যুগটাকে ভারতবর্ষের নবযুগ বলা যায়, সেই রামমোহন রায়ের যুগে—যখন প্রতীচ্য জ্ঞানালোকের শিখা মলিন ধূমায়িত প্রাচ্যজ্ঞানকে নতুন আলো দিয়ে আবার জ্বালিয়ে দিলে,—সেই সময়ে—নারীদের অবস্থা কি রকম ছিল সেটা শুধু পর্য্যালোচনা করে দেখবার জিনিষ নয়,—উপভোগের বস্তুও বটে। তখনকার অনেক বই হয়ত আজকালকার বইয়ের সঙ্গে দেখ্‌তেই পাওয়া যাবে না; অনেক আচার-পদ্ধতি-নিয়ম এমন বদ্‌লে গেছে, যা' আমরা ত জানিই না আমাদের মা ঠাকুর'মারাও খুব কমই জানেন;—কিন্তু যদি খুঁজে পাওয়া যায়—তাহ'লে পুরানো এক এক খানি বই আর পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীনা কোনো কোনো

মহিলার কাছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গ তার অনেক পুরানো জিনিষ আমূল পরিবর্ত্তন করে ফেলেছে।

ঐ রামমোহন যুগের একখানি বই আমরা ছোট বেলায় আলমারীতে পেয়েছিলাম যার নাম "নারীশিক্ষা"। তার ভিতরে অনেক সন্দর্ভ, প্রবন্ধ, জীবনী, গল্পের মধ্যে একটী রচনা ছিল সেটীর নাম 'জ্ঞানদা সরলার কথোপকথন'। জ্ঞানদা নামে একটী মহিলা সরলাকে অনেক উপদেশের সঙ্গে লেখাপড়া শিখ্‌তে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সরলা যে তার কি উত্তর দিয়েছিলেন তা' যদি আমাদের আজকালের সরলারা শোনেন তাঁরা অবাক হয়ে যাবেন। সরলা বলেছিলেন, "ভগিনী আমি শুনিয়াছি—'লিখাপড়া' শিখিলে বিধবা হয়—তুমি কি করিয়া এরূপ অধর্ম্মের কাজ করিলে এবং সকলকে করিতে কহিতেছ" ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর জ্ঞানদা ১০।১২ পাতা ধরে বক্তৃতা উপদেশ দিয়ে সরলার সমস্ত সংশয় দূর, সন্দেহ ভঞ্জন করলেন এবং 'লিখিতে পড়িতে' শেখালেন। এরপরে টেকচাঁদ ঠাকুর (৺প্যারীচাঁদ মিত্র) মহাশয়ের বইগুলি,—তার মধ্যেও তখনকার কালের কিম্বা 'নতুন স্ত্রীশিক্ষার' আড়ষ্ট আদর্শ অনেক আছে; তাঁর বইয়ের মহিলাগুলির নামও অদ্ভুত—একটী নাম শুধু আমার মনে আছে সেটী 'পতি ভাবিনী'। এই সব বইয়ের পাতায় পাতায় 'ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষের' নারী প্রকৃতি ও সমাজের যে ছায়া আছে তা'তে সততা, সরলতা, কোমলতা থেকে নিয়ে সমস্ত গুণ আর তার বিপরীত অনেক দোষই চোখে পড়বে; কিন্তু যা দেখতে পাওয়া যাবে না, তা' হচ্ছে নারীর অধিকার, মনুষ্যত্বের অধিকার, জোরের অধিকার। সে যুগ কেমন ছিল, কতটা সরল ছিল, নারীরা কতটা সত্যি সরলা ছিলেন তা' আমাদের বিশেষ করে জান্‌বার আর সুযোগ নেই। আর তাঁদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে দেখ্‌বারও দরকার নেই মনে করি; কেননা 'তখন'কে 'এখনে' বহু সাধনা করলেও ফিরিয়ে আনা যাবে না। তা' ছাড়া এখন যে নারীপ্রকৃতি গড়ে উঠ্‌ছে একি তখনকার তার অসম্পূর্ণতা—অভাবকে উপলব্ধি করেই নয়? তখনকার নারীর যা' অভাব ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত পুরুষ সহৃদয়তাবশতঃই হোক আর সুবিধার জন্যই হোক নিজের চেষ্টায় তাকে জাগিয়ে তার অভাব তাকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়কার সমাজের প্রথার বিচ্ছিন্ন চিহ্নসমূহ এখনো পূর্ববঙ্গের সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; অনেক বদ্‌লালেও, অনেক একেবারেই বদ্‌লায় নি। যেমন কাপড় পরার ধরণ নারীদের (অবশ্য জানি না আমাদের দেশে সর্ব্বত্র ঠিকই ও ধরণটা প্রচলিত ছিল কিনা, তবে কোন কোনখানে ছিল) একটু কেমন ঘুরিয়ে;—বয়োজ্যেষ্ঠাদের সঙ্গে কথা না কওয়া,—কথা কইবার দরকার হ'লে তুড়ি দিয়ে, করভঙ্গী বা মুখে শব্দ করে বুঝিয়ে দেওয়া এই সব এবং আরও ছোট ছোট অনেক প্রথা আছে। বধূদের বড়দের সঙ্গে কথা কওয়া নিয়ে তাঁরা যে যুক্তি দেখান সে অদ্ভুত! বলেন "বউ মানুষে চোখের দিকে চোখ রেখে কথা কইবে এতে কি বড়দের

মান থাকে," "আর তা'তে গৃহবিবাদ আস্‌তে পারে না" ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের দেশে ঘুরানো শাড়ী পরার ধরণ, না কথা কওয়ার নিয়ম এখনো অনেক সুশিক্ষিত পরিবারেও দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্রীর অনিচ্ছাতে ওসবের প্রচলন উঠ্‌তে চায় না।

এর পরে যে যুগ এসেছিল ব্রাহ্ম-সমাজের ইচ্ছায়, চেষ্টায় তখন স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে—হিন্দুদেরও তার সংক্রামকতা স্পর্শ করেছিল। সেই সময়ের কিছুকাল পরে যে মহিলাটী প্রথম 'গ্রাজুয়েট্‌' হয়েছিলেন—তাঁর নাম আমার মনে নেই,—তাঁকে কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সেকালের অনেকেই খুব সমাদর করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা যে বস্তু সেটা তখনও এখনকার মতনই ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি, বিদ্রূপের জিনিষই ছিল—তখনকার সাময়িক সাহিত্যেও তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। জনকতক যদি অনুমোদন করতেন, অনেকের এতে বিতৃষ্ণা ছিল সেটাও অপ্রকাশ নেই। লেখাপড়া শিখলেই যে তারা খালি কুঁড়ে হয়ে বসে থাকবে, (যেমন এখন বলা হয় 'মাতৃত্ব' উঠে যাবে!) এই ধারণাটী তখনও তাঁদের মনে বদ্ধমূল ছিল;—তবু স্ত্রীজাতিকে লেখাপড়া শেখানো চলনের মধ্যেই হয়ে উঠ্‌লো। সেই সময় থেকেই কেমন করে আস্তে আস্তে সমাজে নারীর লেখাপড়া, বর্ণপরিচয় করাটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছিল—কত দৃঢ়সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে—(বিধবা হওয়া ইত্যাদি) কত প্রাচীনা ঠাকু'মা দিদিমার মনে আঘাত দিয়ে,—তা-ও ভাববার জিনিষ; সে সব ঠাকু'মা দিদিমা নিজেরা লিখ্‌তে পড়তে পারতেন না অথচ রামায়ণ মহাভারত শুনতে চাইতেন, বধূ কন্যাদের দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিতেন, তাদের লেখাপড়াকে কিন্তু বিদ্রূপ-শ্লেষ-ঝঙ্কারে ভূষিত করে। তবু সুবিধা এমনি জিনিষ শুধু বাড়ীর উৎসাহী পুরুষের সাহায্যে স্নেহেচ্ছায় রক্ষণশীল সমাজের বিদ্রূপ সহ্য করেও একটী একটী করে সুপ্ত নারীপ্রকৃতি জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তাঁদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতজন কবি-লেখিকাও হয়ে উঠ্‌ছিলেন। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী মানকুমারী বসু প্রভৃতি তখন, পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী কামিনী রায় শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী ইত্যাদি আরও অনেকের নামই সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্রমে ক্রমে এখন ঘরে ঘরে, বিশেষ উচ্চবর্ণের মধ্যে, নিরক্ষরা নারী প্রায় দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না—বিশেষ প্রাচীনা ছাড়া; বরং গৃহশিক্ষার মাঝখান দিয়েই প্রতীচ্য সাহিত্যেরও রসাস্বাদন করছেন এমন অনেক নারীই আছেন—যাঁদের পরিচয় মাসিক সাহিত্যে আমরা পেয়ে থাকি। এতদিনে, কে জানে কত যুগ-যুগান্তর পরে—ভারতবর্ষের নারীপ্রকৃতি—নতুনরূপে বিকসিত হয়ে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে সমাজের ব্যবহার কি রকম এইবার সেইটা দেখা দরকার—যে প্রকৃতি বেদনায় ক্ষোভে পীড়িত হয়ে মানুষের অধিকার চাইছে, শুধু সম্পর্কের নয়। মাতা কন্যা ভগিনী পত্নী ওসব ত মানুষের অধিকারেরই আনুষঙ্গিক।

সমাজ বলায় যে কি বোঝায়—তা' আজকের দিনে আর কারুকে বুঝিয়ে দিতে হবে

না ; বিশেষ করে মেয়েদের। নরনারী মিলিয়ে সমাজ বটে ; কিন্তু সমাজ-'পতি' পুরুষ, নারী সমাজ নামক যানের বাহন, ব'য়ে নিয়ে চলেছেন কোন্ পথে, কোন্ অনির্দ্দেশ্য যুগ থেকে কেউ জানে না। পুরুষ যখন যেমন খুসী বাহনের সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করেছেন, কর্‌ছেন (সবই পুরুষের দোষ দিতে শ্রদ্ধাস্পদা সখী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখ অনেকেই অনিচ্ছুক দেখছি আমিও কতকটা তা' মানি কিন্তু সবটা নয়। যেটুকু মানিনা তা হচ্ছে এই ; নারীর নয় ঘরের কাজ ছিল, নয় সন্তান পালন করতে হ'ত, নয় চরিত্রে কোমল গুণের আধিক্য ছিল, কিন্তু তাই বলে সমাজের বিধি-নিষেধ,—ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে আইনে কেন অত পক্ষপাত থাকবে ? কেন নরের সঙ্গে নারীর বিচারের 'আকাশ পাতাল' ভেদ হবে ?—কেন 'মানবীত্বে'র সম্মান মানবত্বের মতন রাখা হ'বে না ?—তা'থেকে কি পুরুষের নির্ম্মমতা স্বার্থপরতার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ছে না ? যদিই দৈব দুর্ব্বিপাকে কিম্বা দুর্ব্বলতার জন্যে কোন কেউ আশ্রিত হয় তা'হলে মানুষ তার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করবে এইটাই কি ধর্ম্ম ? না এ'তে পুরুষের খুব ঔদার্য্য প্রকাশ পাচ্ছে ?) কখনো সহৃদয়, কখনো উদাসীন, কখনো পীড়িত সবই করেছেন। পীড়ন যাঁরা করেছেন, করে থাকেন,—তাঁরা যে ইচ্ছে করেই করেন তা হয়ত না-ও হ'তে পারে ;—সমাজ তাঁদের এমনি করে গড়েছে যে, কোন সত্য, কোন বাস্তবতা, কোন দুর্ব্বলতা, তাঁরা নারীপ্রকৃতির মধ্যে সহ্য কর্‌তে পারেন না ; একটুতেই 'স্বাধিকারপ্রমত্ত' হয়ে উঠেন নিজেদের সাদা প্রভুদের মতন। এঁদের কাছে কোন উৎপীড়িত অবিচারিত মানবীত্ব সমবেদনাও পায় না ! যাই হোক্ এঁরা যে আমাদের এই চির লাঞ্ছিত কৃপাপাত্রীদের চেয়েও দয়ার পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কেন না মানুষ হ'বার সুযোগ পেয়েও মানুষ হ'ন নি, মনুষ্যত্ব জাগেনি। এঁরা ছাড়া আর এক শ্রেণীর পুরুষ আছেন যাঁরা নারীত্বকে পীড়ন করেন না কিন্তু অবিশ্বাস করেন। যদি মানব সমাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় তা এঁদের দ্বারাই হয় তাঁদের চেয়ে ; মানবজাতির উন্নতির অন্তরায়ও এঁরাই হ'ন। এক কথায় এঁদের নিজেদের উপর বিশ্বাস না থাকায় কারুর উপরেই বিশ্বাস এঁরা রাখতে পারেন না। এই শ্রেণীর লোকেই ভগবানে বিশ্বাস রাখেন অথচ ভগবানের বিভূতিতে সন্দেহ করেন ; নারীকে 'মা' বলেন অথচ 'মা'কে কিছু হীন বলতেও দেরী লাগে না ; পত্নীকে দেবী বলেন কিন্তু সে দেবীর সঙ্গে দাসীর চেয়ে হীন ব্যবহার করেন—অবিশ্বাস ক'রে। এঁরা মানুষকে অসুস্থ শিশুর মতন তার নিজের উপর নির্ভর করে বিচরণ করতে দিতে ভরসা পান না পাছে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে। মানব চরিত্র যে কত ঝড় ঝাপটা অতিক্রম করে 'সত্যকার মানুষ' হয়ে ওঠে তা' এঁদের ধারণাই নাই। এঁরা ভালোকে মন্দকে সমান সন্দিগ্ধ চোখে দেখেন। এই শ্রেণীর পুরুষের মতন কতকগুলি এ শ্রেণীর নারীও আছেন যাঁরা ভীত হয়ে মনুষ্যত্বের সত্যকে অপমান করে, গোপন করে, স্বজাতির উন্নতির অন্তরায় হ'ন। পুরুষ যা ক্ষতি করতে না পেরে থাকেন তার অবশিষ্টটুকু এঁদের দ্বারা সুসম্পন্ন হয়।

এই সব সত্ত্বেও এবং এই সব থেকে তা'হলে দেখা যাচ্ছে রামমোহন যুগেও যেমন ছিল, তার পর পর সব সময়েই এখন, আজকাল যেখানে এসে নারীজাতি দাঁড়িয়েছেন সেখানেও এখনো তাঁকে শ্লেষ ব্যঙ্গ করবার লোকের অভাব নেই। যে শ্রেণীর লোক আগেও শিক্ষার সেই নবযুগে নারীর শিক্ষাকে বিদ্রূপ করেছেন সেই শ্রেণীর লোক সমাজে সবযুগে থাকা সত্ত্বেও যে নারীর মধ্যে শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে এবং বিস্তার হচ্ছে এইটেই আশার কথা। আর এটাও জানাই কথা যে যাঁরাই যখন সমাজের কোনো পুরোণো জিনিষকে বদ্‌লে দিতে চান তাঁদের উৎপীড়িত বিদ্রূপ ভাজন হ'তেই হয় তা' তাঁদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ থাকুক না কেন। যে কোন যুগের যে কোন সদুদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার ফল তার উত্তরপুরুষে দেখতে পাওয়া যায় তখনি কিছু নয়। কিন্তু মানব প্রকৃতি তার জন্য অপেক্ষা না করেই মত প্রকাশ করে, এটাও আবার তার বিশেষত্ব।

এখন এসব কথা ছেড়ে দিয়ে যা' দেখা দরকার তা' হচ্ছে এই, যে আমাদের গন্তব্য স্থান কোথায়? আমরা যে কন্যা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারুর কারুর বোনও বটে, কিন্তু ঐ স্ত্রী আর মা নিয়েই যে গোল বেধেছে। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের স্ত্রীত্ব বিলুপ্ত করে দেবে। আগে দেখা দরকার 'স্ত্রীত্ব' কথাটার অর্থ কি—'স্ত্রীত্ব' বলতে কি সজীব কোন যন্ত্র বোঝায়—যে ঘরকরনার কাজ করবে, পুরুষকে পূজো করবে, সন্তান লালন পালন করবে,—আর নিরতিশয় উৎপীড়িত হ'লে আত্মহত্যা করবে?

স্ত্রীত্ব বা নারীত্ব বল্‌তে যা' বোঝায় তার কোনো প্রাচ্য অর্থও নেই,—কোনো প্রতীচ্য মানেও নেই, কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্বও নেই—কোনো অনাধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিও নেই। নারীত্ব হচ্ছে মানবীত্ব যেমন নরত্ব মনুষ্যত্ব। মানবত্বকে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করতে হবে। মানবত্বের মধ্যে বাস্তবতা অবাস্তবতা আছে, মানবীত্বের মধ্যেও ঠিক তাহাই আছে। জননীত্বের দ্বারা মানবীত্বের বিচার করা মানবীর একদিকে চল্‌তে পারে; নারীর সমস্ত চিত্তকে জননীত্বের মাপ কাটিতে বিচার করলে বিধাতার ওপর অবিচার করা হবে বলেই মনে হয়। মন নামক বস্তুটী স্ত্রীলোকের আর পুরুষের দুজনেরই সমান; সেখানে মাতৃত্বের সঙ্গে পিতৃত্বের, পত্নীত্বের সঙ্গে পতিত্বের দুইয়েরই আদর্শ থাকা উচিত এবং থাকা ভালোও; এবং বিচার করবার সময়ও মানবকে মানবের—মানবীকে মানবীর অধিকার দেওয়া উচিত। তখন মানুষকে মানুষের অধিকারে আর নারীকে জননী পত্নীর অধিকার হিসাবে বিচার করা অন্যায়। শিক্ষা সম্বন্ধেও—মানবজাতির যে শিক্ষা পাওয়া দরকার যে স্বাধীনতা পাওয়া দরকার তাই নারীরও পাওয়া উচিত, কোনো পত্নীত্ব বা মাতৃত্বের জন্যে তাঁর মনুষ্যত্বকে উৎপীড়িত করা উচিত নয়;—সবারই আগে মনুষ্যত্ব, তারপরে মাতৃত্ব কিম্বা স্ত্রীত্বের বিকাশ হয় এটা বলা বাহুল্য। কেন না 'অমানুষ মাতৃত্ব'—'নারীত্ব'হীন মাতৃত্ব কি কখনো সম্মানিত হয়েছে? স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য স্ত্রীলোককে নিজের গুণে বিকশিত করা তা''

তাঁর অন্তরে মানবগুণেরই প্রভাব থাকুক আর মানবীগুণের অভাব থাকুক। মানুষমাত্রেরই হৃদয়ে সব গুণ একটু আধটু কমবেশী পরিমাণ থাকে; যদি স্ত্রীজাতির অন্তরে কোমলগুণসমূহ বেশীই থাকে ও পুরুষগুণ কম থাকে, বেশ থাক্ না, তা'নিয়ে ত কারুর শিরঃপীড়ার দরকার নেই; তার যা' গুণ আছে তাই ফুটে উঠুক না। যদি মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষার কথা বল্‌তে কেউ চা'ন আমার মনে হয় আগে মানুষ করা দরকার, তারপর 'মা' কিম্বা 'স্ত্রী' হ'তে যে গুণ দরকার হবে স্বভাবজ সংস্কারের সঙ্গে আপনি সেগুণের বিকাশ হবে। থাক্ সে কথা এখন দরকার নেই। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার প্রয়াসী বা প্রয়াসিনীদের কোনো দেশেই এ উদ্দেশ্য কোনো দিন থাকে না যে দেশের নারী সমাজ কন্যা ভগিনীরা সব চপলা বিলাসিনী হ'য়ে ওঠেন;—আর স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচারের অভিপ্রায়ও এটা নিশ্চয়ই থাকে না যে তাঁরা সকলে বাচালতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় গিয়ে পৌছন। বরং তাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ওর বিপরীতই থাকে। যদি কোনো কল্পনাকুশল ব্যক্তির মাথায় হঠাৎ জেগে ওঠে স্ত্রী-শিক্ষাপ্রচারের অর্থ বিলাসিতার প্রসার, - আর স্বাধীনতার অধিকার চাওয়া মানে বাচালতার ইচ্ছা, তা'হলে তাঁর কল্পনা তাঁর নিজস্ব হয়ে থাকুক তাঁর শান্তি-ভঙ্গ করে কারুর তাঁকে বুঝিয়ে দিবার আবশ্যকও করে না। যাঁরা নারীত্বকে জাগাতে চেয়েছেন বা নারীত্বের অপমানে পীড়িত হয়েছেন তাঁরা চা'ন স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার দ্বারা উৎপীড়িত মনুষ্যত্বকে, নারীত্বকে উদ্ধার করতে; স্ত্রী-স্বাধীনতার ফল স্বনির্ভরতা তাঁদের পরমুখাপেক্ষার লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাবে।

এই হ'লো স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচারের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ। ওর ভিতরে কোনো 'বলশেভিজ্‌ম্' কোনো সামাজিক বিবাদ, কোনো 'পতিবিদ্রোহিতা', কোনো 'সত্যধর্ম্ম' ভ্রষ্টতার ঘোষণা—কিছুই নেই, থাকতে পারেও না কোনোদিন। যাঁরা 'সিঁদুরে-মেঘ' দেখ্‌লে ডরান তাঁরা স্ত্রী কন্যার চোখ বেঁধে রাখ্‌তে পারেন, কেউ আপত্তি করবে না।

আমাদের স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ যাঁর যা' ইচ্ছা মানসচক্ষে দেখে নিয়েছেন আমাদের জিজ্ঞাসা করবার আগেই। আমাদের শিক্ষার আদর্শ শিক্ষা, জ্ঞানলাভ বিদ্যালাভ। আজকাল শিক্ষা গৃহে দেওয়া বহুব্যয়সাধ্য সেইজন্যে স্কুল কলেজে বিদ্যালাভ করা সুবিধা। তার অর্থ কোনো দিন 'বিলাসিতা' বলে মনে করাতো যায়নি তবে আমাদের অন্তর্য্যামীরা দেখ্‌ছি সেটীকে 'বিলাস-লালসা' বলেই জানেন। স্বাধীনতার আদর্শ স্বনির্ভরতা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে। সমাজে অনেক দুঃস্থ পরিবার আছেন তাঁদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অভাবের কষ্ট ভোগ করে থাকেন, অনেক লাঞ্ছিতা কুমারী আছেন, নিপীড়িতা বিধবা আছেন, 'পতিদেবতা' কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারী আছেন তাঁদের 'চরণের' স্বাধীনতা দরকার; তা'হলে জীবিকাসংগ্রহ করে তাঁরা বাঁচ্‌তে পারবেন। তবে যদি সমাজ (পুরুষ) মনে করেন তাঁদের জীবনধারণ করবার কোনো দরকার নেই, অবশ্য নাচার। নারীর জীবনের মূল্য এদেশে ত এই রকমই অতএব ক্ষোভের কোনো কারণ নেই।

বিয়ের কনে

মৈমনসিংহের মহারাণী মহোদয়ার সৌজন্যে—

INDIAN ART SCHOOL
CALCUTTA
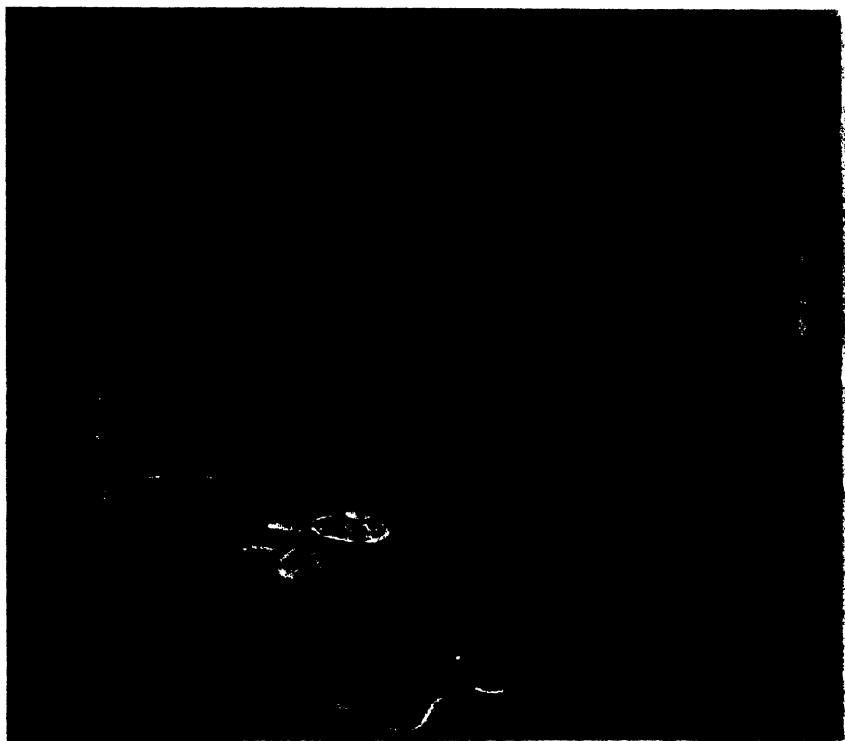
আর জীবন যাত্রার প্রণালী এবং উদ্দেশ্য যে চিরকাল এক রকমই থাকবে তার কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। পুরুষ যেমন 'চিরকুমার' থাকতে চা'ন নারীরও আদর্শ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হতে পারবে। দরকার সমাজে শিক্ষা-স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্ম্মভাব থাকা। অন্য সব তুচ্ছ খুঁটি নাটী সংস্কার থাক্ বা না থাক্ কিছু আসে যায় না। সেগুলো পোষাক পরিচ্ছদের মতন বদলে নেওয়া যায় এবং তাই চিরকাল করা হয়ে থাকে।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

পঞ্চ প্রকৃতি

কচি খুকি

রাঙা কচি পায় পায়,
সারা বাড়ী দৌড়ায় ;
আঁখি দুটি উৎপল,
আধ-কথা উচ্ছল !

কিশোরী

উজ্জ্বল চোখ-মুখ,
গাল লাল টুক্-টুক্ !
চঞ্চল, ফিট্-ফাট্,
লজ্জায় আঁট্-সাট্ !

যুবতী

সেমিজ, সাড়ী, চলন ভারী,
অলঙ্কারে অহঙ্কারী ;
নিটোল শোভা, ভুবন-লোভা,
বাচাল হিয়া, বদন বোবা !

প্রৌঢ়া

ছেলে, মেয়ে, চেঁচামেচি !
লেনা-দেনা, খেঁচা-খেঁচি !
দিবারাতি শুধু ভাবা !
পদে পদে 'মাগো ! বাবা !'

বৃদ্ধা

কোষ্ঠা-কুন্তল, দৃষ্টি ঘোর্-ঘোর্
চামড়া ঢিল্-ঢিল্, দন্ত নড়্‌বোড়্ !
ভাব্‌না হর্‌দম মৃত্যু-শঙ্কার !
শক্তি খুব কম, শুষ্ক সংসার !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্রত্যাখ্যান

(১)

গায়ক বৈকুণ্ঠ মিশ্র যখন একমাত্র আশ্রয়স্থল জামাতাটীকেও হারাইলেন, তখন তাঁর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তখন তাঁর একমাত্র সন্তান সুপর্ণার পূর্ণ যৌবন। বৃদ্ধের সংসার-বন্ধনগুলি একে একে সব খসিয়া গেল; জীবনে যাহারা তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল, রাত্রিমাত্র প্রবাসী পথিকের মত সকলেই একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তবুও সেই গৌরবর্ণ অনুপমদর্শন ব্রাহ্মণের চক্ষের তারুণ্যশ্রী একটুও ম্লান হইল না। হাসিমুখ, সদানন্দ বৈকুণ্ঠ মিশ্র কাহারো সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না,—জীবনমরণের একান্ত সঙ্গী ছিল—একটী সেতার ও কন্যা সুপর্ণা। সকাল সন্ধ্যায় শোকার্ত্তমনে বিপত্নীক বৈকুণ্ঠ মিশ্র যখন এই সেতারটী দক্ষিণ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া প্রিয়তমার মত তাহাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ভাবমুগ্ধ চক্ষু দুটী মুদিত করিতেন, তখন তাঁর মুখের প্রতি প্রফুল্ল হাসিটী দেখিয়া কেহই বলিতে পারিত না, যে সে-বুকে জগতের তীব্রতম অনেক শক্তিশেল চিরকালের জন্য প্রোথিত হইয়া আছে।

পল্লীর স্নেহ-নীড় হইতে বৈকুণ্ঠ মিশ্র এবার দেশান্তরে চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। এই গ্রামের এক সন্ন্যাসী গায়কের নিকট তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র আয়ত্ত করেন, এই গ্রামেই তাঁহার কুটীরে গান শুনিবার জন্য কত রাজামহারাজা সমবেত হইত, আবার এই গ্রামের নদীতীরস্থ শ্মশানে তাঁহার বক্ষের অনেকগুলি পঞ্জরই চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে। কেহ কখনো বৈকুণ্ঠ মিশ্রের অপকার করিতে সাহস করে নাই, কারণ তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—যেন শ্মশানবিহারী মহাদেব কৈলাস-নিবাস ত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামের কুটীরে আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ মিশ্র সঙ্গীতকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই অশ্রুতে যে-ব্যথার প্রকাশ হইত না, সেতারের কড়িকোমলে তাহা কাঁদিয়া উঠিত। তাঁর সারা জীবনটা সঙ্গীতের ছন্দের মতই বিকচসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। দিগ্বিদিক হইতে নানা রসজ্ঞ শ্রোতার দল আসিয়া তাঁহার পাদমূলে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া যাইত, তিনি অর্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, বলিতেন—'অর্থ প্রয়োজনসাধনের জন্য, কিন্তু জীবনে প্রয়োজনের বেশী অনেক ভাবসম্পদ্ চাই, তাহা কেবল সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়।' কন্যাটীও পিতার আদর্শে শিক্ষিতা হইয়াছিল। সুপর্ণা সমস্ত কঠিন রাগ-রাগিণী কৈশোরেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই মিশ্র মহাশয় সময়ে সময়ে শিষ্যসামন্তগণের নিকটে তাহাকে 'বাক্‌সিদ্ধা সরস্বতী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। আজ কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে

তাঁহার সমস্ত কল্পনাই আকাশ-কুসুম হইয়া গেল। জামাতার মৃত্যু-সংবাদে তিনি সর্ব্বতীর্থসার কাশীধামে আসিয়া জীবনের সন্ধ্যাকালটা কাটাইতে মনস্থ করিলেন।

কাশী আসিয়াও তাঁহার সাধনার বিরাম নাই। শিষ্যের দল এখানেও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। একবার গাহিতে বসিলে আর তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান থাকিত না। যৌবনে তিনি এক রাজার দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া অসময়ে হাজির হইয়াছিলেন। দ্বাররক্ষী তাঁহাকে সভায় প্রবেশ করিতে অনুমতি দেয় নাই; পরে একজন সভাসদের সঙ্গে রাজার নিকট গিয়া তিনি যখন উৎকর্ণ, ঊর্দ্ধমুখ ও হতবাক্ অবস্থায় অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, তখন কেহই তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিল না। সঙ্গীতাচার্য্য যখন এই মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বলিলেন, 'এ কি!—সভায় যে হাম্বীর-রাগ গাওয়া হয়েছে শুনতে পাচ্ছি!—এখনো এই সভাতল সেই রাগমূর্চ্ছনায় অভিভূত হয়ে আছে!'—তখন সঙ্গীতরসজ্ঞ রাজা গায়কের অদ্ভুত রসানুভূতি দেখিয়া নিজকণ্ঠের হার আচার্য্যের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রাজসভায় হাম্বীর-রাগ গীত হইয়াছিল। সেই দিন হইতে আচার্য্য বৈকুণ্ঠ মিশ্রের নাম দেশবিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু দৈবের এমনি বিধান—আচার্য্যদেব কাশীধামে আসিয়া কিছু দিনের মধ্যেই কঠিন গলনালী-রোগে আক্রান্ত হইলেন। ধনী শিষ্যগণের চেষ্টায় তাঁহার চিকিৎসার কোনই ত্রুটী হইল না; কিন্তু মাসাধিককাল রোগযন্ত্রণা সহিয়া তিনি ভববন্ধন হইতে চিরমুক্তিলাভ করিলেন। সুপর্ণা অকূল সমুদ্রে ভেলার মত ভাসিতে লাগিল।

সে তখন এই লুপ্তপ্রায় কলাবিদ্যার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইল। পিতৃশোকে ও স্বামীশোকে অকাতরা এই তরুণীটি সঙ্গীতের রসেই হৃদয়ের ক্ষত উপশম করিল। কাশীতে তখন বসন্তের মহামারী উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সুপর্ণা অন্য একটী নিরাপদস্থানে উঠিয়া গেল। যায়গাটা কাশীর বাহিরে—লোকজনের ভিড় সেখানে তত নাই। সুপর্ণার গৃহের পার্শ্বেই আর একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ যুবকের আবাস, সে-ও একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। প্রতি প্রভাতে সে গৃহসংলগ্ন উদ্যানে বসিয়া সঙ্গীত সাধনা করিত, সুপর্ণা একমনে সেই নূতন নূতন গানগুলি শুনিত ও আয়ত্ত করিত। এক একবার ইচ্ছা করিত—সে এই অপরিচিত গায়কটীর কাছে ছুটিয়া যায় ও তার পদতলে পড়িয়া বলে—'ওগো, আমি তোমার দাসী হয়ে থাকবো, আমায় ঐ নূতন সুরগুলি শিখিয়ে দাও!' সেই অজানা সুরগুলি বড় মধুর, বড় মনোহর, এমন বিচিত্র সুর সে কোনো ওস্তাদের কাছে এ পর্য্যন্ত শোনে নাই। প্রভাতের প্রথম বিহঙ্গকাকলীর মত টোড়ী, কাণাড়া, ললিত ও বসন্তের সেই অলসমন্থর, প্রার্থনাব্যাকুল, আবেগকম্পিত রাগনিচয় যখন তরুণ গায়কের করুণকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তখন সুপর্ণার আর ঘরে মন থাকিত না, মনে হইত—সে সঙ্গীতবিদ্যার প্রথমাক্ষরই আয়ত্ত করিতে

পারে নাই। যে যে-বিষয়ের জিজ্ঞাসু, সে সে-বিষয়ে অপর কাহাকেও পারদর্শী দেখিলে নিজের অক্ষমতায় মরমে মরিয়া যায়। তাই যখন বাগেশ্রীতে সুদীর্ঘ কম্পন-গুঞ্জরন উঠিত—

'তোঁরৌরি চরণকো উপমা দিয়া নাহি যাতা
মগন হোতা মেরে মন।
নরনারী মিলি দেতা মবারক আস্তুতি করত তুঁহে—
তুঁহি সংসার-আঁধার॥
গোরে গোরে মুখপর বেস্‌রা শোহে
আউরে শোহে নয়ন-কাজ্‌রা।
শিসফুল বেণী, কণ্ঠে মুণ্ডমালা,
আউরে শোহে মতিয়ানা ক গজরা রে॥'—

তখন সুপর্ণার হৃদয়-কমল প্রেমের প্রভাত সমীরণে শিহরিত হইয়া উঠিত। সে আর শুনিতে পারিত না। কখনো বা গায়ক গাহিত—'আরে দিল্, প্রেম নাগর কা অন্ত না পায়া'—আবার কখনো বা কবীরের সেই চিরপ্রসিদ্ধ গানটী গাহিত—'জাগো পিয়ারে, অব কান্ শোয়ৈ'—তোমার রাত যে গেল গো, দিনটাও কি বৃথা যাবে? যারা জেগেছে, তারা সবাই মণিরত্ন পেলে, ঘুমিয়ে তুমি সব হারালে অবোধ নারী! বাসকসজ্জা-রচনা তোমার হয়নি, হেসেখেলে কতছলে তোমার সময় কেটে গেল! যৌবন তোমার বৃথায় গেল গো—তোমার সে রসরাজকে ত চেনা হলোনা! জাগো, জাগো, চেয়ে দেখ, তোমার শয্যা শূন্য,—রাত্রের আঁধারে সে তোমায় ছেড়ে গেছে; কবীর বলে—সেই মহারাজের গানের বাণে যার মন বিঁধেছে, আর তার চোখে ঘুমের কাজল জড়িয়ে ধরবে না।

সুপর্ণার চোখের উপর দিয়া স্বপ্নপুরীর কত গোলাপী সন্ধ্যা, কত হিরণ্ময় প্রভাত কাটিয়া যাইত। কত আবেশমাখা স্নিগ্ধ গন্ধ, পাখীর কত আনন্দগান তার মুগ্ধমুদিত হৃদয়ে জাগিত। সে তার বাতায়ন সংলগ্ন পার্শ্বের গৃহে সময়ে অসময়ে সেই গুঞ্জরণশীল বাহ্যজ্ঞানশূন্য গায়কটীকে চকিতে দেখিয়া লইত।

(২)

মহামারীর ভয়ে সেবার অনেকেই কাশী হইতে অন্যত্র পালাইয়া গেল। সুপর্ণাদের পাড়া হইতেও সকলে একে একে চলিয়া গেল। কিন্তু সেই গায়ক-ব্রাহ্মণটির কিছুতেই চৈতন্য নাই। একখণ্ড গেরুয়া বসন কটিতটে বেষ্টন করিয়া গোময় মার্জ্জিত ভূমির উপর হরিণচর্ম্মাসনে বসিয়া তানপুরা-লগ্ন বাহু হইয়া সে যখন সঙ্গীতের ঢেউ তুলিত, তখন তাহা সুপর্ণার হৃদয়তটে আছাড় খাইয়া পড়িত,—সুপর্ণা ভাবিত, এই গায়কের মারীভয়ে একটুও ভয় নাই। বৃক্ষলতার শ্যামলতা

যেন তাহার সুন্দর দেহটীর উপর কালবৈশাখীর মেঘের মত ঝুঁকিয়া আছে, আধফোটা ফুলগুলি যেন তাহারি চরণে আত্মনিবেদন করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়, প্রকৃতির অন্তরের গোপন ব্যথাটি যেন এই গায়কের কাছেই ধরা পড়িয়াছে। হঠাৎ সুপর্ণা একদিন শুনিল যে সুন্দর সিং বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাকে দেখিবার কেহই নাই, তাহার একমাত্র ভৃত্য পর্য্যন্ত পালাইয়াছে। সেবাপরায়ণা সুপর্ণা তৎক্ষণাৎ সুন্দর সিংএর গৃহে আসিয়া দেখিল যে সে অচৈতন্য হইয়া আছে, মারীগুটিকায় তার অঙ্গ ভরিয়া গিয়াছে। সেবার শূন্য আসনে সুপর্ণা প্রীতিময়ী অন্নপূর্ণার মত আসিয়া বসিল,—সুন্দর সিংএর আরোগ্যলাভ হওয়া পর্য্যন্ত সেই অচলপ্রতিষ্ঠ বজ্রাসন হইতে সে একদিনের জন্যও উঠিল না।

সুপর্ণা যখন সুন্দর সিংকে মৃত্যুর কবল হইলে ফিরাইয়া আনিল, তখন দেহে প্রাণ থাকিলেও তাহার জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল। সুপর্ণার যত্নে সুন্দর শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গায়কের সঙ্গীত-মোহাচ্ছন্ন মনে একটী স্নেহশীলা নারীর দয়াময়ী মূর্ত্তি চিরাঙ্কিত হইয়া গেল।

সে যখন এই অক্লান্ত সেবার পুরস্কারস্বরূপ সুপর্ণাকে কিছু দিতে চাহিল, তখন সুপর্ণা কহিল, 'দান? দানের জন্য আমি কি আপনার সেবা করতে এসেছিলাম? সেবাই যে নারীর ধর্ম্ম—সে কথাটা আপনি জানেন না?'

সুন্দর অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'ভুল বুঝেছি। তবু আপনি আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিন,—আপনাকে আমি কিছু না দিতে পারলে তৃপ্ত হ'তে পারবো না। যতদূর সম্ভব আমি আপনার এই গভীর স্নেহের ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করবো।'

গম্ভীরভাবে সুপর্ণা উত্তর দিল, 'আপনি আমায় টোড়ী ও দরবারী মালকোষ শিখিয়ে দিন—আর আমি কিছুই চাই না আপনার কাছে।'

বিস্মিতমনে সুন্দর সিং কহিল, 'আপনি কি গান গাইতে জানেন? কে আপনার গুরু?'

সু। সাতমহলের বৈকুণ্ঠ মিশ্রের নাম শোনেন নি? তিনিই আমার পিতা। তাঁর পায়ের তলায় বসে আমি দু'একটা সুর শিখেছি। গানের মহারাজ্যটা এখনো আমার কাছে দুর্লভ হয়ে আছে।'

সুন্দর সিং স্তম্ভিত হইয়া কহিল, 'বৈকুণ্ঠ মিশ্র? হাম্বীরের রাজা? তাঁর বেহাগরাগ শুনে শোরী মিঞা আর বেহাগ গাইবেন না বলেছিলেন। তিনি আপনার পিতা? তিনি আমাদের মহারাজা ছিলেন। তাঁর সন্তানশিষ্যা আপনি, আপনাকে আমি কি শিক্ষা দেবো?'

সুপর্ণা কহিল, 'টোড়ী ও দরবারী মালকোষ তিনি গাইতেন না। কিন্তু আপনি ও-দুটীর যে ওস্তাদ তা আমি জানতে পেরেছি। খুব উঁচু গ্রামের গলা আপনার। আমায় যদি কিছু দান করতে চান তো ঐ দুটীই আমায় দিন—আর আমি কিছুই চাই না।'

'আমি—আমি শিক্ষা দেবো আপনাকে? না—না, সে হতে পারে না!'

'তবে আর আমার কোনই কাম্য নেই। আমায় বিদায় দিন।'

'রাগ করবেন না, দেবি, আমার উপর। নারীরা গান শেখবার অযোগ্য বলে, গুরুজীর নিষেধ আছে। এক জিহ্বাই নারীর পক্ষে যথেষ্ট—এই এক জিহ্বার তেজে তারা বিশ্বভুবন ছারখার করে' বেড়াচ্চে; গানের জিহ্বাটাও তারা পেলে পুরুষের আর বাঁচবার উপায় থাকবে না। সেইজন্য আমায় ও বিষয়ে মার্জ্জনা করতে হবে।'

'নারীকে কি এতই হীন ভাবেন আপনারা? তানসেন মিঞারই ত নারী শিষ্যা ছিল। তিনি ত দানে পতিত হন নি! আজ তবে গায়কদের এ ধারণা কেন হলো?'

'আপনাকে আমি অত সহজে ছাড়ছিনা—আমায় একখানা হাম্বীর ও একখানা বেহাগ শোনাতেই হবে।'

অশেষ অনুরোধে সুপর্ণাকেই সর্ব্বাগ্রে গাহিতে হইল। বেহাগের গিট্‌কিরি ও সম ফেলিবার নৈপুণ্য দেখিয়া সুন্দর সিং বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনের মাঝখানে সহসা যেন বিরহের রুদ্র অনল জ্বলিয়া উঠিল। সুর তীরের মত বিঁধিয়া যায়, তরঙ্গের মত গড়াইয়া চলে হাউই-এর ছুটে, আবার সন্ধ্যারাগের মত অজ্ঞাতে বিলীন হইয়া যায়। সুন্দর সিংএর মুখে কথা ফুটিল না। সে শূন্যদৃষ্টি ও তন্ময় হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে কহিল, 'কোথায় ছিলুম, আর কোথায় এলুম! এ যে একেবারে আমাদের মহারাজের মতই স্বর। গুরুজীর নিষেধ থাকলেও আমি আপনাকে কাল প্রভাত হতে টোড়ী ও মালকোষ শেখাবো অঙ্গীকার করলুম।'

সুপর্ণা সুন্দর সিংকে অভিবাদন করিয়া ফিরিয়া আসিল। তার বিধবাবেশে এমনি একটি আনন্দময় ভাব ফুটিয়া উঠিল যেন তাহা বেহাগেরই প্রতিমূর্ত্তি। নূতন সুর শিখিবার প্রবল আগ্রহে সে তখন বিশ্বভুবনের অন্য সকল কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

(৩)

সঙ্গীতশিক্ষা চলিতে লাগিল। কুশাগ্রবুদ্ধি ছাত্রী পাইয়া গুরুর আনন্দের সীমা রহিল না,—প্রতিশ্রুত সুরগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিষ সুন্দর সিং সুপর্ণাকে দান করিল। সুপর্ণার আর বাহ্যজ্ঞান নাই, সে সেতারটী হাতে করিয়া নিজের কুটীরে আনমনে বসিয়া থাকে, কত রকমে প্রকৃত সুরটী আদায় করিবার চেষ্টা করিত, যতক্ষণ না পারিত, ততক্ষণ একটা দুরন্ত অতৃপ্তি কণ্টকের মত তাহাকে অস্থির করিত। সাধনা যখন মানুষকে পাইয়া বসে, তখন সে এমনি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। সুপর্ণা কিন্তু এক এক সময় বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়ে, —তাহা সঙ্গীতের জন্য নয়, নিজের অক্ষমতার জন্য নয়, অভাবের জন্য নয়,—তাহা একটা অব্যক্ত বেদনা প্রকাশের অভাব হইতেই জাগিত। সে বেদনা বাসনা-সঞ্জাত,—মানুষের মন যখন কিছু পাইবার জন্য চিরতৃষাতুর হইয়া থাকে, তখন সে বেদনাভরা সুরে কাঁদিয়া ফেলে।

সুপর্ণা যখন সুন্দর সিংএর কাছে শেখা সুরগুলির মোহে আত্মবিভোর হইয়া আছে, সুন্দর সিংএর তখন গোয়ালিয়ার-মহারাজের সঙ্গীত-সভায় নিমন্ত্রণ হইল। সুপর্ণা সুন্দর সিংকে মনে মনে অত্যন্ত ভক্তি করিত—গানে যে সিদ্ধবিদ্যা, হৃদয়টীও তার গানের সুরের মত কোমল ও সুন্দর। যুগে যুগে মানুষ সুন্দরের আকর্ষণে মজিয়াছে—আবার প্রতিভার জ্বালা যেখানে জগতের ক্ষুধা ভস্মীভূত করে, মানুষের মন সেখানে ইন্দ্রিয়াতীত কোনো-কিছু পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়ে। সুপর্ণা ধরিয়া বসিল যে সে-ও গোয়ালিয়ারে সঙ্গীত-সভায় যোগদান করিবে। তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সুন্দর সিং উপেক্ষা করিতে পারিল না।

গোয়ালিয়ার-মহারাজের সভা শোভাসম্পদে অতুলনীয়। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদক সেখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। বাদ্যযন্ত্রের একটী প্রদর্শনীয়ও খোলা হইয়াছে। রাজসভার সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে এই সমস্ত গায়ক ও বাদকের জন্য যথাযোগ্য আসন সজ্জিত হইয়াছে। গোয়ালিয়ার-রাজ স্বয়ং এই সভার সভাপতি। সঙ্গীত সভায় নারীর প্রবেশাধিকার নাই বলিয়া সুপর্ণা ছদ্মবেশে আসিয়াছে। তাহার অঙ্গে একটী সুদীর্ঘ শ্বেতবর্ণের রেশমী আবরণ ও মস্তকে পাগড়ী। প্রথমদিনে সঙ্গীতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, মহারাজ স্বয়ং তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিবেন। সুন্দর সিং-এর পূজনীয় গুরুদেব আসক্ জঙ্গ বাহাদুরও আসিয়াছিলেন—তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টনবতি বৎসর, অথচ কণ্ঠের সে স্বর্গীয় শক্তি, দেহের সে যৌবন-লাবণ্য এখনও অটুট আছে। তিনি চিরকুমার—শিষ্যবর্গকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তিনি পুত্রাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। ব্রাহ্মণোত্তম হইয়াও সুন্দর সিং জঙ্গবাহাদুরের পাদচুম্বন করিয়া প্রণাম করিত। জঙ্গবাহাদুরের সুরলালিত্য, খেয়ালী ঢং ও চিত্তোন্মাদী ঝঙ্কারে শ্রোতৃবর্গ সময়ে সময়ে ভাবমূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত।

জঙ্গ বাহাদুর তানসেন মিঞার গুরুদেব আবিষ্কৃত ললিতরাগ গাহিলেন। ললিতরাগ ভোরের সুর। মুখবন্ধস্বরূপ একটী ক্ষুদ্র উর্দ্দু বক্তৃতায় জঙ্গ বাহাদুর কহিলেন, 'আকবর সা সঙ্গীতের অপূর্ব্ব শক্তির সম্বন্ধে প্রথমে বিশ্বাস করিতেন না। পরে তানসেন মিঞা একদিন সম্রাটকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে একটী আঁধার অরণ্যে লইয়া গেলেন। সম্রাট সেই বিজন কাননে বৃক্ষমূলে সাধনারত একটী সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তানসেন মিঞা সেই সন্ন্যাসীর পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাকে ললিতরাগ গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তানপুরাটী কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি ললিতরাগ আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন,—ধীরে ধীরে অমানিশীথিনীর কাজল-ঘন আঁধার সরিয়া গেল, সেই শ্মশান-নিস্তব্ধতা দূর হইল, সেই রহস্যে-ভরা বিজনতা ঘুচিয়া গেল। উষার আলো-ছায়া ভাবটী প্রকৃতির বুকে লাগিল, বিহঙ্গের আনন্দ-কাকলী শোনা গেল, শিশির-পতনের টুপ্‌টাপ্ শব্দ শোনা গেল, অদূরে গগনগাত্রে উষার রক্তচ্ছটাও বুঝি বা উদ্ভাসিত হইল। আকবর সা ব্যস্ত হইয়া তানসেনকে কহিলেন, 'চলো, পৈয়ার, শীঘ্র চলো, বেলা হলে লোকে আমায় চিনতে পারবে।'

তানসেন হাসিলেন, তাহার গুরুর সঙ্গীত সমাপ্ত হইলেও আকবর সাহের মনের ভ্রম ঘুচিল না। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কি-মন্ত্রে দ্বিপ্রহরা নিশায় উষা সমাগম হইয়াছে, তখন তিনি সন্ন্যাসীর পাদদেশে সম্ভ্রম-প্রণত হইয়া পড়িলেন।' মুখবন্ধ সমাপ্ত করিয়া জঙ্গ বাহাদুর ললিতরাগ গাহিলেন, মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া নিজ হস্তের হীরকজড়িত অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া জঙ্গ বাহাদুরের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। সভাস্থল আনন্দশব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

তারপর উঠিলেন—লক্ষ্ণৌ-এর পেয়ারা সাহেব, কাশ্মীরের চন্দনদাস, গুজরাটের মাধব মল্ল, দিল্লীর নজর খাঁ, ত্রিবাঙ্কুরের জলতরঙ্গবাদ্যের ওস্তাদ কাজী মিঞা ও নেপালের গায়কশ্রেষ্ঠ শামসের জঙ্গ। সুন্দর সিং একটী বেহাগ গাহিল। শেষে সুপর্ণা উঠিল,—এই অজ্ঞাত গায়ককে প্রথমে কেহই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই। কিন্তু সে যখন নির্ভীক প্রাণে সুকঠিন দরবারী মালকোষ গাইতে লাগিল, তখন সভাসমেত শ্রোতার দল আনন্দমোহে অভিভূত হইয়া পড়িল। জঙ্গ্ বাহাদুর নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন,—কে এই অজ্ঞাত গায়ক তাঁর সুকঠিন সুর এত সহজে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে? এ ত তাঁর কোন পরিচিত শিষ্য নয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁর কোনো অঙ্গীকারবদ্ধ শিষ্য বিশ্বাসহন্তা হইয়া অপরকে এই সুর শিখাইয়াছে! তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে অগ্নিপ্রতিম হইয়া উঠিল, তাঁহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। সেই জনতার মধ্যে তিনি শালপ্রাংশুদেহে উন্নতবক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

(৪)

মন্ত্রমুগ্ধ মহারাজ সিংহাসন ছাড়িয়া সুপর্ণার কণ্ঠে আপনার বহুমূল্য মুক্তার মালা পরাইয়া দিলেন। সমস্ত গায়কই এই অজ্ঞাতনামা তরুণ গায়কের অশেষ সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। টপ্পা, খেয়াল, ধ্রূপদ—সুপর্ণার আলোকোজ্জ্বল সঙ্গীতের কাছে সব হার মানিয়া গেল। জঙ্গ্ বাহাদুর কি প্রতিবাদ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা সেই উল্লাসতরঙ্গে জলবিন্দুবৎ মিশাইয়া গেল। অযোধ্যার একজন নবীন গায়ক জংলা-পিলুতে একটী টপ্পা গাহিলেন——

'গোরি ধীরে চালো গাগরী ছালক না যায়'——

কঠিন রাগ-রাগিণী সাধনার পর এই নৃত্যদোদুল সুরটী গায়কদের মনের ভার লঘু করিয়া দিল। আর একজন মল্লারে গাহিলেন——

'রুম ঝুম বাদরওয়া বর্ষে,'——

সুন্দর সিং ভৈরবীতে ঝঙ্কার দিয়া গাহিল——

'সুনতু গোপীচন্দ অস রাজা মঁয়ে যোগিন তেরে সাথ।'

ক্রমে ক্রমে গজল, দাদরা, ঠুংরি, সোহেনী, কাজরী, হোলি প্রভৃতি লঘুতর সুর আলাপের পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই মহারাজের সম্মুখীন হইয়া জঙ্গ্ বাহাদুর কহিলেন,—'মহারাজ, মালকোষী গায়কের পরিচয় চাই। কে তাহার গুরু তাহাও জানিতে চাই।'

সুপর্ণা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, 'আমি বৈকুণ্ঠ মিশ্রের কন্যা—শ্রীসুপর্ণা দেবী। আমার বর্ত্তমান গুরুদেব—শ্রীযুত সুন্দর সিং ভট্ট।'

জঙ্গ্ বাহাদুর ততোধিক উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া সুন্দর সিংকে দরবারী মালকোষ শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্তু আজ সে শুধু সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আবার একজন স্ত্রীলোককে এই মন্ত্রসিদ্ধ গান শিক্ষা দিয়াছে। তাঁহার দণ্ড বিধান করুন, মহারাজ!'

মহারাজা হাস্যোজ্জ্বলমুখে কহিলেন, 'শিক্ষাগ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র ভেদ নাই। গোয়ালিয়র রাজ্যের এই নীতি অনুসারে সুন্দর সিং দণ্ডনীয় নহে।'

জঙ্গ্ বাহাদুর তখন সুন্দর সিংহে বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, 'সুন্দব! আজ হইতে তুমি আর আমার কেহ নও—তোমায় আমি চিরকালের মত ত্যাগ করিলাম।'

যে গুরুমহারাজকে সুন্দর সিং দেবতার মত ভক্তি করিত, যাঁহার অনুমতি ভিন্ন জীবনে সে কোনো কাজ করিতে পারিত না, যাঁহার পূজা করাই তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল,—আজ হইতে তিনি তাঁহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছেদন করিলেন। অবশিষ্ট দুই দিনের সভায় যোগদান না করিয়া সুপর্ণাকে সঙ্গে লইয়া সুন্দর ক্ষুণ্নমনে কাশীতে ফিরিয়া আসিল।.........

সেদিন বর্ষা সন্ধ্যায় সমস্ত ধরণী যেন বিশ্বরাজের বিরহে শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আকাশ মেঘান্ধ, তৃপ্ত মনেও অতৃপ্তির হাহাকার জাগিতেছে। সুন্দর সিং একমনে সুর করিয়া কালিদাসের মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা পড়িতেছিল। 'উত্তর মেঘ' পড়িতে পড়িতে তাহার মনে একটা ঘর-ছাড়া ভাব জাগিয়া উঠিল। কোনো কাজেই মন বসে না—মন যেন কাহার পায়ের কাছে পড়িয়া সর্ব্বস্ব বিকাইতে চায়। সুন্দর সিং সেই মেঘ-মেদুর অম্বরে আপনার যাতনা প্রকাশ করিতে চায়—তাই সে গুরুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুপর্ণার নিকট প্রেমভিক্ষা করিতে আসিল।

সুপর্ণা নিজগৃহে বসিয়া একটী মসলিনের উপর কারুকার্য্য ফুটাইতেছিল। সুপর্ণার দ্বারে আসিয়া সুন্দর সিং ডাকিল, 'বন্ধু, আজ বড় কষ্টে তোমার দুয়ারে এসেছি।'

'গানের রাজা আপনি—আপনার আবার কষ্ট কিসের?'

'সুপর্ণা, মসলিনের উপর কার ছবি আঁকচ?'

'যাঁকে আমি পেয়েও হারিয়েছি—এ ছবি তাঁর। আপনার কি কষ্ট আমায় বল্‌বেন না, গুরুদেব?'

'সু! বলবার পূর্ব্বেই যে তুমি তার উত্তর দিলে!'

আমি আপনার কথা ভাল করে বুঝতে পারছি না, মহারাজ!'

'সু! আমি তোমার কাছে প্রেমভিক্ষা করতে এসেছিলাম। এসো, আমরা দুজনে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হই।'

'সে কি কথা, মহারাজ? আপনি যে আমার গুরু মহারাজ--পিতৃস্থানীয়! আমি যে বিধবা—আমার পরলোকস্থ স্বামী যে এখনো আমার হৃদয়ের পাদপীঠে তাঁর চরণকমল ন্যস্ত করে রেখেছেন! আপনি ও-কথা বলবেন না—ওতে আপনার ও আমার জীবন কলঙ্কিত হবে।'

এই দৃঢ় উক্তিতে সুন্দর সিং-এর মুখে কথা ফুটিল না। চিরপোষিত আশা ধূলিসাৎ হইলে মানুষ যেমন ক্ষোভে ও দুঃখে দিশেহারা হইয়া পড়ে, তাহারও সেই দশা হইল। সে মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিল, 'হায়, হায়! আমি গুরু মহারাজকেও হারাইলাম, তোমাকেও হারাইলাম!'

সুপর্ণা নতমুখে বসিয়া রহিল—মসলিনের উপর সযত্ন চিত্রিত তাহার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। গগনে মেঘের শব্দ, হৃদয়ে সমুদ্র-কল্লোল, নয়নে আঁধার-কালিমা,—এমন সময় সেই তিমিরসঘন বৃষ্টিসজল সন্ধ্যায় সে শুনিল—আশাহত কোনো প্রেমিক কাজরি-তে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে——

'বরসে গরজে বাদারোয়া পিয়া বিন মৈঁয়কো না সোহায়!'

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

জাপানের সামাজিক প্রথা

(৪)

পোষাক পরিচ্ছদ

পরিচ্ছদ শব্দটার ভিতরের অর্থ খুঁজিলে দেখা যায়, যাহা শরীরকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করে—ঢাকিয়া রাখে তাহারই নাম পরিচ্ছদ। শরীরকে এইরূপে আচ্ছাদিত করিবার দুইটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ শীতাতপ হইতে শরীরকে রক্ষা করা; দ্বিতীয়তঃ উহাকে অলঙ্কৃত করা—উহার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তোলা। সব দেশেই এই দুই উদ্দেশ্যে পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশীয়েরা চিরদিনই শরীরের অপেক্ষা মনের সৌন্দর্য্যেরই বেশী পক্ষপাতী। তাই বর্ত্তমানে যদিও তাঁহারা বাহিরের ধাক্কায় প্রচীনের ঠিক সেই চিরন্তন আদর্শটী

আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তবুও দীর্ঘদিনের সংস্কারের ফলে সমাজের স্তরে স্তরে সেইভাব জমিয়া রহিয়াছে বলিয়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশে পরিচ্ছদের বিলাসিতা অনেক কম দেখিতে পাই। ইহা অবশ্য খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাপানীরা পোষাক পরিচ্ছদের বিষয়ে অতন্ত বিলাসী। যাহা হউক, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এবার কিছু বলিতে চাই।

জাপানীদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে গোড়ায় কথা উঠে তাহার শ্রেণী বিভাগ লইয়া। এদেশে ধুতি-চাদর যেমন প্রাচীনকাল হইতে দেশীয় পরিচ্ছদ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে, আমাদের দেশেও সেইরূপ "কিমোনো" বলিয়া এক রকমের দেশীয় পরিচ্ছদের চলন আছে। অবশ্য সেই প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জাপানীদের পোষাক পরিচ্ছদের আকার প্রকার যে একই রকম আছে তাহা নহে ; যুগে যুগে দেশের অবস্থা ও সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও আকার গ্রহণ করিয়াছে।* কিন্তু শেষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রথম পরিচিত হইল, তখন তাহারা এই সভ্যতার মধ্যে স্বদেশের উন্নতির পক্ষে যাহা কিছু অনুকূল দেখিতে পাইল, তাহাই জাতীয়তার কুসংস্কারকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময়ে জাপানের পুরুষেরা কাজকর্ম্মের পক্ষে ইউরোপীয় পরিচ্ছদের সুবিধা বুঝিয়া তাহাও গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না। ইহার ফলে আজকাল আমাদের দেশের সর্ব্ববিধ কর্ম্মস্থলে, এমন কি বিদ্যালয়গুলিতে পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ইয়োরোপীয় কোট-প্যান্‌টুলানেরই চলন হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য আজকাল জাপানের উচ্চ ও মধ্যমশ্রেণীর লোকেরা দেশীয় ও পাশ্চাত্যভেদে অন্ততঃপক্ষে দুই শ্রেণীর দুই প্রস্থ পরিচ্ছদ রাখিতে বাধ্য হন। ইহা বেশ একটু ব্যয়সাধ্য বিষয়।

এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান বলিয়া সামাজিকতার প্রয়োজন ছাড়া একখানা ধুতিতেও সারা বৎসর চালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু জাপান শীতপ্রধান, তাই সেখানে কেবল এক রকম কাপড়ে সারা বৎসর কাটে না ; ঋতু অনুসারে পরিচ্ছদের বদল হয়। অন্যান্য দেশে যেমন বাড়ীতে পরিবার ও বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, জাপানেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে যেমন আটপৌরে ও পোষাকী কাপড়, জাপানে সেইরূপ "টুনেগ্রি" বা "উচিগ্রি" এবং "ইয়োসোইকি নো কিমোনো"। টুনেগ্রির "টুনে" অর্থে সর্ব্বদা এবং "গ্রি" বলিতে কাপড় বুঝায়। ইহারই নামান্তর "উচিগ্রি"। এখানে "উচি" অর্থে ভিতর এবং "গ্রি" বলিতে পূর্ব্বের মত কাপড় বুঝাইতেছে। ইহাই জাপানের আটপৌরে কাপড়। এগুলি সাধারণতঃ কার্পাস ও পাটের সূতায় তৈয়ারী হয়। এবার ইয়োসোইকি-নো-কিমোনোই যে জাপানের পোষাকী কাপড় তাহা দেখাইতেছি। ইয়োসোইকি-নো অর্থে বাহিরে যাইবার আর কিমোনো বলিতে পরিচ্ছদ, অর্থাৎ বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ। এই শ্রেণীর পরিচ্ছদগুলি নানাবিধ রেশমের

সূতায় তৈয়ারী হয়। এগুলি বেশ মূল্যবান; বিশেষতঃ মহিলাদের পরিচ্ছদের মূল্য আরও বেশী। ন্যূন পক্ষে একখানির মূল্য ৭৫৲ টাকার কম নহে। এইতো পোষাক-পরিচ্ছদের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হইল। অবশ্য ইহা ছাড়াও অন্য সব দেশের মত জাপানেও যে স্ত্রী পুরুষভেদে পরিচ্ছদের ভেদ আছে; ইহা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।

সব দেশের পোষাক-পরিচ্ছদের আকার একরূপ নহে। দেশভেদে আকার ভেদ দেখা যায়। কাজে কাজেই এখন জাপানীদের পোষাক-পরিচ্ছদের আকার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। কিন্তু আসল জিনিস চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরা বা ছবি আঁকিয়া দেখাইয়া দেওয়া ছাড়া কোন কিছুর আকার বা গঠনপ্রণালী বোঝান বড়ই কঠিন। অথচ এখন এদুইটীর কোনটীরই সুযোগ-সুবিধা হাতের কাছে মিলিতেছে না। কাজেই যতটুকু পারি এখন কথার চিত্রে আঁকিয়া দেখাইতেছি।

কলিকাতার অনেকেই ঠাকুরপরিবারের লোকদিগকে সাধারণ পরিচ্ছদের উপরে "জোব্বা" বলিয়া একরকমের লম্বা গাউন পরিতে দেখিয়া থাকিবেন। আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ "কিমোনো"ও কতকটা এই ধরণের। জোব্বার হাতা ঠিক্ জামার হাতার মতই আঁটসাট; কিন্তু আমাদের কিমোনোগুলির হাতা এখানকার পাঞ্জাবী জামার হাতার চেয়েও অনেক বেশী ঢল্‌ঢলে—এমন কি সেই অংশটা মাপিলে লম্বায় প্রায় এক হাত হইবে। এখন আপনারা এদেশী জোব্বার গায়ে ঐ ধরণের লম্বা হাতা জুড়িয়া দিয়া মনে মনে একটা ছবি আঁকিয়া দেখিয়া লউন জাপানীদের কিমোনোর ঢংটী কিরূপ। তবে এখানে একটা কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখা দরকার যে, কিমোনোর ঐ লম্বা হাতার মুখগুলির নীচের দিক্ হইতে অর্দ্ধেকের বেশী অংশই সেলাই করা। হাতার এই সেলাই করা কাপড়ের ভাজটীর মধ্যে কিছু কিছু জিনিসপত্র বেশ রাখা যায়। এইজন্য যদিও আমাদের কিমোনোগুলিতে পকেট বলিয়া কিছুই নাই, তাহা হইলেও আমরা পকেটের সুযোগ-সুবিধা হইতে এতটুকুও বঞ্চিত হই নাই; বরং তাহা দ্বিগুণই উপভোগ করিতেছি। তাই আমার এদেশী বন্ধুগণ সময়ে সময়ে আমার কিমোনোর পকেটকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টাচ্ছলে মন্তব্য প্রকাশ করেন—"আপনার পকেট যে দেখিতেছি আমাদের পকেটের একেবারে রাজসংস্করণ!" স্ত্রী-পুরুষভেদে এই কিমোনোগুলির আকারের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না; কেবল মহিলাদের হাতা পুরুষদের অপেক্ষা আরও কিছু ঝোলা হইয়া থাকে; এবং ইহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যও কিছু বাড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া, পুরুষদের কিমোনোগুলি তৈয়ারী করিতে নানাবিধ ছিটের কাপড়ের ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ছবি-আঁকা কাপড়গুলি পুরুষদের কিমোনোয় একেবারে অচল; উহা কেবল রমণীদেরই পরিচ্ছদের সৌষ্ঠব বাড়াইয়া তুলে।

এতক্ষণ ধরিয়া আমি কেবল আমাদের প্রধান পরিচ্ছদ কিমোনোর কথাই বলিলাম; কিন্তু ইহার সঙ্গে অন্য যে সব পরিধেয় রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এইবার কোন ঋতুতে কি কি পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয় এই প্রসঙ্গে সেই কথাটা নীচে বলিতেছি।

এদেশের আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র—বর্ষার এই তিন মাস আমাদের দেশের গ্রীষ্মকাল। এই সময়ে আমরা "ষ্টোয়েমনো" বলিয়া একরকমের পাতলা কাপড়ের কিমোনো ব্যবহার করি। এগুলি তুলা, পাট, রেশম অথবা পশমের সূতায় তৈয়ারী হইতে পারে। আমার এই কথায় আপনারা যেন কেহ মনে না করেন যে, গ্রীষ্মকালটী আমরা শুধু একখানি পাতলা কাপড়ের কিমোনো গায়ে জড়াইয়া কাটাইয়া দেই। কিন্তু এই কিমোনোর নীচে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। গলদেশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত তাঁহারা "হাদাজি" বলিয়া একরকমের গেঞ্জি পরিধান করেন; এবং এই কটিদেশের নীচে পুরুষেরা সাধারণতঃ Half Pant এর চেয়েও একরকমের ছোট্ট প্যাণ্ট আর—স্ত্রীরা লুঙ্গী ব্যবহার করেন। পুরুষেরা যে ধরণের ছোট্ট প্যাণ্ট ব্যবহার করেন, তাহা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখি না। তাঁহারা ইহার বদলে কখন কখন কৌপীন অথবা একখানা লম্বা সরু ধুতি কৌপীনের মত জড়াইয়া পরিয়া থাকেন। ভিতরের এই পরিচ্ছদগুলির উপরই সব সময় কিমোনো পরা হইয়া থাকে। কিন্তু এগুলি তো কেবল আলখেল্লার মত গায়ে ঝুলাইয়া রাখিলেই হইবে না—বেশ করিয়া শরীরের সহিত আঁটিয়া দিতে হইবে। অথচ জামার মত ইহার না আছে সর্ব্বাঙ্গে বোতাম যে মুহূর্ত্তে সেগুলিকে টানিয়া বোতাম ঘরায় ঢুকাইয়া দিলেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। কাজেই কিমোনোর ডানদিক্‌টা বামদিকের নীচে রাখিয়া একখানা অতিরিক্ত কাপড় দিয়া বেশ করিয়া কটিদেশে জড়াইয়া জড়াইয়া আঁটিয়া বাঁধিতে হইবে। বাঁধিবার এই কাপড়ের নাম হইতেছে আমাদের দেশের ভাষায় "অবি"—পুরুষদের অবি-গুলি লম্বায়-চওড়ায় দেখিতে ঠিক্ এদেশের চাদরের মত। স্ত্রীদের অবিগুলি কিন্তু একটু অন্যধরণের; এগুলি লম্বায় আট-দশ হাত হইলেও চওড়ায় কিন্তু আধ হাতের বেশী নয়; আর এগুলি এমন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী হয় যে, কতকটা পুরু চামড়ার মতই শক্ত হইয়া উঠে। স্ত্রীদের কটিদেশে ইহা দুই তিন ফেরা জড়াইয়া বাকী অংশটুকু পিছন দিকে গুটাইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মহিলাদের এই অবিগুলি বেশ মূল্যবান।

কিমোনো আর তাহার নীচেকার পরিচ্ছদের কথা বলা হইল। কিন্তু ইহা ছাড়াও সামাজিক-ভাবে কোথাও যাতায়াত করিতে হইলে ঠিক্ এদেশের চাদরের মত এই কিমোনোর উপরে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই "হাওরি" বলিয়া এক রকমের গাউন ব্যবহার করেন। এগুলির আকার প্রকার কতকটা কিমোনোরই মত—কেবল লম্বায় কিছু খাট। আর কেবল পুরুষেরা এই হাওরি ছাড়াও সামাজিকতার ক্ষেত্রে "হাকামা" বলিয়া আর এক রকমের জিনিস ব্যবহার করেন। এগুলি দেখিতে কতকটা ইয়োরোপীয়ান স্ত্রীদিগের কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়া গাউনের মত।

আমি যখন প্রথম এই কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত-কলেজে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পড়িতেছিলাম,

তখন প্রত্যহ এই কিমোনোর উপর হাওরি ও হাকামা পরিয়া তথায় যাইতাম। একদিন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ আমাকে এই দেশীয় পরিচ্ছদে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঃ কিমুরা সাহেব, বড় সুন্দর পরিচ্ছদ! আপনাকে আপনাদের এই দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে আমার মনে হয় যেন ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ আপনাতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাওরি-আচ্ছাদিত আপনার পৃষ্ঠদেশ যেন হিমালয়; আর সম্মুখের দিকে ছড়িয়ে পড়া ঐ হাকামা যেন ভারতের চরণচুম্বী মহাসমুদ্র!" এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য পণ্ডিতেরাও হাসিলেন—আমিও হাসিলাম।

গ্রীষ্ম ঋতুর পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা করিতেছিলাম। সেই প্রসঙ্গে আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় পরিধেয়, সকলেরই কথা বলা শেষ হইয়া গেল। এবার বাকী ঋতু কয়টার সম্বন্ধে অল্প দুই-চারি কথা বলিয়া আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই।

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ছয়মাস জাপানের শীতকাল। এই সময়ে সেখানে মোটা কাপড়ের পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয়। মোটা কাপড় বলিতে প্রধানতঃ দুইখানি পুরু কাপড়ের ভাঁজে তুলা দিয়া তৈয়ারী করা গরম কাপড় বুঝায়। আমাদের দেশের এই তুলাগুলি বড় সুন্দর! ভিতরে সেলাই না থাকিলেও বহুদিনের ব্যবহারেও তুলাগুলি সরিয়া এক স্থানে চাপ বাঁধে না। ইহার নাম "ওয়াতাইরে"; ওয়াতা বলিতে তুলা, আর ইরে অর্থে দেওয়া, অর্থাৎ তুলা দেওয়া কাপড় বুঝায়। শীতকালে যে হাওরি ব্যবহার করা হয়, তাহাও গ্রীষ্মকালের মত অত পাতলা কাপড়ের নহে; কিন্তু দুইখানি পুরু কাপড় একত্র করিয়া তৈয়ারী হয়। পুরুষদের হাকামাগুলিতেও এই সময়ে একটু পুরু কাপড় ব্যবহার করা হয়।

শীত ও গ্রীষ্ম ছাড়া হেমন্ত ও বসন্তের শীতাতপ সমান বলিয়া এই উভয় ঋতুতে একই ধরণের পরিচ্ছদ ব্যবহারের প্রথা আছে। এই সকল "আওয়াসে" বলিয়া দুইখানি পুরু কাপড় একত্র করিয়া তৈয়ারী করা কিমোনো ব্যবহার করা হয়। এই সময়ের হাওরিগুলিও একখানি মাত্র পুরু কাপড়ে তৈয়ারী হয়।

ইহা ছাড়া শিরোস্ত্রাণ ও পাদুকা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তাহা আগামীবারে চেষ্টা করিয়া দেখিব।

শ্রী আর, কিমুরা

আমাদের "ন্যাশনালিজ্‌ম্"

আমাদের দেশে কস্মিন্ কালেও "জাতীয়তা" (Nationalism) ব'লে একটা জিনিস ছিল না। থাকার দরকারও ছিল না—এখনও আছে কি না সন্দেহ এবং ভবিষ্যতে থাকবে না সেটাও নিশ্চিত। ইউরোপের ভালমন্দ আর দশটা জিনিসের সঙ্গে এই "জাতীয়তার অনুভূতি" নামক অপূর্ব্ব পদার্থটিও এসেছে। ভারতের সমাজ যে ভাবে গঠিত ছিল, তাতে জাতীয়তার কথা ছিল না—তার প্রয়োজনও হয় নি।

অবশ্য ভারতের বিরাট একত্বের অনুভূতি আমাদের সভ্যতার ভিতর নানাদিক দিয়ে ফুটে উঠেছে। ভারতের চতুঃসীমা নির্দ্দেশক তীর্থস্থানগুলির অবস্থিতি, গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরী প্রভৃতি নদীর বন্দনা প্রভৃতি হ'তে বেশ বোঝা যায়, এই মহাদেশের বিচিত্র বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে কেমন একটা সাধনার যোগাযোগ ছিল। সে সাধনার মধ্যে আত্মার মুক্তিকামনা মানুষের চরম লক্ষ্য ছিল—এবং আর সমস্তই তার অনুবর্ত্তী ব'লে মনে ক'রে নেওয়া হ'ত।

"ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥"

—"কুলের জন্য একেকে ত্যাগ করবে, গ্রামের জন্য কুল ত্যাগ করবে, জনপদের জন্য গ্রাম ত্যাগ করবে এবং আত্মার্থে পৃথিবী ত্যাগ করবে।"

ত্যাগের এই ক্রমান্বয়তার মধ্যে একটা মহান্ উদারভাব আছে, কিন্তু ইউরোপের আজকালকার জাতীয়তার বদ্ গন্ধ তাতে ছিল না। প্রতাপাদিত্য বা প্রতাপাদিত্যের যে স্বদেশপ্রেম সেটা কুলগত মর্য্যাদারক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা; অথবা স্থানীয় ব্যক্তিগত রাজ্যরক্ষণে দুর্লভ বীরত্বের পরিচায়ক মাত্র। শিবাজী বা রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্য কোনও জাতিগত আদর্শের উপর স্থাপিত হয় নি। শিবাজীর সাম্রাজ্যগঠনের মূলে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা থাকলেও—ভারতীয়ত্ব ছিল না। এবং সে রাজ্য টেঁকে নি—কেন না সে সময়কার ভারত শুধু হিন্দু-ভারত নয়, সেটা মুসলমানেরও ভারত হ'য়ে পড়ে ছিল। তাই মনে হয় জাতীয়তার ভাব কোনও দিনই ভারতবর্ষে ছিল না। এখনও সে ভাব জোর ক'রে চাপালে ভারতীয় জীবনের আদর্শের সঙ্গে খাপ খাবে কি না সন্দেহ। তাই রাজনীতির খবর ভারত রাখে না—তার জীবনপ্রণালী স্বতন্ত্র ধারায় এতদিন বয়ে এসেছে।

ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র। আত্মঅভাবপূরণক্ষম পরিবার এবং তদনুরূপ গ্রাম (Self-contained homes and self contained village communities) সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনে ভারতীয় সভ্যতার অমৃতময় ফলরূপে মানবের জটিল জীবন-সমস্যার এক সুন্দর সমাধান ক'রে গেছে। এই সকল ছোট ছোট গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রে সকলজাতি বাস ক'রত, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রামের মোড়ল থাকত, এবং সমস্ত জমি সাধারণভাবে

গ্রামের সম্পত্তি ব'লে পরিগণিত হ'ত। স্থানীয় অভাব অভিযোগ সমস্তই গ্রামের পঞ্চায়েত সভা হ'তে মীমাংসিত হ'ত। এইরূপ দশখানি গ্রামের উপর একজন, একশ খানির উপর আর একজন হাজার খানির উপর আর একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকতেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে গ্রামের সঙ্গে বাইরের কোনও সংস্রব ছিল না—রাজার প্রাপ্য খাজনা মোড়লের হাত দিয়ে পৌঁছুলেই তিনি রাজধানীতে নিশ্চিন্ত থাকতেন এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রজাগণকে রক্ষার উপায় করতেন।

গ্রাম্য জনসাধারণের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের প্রতিপালনেই সাধারণের অভাব দূর হ'য়ে যেতো। ধর্ম্মশালা স্থাপন, পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ, বৃষোৎসর্গ, মুষ্টি ভিক্ষাদান, অতিথিসেবা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকাজ লোকে স্বেচ্ছায় কর্‌তো, কারও উপর জোর জবরদস্তি ছিল না, অথচ বিনাকষ্টে সমাজের সমস্ত সাধারণ অভাব দূর হ'য়ে যেতো। রাজ্যবিপ্লব হ'লেও এই সকল সাধারণ-তন্ত্র অক্ষয় থেকে ভারতীয় সভ্যতাকে বজায় রাখতো। আজও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে এই সকল গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রের বিকৃত নিদর্শন বর্ত্তমান রয়েছে।

রুশিয়ার সমাজ-বিপ্লব আজ যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার অভিমুখে যাচ্ছে, ভারতে তদনুরূপ আদর্শ সমাজ-জীবনে বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই—প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। সমগ্র জগতেই আবার সেই আদর্শকে নবযুগের উপযোগী ক'রে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে। না হ'লে মানুষের শান্তি নেই।

এখন সমাজে এত বিরোধ, দুঃখদারিদ্র্য, অশান্তি কেন? আমি যেটি হ'তে চাই, সমাজ আমায় তা হ'তে দেয় না। আমার কবিত্বশক্তি থাকতে আমায় ব্যবসাদার হ'তে হয়, আবার হয়তো চিত্রকর যে তাকে উপবাসে কাটাতে হয়। আদর্শ-সমাজে এই হবে—যে আমি আমার ভগবদ্দত্ত শক্তির স্ফুরণে সমাজকে সেবা করবো—সমাজ আমার ভিতরের অভাব বাইরের অভাব তার হাতে যতটা ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে দূর করবে। যোগ্যতার মাপ কাঠিতে প্রয়োজনানুসারে দেওয়া-নেওয়া চালিত হ'বে। পরস্পরের শুধু দৈহিক অভাব নয়, অন্তরের অভাবপূরণেও সমাজের শক্তি চালিত হবে। তবে আমার আত্মার প্রস্ফুটনের জন্য, আমার জীবনের চরম সুখের জন্য,—এই সমাজ, ইহা আমার উপলব্ধি হবে। এইখানেই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ঝগড়া মিটে যাবে। এক লক্ষ্য অভিমুখী সহযোগিতার ধারায় সমাধা দেহ শীতল হবে—শান্তির পূর্ণতায়, প্রেমের সফলতায় বন্ধন তখন মুক্তির সহায়ক হবে—শাসন তখন আদরের বস্তু হবে।

এই আদর্শ জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ইউরোপের আমদানী "ন্যাশনালিজ্‌ম্" এবং তারই সহচর "পেট্রিয়টিজ্‌ম্"এর ভূত আমাদের ঘাড় থেকে মেরে ফেল্‌তে হবে। মস্ত মস্ত পার্লামেণ্ট, চেম্বার, সেনেট—এই সমস্ত চোখের সামনে রেখে—আমরা ভারতকে উদ্ধার করতে চাই। ভারত কিন্তু তাতে উদ্ধার হবে না। যাকে "গবর্ণমেণ্ট" বলা হয়—যে রাষ্ট্রীয় প্রণালীতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুবিধার জন্যই যেন সব প্রচেষ্টা,—তাকে যথাশীঘ্র আমুল পরিবর্ত্তন করতে হবে। এই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে জগতকে নতুন এক আদর্শ দেওয়ার প্রয়োজন আজ বিশেষ-রূপে হয়েছে। ইউরোপের সভ্যতা দেউলে হ'য়ে পড়েছে। ভারতের যুগ যুগান্তরের সাধনা-লব্ধ কালের আজ এক সার্থকতার সুযোগ এসেছে। এই নতুন আদর্শকে রূপ দিতে ভারতীয় সাধকের ডাক পড়েছে। সেই ডাকের সাড়ায় আজ চারিদিকে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। আমাদের মুক্তি এই সাধনার সিদ্ধিলাভে।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

পুরাতন কলিকাতা

(১৮২৪ খৃঃ অঃ)

চিত্রশিল্পী—জেম্‌স্ ফ্রেজার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বটানিক্যাল গার্ডেন

ট্যাঙ্ক স্কোয়ার (বর্ত্তমান ডালহৌসী স্কোয়ার)

স্কচ গির্জ্জা

গঙ্গায় ঝড় (সালকিয়া)
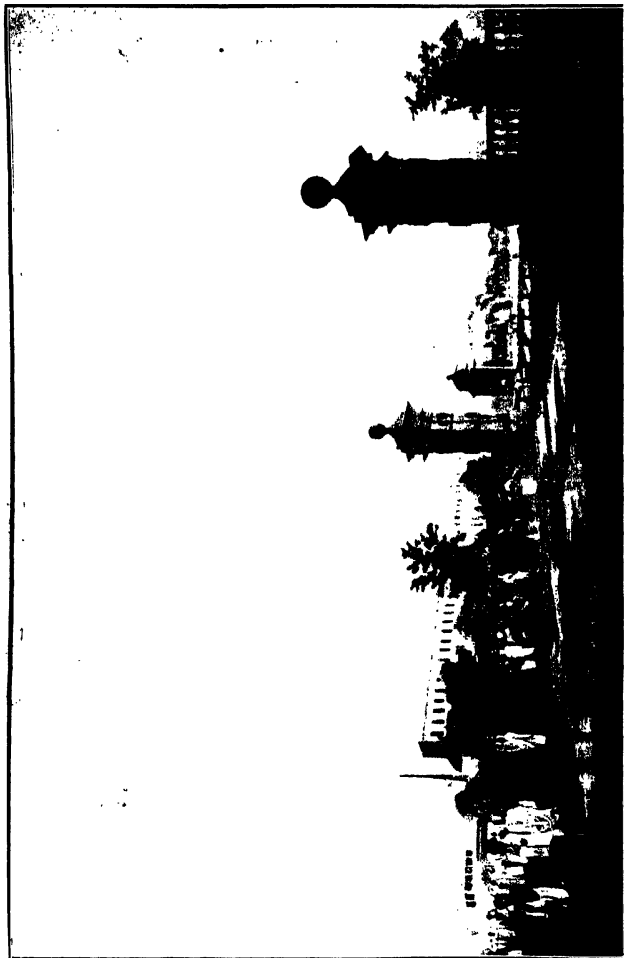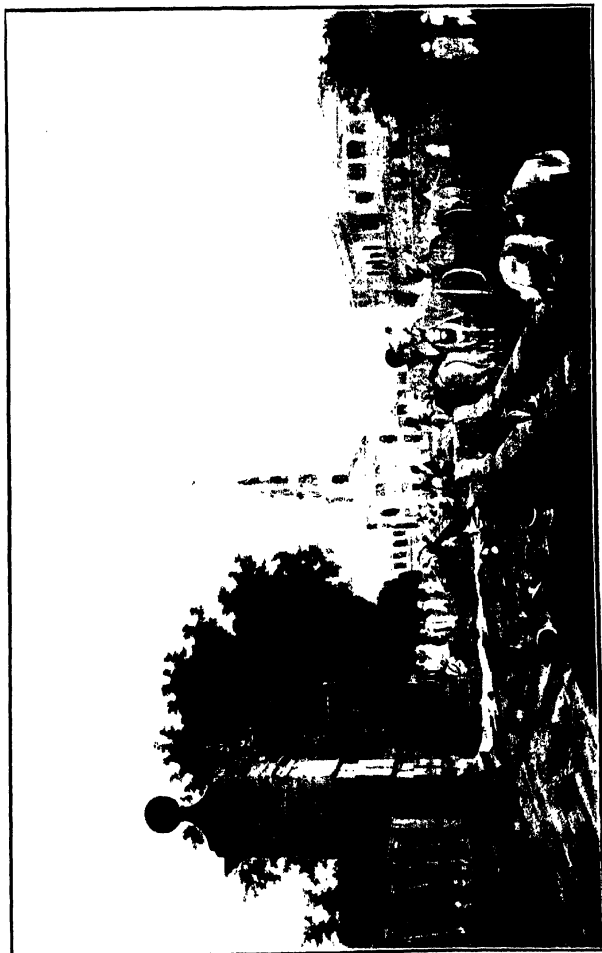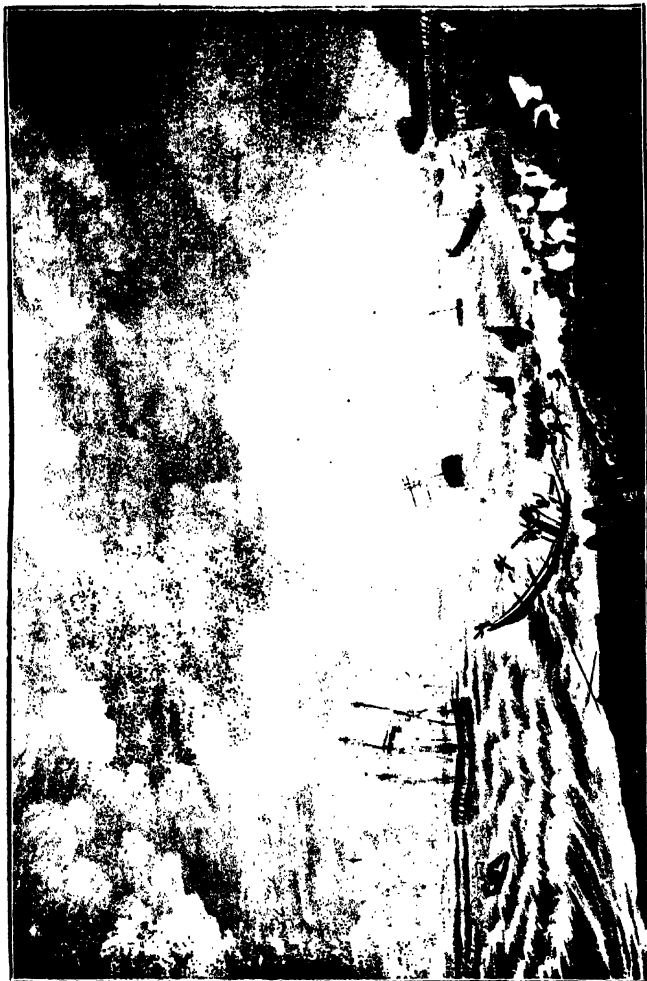
জর্ম্মানি

অভিরাম রাইন উপত্যকা দেখলাম। বাস্তবিকই অনুপম শোভা। গত বৎসর সুইট্জরল্যাণ্ডের জমকাল সৌন্দর্য্য দেখে মনে হয়েছিল যে য়ুরোপের আর কোনও শোভা কি আর এর পরে মনে পুলকশিহরণ জাগাতে পার্ব্বে? কিন্তু দুধারের পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে ষ্টীমারে চড়ে যখন রাইন নদীবক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েও দৃশ্যের সৌন্দর্য্য কম প্রীতিকর মনে হ'ল না, তখন উপলব্ধি কর্লাম যে, প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যেটা অন্য দেশের নৈসর্গিক শোভার মধ্যে নাই। তাই মনে হ'ল যে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখা উপভোগের দিক্ দিয়ে ব্যর্থ হ'তে পারে না। বাইরণ সুইট্জরল্যাণ্ডকে অবশ্য খুবই উচ্চস্থান দিয়াছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন :—

He who hath lov'd not—here would learn that love. কিন্তু তিনি রাইন উপত্যকার মোহিনীশক্তিতেও বড় কম মোহিত ও উচ্ছ্বসিত হ'ন নাই। এর শোভা সম্বন্ধে তিনি দুই ছত্রে যতখানি ভাব প্রকাশ করেছিলেন আমি দুই পৃষ্ঠাতেও ততটা প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্ব না বলে সেই দুই ছত্র উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ কর্ত্তে পার্লাম না।

"There can be no farewell to scenes like thine
The mind is colour'd by thy every line."

তারপর অবিচ্ছেদে চারমাস বিখ্যাত বার্লিন সহরে কাটান গেছে, যার ঐতিহাসিক গরিমার কথা এতদিন পড়েই এসেছি। তবে রাইনের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্যের পর বিরাট্ কলকারখানাময় কোলাহল-মুখর রাজধানীর জীবন যে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হবে না এত জানা কথা; বিশেষতঃ যখন যুদ্ধের শেষ হ'লেও শান্তি আরম্ভ হয় নাই। সর্ব্বত্রই জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য, এই অনুযোগ শুনি। বিলাতি পাউণ্ডের দাম এখন খুব বেশি বলে আমাদের কাছে জিনিষপত্র ইংলণ্ডের তুলনায় 'আক্রা' না হ'য়ে বরং সস্তাই হ'য়ে দাঁড়ায়; কিন্তু এদেশবাসীর কষ্টের কথা কাগজপত্রে পড়ে ও লোক-জনের মুখে শুনে একটু ব্যথা বোধ না করেই পারা যায় না। বিশেষতঃ যখন যুদ্ধের আগে এখানে জীবন কিরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল, সে বিবরণ লোকমুখে শুনি, তখন সে স্মৃতির ভার যে এদের বর্ত্তমান দৈন্য-দুর্দ্দশাকে আরও কত বেশি দুঃসহ করে তুলেছে তা কল্পনা করে এদের সঙ্গে একটু সমবেদনা প্রকাশ না করেই পারা যায় না। মানুষের অধিকাংশ দুঃখের গুরুত্বই তুলনায় বেশি কম বোধ হয়ে থাকে। তাই এদের বর্ত্তমান দুঃখ যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়।

তাছাড়া নিতান্ত স্থূল কষ্টটাও যে এদেশে খুব বেশি হয়ে পড়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। একটা ইংরাজী সাপ্তাহিক পড়ছিলাম; তাতে লিখেছে, যে জার্ম্মাণীর ধ্বংসসাধন করা একটু কঠিন; কিন্তু আমরা সকলে মিলে তাকে প্রায় শ্বাসকষ্টের কাছাকাছি এনে ফেলেছি। কিন্তু যুদ্ধে হারা,

ও বর্ত্তমান জীবনের স্থূল গুরুভার সত্ত্বেও এ জাতিটার নিরুপদ্রবে কাজকর্ম্ম চালানর ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য্য না হয়েই পারা যায় না। আইন-অনুবর্ত্তনটা এ জাতির এতই মজ্জাগত, যে রাজতন্ত্র থেকে শাসনপদ্ধতি সাধারণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠারূপ রাষ্ট্রবিপ্লবটাও এরা একরকম বিনা রক্তপাতে করে ফেলেছে বল্‌লেই চলে। এরা দৈহিক পরিশ্রম কর্ত্তে পারেও অসাধারণ। এক মস্ত পোলাণ্ড-দেশীয় পিয়ানোবাদক তাঁর বাড়ীতে একটি সান্ধ্য পার্টিতে আমাকে বলেছিলেন "You may hate the Germans but you can't help admiring them all the same." বলা বাহুল্য ইনি জার্ম্মাণজাতির প্রতি বড় সদয় নন, তাই এঁর প্রশংসার একটু দাম আছে। য়ুরোপে জনসাধারণের কলের মত নিরাপত্তিতে অসাধারণ পরিশ্রম করার অভ্যাস দেখে আমার মনে হ'ল যে "Why should life all labour be ?" একথা য়ুরোপীয় কবির মুখে ঠিক্ খাপ খায় নাই। এ ভাবটা প্রাচ্যেরই মজ্জাগত। এরা, অর্থাৎ প্রতীচ্য, কাজের চাপে এ সব "Vanity, vanity, all is vanity" রূপ চিন্তার দায় হতে অব্যাহতি পেয়েছে।

মিলিত শক্তি (Entente) জার্ম্মানিকে এখন কামধেনুতে পরিণত কর্ত্তে এতই ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন যে কামধেনুটি অকালে ধেনুলীলা সংবরণ কর্লে যে দোহন কার্য্যটি স্থগিত রাখতে হতে পারে, সে কথা তাঁরা বড় ভাব্‌ছেন না,—অন্ততঃ ফরাসীজাতি ত নয়ই। ফ্রান্সের এতবড় নৈতিক অবনতি বোধ হয় চতুর্দ্দশ লুই-এর সময়েও হয় নাই। ইংরাজজাতি অপরজাতির সঙ্গে ব্যবহারে উচ্চহৃদয় না হ'লেও প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে নিজের স্বার্থ একেবারে ভোলে না। তাই Maynard Keynes মহোদয় "ভার্সেই'র" সন্ধিসভা থেকে অপসৃত হয়ে তাঁর Economic Consequences of peace নামে জগৎ প্রসিদ্ধ বইখানিতে যখন প্রতিপন্ন কর্ত্তে চেষ্টা করেন, যে এই অন্ধ প্রতি-হিংসা লালসা আত্মহত্যারই সামিল, তখন ইংলণ্ডে তাঁর বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন উঠ্‌লেও তাঁর কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে ইংরাজের চোখ আজ অনেকটা খুলেছে। ফল হয়েছে এই যে জার্ম্মাণিকে দমন কর্ব্বার জন্য ফ্রান্স যা কর্চ্ছে, তাতে ইংলণ্ড সর্ব্বদা সায় দিচ্ছে না, এমন কি সাইলিসিয়া-বণ্টন, রুরখনি-অধিকার প্রভৃতির বিপক্ষে official ইংলণ্ডও অর্দ্ধস্বগতঃ ভাবে "না" বলে ফেলেছে। সম্প্রতি জর্ম্মান ও ফরাসী সচিব-সম্প্রদায় থেকে Rathenau ও Loncheur বলে দুই মন্ত্রীতে মিলে ফ্রান্সের বিনষ্ট জনপদের পুনর্নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে যে আপোষে মিট্‌মাট করে ফেলেছেন, সে রকমটা নাকি ফ্রান্সের ধাতে সয় না, যেহেতু ফ্রান্স বোঝে কেবল পাশব বল ; আর এ বন্দোবস্তটা পাশব বল ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হয়েছে। অন্ততঃ ইংরাজী liberal কাগজপত্রে এই রকম সমালোচনাই দেখা যায়। তাই মনে হয় যে, যে জাতি "স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রী"র পতাকা উড়িয়েছিল, এখনকার ফরাসীজাতি কি সেই জাতির বংশধর ? রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর প্রতি ব্যবহারে ফ্রান্স আজ যে নীচতার পরিচয় দিয়েছে, তা যে ফরাসীজাতিতে সম্ভব, তা কল্পনা করা একটু শক্ত। মহামতি Bertrand Russel মহোদয় লিখেছেন যে ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইংরাজজাতি ফরাসীজাতিকে

জগৎ-জয় কর্ত্তে বাধা দিয়ে খুব ভুল করেছিল, কারণ ফরাসীজাতি তখন যদি জগজ্জয়ী হ'ত, তাহলে সেটা জগতের পক্ষে মোটের উপর লাভ হ'ত। কারণ ফরাসীবিপ্লব দাঁড়িয়েছিল অভ্রভেদী আদর্শের জন্য, এবং যেখানেই ফরাসী সৈন্য গিয়েছিল সেখানেই জনসাধারণ তাদের মুক্তিদাতা বলে অর্চ্চনা করেছিল,—কেবল উৎপীড়ক জমিদার সম্প্রদায় ছাড়া।* ফরাসীজাতি তার দিগ্বিজয়ে কৃতকার্য্য হলে মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে জমাখরচের খাতায় লোকসানের চেয়ে লাভ বেশী থেকে যেত কি না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু ফরাসীজাতি যে তাদের আদর্শবাদের প্রভাবে জগৎকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাসেল মহোদয় বল্‌ছেন যে ঐ সময়ে ফরাসী দিগ্বিজয়ের মনস্তত্ত্বটা ছিল জগতের ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রম। অর্থাৎ জগতের ইতিহাসে আর কখনও একটা সমগ্র জাতিকে অশিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কর্ত্তে দেখা যায় নাই। অনুগতপ্রাণ মানুষ, যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আইডিয়ার জন্য এত উঁচুতে উঠ্‌তে পারে, এ ঘটনাটি বাস্তবিকই মহিমময়। তাই বিগতযুগের প্রতীচ্যচিন্তাজগতের নেতা ফরাসীজাতির বর্ত্তমান নিষ্ঠুরতা ও সঙ্কীর্ণতা দেখে দুঃখ হয়। এখানে আমি এমন কথাও কোনও শিক্ষিতা মহিলার মুখে শুনেছি, যে ফ্রান্সের নির্দ্দয় অত্যাচারের স্রোত যে ভাবে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে (এ যুদ্ধ সম্বন্ধে সকলেই স্থিরনিশ্চিত) তাতে যদি জার্ম্মাণী জয়ী হয়, তবে ফরাসীজাতির নাম জগতের মানচিত্র হতে মুছে ফেলা হবে। আমি গতবৎসরে পারিসে এক প্রফেসরের অতিথি হয়েছিলাম। তিনি আমাকে বল্‌তেন যে, যুদ্ধের শেষভাগটা তাঁরা যে যুদ্ধ কর্ত্তে মনকে রাজী করেছিলেন, সে কেবল এই বীজমন্ত্র জপ করে, যে "It is the War to end all wars". আজ সে কাতর আশার স্থান কোথায়? আমাকে এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা একদিন বলেন যে, যদি আমি পারিসে যাই তাহ'লে তিনি পারিসে তাঁর অনেকগুলি ফরাসী বন্ধু ও বান্ধবীর কাছে আমাকে সুপারিশে পরিচয় করে দেবেন, যাঁদের কাছে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোনও জার্ম্মাণকে পাঠাতে সাহস করেন না। এ আক্ষেপটি সামান্য নয়। যুদ্ধের সময়ের কথা বোঝা যায়; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ দুবৎসর, অথচ ফরাসীজাতির মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রায় সমানই প্রবল আছে। ফলে তারা শুধু যে জার্ম্মানিকে নিষ্পিষ্ট করে অজস্র অর্থরূপ ক্ষতিপূরণ নিয়েই ক্ষান্ত তা নয়, ফরাসী সৈন্য অধিকৃত জার্ম্মাণজনপদে তারা অধিবাসীদের সঙ্গে নানারূপ দুর্ব্ব্যবহার করে থাকে,—যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার শান্তির সময়ে এক স্বাধীন জাতি অন্য এক স্বাধীন জাতির প্রতি কর্ত্তে সাহস করে না। শুধু জার্ম্মাণ কাগজে নয় ইংরাজী কাগজপত্রেও পড়েছি এবং অধিকৃত

* "If revolutionary France could have conquered the continent and Great Britain, the world now be happier, more civilized and more free as well as more peaceful. * * * But revolutionary France was quite an exceptional case, because its early conquests were made in the name of liberty, against tyrants not against peoples; and everywhere the French armies were welcomed as liberators, by all axcept rulers and bigots." ...Principles of Social Reconstruction.

নগরগুলিতে স্বচক্ষে দেখেছি, যে ভাল ভাল বিস্তর প্রাসাদ ও অট্টালিকা ফরাসীসৈন্যেরা নির্ব্বিচারে ব্যারাকস্বরূপে ব্যবহার কচ্ছে। তার উপর পড়লাম যে, তারা নাকি ভাল হোটেল স্নানাগার প্রভৃতিতেও যথেচ্ছাচার করে, থিয়েটার প্রভৃতিতে জোর করে বিনা টিকিটে প্রবেশ করে এবং আরও গুরুতর অত্যাচার করে, যে গুলির যাথার্থ্য সপ্রমাণ হয় নাই বলে লিখ্‌লাম না।

একটা ভরসার কথা এই যে, একটা জাতির প্রতি অপর একটা জাতির উৎপীড়নে জনসাধারণ তত সাড়া দেয় না, (এক যুদ্ধের সময় ছাড়া) কারণ, রাজনীতিতে জনসাধারণ বেশি যোগ দেয় না। সেজন্য বর্ত্তমান জার্ম্মানির প্রতি নির্দ্দয় ও এমন কি পাশবিক ব্যবহারের জন্য সমগ্র ফরাসী জাতি ততটা দায়ী নয়, যতটা শাসনদণ্ড যাঁদের হাতে আছে তাঁরা দায়ী। রোমাঁ রোলা মহোদয় লিখেছেন যে, ফরাসীজাতি রাজনীতির জন্য ততক্ষণ অবধি মাথা ঘামায় না, যতক্ষণ তা না করে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হয়। এটা একদিক্ দিয়ে ভরসার কথা। কারণ, এতে আশা করা যায় যে এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিপক্ষে ফরাসীজাতির মধ্যে অনেকেই হয়ত দাঁড়াতে পার্ত্ত, যদি তারা জান্‌ত যে এইভাবে এক দেশ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ব্যবহার কচ্ছে। কিন্তু মানুষেরা সচরাচর (Line of least resistance-এ) পথে বাধাহীন চলে বলে, তারা চেষ্টা করে' কোনও বিষয়ে সঠিক্ খবর জান্‌তে চায় না,—সংবাদপত্রে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থেকে, নিজ নিজ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে মগ্ন থাকে। তা ছাড়া এই অত্যাচারের প্রতিবাদে রোলাঁ-প্রমুখ দুই চারজন মহাপ্রাণ লোক ছাড়া যে আর কারও স্বর বাইরে পৌঁছাচ্ছে না, তার এও একটা কারণ, যে বর্ত্তমান জগতে ষ্টেট-রূপ মহাদৈত্যের কলেবর এত বড় যে, তার তুলনায় ব্যক্তিবিশেষের বালখিল্যপরিমাণ জীবনে ও শক্তিতে তার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটান সম্ভবপর নয়। এটা মানুষের কর্ম্মের প্রেরণার মস্ত পরিপন্থী; খুব সরলপ্রকৃতির লোক না হ'লে, মানুষের ভাল কর্ব্বার ক্ষমতার দৈন্য দেখে, অনেককেই যে স্বতঃই নিরাশাবাদী হয়ে পড়তে হয়, এই কথা বার্টরাণ্ড রাসেল মহোদয় আক্ষেপ করে লিখেছেন। এই সব ভেবে চিন্তে জগতের সত্য সত্যই উন্নতি হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সময়ে সময়ে সংশয় জন্মায়। যুদ্ধবিগ্রহকে উপলক্ষ করে ষ্টেট রূপ ষ্টীমএঞ্জিনে যে সাধারণের মধ্যে কি ভাবে বিদ্বেষ চারিয়ে দিতে পারে, ও তাদের কি রকম একদেশদর্শী কর্ত্তে পারে, সে সম্বন্ধে উপরি-উদ্ধৃত সম্ভ্রান্ত মহিলাটির আক্ষেপেই প্রতীয়মান হয়। কারণ এক্ষেত্রে যে বিদ্বেষ ব্যক্তিগতভাবে ফুটে উঠেছে, একথা অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নাই। এই সব ক্ষুদ্রতা দেখে এখানকার অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্থিরসিদ্ধান্ত করে বসেছেন, যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ও নীতির প্রভাব, বর্ত্তমান সভ্য য়ুরোপীয়ের মনে নিতান্তই ফল্গুধারার মত চলেছে। কথাটা একেবারে অস্বীকার করারও উপায় নাই। নিষ্ঠুর নিয়তির দত্ত অবিচারের কষ্ট ছাড়াও আমাদের এ স্বসৃষ্ট দুঃখকষ্টের বিরাটত্বের কথা ভাব্‌লে মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখা সময়ে সময়ে একটু শক্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অবসান

আমি　জীবনে আমার শুনেছি তোমার
অভয় বাণী,
অনেক খানি,
ওগো অধিরাজ, ভুলিয়াছি লাজ,
ছুটিয়াছি তাই ধরনীর মাঝ,
স্মরি' ওচরণ ওকালো বরণ,
চক্রপাণি ;
আজিকে তাইতে বেদনা আঘাত
কিছু না জানি,
কিছু না মানি।

বুকে　জ্বল ধ্বক্ ধ্বকি লক্ লকি শিখা
জ্বল্ জ্বল—
হ'য়ে উজ্জ্বল !
করেনে শুষ্ক নয়নের বারি,
আয় পতঙ্গ আয় সারি সারি,
কাঁদিস্ নে আর, কাঁদিস্ নে আর—
ছল ছল্ !
রারণের চিতা, সে যে তোর মিতা,
ভয় কি বল্ ?
চল্ রে চল্।

এই　বিপুল বিশ্বে হারায় যদি
একটি বার—
কণ্ঠ-হার ;
খুঁজে মলে তা'র দেখা পাওয়া ভার,
যত আলো জ্বাল ততই আঁধার,
বেদনা ভিন্ন নাহি কিছু আর
সান্ত্বনার ;
পৃথিবী দীর্ঘ-নিশ্বাস-ধূমে
অন্ধকার,
বন্ধ দ্বার।

তবে　বল বল সখা, বল বল প্রিয়,
কিসের ভয় ?
হো'ক যা হয় !
কত যে আঘাত করে কত জনে
সে সব কিছুই পড়ে নাকো মনে
মিশে গিয়ে বিষ বিষেরই সনে
হয়েছে ক্ষয়,
আনন্দময় তাহ'তে হৃদয়
হে দয়াময় !
তোমার জয়।

তবে　আয় ছুটে আয় কাল বয়ে যায়
বাহির হ'রে
ভাবিস্ পরে
পেয়েছিস্ দিন বাজা ওরে বীণ,
ক্ষীণ, ভাঙ্গা-বুক করেনে নবীন,
চল্ ছুটে চল্ বিরাম বিহীন
ভবের 'পরে,
কে বলিবে দীপ নিভিবে কখন
উজল ঘরে !
দারুণ ঝড়ে।

কিসের দুখ !
কিসের দুখ !
জীবনেতে এযে পরম সুখ !
দুখের চুমায় মুছিয়া গিয়াছে
বেদনাটুক্
সরস হয়েছে স্নিগ্ধ হয়েছে
মলিন মুখ
সঙ্কোচ আজ মুক্ত করেছে
বদ্ধ বুক
জ্বালাইয়া প্রাণ স্তব্ধ করেছে
সর্ব্বভুক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

দেশকে যেমন দেখিয়াছি

গোড়ার কথা

অন্নসমস্যা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া, অনেকেই দেশের ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চাকুরীর নাগ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া দেশসেবায় রত হইবার সময় মনে আসিল "ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন"; কিন্তু যতদিন মাসকাবারে টাকা ঘরে আসিতেছিল, ততদিন এই ঋষিবাক্য আমার ত মনেই আসে নাই, স্বধর্ম্মরত ত্রিসন্ধ্যাকারী বড় বড় চাকুরে, যাঁহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতাম তাঁহাদের মুখেও শুনি নাই; বরং আমাদের সকলেরই ধ্যানের বিষয় ছিল, কি ভাবে চোখের জলে সিক্ত বিল্বপত্র প্রয়োগে শ্বেতকায় আশুতোষের নিকট হইতে ছেলের বা জামাতার চাকুরীরূপ বর আদায় করিব। জিনিষ পত্রের মহার্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর বাজারও গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের বিলাত পাঠানর পরামর্শ লইতে গেলে আমাদের বড়-সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে "ছেলে বিলাত পাঠানর খেয়াল কেন মনে আসিল? বিলাত গেলে ছেলের মতি-গতি বিগড়াইয়া যাইবে। সাবেকের পক্ষপাতী টুপীধারী বাপ আর হ্যাটধারী ছেলের এক পরিবারে বাস সুখের হইবে না। আমি তাহাকে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট করিয়া দিব, বিলাত পাঠান ভাল মনে করি না।" উত্তরে বলিয়াছিলাম "গোলামীর মর্য্যাদা বেশ বুঝিয়াছি, ছেলেকে আর গোলাম করিতে চাই না।" ইহার পর মর্লীমিণ্টো শাসন-সংস্কারের ফলে সাহেবদের একচেটিয়া একটা বড় পদ আমার জুটিবার সম্ভাবনা হইল তখন আমাদের উপরওয়ালা সাহেবের (যিনি আমাকে খুব পছন্দ করিতেন) মাথা ঘুরিয়া গেল। আমার নীচের এক সাহেবের নাম করিয়া বলিলেন "—কে না দিয়া তোমাকে এ চাকুরী দেওয়া হইবে কেন? তোমার বেশী মাহিয়ানা পাওয়ায় লাভ কি? কেবল ত গলগ্রহ পোষ্যগণের (Hangers-on) কুঁড়েমির সহায়তা করিবে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য টাকা ব্যয় করিবার কথা তোমার মনে স্থান পাইবে না।" উত্তরে বলিয়াছিলাম "Is it not better to feed human beings than to feed animals?" কথা প্রসঙ্গে বলিলাম "আমাদের জাতির অধিকৃত কোন দেশ নাই, যেখানে গিয়া তাহারা টুপী ঘুরাইয়া খাইতে পারে। নিজের দেশে থাকিলে তাহারা "কুপোষ্য," ভারতের বাহিরে গেলে তাহারা "কুলি"। সাহেবরা ঘোড়া রাখিয়া, কুকুর পুষিয়া, মদ খাইয়া, জুয়া খেলিয়া টাকা উড়াইলে দোষ নাই—সাহেবদের অনুকরণে অনেক বাঙ্গালীও তদ্রূপ করিতেছেন—আর আমরা উপার্জ্জনে অশক্ত গরীব, আত্মীয়স্বজন প্রতিপালন করিলে দোষের ভাগী হই।" এই প্রকার বাদানুবাদের পর সাব্যস্ত হইল যে, শ্রমশিল্প দ্বারা দেশের ধনধান্যবৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া কেবল চাকুরীর দিকে নজর দিলে জাতীয় জীবন রক্ষা হইবে না। ইহার দুই বৎসর পরে বিলাত যাত্রা করি। সেখানে বার্ণাডোস্ হোম

(Barnado's Home), র‍্যাগেড্ স্কুল (Ragged Schools) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া আসিয়া দেশের কাজে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা হয়। পেন্‌সন্ লইবার আগেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাহেবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিলেন "যে অঞ্চলের লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, ম্যালেরিয়া ও নানা প্রকার ব্যাধি যে দেশের নিত্য সহচর, যে দেশের লোক নিজের স্বার্থভিন্ন নড়িয়া বসিতে চাহে না; সে দেশের সেবা কি ভাবে করা যাইতে পারে, ইহা আমি বুঝিতে পারি না। তবে রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব না রাখিয়া কৃষি-শিল্প সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম্মে ও সামাজিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইলে সহানুভূতির অভাব হইবে না।" আমি বলিয়াছিলাম "শাস্ত্রকারদের অনুশাসন মানিলে আমার বাণপ্রস্থধর্ম্মের অনুষ্ঠানের বয়স আসিয়াছে; এ সময়ে 'সন্তোষঃ মূলংহি সুখং' এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্বংসোন্মুখ অরণ্যে পরিণত জনপদই আমার কার্য্যক্ষেত্র হওয়া উচিত। তাই যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার জ্ঞানানুশীলন ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশভূষাবাক্য এবং বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া দেশের কাজে প্রবৃত্ত হইতে সংকল্প করিয়াছি, রাজনৈতিক আন্দোলন আমার লক্ষ্য নহে।" কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সরকারী আদবকায়দা বজায় রাখিয়া সাহেবসুবারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'থাক্‌গে জুড়ে বাপের কুঁড়ে'।

সে আজ ৫০ বৎসরের উপরের কথা। এই সময়ের দেশের অবস্থার যে চিত্র আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমান বুঝিতে গেলে, অতীতের দিকে তাকাইতে হয়, তাই এই অবতারণা।

আমার মাতুলালয় যশোহর জেলার এক গণ্ডগ্রামে, পিত্রালয় হইতে ৩০ মাইল দূরে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে আসা যাওয়া সুবিধা জনক ছিল না। "জল ভাস্‌লেই" মাতৃদেবীর পিত্রালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং আধুনিক পূজার ছুটীর "হাওয়াখোর"দের ন্যায় প্রতি বৎসর নৌকাযোগে মামাবাড়ী যাওয়া আমাদের চেঙ্গে যাওয়ার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ওলাদেবীর আবির্ভাবে এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যশোহর জেলার বহু গ্রাম উজাড় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এবং সে ঢেউ আমার মামাবাড়ীর গ্রামেও লাগিয়াছিল। যে গ্রামে একশ' ঘরের উপর ব্রাহ্মণেরা বাস ছিল, সেখানে তখন অনেক বাড়ীতেই বিধবারা যেন ভিটায় 'প্রদীপ দিবার' জন্য বাঁচিয়া ছিলেন। বহু বাস্তু ভিটা জঙ্গলে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। দিনের বেলায় বাঁশ ঝাড়ে ঢাকা পল্লীপথ দিয়া একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাওয়ার সময় বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের শব্দে ভূতের দাঁত কড়মড়ি শব্দ মনে হইয়া অস্থির হইতে হইত। সন্ধ্যার পর কুটীরে কুটীরে তৈলপ্রদীপে ক্ষীণ আলোক প্রদান করিত। অসংখ্য জোনাকী পোকা উড়িতে আরম্ভ করিলে এবং জ্যোৎস্না দেখা দিলে

বালসুলভ অন্ধকার ভীতি দূরে যাইত ; কিন্তু ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্তরবে আবার মনে ভয়ের ভাব জাগাইয়া দিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 'সাঁঝের শুওর' ও 'নেকড়ের' ভয় ছিল। কেউ ডাকিলেই গরু বাছুর সাবধান করিতে হইত তাহার পর নেকড়ের ডাক শুনিয়া বিছানায় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। সব চেয়ে বেশী ছিল ভূতের ভয়। একদিন শুনা গেল, যে একটি ৭।৮ বছরের ছেলেকে ভূতে মারিয়া ফেলিয়াছে। নানা জনে নানা ব্যাখ্যা দিয়াছিল। আসল কথা এই— জঙ্গলের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। সন্ধ্যার পর কর্ত্তা হাট হইতে একটা ইলিশমাছ আনিয়া দাওয়ায় রাখিয়া গৃহিণীকে উহা লইয়া যাইতে বলিলেন। বালক দেখিল তাহার মা যেন মাছ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। মা কিন্তু তখনও মাছ লইতে আসেন নাই। সম্ভবতঃ শেয়ালে মাছটা লইয়া গিয়াছিল। মা আসিয়া "মাছ কই?" বলিয়া উঠায় ছেলে উত্তর করিল "মা, তুমিই ত মাছ লইয়া গেলে।" স্বামীস্ত্রী গবেষণা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন পেত্নীতে মাছ লইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া বালকের জ্বর হইল, সে প্রলাপ বকিতে লাগিল "মা তুমিইত মাছ নিয়ে গেলে।" অনেক ওঝা আসিয়া "ঝাড়পোঁছ" করিল, কিন্তু বালকটি মারা গেল। এখনও এই কথা মনে করিলে গা কেমন করে। এহেন গ্রামে মা প্রতিবৎসর আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। ম্যালেরিয়াদি নানা রোগে জরাজীর্ণ ক্ষীণ দেহ, প্লীহাযকৃতে স্ফীতোদর এবং তদুপরি বুকের গোড়ায় 'চিতাকসের' ঘা—ঈদৃশ নরনারীকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত যে 'এমন দেশে থাক কোন্ সুখে?' তাহা হইলে

'থাক্‌গে জুড়ে বাপের কুঁড়ে।'

এই প্রবাদবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পৈত্রিক ভিটা আগ্‌লাইয়া থাকার সমর্থন করিত। মধ্যে মধ্যে "হরিহে, তোমার ইচ্ছা" এই শান্তিপ্রদ বাক্য উচ্চারণ করিয়া "শেষের সে দিনের" অপেক্ষা করিত। মানুষ মরায় যে গ্রাম উজাড় হইতেছিল সেই গ্রামে লেখা পড়ার বন্দোবস্ত থাকিতে পারে না। মামাবাড়ীতে আমাদের সঙ্গী হইত রাখাল বালকগণ। গোষ্ঠবিহারী আমাদের একমাত্র ক্রীড়াকৌতুক ছিল।

. যে সময়ের কথা বলিতেছি ঐ সময়ে আমাদের নিজগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অবস্থা ভিন্ন প্রকারের ছিল। নীল বিদ্রোহের পর, বেগতিক দেখিয়া, সাহেবকুঠিয়ালরা আস্তে আস্তে পাত তাড়ি গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফলে হিন্দু কুঠিয়ালদের নীলের কারবারে বিলক্ষণ লাভ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ বা সঞ্চিত অর্থদ্বারা, কেহ বা দেনা করিয়া সাহেবদের কুঠি কিনিয়া লইতেছিলেন। অনেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ কুঠি কেনার হিড়িকে মহাজনের খপ্পরে পড়িয়াছিলেন, ইঁহাদের বংশধরেরা এখনও সেই দেনার জের টানিতেছেন। সাহেবদের কুঠি কেনা হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাদের নয়ন-প্রীতিকর আবাস-ভবনগুলি নিজেদের ভদ্রাসনরূপে ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি কাহারও জন্মে নাই। নদীর ধারে স্বাস্থ্যকর ও খোলা জায়গায় সাহেবেরা তাহাদের বাসগৃহ

নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে বাস করিতেন। এই প্রকার এক একটা বসতবাটীর সংলগ্ন জমির পরিমাণ ৭০।৮০ বিঘার কম নহে। যে বাড়ী সস্তার বাজারেও ২০,০০০।২৫,০০০ টাকার কমে নির্ম্মাণ হইতে পারে নাই, উহা "জলের দামে," ১,০০০।২,০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু "বাপের কুঁড়ে" ছাড়িয়া, উপকণ্ঠে বুনো ও ইতর লোকের বাস, এমন সাহেবীধরণের বাড়ীতে বাস করিবার ইচ্ছা ক্রেতাদের কাহারও মনে উদয় হয় নাই। বিশেষ সে সময়ে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" রব উঠে নাই। এখন কিন্তু ইঁহাদের বংশধরেরা পৃথকান্ন হইয়াও পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করিতেছেন। যে বাড়ীতে ৮।১০টি কুঠরী ছিল তাহার ৪।৫টি ব্যবহার হইতেছে রান্নাঘর রূপে, সুতরাং বাসের উপযোগী ঘরের অভাব। বাধ্য হইয়া এক ঘরে বহু কাচ্চা বাচ্চা লইয়া বাস করিতে হইতেছে। পরস্পরের মনোমালিন্যের ফলে "ভদ্রাসন" প্রেতালয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আঙ্গিনার চেহারা দেখিলেই সনাতন প্রথার মাহাত্ম্য বুঝা যায়। কোন জায়গায় গাভী-পরিত্যক্ত ভাতের মাড় পচিতেছে, কোন স্থানে বা স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা জল নিকাশের ব্যবস্থা রোধ করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীতে ব্যাম পীড়া দেখা দিলে চণ্ডীপাঠের ধূম পড়িয়া যায়, অবস্থানুসারে ডাক্তার কবিরাজও ডাকা হয়; কিন্তু সরিকী বাড়ী, স্বাস্থ্যকর করিবার চেষ্টা করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য—এ ধারণা কাহারও মনে স্থান পায় না। কৃষকদের অবস্থা কিন্তু ভিন্ন প্রকারের ছিল। কুঠিয়াল সাহেবেরা নীলের কারবারের জন্য খাল কাটাইয়া জল চলাচলের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে জমীর উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাহেবেরা দেশ ছাড়িয়া যাওয়ায় এবং নীলের জমিতে ধান বুনন হওয়ায় প্রজার অবস্থা সচ্ছল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত লাভজনক পাটের চাষ আরম্ভ হয় নাই, ম্যালেরিয়া দেখা দেয় নাই এবং দেনা করিয়া টিনের ঘর করিবার কল্পনাও কৃষকদের মনে স্থান পায় নাই। বর্ষার প্রারম্ভে কৃষকেরা আউশধান যে পরিমাণে ঘরে তুলিত তাহাতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত খোরাক যোগাড় হইত, সুতরাং ছিপ নৌকায় বাইছ দিয়া সারি গাহিয়া বেড়াইতে পারিত। কৃষকদের বাবরী চুলের বাহার দেখিলেই বুঝা যাইত যে তাহারা মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। এখন আর সে দিন নাই। এখন তাহারা স্বাস্থ্য হারাইয়া দেনার দায়ে ছটফট করিতেছে। যাহারা "বাপের কুঁড়ে" জুড়িয়া বসিয়া আছে তাহারাই বিশেষ কষ্টে দিন কাটাইতেছে। অনেকে পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া চরে বসতি করিতেছে। চরপল্লী সকল স্বাস্থ্যে এবং সমৃদ্ধিতে পুরাতন গ্রামসকল অপেক্ষা অনেক ভাল, কিন্তু কি ইতর কি ভদ্র কেহই ইহা বড় একটা ধারণার মধ্যে আনিতেছে না। ফলে ধ্বংসোন্মুখ পল্লী সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকার বাহাদুর কৃষি বিভাগ এবং কো-অপরাটিভ সমিতি খুলিয়া কৃষককুল বাঁচাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। কি ভাবে চলিলে পল্লীবাস সম্ভব হইতে পারে তাহা ক্রমে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৪)

নিউইয়র্কের হোটেলে বষ্টনের আর একটী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। ইঁহার নামটা ভুলিয়া গিয়াছি। ইনি অবিবাহিতা ছিলেন। সম্বাদপত্রাদিতে লিখিয়া জীবিকা-উপার্জ্জন করিতেন। নিউইয়র্কে যেমন একটা মেয়েদের ক্লাব আছে, বষ্টনেও সেইরূপ একটা অতি সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ মহিলা-ক্লাব ছিল। এই মহিলাটী বষ্টনের এই মহিলা-ক্লাবের কর্ত্রীপক্ষীয়-দিগের একজন ছিলেন। ইনি আমাকে তাঁহাদের ক্লাবের সভ্যাদিগের নিকটে একদিন ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া যান। কিছুদিন পরে এই ক্লাবের সম্পাদিকার নিকট হইতে যথারীতি আমন্ত্রণপত্র আসিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিকা আমি কি বিষয়ে বক্তৃতা করিব তাহাও জানিতে চাহিলেন। বষ্টনের মহিলা-সমাজে আমি বক্তৃতা করিতে যাইব শুনিয়া আমার হোটেলের অন্ধ মহিলা বন্ধুটী বিশেষ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন :—"মিঃ পাল, এবারে তুমি মার্কিণের মেয়েদের যথার্থ পরিচয় পাইবে। আমাদের মেয়েরা যে পুরুষদিগের সখের পুতুল নয়, নিউইয়র্কেই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাইয়াছ। কিন্তু তাহারা যে ঘরকন্না করিয়া কিম্বা ভোগবিলাসে গা ঢালিয়া দিয়াই দিন কাটায় না, বষ্টনের মেয়েদের দেখিয়া ইহার প্রমাণ পাইবে। বষ্টনের মেয়েদের চিন্তার গভীরতা আমরাও সকল সময়ে মাপিয়া উঠিতে পারি না। তুমি জান এমার্সন বষ্টনের লোক ছিলেন। থিয়োডোর পার্কার, লাওয়েল প্রভৃতি মার্কিণের যত বড় বড় চিন্তাশীল লোক, বড় কবি ও দার্শনিক,—প্রায় সকলেই বষ্টনের আশেপাশে জন্মিয়াছিলেন। ইহার ফলে বষ্টনে সর্ব্বদাই একটা অতি উচ্চ ও গভীর তত্ত্বানুশীলনের হাওয়া বহিতেছে।" তার পর একটু হাসিয়া কহিলেন, "দেখ, বষ্টনের মেয়েদের কাছে বক্তৃতা করা যে বড় সোজা হইবে তা ভাবিও না। ইহারা ইহাদের সভা-সমিতিতে—whichness of the why এবং whyness of the which—এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা করে।" ইঁহার কথা শুনিয়া আমি বষ্টনের মহিলা-ক্লাবের সম্পাদিকাকে আমার বক্তৃতার বিষয়ের একটা লম্বা তালিকা লিখিয়া পাঠাইলাম। এই তালিকাভুক্ত যে কোনও বিষয়ে তাঁহারা হুকুম করেন, সেই বিষয়েই বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত আছি। এই তালিকায় কি কি বিষয়ের উল্লেখ ছিল তাহার সকলটা মনে নাই। তবে তাহার দুপাঁচটা এখনো মনে আছে। প্রথম—A Hindu View of Emerson—হিন্দুসাধনার কষ্টি-পাথরে এমার্সনের

সমালোচনা ; দ্বিতীয় হিন্দুসাধনায় ঈশ্বর, মানুষ এবং জগৎ ; তৃতীয়—গীতাধর্ম্ম ও গীতাতত্ত্ব অথবা Hindu View of Ethics ; চতুর্থ—হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞান ; পঞ্চম—সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের লক্ষণ ও হিন্দু ধর্ম্ম ; ষষ্ঠ—বাঙ্গালা দেশের প্রেম-গাথা—Love-lyrics of Bengal ; সপ্তম—হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ব্যবহার-শাস্ত্রে নারীর স্থান ও অধিকার ; অষ্টম—আধুনিক ভারতে ব্রিটিশ শাসন। যদিও শেষোক্ত রাষ্ট্রীয় বিষয়টী এই তালিকাতে লিখিয়া দিয়াছিলাম, বষ্টনের বিদুষীমণ্ডলের সমক্ষে আমাকে যে এবিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে ইহা কল্পনা করি নাই। আমার বড় সাধ ছিল যে এমার্সনের স্বজাতিবর্গকে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্বকথাই শুনাইব। বহুদিন হইতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে মার্কিণের বা ইংলণ্ডের লোকেরা এমার্সনকে কিছুই বুঝে না। আমি নিজে যতদিন ভারতের সনাতন সাধনার সত্যপ্রাণবস্তুর সন্ধান পাই নাই, ততদিন এমার্সনের কোনও কথাই বুঝি নাই। এমার্সনের ভাষা যে বুঝিতাম না এমন নহে। ব্যাকরণ এবং শব্দকোষের সাহায্যে কোনও গ্রন্থের যতটা জ্ঞানলাভ করা সম্ভব, আমিও এমার্সনের ততটা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এজ্ঞান শব্দজ্ঞান মাত্র, বস্তুজ্ঞান নহে। গীতা এবং উপনিষদাদি পড়িয়া যখন আমি আবার এমার্সন খুলিলাম, তখন এমার্সনের গ্রন্থে আমার চক্ষে একটা নূতন রাজ্য খুলিয়া গেল। গীতা এবং উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে আমি ভগবদ্-প্রসাদাৎ এমার্সনের অপূর্ব্ব তত্ত্বভাণ্ডারের চাবীটা পাইলাম। এই চাবী ব্যতীত আর কোনও প্রকারের কলকৌশলের দ্বারা এমার্সনের শিক্ষার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করি না। মার্কিণে বা ইংলণ্ডে এখনও এমার্সনকে বোঝে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে পশ্চিমের লোকেরা এখনও ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বেদান্তের বিমল আলোকে এমার্সনের দৈবী প্রতিভাকে উদ্ভাসিত করিয়া বষ্টনের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীসমক্ষে তুলিয়া ধরিব, মনে মনে এই বড় সাধ ছিল। এই জন্য আগ্রহাতিশয়সহকারে বষ্টনের মহিলা-সমাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমার বক্তব্য বিষয়ের তালিকায় A Hindu view of Emerson—সকলের আগে এইটী লিখিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এ সাধ পুরিল না। পত্রোত্তরে সম্পাদিকা লিখিয়া জানাইলেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধেই আমি সমিতিতে বক্তৃতা করি, সকলের ইচ্ছা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সভাস্থলে যাইয়া দেখিলাম প্রায় ছয় সাত শত মহিলা ঘরটী পরিপূর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন। দাসব্যবসায় উপলক্ষে মার্কিণে যে গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে যিনি স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শকে মূর্ত্তিমান করিয়া মার্কিণের নূতন জাতীয় সঙ্গীত বা National Anthem রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহিলা-কবি জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ (Julia Ward Howe) বষ্টনের এই মহিলা-সমাজের সভানেত্রী বা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন সত্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তিনি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সভার অধিনেত্রী হইতে পারেন নাই। আর একটী মহিলা ঐই ভার গ্রহণ করেন।

আমি প্রায় দেড়-ঘণ্টা কাল এদেশের ইংরাজশাসনের দোষ-গুণ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করি। এখানেও বক্তৃতার পরে শ্রোতৃমণ্ডলী আমাকে নানা বিষয়ে জেরা করিতে আরম্ভ করেন। জেরার প্রশ্নগুলি মনে নাই। কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি একটা জ্বলন্ত অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে গভীর ব্রিটিশ-বিদ্বেষও ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সভা ভঙ্গ হইলে পরে ইহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ-পরিচয় পাই। সভ্যেরা তখন আমাকে আসিয়া ঘেরাও করিয়া দাঁড়াইলেন। আর প্রায় সকলেই একবাক্যে আমার অসাধারণ সংযমের স্তুতিবাদ বা শ্লেষবাদ করিতে লাগিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভাল'র দিকটাও যে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, ইহা আমার শ্রোতৃবর্গের একবারেই ভাল লাগে নাই। তাঁহারা আমার কথায় বুঝিলেন যে ইংরাজ আমার স্বদেশকে, আমার স্বজাতিকে যে শিকল দিয়া বাঁধিয়াছে, তাহার অপরিহার্য্য বেদনা আমার প্রাণে জাগে নাই। পরাধীনতার বেদনাবোধ যার নাই, স্বাধীনতার মূল্য এবং মর্য্যাদাবোধও তাহার জন্মে নাই। এই ভাবেই অনেকে আমার বক্তৃতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটী মহিলা আসিয়া কহিলেন, "মিঃ পাল, তোমাকে কি কহিব ? তুমি যীশুখৃষ্টের ক্ষমাধর্ম্মকেও ছাড়াইয়া গিয়াছ।" আর একটী মহিলা বলিলেন, "ইংরাজ তোমার দেশের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; সেই ইংরাজের শাসনের গুণগান তুমি কি করিয়া করিলে আমি ভাবিয়া পাই না। পরাধীনতার যে কোনও ক্ষতিপূরণ এজগতে নাই, এতদিন এই কথাটী জানিতাম; তোমার মুখে প্রথম ইহার বিপরীত কথা শুনিলাম।" আমি হাসিয়া কহিলাম,—"আমার দেশের শিক্ষাতে ও সাধনাতে শত্রুকে তাহার যাহা যথার্থ প্রাপ্য তাহা দিতে কহে। আপনারা ভাবিবেন না যে এই পরদেশী শাসনের শিকল আমার গলায় বাজে না। কিন্তু বষ্টনে আসিয়া আমি এমার্সনের ক্ষতিপূরণের বিধানের বা law of compensationএর কথা ভুলিতে পারি নাই। প্রত্যেক দুঃখের বা অপমানেরই বিধাতার নিয়মে একটা ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে। ভারতের ব্রিটিশ শাসনের দুঃখ এবং অবমাননারও একটা পাল্‌টা দিক আছে। সত্যের অনুরোধে আমি সে দিকটা আপনাদের নিকটে গোপন করিতে চাহি না।"

(১৫)

বন্ধু বান্ধবেরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় কখনও একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়াছি কি না। নিউ ইয়র্কের ন্যাসনাল টেম্পারেন্স সোসাইটির কল্যাণে একবার আমার এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। গ্রামটার নাম মনে নাই, কিন্তু রেল ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে বার-চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়াছিলাম, একথা মনে আছে। এখানে যাইয়া দেখিলাম যে পথে গ্যাস নাই, বিজলীর আলো ত দূরের কথা। কেরসিনের আলো মাঝে মাঝে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে; সে আলোতে পথ দেখা যায় কি না সন্দেহ,

কেবল রাত্রির অন্ধকারটাই দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠে। যাতায়াতের ট্রাম বা bus পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং গাড়ী ও ঘোড়াও তেমন নাই। আমি যাঁর বাড়ীতে অতিথি হই, বোধহয় তাঁর নিজের একখানা দু'চাকার টমটম ছিল। সেই টমটমেতেই ষ্টেশন হইতে বার-চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসি। জলের কল নাই ; টিউব ওয়েল হইতেই লোকে নিজেদের ব্যবহারের জল সংগ্রহ করে। রাত্রে সন্ধ্যার পরে গ্রামের গির্জ্জা-ঘরে আমার বক্তৃতা হয়। গ্রামখানি ছোট, লোকসংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু ইহার চারিদিকে আরও কতকগুলি ছোট ছোট গ্রাম আছে। সেই সকল গ্রাম হইতে আমাদের গরুর গাড়ীর মতন ছাপ্পর দেওয়া বড় বড় ঘোড়ার গাড়ীতে বা wagonএ চড়িয়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকারা গ্রামান্তর হইতে আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিল। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী কিম্বা কাঠুরিয়া। এই গ্রামগুলির চারিদিকে বড় বড় কাঠের বন ছিল। অনেকে এই বনের কাঠ কাটিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। এতটা অজ্ঞ পল্লীগ্রাম বিলাতেও দেখি নাই। গ্রাম হইতে চারি পাঁচ মাইল ব্যবধানে একটা রেল-লাইন গিয়াছে, কিন্তু সেখানে কোনও ষ্টেশন নাই ; তবে গাড়ী যাতায়াতের সময় রেলের ধারে লোক দাঁড়াইলে ট্রেণ থামাইয়া তাহাদিগকে তুলিয়া নেওয়া হয়। পূর্ব্বদিন চৌদ্দ মাইল টমটমে চড়িয়া আসিয়া সেভাবে সেপথে ফিরিয়া যাইবার সাধ আর ছিল না। এই রেল-লাইনের কথা শুনিয়া সেখানে পৌঁছিবার কোনও ব্যবস্থা সম্ভব কি না গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন যে প্রাতঃকালে একটা কাঠ-বোঝাই গাড়ী তাঁদের গ্রামের ভিতর দিয়া রেললাইন পর্য্যন্ত মাঝেমাঝে যায় ; সেই গাড়োয়ানকে বলিলে সে নিশ্চয়ই আমাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইবে। আমি তাঁহাকে এই ব্যবস্থাই করিতে কহিলাম। সৌভাগ্যক্রমে পরদিনই তাহার এই পথে যাইবার কথা ছিল। আমি যথাসময়ে সকাল বেলা খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম। এবং সে আসিলে তাহার সেই কাঠ-বোঝাই মালগাড়ীর কোচবাক্সে তাহার পাশে বসিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করিলাম। গাড়ীটা কাঠ-বনের ভিতর দিয়া চলিল। ক্রমে আমরা দু'জনে নানা গল্প করিতে করিতে রেল-লাইনের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে মন্থর গতিতে একখানা ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেণের গার্ড (আর কোনও যাত্রী সেখান হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া মনে নাই) আমাকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া তুলিয়া লইলেন, এবং আমাদের ট্রামের মতন গাড়ীর ভিতরেই টিকিট কাটিয়া আমাকে নিউইয়র্কের দিকে লইয়া চলিলেন। আমারও সভ্যদেশে এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রতীকার

ইংরাজীতে একটি বচন আছে, বিপদ কখনও একা আসেনা। আমাদের দেশের অবস্থা ভাবিতে গিয়া দেখি একটার পর একটা দুর্গতির বোঝা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার মূল কারণ এক কি বহু, ইহা লইয়া তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু জাতীয় সমস্যা যে এক নহে, তাহা ত স্পষ্টই দেখিতে পাই। আজ অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, অর্থ-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা, এমন জটিলাকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে যে এই গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া ঠাহর করা দায় কোন্ পথ ধরিতে হইবে, কোন্ সমস্যার সমাধান করিলে আমরা এই ব্যূহের মধ্য হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

ইহা জানিয়া রাখা ভাল যে সহজে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। দীর্ঘকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে দূর করিয়া দিয়া প্রাণশক্তির বিকাশের পথ বাধা-মুক্ত করিতে হইবে। এই জন্য কোনো বিশেষ রাজনৈতিক সূত্র করিয়া মুক্তির প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

একবার দেশে ধূয়া উঠিল প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কর, উচ্চশিক্ষার দিকে অত দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। কাজে হাত দিয়া বুঝিতে পারা গেল, যাহাদের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেশে প্রচলন করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের প্রস্তুত করা চাই। তারপর একটু আধটু লেখাপড়া শিখাইয়াও বিশেষ কোনো ফল দেখিতে পাওয়া গেল না। শিক্ষাসমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল,—কোনো প্রকারে ইহার সমাধান হইল না।

রাজনীতি বিশারদেরা একদল বলিলেন, 'শাসনযন্ত্রটা একবার আমাদের করতলগত হইলে তারপর দেশকে গড়িতে বিলম্ব ঘটিবে না। আংশিক পরিমাণে সেই যন্ত্রটার কর্ত্তৃত্বভার আমাদের উপর ন্যস্ত করা হইল বটে, কিন্তু ফল হইল কি? এতকাল যন্ত্র চালাইতে যাহা ব্যয় হইত, তাহার উপর প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইল, আর এই টাকা সংগ্রহ করা হইল নূতন ট্যাক্স বসাইয়া। দেশের লোক দেখিল, সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া ফল হইল উল্টা; একদিকে করবৃদ্ধি, অপরদিকে অর্থের অনটন। তারপর, এতদিন আমাদের মনিব ছিল একজন—এখন দুই মনিবের মুখের দিকে তাকাইয়া আমাদের ভিক্ষা করিতে হয়। একজনকে জলকষ্টের কথা জানাইয়া যদি বলি, ইহার একটা প্রতীকার করিয়া দিন তবে তিনি উত্তর করেন তোমাদের জল খাওয়াইবার ভার তোমাদেরই প্রতিনিধি একজন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার হাতে টাকা নাই। তোমরা যদি উৎকৃষ্ট পানীয় জল চাও ত সঙ্গে সঙ্গে টাকাও দিতে রাজি থাকিও।

আর একদল উৎকট স্বদেশ প্রেমের নেশায় বলিলেন, সকল সমস্যার মীমাংসা করিবার একটি মাত্র উপায় আছে। কোনো রকমে ঐ শাসনযন্ত্রটাকে ভাঙ্গিতে পারিলে সকল আপদ চুকিয়া যায়; উহাই হইতেছে আমাদের দুর্গতির মূল কারণ। দেশের লোক জানিতে চাহিল, কোন্ অমোঘ অস্ত্রে এমন বিরাট্ যন্ত্র ভাঙ্গিতে পারা যাইবে। উত্তর পাওয়া গেল, "সকলে চরকায় সূতা কাট, খদ্দর পর"; তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-ব্যবসার হানি করা হইবে, আর সে-দেশের মজুর অভুক্ত থাকিলে ব্রিটিশ শাসন যন্ত্রটি বিফল হইবেই।

সকল সমস্যার সমাধান এত সহজে হইতে পারে মনে করিয়া আমাদের মন খুসি হইল, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল ব্যাপারটি অত সহজ নহে। সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে গিয়া যাহা হয় তাহাই হইল—সমস্যার জটিলতা বাড়িল বই কমিল না আর সিদ্ধিলাভের আশাও ক্ষীণ হইয়া আসিল। এতকাল মনে করা গিয়াছিল, যাহারা দেশ-নায়ক বলিয়া পরিচিত, তাহারা দেশের অবস্থা অবগত আছেন; কিন্তু রাজনৈতিকক্ষেত্রে তাঁহারা যে-প্রমাণ দেখাইলেন, তাহাতে স্বভাবতঃই জনসাধারণ ইঁহাদের উপর ভরসা রাখিতে পারিতেছে না; আর গবর্ণমেণ্টও ইঁহাদের আস্ফালনকে ভয় করে না। অতএব ইহাও একটি সমস্যা হইয়া উঠিল।

এমত অবস্থায় কি করা যাইবে এবং যাহা করণীয় কাহারা সেই কাজে হাত লাগাইবে ইহাই ভাবিবার কথা। দেশের তরুণ সম্প্রদায় গা ঝাড়া দিয়া না উঠিলে আর কোনো উপায় দেখিতেছি না। অতএব তাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধে দু একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিব।

প্রথমতঃ—উৎকট স্বদেশপ্রেমের সঙ্কীর্ণতার ভিতর হইতে দেশের যুবকদের বাহির হইয়া আসিতে হইবে। যাহার প্রভাবে আমাদের চিত্তের পরিসর বৃদ্ধি হয় না ও আত্মবিকাশের সহায়ক নহে, তাহার দ্বারা দেশের কল্যাণ হইতেই পারে না। এই স্বদেশ-প্রেমের দোহাই দিয়া সভ্যতার তলদেশে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ এমন স্বদেশপ্রেমের বর্জ্জন করিবেই।

দ্বিতীয়তঃ—দেশ-সেবকদের মনে স্বাজাত্যের আদর্শ স্পষ্ট মুদ্রিত থাকা আবশ্যক। ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাবোন্মাদের নেশায় স্বাধীনতা-লাভের নিমিত্ত আস্ফালন করিলে আমাদের সমস্যা আরো জটিল হইয়া পড়িবে। দেশকে জানা চাই, দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করা চাই। রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় ছাত্রদের বলিয়াছিলেন, "স্বদেশকে

মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না।" *

আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই যে, ভারতবর্ষে সমাজ-ভিতের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে বিশ্লিষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতার নানা কারণ বর্ত্তমান। অতএব, ইহার উপর কোনো টেকসই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব নহে। অথচ আজ আমরা বলিতেছি, এই গণতান্ত্রিক যুগে আমরাও কালোপযোগী রাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন করিব। কিন্তু ভোট্ দিবার স্বাধীনতাটুকু হাতে পাইলেই ত হইল না; ভারতবর্ষের বিপুল জনবাহিনীকে ভোট্ দিতে দাও, আর অবিলম্বে স্বাধীন রাষ্ট্র-জীবনের ভূমিকা পত্তন করা হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। গণতন্ত্রের নাম শুনিলেই অনেকের মনে হয়, যদি কোনো প্রকারে ভারতবর্ষে ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যেন সকল সমস্যার সমাধান হইবে। প্রাচীনকালে এথেন্সেও নাকি গণতন্ত্র ছিল—কিন্তু তাহার মূলে সমাজ-ভিতে ছিল ক্রীতদাস ও দাসশ্রেণী! আজ তোমাদের সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে; এইখানে দৃষ্টি না পড়িলে স্বাজাত্যের আদর্শ গড়াও সম্ভব হইবে না।

ভারতবর্ষের সমাজ-কেন্দ্র পল্লীতে। অতএব, পল্লী-সংস্কার কাজটাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী মনে করি। দেশের পনর আনা লোক ত পল্লীতেই বাস করে। দেশের লোকের মুখে অন্ন জোগায় কৃষি-সম্প্রদায়; বঙ্গদেশে সহরের সংখ্যা ১১৯, পল্লীগ্রামের সংখ্যা ১,১৯,৭৩২; সহরে প্রায় ২৯ লক্ষ আর পল্লীগ্রামে ৪ কোটি ২৫ লক্ষ লোকের বাস। সহরবাসী ২৯ লক্ষ মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ অস্থায়ীরূপে সহরে থাকে। তারপর, রাজস্ব, লবণ-কর প্রভৃতি পল্লীগ্রামের লোকেরাই অধিকপরিমাণে প্রদান করে—তাহার তুলনায় সহরবাসীরা যাহা দেয়, তাহা নিতান্ত সামান্য।

এই সব কথা আমাদের শাসনকর্ত্তারা সবিশেষ অবগত আছেন। মণ্টেগু সাহেব ভারতশাসনসংস্কার করিবার প্রস্তাব করিয়া যে সুপাঠ্য রিপোর্টখানি লিখিয়াছেন তাহার ১৩৬ দফায় বলা হইয়াছে:——

"The fraction of the people who are town dwellers contribute only a very small fraction to the revenues of the state. On the other hand, is an enormous country population immersed indeed in the struggle

* "শিক্ষা" পৃঃ ২৪ দেশের সঙ্গে আমাদের যোগটা নিবিড় না হইলে আমরা স্বাজাত্যের আদর্শও উপলব্ধি করিতে পারিব না। এই জন্য আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন এমন সকল শিল্প-কেন্দ্র ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র স্থাপন করা যেখানে দেশের কর্ম্মিগণ দেশহিতব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত শিক্ষা ও দীক্ষা পাইতে পারেন।

for existence. The rural classes have the greatest stake in the country, because they contribute most to its revenues. Among them are a few landlords and a large number of yeoman farmers"——ভাবার্থঃ—রাজকোষে সহরবাসীরা অতি সামান্য রাজস্বই দেয়। এ-দিকে "পল্লীবাসী বিপুল জনবাহিনী অত্যন্ত জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত। রাষ্ট্রের নিকট ইহাদের দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কেননা ইহারাই রাজস্বের অধিকাংশ দিয়া থাকে। অনেক জমিদার ও ভদ্র-গৃহস্থ পল্লীগ্রামেই বাস করে।"

এই পল্লীবাসিদের তরফ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় "প্রতিনিধিগণ" উপস্থিত থাকিয়া পল্লীবাসীর কল্যাণ কামনা করিবেন, নূতন-সংস্কার ব্যবস্থায় ইহার বিধান আছে। কিন্তু "Rural constituency" হইতে ভোট্ সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন পল্লীসংস্কার সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন; বিগত দেড়-বৎসর মধ্যে কেহ এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে "পথ ও পাথেয়" আবিষ্কার করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্কার যাহাই হৌক না কেন, ইহা দ্বারা যদি কিছু উপকার পাওয়া যায় তাহা মুষ্টিমেয় অভিজাতের সৌভাগ্যেই লাভ হইবে,—যাহারা শ্রমী, যাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থে রাজস্ব-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়, তাহাদের অদৃষ্টে থাকিবে ধনীর উচ্ছিষ্ট মাত্র। এমত অবস্থায় গণতন্ত্রের ভিৎ স্থাপন করা অসম্ভব; অতএব, সর্ব্বাগ্রে পল্লীতে পল্লীতে সভ্যতার মৌলিক উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পল্লীবাসির জীবনকে সর্ব্বপ্রকার বাধা হইতে মুক্তি দিবার সুযোগ দিলে তারপর, একদিন বাংলার প্রত্যেক পল্লী এক একটি 'জীবন-কেন্দ্র' পরিণত হইবে; আর, তখনই আত্ম-কর্ত্তৃত্বের শক্তি আপনা হইতে জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা সমাধান করিয়া দিবে। তখন আমরা যে-'স্বরাজ' লাভ করিব তাহা পরদত্ত কোনো রাষ্ট্রীয়যন্ত্র নহে,—তাহা আমাদের নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদের গৌরবে তখন আমরা বিশ্বমানবের অভিমুখে ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা উদ্ঘাটিত করিতে পারিব; সেদিন কোনো যান্ত্রিক-ব্যবস্থা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারিবে না। বাংলাদেশে তরুণ সম্প্রদায় আজ এই কাজে ব্রতী হউন—যে-কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে, ইহার প্রতীকার তাঁহাদেরই হাতে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিভ্রাট

(১)

টেক্কা বলে, "আমি একলা করি কি? ছিল যখন রাজারাণী তখন তাদের উপর টেক্কা দিতুম। এখন ত আর সে বড়াই চল্‌বে না। ছিলুম সকলের সেরা, এখন ত আর কেউ পুঁছবেও না।"

দুরী বল্‌লে, "টেক্কা মশাই, রাজারাণী গেলেন কোথায়?"

টেক্কা টেকো মাথা চাপ্‌ড়ে বল্‌লে, "তাই যদি ছাই জান্‌ব তা হলে আকাশ পাতাল ভেবে মর্‌ব কেন? সকাল বেলা মুখ হাত ধুয়ে বেড়াতে বেরিয়েচি ভাবলাম রাজবাড়ীতে একবার ঢু মেরে যাই। গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই, দরজা জানালা সব হাট করা খোলা, ডাকাডাকি কোরে কারুর সাড়াশব্দ পাইনে, বাড়ীটা যেন খেতে আসছে।"

দুরী তার কুৎকুতে চোক দুটো প্রাণপণে বড় কোরে বল্‌লে, "এমনতর আজগুবী কথা ত কোথাও শুনি নি! চারিদিকে সেপাই সান্ত্রী, লোকজন গিশগিশ কোরছে, আর এক রাত্রের মধ্যে—ফুঃ এক ফুঁয়ে সব উড়ে গেল! একি ভেল্কি বাজী না কি, ঝুড়ির ভিতর থেকে ছোকরা উড়িয়ে দেওয়া! তা আপনি কি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন নি?"

"জিজ্ঞাসা আবার করি নি? চৌরাস্তায় গিয়ে দোকানী পসারী, মুদি মুদ্দোফরাশ সকলকে জিজ্ঞাসা করলুম, কেউ কিচ্ছু জানে না।" টেক্কা ডান্‌ হাতের বুড়ো আঙ্গুল নাড়া দিলে। একলা থাকে কি না, সভ্যতা ভদ্রতা কিছু জানে না।

এমন সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির তিরী। টেক্কা জিজ্ঞাসা কোরলে, "তিরী খোঁড়াচ্চ কেন, কি হয়েচে?"

তিরী বল্‌লে, "আরে মশাই, রাজারাণী নেই তার আমি কি জানি! সহরসুদ্ধর রাগ আমার উপর। আমি আস্‌চি আপনাকে জিজ্ঞাসা কোরতে রাজারাণী কোথায় গেল, আর রাস্তার লোকে বলে এই পাজী বেটা তিরীই যত নষ্টের গোড়া। কেউ বলে তিন শত্রু ত ওই এনেছিল, কেউ বলে তিন জিনিসটাই খারাপ, তিনটে কাণা কড়ি ভিখারীকেও দেয় না, ওই তিরীটাই ঘরের বিভীষণ, রাজারাণীকে ধরিয়ে দিয়েচে। এই যেই বলা আর ছোঁড়াগুলো সব ঢিল পাটকেল ছুড়্‌তে আরম্ভ কোরলে। আমি ত চোঁচাঁ দৌড়, একটা ঢিল হাঁটুতে লেগেচে, তাই খোঁড়াচ্চি। রাজারাণী না থাক্‌লে কি দেশটা এমনি অরাজক হয়?"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাতা প্রভৃতি সুড় সুড় কোরে এসে উপস্থিত।

সকলেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, কেউ হয়ত ঢোক গিল্‌চে, কারুর চোক কপালে উঠেছে। রাজারাণী কোথায় গেলেন? চৌকা বলে এক কথা ত আটা বলে আর এক কথা, নহলা আবার একটা নতুন মত বাহির করে।

টেক্কা বল্‌লে, "সকলে এক সঙ্গে কথা কইলে চল্‌বে কেন? তা হলে শুন্‌বে কে? এ একটা সঙ্গীন ব্যাপার, আমাদেরই কখন কি হয় বলা যায় না। এখন হাউকাউ কোরে কি হবে?"

চৌকা বল্‌লে, "সত্য কথা!"

টেক্কা বল্‌লে, "তোমরা যে এত জন রয়েচ বিবেচনা করে বল দেখি এই যে কাণ্ডটা হয়েচে এর মানে কি! রাজারাণী কি ছুঁচ, যে সূতা থেকে টুপ কোরে পড়ল আর খুঁজে পাবার জো নেই? আর সত্যি ত তাদের রাতারাতি পালক ওঠে নি, যে ভোরবেলা চড়াই পাখীর মত ফুড়ুৎ কোরে উড়ে যাবে?"

তিরী একটু ভারিক্কে রকম ভাবে বল্‌লে, "তা রাজারাণী যদি ভোরে উঠে শিকার কোরতে গিয়ে থাকে?"

পঞ্জা বলে উঠ্‌ল, "শিকার কোরতে গিয়েচে না তোমার গুষ্টির পিণ্ড দিতে গিয়েচে! তিন কাণা কিনা তা না হলে অমন আঁকড়া বুদ্ধি হবে কেন? সাধে কি ছোঁড়ারা তোমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েচে! রাজারাণী যেন শিকারে গেল, সেই সঙ্গে কি সিপাই বরকন্দাজ, চাকর নফর' ভাণ্ডারী বামন, সখী দাসী সব শিকারে গেল? বুদ্ধির দৌড়খানা দেখ!"

নহলা একটু এগিয়ে এসে বল্‌লে, "তা যেন হল, কিন্তু রাজারাণী যে নেই তাই বা সাব্যস্ত হল কেমন কোরে? তাঁরা যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, লোকজনও নিয়ে যেতে পারেন।"

পঞ্জা নাক সিঁটকে বললে, "এইবার বুদ্ধিবাচস্পতি মশাই এলেন। তা হবে না কেন? তিন ত্রিক্কে নয় ত!"

আটা বল্‌লে, "মিছে কথা কাটাকাটিতে কি হবে? কেউ কি ভাল কোরে খোঁজ নিয়েছে, কোন রকম খবর পাওয়া গিয়েছে? সে কথা না কয়ে মেয়েমানুষের মত নেই কোরলে কি হবে?"

দহলা এতক্ষণ এক পাশে চুপ কোরে বসেছিল। এখন বল্‌লে, "আমি সহরের চারদিক ঘুরে লাল দরজায় গিয়েছিলাম। সেখানে কতক লোক বল্‌লে, রাত্রে বর্গী এসেছিল। কিন্তু বর্গী এসে সহর লুটপাট করেনি, মশাল জ্বেলে ঘর দোর জ্বালিয়ে দেয়নি, আর রাজবাড়ীতেই যদি বর্গী গিয়ে থাকে তা হলে কোন গোলমাল হয়নি এ কি রকম কথা! সেই জন্য আমি ও কথাটা চট্ কোরে বিশ্বাস করতে পারিনি।"

টেক্কা বল্‌লে, "কই, আমাকে ত কেউ বর্গীর কথা বলেনি।"

(২)

গোলাম যে গয়েরহাজির সেটা কেউ লক্ষ্য করেনি। রাজা রাণী নেই সেইজন্য সব ভয় ভাবনায় পড়েচে, অন্য কোন দিকে ততটা খেয়াল ছিল না। আবার এরা সব ফোঁটাওয়ালা, গোলাম পাগড়ীওয়ালা। গোলামকে আস্তে দেখে সব বলাবলি করতে লাগল, "এই যে গোলাম আসচে, তা হলে রাজা রাণী কাছেই কোথাও আছে।"

গোলামের পাগড়ী এলোথেলো, মুখ পাঁশুটে বর্ণ, গলায় কালশিরা পড়েচে। সে আস্তেই টেক্কা জিজ্ঞাসা করলে, "রাজা রাণী কোথায়?"

গোলাম বললে, "সেই কথা ত আমি জানতে এসেচি।"

"বিলক্ষণ, তুমি থাক রাজবাড়ীতে, তুমি সে খবর রাখ না?"

"কাল রাত্রে গিয়েছিলাম নতুন পাড়ায় নিমন্ত্রণে। ফিরতে অনেক রাত্রি হল। ফিরে যাবার সময় দেখি আট ঘাট বন্ধ, ঘাটিতে ঘাটিতে পাহারা। মুখস পরা সব পেল্লায় পেল্লায় মানুষ, কোন দেশের লোক তা জানি না। আমি বললুম, আমি যাব রাজবাড়ী, পথে আমাকে আটক কর কেন? যমদূতের মত একটা লোক বল্লে, কোথায় তোর রাজবাড়ী আর কোথায় তোর রাজা? এই বলে আমায় এমন গলাধাক্কা দিলে যে আমার গলার হাড় যেন ভেঙ্গে গেল। তার পর পথের ধারে একটা ঘরে আমায় পুরে বাইরে থেকে শিকল দিলে। সকাল বেলা আমার চেঁচামেচি শুনে রাস্তার একটা লোক দরজা খুলে দিলে। শুনলুম রাজবাড়ীতে জনমনুষ্য নেই।"

ফোঁটাওয়ালারা ভয়ে জড়সড়, এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। টেক্কা বল্লে, "কই, এ কথা ত আমাকে কেউ কিছু বলেনি। তারা রাক্ষস নয় ত, হয়ত রাজা রাণীকে খেয়ে ফেলেছে!"

গোলাম বল্লে, "যেমন তুমি এক ফোঁটা তেমনি তোমার বুদ্ধিও এক ফোঁটা! রাক্ষস হলে আমাকে খেত না? তারা যাবার সময় বলে গেল এদেশে আর আসবে না, এখানকার কাজ হয়ে গিয়েচে।"

তখন সব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। টেক্কার কিন্তু ভারি রস হয়েছিল, গোলামকে চোক রাঙ্গিয়ে বল্লে, "জান না আমি টেক্কা?"

গোলাম বল্লে, "জান না আমি গোলাম, একা এক কুড়ি? আর তুমি কি? যতক্ষণ রাজারাণী ততক্ষণ তুমি টেক্কা, নইলে শুধু ফোক্কা। তোমার চেয়ে দুরীও বড়।"

টেক্কা থ হয়ে গেল। গোলামের কথা শুনে সকলে ভাবতে লাগল যদি রাজারাণী গেল, তা হলে রাজ্য চালাবার কি উপায়?

(৩)

রাজারাণীই যেন গিয়েছে, তা বলে দেশটা ত আর যায়নি। দেশ ত রক্ষে করতে হবে, দেশের কাজ কর্ম্ম ত চালাতে হবে! রাজা গেলে দেশ অরাজক হয় সত্য কিন্তু রাজা যদি মোটেই না থাকে তা হলে ত আর একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, হাত গুটিয়ে চুপটী করে বসে থাক্‌লে ত হবে না। রাজারাণী ত একেবারে গিয়েছে আর ফিরবে না। রাজবাড়ীও ভোঁ ভাঁ করচে, লাগায়েৎ রাজারাণী থেকে ইস্তক মশালচী মেথর পর্য্যন্ত নেই। যদি আবার একটা নতুন রাজা করে রাজবাড়ীতে রাখা যায় তা হলে সেই মুখস আঁটা তালগাছের মত মানুষগুলো আবার রাতারাতি এসে তাকে নিয়ে যাবে, হয়ত রাগ কোরে সহর শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে, ফোঁটাওয়ালাদেরও আর কেউ দেখতে পাবে না। না বাপু, রক্ষে কর, রাজারাণীতে আর কাজ নেই! চাচা, আপন বাঁচা!

ভাবতে ভাবতে হরতন আর রুইতন ত একেবারে ফিকে হয়ে গেল, ইশকাপন্ আর চিড়ীতন ভয়ে আরও কালো হয়ে গেল।

টেক্কা বলে, "তাইত, ছিলুম আমরা বেশ, কোত্থেকে এ এক বিষম বিভ্রাট এসে উপস্থিত। তা গোড়ার কথা এই যে রাজা যদি নাই রইল তা হলে প্রধান হবে কে? মাথার উপর ত একজন থাকা চাই।"

দুরী বেচারি নিতান্ত গরীব কিনা আর সকলের নীচে তার স্থান, তাই সে সকলের খোসামোদ করে। বল্‌লে, "প্রধান ত আপনি রয়েছেন। আপনার পায়া রাজার উপর। আপনি ত একা একেশ্বর।"

টেক্কা বুক ফুলিয়ে চার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "তা বটেই ত, আমি ত রাজার উপরে রবাবর টেক্কা দিয়ে এসেছি। প্রধান আমি ছাড়া কে হবে?"

গোলাম ঠোঁটকাটা, তা না হলে গোলাম হবে কেন? বল্‌লে, "ওগো টেক্কা মশাই, একবার যা বলা হয়েচে সে কথাটা আবার পাল্টে শুনতে হবে না কি? তবে শোন—

রাজারাণীর পাশে থেকে টেক্কা হল ধন্য,
রাজারাণী গেল যদি, টেক্কা তবে শূন্য!"

সকলে বল্‌লে, "বাঃ বাঃ বেশ বলেচ! রাজারাণী যদি গেল তবে টেক্কা বড় হল কিসে? আমরা সবাই ওর চেয়ে বড়। ফোঁটা গুণে দেখ।"

বাহবা পেয়ে গোলামের গুমর বেড়ে গেল। বল্লে, "এখন আমিই ত প্রধান, এখন সব কাজের ভার আমার উপর। তোমরা কেউ উজীর হবে, কেউ খাজাঞ্চি হবে, কেউ সেনাপতি হবে।"

এতক্ষণ ছক্কা একটা কথাও কয়নি। এখন বল্‌লে, "তা হলে তুমিই রাজা হলে। রাজার সিংহাসনে গোলাম বস্‌বে।"

সাতা বল্‌লে, "তাও কি কখনও হয়?"

গোলাম বল্‌লে, "কেন, আমিই ত সব চেয়ে বড়। আমার উপর তুরুপ চলে না।"

পঞ্জা বল্‌লে, "হাঁ, সে গ্রাবুতে। আর গোলাম চোরের বেলা তোমায় পোঁছে কে? গ্রাবুর বেলা সব নিজেদের বেছে বেছে নেওয়া হয়, আমরা সব ফ্যালনা কিনা, তাই আমাদের বাদ দেওয়া হয়, আমরা উপুড় হয়ে কি চিৎ হয়ে পড়ে থাকি, আর ওঁরা মজা লুটেন। বিন্‌তি, পঞ্চাশ হন্দর সব কাঁড়ি কাঁড়ি ওঁদের ঘরে আর আমরা সব সাক্ষী গোপাল, হাঁ কোরে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত চেয়ে থাকি।"

চৌকা বল্‌লে, "এই ত হল কথা! রাজারাণী যখন নেই তখন গোলাম কোথাকার কে? কাল রাত্রে রাজবাড়ীতে থাক্‌লে ত ওকেও ধরে নিয়ে যেত।"

সুযোগ পেয়ে টেক্কা বল্‌লে, "ওর কি সে হুঁশ আছে? গোলামের আর কত বুদ্ধি হবে বল? আস্পর্দ্ধাখানা একবার দেখ! উনি আমার চেয়ে বড় হতে চান!"

দুরী ধামাধরা কিনা। বল্‌লে, "আস্পৰ্দ্ধা না আস্পৰ্দ্ধা! টেক্কা মশাই থাক্‌তে গোলাম হল বড়!"

গোলাম গরম হয়ে বল্‌লে, "কি তোমরা টেক্কা টেক্কা করচ? ওর না আছে চাল না আছে চুলো, না আছে লোক না আছে জন। ও ছিল রাজারাণীর ল্যাংবোট, জাহাজই যদি ডুবল ত ও কোথায় ভেসে যায় কে তার খোঁজ রাখে!"

পঞ্জা বল্‌লে, "অত গরম হয়ো না, গোলাম বাবাজি! কি যে হয়েছে তা তুমি মোটেই বুঝতে পারচ না। তাতে তোমার দোষ দিচ্চি নে, কেন না বুঝতেই যদি পারবে তা'হলে চিরকাল গোলামী করবে কেন? আসল কথাটা কি জান? কাল রাত্রে যে কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, তার মানে যুগ উল্‌টেছে। রাজা রাণী, গোলাম টেক্কা ওসব কিছুরই পাট থাকবে না। আবা কাবা পাগড়ী পেশোয়াজ প'রে ময়ূরের মত প্যাখম ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ান আর চলবে না। তোমরা দুজন এখন নিজের নিজের পথ দেখ।"

সকলে বল্‌লে, "বেশ বলেচ, বেশ বলেচ, এর উপর আর কথা নেই!"

আসরে আমল পেয়ে পঞ্জা বল্‌তে লাগল, "এতদিন তোমরা আমাদের বাদ দিয়েছিলে, যা ইচ্ছে তাই কোরতে। এখন থেকে তোমরা বাদ পড়বে, টেক্কা কিম্বা গোলাম কাউকে আমরা চাইনে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লী আর চলবে না। রাজা রাজড়ার চেয়েও বড় পঞ্চায়েত। পাঁচে যা বল্‌বে তাই হবে। এখন আবার সেইদিন এসেছে। সব ক্ষমতা পাঁচের হাতে হবে।"

দহলা বল্‌লে, "রসো ঠাকুর, একটু বুঝে সুঝে বল। এ ত আর ছেলের হাতে মোয়া নয় যে কাকের মত খপ্ করে হাত থেকে কেড়ে নেবে? পাঁচের কথা চলবে না দশের কথা?"

টেক্কা ও গোলাম হালে পানি পায় না। তবু গোলাম চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। বল্‌লে, "তা হলে প্রধান হবে কে, পঞ্জা না দহলা?"

টেক্কা বল্‌লে, "কেউও কারুর কথা শুন্‌বে না। যার যা খুসী বললেই হল।"

আটা আর থাক্‌তে না পেরে বল্‌লে, "তবে তুমি বুঝি আর কারুর খুসীতে কথা কইছিলে ?"

তিরী। "কেমন, টেক্কা মশাই, তুমি ত একা এক শো, এখন কথাটার জবাব দাও।"

পঞ্জা বললে, "ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা কোন ঠেসা হয়েছে, যা ইচ্ছে বলুক গে। আমি যে প্রধান হব এমন কথা আমি বলি নি, মনেও করি নি। পাঁচজনে যা করবে তাই হবে। অবশ্য, পাঁচ জনের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু আমি একা কোন ক্ষমতা চাইনে। পাঁচের সমান কে আছে ? পঞ্চ কন্যা, পঞ্চ পাণ্ডব। মহাভারত ত পাঁচ পাণ্ডবকে নিয়ে।"

এ কথায় অনেকে পঞ্জার দিকে ঝুঁক্‌ল। ছক্কার একটু আত্মপ্রসাদ হল। বললে, "সেই জন্য ত পঞ্জা ছক্কা বলে। যার দিক পঞ্জা ছক্কা প'ড়ে তারই জিত। আর বোম্‌ ছক্কা হলে ত কথাই নেই।"

সাতা বল্‌লে, "আমি নিজের কথা বল্‌তে চাইনে, কিন্তু রঙের বেলা আমি হাতে এলে ত আমার বদলে সব পাওয়া যায়। এখন কি আমাকে বাদ দেবে ?"

দহলা। "আমার কথা কি চাপা পড়ল না কি ? যেখানে ইচ্ছে হয় গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, লোকে পাঁচের কথা শোনে না দশের কথা শোনে ?"

দুই পক্ষে অনেক কথা, অনেক তর্ক হল, কিন্তু কিছু মীমাংসা হল না। অনেক বেলা হয়ে গেল বলে সে দিনকার মত সভা স্থগিত রইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"চন্দ্রগুপ্ত"-এর গান *

[রচনা——————স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্‌-এ]

(পঞ্চম গীত)

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুক-বালা

ইমন ভূপালী ——————যৎ।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,—
গর্জ্জে সিন্ধু ; চলিছে তরণী !—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি' সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর !—
"ওঠ্‌ মা ওঠ্‌ মা দেখ্‌ মা চাহি'
এই ত এসেছি আর চিন্তা নাহি—
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্‌ মা ওঠ্‌ মা প্রদীপটী ধর।
লঙ্ঘি' বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এসেছি ত আজি

কোথায় জননী ? গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
একি !—কুটীর যে মুক্তদ্বার !
নির্ব্বাণ দীপ !—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী ! কোথায় জননী !
শূন্য যে শয্যা—শূন্য যে ঘর।"—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে.
চরণাঘাতে . বজ্র-নিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর ॥

* "চন্দ্রগুপ্ত"-এর গানের স্বরলিপি 'বঙ্গবাণী'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

[স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

০ ৩ ১' ২ ০ ৩
II{গা গা | রা রা I সা -া | সসা সা | সা -ধ্‌া | গা গা I
ঘ ন ত ম সা • বৃ ত অ ম্ ব র

১' ২ ০ ৩ ১' ২
I গা গা | গা -া | রা -গা | পা -া I পা -া | পা -া |
ধ র ণী • গ র্ জে • সি ন্ ধু •

০ ৩ ১' ২ ০ ৩
| পা পা | পা -ক্ষাপধা I ধা ধা | ধা -া | পা ধপা | -র্সা র্সা I
চ লি ছে • • • ত র ণী • গ ভী• • র

১' ২ ০ ৩ ১' ২
I র্সা -া | র্সা -া | পা -া | পা পা I পা -া | পা -া |
রা • ত্রি • গা • হি ছে যা • ত্রী •

০ ৩ ১' ২ ০ ৩
| গা -া | গা গা I রা -গরা | সা -ধ্‌া | সা রা | সরা -গা I
স্তে • দি সে ঝ •এ্ ঝা • উ ঠি ছে• •

১' ২
I গা -া | গা -া} II
ম • র

০ ৩ ১' ২ ০ ৩
II{গা -া | গা -পা I পা -া | পা -ধা | না -া | না -ধনর্সা I
ও ঠ্ মা • ও ঠ্ মা • স্থে থ্ মা • • •

১' ২ ০ ৩ ১' ২
I র্সা -া | র্সা -া | র্সা নর্সর্রা | র্রা র্রা I র্রা র্রা | র্রা -া |
চা • হি • এ ই•• ত এ সে• ছি আ র্

১´ ২ ০ ৩
| র্সা র্রা | র্সর্রা -র্গা I র্গা -া | র্গা -া} | {র্গা র্পা | র্গা -া I
চি ন্ তা॰ ॰ না ॰ হি ॰ জ ন নী ॰

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I র্রা -র্গা | র্রা -া | র্সা -া | র্সা -নর্সা I ধা -া | পা -া |
হী ॰ না ॰ ক ন্ ভ্যা ॰॰ দী ॰ না ॰

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
পা -ধা | না -া I না -া | না -র্সা | ধা না | -র্রা র্সা I
ও ঠ্ মা ॰ ও ঠ্ মা ॰ প্র দী প্ টী

১´ ২
I র্সা -া | সা -া} II
ধ ॰ র ॰

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
II{র্সা -া | র্সা র্সর্রা I না -া | না -া | ধা -া | ধা ধা I
ল ঙ্ ঘি ব॰ না ॰ নী ॰ প র্ ব্ব ত

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I পা -ক্ষা | ধা -পা | পা -ধা | না না I না না | না নর্সা
রা ॰ জি ॰ তো র্ কা ছে এ ই আ মি॰

| ধা র্রা | র্রা র্রা I র্রা -া | র্গর্রা -া}} | {র্রা র্রা | -র্সা র্গা I
এ সে ছি ত॰ আ ॰ জি॰ ॰ কো থা ॰ য়

১ ২ ০ ৩ ১´ ২
I র্গা র্গা | র্গা -া | র্সা র্সা | -া র্সা I র্রর্সা র্সা | র্সা -া |
জ ন নী ॰ গ ভী ॰ র র॰ জ নী ॰

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
| পা -া | পা -া I পা পা | পা -া | পা পা | পা -ম্ধা I
গ র্ জে ০ অ শ নি ০ ব হি ছে ০০

১´ ২
I ধা -া | ধা -া} II
ঝ ০ ড় ০

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
II{ রা -া | রা -া I গা ম্মা | ম্মা ম্মপা | পা -ম্মা | গম্মপা -া I
এ ০ কি ০ কু টী র যে০ যু ক্ ত০০ ০

১´ ২ ০ ৩ ১ ২
I পা -া | পা -া | পা -া | পা ধা I ধা -া | ধধা ধা
যা ০ র ০ নি র্ ব্বা ণ দী প্ গৃ হ

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
| পা -ধা | -পধা না I না -া | না -া}| {না না | ধনর্সা -া I
অ ০ ০ন্ ধ কা ০ র ০ কো থা য়০০ ০

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | নর্সর্রা -া I র্রা র্রা | র্রা -া |
জ ন নী ০ কো থা য়০০ ০ জ ন নী ০

০ ৩ ১´ ২
| পা -া | ধা না I না -া | না -া | পা -র্গা | র্গা র্গা I
শূ ০ ন্য যে শ ০ য্যা ০ শূ ০ ন্য যে

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I র্গা -া | র্গা -া}| {সা -া | -া -া I গা -া | গা -া |
ঘ ০ র ০ সে ০ ০ ০ ধ্ব ০ নি ০

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
| পা -া | পা -া I পা -া | -া -া | পা -া | -া -া I
উ ॰ ঠি ॰ য়া ॰ ॰ ॰ আ ॰ ॰ র্

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I পা -া | পা -া | পা -া | -ক্ষা -পা I ধা -া | -া -া
শু ॰ নি ॰ না ॰ ॰ ॰ দে ॰ ॰ ॰

| পা -া | পা -া I -া -া | পা -া | গা -া | গা -া I
বি ॰ ধা ॰ ॰ ॰ তৃ ॰ চ ॰ র ॰ ॰

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I গা -া | -া -া | রা -া | গা -া I সরা -গা | -া
পে ॰ ॰ ॰ প ॰ ড়ি ॰ য়া ॰ ॰ ॰

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
| গা -া | -গা -া I সা -া | -গা -া}|{গা -া | র্সা -া I
কাঁ ॰ ॰ ॰ দে ॰ ॰ ॰ চ ॰ র ॰

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I র্সা -া | -র্সা -া | র্সা -া | -র্সা -া I র্সা -া | -া -া |
পা ॰ ॰ ॰ ষা ॰ ॰ ॰ ত্তে ॰ ॰ ॰

১´ ২ ০ ৩
ধা -া | -া -া I ধা -া | -া -া | পা -া | পা -া I
ব ॰ ॰ ॰ ন্ধ ॰ ॰ ॰ নি ॰ পা

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I -া -া | পা -া | গা -া | -া ।I গা -া | গা -া |
॰ ॰ তে ॰ মূ ॰ র্ ॰ ছি ॰ য়া ॰

১´
| রা -া | রা -া I রা -া | রা -া | ধ্া -া | ন্া -া I
প • ড়ি • ল • সে • অ • ব •

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২
I রা -া | -া -া | সা -া | -া -া I সা -া | -া -া} IIII
নী • • • প • • • র • • •

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—"চন্দ্রগুপ্ত"-এর প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত চারিটী গানের স্বরলিপি, "নারায়ণ" নামক মাসিক পত্রিকায় পর্‌পর্‌ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে বাকী গানগুলির স্বরলিপি "নারায়ণ"-এ প্রকাশিত না হইয়া "বঙ্গবাণী"তেই প্রকাশ করা হইবে।

——————লেখিকা

বাংলার নবযুগের কথা

অষ্টম কথা

রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ

(১)

বাংলার নবযুগের কথায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জীবন ও সাধন উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, এমন কি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও দেশবিদেশে যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বাবুর সে প্রতিষ্ঠা ছিল না। মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দ এবং শাস্ত্রী মহাশয়, তিনজনই এক একটা সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিছনে এরূপ কোনও দল ছিল না। সুতরাং তাঁহার যশ ও খ্যাতি ততটা পরিমাণে চারিদিকে ছড়াইয়াও পড়ে নাই।

রাজনারায়ণ বাবুর বিশেষ প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে। আর এ ক্ষেত্রেও তিনি যে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। তবে যে দু'তিনখানা বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই সে সময়ের বাংলা সাহিত্যে তাঁহার একটা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁর "একাল ও সেকাল" বাংলা সাহিত্যে একখানা শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। বসু মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও একজন লেখক

ছিলেন। আধুনিকভাবে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথমে ধর্ম্মবিজ্ঞানের বা Science of Religion এর আলোচনা করেন। তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" বাংলা ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রথম গ্রন্থ। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রাজনারায়ণ বাবুর আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে বসু মহাশয়ের মনীষা এবং স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার নবযুগের ইতিহাসে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা এই সকল গ্রন্থ দ্বারা হয় নাই। তাঁহার "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব"-বিষয়ক বক্তৃতা এবং বাংলাদেশের ইংরাজীনবীশদিগের মধ্যে স্বাজাত্যাভিমানের অনুশীলন করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন, তাহার দ্বারাই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে রাজনারায়ণ বাবুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার দৌহিত্র। এই প্রসঙ্গে আমাদের গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় কেহ কেহ রাজনারায়ণ বাবুকে Grand-father of Indian Nationalism বা ভারতের জাতীয়তার পিতামহ এই উপাধি দিয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার দৌহিত্র না হইলেও এই কথাটা সর্ব্বতোভাবে সত্য হইত। কারণ এই বাংলাদেশে রাজনারায়ণ বাবুর শিক্ষাদীক্ষাই সর্ব্বপ্রথমে স্বাদেশিকতার স্রোত আনিয়াছিল। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই বসু মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু তিনি 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন যে একজন তাঁহাকে Grand-father of Nationality এই উপাধি দিয়াছিলেন।

সে কালের ইংরাজী নবীশদিগের মতন প্রথম যৌবনে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও পাশ্চাত্য সাধনার প্রভাবে সংশয়বাদী হইয়া উঠেন। তিনি নিজেই কহিয়াছেন,—

"কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি সংশয়বাদী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর ও আমার পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈত্রিক ও সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হইল। লালা হাজারীলাল প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ইঁহার বাটী ইন্দোরে ছিল, ইঁহার একটী প্রণবাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরী ছিল। তখন যে ব্রাহ্ম হইত তাহাকে একটী ঐরূপ স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। প্রণবের নীচে পারস্য ভাষায় ইঁ হাম্ নমাহদ্ মান্দ্, এইরূপ রহিবে না, এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। এই বাক্য দেখিতে পাইলে বিপদের সময় সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে, এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে, এই জন্য ঐ বাক্য অঙ্গুরীতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। লালা সাহেব প্রতিদিন প্রাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পত্র অনেকগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহির হইতেন, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সেগুলি স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া হাজির করিতেন।

"যে দিন প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইংরাজী ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সেদিন আমি স্বগ্রামের দু একজন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি সেদিন বিস্কুট ও শেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য উহা করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। ......ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের

সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী অথবা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল।"

কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বোধ হয় কোনও দিনই জাতীয়তা বা Nationality র আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে তিনি এক পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি মহর্ষিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে অনুরোধ করেন। ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির, ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে। তখনও মহর্ষি তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই সূত্রেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরিচয় ও আত্মীয়তা আরম্ভ হয় এবং রাজনারায়ণ বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন।

(২)

রাজনারায়ণ বাবুর পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয় রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমান হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এই স্কুল ছিল। নন্দকিশোর বসু মহাশয় স্কুল ছাড়িয়া কিছুদিন রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কাজ করেন। ব্রহ্মসভা সংস্থাপনের পরে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, নন্দকিশোর বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। নন্দকিশোর রামমোহন রায়ের শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া একদিকে যেমন বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অনুরাগী হয়েন, সেইরূপ অন্যদিকে স্বদেশের প্রতিও অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া উঠেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পিতার নিকট হইতেই অজ্ঞাতসারে বৈজিক নিয়মাধীনে তাঁহার আমরণসাধ্য সরল ও সতেজ স্বাদেশিকতার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এইজন্যই তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া যতটা পরিমাণে ইংরাজের অনুকরণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বাবু সেরূপ ব্যগ্র হন নাই।

মহর্ষির সঙ্গে বন্ধুতাও বসু মহাশয়ের এই স্বাদেশিকতাকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজদিগের সঙ্গে কিছুতেই মেশামেশি করিতে চাহিতেন না। মিস্ কার্পেণ্টার এদেশে আসিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। মিস্ কার্পেণ্টারের পরিবার-বর্গের সঙ্গে বিলাতে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। সেই সূত্রেই তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠেন। একথা শুনিয়া মহর্ষি কলিকাতা ছাড়িয়া তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থ কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার "আত্মচরিতে" লিখিয়াছেন :—

"দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। কৃষ্ণনগরের প্রিন্সিপ্যাল লব (Lobb) সাহেব কোনও সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন——"The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans."

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিগত স্বাজাত্যাভিমানও বোধ হয় বসুজ মহাশয়ের প্রকৃতিগত স্বাজাত্যাভিমানকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। পানাহার বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু হিন্দু সমাজের কোন আচার বিচারই মানিতেন না। সমাজ-সংস্কার কার্য্যে তিনি কখনই পেছপাও হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ সংস্কারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইবার পরে নিজের পরিবারে ইহা অকুতোভয়ে প্রচলিত করেন। এই আইন অনুসারে প্রথম বিবাহ হয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের। বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন :—

" যে দিন তাঁহার বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টানের ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কীর সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পাণিহাটীর মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়া মহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিস্কৃত হইলাম। দুর্গাচরণ বসু যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজ্যে তাঁহার পাল্কীর ভিতর মুখ দিয়া বলিলেন—'দুর্গা, তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি'......বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে 'রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আসিলে আমরা ইট মারিব।' তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, 'তাহাতে আমি খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে তাঁহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল, তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন, তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।' "

রাজনারায়ণ বাবু তখন মেদিনীপুর স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন। মেদিনীপুরেও এই লইয়া কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তখনকার উকীল-সরকার হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাবু জানেন না কি তিনি বাংলা ঘরে বাস করেন, অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে তাহা পুড়াইয়া দিতে পারি। সে সময় এই লইয়া একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইতে পারে, এই আশঙ্কাও হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন যে এইজন্য

তিনি ও তাঁহার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেড-মাস্টার হইয়াছিলেন) ইহাঁরা দুইজনে মেদিনীপুরের নিকটে জঙ্গলে যাইয়া দুইটা মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসেন। "যদি দাঙ্গা হয়, সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।" রাজনারায়ণ বাবুর এই ক্ষাত্রভাবটা বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। আমি যখন তাঁহার প্রথম দর্শনলাভ করি, তখন রাজনারায়ণ বাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া উটিয়াছে। শরীরটাও যে খুব দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই বয়সে, সেই শরীর লইয়া, সেই প্রথম দেখার দিনেই কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন :—"আমি বেশী দিন বাঁচব এমন আশা ত করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারি, তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে করিব।"

(৩)

রাজনারায়ণ বাবু সেকালের ইংরাজী-নবীশদিগের মতন প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন। এই যুক্তিবাদই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া আনে। কিন্তু এই যুক্তিবাদ তাঁহাকে নাস্তিকও করিতে পারে নাই এবং বিদেশের অনুচীকির্ষাতেও প্রণোদিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের অগ্রণীদল গণ্য হইলেও রাজনারায়ণ বাবু স্বদেশের সভ্যতা এবং সাধনার প্রতি কখনও শ্রদ্ধাহীন হয়েন নাই। দেশ-প্রচলিত প্রতিমা-পূজা বর্জ্জন করিয়াও তিনি বেদ ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান যে জগতের সকল ধর্ম্মতত্ত্বের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতর, একথা সর্ব্বদাই প্রচার করিতেন। কিন্তু স্বদেশের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহাকে অন্যান্য দেশের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করে নাই। রাজনারায়ণ বাবু ইংরাজীতে বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল্ প্রভৃতি খুবভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন বাইবেলের সার-সংগ্রহ করিয়া Precepts of Jesus প্রচার করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বাবুও সেইরূপ একখানি সার-সংগ্রহ করেন, এবং Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists এই নামে উহা ছাপাইয়া প্রচার করিবার ভার তাঁহার জামাতা সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপরে অর্পণ করেন। রাজনারায়ণ বাবু খুব ভাল ফার্শী জানিতেন। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও একখানি অনুরূপ গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। সেখানি মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠযোগ থাকা সত্বেও রাজনারায়ণ বাবু এদেশে হিন্দুর পক্ষে "সুমহৎ বেদ-বেদান্ত অবলম্বন" করিয়াই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করা উচিত, ইহা মনে করিতেন; এবং ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মসাধন বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মই জগতের সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বিশ্বাস করিতেন। সেই জন্য রাজনারায়ণ কখনওই নিজেকে কেবল Theist বা একেশ্বরবাদী কহিতেন না; বিদেশীয়দিগের সঙ্গে পত্র-

ব্যবহারে সর্ব্বদাই নিজেকে Hindu Theist বলিয়া বর্ণনা করিতেন। রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াও একদিনের জন্য নিজের হিন্দুত্বের গৌরব বিস্মৃত হন নাই।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পূর্ব্ব বৎসর ১৮৯৮ ইংরাজীতে আমি বিলাতের ব্রিটিশ এবং ফরেন য়ুনিটেরিয়ান এসোসিয়েসনের (British & Foreign Unitarian Association) বৃত্তি লইয়া অক্সফোর্ডে য়ুনিটেরিয়ানদিগের নিউ ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তত্ত্ববিদ্যা ও খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে যাই। বিলাত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে দেওঘরে যাইয়া রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। একদিন মাত্র তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু সেদিনের কথা জীবনে ভুলিতে পারিব না। সেই দিন সর্ব্বপ্রথমে বসু মহাশয়ের জীবনব্যাপী ব্রহ্মসাধনের সঙ্কেতটী ধরিতে পারিয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ধর্ম্মপ্রচারব্রত-গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্ম যুবক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে কি?" প্রশ্নটা শুনিয়াই বেচারী থতমত খাইয়া যায়। বসু মহাশয় তখন কহেন, "ব্রহ্মদর্শন লাভ যাহার হয় নাই, সে আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে কি করিয়া?" কথাটা শুনিয়া আমিও চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, রাজনারায়ণ বাবুর ধর্ম্মপ্রচারের আদর্শ কতটা উঁচু। যে নিজে সিদ্ধিলাভ করে নাই, সে অপরকে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিবে কিরূপে? কথাপ্রসঙ্গে বসু মহাশয় আবার কহিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে সচরাচর যেভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহা সত্য উপাসনা নহে। একটী ব্রাহ্মবন্ধুর নাম করিয়া কহিলেন, "অমুককে জান ত? তিনি আমার এখানে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। আর প্রতিদিন দুবেলা চোখ বুঝিয়া কত কি বিড়বিড় করিয়া বকিতেন। এই তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা ছিল। আমি একদিন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, "এই বিড়বিড় করিয়া কি কেবল ব'ক? ইহাতে কি ব্রহ্মের উপাসনা হয়? ব্রহ্মের উপাসনা যদি করিতে চাও তাহা হইলে ওই বাহিরে যাও, আর চোখ মেলিয়া একবার এই আকাশপানে তাকাইয়া দেখ।" বুঝিলাম এই বৃদ্ধ সাধক কোন্ পথে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিয়াছিলেন। আমার বিলাত যাইবার প্রসঙ্গ উঠিলে রাজনারায়ণ বাবু কহিলেন, "দেখ, আমি বিলাত গিয়া ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষপাতী নহি। তোমাদের শিবনাথের মতন আমি বিলাতী শাস্ত্রী নহি। ইংরাজেরা ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু শিখাইতে পারে এ বিশ্বাস আমি করি না। লাভের মধ্যে তাহাদের সংসর্গে আমাদের প্রকৃতি বিগড়াইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তাদের যদি আমাদের ধর্ম্মকথা কিছু শুনাইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে যাও। নতুবা তত্ত্বজ্ঞান বা ধর্ম্মলাভের আশায় সে দেশে যাইও না।"

আমরা ভারতবর্ষের লোক, বর্ত্তমানে যতই অধঃপতিত হই না কেন, জগতের একটা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী বলিয়া মানবসমাজে আচার্য্যের আসনে আমাদের অধিকার আছে, চিরদিন রাজনারায়ণবাবুর এই বিশ্বাস ও অভিমান ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজনারায়ণবাবু নিজে কহিয়াছেন যে এই

বক্তৃতাতেই পরবর্ত্তী হিন্দু পুনরুত্থানের বা Hindu Revivalএর ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। যেকালে এদেশের ইংরাজী নবীশেরা হিন্দু ধর্ম্মকে ভ্রম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতেন, নূতন কৃতবিদ্য সমাজে হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই উপেক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে একজন ইংরাজী নবীশের পক্ষে একদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপাদি প্রকাশ্যভাবে বর্জ্জন করিয়াও অন্যদিকে হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করাতে কতটা সৎসাহস এবং স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর এই স্বাজাত্যাভিমানের প্রথম পুরোহিত ও প্রচারকরূপেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাংলার নবযুগের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

এখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে এই বিদ্যা মন্দিরের ভিতরে বরণ করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু একদিন ছিল যখন এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য সন্তানেরা বাংলা ভাষায় পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তাও কহিতেন না, পত্রব্যবহারও করিতেন না। অথচ সেই যুগেই কৃতবিদ্য রাজনারায়ণ বসু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বাংলা ভাষাটা চালাইবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরে তাঁহাদের এক সভা ছিল। এই সভার মজলিসে সভ্যদিগকে খাঁটী বাঙ্গালাতে কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। এসকল কথোপকথনে ইংরাজী শব্দের বুক্‌নী দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনও সভ্য কোনও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার জন্য তাঁহার অর্থদণ্ড হইত। প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের জন্য বোধহয় এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইত। এই উপায়ে সভার অর্থাধারে বেশ দু'পয়সা সঞ্চিত হইত। এই সকলই রাজনারায়ণ বসুর আযৌবনসিদ্ধ স্বাদেশিকতার প্রমাণ।

(৪)

রাজনারায়ণ বাবু কেবল ধর্ম্মে বা তত্ত্বজ্ঞানেই নিজের দেশকে জগতে বরেণ্য করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু যে সকল শক্তি এবং সাধনা থাকিলে একটা জাতি সর্ব্বতোভাবে মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠের পদবী প্রাপ্ত হয়, নিজের দেশবাসীদিগকে সে সকল শক্তি ও সাধনাসম্পন্ন করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে স্বাজাত্যাভিমান ছিল না বলিলেই চলে। কৃতবিদ্যেরা নিজেদের হীনতাবোধে সর্ব্বদাই অবনত হইয়া থাকিতেন। বিদেশীয়েরা তাঁহাদের অপেক্ষা যে কত বড় ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের মুখে স্বদেশের গৌরবের কথা ফুটিবার অবসর পাইত না। জন সাধারণেরও গতানুগতিকভাবে দেশে যাহা চলিয়া আসিয়াছিল তাহারই অনুবর্ত্তন করিলেও জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বা গৌরবের কোনও হেতু আছে ইহা ধরিতে পারিত না। কৃতবিদ্যেরা ইংরাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। জনসাধারণে ইংরাজের অভ্যুদয় ও প্রবল প্রতাপের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কাহারও মধ্যে ঈষৎ পরিমাণেও স্বাজাত্যাভিমান অঙ্কুরিত

হয় নাই। সমাজের এই অবস্থায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একদিকে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা করেন, এবং অন্যদিকে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"এই সভার কার্য্যবিবরণ হইতে "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal" রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা 'good night' না বলিয়া 'সুরজনী' বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন ;. আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন।"

রাজনারায়ণ বাবু বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার সমাধির উপরে, তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত এই কথাগুলি যেন অঙ্কিত থাকে !

"প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।

স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতি সমূহের মধ্যে গণ্যজাতি হইবে। এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন!"

এই কয়টি কথার ভিতরেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চরিত্রের ও সাধনার মূল প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেই আমরা তাঁহার গভীর এবং আমরণসাধ্য স্বজাতিপ্রীতির এবং স্বাজাত্যাভিমানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই। আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্যসমাজে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম গুরু ছিলেন। তাঁহার Grand-father of Indian Nationalism উপাধি সর্ব্বতোভাবে সার্থক ছিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

প্রেমের গান

আমাদের—দোঁহার প্রেমের দুই পাখাতে ভর করে' গান
ছুটল দেশে দেশে,
বলাকা—শ্রেণীর মত মাল্য রচি নীল আকাশে
চল্‌ল ভেসে ভেসে।
চমকি—পল্লীবধূ ঘাটের পথে কল্‌সী কাঁখে,
থমকি—তুল্‌বে গ্রীবা, চাইবে কিবা উদাস আঁখে।
নাগরী—হর্ম্ম্যচূড়ে নাগর প্রিয়ে আঙুল দিয়ে
দেখাবে তায় হেসে॥

সহসা—তরুণ পথিক তাদের হেরে উদাস-প্রাণে
যাত্রা যাবে ভুলে,
মাঝিরা—দেখবে অবাক, ঠেকবে তাদের অলস দাঁড়ের
নৌকা গিয়ে কূলে।
ইহারা—বাসর ঘরের বাতায়নের আশে পাশে
সারারাত—করবে কূজন, শুনবে দুজন রসোল্লাসে,
আঙিনায়—রচবে কুলায় তুলসী তলায়, বধূ সভায়
বসবে ঘেঁষে ঘেঁষে॥

এ গানে—সুবর্ণেরে পায়ে ঠেলে সুবর্ণারে
বাস্‌বে সবাই ভালো,
ইহারা—নীরস আঁধার জীবন নিশায় আনবে উষা
ঢাল্‌বে প্রেমের আলো।
ইহারা—উড়ে উড়ে বস্‌বে অনেক হৃদয় জুড়ে
এ গানে—মানিনীদের মান অভিমান যাবে দূরে।
ইহারা—পাখার হাওয়ায় উড়িয়ে বাধা তরুণ জগৎ
জিনবে অবশেষে॥

শ্রীকালিদাস রায়

পথের রেখা

(১)

অর্দ্ধমলিন রোগশয্যার পার্শ্বে মলিনবসনা নারী বসিয়াছিল। রোগশীর্ণ স্বামীর আননে, লোকাতীত রহস্যগর্ভ হইতে যে কালো যবনিকা দ্রুত অচঞ্চল ও অমোঘগতিতে নামিয়া আসিতেছিল, অপলকনেত্রে নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দীর্ণচিত্তে সে তাহাই দেখিতেছিল। উপায় নাই, কোন পথ নাই। জীবন রক্ষার কোনও সম্ভাবনাই নাই! দীর্ঘ ছয়মাস ধরিয়া যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিয়াছে—জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রাম, যম ও মানুষের বলপরীক্ষা হইয়াছে—তাহাতে চিরজয়ী কালের বিজয় বিষাণ কি ঘোর রবেই আজ না বাজিয়া উঠিয়াছে!

বাহিরেও প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল। ঝটিকার আর্ত্ত চাৎকার, বিদ্যুতের নিষ্ঠুর, চপল হাস্য, বজ্রের ভীম গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে প্লাবনধারা নামিয়া আসিয়াছিল। খোলার চালের ছিদ্রপথে গৃহের কোণে টপ্ টপ্ করিয়া জলের ধারা পড়িতেছিল। শয্যার একপার্শ্বে চারি বৎসরের শিশু অযত্নে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীরগাত্রে একটা ধূমমলিন লণ্ঠন হইতে মৃদু দীপালোকশিখা নির্গত হইতেছিল। সে অত্যল্প আলোকে সাজসজ্জাবিরল ক্ষুদ্র, দীন কুটীরের অন্ধকার সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

রমণী স্থিরভাবে বসিয়া মৃত্যুর লীলা দেখিতেছিল আর মাঝে মাঝে ঝিনুকে করিয়া বিন্দু বিন্দু জল রোগীর মুখে দিতেছিল। বাহিরের দুর্য্যোগ, তাহার ভিতরের প্রলয় ঝটিকার নিকট কত তুচ্ছ! সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, ভীষণতম সঙ্কট সময়ে কেহ তাহার দোসর পর্য্যন্ত নাই। সঙ্গীর মধ্যে শিয়রদেশে অশরীরী কাল পুরুষ, আর শয্যায় নিদ্রিত খোকা! দুশ্চিন্তা, শোক, নৈরাশ্য, আশঙ্কা অসংখ্যবার তাহার দেহ ও মনে ভীষণ শিহরণের সঞ্চার করিয়া বুঝি আজ একেবারেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল! অশ্রু?—বুঝি তাহারও উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল!

রোগীর ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। এখন ত আর সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে না! শুধু বক্ষপঞ্জরের আন্দোলন!

নিতান্ত অসহায়ভাবে নারী একবার ঊর্দ্ধপানে চাহিল! নাই, নাই! আশার ক্ষীণতম আলোকরেখা কোথাও নাই! শুধু অন্ধকার—সীমাহীন, দুরতিক্রম্য অন্ধকারের সমুদ্র তাহার ভবিষ্য জীবনপথের সম্মুখে সগর্জ্জনে প্রলয়নৃত্য করিতেছে!

"মা গো!"

সে দীর্ণ বক্ষের আর্ত্তক্রন্দন কুটীর মধ্যস্থ বায়ুমণ্ডলে অনুরণিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাকে

সান্ত্বনা দিবার, তাহার মহাদুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার কেহই ত ছিল না। শুধু ঝঞ্ঝার প্রবাহ রুদ্ধ জানালা ও দরজায় কয়েকবার ঠেলা মারিয়া চলিয়া গেল। গুরুগর্জ্জনে আকাশপথে বজ্র নাচিয়া উঠিল।

(২)

"মা, ক্ষিধে—খাবার দে না।"

বারাণ্ডার একপ্রান্তে বসিয়া, গালে হাত দিয়া রমণী উর্দ্ধপানে চাহিয়াছিল। খোকার ডাক তাহার কর্ণে বোধ হয় প্রবেশ করে নাই। শিশু অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে মাকে ডাকিতে ডাকিতে তাহার পৃষ্ঠে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল; রমণী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া ক্রন্দনরত পুত্রকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেঁদনা মাণিক্, একটু চুপ ক'রে থাক, বাবা!"

"পেট জ্বলে গেল মা!"—বালক বামহস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

অভাগী রমণীর বুকের ক্ষত হইতে যেন রক্তের ঝলক ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। বক্ষের ভীষণতম যন্ত্রণাকে কি ঠেলিয়া ফেলা যায়? তথাপি—তথাপি সে প্রবল উদ্যমে আপনাকে সংযত করিল।

বারাণ্ডার একপার্শ্বে কয়েকটা বর্ণবিহীন অর্দ্ধভগ্ন কাঠের পুতুল পড়িয়াছিল। একখানা ভাঙ্গা টিনের গাড়ী, তিনটি চাকাশূন্য ভগ্নচূড় মাটির রথ এবং ঐরূপ আরও কয়েকটি পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত খেলানা এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাইতেছিল। মাতা সেগুলি জড় করিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া কোমলস্বরে বলিল, "লক্ষ্মীধন আমার, বসে বসে একটু খেলা কর, আমি তোমার খাবার যোগাড় দেখ্‌ছি।"

জননীর আশ্বাসবাক্যে ভুলিয়া বালক খেলা করিতে বসিল। প্রবাহিত অশ্রুসিন্ধুকে বসনাঞ্চলে রুদ্ধ করিবার প্রয়াসে, টলিতে টলিতে, মাতালের ন্যায় স্খলিত চরণে, জননী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, সে বন্যাস্রোতকে রোধ করে কাহার সাধ্য? ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া রমণী নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

আর কত সহ্য হয়? বুক যে ফাটিয়া গেল!

আজ একমাস সে স্বামীকে হারাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার, জগতের সকল প্রকার মহাদুঃখ, তাহার জীবনকে ঘিরিয়া, চাপিয়া ফেলিতে চাহিতেছে!

ছয়মাস পূর্ব্বে কি সুখের জীবনই না তাহাদের ছিল! সুস্থ, সবল, গুণবান, রূপবান স্বামী—তাঁহার অনাবিল স্নেহ প্রেমের সুখশীতল ছায়া, দাম্পত্য জীবনের অপরিমেয় সুখ ও আনন্দ, কোনই অভাব ত তাহার ছিল না! পিতৃমাতৃহীনা, পরান্নপ্রতিপালিতা সহায়-বঞ্চিতা দেখিয়া যতীশচন্দ্র তাহাকে

বিবাহ করিয়াছিলেন। এ বিবাহে স্বামিগৃহের সকলেরই ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু উদার-হৃদয় যতীশচন্দ্র দরিদ্র কন্যাকে বুকে তুলিয়াছিলেন, কাহার নিষেধ শুনেন নাই। পরিণামে সেজন্য স্বজনগণের সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। পৈতৃক সম্পত্তির মায়া ও আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্বামী কলিকাতায় আসিয়া কোনও সদাগরী আফিসে চাকরী লইয়াছিলেন। পরিশ্রমে, যত্নে অল্পদিনেই মাসিক দুইশত টাকা বেতন উপার্জ্জন করিতেছিলেন। তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে কোনও অভাব বা দৈন্য ত ছিল না।

খোকার আবির্ভাবে মধুময় দাম্পত্য-জীবন আরও মধুর, আরও রমণীয় ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। কি সুখের স্মৃতিভরা সেই জীবন! কিন্তু তারপর?—সহসা একদিন স্বামীর সুস্থ সবল দেহ কাল রোগে ধরিল। কালো মেঘ নির্ম্মল আকাশকে অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। এক মাস রোগ ভোগের পর ডাক্তার যখন বলিয়া গেলেন, উহা কালা-জ্বর, তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া কমলার মাথায় পড়ে নাই কি?

চাকরী ছাড়িয়া, সঞ্চিত সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করিয়া, বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইতে হইল। কিন্তু রোগের উপশম হইল না। সুচিকিৎসার জন্য আবার কলিকাতায় ফিরিতে হইল। এবার আর যতীশচন্দ্রকে শয্যাত্যাগ করিতে হইল না। অর্থ ফুরাইয়াছিল, অলঙ্কার বেচিয়া চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু তাহা কতদিন? তথাপি চেষ্টার ত্রুটী হইল না। সহায়হীনা নারীর পক্ষে যতদূর সম্ভব সে কি তাহার কোনও অনুষ্ঠান বাকী রাখিয়াছিল?

অবশেষে অর্থাভাবে এই খোলার ঘরে রুগ্ন স্বামীকে লইয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তারপর—তারপর!—উঃ সে কি ভীমা রজনী! পরদিনের প্রভাত—সে আরও ভয়ঙ্কর! বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শবদেহ গৃহমধ্যে শায়িত! শ্মশান বন্ধুও কেহ নাই! তাহার বুকফাটা অস্ফুটক্রন্দন নগরের কোলাহল ছাপাইয়া বাহির হইতে পারে নাই! পার্শ্বের সুরম্য অট্টালিকা সমূহের অধিবাসীদিগের বিকারবিহীন হৃদয়ে সে ক্রন্দন—সে বিলাপ স্পর্শ করিবার অবকাশ ত ছিল না! অবশেষে কতিপয় ভবঘুরে, কর্ম্মহীন, পল্লীর ব্রাহ্মণসন্তান কি করিয়া ব্যাপারটা জানিতে পারিয়াছিল, তাহারাই ব্রাহ্মণের শবদেহের সৎকার করিয়াছিল। স্বামীর প্রথম স্নেহের দান কাণের দুল জোড়া অবশিষ্ট ছিল, সর্ব্বস্ব বিক্রয়ের পরও উহা সে প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারে নাই—স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ব্যাপার উপলক্ষে তাহাও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

তারপর কঠোরতর জীবন সংগ্রাম! শিশুপুত্রের অন্ন সংস্থানের জন্য কি উদ্বেগ, কি যন্ত্রণাই না তাহাকে সহ্য করিতে হইতেছে! দুই খানা বাড়ীর পরে যে সুবৃহৎ অট্টালিকায় ধনী বাস করিতেন, অনেক চেষ্টা করিয়া সেখানে সে পাচিকার কাজ লইয়াছিল; কিন্তু এক সপ্তাহের বেশী তথায় সে থাকিতে পারে নাই। এত দুঃখ, এত কষ্ট, এমন প্রচণ্ড শোক—অনাহার, অনিদ্রা দুশ্চিন্তা সত্বেও তাহার দেহ হইতে সৌন্দর্য্য ও যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তি অন্তর্হিত হয় নাই। ধনীর লিপ্সা ও

লালসা-ক্ষুধিত দৃষ্টির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়াই সে পাচিকাবৃত্তি ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

অবশিষ্ট তৈজসপত্র যাহা ছিল, পাড়ার মুদী বৌয়ের সাহায্যে তাহা বেচিয়া কয়দিন কোনও মতে চলিয়াছিল। তিন দিন একবেলা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া সে শিশুর ক্ষুধার অন্ন যোগাইয়াছে; কিন্তু আজ ত সে সম্পূর্ণ রিক্ত। এত বেলা পর্য্যন্ত দুধের বাছাকে সে এতটুকু আহার্য্যও দিতে পারে নাই। খোকা ক্ষুধায় কাতর। কেমন করিয়া সে যন্ত্রণা শিশু সহ্য করিবে? এইমাত্র সে তাহাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে—সে খাবার যোগাড় করিতে যাইতেছে, শিশু সেই আশায় চুপ করিয়া আছে; কিন্তু তাহার আশ্বাসবাণী যে কতদূর মিথ্যা তাহা কি সে জানে না?

"দয়াল ঠাকুর!"

রমণী বলির পশুর মত ভূমিতলে ছটফট করিতে লাগিল।

আছ কি? ভগবান্, সত্যই তুমি আছ কি? যদি থাক, যদি সত্যই তোমার প্রাণে দয়া থাকে, তবে এইটুকু অনুগ্রহ কর, তাহাকে পৃথিবীর আলোক আর যেন না দেখিতে হয়। তাহার সমস্ত অনুভূতি, চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যাক্!

কিন্তু খোকা? তাহার স্বামীর শেষ চিহ্ন, শ্রেষ্ঠতম দান, জীবনের পবিত্রতম বন্ধন এই খোকা তখন কি করিবে? কাহার কাছে এই শিশু স্থান পাইবে? ক্ষুধার জ্বালায় বালক যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিবে তখন কে তাহার চোখের জল মুছাইবে? পরপারে যদি তাহার দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয় সে তাঁহার কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবে? দুধের বাছাকে কাহার দ্বারে ফেলিয়া দিয়া সে আপনাকে বিলোপ করিতে চাহে?

না, না, এ পাপ চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারে না। এই প্রবল প্রলোভনকে জয় করিতে হইবে। না, দয়াময়! চিরবিস্মৃতি সে এখন চাহে না!—কিন্তু ক্ষুধা! পেটের জ্বালায় সন্তান এখনই আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে, অনাহারে তাহারই চোখের উপর তাহার নাড়ী-ছেঁড়া ধন ছটফট করিয়া মরিবে, তাহার প্রতীকার কোথায়? কেমন করিয়া সে তাহাকে বাঁচাইবে? কেমন—

উত্তেজনার আতিশয্যে সে উঠিয়া বসিয়াছিল। এবার দুই হাতে বক্ষোদেশ চাপিয়া ধরিয়া সে ভীষণতম যন্ত্রণাকে যেন চাপিয়া ফেলিতে চাহিল। অন্ধকার! সবই যেন অকস্মাৎ অন্ধকার সমুদ্রে ডুবিয়া গেল! উপবাসক্লিষ্ট, চিন্তাশ্রান্ত দেহভার ভূমিতলে আবার লুটাইয়া পড়িল।

(৩)

পুরাতন, বৈচিত্র্যহীন খেলা কতক্ষণ ভাল লাগে? একই বিষয়ে শিশুচিত্ত কতক্ষণ আসক্ত থাকে? উদরে ক্ষুধার জ্বালা প্রচণ্ডতেজে জ্বলিয়া উঠিলে শিশুর চঞ্চল হৃদয় খেলার মোহ কাটাইয়া উঠিল। এত বেলা পর্য্যন্ত সে কিছুই খাইতে পায় নাই—অন্যদিন এতক্ষণ সে যে দুইবার খাদ্য

পায়! খোকা "মা! মা!" রবে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অন্যদিনের মত তাহার স্নেহময়ী জননী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল না, ব্যাকুল স্নেহে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল না ত! শিশু ক্রন্দনের মাত্রা চড়াইল। তথাপি কেহ আসিল না। তখন ক্রন্দনশ্রান্ত খোকা উঠিয়া দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলিল।

দ্বারের কাছে আসিয়া সে দেখিল, তাহার মা ভূমিতলে পড়িয়া আছে। মা বুঝি ঘুমাইতেছে! খোকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, মাতার গায়ে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে লাগিল। তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কেহ তাহার সকরুণ আহ্বানে সাড়া দিল না। তখন জননীর দেহের উপর গড়াইয়া পড়িয়া, ক্ষুধার যন্ত্রণায় অধীর শিশু গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হইয়া শিশু কেমন করিয়া কাঁদে—দরিদ্রের ঘরে, নিরুপায় শিশু কেমন করিয়া অশ্রুভরাকণ্ঠে চীৎকার করে—অনশনক্লিষ্টা সহায়হীনা মাতার বুকের উপর পড়িয়া নিরন্ন শিশু ব্যাকুলআগ্রহে মাতাকে কেমন করিয়া ডাকে—যাহার উদর আহার্য্যভারে পরিপূর্ণ, গৃহে সুখ শান্তির মলয়-হিল্লোলের প্রবাহ, অভাব দৈন্যের কালোছায়া যাহার আনন্দের সংসারকে আচ্ছন্ন করে নাই, সে তাহা অনুমান করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পল্লীর সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ গৃহের অধিবাসীদিগের কর্ণে শিশুর সে বুকফাটা ক্রন্দনের শব্দ নিশ্চয়ই পঁহুছে নাই, পঁহুছিতে পারে না। সুতরাং বালক কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। মা যখন উঠিল না, তখন কি ভাবিয়া বালক নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইল। শিশুচিত্তের রহস্য কে বুঝিবে? সে এক পা দুই পা করিয়া ধীরে ধীরে সদর দরজা দিয়া পথের ধারের অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র রোয়াকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

পথের মোড়ে একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে অনেক লোক জড় হইয়াছিল। সব ভুলিয়া শিশু সেইদিকে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিল। তাহারা কাহারা শিশু কি তাহা জানে? অসম্ভব। উহারা ওখানে কি করিতেছে, তাহাও কি সে বুঝে? নিশ্চয় নহে। কিন্তু দৃশ্যটা বোধ হয় কিছু বিচিত্র, তাই কি সে ক্রন্দন ভুলিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল? ক্ষুধার জ্বালা?—হয়ত ক্ষণিকের জন্য শিশুর চপল-হৃদয় তাহাও ভুলিয়াছিল।

পথের দুই ধারের অট্টালিকসমূহ হইতে দুই চারিটি করিয়া দর্শক বাহির হইতেছিল। মুদী, হালুইকর, ফুলুরীওয়ালা সকলেই নিজের নিজের দোকান হইতে বাহির হইয়া কৌতূহলভরে সে দৃশ্য দেখিতেছিল। কিন্তু রোরুদ্যমান শিশুর দিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। না হওয়াই কি বিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব নহে? দরিদ্রের সন্তানের দিকে কাহার নেত্রপাত হয়? কোলাহলময়ী রাজধানীর বিপুল বক্ষে নিরাশ্রয়ের হাহাকার অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে, কত বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে, কত নিরন্নের, নিরুপায়ের আকুল ক্রন্দন আকাশে বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার তত্ত্ব লইবার অবসর কাহার আছে?

অদূরবর্ত্তী জনতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন শিশু সেইখানে বসিয়া পড়িল। ক্রমে শ্রান্তিহরা, শান্তিভরা, নিদ্রার ইন্দ্রজালভরা ক্রোড়ে শিশু আপনাকে সমর্পণ করিল।

(৪)

এক দল উৎসাহী যুবক পতাকা উড়াইয়া গান করিতে করিতে খোলার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। উহাদের উত্তেজনাভরা কণ্ঠে কাহার বন্দনা গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল ? মাতৃবন্দনা ? তাহাদের উৎসাহভরা আননে ভক্তির প্রবাহধারা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল ; হৃদয়ের মধ্যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রবল উচ্ছ্বাস। ভাবাতিশয্যে মুগ্ধ, মহত্তর কর্ম্মের প্রেরণায় অভিভূত যুবকের দল, রাজপথ মাতাইয়া, দর্শকের প্রাণে উৎসাহ, উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া, নবজীবনের গান গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল। যাহাদের প্রাণ উর্দ্ধগামী, যাহাদের বুকে উদ্দাম আশা, যাহাদের লক্ষ্য বৃহত্তর ব্যাপারে, পথের 'আনাচে' 'কানাচে' তাহাদের দৃষ্টি পড়ে না—ক্ষুদ্র শিশু তাহাদের লক্ষ্যের বাহিরে পড়িয়া রহিল।

ক্রমে আরও একদল সেই পথে অগ্রসর হইল। তাহারাও প্রচার কার্য্যে চলিয়াছে। শুধু মাতৃ নাম নহে—দেশের বস্ত্র-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য মহাত্মার বাণী ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, পথে ঘাটে প্রচার করিতে হইবে। মাতৃযজ্ঞের আহুতি চাই।

দর্শকগণের কেহ বা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল, কেহ বা বিজ্ঞের মত মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ বা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা পথের জনতা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। সেই বড় বাড়ী হইতে একদল পুরকামিনী রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সকলেরই অঙ্গে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'। অলঙ্কারবাহুল্যবর্জ্জিতা মহিলাদের মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া চপলমতি দর্শকগণও স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। মায়ের দল ঘরে ঘরে—শুদ্ধান্তঃপুরে আশার বাণী বিলাইতে চলিয়াছেন !

দলের পশ্চাতের মহিলাটি চলিতে চলিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ও কাহার সোণার চাঁদ, অমন অনাদরে মাটিতে লুটাইতেছে ? মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণধারা বাছার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে না ?

রমণী দ্রুতপদে বারাণ্ডায় উঠিয়া বালককে সযত্নে বুকের উপর তুলিয়া লইলেন। যেন মা যশোদার সোণার বুকে নীল কমল ফুটিয়া উঠিল ! নিদ্রাভঙ্গে, স্বপ্নাতুর নয়নে শিশু সেই স্নেহ-করুণ মাতৃমুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল। না, এ ত তাহার জননী নহেন !

শিশুর শ্রান্ত, ক্লান্ত আননে তিনি কি দেখিলেন তিনিই জানেন। মৃদু, কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এই বাড়ী তোমাদের ?"

খোকা মাথা নাড়িল। রমণী ধীরপদে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরের মধ্যে, ভূমিতলে মাতাকে তখনও শায়িতা দেখিয়া খোকা 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রমণী তাহাকে নামাইয়া দিয়া কমলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একবার চারিদিকে চাহিতেই মাটির কলসী দেখিতে পাইলেন। দ্রুতপদে অঞ্জলি ভরিয়া জল আনিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা কমলার চোখ মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে কমলা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল। শিয়রদেশে করুণার প্রতিমূর্ত্তি কে ঐ নারী?—সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে?

ধীরে ধীরে কমলা উঠিয়া বসিল। খোকা ব্যাকুলভাবে মাতার কণ্ঠলগ্ন হইল। একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়াই রমণী কি যেন মনে বুঝিলেন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়াই তিনি রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে না দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ব্যস্তভাবে তাঁহাকে খোলার বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রমণী চলিতে চলিতে বলিলেন, "একটু দাঁড়ান, আমি আস্‌ছি।"

সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী দ্রুতপদে মোড়ের সেই বড় বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার মূর্ত্তি আবার পথে দেখা গেল। তাঁহার এক হস্তে একটি বড় ঘটি, অপর হস্তে গেলাস।

কাহারও কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মহিলা পুনরায় খোলার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

(৫)

দুগ্ধপূর্ণ পাত্র খোকার মুখের কাছে ধরিয়া রমণী বলিলেন, "খাওত, বাবা।"

শিশু একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল। রমণী বলিলেন, "তোমার মা কিছু বল্‌বেন না। আমি তোমার মাসী হই, সোণা, মাণিক।"

খোকা আপত্তি করিল না। সে পরমআগ্রহে দুগ্ধ পান করিল। উঃ! ক্ষুধার কি ভীষণ কি তীব্র অভিব্যক্তি! রমণী কি সে দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিবেন?

কলসীর জলে গেলাসটী ধুইয়া উহা দুগ্ধপূর্ণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আপত্তি শুন্‌ব না বোন্। এটা খেতেই হবে।"

কমলা ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি জানাইল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সে অধীর, তথাপি সে আপত্তি করিল। রমণী কোন কথা শুনিলেন না। বাম হস্তে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া দক্ষিণ হস্তে তিনি দুগ্ধপাত্র তাহার ওষ্ঠের নিকট ধরিয়া বলিলেন, "কোন কথা আমি শুন্‌বো না, বোন্।"

এ অযাচিত স্নেহ, আদরের অনুরোধ উপেক্ষণীয় নহে। কমলার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল। একটু সাম্‌লাইয়া সে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে খানিকটা দুগ্ধ পান করিল।

ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ তখন মহিলাবৃন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে প্রবেশও করিয়াছিলেন। দৃশ্যটা চির পুরাতন। সংসারের রঙ্গমঞ্চে, প্রতিদিন এখানে ওখানে এমন লক্ষ লক্ষ দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছে। কিন্তু যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন হয়ত তাঁহাদের চক্ষে ইহা পুরাতন নহে। গৃহের সর্ব্বত্র—কমলা ও তাহার শিশুপুত্রের আনন ও নয়নে, বসনে দেহে ইতিহাস যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সমাগতা নারীবৃন্দের নয়নে নয়নে বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলিয়া গেল।

যাহার অঞ্চলে যাহা ছিল, সঞ্চিত হইয়া, পরিমাণ নিতান্ত মন্দ দাঁড়াইল না। পুরোবর্ত্তিনী মহিলা উহা লইয়া অগ্রসর হইলেন।

"দেখি ভাই, তোমার হাতটা।"

কমলা অগ্রবর্ত্তিনী নারীর অঞ্জলিভরা হাতের দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিল। ভিক্ষা? ইহাই তাহার জীবনের পরিণাম? মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার স্মৃতিপথে স্বামীর কথা মনে পড়িল। রোগের সহিত, অভাবের সহিত জীবনের শেষ ভাগে মহাসংগ্রামের সময় কমলাই ত তাঁহাকে ধনী আত্মীয়বর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। রুগ্ন, রিক্তসর্ব্বস্ব যতীশচন্দ্র তাহাতে সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন। পরের দানে—অনুকম্পাপ্রদত্তঅর্থে তিনি বাঁচিতে চাহেন না। যাহা যথার্থ পরিশ্রমের দ্বারা অর্জ্জিত নহে সে অর্থ তাঁহার কাছে বিষ। তাঁহার বহু আত্মীয় ছিল। এখনও আছে, একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই শেষাবস্থায়, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে মরিতে হইত না। স্বামীর পৈতৃক ভিটায় আশ্রয় লইলে আজ কমলাও কি সপুত্র অনাহারে এমন অবস্থায় থাকিত? কিন্তু না, তাহার পরলোকগত স্বামীর তাহা অভিপ্রেত ছিল না। আজ এই চরম অবস্থাতেও সে তাঁহার স্মৃতির অপমান করিতে পারে না। সে যে তাঁহার স্ত্রী—সহধর্ম্মিনী। না, অন্যের দান সে লইতে অসমর্থ।

অত্যন্ত দীনভাবে, কুণ্ঠাকম্পিত ক্ষীণস্বরে যুক্তকরে কমলা বলিল, "অপরাধ নেবেন না, আমায় ক্ষমা করুন।"

মহিলারা চমৎকৃত হইলেন। অকপট শ্রদ্ধার চিহ্ন তাঁহাদের আননে ফুটিয়া উঠিল। কমলার পার্শ্বে যিনি বসিয়াছিলেন, পুরোবর্ত্তিনী মহিলাকে তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সুষমা দি, থাক্ ও টাকাটা দাতব্য ভাণ্ডারে দিলেই চল্‌বে। আপনারা আর দেরী কর্‌বেন না, শ্যামবাজারের দিকে চলে যান।"

"তুমি যাবে না, মাধুরি?"

"না, দিদি, আজ আর আমার যাওয়া হবে না।"

"আজ যে অনেক বড় বড় কাজ আছে।"

মাধুরী বলিলেন, "তা জানি, সুষমা দি, কিন্তু ঘরের পাশে, নিজেদের পাড়ার এ কাজটাও ত একটুও ছোট নয়! আজকের মত আমায় রেহাই দিন।"

মহিলার দল যেন অপেক্ষাকৃত নিরুৎসাহে কুটীর প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের দলের মধ্যে শ্রীমতী মাধুরীই যে কেন্দ্রস্বরূপিনী।

কমলা সবিস্ময়ে ইঁহাদের আলোচনা শুনিতেছিল। সকলে চলিয়া গেলে সে বলিল, "আপনারা বুঝি প্রচারের কার্য্যে যাচ্ছিলেন? তা আপনি গেলেন না কেন?"

মৃদু হাসিয়া মাধুরী বলিলেন, "আজকের মত সে কাজ আমার হয়ে গেছে, ভাই। একটা কথা তোমায় বলি শোন। এ বাড়ীতে তোমায় আর থাক্‌তে দিচ্ছি না।"

"কোথায় যাব? আমার ত আর কোথাও স্থান নেই!"

"আমার বাড়ীতে চল। অত বড় বাড়ীতে আমি এক্‌লা থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

বিবর্ণমুখে কমলা বলিল, "কিন্তু দিদি——"

বাধা দিয়া মাধুরী বলিলেন, "তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি; তুমি পরের সাহাষ্য চাওনা, তা আমি বুঝি। অনুগ্রহ দেখিয়ে আমি কি তোমায় অবজ্ঞা কর্‌তে পারি? তোমাকে অপমান করবার মোটেই আমার ইচ্ছে নেই।"

কমলা দেখিল, এই করুণাময়ী নারীর আননে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে মুগ্ধভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

মাধুরী একটু থামিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার একটি ছেলে ও স্বামী ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। স্বামী দেশের কাজে ব্যস্ত। হয়ত কোন্ দিন শুনব তিনি জেলে গেছেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ, বাড়ীতে তিনি থাকেনই না। অত বড় বাড়ীতে কি একা থাকা যায়? যদিও আমাদের প্রচার সমিতির আপিস্ টাপিস্ আছে; কিন্তু অনেক সময় একা থাকি। আবার ছেলেটাকে অনেক সময় চাকরাণীদের কাছে রেখে আস্‌তে হয়। তুমি যদি যাও, আমার ছেলে তোমার কাছে থাক্‌বে—অম্‌নি না। তুমি সেলায়ের কাজ জান, ভাই?"

সে জানে বই কি। একদিন তাহারই ত নিজের সেলাইয়ের কল ছিল; কিন্তু পীড়া ও দারিদ্র্য রাক্ষসীর কল্যাণে সবই যখন গিয়াছে, তখন কলই বা থাকিবে কিরূপে? সে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিল সে জানে।

মাধুরী বলিলেন, "তবে ত ভালই! আমার দুটো কল্ আছে। তুমি একটাতে জামা, ব্লাউজ, সেলাই কর্‌বে—আমি কাজ এনে দেব। খদ্দরের নানা রকম জামা, সেমিজ প্রভৃতির অর্ডার ঢের পাওয়া যাবে। চরকায় সূতা কাটা, আর সেলাইয়ের কাজ—এই দুটো

হলেই তোমাদের মা-পোয়ের খরচ খুব চলে যাবে। কেমন? এতে রাজি না হলে আমি তোমায় ছাড়্ছি না।”

নিমীলিতনেত্রে কমলা একবার ভাবিয়া লইল। হাঁ, ভগবান! হাঁ দয়াল ঠাকুর! তুমি সত্যই আছ! তোমার অপার করুণা, নিরাশ্রয়কে, ভক্তকে, অনাথকে চিরদিনই রক্ষা করিয়া আসিতেছে! তাহার কাতর নিবেদন অনাথ নাথের চরণতলে পৌঁছিয়াছে, তাঁহার অভয় হস্ত সমস্ত বিপদের বাধাকে সরাইয়া দিয়াছে। ধন্য! আজ কমলার জীবন ধন্য! পরের গলগ্রহ না হইয়া সে ও তাহার পুত্রের জীবনযাত্রার পথের রেখা সে দেখিতে পাইয়াছে।

দর দর ধারে কৃতজ্ঞতা, ভক্তির প্রবাহধারা নামিয়া আসিতেছিল। সেই স্তব্ধ, ভক্তিনম্রা রমণীর পার্শ্বে নতজানু হইয়া মাধুরীও যুক্ত করে বসিলেন। তাঁহারও হৃদয়ে আজ বন্যার ধারা বহিতেছিল। বৃহৎ, মহৎ কর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি আজ অনন্ত আহ্বানের যে প্রণবধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন সেজন্য কোটিবার তাঁহাকে ধন্যবাদ!

খোকা শুধু বিস্ময়ভরা, অপলকনেত্রে যুগল নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়

এইবার বাঙ্গালার বহুবিধ উপাসক সম্প্রদায় কেমন ভাবে সামঞ্জস্য লাভ করিয়া একটা বিরাট হিন্দু সমাজে পরিণত হইয়াছিল, তাহার একটু ইঙ্গিত করিব। জৈন, বৌদ্ধ, বজ্রযানী তান্ত্রিক, সহজিয়া, গোরক্ষ নাথের “নাথী,” গৌড়ীয় বৈষ্ণব, স্মার্ত্ত শাক্ত, বেদাচার অনুগত হিন্দু,—এই সকল বিরোধী মতের ও আচার-ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন কেমন করিয়া হইল, তাহার প্রকৃষ্ট রূপে আলোচনা করিতে হইলে একখানি বিশাল পুস্তক রচনা করিলেও পর্য্যাপ্ত হয় কি না বলিতে পারি না। বাঙ্গালীর সাধন-তত্ত্ব, যাহা শাক্ত, বৈষ্ণব, নাথী ও সহজিয়ার বেদী স্বরূপ, যাহা সকল উপাসনার অবলম্বন স্বরূপ, তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় সহস্র পৃষ্ঠা-ব্যাপী একখানি পুস্তক রচনা করিলে সকল জ্ঞাতব্য কথা বলা হয় কি না, তাহাও বলিতে পারি না। এই দুইটার কোন চেষ্টায় আমি ব্রতী হইব না;—হই নাইও। আমি কেবল ইঙ্গিত করিব, কোন পথে অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয় পাইতে পার, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পার। দুই একটা দৃষ্টান্ত কথা শুনাইয়া স্থানে স্থানে আমার সিদ্ধান্ত প্রাঞ্জল করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। বিচার, বিশ্লেষণ ও সংগ্রহের ভার আগামিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিত রহিলাম। আপাততঃ দুই তিনটা সামাজিক সমাধানের উল্লেখ করিয়া পরে উপাসনা-তত্ত্বের ও সমাজ-ধর্ম্মের একটু বিচার করিব।

ব্রাহ্মণসমন্বয়

যাঁহারা নব্য ও আধুনিক স্মৃতি শাস্ত্রের দুইচারি পাতা উল্টাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র জাতি সকলের যজন-যাজন করা, বেশ্যাদি আচণ্ডালের দীক্ষাগুরু হওয়া কতটা দোষের কাজ। স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে এমন কাজ করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে ঘোর পাতিত্য ঘটে, তেমন ব্রাহ্মণকে অপাংক্তেয় করিতে হয়, অর্থাৎ সামাজিক ভোজে ব্রাহ্মণ-পংক্তির বাহির করিয়া দিতে হয়,—তেমন ব্রাহ্মণের সহিত ভুজন্যতা বজায় রাখা চলে না। পরন্তু বাঙ্গালায় স্মৃতির এই বিধান সর্ব্বথা অমান্য বা উপেক্ষা করা হইয়াছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দের বংশধরগণ, খড়দহের গোস্বামি-প্রভুপাদগণ ছত্রিশ জাতির গুরুগিরি করিয়া, এমন কি বেশ্যাকে দীক্ষা দিয়াও সমাজে অপাংক্তেয় কখনই হন নাই। তাঁহাদের বাটিতে কুলীনের ছেলেরা বিবাহ করিলে, গোস্বামিকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে নিকষ কুলীনের কুল ভঙ্গ হয় বটে, গোস্বামি-দৌহিত্রগণ "বীরভদ্রী" থাকে পরিণত হন বটে, পরন্তু তাঁহাদের জাতিনাশ ঘটে না, অপাংক্তেয় হন না। কেবল ইহাই নহে। শাক্ত-তান্ত্রিক ঘোর কুলাচারী ব্রাহ্মণ কুলীন স্বচ্ছন্দে গোস্বামিকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, গোস্বামি-প্রভুপাদগণও অম্লানমুখে শাক্তগৃহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিয়া থাকেন। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও এই পদ্ধতি অনুসারে শাক্ত পাত্রকে কন্যাদান করিয়া থাকেন' শাক্তগৃহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহলক্ষ্মী করেন। ইহাতে কোন পক্ষের সাধন-পদ্ধতির ব্যাঘাত ঘটে না। গোড়ায় অবধূত-শিষ্য প্রভুপাদ শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন, পরে শ্রীচৈতন্যের উপদেশে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। দেবীবরের মেলবন্ধনের পরেই ব্রাহ্মণ সমাজে এই সমন্বয় সাধিত হয়। খড়দহের গোস্বামিগণ বংশজ বলিয়া গ্রাহ্য হন, তাঁহাদের সামাজিক উপাধি "বটব্যাল" ধার্য্য হয়। তাঁহারা কুলপতি বলিয়া "মালাচন্দনের" দাবীও করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণ কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানে কন্যাদান করিয়া, "চতুঃসাগরী মেল বন্ধন" করিয়া কুলপতির আসন পাইয়া ছিলেন এবং মালা চন্দন লাভ করিতেন। কেবল ইহাই নহে, "বর্ণ ব্রাহ্মণ" সকল বাঙ্গালায় কোনকালেই অপাংক্তেয় হন নাই। কেবল অন্ত্যজ জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণগণই স্ব-স্ব-যজমানের দলভুক্ত থাকিতেন। ইহার হেতু এই যে, বর্ণ ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। যাহারা ব্রাহ্মণ আচার অনুকারী সৎ-শূদ্র সকলের যজন-যাজন করিতেন তাঁহারা কখনই আপাংক্তেয় হন নাই, পরন্তু যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ আচার সম্পন্ন হিন্দুর বিরোধী জাতি সকলের যজন-যাজন্ করিতেন, তাঁহারাই হিন্দু সমাজের বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। তথাপি বলিব, এমন বর্ণ ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিলে কুলীনের ছেলেদের জাতি যাইত না। সামাজিক এতবড় সমন্বয় বাঙ্গালার বাহিরে রাজপুতানায় এবং গুজরাটে ঘটিয়াছিল। এই দুই প্রদেশের জৈনগণ বল্লভাচার্য্যের শিষ্য বৈষ্ণবদিগের গৃহে বৈবাহিক আদান-

প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা জৈনদিগের ধর্ম্মগত কোন ক্ষতি বোধ হয় না, বল্লভকুলের বৈষ্ণবদিগেরও জাতিনাশ ঘটে না। ইহা একটা বড়রকমের সামাজিক সমন্বয়; এই সমন্বয়ের পন্থা বাঙ্গালীই ভারতবাসীকে প্রদর্শন করেন।

ব্রত-ব্রাহ্মণ

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর সমাজে "ব্রত-ব্রাহ্মণ" একটা অপূর্ব্ব জাতি ও পদার্থ। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বে মাসেক কাল যাহারা তারকনাথের বা অন্য প্রতিষ্ঠিত শিবের সন্ন্যাসী সাজে, তাহাদিগকে "ব্রত-ব্রাহ্মণ" বলে। উহারা মহান্তের নিকটে যাইয়া উপবীত, দণ্ড ও বহির্ব্বাস বা গেরুয়া বসন লইয়া আসে, এবং একমাস কাল কঠোর সংযম করিয়া থাকে। এই সংযমের কালে, সন্ন্যাসের সময়ে উহাদিগকে ব্রাহ্মণের সমাদর দিতে হয়; সকল জাতীয় হিন্দু নর-নারী এই সংযম ব্রত অবলম্বন করে এবং চড়ক পূজায় যোগ দেয়; আচণ্ডাল সকলেরই এই ব্রত অধিকার আছে এবং সবাই ব্রত-ব্রাহ্মণ সাজিতে পারে। "ধর্ম্মরাজের" পূজাতেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। ধর্ম্মযাজী ব্রাহ্মণ সকল ক্ষেত্রে বংশগত ব্রাহ্মণ নহে, ব্রত-ব্রাহ্মণ হইয়া বারো মাস ঐ ব্রত অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া উহারা আমরণ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে। "শীতলার ব্রাহ্মণ"ও এই হিসাবের ব্রাহ্মণ। তাহারা শীতলা দেবীর পূজা পরে, উৎকট বসন্তরোগের চিকিৎসা করে, তাই তাহারা ব্রাহ্মণের আখ্যা পাইয়াছে; শীতলার পূজায় তাহাদিগকেই পুরোভাগে রাখিয়া অর্চ্চনা-আরাধনা করিতে হয়। পূর্ব্বে নাগ বা মনসা ব্রাহ্মণও রাঢ়ে-বঙ্গে উভয় প্রদেশেই ছিল। ইদানীং নাগ-ব্রাহ্মণ আর দেখিতে পাই না। ইহারাও জাতির হিসাবে ব্রাহ্মণ নহে, নাগ পূজায় বা মনসার "জাঠে" ইহারা পুরোহিতের কাজ করিত বলিয়া ব্রাহ্মণ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। এখনও শিখদিগের মধ্যে "জাঠ" বা "জাঠা"র প্রচলন আছে। পরে এই "জাঠ" সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি। এই ব্রত-ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মযাজী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ব্রাহ্মণকে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে এবং সময় বিশেষে পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দিতেছে। এইটুকু ভুলিলে বা উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

সমুদ্রমন্থন

পুরাণের সমুদ্রমন্থনের গল্পটা একটু অভিনিবেশসহ পাঠ করিলে অনেক মজার তত্ত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মন্দার পর্ব্বতকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া, শেষ নাগকে মন্থন রজ্জু বানাইয়া সমুদ্র মন্থন করা হইয়াছিল। মন্দারের পূর্ব্বদিকে থাকিয়া, শেষ নাগের মুখ ধরিয়া অসুরগণ টানিয়াছিলেন; মন্দারের পশ্চিম দিকে থাকিয়া নাগের লেজ ধরিয়া সুরগণ মন্থন কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। সুরগণের ভাগ্যে সোমলতা ও অমৃতপূর্ণ ভাণ্ড লাভ হইয়াছিল, অসুরগণ কেবল অহি ফেণ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মন্দার পর্ব্বত ভাগলপুর জেলার দক্ষিণে,

বৌঁশি ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত। এখনও মন্দারের চারিদিকের গ্রাম্যগণ উহার পূর্ব্বাংশকে অহিফেণভোজী অসুরের দেশ বলে, আর উহার পশ্চিম অংশটাই আর্য্যাবর্ত্তের শেষ সীমা। অসুর পীতবর্ণ, অহিফেণ-সেবী এবং মৎস্যাদ; সুর শুভ্রবর্ণ, সোমপায়ী এবং মাংসভুক্। পৌরাণিক যুগে, কৌশিকীর সহিত গঙ্গার সঙ্গমের যোজনান্তর দক্ষিণে সাগর অবস্থিত ছিল, এমন উল্লেখ বাল্মীকি রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়। আমার মনে হয় তখনকার বঙ্গদেশে, রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে পীত জাতি বাস করিত; তাহারা কৈবর্ত্তবৃত্তিক ছিল অর্থাৎ নৌ-চালনা করিয়া সাগরে ও নদীতে জালিকের কাজ করিত। তাহারা মাছ খাইত, নেশার হিসাবে ভাঙ, গাঁজা ও অহিফেন সেবা করিত, বেদাচার গ্রাহ্য করিত না, বেদকে মান্য করিত না। ইহাদের একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা ছিল, স্বতন্ত্র সাহিত্য ছিল। ইহারা বৈদিক আর্য্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সাগরমন্থনের অসুর বোধ হয় ইহারাই এবং ইহারাই পুরাতন বাঙ্গালার অধিবাসী ছিল—আদিম বাঙ্গালী ছিল। ইহারাই সর্ব্বাগ্রে বেদের বিরোধ ঘটায়; যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি তাহাতে ত ধারণা হইয়াছে চার্ব্বাক বাঙ্গালী ছিলেন, কপিল বাঙ্গালাদেশে গঙ্গা ও সাগর সঙ্গমে বাস করিতেন। বাঙ্গালায় এখনও চারিটা কপিলাশ্রমের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রথম আশ্রম মৌরক্ষি ও অজয়ের মধ্যে নলাহাটির ঘাটের কাছে ছিল; দ্বিতীয় নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর মাঝখানে ছিল; তৃতীয় মগরা-চন্দ্রহাটির ঘাটের উপরে, ত্রিবেণীর কিছু উত্তরে অবস্থিত; চতুর্থ এখনকার সাগরদ্বীপে। ইহা হইতে বুঝা যায় সাগর যেমন-যেমন দক্ষিণ দিকে হটিয়া গিয়াছে, তেমন-তেমন ভাবে কপিলাশ্রমকেও সরাইয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। মোট কথা এই, মহামুনি কপিল বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার রচিত দর্শন-শাস্ত্র বাঙ্গালা দেশ হইতেই প্রথমে প্রচারিত হয়। কপিল-কনাদ-গৌতম, তিন জনই মিথিলায় ও বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই তিন জনই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার ভাব-সমুদ্র মন্থন করেন এবং প্রাচ্যদেশকে এক নূতন ও বিশিষ্ট ভাবের ভাবুক করিয়া তোলেন। মনে হয়, ইঁহাদেরই শিক্ষাপ্রভাবে সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের উদ্ভব ঘটে এবং তাঁহার প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম মগধে এবং বাঙ্গালায় সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের হীনযান ও মহাযান এই দুই শাখা সর্ব্বাগ্রে মগধে সম্প্রসারিত হয়। বাঙ্গালী মহাযানকে অবলম্বন করে এবং তাতার চীনে, তিব্বতে ও অন্য প্রাচ্যদেশে প্রচার করে। এই মহাযানের উপশাখা হিসাবে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এই হিসাবে বাঙ্গালী পূর্ণ মাত্রায় আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত ও মান্য সকল রকমের Orthodoxyর বা গোঁড়ামীর বিরোধ ঘটায়।

জৈনধর্ম্ম

আমার মনে হয় সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের উদ্ভবের পূর্ব্বে জৈনাচার বাঙ্গালায় প্রচারিত হইয়াছিল। মনে হয়, মহাবীর সিদ্ধার্থের পূর্ব্বগামী, অথবা সমসময়ের পুরুষ। সহজ মতের

পুঁথিপত্রে জীন-সিদ্ধার্থের প্রতিবাদ আছে, সিদ্ধাচার্য্যগণের দোঁহাবলীর মধ্যে জৈন বিরোধের স্পষ্ট উল্লেখ পাইয়াছি। যাহা হউক ইহা সত্য যে, হাজার বৎসরের অনেক পূর্ব্বে রাঢ়দেশে জৈন-ধর্ম্মের খুব প্রাবল্য ছিল। সহজ মতের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম, রূপ, রস ও ভাবের ধারায় জীনাচার্য্যগণের শান্ত-সমাহিত ভাবকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। জৈনদিগের পর্য্যূষণ ব্রত এখনও আকারান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। কার্ত্তিকের পূজাটা যে জৈনদিগের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উৎসবের আকারান্তর নহে তাহাও নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কার্ত্তিক পূজার আবরণে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঢাকা আছে। এখন রাঢ়দেশে "বর্দ্ধমান" নামটি ছাড়া জৈনধর্ম্মের ও জীনাচার্য্যগণের আর কিছুই প্রকট নাই। বাঙ্গালী জৈন নাই, যাহারা পূর্ব্বে ছিল তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবরণ গ্রহণ করিয়া আত্ম-গোপন করিয়াছে। বাঙ্গালার জৈন-ধর্ম্ম এখন প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইয়া গিয়াছে।

গোরক্ষনাথ

গোরক্ষনাথ একজন দুর্দ্দমনীয় সাধক ও যোগী ছিলেন। অনেকে বলেন যে, ইনি গোড়ায় বৌদ্ধ ছিলেন, পরে বজ্রযানী তান্ত্রিক ও শৈব হন। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ হঠযোগের সিদ্ধ-সাধক ছিলেন; ইনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাহা সহ্য করিতে পারেন না। গুরু উপদেশ করেন যে, যোগ্যপাত্রে অষ্টসিদ্ধি অর্পণ কর, তোমার স্বস্তি ও মুক্তি দুই লাভ হইবে। খুঁজিতে খুঁজিতে গোরক্ষনাথ এলাহাবাদে ত্রিবেণীর ঘাটে এক সুলক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে দেখিতে পান। গোরক্ষনাথ তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, আমার নাম গোরক্ষনাথ, আজ মাঘী পূর্ণিমা, তোমাকে কিছু দান করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন, কি দিবে,—দেও; গোরক্ষনাথের নাম শুনিয়া তিনি বিস্মিত বা বিচলিত হইলেন না। গোরক্ষনাথ বলিলেন, আমি তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দান করিব। ব্রাহ্মণ অম্লানমুখে বলিলেন—দেও, এবং সঙ্গমের জল বদ্ধাঞ্জলি পূর্ণ করিয়া করপুটে ধারণ করিলেন। গোরক্ষনাথ মন্ত্রপূতঃ অষ্টসিদ্ধি তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাই "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া সঙ্গমের স্রোতে ঢালিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া পরে জিজ্ঞাসিলেন,—আপনি কে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, আমি বাঙ্গালার অধিবাসী, নাম মধুসূদন সরস্বতী। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়া তিনি বঙ্গভূমি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। রাঢ়েই তিনি শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন এবং আধুনিক বীরভূম জেলায় নাথীসম্প্রদায়ের অনেক কীর্ত্তি লুকান আছে। মনে হয় যোগী ও আগুরীজাতি নাথীধর্ম্মের ফলস্বরূপ। এই নাথী-সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাঙ্গালায় বহু শিব-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চড়কপূজা, পিঠ ফোঁড়া, জিভ ফোঁড়া, গম্ভীরা, ভাদো প্রভৃতি লুপ্ত

এবং অর্দ্ধলুপ্ত উৎসব সকল এই সম্প্রদায়ের প্রভাবে এক সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাদেরই প্রভাবে ব্রত ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। গোরক্ষনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সমন্বয় সাধন করেন। বাঙ্গালায় গোরক্ষনাথের শেষ ও প্রবল শিষ্য ছিলেন বিরূপাক্ষ। ইঁহার কথা পরে বলিতে পারি।

নর-পূজা বা আত্মপূজা

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে নর-পূজা বা আত্ম-পূজার সম্প্রসারণ অতি মাত্রায় ঘটিয়াছিল। কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সকল সম্প্রদায়ই নানাভাবে আত্মপূজায় রত ছিলেন। এই ভাব প্রকাশের পদ্ধতি লইয়াই সম্প্রদায়-বিভাগ ঘটিত। তত্ত্বে ও সিদ্ধান্তে সকল সম্প্রদায়ই প্রায় একমতের ছিলেন, কেবল উপাসনা এবং আরাধনাপদ্ধতি অনুসারে এক-একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সকল সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, আরাধ্য দেবতা বা ইষ্টদেব আমাদের প্রত্যেকের দেহভাণ্ডে পরমাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন; আমরা প্রত্যেকেই শিবস্বরূপ; সেই দেহস্থ শিবকে বা পরমাত্মাকে দর্শন করা সকল সাধকের উদ্দেশ্য। উহাই উপাসনা, উহাই আরাধনা, উহাই সাধনা। দেহের মধ্যে যে সকল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের একটা বা দুইটা শক্তির অবলম্বনে সাধনা করিতে হয়। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। প্রত্যেক জীবাত্মা বা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার অংশস্বরূপ; স্বদেহস্থ আত্মাকে দর্শন করিতে পারিলে, বিশ্বব্যাপী আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব দেহস্থ আত্মদর্শনই সকল সাধনার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য দুই দলের সাধক দ্বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রথম যোগ-মার্গ এবং তন্ত্রের কর্ম্ম-মার্গ। ইহারা ভাব, রস, আসক্তি, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতির কোন ধার ধারে না। ইহারা বলে যোগের ক্রিয়াবলে, হঠযোগ এবং রাজ-যোগের সাহায্যে চিত্ত ও বুদ্ধির সকল আবরণ ছিন্ন করিয়া আত্মদর্শন করিব। প্রাণায়াম ও ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়ার দ্বারা ইহারা আত্মাকে অনুভূতিগম্য করিতে চেষ্টা করে। তন্ত্র বলেন, সব সময়ে এবং সকল সাধকের পক্ষে দেহস্থ শক্তির সাহায্যে সাধনা করা সুবিধাজনক বা আশুফলপ্রদ হইবে না; বাহ্য শক্তির এবং দ্রব্যশক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তন্ত্র পশ্বাচার, বীরাচার প্রভৃতি অষ্টবিধ আচারের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। তন্ত্র দ্রব্যশক্তি সঞ্চয়ের উপদেশ বার-বার দিয়াছেন; তাই তন্ত্র রসায়নের চর্চ্চা করিয়াছেন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অনেক গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রত্যেক জীবদেহের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্ত্র Scienceএর বেদীর উপরে সাধনাকে বসাইয়াছেন এবং তন্ত্রোক্ত Scientific পন্থা অবলম্বন করিয়া সকলকে সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তন্ত্রের সাধনায় Biology, Physiology, Chemistry, Zoology, Pathology প্রভৃতি অনেক "লজিই" আছে। তন্ত্রোক্ত এক-একটা ধ্যানের মূর্ত্তি,

জীবতত্ত্বের বা Biologyর এক-একটা সাবয়ব সিদ্ধান্তমাত্র। জীবদেহে বিশেষতঃ নরদেহে কত শক্তি কেমন ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি ষড়রিপু কেমন শক্তির ক্রিয়ায় সম্বুদ্ধ হয় অথবা উন্মেষ লাভ করে, তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার তন্ত্রেই আছে। তন্ত্র একটা বড় কথা এই বলিয়াছেন যে, বাহ্য-শক্তি সকলের ক্রিয়ার প্রভাব এবং প্রতিবেশ-প্রভাব (Environments)কে এড়াইয়া, নিজের দেহ এবং দেহস্থ শক্তিসকলকে Isolate বা Insulate করিয়া বা কেন্দ্রীকৃত রাখিয়া প্রথম অবস্থায় কোন সাধকই সাধনা করিতে পারেন না। পূর্ণ Insulation বা স্বতন্ত্রী-করণের ক্ষমতা সকল দেহে থাকে না। অতএব গোড়ায় বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া সাধককে কাজ করিতে হইবে। অবশ্য তন্ত্র নরদেহ এবং নরদেহগত আত্মা ছাড়া আর কিছু আরাধ্য নাই—হইতেই পারে না, এমন কথা জোর করিয়া বলিয়াছেন। Anthropomorphismএর পূর্ণ ও বিশদ ব্যাখ্যা তন্ত্রে যেমন আছে, তেমনটি আমি আর কোথায়ও পাই নাই। তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত বাক্য সকল উপাসক-সম্প্রদায়ের মূল বেদী। বৈষ্ণব বল, শাক্ত বল, শৈব বল, যে উপাসক সম্প্রদায় সাধনায় তৎপর হইয়াছেন, তাঁহাকেই তন্ত্রপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এ কথাটা পরে প্রয়োজন হইলে খুলিয়া বলিব।

ভাব ও ভক্তি

নীরস, ভাবশূন্য যোগ-মার্গ ও শক্তি সাধনার কথা একটু ইঙ্গিতে বলিলাম। ইহা ছাড়া ভাবমার্গের সাধনা আছে। এই ভাবমার্গই ভক্তি-শাস্ত্রের মূল। শাণ্ডিল্য-নারদপ্রমুখ ভাক্ত-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণ বলিয়াছেন যে, মানুষ যেমন ভাবে ও আসক্তির বলে অপর মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রেমের সাহায্যে নর-নারী একাত্মতুল্য হইয়া পড়ে, ভক্তি ও স্নেহের সাহায্যে মাতা ও পুত্র, পিতা ও পুত্র, প্রভু ও ভৃত্য, সখা ও সখা এক ভাব-ভাবুক হয়, তেমনই সাধককে প্রেম ও আসক্তির সাহায্যে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে,—সারূপ্য, সাযুজ্য ও সামীপ্য লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক নরদেহে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে. এই আসক্তি সকলের একটা কোন আসক্তির অতিমাত্রায় উন্মেষ ঘটাইয়া পরমাত্ম-দর্শন করিতে হইবে। ভক্তি-শাস্ত্রই দ্বৈতবাদের আসন। তুমি ও আমি, সাধক ও সাধ্য, পূজক বা উপাসক এবং উপাস্য দেবতা ভক্তি-শাস্ত্রই প্রথম কল্পনা করেন। ভক্ত অদ্বৈতবাদী হইতেই পারে না। আমি ছাড়া আর একজন না থাকিলে ভালবাসিব কাহাকে, ভক্তি করিব কাহার? অতএব আমি ছাড়া আর একজনের অস্তিত্বের কল্পনা না করিতে পারিলে ভাবানুগা আসক্তি সম্ভবপর নহে। সে আর একজন কেমন হইবেন? আমি যেমনটি চাই, তেমনটিই হইবেন। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু,—আমার সাধ, বাসনা, আসক্তির পূর্ণ তৃপ্তি তাঁহাতেই হইবে। মানুষ আমি, আমার কল্পনায়, আমার ধ্যানে নরাকারে রূপটা স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। তাই আমার দেবতা নরাকারাকারিত,—দ্বিভুজ মুরলী

ধর, নব-নটবর,—নব-নব রে নিতুই নব। তিনি নবীনতার আকর, আমি যত রকমের নবীনতা দেখিতে চাহি, উপভোগ করিতে চাহি, সবটাই তাঁহাতে পাই। আমার যদি পুরুষের রূপ ভাল না লাগে, তাহা হইলে বাঞ্ছাকল্পলতিকা, তিনি নারীরূপেই আমার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হন। তখন তিনি উমা সুন্দরী—বালারুণতুল্যা বালিকা। তাই কমলাকান্ত গান করিয়া গিয়াছেন,—

"জান না রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখনো কখনো পুরুষ হয়॥"

শ্যাম শ্যামা হয়, শ্যামা শ্যাম হয়;—আমি যা চাই তাঁহাতে সেই রূপই পাই। তিনি কৃষ্ণাঙ্গী, শ্যামাঙ্গী, গৌরাঙ্গী, শ্বেতাঙ্গী, কষিত-কাঞ্চন-বর্ণাভা অতসী কুসুম বর্ণা। তিনি শ্যাম, গৌর, শ্বেত, পীত, সজল জলদকায়; নব দুর্ব্বাদলশ্যাম, শত চাঁদ নিঙ্‌ড়ান অমল ধবল সুধা মাখানো শুভ্রকায়। আমি যেমন, আমার যেমন রুচি ও প্রকৃতি, যেমন প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি, ঠিক তিনি তেমনটিই। তাই সাধক মধুর সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন——

"আদর করে হৃদে রাখ,
আদরিণী শ্যামা মা'কে।
তুমি দেখ, আর আমি দেখি মন,
আর যেন কেউ না দেখে।"

ইহাই ভাবমার্গের সাধনা—ভক্তি-শাস্ত্র প্রদর্শিত আত্মসান্নিধ্য লাভের একটা পন্থা। কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি নানক পন্থী, যাহারাই ভক্তির সাহায্যে উপাসনা করেন, তাঁহারাই ভাবের এই পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তি সূত্র এবং নারদের ভক্তিতত্ত্ব তাঁহাদের যষ্টির স্বরূপ। এই দুইখানা বহির ব্যাখ্যার উপর নানাবিধ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ভক্তি ও ভাবমার্গ ছাড়া আর একটা রসের পন্থা বাঙ্গালায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাহাই বাঙ্গালী জাতিকে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর ভাষায় ও সাহিত্যে যেন ওতঃপ্রোতঃভাবে বিরাজ করিতেছে। সে কথাটা পরে বলিতেছি।

প্রেম ও সহজ মত

প্রেমের সাহায্যে সাধনা বাঙ্গালায় যেমন শত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, এমনটি বোধ হয় বাঙ্গালার বাহিরে, পৃথিবীর আর কোন দেশে ও জাতির মধ্যে হয় নাই। সহজ মতই প্রেমের সাধনা, সহজিয়ার দল প্রেম ছাড়া আর কিছু জানে না; আর

এই সহজ মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বনিয়াদ বলিলে অধিক বলা হইবে না। সহজিয়া ধর্ম্মের মূল যে কোথায় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না ; উহাতে বৌদ্ধ দর্শনের অনেক সিদ্ধান্ত আছে, জৈন মতও আছে, বৌদ্ধ-তন্ত্রের অনেক কথা আছে, অনেক রকমের সাধন-পদ্ধতি আছে, আর আছে প্রেমের ধর্ম্ম। প্রেমের সাধনার "ফিলজফি" টুকু, মনে হয়, সহজিয়া দার্শনিকগণের নিকট হইতে পরে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব উপাসকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সহজ মতে আছে যে, যোগ ও ভাব লইয়া কোন কাজের কাজ ত হইবে না, ভক্তির সাহায্যে মুক্তি পাইতে পার। পরন্তু মুক্তি পাইয়া ত কোন লাভ নাই। চাই আনন্দ ; জীব-সামান্য ধর্ম্মই হইল আনন্দ-পিপাসা। সকল জীবই আনন্দ চাহে, আনন্দের জন্য হেন দুঃখ নাই যাহা জীব ভোগ করে না। নর এবং নারী সনাতন স্বষ্টি ; স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব বিশ্ব স্বষ্টির মূল অবলম্বন ; এক সনাতন পুরুষ দুইয়ে বা নারীতে বিভক্ত হইয়া তবে বহুর স্বষ্টি করিয়াছেন। একের দুইয়ে বিভক্তি আনন্দলাভের জন্য ; আনন্দ হইতেই জীবস্বষ্টি ঘটিয়া থাকে। অতএব আনন্দই জীবের ইপ্সিত ও লভ্য এবং সাধ্য। সে আনন্দ কেমন ? অবাঙ্-মনসঃ-গোচর—বাক্য মনের অগোচর, তাহা ভাষায় বুঝান যায় না, কেহ পারে নাই। যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, তাহার মূকাস্বাদনবৎ—বোবার মিষ্ট আস্বাদনের তুল্য অবস্থা ঘটিয়াছে। নবীন কিশোর অনাস্বাদিতপূর্ব্বা কিশোরীর সঙ্গলাভ করিলে যে তৃপ্তি, তুষ্টি, স্বস্তি লাভ করে, তাহাকে অনবরত, অবিশ্রান্ত ও অব্যাহত ধারায় পরিণত করিতে পারিলে, সেই ক্ষণেকের সুখকে নিরবচ্ছিন্ন করিতে পারিলে যাহা হয় তাহাই আনন্দ, তাহাই সাধ্য এবং তাহার প্রাপ্তি চেষ্টাই সাধনা। বহির্দ্দেবতা নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই, সাধন নাই, ভজন নাই, যোগ নাই, তপস্যা নাই, সংসারে—বিশাল বিশ্ব স্বষ্টির মধ্যে আছে কেবল এই আনন্দ, এবং আনন্দ প্রাপ্তির চেষ্টা। নরের আরাধ্যা নারী, নারীর আরাধ্য নর, সংসার নবীন কিশোর এবং কিশোরীর কুঞ্জ কানন তুল্য। আর যে সকল সম্বন্ধ,—মাতা, পিতা, ভগিনী, দুহিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি,—সে সকলই ব্যবহারিক সম্বন্ধ, সহজ নহে। যাহা সহজাত, যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি, যাহার জন্য জীবের স্বষ্টি তাহাই সহজ, তাহাই কামজ। আমার মনে হয় সহজ ধর্ম্ম অনেকটা মধ্য-যুগের ইয়োরোপের Natural Religion এবং Satan worshipএর ভারতীয় সংস্করণ। উহাতে বেদ নাই, কোরাণ নাই, তন্ত্র নাই, জাতি নাই, বর্ণ বিচার নাই, উচ্চ নীচ, মূর্খ পণ্ডিত নাই,—আছে আনন্দের সাধনা এবং আনন্দের উপভোগ। কাম বা আদি সাধনা সহজ মতের একমাত্র সাধনা। সহজ মতে যুগল ছাড়া আর কিছু নাই; সে যুগলের মধ্যে রিরংসা ছাড়া অন্যভাব নাই। এমন সাধন-তত্ত্বের পরিণতি ভীষণ বা কদর্য্য হয়ই। বৌদ্ধধর্ম্মে এই অংশের অতি ভীষণ বিকৃতি ঘটিয়াছিল ; সেই বিকৃতি জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম নামতঃ লোপ পাইয়াছিল ; সহজ মতও এই হেতু গুপ্ত সাধনায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সহজ মত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের Philosophical basis তাত্ত্বিকী বেদী। চণ্ডীদাস-প্রমুখ গোড়ার বৈষ্ণবগণ সহজ মত হইতে প্রেম তত্ত্বটা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; রস-

তত্ত্বটা আগা গোড়া সহজিয়াদের নিকট হইতে ধার করা সামগ্রী। ঐ যে বলিয়াছি দেহতত্ত্বের গান ও ভাব, উহার সবটাই সহজ মত হইতে সংগৃহীত। সহজ মতকে বাদ দিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহিরের খোলস ছাড়া আর কিছু থাকে না। কেঁদুলী বা কেন্দু বিল্বগ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে যে মেলা হয় তাহাতে সহজ মতের বাবাজীউয়ের দল অত্যধিক সংখ্যায় সমবেত হয়। সহজ মতের ভাষাই হইল "সন্ধ্যা ভাষা" অর্থাৎ সিদ্ধাচার্য্যগণের দোঁহাবলীর ভাষা। রাঢ়দেশে এখনও দুই চারিটি সহজ মতের সুপণ্ডিত বাবাজিউ পাওয়া যায়।

হিন্দু মুসলমান সমন্বয়

এই নানা ভাবের ও রসের সমাহারে, নানা সাধন-পন্থার সমাবেশে বাঙ্গালী জাতির মনে এক অপূর্ব্ব ঔদার্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালী ভাবুক ও রসিক, কখনই গোঁড়া ও গণ্ডীবদ্ধ নহে। এই ঔদার্য্য হেতু বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিম প্রদেশে, আর্য্যাবর্ত্তে ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় চেষ্টা যে ঘটে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। নানক পন্থা, কবীর পন্থা, দাদু পন্থা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়-সাধক চেষ্টা-জাত ধর্ম্ম-মত মাত্র। আকবর শাহ প্রবর্ত্তিত "দীন-ই-ইলাহী" ধর্ম্ম আমাদের কিশোরকালপর্য্যন্ত পশ্চিমের লালা কায়স্থ ও ক্ষেত্রী-বণিক গৃহস্থ বিশেষের মধ্যে সজীব ভাবে প্রচলিত ছিল। জালাল্-উদ্দিন আকবরের নামানুসারে "জালালী ফকীর" নামক একদল সন্ন্যাসীর দলের সৃষ্টি হইয়াছিল; ইহাদের বর্ণনা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় এখনও ইহারা "আউল" "বাউল" বলিয়া পরিচিত। হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধন করিতে অনেকে উদ্যত হইয়াছিলেন বটে, পরন্তু এ পক্ষে বাঙ্গালীর ব্যবস্থা অপূর্ব্ব এবং স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দু তাহা পারে নাই। বাঙ্গালী মুসলমানের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়াছে, তন্ত্র সাধক সূফী মুসলমান ফকীরকে গুরুপদে বরণ করিয়াছে, তাহাদের মন্ত্র-শিষ্য হইয়াছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ এখনও গঙ্গাস্নান করিবার সময়ে "দরাব-গাজী" রচিত গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। "সুরধুনি মুনিকন্যা তারয়েৎ পুণ্যবন্তম্" ইতি পাঠমূলক গঙ্গাস্তোত্র দরাব খান্ বা দরাব গাজীর রচিত। পূর্ব্ববঙ্গের জনাব আলি খানের রচিত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত সকল এক সময়ে রামপ্রসাদের গানের মতন প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে এতটা ঔদার্য্য পৃথিবীর আর কোন সভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা বলিতে পারি না। মেদিনীপুর জেলায় এখনও একঘর তান্ত্রিক সূফী মুসলমান আছেন, যাহাদের এখনও কুড়ি হাজার হিন্দু শিষ্য আছে। শুনিতে পাই, স্যর আগা খানের হিন্দু শিষ্য অনেক আছে। সত্যনারায়ণের ও সত্যপীরের কথা আছে, ব্রত আছে, আবার হিন্দু-মুসলমানে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধও আছে। পাঠান যুগে এবং মোগলদের প্রথম আমলে হিন্দু-মুসলমানে এতটা সম্প্রীতি ঘটিয়াছিল যে, তাহা এতদিন বজায় থাকিলে হিন্দু-মুসলমান

সম্পিণ্ডিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইত। সহজ মতে এবং তন্ত্র সাধনায় হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদ বিচার নাই। যোগ্যতা থাকিলে, অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইলে সকল ধর্ম্মাবলম্বী এবং সকল জাতীয় নর-নারীই তন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিত এবং সাধনা করিতে পারিত। মার্কিণের তান্ত্রিক পণ্ডিত বরোজ এবং জর্ম্মণীর ডাক্তার জিমরম্যান দুইখানি পুস্তক লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, Greek Churchএর খৃষ্টানগণ, Nestorian খৃষ্টানগণ তন্ত্রসাধনা করিতেন। ইয়োরোপের মধ্যযুগের Esoteric Religion তন্ত্রোক্ত সাধনার নামান্তর মাত্র। বৌদ্ধতন্ত্র, সহজ মত এবং শাক্ততন্ত্রও ভক্তির ধর্ম্ম বাঙ্গালায় এমন একটা সমন্বয়ের এবং ঔদার্য্যের ভাবের উন্মেষ সাধন করিয়াছিল, যাহার অনুরূপ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ও জাতির মধ্যে নাই বা ছিল না। এই ঔদার্য্য ও প্রসন্নতা শূন্য পুরাণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত, বাঙ্গালার আদি ও মধ্যযুগের সমগ্র সাহিত্যে, সকল মহাকাব্যে ও গাথায় পরিলক্ষিত হইবে। শূন্য পুরাণ পাঠ করিলেও মনে হয় বাঙ্গালার সহজিয়া ও বৌদ্ধগণই পাঠানদের ডাকিয়া আনিয়া বাঙ্গালায় আশ্রয় দিয়াছিল। পাঠানদের সহিত বাঙ্গালীর মেলা-মেশা খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পরে প্রকাশ করিতে পারি।

বৌদ্ধ ও পাঠান

বাঙ্গালায় যখন প্রথম পাঠান অভিযান হয়, তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অতিমাত্রায় ছিল; তখন বজ্রযানী ও কালচক্রযানীদিগের প্রতিপত্তি খুব ছিল, সহজ-মত রাঢ়ে ও বঙ্গে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, লুইপাদ-প্রমুখ সিদ্ধাচার্য্যগণের দলবল পঞ্চকোট হইতে চট্টগ্রাম ও ডবাক্-প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়াছিল। নানা আকারে, নানাভাবে, নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মহাযানী বৌদ্ধমত বাঙ্গালীজাতির প্রায় সকল স্তরেই যেন অনুস্যূত হইয়াছিল। ব্রহ্মাবর্ত্তের, কান্যকুব্জের, মিথিলার এবং দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ হিন্দু রাজার আহ্বান মত বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা দেশের জনসাধারণের সহিত মেলা-মেশা করিতেন না, এমন কি বাঙ্গালার আদিম নিবাসী নর-নারীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। তাঁহারা নিজেদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাজ-পরিচ্ছদ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেন। তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিতেন না, ধর্ম্মপুস্তক সকলের ব্যাখ্যা করিতেন না; কেবল নিজেদের ঘরে থাকিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল করিতেন, রাজাদেশে যাগ-যজ্ঞাদিও করিতেন। বাঙ্গালার জনসাধারণ সিদ্ধাচার্য্যগণের দ্বারা, বৌদ্ধশ্রমণগণ দ্বারা, বৌদ্ধতান্ত্রিক কুলাচারী এবং বীরাচারী কর্ম্মিগণের দ্বারা শাসিত, পরিচালিত এবং সুরক্ষিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার ধর্ম্মবাজী ও সহজিয়া দলই পাঠানদিগকে আহ্বান করিয়া এদেশে আনয়ন করে। এপক্ষে অনুকূল প্রমাণ শূন্যপুরাণে অনেক পাওয়া যায়। 'আমার এই ধারণা ক্রমে দৃঢ় হইতেছে যে, ভারতবর্ষে গোড়া হইতে

পাঠানদিগের প্রবেশ বৌদ্ধদিগের সহায়তায় হইয়াছিল। কান্যকুব্জের জয়চন্দ্র যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন, সনাতন ধর্ম্মীদিগের বিদ্বেষী ছিলেন, তাহা চাঁদ বর্দ্দইয়ের মহাকাব্যে পাওয়া যায়, বইজু বাওরার একটা গানে তাহা স্পষ্ট বলা আছে। যাউক সে কথা ; বাঙ্গালায় পাঠানগণ আসিলে এবং পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ জয় করিয়া বসিলে, সহজিয়া ও বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে খুব আদরের আসন দিয়াছিলেন। এই আদরের ফলে, পূর্ব্ববঙ্গের অর্দ্ধেকটা—সমাজের নিম্নতম স্তরটা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, পাঠানদিগের সহিত বৈবাহিক কুটুম্বিতা করে। বৌদ্ধ সমাজে এখনও বিবাহ-বন্ধনটা বড়ই শিথিল, ব্রহ্মদেশে এখনও যাইলে এ কথার প্রমাণ সমাজের সকল স্তরে পাওয়া যাইবে। কাজেই পাঠান সংস্রবে বাঙ্গালার সামাজিক বহুস্তরে রক্তদুষ্টি ঘটিয়াছিল, পাঠানদিগের সহিত একটা অপূর্ব্ব মেলা-মেশা হইয়াছিল। সে মেলা-মেশার পরিচয় আমরা পরে মোগলপাঠানের যুদ্ধে পাইয়াছি। মোগলমারীর তিনটা যুদ্ধে পাঠান অপেক্ষা বাঙ্গালার কৈবর্ত্ত, আগুরী, গোড়ো গোয়ালা প্রমুখ রণদুর্ম্মদ জাতিসকল অধিকতর সংখ্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল। এমন কি দাউদ খাঁয়ের দলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বীর অনেক ছিল। মোগল-পাঠানের যুদ্ধে, মোগলমারীর রণক্ষেত্রে বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর পুরুষসকল বীরগতি লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক ইয়োরোপের তুল্য বঙ্গদেশও তখন পুরুষ-শূন্য হইয়াছিল। বাঙ্গালীর বীরত্বের প্রশংসা খোদ্ মোগল সেনানী মুনিম খান্ এবং রাজা তোডর মল্ল করিয়া গিয়াছেন। এই পাঠানের পতনকাল ও মোগলের উদ্ভবকাল বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যে একটা মহা মুহূর্ত্ত—সন্ধিক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সময়েই শ্রীচৈতন্যের উদ্ভব হয়, এই সময়েই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন অবতীর্ণ হন, এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন ঘটে, বাঙ্গালীসমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা হয়। এই দেড়শত কি দুইশত বর্ষকাল বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির Augustan Period। একদিকে অরাজকতা এবং মাৎস্য-ন্যায় ; অন্যদিকে নবদ্বীপে মনীষার প্রদীপ শতদ্যুতিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার বনিয়াদ গাড়া হয়, Nation-building বা জাতি সৃষ্টির কাজ আরব্ধ হয়। পাঠানের আগমনের তিনশতবর্ষকাল কত বিদেশী জাতি যে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করে, তাহার হিসাব করা এখন কঠিন। পাঠান সর্দ্দারগণের অনেকেই বঙ্গমহিলাদের পত্নীপদে বরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সোণা বিবি ইহার একটা বড় দৃষ্টান্ত। আবিসিনিয়ার গোলাম-হাব্‌শী, জু-জু, উজবেগ প্রভৃতি অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ বিদেশীয় মোস্‌লেম বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করে ; এবং বৌদ্ধ শৈথিল্যের কল্যাণে এক-একটা সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়া রাখে। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনন্দন, দেবীবর প্রভৃতি মনীষিগণ বৌদ্ধ ও সহজমতে শিথিলীকৃত বাঙ্গালী সমাজকে শ্রেণীবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিশিষ্টতা-উপেত করিয়া দেন। তাঁহারাই বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আদি দেবতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

• • •

কালাপাহাড় ও বিরূপাক্ষ

বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ রাঢ়ে একটা প্রবচন প্রচলিত ছিল যে, "কালাপাহাড়ের কাট এবং বিরূপাক্ষের ফাট্" দুই সমান। কালাপাহাড় বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া কেবল হিন্দুর দেবমন্দির ও দেবপ্রতিমা চূর্ণ করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৌদ্ধ মন্দির ও মূর্ত্তি-সকল চূর্ণ করিয়াছিলেন। যেখানে বৌদ্ধমত প্রবল ছিল, যাহাতে সহজমতের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল তিনি তাহাই নষ্ট করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় তলোয়ারের সাহায্যে এই কাজ করেন। বিরূপাক্ষ একজন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে বিগ্রহে দেবভাব ও দৈবীশক্তি না থাকিত, বিরূপাক্ষ তাহাকে প্রণাম করিলেই সে বিগ্রহ ফাটিয়া যাইত। বিরূপাক্ষ বাঙ্গালার বহুস্থানে ঘুরিয়া দেবপ্রতিমা সকল ফাটাইতেন। কাঁচড়াপাড়ার কাছে "ফাটা রায়" বলিয়া এখনও এক বিগ্রহ আছেন; কিম্বদন্তী এই যে, বিরূপাক্ষ এই মূর্ত্তিকে ফাটাইয়া দেন। তবে যে সকল তীর্থে শ্রীচৈতন্য যাইয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছিলেন, বিরূপাক্ষ সে সকলকে ফাটাইতে পারেন নাই। গুপ্তিপাড়ার শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রকে বিরূপাক্ষ ফাটাইতে পারেন নাই, কেন না, তখন গুপ্তিপাড়ায় সদানন্দ স্বামী নামক এক মহাপুরুষ বাস করিতেন। তিনিই বৃন্দাবনচন্দ্রকে রক্ষা করেন। সোজা কথা এই কালাপাহাড় ও বিরূপাক্ষ দুইজনেই উৎকট Iconoclast বা ধ্বংসবাদী ছিলেন। দুইজনেই বৌদ্ধমত ও সহজ মতকে প্রমথিত করেন। কালাপাহাড়ের জীবন কথা এখনও ঠিকমতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া লিখিত হয় নাই, বিরূপাক্ষের নাম ত বাঙ্গালার পনের আনা ইংরেজিনবীশে জানে না। অথচ সহজিয়াদের চক্রে যাইয়া বিরূপাক্ষের নাম করিলে এখনও গালাগালি খাইতে হয়। একটা ঐতিহাসিক কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। বাঙ্গালার সাধারণ গৃহস্থের গৃহে কালাপাহাড়ের আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া পূজা হইত না। তান্ত্রিকগণ তাম্রের টাটে বা থালায় যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহারই উপরে নিত্য হোম করিতেন। বৈদিকগণ যথারীতি হোমকুণ্ড বানাইয়া যজ্ঞ করিতেন, চণ্ডীর উপাসকগণ ঘটস্থাপন করিয়া চণ্ডীর পূজা করিতেন। চণ্ডী উপাসক মাত্রেই বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিলেন। চণ্ডীর ঘটস্থাপনায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, মহিলাগণ নিজেরাই ঘটস্থাপনা করেন এবং মঙ্গলচণ্ডী, জয়চণ্ডী প্রভৃতির ব্রতকথার আবৃত্তি করেন। উলাগ্রামে যে বৈশাখী পূর্ণিমায় ওলাইচণ্ডীর পূজা হইত তাহা হিন্দু তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজা নহে, তাহা স্পষ্ট কালচক্রযানের চণ্ডীপূজা, সিদ্ধার্থের জন্মতিথিতে বৈশাখী পূর্ণিমায় করা হইত। বাঙ্গালার মহিলাদের ব্রত সকলের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, উহার কোনটাই বৈদিক বা মূল তান্ত্রিকী ক্রিয়া নহে। উহার সবটাই হয় বৌদ্ধ নহে ত জৈন ব্রত। তাল নবমী, দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্তচতুর্দ্দশী, ঘৃত সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্রত সকলের কোনটাই বৈদিক যুগের ব্রত নহে। বৌদ্ধ-মত, সহজ-মত, বাশুলী দেবীর ব্রত এবং জৈন ব্রত প্রচ্ছন্নভাবে বাঙ্গালার মহিলাদিগের ব্রতমালার মধ্যে নিহিত আছে।

যাউক এ কথা ; আমি বলিতেছিলাম বাঙ্গলায় পূর্ব্বে এখনকার মতন মাটির মূর্ত্তি গড়াইয়া প্রতি গৃহে পূজা হইত না। তখন গ্রামে গ্রামে মন্দির ছিল, সে সকল মন্দিরে বৌদ্ধ দেবদেবীর পাষাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত এবং নরনারী এই সকল মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করিতেন। কালাপাহাড় ও বিরূপাক্ষ বিগ্রহ চূর্ণ করিবার পরে, মালদহের বা বরেন্দ্রের রাজা জগদ্রাম ভাদুড়ী প্রথমে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়াইয়া নবরাত্রির ব্রত সমাধা করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মাটির মূর্ত্তি-পূজার একজন প্রবর্ত্তক। তিনি স্বয়ং মাটির কালী প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতেন ও পরের দিন নিরঞ্জন করিতেন। তাই গোড়ায় মাটির প্রতিমা পূজাকে জনসাধারণে "আগম বাগীশী" কাণ্ড বলিত। বাঙ্গালা ছাড়া আর কোন প্রদেশে বা জাতির মধ্যে মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা-পদ্ধতির প্রচলন নাই। বাঙ্গালার এই মূর্ত্তি পূজার বৈশিষ্ট্য কালাপাহাড়ের ও বিরূপাক্ষের ধ্বংসবাদের ফলে উন্মেষ লাভ করিয়াছিল। এখনও বাঙ্গালার কোন পুরাতন শক্তি-মন্দিরে পাষাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি নাই, সবই এক একটা যন্ত্র লিখিত পাষাণ খণ্ড, পরে তাহার অপর পৃষ্ঠা কতকটা চাঁচিয়া ছুলিয়া মূর্ত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব মন্দিরে যে দ্বিভুজ মুরলীধরের লক্ষ্মী নারায়ণ জিউয়ের মূর্ত্তি সকল আছে, সে সকলই অপেক্ষাকৃত আধুনিক ;—শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পরে। খড়দহের শ্যামসুন্দরের বেদীর উপরে কিন্তু তান্ত্রিক যন্ত্র (ত্রিপুরা ভৈরবীর) লিখিত আছে। পুরাতন সকল বৈষ্ণব মন্দির ও বিগ্রহই তন্ত্রক্ষেত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সকলই মোগলের আমলে সমাজের পুনঃ গঠন কালে ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মন্দিরে, প্রতি গ্রামের নামের ভিতরে, প্রত্যেক গৃহস্থের আচার-ব্যবহারে ও কর্ম্মপদ্ধতিতে, প্রত্যেক গানে-ছড়ায়, পাঁচালী-ছন্দে, কাব্যে-গাথায় যে কত অপূর্ব্ব রকমের ঐতিহাসিক ঘটনা, সমাজ-বিপ্লবের কথা লুকান আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার স্তরে স্তরে,—সামাজিক স্তরে, ভূস্তরে ও প্রস্তরে—যে কত বিস্মৃত ও অর্দ্ধ-বিস্মৃত কাহিনী গ্রন্থিত রহিয়াছে, তাহারও আবৃত্তি বুঝিবা এক জীবনে, একজনের দ্বারা এখন শেষ করা যায় না। সাত শতাব্দী কালের মোগল-পাঠানের অভিযান উপদ্রব, রাজবিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লবে যে কত উৎকট কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা আমরা এখন ভুলিতে পারি—ভুলিয়াছিও, পরন্তু ধরাসুন্দরী নিজ বক্ষে স্তরে স্তরে অনপনেয় লেখায় তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন। এখনও সে লেখা পড়িবার সামর্থ্য আমরা হারাই নাই, এখনও চেষ্টা করিলে আমাদের সমাজ-পরিচয়, কুল-পরিচয় এবং জাতি-পরিচয় আমরা পাইলেও পাইতে পারি। এখনও ইচ্ছা করিলে আমরা বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার মহিমা বুঝিলেও বুঝিতে পারি।

শেষ কথা

আমার স্মৃতির সাহায্যে এবং আমার কাছে যে সকল পুঁথিপত্র আছে. তাহাদের সাহায্যে, যতটা সংক্ষেপে সম্ভবপর, ততটা সংক্ষেপ করিয়া আমি বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার সামান্য একটু পরিচয়

দিলাম। অনেক কথা বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার এক সময়কার প্রবল সৌর উপাসকদিগের কথা বলি নাই; মনসা পূজা ও মনসা মঙ্গল এবং নাগ উপাসকদিগের কথা কহি নাই; চণ্ডীদাসের বাশুলী কে ও কি, সহজিয়াদিগের পাল্লায় পড়িয়া তিনি কেমন আকার ধারণ করিয়াছিলেন তাহারও ব্যাখ্যা করি নাই; অবধূত সম্প্রদায়ের কথা বলি নাই, শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু অবধূত হইয়া কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের মূল পুরুষ হইয়াছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য গোড়ায় কি ছিলেন ও কেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর হইয়াছিলেন, অবধূত সমাজের 'পিশাচ-খণ্ড' কি ছিল,—ইত্যাকার অনেক কথারই উল্লেখ করি নাই। আমি কেবল আধুনিক বিদ্বজ্জন-সমাজের অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক চেষ্টায় এই তিনটি সন্দর্ভ লিখিলাম। বাঙ্গালায় "Chronicles"এর অভাব নাই, বরং বলিব তাহা অত্যধিক মাত্রায় এখনও সংগৃহীত রহিয়াছে, কেবল সে উপাদান পাইয়া প্রকৃত ইতিহাস লেখার প্রয়াস কেহ করে নাই। শ্রীমান রমাপ্রসাদ চন্দ "গৌড়রাজ মালা" পুস্তকে খাঁটি ইতিহাস লেখার একটু সূচনা করিয়াছিলেন, আর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার লিখিত "বেণেদের মেয়ে" উপন্যাসে বাঙ্গালার গোড়ার আমলের একটা সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, জাতিসকলের এবং জাতি-সঙ্ঘের ইতিহাস এখনও কেহ লিখেন নাই। বাঙ্গালীর সাহিত্যের বিশ্লেষণ-বিচার কেহ করেন নাই, তাহা হইতে লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিতে কেহ উদ্‌যোগী হন নাই। শূন্য পুরাণের ও সহজিয়া সিদ্ধাচার্য্যগণের দোঁহাবলীর সাহিত্য, ধর্ম্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের সাহিত্য, শৈব ও মনসা সাহিত্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য,—এই কয়টা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিলে অনেক এবং অসংখ্য লুপ্ত ও বিস্মৃত রত্নের উদ্ধার হইতে পারে। ইহা ছাড়া তন্ত্র-সাহিত্য আছে, কুলজী ও কুল-কথা আছে, তাহাদের প্রত্নতত্ত্ব আছে; কীর্ণাহারের রঙ্কিনী অট্টহাস, যুগাদ্যা, জগদ্দল, বজ্রযোগিনী বর্গভীমা প্রভৃতি মন্দিরের ও গ্রামের এবং বিগ্রহের, তৎসহ গাথা, পাঁচালী, কথা-সাহিত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে। এ কাজ ত একজনের নহে; একটা বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এ কার্য্যে ব্রতী হইলে পঞ্চাশ বৎসরের পরিশ্রমের পরে বাঙ্গালীর প্রকৃত ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারেন। বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে পারিলে প্রাচ্য দেশের এবং প্রাচ্যোত্তর ভারতের ইতিহাস অনেকটা জানা যাইবে। তাহারা কেমন বাঙ্গালী যাহারা ব্রহ্মে-শ্যামে, এনাম (অঙ্গম্) কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল? অন্য দেশের এবং অন্য জাতির নানাবিধ ইতিহাস আমরা পাঠ করিতেছি, পরন্তু আত্ম-পরিচয় আমরা রাখি না। ইহা কি কম লজ্জার কথা! ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ ভাই;
পাইলেও পাইতে পার
লুকান রতন॥"

বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীজাতি সত্যই এখন ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে, নিবিড় বিস্মৃতির এবং উপেক্ষার ভস্মে উহারা সমাচ্ছন্ন, একবার এই ভস্মরাশিকে উড়াইয়া দেখিবে কি ? পাইলেও পাইতে পার লুকানো রতন,—আত্মগ্লানি ও আত্ম-ধিক্কার পরিহার করিয়া শ্লাঘার অনুপম মণিমুকুট পাইলেও পাইতে পার। রোগজীর্ণ দেহে এ আশা এখনও পোষণ করি বলিয়াই, এই সন্দর্ভত্রয় লিখিলাম। যদ্বিধের্মনসিস্থিতম্।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

খড়দহ

নিতানন্দ প্রভুর নিবাস-ভূমি খড়দহ বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ।

মহাপ্রভুর আদেশে অবধূত নিত্যানন্দ স্বীয় দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া গৃহী হন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন, সুবর্ণবণিককুলতিলক উদ্ধরণ দত্ত। কালনার গৌরীদাস সরখেলের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। যখন তাঁহার আঙ্গিনায় গৌর নিতাই হরি নামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন গৌরীদাস পণ্ডিত সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন যে তিনি কিছুতেই তাঁহাদের দুজনকে আর চোখের আড়াল হইতে দিবেন না, তাঁহাদের দুইজনকে কালনায়ই থাকিতে হইবে! আবদারটা কতদূর দেখুন একবার! মহাপ্রভু বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি তোমার গৌর-নিতাই চিনিয়া লও।" সবিস্ময়ে গৌরীদাস পণ্ডিত দেখিলেন, তাঁহার আঙ্গিনায় দুইজন গৌর ও দুইজন নিতাই নৃত্য করিতেছেন, সেই একইরূপ হাতের ভঙ্গী, একইরূপ চোখের জল!—কি আশ্চর্য্য, গৌরীদাস কোন দুইটিকে রাখিবেন স্থির করিতে পারিলেন না; কিছুক্ষণ পরে যাঁহাদিগকে খাঁটি গৌর-নিতাই মনে করিলেন, তাঁহাদিগকেই ধরিয়া ফেলিলেন; অমনই বাকী দুই গৌর-নিতাই অদৃশ্য হইলেন, এবং যাঁহাদিগকে ধরিয়াছিলেন, তাঁহারা নিমকাঠের বিগ্রহে পরিণত হইয়া গেলেন। কালনার সুপ্রসিদ্ধ গৌর-নিতাই বিগ্রহের সম্বন্ধে এই প্রবাদ কথা। এই প্রবাদের মূলে অন্ততঃ এই দুইটী সত্য পাওয়া যায়। প্রথম কালনার গৌর-নিতাই বিগ্রহ তাঁহাদের সমকালীন। দ্বিতীয়, এই বিগ্রহদ্বয় গৌর নিতাইএর ঠিক অনুরূপ হইয়াছিল।

যদিও গৌরীদাসের পরিবার বৈষ্ণব-প্রভুদ্বয়ের এতটা ভক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের জীবিতাবস্থায়ই তাঁহাদিগের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা যে সমাজের শাসনকে ভয় না করিতেন তাহা নহে। গৌরীদাসের ভাই সূর্য্যদাস সরখেল উদ্ধরণ

দত্তের অনেক যুক্তি ও তর্ক শুনিয়া, নিজে নিত্যানন্দের বিশেষ ভক্ত হইয়াও গৃহত্যাগী অবধূতের হস্তে নিজের দুইটি কন্যা প্রদান করিতে প্রথমতঃ খুবই দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। তারপর নিত্যানন্দ তাঁহাকে কয়েকটি বিভূতি দেখাইলেন। তাহাতে সূর্য্যদাস আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই "জাতি-নাশা" মহাপুরুষটির হস্তে "জাহ্নবী ও বসুধা"কে সমর্পণ করিয়া ফেলিলেন।

এই বসুধা ও জাহ্নবীকে লইয়া নিত্যানন্দ খড়দহে আবাস স্থাপন করিলেন। জাহ্নবীর পুত্র বীরভদ্রই "শ্যাম সুন্দর" বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। বীরভদ্র সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। কথিত

যে পাথরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ রচিত হয় তাহার অবশিষ্টাংশ।

আছে গৌড়ের বাদসাহ একবার তাঁহাকে ভণ্ড সন্ন্যাসী মনে করিয়া আটকাইয়া রাখেন, কিন্তু তিনি নানারূপ অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া সম্রাটকে বিস্মিত করেন। "প্রেমবিলাস" এই সকল আজগুবী অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্রাট বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার কোন ভেদ-জ্ঞান নাই, যাহা ইচ্ছা তাহা খাইতে পার।" সন্ন্যাসীর পক্ষে এ সম্বন্ধে আপত্তি খাটে না, বীরভদ্রও কোন আপত্তি করিলেন না; নানারূপ নিষিদ্ধ মাংসের বিবিধ ব্যঞ্জন উৎকৃষ্ট রৌপ্য পাত্রে সাজাইয়া আনীত হইল। খানসামারা সম্রাটের সম্মুখে বীরভদ্রকে সেগুলি খাইতে দিল। বীরভদ্র দেখিলেন,

আহার্য্য শুভ্র বস্ত্রে আবৃত রহিয়াছে,—তিনি সেই শুভ্র বস্ত্র উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন, তখন দেখা গেল নিষিদ্ধ মাংস তথায় নাই। তৎস্থলে রহিয়াছে নানা রংএর সুগন্ধি ফুল ও উৎকৃষ্ট ফল। বাদসাহ প্রীত হইয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর তুমি কি চাও ?"

শ্যামসুন্দরের মন্দির।

বীরভদ্র রাজ-প্রাসাদের তোরণ-সংলগ্ন একখানি উৎকৃষ্ট কালো পাথর চাহিলেন; সেই পাথর হইতে নাকি তখন অবিরত ঘর্ম্ম-বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছিল। সেই পাথর দিয়া তিনখানি বিগ্রহ রচিত হয়। অবশিষ্টাংশ এখনও পড়িয়া আছে। [৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন]

ঐ পাথরে শ্যামসুন্দর ছাড়া আরও দুই খানি বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহাদের একটি

সাঁইবনায় ও আর একটি বল্লভপুরে; আছেন। কিন্তু শ্যামসুন্দরের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া আছে। [৩৮৭ পৃষ্ঠায় শ্যামসুন্দরের মন্দির দেখুন]

চারিদিকে ছোট ছোট বাড়ী, ছোট ছোট রাস্তা, ছোট ছোট গাছ, সহসা এই বিশাল মন্দির অপ্রত্যাশিত ভাবেই চোখে আসিয়া পড়ে। এই প্রকাণ্ড মন্দিরের উপর যে পাঁচটি "খুন্তী" আছে, উহা নকল খুন্তী ; বাঙ্গালা ১৩১৭ সনের ঝড়ে আদতগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই "খুন্তী" গৌড়ের বাদসাহের দত্ত অভয় চিহ্ন। অর্থাৎ যে মন্দিরের মাথায় এই 'খুন্তী' থাকিবে, তাহা মুসলমান অত্যাচার এবং আক্রমণ হইতে একেবারে নিরাপদ। কথিত আছে বীরভদ্রকেই গৌড়েশ্বর সর্ব্ব-প্রথম এই 'খুন্তী' ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন এবং শ্যামসুন্দর মন্দিরের শিরেই ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা। তারপর অপরাপর কতকগুলি মন্দির এই অধিকার পাইয়াছিল। মন্দিরটির গঠন প্রণালী অনেকটা কালীঘাটের মন্দিরের মত। ইহার মধ্যে দুইটি প্রাচীন নিদর্শন আছে। প্রথমটি নিত্যানন্দের অবধূত-ধর্ম্মের ভগ্নধ্বজ-স্বরূপ ভাঙ্গা লাঠি খানি। এই তাহার চিত্র দেখুন :—
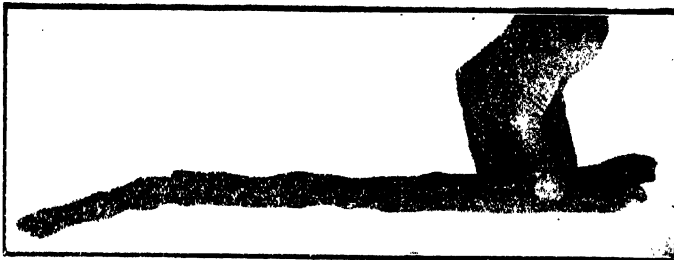
নিত্যানন্দের অবধূত ধর্ম্মের ভগ্নধ্বজস্বরূপ ভাঙ্গা লাঠি।

দ্বিতীয় নিদর্শন—নিত্যনন্দের হাতের লেখা ভাগবৎ। তাহার একটি পৃষ্ঠার প্রতিচিত্র নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।
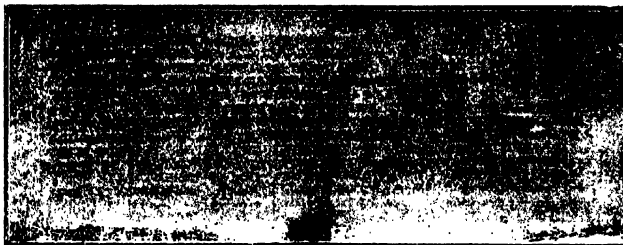
নিত্যানন্দের হাতের লেখা ভাগবৎ।

আমি এই পুঁথি স্বয়ং দেখিয়াছি। ইহার গলিত অবস্থা ও হস্তাক্ষরের প্রাচীনরূপ দেখিয়া, ইহা যে নিত্যানন্দের হস্তাক্ষর তাহার সম্বন্ধে কোন দ্বিধাই হয় না।
সেই প্রাচীন কাল হইতে এই পুঁথি নিত্যানন্দের লেখা বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে। আমাকে তাঁহার এক বংশধর বলিলেন, "এ লেখা যে নিত্যানন্দের তাহার সম্বন্ধে আমার একটি সন্দেহ আছে। দেখুন, ইহার জায়গায় জায়গায় ভুল আছে। যুগাবতার পতিতপাবন প্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত হইলে ইহাতে কি ভুল থাকিতে পারিত!"

শ্যামসুন্দরের দোলমঞ্চ।
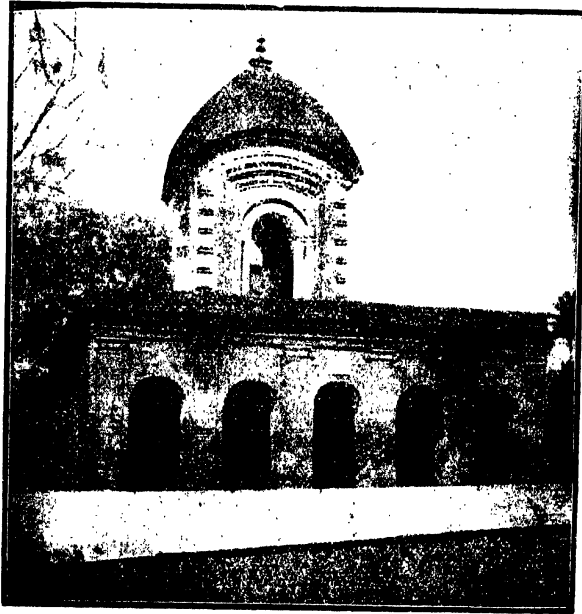
পতিতপাবন প্রভু যে একজন বৈয়াকরণ ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ১২ বৎসর বয়স হইতে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, তিনি ব্যাকরণশুদ্ধ রচনা করিবার সুবিধা পাইলেন কবে? বর্ণাশুদ্ধি বঙ্কিমবাবুর লেখার পত্রে পত্রে হইত, মাইকেল ত বর্ণাশুদ্ধির ঝুড়ি লইয়া প্রেসে দিতেন, পণ্ডিত তাহা শুদ্ধ করিতে যাইয়া গলদঘর্ম্ম হইত। নিত্যানন্দ যেরূপ প্রেম-বিহ্বলভাবে মাতোয়ারা অপার্থিব চরিত্র ছিলেন, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। সে আমলে খুব অল্প লোকই বর্ণাশুদ্ধি পরিহার করিতে পারিতেন। তবে মহাপ্রভু ও তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল, জগন্নাথ মিশ্রের হাতের লেখা সংস্কৃত মহাভারতের যে পুঁথি আমি দেখিয়াছি,

তাহা একান্ত নির্ভুল। নিত্যানন্দ প্রভুর হাতের লেখা এই অমূল্য পুঁথি খানি যে ভাবে আছে, তাহাতে মনে হইতেছে হয়ত অচিরে শুনিব যে ইহা চুরি হইয়া গিয়াছে। হায় বাঙ্গালী জাতি! হায় বৈষ্ণব সমাজ! কত সভা-সমিতি ও মেলা বসিতেছে—কিন্তু তোমাদের সর্ব্বস্ব যে সকল পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহা আগলাইবার চেষ্টা করিবার জন্য একটি প্রাণীও দেখিতেছি না। কথায় দড়, কাজের বেলায় কাণাকড়ির দেশ-প্রীতিও তোমাদের দেখিতে পাই না।

পতিত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ যে স্থানে বীরভদ্রের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়া ছিল, সেই স্থানে কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন-স্বরূপ তাহাদের বংশধরগণ বৎসর বৎসর একটা মেলার প্রতিষ্ঠা করিত। অর্থাভাবে সেই মেলা আজ ২০।২৫ বৎসর যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে। ১২০০ নেড়া অর্থাৎ মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ১৩০০ নেড়ী অর্থাৎ মুণ্ডিত শিরা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী এই স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই স্থানটি "বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে উহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদি বাড়ী (এখন পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে) এবং নেড়া নেড়ার মেলার স্থানটির চিত্র নিম্নে দেখুন।

নেড়ানেড়ির মেলার স্থান।

খড়দহে জাহ্নবী ও বসুধাদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই মন্দিরের প্রতিচিত্র পরপৃষ্ঠায় দিতেছি। যাঁহারা এই সকল বিষয় ভাল করিয়া জানিতে চাহেন, তাঁহারা নিত্যানন্দ দাস কৃত প্রেম-বিলাস পুস্তক পাঠ করুন।

এই খড়দহে শ্যাম সুন্দরের মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের কত কথাই মনে হইতেছিল। এই মন্দিরে বিজলী-বাতি জ্বলে না, এই মন্দিরের পথঘাট সুপ্রশস্ত নহে, এই

মন্দিরে আধুনিক কারুকার্য্য নাই, কিন্তু তথাপি এই মন্দিরের মেটে প্রদীপটি বঙ্গ ভূমির ললাটের সিন্দূর বিন্দুর ন্যায় পবিত্র। এই মন্দিরের দেবতাকে সাক্ষী করিয়া একবার হিন্দু সমাজ জাতি ভেদের কঠোর নিগড় খুলিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। এই মন্দিরের অপ্রশস্ত রাস্তা ঘাট এক সময় প্রতি পর্ব্ব উপলক্ষে বিপুল জনসংঘ বহন করিয়া আনিত এবং ইহার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য বঙ্গের বহু নর নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া আসিত। তাহাদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি

বসুধা ও জাহ্নবীর বিগ্রহ।

ইহার "শিরোপা" নামক ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ বস্ত্র উপহার পাইয়া মাথায় বাঁধিতে পারিতেন, তাঁহারা জীবন সার্থক মনে করিতেন। হায়! সেই মেটে প্রদীপে ঘিয়ের সল্‌তা, হায়! সেই শিরোপার উজ্জ্বল রক্তিমা, হায়! এই মন্দিরের বিশাল রূপ,—বাঙ্গালাদেশ এখন নানা ঝক্‌ঝকে, আপাতসুন্দর মেকীতে ভরিয়া গিয়াছে, আমাদের চোখ ঝলসিয়া গিয়াছে, অন্ধ হইয়া গিয়াছে—আবার কবে সেই সরল প্রাণ, সর্ব্বস্ব দেওয়া ভক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরতা ফিরিয়া পাইব? কবে তীর্থগুলির মহিমার পুনরুদ্ধার হইবে, জড়বাদীর নগরীর রূপ ম্লান হইবে?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

স্মৃতি

চিত্রকর শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ ও চিত্রাধিকারিণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সৌজন্যে—
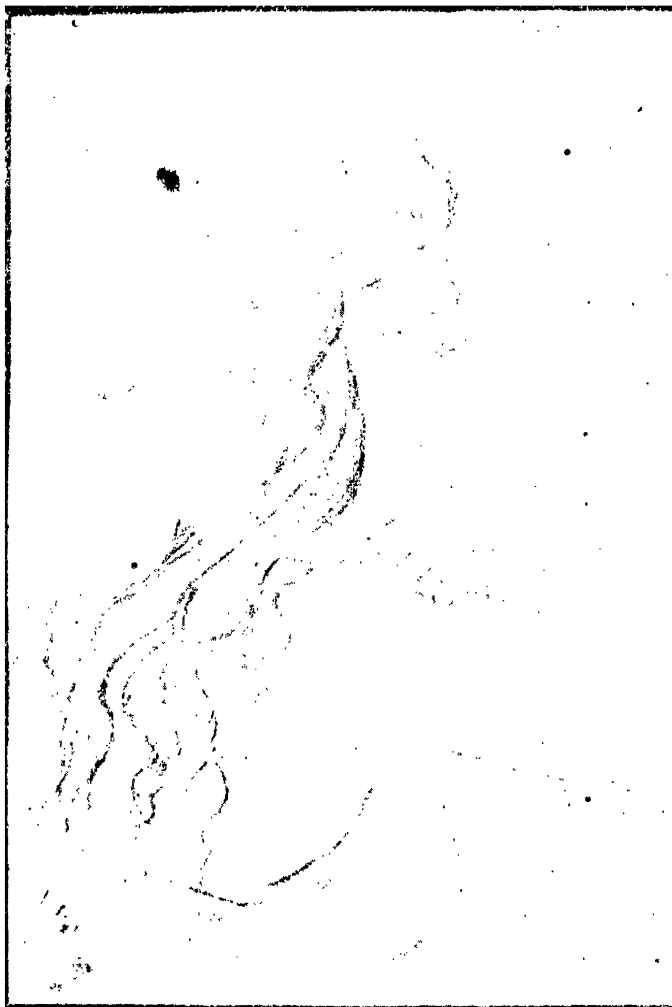
ছিটে-ফোঁটা

সাগর—আমি সাগর।—আমার বুকের উপরে একদিকে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ, আর অন্যদিকে বিষাদের জড়িমা ও নিশ্চেষ্টতা। জনপূর্ণ মহাদেশের কূলে কূলে আমি নিরন্তর আছড়াইয়া পড়িতেছি; আর যেখানে মেরুপ্রান্তে মাথার উপরে অবিরাম প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতেছে, সেখানে চিরজাগ্রত শীতল স্পর্শে আমার উচ্ছ্বাসগুলি স্তরে স্তরে পাহাড় সাজাইয়া নিশ্চল হইয়েছে। পৃথিবীর কূলের আঘাতজনিত ব্যথাই আমার আনন্দ; আর—চিরশীতল স্পর্শে জাত নির্ম্মল শুভ্র কঠোরতাই আমার নির্ব্বাণ। আমার মোক্ষ,—আমার গতি, এক দিকে চঞ্চলতার অবিরাম উচ্ছ্বাসে, আর একদিকে ঝঞ্ঝার তলায়, নিশ্চল সমাধিতে।

* * *

ছায়া—আমি ছায়া। আমার পিছনে পিছনে রহিয়াছে এক অত্যজ্য অনুচর; সে বৃহত্তর ও গাঢ়তর ছায়া; সে মৃত্যু। আমার সম্মুখের পা ফেলিবার পথে রহিয়াছে উজ্জ্বল ও অফুরন্ত শূন্য। আমি এক একবার অলস হইয়া বৃহত্তর ছায়ার গায়ে ঢলিয়া পড়ি, আর এক একবার কর্ম্মবীর হইয়া শূন্যে পাদক্ষেপ করি। উভয় দিকেই ভীতি। অন্ধকারের মোহে ও আলোকের উত্তেজনায় আমি আমাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া ভাবি, এবং নির্ভয় হইয়াছি ভাবিয়া শান্তির মন্ত্র পড়ি। লোকে বলে আমি আলোকের সহচর; কিন্তু বুঝিলাম না,—আমার প্রতিষ্ঠা অন্ধকারে না আলোকে, মৃত্যুতে না জীবনে? আমার সম্মুখে পথের চিরউজ্জ্বল শূন্যের ভিত্তি কোথায়? আমার ভিত্তি কোথায়?

* * *

পৃথিবী—আমি পৃথিবী। হে সূর্য্য! জন্মের মুহূর্ত্ত হইতে আমি তোমাকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরিতেছি; যে আমাকে বেড়িয়া ঘোরে, তাহাকেও বুকে ধরিতে পারিলাম না,—তোমাকেও নয়। হে সূর্য্য তুমি নিজে আমাদিগকে টানিতে টানিতে বহু দূরের "লীরা"কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছ। সেই তোমার সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছ, অথচ সে পথে দু'এক তিল বই অগ্রসর হইতে পার নাই; আর তুমি যদি বহুদূরও অগ্রসর হইতে, তবে কি এখনও লীরায় ও তোমাতে সমান ব্যবধানই রহিত না? তুমিও লীরাকে পাইতেছ না, আমিও তোমাকে পাইতেছি

না,—আর আমার প্রেমিকও আমাকে পাইতেছে না। মিলন নাই, মৃত্যু বা নির্ব্বাণ নাই,—কেবল আছে অনন্ত পথে অনন্ত বেষ্টন।

* * *

মানুষ—আমি উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে উড়িতে শিখিয়াছি,—আমি উর্দ্ধতম পর্ব্বতের শিখরে উঠিতেছি, আমি আত্মদম্ভে উর্দ্ধকে জয় করিতে চলি নাই। আমার ক্ষমতার সীমায় দাঁড়াইয়া এই আমার আবাস স্থলের অজানা প্রান্তে নূতন রাজ্য দেখিতেছি। আমার জ্ঞানের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রাণের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িয়াছে, যাহারা একদিন আমার অজ্ঞানে ও ঔদাসীন্যে অপরিচিত অথবা উপেক্ষিত ছিল। হে অজানা আপনার জন! আমি তোমাদিগকে দেখিব,—তোমাদিগকে ধরিব, আর তোমাদের সৌন্দর্য্যের ধ্যানে আমার চারিদিকের শূন্যকে পূর্ণ করিব।

* * *

অফুরন্ত

তোমারে পেয়েছি বটে, তবু মনে হয়
আরও কত বেশী পাওয়া রয়েছে পড়িয়া;
যেটুকু পেয়েছি, তার সীমানা টুটিয়া
অজানার অফুরন্ত নব-পরিচয়
কত যে রয়েছে বাকী! দেহ কিনারায়
ওই যে মিশেছে তব অতনু-কায়ার
অন্তহীন পারাবার,—চিত্ত মোর চায়
সে অসীম সন্তরিতে, তলাইতে তার
অতল-পরশ-তলে, হ'তে আত্মহারা
তোমার আত্মার মাঝে। ক্ষুদ্র দেহটিরে
কেন্দ্র করি দিগ্‌দিগন্তে যে আলোক-ধারা
বিতরিছে প্রাণ-জ্যোৎস্না, চিত্তে মোর ফিরে
সে আকাশে, সুধা-মত্ত চকোরের পারা;
নিত্য নব পরিচয়ে তুমি সীমাহারা।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আইন আদালত

ভারতীয় আইন সভায় নূতন বিধির প্রস্তাব

(১)

হিন্দুর আইন যেমন আছে,—অর্থাৎ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে "অবৈধ" সন্তানের সামাজিক পদবী যাহাই হউক, উহারা জন্মদাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারে ; অন্ততঃ পক্ষে শূদ্রদের মধ্যে যে এরূপ উত্তরাধিকারে বাধা নাই, তাহাই কয়েক বৎসর ধরিয়া হাইকোর্টের বিচারে স্থির হইয়াছে। রেডি নামক একজন মাদ্রাজি-সদস্য এই রীতি সম্পূর্ণ উঠাইয়া দিবার জন্য নূতন সরকারী আইন পাশ করাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু নীতি এই,—কেহ সংযম হারাইয়া নিজ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিলেও সে মিলনকে বিবাহ বলিয়া ধরিতে হইবে,—তবে বিবাহ পৈশাচও হইতে পারে, বা রাক্ষসও হইতে পারে; কেহ যে নিজের কর্ম্মফল ও দায় এড়াইয়া, প্রজাপতির মত বিচরণ করিবেন, তাহা হইতে পারে না। সনাতন প্রথার উকিলেরা এ সকল স্থলে প্রাচীনতা রক্ষা করিতে চাহেন না, দেখিতেছি। যাঁহারা হিন্দুর আইনে বিদেশের হাত সহিতে পারেন না বলিতেছেন, তাঁহারাই আবার হিন্দুর রীতি বদলাইবার জন্য সরকারী বিধান চাহিতেছেন।

বারিষ্টার গৌর মহাশয় আবার অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ করাইবার আইন পাশ করাইবার প্রস্তাব তুলিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এ স্থলেও আইন পাশ না করাইয়া, জাতীয় ব্যবস্থায় যাহা আছে, তাহার প্রসার বাড়াইয়া তোলা, এবং প্রয়োজন হইলে নিজেদের ব্যবস্থায় নূতন রীতি চালাইয়া লওয়া উচিত। কি ভাবে একাজ হইতে পারে, ভবিষ্যতে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু এ সম্বন্ধে হাস্যকর বিষয় এই যে, সামাজিক বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ অনুচিত বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় যে সভ্যেরা অসম্ভব কোলাহল তুলিলেন, তাঁহারাই অম্লানবদনে আদর করিয়া রেডি মহাশয়ের (গারু= মহাশয়) প্রস্তাবটি পেশ করাইলেন। সমাজ মেরামতের অর্থই দাঁড়াইয়াছে, ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা, কোন নির্দ্দিষ্ট নীতির অনুসরণ নয়।

(২)

বোম্বাই ও কলিকাতার হাইকোর্টের উকীলদের এই অধিকার নাই যে তাঁহারা হাইকোর্টে প্রথমে নূতন করিয়া দায়ের করা মোকদ্দমায় ওকালতি করিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ব্যারিষ্টার দের বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে; তবে মাদ্রাজের উকীলেরা এ অধিকারে বঞ্চিত নহেন। ব্যারিষ্টারকে কোন বিষয়ে বিশেষ অধিকার দিবার পক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। এবারে আইন সভায় প্রস্তাব হইয়াছে যে উকীলদিগকে হাইকোর্টে মোকদ্দমার আদিম বিচারে কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

কার্ত্তিকে

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব—যাঁহারা অধ্যাপনা করেন, যাঁহারা শিক্ষা-বিষয় লইয়াই বিশেষভাবে ব্যাপৃত, কেবল তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কাজের পরিচালনার উপযুক্ত পাত্র। বিদেশের যে সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাঁচে, আমাদের একালের বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়া, সেখানে এই নিয়মই চলে,—আর আমাদের প্রাচীন কালের টোলেও এই নিয়মই চলিত। যাঁহারা টাকা না দিলে বিশ্ব-বিদ্যালয় চলে না, ইউরোপে তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর তিল মাত্র-ও কর্ত্তা-গিরি চালান না; এ দেশের টোলের অধ্যাপকেরাও দাতা রাজাদের কাছে কৈফিয়ৎ কাটিতেন না! এ দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর প্রচলিত আইনে যতখানি কর্ত্তৃত্ব আছে, উহাও ইউরোপের আদর্শে ও আমাদের প্রাচীন আদর্শে অত্যধিক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে কথা উঠিয়াছে যে, প্রচলিত আইন বদলাইয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে বিশ্ব-বিদ্যালয় শাসন করিবার অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া চাই। জানিনা, কেহ কেহ নূতন অর্জ্জিত ক্ষমতার নেশায় ভাবিতেছেন কিনা,—যাহাকে টাকা দিব, তাহাকে ধমকাইতে পারিবনা কেন। শিক্ষার ব্যবস্থার উপর হাত না দিয়া, টাকা কড়ির ব্যয়ের পদ্ধতিতে হাত দিলেও একই ফল হয়, কারণ, রসের উপরেই পুষ্টি নির্ভর করে। এরকম প্রস্তাব শুনিলে, প্রজা উদ্‌বাস্তু করিবার প্রচলিত গল্পের সেই কথাটি মনে পড়ে,—"তোকে তাড়াইব না, কেবল তোর উঠান চষিয়া ফসল বুনিব।" প্রচলিত আইন পরিবর্ত্তিত হউক আর নাই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়কে লইয়া এরকম সমালোচনা চলিলেই উহার গৌরব নষ্ট হয়, ও ছাত্রদের মনে অসম্মান ও উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে। অনেক সুবুদ্ধি ব্যক্তিও এসময়ে, দুর্বুদ্ধির চাপে পড়িয়া বলিতেছেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিতদের ও অধ্যাপকদের আভিজাত্য (Intellectual Aristocracy) ভাঙ্গিয়া "গণতন্ত্র" বসাইবেন।

উপস্থিত আইন-সভার সভ্যেরা হয়ত সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল বিভাগে কর্ত্তাগিরি করিতে সমর্থ; কিন্তু তাঁহারাইত বলিতেছেন যে, ভবিষ্যতের আদর্শ আইন-সভায় দেশের অনেক অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত কর্ম্ম-পটু ব্যক্তিরা আসন পাইবেন। এখন ক্ষমতার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রচলিত আইন বদ্‌লাইলে, ভবিষ্যতের কর্ম্মপটুদের হাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কি দশা হইবে? আইন যে বদ্‌লাইবে, তাহা বলিতেছিনা, কিন্তু কি ভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষা করা উচিত, তাহা না বুঝিয়া লইবার ফলেই যে পদস্থেরা ভুলক্রমে শিক্ষা-সংহার-নীতির মন্ত্র জপিতেছেন, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

* * *

মেলেরিয়া—এদেশের লোক বহুকাল হইতেই কার্ত্তিকের পচানে জ্বরে ভুগিতেছে ও মরিতেছে; পুরা (৫০) পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা সম্বন্ধে এই লেখকের নিজের অতি প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট স্মৃতি আছে। মেলেরিয়ার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের অনেক উপপত্তি আছে, এবং উহার নাশ সম্বন্ধেও অনেক সিদ্ধান্তের কথা পণ্ডিতদের মুখে শুনিয়াছি; আমাদের মোটা বুদ্ধিতে উহার বিচার চলে না। তবে জানি যে, যে অঞ্চলে রেলের নাম গন্ধ ছিল না, এমন অনেক স্থলে ঐ জ্বরের ভীষণ প্রকোপ দেখিয়াছি, আর যেখানে রেল ছিল, এমন অনেক স্থলে মোটেই উহার প্রাদুর্ভাব ছিল না। চারিদিকের মেলেরিয়ার মধ্যেও যে সকল গ্রামে জল বিশুদ্ধ থাকিত, যেখানকার লোকেরা ভাল খাইতে পাইত ও পরিচ্ছন্ন থাকিত, সেখানে এই পচানে জ্বর দেখা যাইত না। বড় উৎসবের বড় ছুটীতে অনেক বুদ্ধিমান লোক গ্রামে বাস করিবেন; তাঁহারা পণ্ডিতদের উপপত্তি ও সিদ্ধান্ত লইয়া মাথা না ঘুরাইয়া, জল ভাল রাখিবার ও শস্য-বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে চাষাদের সঙ্গে জুটিয়া যাহাতে একটা কিছু করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে বড় ভাল হয়। ইহাতে মেলেরিয়া না মরিলেও অন্যদিকে যখন উপকার হইবে, তখন এ সুসাধ্য সাধনের চেষ্টা করা উচিত। বলিয়া রাখি, যে সকল ডাক্তারেরই তাঁহাদের উপপত্তিতে অচলা ভক্তি নাই; তাঁহারা রোগ হইলেই কেবল ঔষধ দিয়া থাকেন, আর দাশুরায়ের গানে যাহা আছে, প্রকারান্তরে তাহাই বলিয়া থাকেন,——"আমি কেবল নিদানে"।

* * *

বিলাত ঘরের কাছে আসিতেছে—জাহাজে চড়িয়া বিলাতের মাটীতে পা দিতে এখন ন্যূন পক্ষে ১৫।১৬ দিন লাগে; উড়া জাহাজের যে বন্দোবস্ত হইতেছে, তাহাতে লাগিবে সাড়ে তিন দিন। আকাশ পথের যাত্রায়, জাহাজের চেয়ে বড় বেশী খরচ পড়িবে না, আর একখানি যানে ২০০ যাত্রী যাইতে পারিবে। বিলাত খুব ঘরের কাছে আসিতেছে; কাজেই সে দেশের সভ্যতার টাট্‌কা ভাবটা বেশী প্রসার লাভ করিবে। এ সময়ে স্থির-প্রাণতায় ইউরোপীয় সভ্যতার গতি ও প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত, সমাজ-তত্ত্বের জ্ঞান-চক্ষুতে জাতীয় স্থিতির অথবা লোকস্থিতির যথার্থ পথ দেখিয়া লইতে হইবে, এবং হিতৈষণার নামে জ্যেঠামি ছাড়িয়া, নিজেদের অধোগতির কারণ বুঝিয়া লইতে হইবে। এইজন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষার্থীদিগকে ইতিহাস ও নৃ-তত্ত্ব পড়িতে আহ্বান করিতেছি।

* * *

কলিকাতার প্রসারবৃদ্ধি—বিলাতি সভ্যতায় পল্লীর লোকসংখ্যা কমে ও সহরের প্রসার বাড়ে। কলিকাতার প্রসার বাড়িবে; উত্তরে কাশীপুর পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে বেহালা পর্য্যন্ত সহরটি বিস্তৃত হইবে। এখন সহরের অধিবাসী এগার লক্ষ; হয়ত অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডনের মত লোকসংখ্যা হইবে ৬৭ লক্ষ; হয়ত শীঘ্রই উত্তরের সীমা, বারাকপুর ছাড়াইবে। কলিকাতার গড়ের মাঠটি রক্ষা করিবার ভার ছিল সৈনিক বিভাগের উপরে; এখন উহা মিউনিসিপালিটির হাতে পড়িবে। দেশের মিউনিসিপালিটির এই জমিদারী বাড়ায় যে খরচ বাড়িবে, সে খরচ যদি আয়ের টাকায় কুলাইত, তবে সৈন্য-বিভাগ এই জমিদারী ছাড়েন কেন? সকল বিভাগের টাকা কাটিয়া সৈন্য বিভাগের টাকা বাড়ান হইয়াছে; তাহার এক পয়সাও গড়ের মাঠের জন্য খরচ করা হইবে না। আমাদের খরচ বাড়ুক, ক্ষতি নাই,—এবারে মাইল কতক স্বরাজ বাড়িয়া গেল।

* * *

বিলাতি খবর—আয়ার্লাণ্ডের রাষ্ট্রদ্রোহীরা নগর ধ্বংসের ও নরহত্যার একশেষ করিয়াছে,—স্বরং রাষ্ট্র-সভাপতি কলিন্সকে হত্যা করিয়াছে। পার্লামেণ্টের "মরণ-কামড়" দলের সভ্যেরা এই বিদ্রোহীদিগকে সাজা দিবার জন্য অনেক জিদ করিয়াছেন, কিন্তু পার্লামেণ্ট ঠাণ্ডা মাথায় কেবল বিদ্রোহের নির্ব্বাণের পর শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এত বড় বিদ্রোহের নেতা ডি, বেলেরা, দণ্ডিত হইলেন না; বরং তাঁহার সঙ্গে সন্ধির পরামর্শ চলিতেছে। রাজনীতিটি, জলের মত নিজের আধারের ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের রূপ ধরিয়া থাকে।

অনেকবার বলিয়াছি, যে ফরাসীরা দুস্থ জার্ম্মানিকে একেবারে পেষণ করিয়া যুদ্ধের খেসারতের টাকা আদায় করিতে চায়, আর সন্ধির নিয়মটা খানিকটা অগ্রাহ্য করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব চালাইতে চায়। জার্ম্মানি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে; প্রায় আমাদের একটা আধুলির মত "মার্ক" নামক টাকার ২৫টীতে আগে একটি সোণার পাউণ্ড পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন পঁচিশের যায়গায় ৬০০০ মার্ক দিলে, আমাদের হিসাবের ১৫ টাকার একটি পাউণ্ড পাওয়া যায়। জার্ম্মানেরা অনেক পরিশ্রম করিয়া টাকা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ফরাসীর দাবী শোধ করিতে পারিতেছেনা। এবারে বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, জার্ম্মানি ফরাসীকে টাকা না দিয়া সাময়িক বাজার দরে কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ দিবে। টাকার অভাবে জার্ম্মানেরা রুশিয়ায় রোজগারের পথ খুলিতেছে; কিন্তু ইহাতে জার্ম্মানির বল বাড়িবে ভাবিয়া অন্যদের আতঙ্ক হইয়াছে; কাজেই জার্ম্মানির ঘটিয়াছে বিষম সঙ্কট।

গ্রীকেরা তুর্কী সম্রাজ্যটিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য চিরকালই ব্যগ্র। ইংরেজ রাজমন্ত্রী লয়েড জর্জের একটি উক্তির অযথা ব্যাখ্যা করিয়া গ্রীকেরা বলিয়াছিল যে তাহারা বাহুবলে কন্স্তান্তিনোপল অধিকার করিলে ইংরেজেরা বাধা দিবেন না। আগে হইতেই তুর্কীর রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ ছিল; ইংরেজ রাজমন্ত্রীর উক্তির ছল ধরিয়া গ্রীকেরা সৈন্যবল লইয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল! সৌভাগ্যক্রমে তুর্কীদের সৈন্যেরা সর্ব্বত্রই গ্রীকদিগকে হঠাইয়া দিয়াছে। পশ্চিম এসিয়ার আনাতোলিয়া রাজ্য হইতে গ্রীকেরা তাড়িত হইয়াছে,—স্মির্ণা এখন কেমালপাশার দখলে, এবং তুর্কীর রাজবংশ প্রবর্ত্তক ওসমানের আদিম কীর্ত্তিস্থান "ব্রুসা" নগরও কেমালপাশার দখলে। গ্রীক জয়ী হইলে কি হইত জানি না, কিন্তু অখৃষ্টীয়ান তুর্কীদের জয়ে বলকান্ রাজ্যে হিংসার আগুন ধোঁয়াইতেছে। রুমানিয়া ও জুগোশ্লাভিয়া মাথা নাড়া দিয়া গ্রীসের সহায়তার ছলে "থ্রেসে" তুর্কীর ক্ষমতা বাড়িতে না দিবার কল্পনা করিতেছে; এখন সুযোগ পাইয়া বুলগেরিয়া থ্রেসের সীমায় না আসিতে পারে, তাহাও দেখিতেছে। ইংরেজ ফরাসী ও ইতালীয়েরা চেষ্টা করিতেছেন যে, আনাতোলিয়াটী তুর্কীর দখলেই থাকুক,—তবে কেমালপাশার প্রভাব যাহাতে ইউরোপে প্রসারিত না হয়, তাহার জন্য দর্দনলিস (Dardenneles)এ ইঁহাদের যুদ্ধ জাহাজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকুক।

* * *

ভারতীয় একতা—আমরা বঙ্গবাণীর প্রথম সংখ্যাতেই লিখিয়াছিলাম যে, সারা ভারতবর্ষে একতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, আমাদের উন্নতি অসম্ভব, এবং সেই একতা লাভ করাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। যাঁহারা আমাদের একতা লাভ অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারাও যে স্বীকার করেন যে, বিনা একতায় আমাদের উন্নতির আশা নাই, তাহাও উক্ত মন্তব্যে উল্লিখিত ছিল। এবারে অসহযোগ পন্থীদের বা আড়ীর দলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল; প্রবন্ধ লেখক শ্রীমান্ হেমন্ত কুমার সরকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে যেন মনে হয়, যে অসহযোগবাদীরা গোটা ভারতকে এক করিয়া রাষ্ট্রোন্নয়ন চাহেন না, এবং কাজেই একতা লাভ সম্ভব কি অসম্ভব, তাহার বিচারও করেন না। প্রাচীন ভারতে কখনও একতা লাভ কাহারও লক্ষ্য ছিল না, একথাও ঐ প্রবন্ধে আছে। এ সম্বন্ধে অসহযোগ পন্থীদের মধ্যে মতভেদ আছে কিনা, তাহা আমরা জানিবার জন্য উৎসুক। সকল দিকের সকল কথা শুনিবার পর আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

* * *

সুড়ঙ্গের রেল—পাতালে যে রেল চলে, ইংলণ্ডে তাহাকে বলে "টিউব"—অর্থাৎ "চোঙ্গার রেল"। কলিকাতায় এই চোঙ্গা রেল বা সুড়ঙ্গের রেল পাতিবার প্রস্তাব হইয়াছে। শিয়ালদহের খানিকটা পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সহরের মধ্যে ৪।৫টি ষ্টেশন রাখিয়া গঙ্গার তলা দিয়া হাওড়ার খানিকটা পশ্চিম পর্য্যন্ত এই রেল করিবার কথা। বিলাতের মাটি শক্ত; কাজেই সহজে সেখানে পাতালের সুড়ঙ্গে রেল বসিয়াছে; কিন্তু বঙ্গদেশের মাটি অতি শিথিল ও জলে ভরা। বিলাতে ১০০ ফুট নীচে, যে রকম কঠিন মাটি পাওয়া যায়, কলিকাতায় তাহার জন্য ৪০০ ফুট তলায় যাইতে হয়; অত তলায় না যাইয়া কি করিয়া সুড়ঙ্গের ছাত ও দুই পাশ শক্ত ও নিরাপদ করা যায়, তাহার বিচার হইতেছে। ইঞ্জিনিয়ারেরা আঁচিতেছেন যে এই বহু কোটী টাকার রেলটি পাঁচ বৎসরেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

* * *

রাজমন্ত্রীর উক্তি—আমরা খোকা সাজিতে ভালবাসি; আমাদের মন ভুলাইয়া কেহ দুইটি মিষ্ট কথা বলিলে অথবা চোখে ধূলা দিলে, আমরা সুখী হই। এদেশ শাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ নীতি যাহা, তাহাই স্পষ্ট কথায় সিবিল সার্বিসের তর্কের প্রসঙ্গে রাজমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন। শিষ্টাচারের মিষ্ট কথাকে খাঁটি সত্য বলিয়া নজীর দিয়া আমাদের ব্যবস্থাপক [illegible]মন্ত্রীর উক্তির প্রতিবাদ হইয়াছিল। আমরা গতবারেই বলিয়াছি যে, শাসন-দণ্ডটি আপনাদের হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াই ইংরেজ সরকার আমাদিগকে ঐ দণ্ডটি একটু নাড়িতে চাড়িতে দিবেন; এবং সেই নাড়াচাড়ার নামই ভারতের আত্ম-শাসন। ইংরেজের মনে হইয়াছে যে, সিবিল সার্বিসে বেশী ইংরেজ না থাকিলে ও উহার দাবদাবাই চলিয়া গেলে এদেশের লোকসাধারণ ভুলিয়া যাইতে পারে যে, তাহারা বাস করিতেছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায়।

* * *

নিবেদন— অপরাজিতা উপন্যাসখানি যে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে পারিবে না, তাহা আমরা গোড়ায় ভাবিতেই পারি নাই। উহার লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, এখন নানা কাজে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়াই হয়ত এইরূপ ঘটিল। আমাদের নিজেদের দোষে না ঘটিলেও এই ত্রুটীর জন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। তবে এখন সুখের বিষয় এই যে অতি শীঘ্রই একজন বিখ্যাত কৃতী লেখকের একখানি নূতন মনোহর উপন্যাস বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.

আকবরের জন্ম

খোদাবক্স লাইব্রেরী হইতে

দুশ্চর্য্য তপস্যা লাগি'
হোমানল জ্বালাইয়া আমরণ কে রহিবে জাগি ?

সর্ব্ব স্পৃহাহীন কর্ম্মশালা,
হেথায় রয়েছে জ্বালা
বুকের আড়ালে
যে কনক দীপখানি, অন্ধকার জাল
ঘেরা তার চারিধার ;
তাহারি আলোক লক্ষ্য করে' হ'তে হবে পার
অনন্ত দুর্য্যোগ রাত্রি ;
হে মোর পথের যাত্রী
কি পাথেয় করিয়া সম্বল
যাত্রা তব হবে সুরু—তাই ভেবে চক্ষে আসে জল !

চৈতন্যের সে চেতনা নাই
ছুঁৎমার্গ জাতের বালাই
ব্যাধি সম সারা অঙ্গ ছেয়ে ;
দরদর দু'নয়ন বেয়ে
যে পবিত্র অশ্রুধারা এই নদীয়ার মাটি
করেছিল খাঁটি',
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে দেবতার মুখে ;—
পাপী তাপী মানবের দুখে
যেই মহাপ্রাণ
আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়া, লভিলা নির্ব্বাণ
সে আজি কাব্যের কথা !
মানুষের ব্যথা
মানুষের যদি নাহি বাজে প্রাণে,
বেদনার গানে
যদি তার চিত্ততল
করুণায় না হয় বিহ্বল,
তবে এ সাধনা বৃথা, সব পণ্ডশ্রম
মানুষ গড়িতে যাওয়া মানুষের একান্ত যে ভ্রম !

প্রেমের যে আকুল বন্যায়
শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়
সে কি আজ মিথ্যা হ'বে ?
নিমাইয়ের দেশবাসী কলঙ্ক বহিয়া লবে
আপন মাথায় ?

বজ্রমুষ্ঠে আপনার,—উন্নত ললাটে জয়টিকা
নয়নের জ্যোতিলিখা
চিরোজ্জ্বল সদা সপ্রকাশ ;
বিচিত্র সে মুক্তি-ইতিহাস
তরুণ বুকের রক্তে রচিয়াছ অক্ষয় অমর !
ব্রহ্মচারী, তোমাদের তপস্যার ফল
আসমুদ্র হিমাচল
ভুঞ্জিয়াছে মহাসুখে যোগলব্ধ শান্তিবারি সম
মর্ত্তের কল্যাণে ভরা চিরস্নিগ্ধ নিত্য অনুপম !

এ'ত শুধু নহে বন্ধু আহ্বান আমার,
নিমন্ত্রণ এযে বিধাতার !
আমি তাঁরি গুরুভার লইয়া মাথায়
নিগ্রহের দারুণ ব্যথায়
দাঁড়াইয়া তোমাদের দ্বারে !
ফিরালে ত হ'বে না আমারে।

যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে বারংবার
বিধাতা পাঠায়ে দেছে আহ্বান তাঁহার
বিফল হয়নি তাহা ফিরে নাই অবহেলা পেয়ে—
পাখী যে উঠিছে গেয়ে
তাঁহারি সঙ্গীত,
বাতাস আকাশ ভরে দিয়ে যায় তাঁহারি ইঙ্গিত !
সমুদ্র রেখেছে বুকে তাঁহারি আহ্বান
মুক্তির আনন্দ গান
শোনা যায় জলদ গম্ভীর !
আবেগে অধীর
সহস্র ব্যাকুল বাহু শুধু ডাকে ক্ষুব্ধা ধরণীরে,
পাথারের বুক চিরে চিরে
মণি লাবণ্যের আলো রেখা
মাঝে মাঝে যায় দেখা,
ও তাঁহারি পথের নিশানা
সুখে দুঃখে একটানা
জীবনের জীর্ণ পাতা ভরে
সাজায়ে তুলিতে হ'বে ফল ফুল নব কিশলয়
জীবনের সেই অভ্যুদয় !
জীবনের স্বার্থকতা ভুলে,

সন্দেহ দোলায় দুলে দুলে
দিবারাত্র ফেলি দীর্ঘশ্বাস
কে করিবে আত্মনাশ ?
শুধু যুক্তি তর্কযুদ্ধ বাক্যজালে বেড়িলে সংসার;
দুর্দ্দিনের অন্ধকার
শত গুণে ঘনাইয়া উঠি'
তোমার পথের আলো অজানিতে নেবে সব লুটি'।
পাঁজি পুঁথি দিনক্ষণ দেখা
ভৎ'সিয়া ভাগ্যের লেখা
যদি কর কপালে আঘাত,
বিধাতা বিমুখ হ'বে পোহাবে না দুর্যোগের রাত !

প্রলয়ের ঝড় ব'য় মাথার উপর দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু বহ্নিমুখ উল্কাপাত,
ঘন ঘন অশনি-সম্পাত
অবিশ্রাম করকা বর্ষণ
প্রমাথিনী ধ্বংসলীলা, চারিদিকে মৃত্যুর গর্জ্জন—
তবুও দাঁড়ায়ে যারা স্থির
তেজোদীপ্ত সমুন্নত শির,
হাসিমুখে বিপর্য্যয়ে করে পরিহাস
নাহি লজ্জা নাহি ত্রাস ;
ঝঞ্ঝার শকতি বুকে, বেগে ধায় বিদ্যুতের মত
লক্ষ শত
মৃত্যুবাণ বক্ষে আঁকে জয়চিহ্ন রেখা,
এমনি ভাগ্যের লেখা
তাহাদের নাহি বহুজন,
প্রকৃতি অধম
পশ্চাতে পড়িয়া শুধু জয়ধ্বনি করে'
নিরর্থক গ্লানি ভরে
আপনারে করে অপমান
তাহাদের পেতে হ'বে ত্রাণ !

মোহমুগ্ধ দুর্গ হ'তে
যদি তারা কোনও মতে
একবারে মুক্তি পায় উদ্ভাসিত আকাশের তলে,
সুপ্ত শক্তি আবার উঠিবে জ্বলে

নির্ব্বাপিত হোমানল সম
সাগ্নিকের তেজোদীপ্ত আত্মসাধনার অনুপম!

*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*

ধ্যান নেত্রে চেয়ে দেখ একবার
মূর্ত্তি ওই দেশদেবতার
ব্যথাতুর কি করুণ ও নয়ন দু'টি
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে নীলোৎপল উঠিয়াছে ফুটি'।
হৃদয় শোণিতে রাঙা বেদনার রক্ত শতদলে
গাঁথি মালা পরিয়াছে গলে,
ভগ্নসৌধ জনশূন্য, দেবতাবিহীন দেবালয়
তাই তাঁর শ্মশানে আশ্রয়!
মাতা মোর লম্বোদরী
দেশের বুভুক্ষা হরি'
রেখেছেন আপন উদরে—
বাঙলার ঘরে ঘরে
অহর্নিশি উঠিতেছে যে আর্ত্তরোদন
সেই বুঝি মায়ের বোধন।
তাথিয়া তাথিয়া নৃত্য ডমরুর ডিমি ডিমি ধ্বনি
ওই শোন অস্ত্রের ঝনঝনি
কবন্ধের উষ্ণরক্তে আজি মা'র চাই যে তর্পণ
খর্পরে যে করিবে অর্পণ
আপনার সদ্যছিন্ন হৃদিপিণ্ড খানি,—
ভাল জানি
মৃত্যুঞ্জয়ী সেই হ'য়ে শিব সাধনার সিদ্ধি তা'র
নবসৃষ্টি মহাকল্পে একমাত্র তারি অধিকার! *

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার ৩০শে অক্টোবর তারিখের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শিল্প ও দেহতত্ত্ব

কিছুর নোটিস যে দিচ্ছে ঘটনা যেমন ঘটেছে তার সঠিক রূপটির প্রতিচ্ছায়া দেওয়া ছাড়া সে বেচারা অনন্যগতি, সে যদি ভাবে সে একটা কিছু রচনা করছে তো সেটা তার মস্ত ভ্রম। ডুবুরি সমুদ্রের তলা ঘেঁটে মুক্তার শুক্তি তুলে আনে, খুবই সুচতুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার কিন্তু সে কি বলাতে পারে আপনাকে মুক্তাহারের রচয়িতা, না যে পাহাড় পর্ব্বত দেশে বিদেশে ঘুরে ফটোগ্রাফ তুলে আনছে সে নিজেকে চিত্রকর বলে চালিয়ে দিতে পারে আর্টিষ্ট মহলে? একটুখানি বুদ্ধি থাকলেই আর্টের ইতিহাস লেখা চলে, কিন্তু যে জিনিষগুলো নিয়ে আর্টের ইতিহাস, তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয় রসবেত্তা—নেপোলিয়ান বীর-রসের আর্টিষ্ট তার হাতে ইউরোপের ইতিহাস সৃষ্টি হল, সীজার আর্টিষ্ট গ'ড়লে রোমের ইতিহাস। যে ডুবে তোলে সে তোলে মাত্র বুদ্ধিবলে, আর যে গড়ে তোলে সে ভাঙ্গাকে জোড়া লাগায় না শুধু, সে বেজোড় সামিগ্রীও রচনা করে চলে মন থেকে! ইতিহাসের ঘটনাগুলো পাথরের মতো সুনির্দ্দিষ্ট শক্ত জিনিষ, একচুল তার চেহারার অদল বদল করার স্বাধীনতা নাই ঐতিহাসিকের, আর ঔপন্যাসিক কবি শিল্পী এদের হাতে পাষাণও রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে কাদার মতো নরম হয়ে যায়, রচয়িতা তাকে যথাইচ্ছা রূপ দিয়ে ছেড়ে দেন। ঘটনার অপলাপ ঐতিহাসিকের কাছে দুর্ঘটনা, কিন্তু আর্টিষ্টের কাছে সেটা বড়ই সুঘঠন বা সুগঠনের পক্ষে মস্ত সুযোগ উপস্থিত করে দেয়। ঠিকে যদি ভুল হয়ে যায় তবে সব অঙ্কটাই ভুল হয়—অঙ্কনের বেলাতেও ঠিক ওই কথা; কিন্তু পাটিগণিতের ঠিক আর খাঁটি গুণীদের ঠিকের প্রথা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; নামতা ঠিক রইলো তো অঙ্ককর্ত্তা বল্লে ঠিক হয়েছে, কিন্তু নামেই ছবিটা ঠিক মানুষ হলো কি গরু গাধা বা আর কিছু হলো রসের ঠিকানা হলো না ছবির মধ্যে, অঙ্কনকর্ত্তা বলে বসলেন ভুল! ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়মাসের anatomy নিয়ে, আর আর্টিষ্টদের কারবার অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। আর্টিষ্টের কাছে ঘটনার ছাঁচ পায়না রস, রসের ছাঁদ পেয়ে বদলে যায় ঘটনা, হাড় মাসের ছাঁচ পায়না শিল্পীর মানস কিন্তু মানসের ছাঁদ অনুসারে গড়ে ওঠে.সমস্ত ছবিটার হাড় হদ্দ, ভিতর বাহির। একটা গাছের বীজ, সে তার নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি যেমনটি পেয়েছে সেই ভাবেই যখন হাতে পড়লো, তখন সে গোলাকার কি চেপ্টা ইত্যাদি কিন্তু সে থলি থেকে মাটিতে পড়েই রসের সঞ্চার নিজের মধ্যে যেমনি অনুভব করলে অমনি বদলে চল্লো সে নিজেই নিজের আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই; যার বাহু ছিলনা চোখ ছিল না, যে লুকিয়ে ছিল মাটির তলায় নীরস কঠিন বীজকোষে বদ্ধ, সে উঠলো মাটী ঠেলে মেলিয়ে দিলে হাজার হাজার চোখ আর হাত আলোর দিকে আকাশের দিকে বাতাসের উপরে, নতুন শরীর নতুন ভঙ্গী লাভ করলে সে, রসের প্রেরণায়, গোলাকার বীজ ছত্রাকার গাছ হয়ে শোভা পেলে

বীজের anatomy লুকিয়ে পড়লো ফুলের রেণুতে পাকা ফলের শোভার আড়ালে। বীজের হাড় হদ্দ ভেঙ্গে তার anatomy চুরমার করে বেরিয়ে এল গাছের ছবি, বীজকে ছাড়িয়ে। গাছ যে রচলে তার রচনায় ছাঁদ ও anatomyর দোষ দেবার সাহস কারু হলনা, উল্টে বরং কোন কোন মানুষ তারই রচনা চুরি করে গাছপালা আঁকতে বসে গেল—বীজ তত্ত্বের বইখানার মধ্যে ফেলে রেখে দিলে যে অস্থি পঞ্জরের মতো শক্ত পিঞ্জরে বদ্ধ ছিল বীজের প্রাণ তার প্রকৃত anatomyর হিসেব। বীজের anatomy দিয়ে গাছের anatomyর বিচার করতে যাওয়া, আর মানুষী মূর্ত্তির anatomy দিয়ে মানস মূর্ত্তির anatomyর দোষ ধরতে যাওয়া সমান মূর্খতা। Anatomyর একটা অচল দিক আছে, যেটা নিয়ে এক রূপের সঙ্গে আর রূপের সুনির্দ্দিষ্ট ভেদ, কিন্তু anatomyর একটা সচল দিকও আছে সেটা নিয়ে মানুষে মানুষে বা একই জাতের গাছে গাছে ও জীবে জীবে বাঁধা পার্থক্য একটুখানি ভাঙ্গে—কোন মানুষ হয় তাল গাছের মতো, কেউ হয় ভাঁটার মতো, কোন গাছ ছড়ায় ময়ূরের মতো পাতা, কেউ বাড়ায় ভূতের মতো হাত! প্রকৃতিবিজ্ঞানের বইখানাতে দেখবে মেঘের সুনির্দ্দিষ্ট গোটাকতক গড়নের ছবি দেওয়া আছে—বৃষ্টির মেঘ, ঝড়ের মেঘ, সবার বাঁধা গঠন কিন্তু মেঘে যখন বাতাস লাগলো রস ভরলো তখন শাস্ত্র ছাড়া সৃষ্টি ছাড়া মূর্ত্তি সব ফুটতে থাকলো, মেঘে মেঘে রং লাগলো অদ্ভুত অদ্ভুত, সাদা ধূমা ধুমধাম করে সেজে এল, লাল নীল হলদে সবুজ বিচিত্র সাজে, দশ অবতারের রং ও মূর্ত্তিকে ছাড়িয়ে দশ সহস্র অবতার! সচিত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুঁথি খুলে সে সময় কোন্ রসিক চেয়ে দেখে মেঘের রূপগুলোর দিকে? এই যে মেঘের গতিবিধির মতো সচল সজল anatomy, একেই বলা হয় artistic anatomy, যার দ্বারায় রচয়িতা রসের আধারকে রসের উপযুক্ত মান পরিমাণ দিয়ে থাকেন। মানুষের তৃষ্ণা ভাঙ্গতে যতটুকু জল দরকার তার পরিমাণ বুঝে জলের ঘটি একরকম হল, মানুষের স্নান করে শীতল হতে যতটা জল দরকার তার হিসেবে প্রস্তুত হল ঘড়া জালা ইত্যাদি; সুতরাং রসের বশে হল আধারের মান পরিমাণ আকৃতি পর্য্যন্ত। যার কোন রসজ্ঞান নেই সেই শুধু দেখে পানীয় জলের ঠিক আধারটি হচ্ছে চৌকোনা পুকুর, ফটিকের গেলাস নয়, সোণার ঘটীও নয়! গোয়ালের গরু হয়তো দেখে পুকুরকে তার পানীয় জলের ঠিক আধার, কিন্তু সে যদি মানুষকে এসে বলে তোমার গঠন সম্বন্ধে মোটেই জ্ঞান নেই কেননা জলাধার তুমি এমন ভুল রকমে গড়েছ যে পুকুরের সঙ্গে মিলছেই না, তবে মানুষ কি জবাব দেয়?

ঐতিহাসিকের মাপকাটি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাটি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাটি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ামূলক। ঐতিহাসিককে রচনা করতে হয় না, তাই তার মাপকাটি ঘটনাকে চুল চিরে ভাগ করে দেখিয়া দেয়, ডাক্তারকেও জীবন্ত মানুষ রচনা করতে হয় না কাযেই জীবন্মৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ করার কাযের জন্য চলে তার মাপকাটি, আর রচয়িতাকে অনেক সময় অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে হয়, রূপকে রসে, রসকে

রূপে পরিণত করতে হয়, কাযেই তার হাতের মাপকাটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের, রূপকথার সোণার রূপোর কাটির মতো অদ্ভুত শক্তিমান। ঘটনা যাকে কুড়িয়ে ও খুঁড়ে তুলতে হয় ঠিক ঠিক খোন্তা হল তার পক্ষে মহাস্ত্র, মানুষের ভৌতিক শরীরটার কারখানা নিয়ে যখন কারবার ঠিক ঠিক মাংসপেশী অস্থিপঞ্জর ইত্যাদির ব্যবচ্ছেদ করার শূল ও শলাকা ইত্যাদি হল তখন মৃত্যুবাণ, কিন্তু রচনা প্রকাশ হবার আগেই এমন একটি জায়গার সৃষ্টি হয়ে বসে যে সেখানে কোদাল কুড়ুল শূল শাল কিছু চলে না, রচয়িতার নিজের অস্থিপঞ্জর এবং ঘটাকাশের ঘটনা সমস্ত থেকে অনেক দূরে রচয়িতার সেই মনোজগৎ বা পটাকাশ, যেখানে ছবি ঘনিয়ে আসে মেঘের মতো রস ফেনিয়ে ওঠে, রং ছাপিয়ে পড়ে আপনা আপনি, সেই সমস্ত রসের ও রূপের ছিটে ফোঁটা যথোপযুক্ত পাত্র বানিয়ে ধরে দেয় রচয়িতা আমাদের জন্যে। এখন রচয়িতা রস বুঝে রসের পাত্র নির্ব্বাচন করে যখন দিচ্ছে তখন রসের সঙ্গে রসের পাত্রটাও স্বীকার না করে যদি নিজের মনোমত পাত্রে রসটা ঢেলে ঢেলে নিতে যাই তবে কি ফল হবে? ধর রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্ত্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা, পাত্র ও তার অন্তর্নিহিত রসের চমৎকার সামঞ্জস্য দিয়ে, এখন সেই রচয়িতার আধারকে ভেঙ্গে রৌদ্ররস যদি মুঠোম হাত পরিমিত anatomy দোরস্ত আমার একটা ফটোগ্রাফের মধ্যে ধরবার ইচ্ছে করি তো রৌদ্র হয় করুণ, নয় হাস্য রসে পরিণত না হয়ে যাবে না কিম্বা ছোটমাপের পাত্রে না ঢুকে রসটা মাটি হবে মাটিতে পড়ে।

হারমোনিয়ামের anatomy ; বীণার anatomy, বাঁশীর anatomy, রকম রকম বলেই সুরও ধরে রকম রকম ; তেমনি আকারের বিচিত্রতা দিয়েই রসের বিচিত্রতা বাহিত হয় আর্টের জগতে, আকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্টতা সেখানে কিছুই নেই। হাড়ের পঞ্জরের মধ্যে মাংসপেশী দিয়ে বাঁধা আমাদের এতটুকু বুক প্রকাণ্ড সুখ প্রকাণ্ড দুঃখ প্রকাণ্ড ভয় এতটুকু পাত্রে ধরা মুস্কিল, হটাৎ এক এক সময়ে বুকটা অতিরিক্ত রসের ধাক্কায় ফেটে যায়, রসটা চাইলে বুককে অপরিমিত রকমে বাড়িয়ে দিতে কিম্বা দমিয়ে দিতে, আমাদের ছোট পিঞ্জ্‌রে হাড়ে আর তাঁতে নিরেট করে বাঁধা স্থিতি স্থাপকতা কিম্বা সচলতা তার নেই, অতিরিক্ত ষ্টিম্ পেয়ে বয়লারের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রস বুকের মধ্যে এসে পাত্রটায় যে প্রসারণ বা আকুঞ্চন চাইলে, প্রকৃত মানুষের anatomy সেটা দিতে পারলে না কাজেই আর্টিষ্ট যে সে রসের ছাঁদে কমে বাড়ে ছন্দিত হয়, এমন একটা সচল তরল anatomy সৃষ্টি করে নিলে, অন্তর এবং বাহিরে সুসঙ্গত সুসংহত anatomy। রসকে ধরবার উপযুক্ত জিনিষ বিচিত্র রং ও রেখা সমস্ত—গাছের ডালের মতো তারা, ফুলের বোটার মতো তারা, পাতার ঝিলিমিলির মতো তারা, জীবনরসে প্রাণবন্ত ও গতিশীল। ফটোগ্রাফারের ওখানে ছবি ওঠে—সীসের টাইপ থেকে যেমন ছাপ ওঠে—ছবি ফোটেনা ! পারিজাতের মতো বাতাসে দাঁড়িয়ে আকাশে ফুল ফোটানো আর্টিষ্টের কায, সুতরাং তার মন্ত্র মানুষের শরীর যন্ত্রের হিসেবের খাতার লেখার সঙ্গে এমন কি বাস্তব জগতের হাড়হদ্দের খবরের সঙ্গে মেলানো মুস্কিল। অভ্রবিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত

ইত্যাদি নাম রূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে—কিন্তু কবিতা কি গান রচনার বেলা ঐসব পেঁচালো নাম গুলো কি বেশী কাযে আসে ? মেঘের ছবি আঁকার বেলাতেও ঠিক পুঁথিগত ঘোরপেঁচ এমন কি মেঘের নিজমূর্ত্তিগুলোর হুবহু ফটোগ্রাফও কাযে আসে না ! রচিত যা তার মধ্যে বসবাস করলেও রচয়িতা চায় নিজের রচনাকে। সোণার খাঁচার মধ্যে থাকলেও বনের পাখী সে যেমন চায় নিজের রচিত বাসাটি দেখতে, রচয়িতাও ঠিক তেম্‌নি দেখতে চায় নিজের মনোগতটি গিয়ে বসলো নিজের মনোমত করে রচা রং রেখা ছন্দোবন্ধ ঘেরা সুন্দর বাসায়। কোকিল সে পরের বাসায় ডিম পাড়ে—নামজাদা মস্ত পাখী ! কিন্তু বাবুই সে যে রচয়িতা, দেখতে এতটুকু কিন্তু বাসা বাঁধে বাতাসের কোলে—মস্ত বাসা ! আমাদের সঙ্গীতে বাঁধা অনেকগুলো ঠাট আছে, যে লোকটা সেই ঠাটের মধ্যেই সুরকে বেঁধে রাখলে সে গানের রচয়িতা হল না, সে নামে রাজার মতো পূর্ব্বপুরুষের রচিত রাজগীর ঠাটটা মাত্র বজায় রেখে চল্লো ভীরু, কিন্তু যে রাজত্ব পেয়েও রাজত্ব হারাবার ভয় রাখলে না, নতুন রাজত্ব জিতে নিতে চল্লো সেই সাহসীই হল রাজ্যের রচয়িতা বা রাজা এবং এই স্বাধীনচেতারাই হয় সুরের ওস্তাদ। সুর লাগাতে পারে তারাই যারা সুরের ঠাটমাত্র ধরে থাকে না, বেসুরকেও সুরে ফেলে।

মানুষের anatomyতেই যদি মানুষ বদ্ধ থাক্‌তো, দেবতাগুলোকে ডাক্‌তে যেতে পারতো কে ? কার জন্যে আসতো নেমে স্বর্গ থেকে ইন্দ্ররথ, পুষ্পক রথে চড়িয়ে লঙ্কা থেকে কে আনতো সীতাকে অযোধ্যায় ? ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু আপনার anatomy ভাঙ্গতে সুরু করলে বানরের মতো পিঠের সোজা শিরদাঁড়াকে বাঁকিয়ে সে উঠে দাঁড়লো দুই পায়ে ভর দিয়ে, গাছে গাছে ঝুল্‌তে থাক্‌লো না ! প্রথমেই যুদ্ধ হল মানুষের নিজের anatomyর সঙ্গে, সে তাকে আস্তে আস্তে বদলে নিলে আপনার চলন-বলনের উপযুক্ত করে। বীজের anatomy নাশ করে যেমন বার হল গাছ, তেমনি বানরের anatomy পরিত্যাগ করে মানুষের anatomy নিয়ে এল মানুষ ; ঠিক এই ভাবেই medical anatomy নাশ করে আর্টিষ্ট আবিষ্কার করলে artistic anatomy, যা রসের বসে কমে বাড়ে আঁকে বাঁকে, প্রকৃতির সব জিনিষের মতো—গাছের ডালের মতো, বৃন্তের মতো, পাপড়ির মতো, মেঘের ঘটার মতো, জলের ধারার মতো। রসের বাধা জন্মায় যাতেএমন সব বস্তু কবিরা টেনে ফেলে দেন—নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ। ল’য়ে ল’য়ে না মিল্লে কবিতা হল না, একথা যার একটু কবিত্ব আছে সে বলবে না, তেমনি আকারে আকারে না মিল্লে ফটোগ্রাফ হল না বলতে পারি কিন্তু ছবি হল না একথা বলা চলে না। ‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান’ শুনতে বেশ লাগলো,—‘ছেলেটি কার্ত্তিকের মতো’ দেখতে বেশ লাগলো, কিন্তু কবিতা লিখলেই কি কাশীদাসী সুর ধরতে হবে, না ছেলে আঁকতে হলেই পাড়ার আদুরে ছেলের anatomy কাপি করলেই হবে ? গণেশের মূর্ত্তিটিতে আমাদের ঘরের ও পরের ছেলের auatomy যেমন করে ভাঙ্গা হয়েছে তেমন আর কিছুতে নয় ! হাতীও

মানুষের সমস্তখানি—রূপ ও রেখার সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন anatomy পেয়ে এল—কাযেই সেটা আমাদের চক্ষে পীড়া দিচ্ছে না, কেন না সেটা ঘটনা নয় রচনা। আরব্য উপন্যাসের উড়ন্ত সতরঞ্চির কল্পনা বাস্তবজগতে উড়োজাহাজ দিয়ে সপ্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত কি আমাদের কাছে নগণ্য হয়েছিল, না অবাধ কল্পনার সঙ্গে গল্পের ঠাট মিলছে কিন্তু বিশ্বরচনার সঙ্গে মিলছেনা দেখে গালগল্প রচনার বাদশাকে কেউ আমরা দুষেছি? প্রত্যেক রচনা তার নিজের anatomy নিয়ে প্রকাশ হয়, ঠাট বদলায় যেমন প্রত্যেক রাগরাগিণীর, তেমনি ছাঁদ বদলায় প্রত্যেক ছবির কবিতার রচনার বেলায়। ধর যদি এমন নিয়ম করা যায় যে কাশীদাসী ছন্দ ছাড়া কবিরা কোনো ছন্দে লিখতে পারবে না—যেমন আমরা চাচ্ছি ডাক্তারি anatomy ছাড়া ছবিতে আর কিছু চলবে না—তবে কাব্যজগতে ভাবের ও ছন্দের কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সুরের বদলে থাকে শুধু দেশ জোড়া কাশী আর রচয়িতার বদলে থাকে কতকগুলি দাস! কাযেই কবিদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে 'কবয়ঃ নিরঙ্কুশাঃ' বলে কিন্তু বাস্তবজগতের থেকে ছাড়া পেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা, আর ছবি আট্‌কে থাকবে ফটোগ্রাফের বাক্সর মধ্যে—জালার মধ্যে বাঁধা আরব্য-উপন্যাসের জিন্‌-পরীর মতো সুলেমানের সিলমোহর আঁটা চিরকালই, এ কোনদেশী কথা? ইউরোপ যে চিরকাল বাস্তবের মধ্যে আর্টকে বাঁধতে চেয়েছে সে এখন সিলমোহর মায় জালা পর্য্যন্ত ভেঙ্গে কি সঙ্গীতে, কি চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, কবিতায়, সাহিত্যে, বাঁধনের মুক্তি কামনা করছে, আর আমাদের আর্ট যেটা চিরকাল মুক্ত ছিল তাকে ধরে ডানাকেটে পিঞ্জরের মধ্যে ঠেসে পুরতে চাচ্ছি আমরা! বড় পা'কে ছোট জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে চীনের রাজকন্যার যা ভোগ ভুগতে হয়েছে সেটা কসা জুতোর একটু চাপ পেলেই আমরা অনুভব করি—পা বেরিয়ে পড়তে চায় চট্‌করে জুতো ছেড়ে, কিন্তু হায়! ছবি সে কিনা আমাদের কাছে শুধু কাগজ, সুর সে কিনা শুধু খানিক গলার শব্দ, কবিতা সে শুধু কিনা ফর্ম্মা বাঁধা বই, তাই তাদের মুচড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে চুরে চামড়ার থলিতে ভরে দিতে কষ্টও পাইনে ভয়ও পাইনে।

অন্যথা-বৃত্তি হল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিষ, এই অন্যথা বৃত্তি দিয়েই কালিদাসের মেঘদূতের গোড়া পত্তন হল, অন্যথা-বৃত্তি কবির চিত্ত মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন যথা—"ধূমজ্যোতিসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ, সন্দেশার্থাঃ ক্ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃপ্রাপণীয়াঃ"! ধূমা আলো আর জল বাতাস যার শরীর তাকে শরীর দাও মানুষের তবেতো সে প্রিয়ার কাণে প্রাণের কথা পৌঁছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধি মাফিক মেঘকে মেঘ রেখে কিছু রচনা করা কালিদাসও করেননি কোন কবিই করেন না যখন রচনার অনুকূল মেঘের ঠাট কবি তখন মেঘকে হয়তো মেঘই রাখলেন কিন্তু যখন রচনার প্রতিকূল ধূম জ্যোতি জল বাতাস তখন নানা বস্তুতে শক্ত

করে বেঁধে নিলেন কবি। এই অন্যথাবৃত্তি কবিতার সর্ব্বস্ব, তখনও যেমন এখনো তেমন, রসের বশে ভাবের খাতিরে রূপের অন্যথা হচ্ছে—

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথভোলা
ঐ যে পূরব গগণ জুড়ে, উত্তরী তার যায় রে উড়ে
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা!
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্ খানে
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে, ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা।

ভাব ও রসের অন্যান্য বৃত্তি পেয়ে মেঘ এখানে নতুন সচল anatomyতে রূপান্তরিত হল! এখন বলতে পারো মেঘকে তার স্বরূপে রেখে কবিতা লেখা যায় কিনা? আমি বলি যায়, কিন্তু অভ্রবিজ্ঞানের হিসেব মেঘের রূপকে যেমন ছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায়, সে ভাবে লিখলে কবিতা হয় না, রংএর ছন্দ বা ছাঁদ, সুরের ছাঁদ, কথার ছাঁদ দিয়ে মেঘের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ ছাঁদ না বদলালে কবিতা হতে পারে না, যেমন—

আজি বর্ষা রাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে
বেণু বনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়
রঙের ধরায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে।

মনে হবে অপ্রাকৃত কিছু নেই এখানে, কিন্তু কালো শুধু বলা চল্লো না, কোমল কালো না হলে ভেসে চলতে পারলো না আকাশে বাতাসে রংএর স্রোত বেয়ে কবির মানস-কমলের থেকে খসে পড়া সুর বোঝাই পাপড়িগুলি—সেই দেশের খবর আনতে যে দেশে বাদল বাউল একতারা বাজাচ্ছে সারা বেলা! সকালের প্রকৃত মূর্ত্তিটা হল মেঘের কালোয় একটু আলো কিন্তু টান টোনের কোমলতা পাতার হিলিমিলি নানা রংএর ঝিলিমিলির মধ্যে তাকে কবি হারিয়ে দিলেন; মেঘের শরীর আলোর কম্পন পেলে ফটোগ্রাফের মেঘের মতো চোখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো না। বর্ষার শেষ রাত্রে সত্যিকার মেঘ যে ভাবে দেখতে দেখতে হারিয়ে যায়, সকালের মধ্যে মিলিয়ে দেয় তার বাঁধারূপ, ঠিক সেই ভাবের একটি গতি পেলে কবির রচনা। সকালে মেঘে একটু আলো পড়েছে এই ফটোগ্রাফটি দিলে না কবিতা; আলো মেঘ লতা পাতার গতিমান ছন্দে ধরা পড়লো শেষ বর্ষার চিরন্তন রস এবং মেঘালোকের লীলা হিল্লোল! রচনার মধ্যে এই যে রূপের রসের চলাচল গতাগতি এই নিয়ে হল তফাৎ, ঘটনার নোটিসের সঙ্গে রচনার প্রকৃতির। নোটিস সে নির্দ্দেশ করেই থামলো, রচনা চলে গেল গাইতে গাইতে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে

মনের থেকে মনের দিকে এক কাল থেকে আর এক কালে বিচিত্র ভাবে। কবিতায় বা ছবিতে এই ভাবে চলায়মান রং রেখা রূপ ও ভাব দিয়ে যে রচনা তাকে আলঙ্কারিকেরা গতিচিত্র বলেন—অর্থাৎ গতিচিত্রে রূপ বা ভাব কোন বস্তুবিশেষের অঙ্গবিন্যাস বা রূপ সংস্থানকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকে না কিন্তু রেখার রংএর ও ভাবের গতাগতি দিয়ে রসের সজীবতা প্রাপ্ত হয়ে আসা যাওয়া করে। বীণার দুই দিকে বাঁধা টানা তার গুলি সোজা লাইনের মতো অবিচিত্র নির্জীব আছে—বলছেও না চলছেও না! সুর এই টানা তারের মধ্যে গতাগতি আরম্ভ করলে অমনি নিশ্চল তার চঞ্চল হল গীতের ছন্দে, ভাবের দ্বারা সজীব হল—গান গাইতে লাগলো, নাচতে থাকলো তালে তালে। পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলে গেল সুরের অসংখ্য পাপড়ি, সোজা anatomyর টানা পাঁচিল ভেঙ্গে বার হল সুরের সুরধুনীধারা, নানা ভঙ্গিতে গতিমান! আকাশ এবং মাটি এরি দুই টানের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের anatomy দোরস্ত শরীর, দুই খোঁটায় বাঁধা তারের মতো এই হল ডাক্তারি anatomyর সঠিক রূপ, আর বাতাসের স্পর্শে আলোর আঘাতে গাছ ফুল পাতা লতা এরা লতিয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে শাখা প্রশাখার আঁকা বাঁকা নানা ছন্দের ধারায়, এই হচ্ছে artistic anatomyর সঠিক চেহারা! আর্টিষ্ট রসের সম্পদ নিয়ে ঐশ্বর্য্যবান, কাযেই রস বণ্টনের বেলায় রসপাত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি, সে রসের সঙ্গে রসপাত্রটাও সৃষ্টি করে ধরে দেয় ছোট বড় নানা আকারে ইচ্ছা-মতো। এই পাত্রসমস্যা শুধু যে ছবি লিখছে তাকেই যে পূরণ করতে হয় তা নয়, রসের পাত্রপাত্রীর anatomy নিয়ে গণ্ডগোল রঙ্গমঞ্চে খুব বেশী রকম উপস্থিত হয়। নানা পৌরাণিক ও কাল্পনিক সমস্ত দেবতা উপদেবতা পশুপক্ষী যা রয়েছে তার anatomy ও model বাস্তব জগৎ থেকে নিলে তো চলে না। হরেরামপুরের সত্যি রাজার anatomy রাজশরীর হলেও রঙ্গমঞ্চের রাজা হবার কাযে যে লাগে তা নয়, একটা মুটের মধ্যে হয়তো রাম রাজার রসটি ফোটাবার উপযুক্ত anatomy খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর anatomy হয়তো সীতা সাজবার কালে লাগলো না, একজন ছেলের anatomy দিয়ে দৃশ্যটার মধ্যে উপযুক্ত রসের উপযুক্ত পাত্রটি ধরে দেওয়া গেল। পাখীর কি বানরের কি নরদেব ও দেবদেবীর ভাব ভঙ্গী চলন বলন প্রভৃতির পক্ষে যেরকম শরীর গঠন উপযুক্ত বোধ হল অধিকারী সেই হিসেবে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন বা সজ্জিত করে নিলে, যেখানে আসল মানুষের উচ্চতা রচয়িতার ভাবনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না সেখানে রণ্‌পা দিয়ে anatomical মাপ বাড়িয়ে নিতে হলো, যেখানে আসল দুহাতের মানুষ কাজে এল না সেখানে গড়া হাত, গড়া ডানা ইত্যাদি নানা খুটিনাটি ভাঙ্গাচোরা দিয়ে নানা রসের পাত্র পাত্রী সৃষ্টি করতে হল বেশকারকে, রচয়িতার কল্পনার সঙ্গে অভিনেতার রূপের সামঞ্জস্য এইভাবে লাভ করতে হল নাটকে! কল্পনামূলক যা তাকে প্রকৃত ঘটনার নিয়মে গাঁথা চলে না, আর ঘটনামূলক নাটক সেখানেও একেবারে পাত্র পাত্রীর সঠিক চেহারাটি নিয়ে কায চলে না, কেন না যে ভাব যে রস

ধর্ত্তে চেয়েছেন রচয়িতা তা রচয়িতার কল্পিত পাত্রপাত্রীর চেহারার সঙ্গে যতটা পারা যায় মেলাতে হয় বেশকারকে। এক একজন বেশ সুঠাম সুশ্রী, পাঠও করতে পারলে বেশ, কিন্তু তবু নাটকের নায়ক বিশেষের পার্ট তাকে দেওয়া গেল না, কেননা সেখানে নাটক রচয়িতার কল্পিতের সঙ্গে বিশ্ব-রচয়িতার কল্পিত মানুষটির anatomy গঠন ইত্যাদি মিল্লো না। ছবিতেও তেমনি কবিতাতেও তেমনি, ভাবের ছাঁদ অনেক সময়ে মানুষের কি আর কিছুর বাস্তব ও বাঁধা ছাঁদ দিয়ে পুরোপুরি ভাবে প্রকাশ করা যায় না, অদল বদল ঘটাতেই হয়, কতখানি অদল বদল সয় তা আর্টিষ্ট যে রসমূর্ত্তি রচনা করছে সেই ভাল বুঝবে আর কেউ তো নয়। চোখে দেখছি যে মানুষ, যে সব গাছপালা নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত আকাশ এরি উপরে আলো আঁধার ভাব ভঙ্গী দিয়ে বিচিত্র রস স্বজন করে চল্লেন যার আমরা রচনা তিনি, আর এই যে নানা রেখা নানা রং নানা ছন্দ নানা সুর এদেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষ নিজের কল্পিতটি, মানুষ বিশ্বের আকৃতির প্রতিকৃতি নিজের রচনার বর্জ্জন করলে বটে, কিন্তু প্রকৃতিটী ধরলে অপূর্ব্ব কৌশলে যার দ্বারা রচনা দ্বিতীয় একটা সৃষ্টির সমান হয়ে উঠলো। এই যে অপূর্ব্ব কৌশল যার দ্বারা মানুষের রচনা মুক্তিলাভ করে ঘটিত জগতের ঘটনা সমস্ত থেকে এটা কিছুতে লাভ করতে পারে না, সেই মানুষ যে এই বিশ্বজোড়া রূপের মূর্ত্ত দিকটার খবরই নিয়ে চলেছে, রসের অমূর্ত্ততা মূর্ত্তকে যেখানে মুক্ত করছে সেখানের কোন সন্ধান নিচ্ছে না, শুধু ফটো-যন্ত্রের মতো আকার ধরেই রয়েছে, ছবি ওঠাচ্ছে মাত্র, ছবি ফোটাচ্ছে না! মানুষের মধ্যে কতক আছে মায়াবাদী কতক কায়াবাদী, এদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ লেগেই আছে, একজন বলছে কায়ার উপযুক্ত পরিমাণ হোক ছায়া মায়া সমস্তই, আর একজন বলছে তা কেন, কায়া যখন ছায়া ফেলে সেটা কি খাপে খাপে মেলে শরীরটার সঙ্গে, না নীল আকাশ রংএর মায়ায় যখন ভরপূর হয় তখন সে থাকে নীল, বনের শিয়রে যখন চাঁদনী মায়াজাল বিস্তার করলে তখন বনের হাড়হদ্দ সব উড়ে গিয়ে শুধু যে দেখ ছায়া তার কি জবাব দেবে? মায়াকে ধরে রয়েছে কায়া, কায়াকে ঘিরে রয়েছে মায়া, কায়া অতিক্রম করছে মায়া দিয়ে আপনার বাঁধা রূপ, মায়া সে নিরূপিত করছে উপযুক্ত কায়া দ্বারা নিজকে, জাগতিক ব্যাপারে এটা নিত্য ঘটছে প্রতি মুহূর্ত্তে, জগৎ শুধু মায়া কি শুধু কায়া নিয়ে চল্‌ছে না, এই দুয়ের সমন্বয় চলেছে, তাই বিশ্বের ছবি এমন চমৎকার ভাবে আর্টিস্টের মনটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে! এই যে সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথা কায়া মায়া ফুল আর তাদের রঙ্গের মতো শোভা পাচ্ছে—anatomyর artistic ও inartistic সব রহস্য এরি মধ্যে লুকোনো আছে। রূপ পাচ্ছে রসের দ্বারা অনির্ব্বচনীয়তা, রস হচ্ছে নির্ব্বচনীয় যথোপযুক্ত রূপ পেয়ে, রূপ পাচ্ছে প্রসার রসের, রস পাচ্ছে প্রসার রূপের, এই একে একে মিলনে হচ্ছে দ্বিতীয় স্বজন আর্ট, তারপর সুর ছন্দ বর্ণিকা ভঙ্গ ইত্যাদি তৃতীয় এসে তাকে করে তুলছে বিচিত্র ও গতিমান! ওদিকে এক রচয়িতা এদিকে এক রচয়িতা, মাঝে রয়েছে নানা রকমের বাঁধা রূপ সেগুলো দুদিকের রঙ্গ-রসের পাত্র পাত্রী হয়ে করে চলেছে—বেশ বদলে বদলে, ঠাট বদলে বদলে -অভিনয় করছে নাচছে গাইছে হাঁসছে

কাঁদছে চলাফেরা করছে ! রচকের অধিকার আছে রূপকে ভাঙ্গতে রসের ছাঁদে। কেননা রসের খাতিরে রূপের পরিবর্ত্তন প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম, দিন চলেছে, রাত চলেছে, জগৎ চলেছে রূপান্তরিত হতে হতে, ঋতুতে ঋতুতে রসের প্রেরণাটি চলেছে গাছের গোড়া থেকে আগা পর্য্যন্ত রূপের নিয়ম বদলাতে বদলাতে পাতায় পাতায় ফুলে ফলে ডালে ডালে ! শুধু এই নয়, যখন রস ভরে উঠলো তখন এতখানি বিস্তীর্ণ পাত্রেও রস ধরলো না—গন্ধ হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো রস, রংএ রংএ ভরে দিলে চোখ, উথলে পড়লো রস মধুকরের ভিক্ষাপাত্রে, এই যে রসজ্ঞানের দাবী এ সত্য দাবী, সৃষ্টি কর্ত্তার সঙ্গে স্পর্দ্ধার দাবী নয়, সত্যগ্রহীর দাবী ! ডাক্তারের দাবী ঐতিহাসিকের দাবী সাধারণ মানুষের দাবী নিয়ে একে তো অমান্য করা চলে না। আর্টিষ্ট যখন কিছুকে যা থেকে তা'তে রূপান্তরিত করলে তখন সে যা তা করলে তা নয়, সে প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করলে না উল্টে বরং বিশ্ব প্রকৃতিতে রূপমুক্তির নিয়মকে স্বীকার করলে প্রমাণ করে চল্লো হাতে কলমে, আর যে মাটিতেই হোক বা তেল রংএতেই হোক রূপের ঠিক ঠিক নকল করে চল্লো, সে আঙ্গুরই গড়ুক বা আমই গড়ুক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু সে দিয়ে যেতে পারলে না, সে অভিশপ্ত হল, কেননা সে বিশ্বের চলাচলের নিয়মকে স্বীকার করলে না প্রমাণও করলে না, কোন কিছু দিয়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রমতো তার কায পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রান্তিমৎ দোষে দুষ্ট হল। রক্ত চলাচলের খাদ্য চলাচলের পক্ষে যে ভৌতিক শরীর গঠন অস্থি সংস্থান তার মধ্যে রসাধার আর একটি জিনিস আছে যার anatomy ডাক্তার খুঁজে পায়নি এ পর্য্যন্ত। বাইরের শরীর আমাদের বাঁধা ছাঁচে ঢালা আর অন্তর্দেহটি ছাঁচে ঢালা একেবারেই নয় সুতরাং সে স্বাধীনভাবে রসের সম্পর্কে আসে, এ যেন এতটুকু খাঁচায় ধরা এমন একটি পাখী যার রসমূর্ত্তি বিরাটের সীমাকেও ছাড়িয়া গেছে, বচনাতীত সুর বর্ণনাতীত বর্ণ তার। এই পাখীর মালিক হয়ে এসেছে কেবল মানুষ আর কোন জীব নয়। বাস্তব জগৎ যেখানে সীমা টানলে রূপের লীলা শেষ করলে সুর থামালে আপনার সেইখানে মানুষের খাঁচায় ধরা এই মানস পাখী সুর ধরলে, নতুন রূপ ধরে আনলে অরূপের রূপ—জগৎ সংসার নতুন দিকে পা বাড়ালে তবেই মুক্তির আনন্দে। মানুষ তার স্বপ্ন দিয়ে নিজেকেই যে শুধু মুক্তি দিচ্ছে তা নয় যাকে দর্শন করছে যাকে বর্ণন করছে তার জন্যে মুক্তি আনছে। আটঘাট বাঁধা বীণা আপনাকে ছাড়িয়ে চলেছে এই স্বপ্নে, সুরের মধ্যে দিয়ে বাঁশী তার গাঁঠে গাঁঠে বাঁধা ঠাট ছাড়িয়ে বার হচ্ছে, এই স্বপ্নের দুয়ার দিয়ে ছবি অতিক্রম করেছে ছাপকে, এই পথে বিশ্বের হৃদয় গিয়ে মিলছে বিশ্বরূপের হৃদয়ে, এই স্বপ্নের পথ। বীণার সেই anatomyটাই বীণার সত্য anatomy, এ সত্য আর্টিষ্টমাত্রকেই গ্রহণ করতে হয় আর্টের জগতে ঢোকার আগেই, না হলে সচরাচরকে ছাড়িয়ে সে উঠতে ভয় পায় ! পড়া পাখী যা শুনলে তারই পুনরাবৃত্তি করতে করতে থাকলো রচয়িতার দাবী সে গ্রহণ করতে পারলে কি, মানুষ যা দেখলে তাই এঁকে চল্লো রচয়িতার দাবী নিতে পারলে কি সে ? নিয়তির নিয়মে যারা ফুল পাতার সাজে সেজে এল, রঙ্গীন ডানা

মেলিয়ে নেচে চল্লো গেয়ে চল্লো, তারা কেউ এই বিশ্বসংসারে রচয়িতার দাবী নিতে পারলে না, এক যারা স্বপন দেখলে স্বপন ধরলে সেই আর্টিষ্টরা ছাড়া! পাখী পারলে না রচয়িতার দাবী নিতে কিন্তু আকাশের পাখীকে ধরার ফাঁদ যে মানুষ রচনা করলে মাটীতে বসে সে এ দাবী গ্রহণ করলে, নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতের নিয়ম যারা পদে পদে প্রমাণ করে চল্লো নিজেদের সমস্ত রচনায়, তারাই দাবী দিতে পারলে রচয়িতার! কবীর তাই বল্লেন—"ভরম জঞ্জাল দুখ ছন্দ ভারি" ভ্রান্তির জঞ্জাল দূর কর—তা'তে দুঃখ ও দীনতা আর ঘোর সংশয়, "সত্ত দাবা গহো আপ নির্ভয় রহো" তোমার যে সত্য দাবী তাই গ্রহণ কর নির্ভয় হও। যে মানুষ রচয়িতার সত্য দাবী নেয়নি কিন্তু স্বপন দেখলে ওড়বার সে নিজের কাঁধে পাখীর ডানা লাগিয়ে উড়তে গেল, পরীর মতো দেখতে হল বটে সে, কিন্তু পরগুলো তার বাতাস কাটলে না, ঝুপ করে পড়ে মলো সে; কিন্তু যে রচয়িতার সত্য দাবী গ্রহণ করলে তার রচনা মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে উড়লো তাকে নিয়ে লোহার ডানা বিস্তার করে আকাশে। মানুষ জলে হাঁটবার স্বপন দেখলে রচয়িতার দাবী গ্রহণ করলে না ডুবে মলো ছপা না যেতে, রচয়িতার রচনা পায়ের মতো একেবারেই দেখতে হল না কিন্তু গুরুভাবের দ্বারা সে জলের লঘুতাকে জয় করে স্রোতের বাধাকে তুচ্ছ ক'রে চলে গেল সে সাত সমুদ্র পার! মানুষ নিমেষে তেপান্তর মাঠ পার হবার স্বপন দেখলে রচয়িতার দাবী নিতে পারলে না, খানিক পথে দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হল, 'তার anatomy দোরস্ত শরীর, তৃষ্ণায় বুক ফেটে মলো সে হরিণের মতো! ঘোড়ারও দৌড় অবলম্বন করে যতটা যেতে চায় নির্বিবিঘ্নে তা পারলে না, রণক্ষেত্রে ঘোড়া মায় সওয়ার পড়ে মলো! রচয়িতা নিয়ে এল, লোহার পক্ষিরাজ ঘোড়া!—যেটা ঘোড়ার মতো একেবারেই নয় হাড় হদ্দ কোন দিক দিয়ে—সৃজন করে উঠে বসলো আপন পর সবাইকে নিয়ে, নিমেষে ঘুরে এল যোজন বিস্তীর্ণ পৃথিবী নির্ভয়ে! যা নিয়তির নিয়মে কোথাও নেই তাই হল, জলে শিলা ভাস্‌লো আকাশে মানুষ উড়লো, ঘুমোতে ঘুমোতে ঘুরে এল পৃথিবী রচনায় চড়ে মানুষ! প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত আচরণে দোষ এখানে তো আমাদের চোখে পড়ে না। মানুষ যখন আয়নার সাম্‌নে বসে চুল ছাঁটে, টেরি বাগায়, ছিটের সার্টে বাংলা anatomyর সৌন্দর্য্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে ভেঙ্গে নেয় নিজের দেহ, কাজল টেনে চোখের টান বাড়িয়ে প্রেয়সী দেখা দিলে বলে বাহবা,—চুলের খোঁপার ঘোর পেঁচ দেখে বাঁধা পড়ে—নিজের কোন সমালোচনা যে মানে না তার কাছে; তখন ছবির সামনে এসে anatomyর কথা পাড়ে কেন সে তা আমার কাছে প্রকাণ্ড রহস্য।

ইজিপ্টের লোক এককালে সত্যিই বিশ্বাস করতো যে জীবন কায়া ছেড়ে চলে যায় আবার কিছুদিন পরে সন্ধান করে করে নিজের ছেড়েফেলা কামিজের মতো কায়াতেই এসে ঢোকে, এইজন্যে কায়ার মায়া তারা কিছুতে ছাড়তে পারেনি, ভৌতিক শরীরকে ধরে রাখার উপায় সমস্ত আবিষ্কার করেছিল, একদল কারিগরই তৈরি হয়েছিল, ইজিপ্টে যারা 'কা' প্রস্তুত করতো তাদের কাযই ছিল যেমন মানুষ ঠিক সেই গড়নে পুত্তলিকা প্রস্তুত করা, গোরের মধ্যে ধরে রাখার জন্য;

ঠিক এই সব 'কা' নির্ম্মাতাদের পাশে বসে ইজিপ্টের একদল রচয়িতা artistic anatomyর বৃহত্ত ও অন্যথা বৃত্ত দিয়ে পুত্তলিকা বা 'কা' নির্ম্মাতাদের ঠিক বিপরীত রাস্তা ধরে গড়েছিল কত কি তার ঠিক নেই, দেবতা মানুষ পশু পক্ষী সবার anatomy ভেঙ্গে চুরে তারা নতুন মূর্ত্তি দিয়ে অমরত্বের সিংহাসনে বসিয়ে গেল। ইজিপ্টের এই ঘটনা হাজার হাজার বৎসর আগে ঘটেছিল; কায়া-নির্ম্মাতা-কারিগর ও ছায়া-মায়ার যাদুকর দুই দলেই গড়লে কিন্তু একজনের ভাগ্যে পড়লো মূর্ত্ত যা কিছু তাই, আর এক জনের পাত্রে ঝরলো অমূর্ত্ত রস স্বর্গ থেকে এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোন যুগের আর্টের ইতিহাসে হয়নি হবার নয়। ইজিপ্ট তো দূরে পাঁচ হাজার দশ হাজার বছরটা আরো দূরে, এই আজকের আমাদের মধ্যে যা ঘটছে তা দেখনা কেন যারা ছাপ নিয়ে চলেছে মর্ত্ত্য জগতের রূপ সমস্তের, তারা মূর্ত্ত জিনিষ এত পাচ্ছে দেখে সময়ে সময়ে আমারও লোভ হয়—টাকা পাচ্ছে, হাত তালি পাচ্ছে, অহংকে খুব বেশী করে পাচ্ছে! আর এরূপ যারা করছেনা তারা শুধু আঁকা বাঁকা ছন্দের আনন্দটুকু, ঝিলি মিলি রঙ্গের সুরটুকু বুকের মধ্যে জমা করছে, লোহার সিন্দুক কিন্তু রয়েছে খালি; বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই কালে কালে খুব আদর করে আর্টিষ্টদের যা সম্ভাষণ করেছে তা উর্দ্দূতে বলতে গেলে বলতে হয়—খেয়ালী, হিন্দীতে বাউর বা বাউল, আর সব চেয়ে মিষ্টি হল বাংলা—পাগল, কিন্তু এই পাগল তো জগতে একটি নেই, উপস্থিত দশবিশ লক্ষ কিম্বা তারও চেয়ে হয়তো বেশী· এবং অনুপস্থিত ভবিষ্যতের সব পাগলের সর্দ্দার হয়ে যে রাজত্ব করছে, উল্কার মতো জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টি রচনা সমস্ত সে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে পথে বিপথে সৃজনের উৎসব করতে করতে এমন যে খেয়লের বাউল জগতের আগত অনাগত সমস্ত খেয়ালী বা আর্টিষ্ট হল তার চেলা, তারা পথ চলতে ঢেলাই হোক মাণিকই হোক, যাই কুড়িয়ে পেলে অমনি সেটাকে যে খুব বুদ্ধিমানের মতো ঝুলিতে লুকিয়ে রাতারাতি আলো আঁধারের ভ্রান্তি ধরে চোখে ধুলো দিয়ে বাজারে বেচে এল তা নয়—মাটির ঢেলাকে এমন করে ছেড়ে দিলে যে সেটা উড়ে এসে যখন হাতে পড়লো তখন দেখি সোণার চেয়ে সেটা মূল্যবান, আসল ফুলের চেয়ে হয়ে গেছে সুন্দর! বাংলায় আমাদের মনে আর্টের মধ্যে অস্থিবিদ্যার কোনখানে স্থান, এই প্রশ্নটা ওঠবার কয়েক শত বৎসর আগে এই পাগলের দলের একজন আর্টিষ্ট এসেছিল সে জেগে বসে স্বপন দেখলে—যত মেয়ে শ্বশুর ঘরে রয়েছে আসতে পারছে না বাপের বাড়ী, একটা মূর্ত্তিতে সেই সবারই রূপ ফুটিয়ে যাবে! আর্টিষ্ট সে বসে গেল কাদা মাটি খড় বাঁশ রং তুলি নিয়ে, দেখতে দেখতে মাটির প্রতিমা সোণার কমল হয়ে ফুটে উঠলো দশ দিকে সোণার পাপড়ি মেলে! এ মূর্ত্তি বংলার ঘরে ঘরে দেখবে দুদিন পরে কিন্তু এরও উপরে ডাক্তারি শাস্ত্রের হাত কিছু কিছু পড়তে আরম্ভ হয়েছে· সহরে। বাংলার কোন অজ্ঞাত পল্লীতে এই মূর্ত্তির মূল ছাঁচ যদি খোঁজ তো দেখবে—তার সমস্তটা artistic anatomyর নিয়মের দ্বারায় নিয়তির নিয়ম অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে ব্যতিক্রম ও অতিক্রমের সিংহাসনে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইয়োরোপের চিঠি

বার্লিন

১৫ই নবেম্বর, ১৯২১

(১)

রুশিয়াকে ওয়াশিংটনের সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। অথচ এই বৈঠকে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশ্নগুলা আলোচিত হইবার কথা। কাজেই রুশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব এই আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনকে শাসাইয়া চীনের নিকট এক কড়া চিঠি ঝাড়িয়াছেন।

টিচেরিণ বলিতেছেন—"ওয়াশিংটনের কর্ম্মকর্ত্তারা হয়ত এই সুযোগে বোল্‌শেভিকদের বিপক্ষীয় কোন্ কোন রুশ দলকে গোটা রুশিয়ার প্রতিনিধি স্বীকার করিয়া লইবেন। তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে এই আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক রুশিয়ার শত্রুতা আচরণ করিতেছেন। সোহ্বিয়েট সরকার তাহা হইলে এই বৈঠকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সকল প্রকার অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইবেন। এক কথায় ওয়াশিংটনে যে কোন মীমাংসাই হউক না কেন, বোলশেভিক রুশিয়া তাহার সকল গুলাই অগ্রাহ্য করিয়া চলিবেন।"

চীনে আবার দুইটা গবর্ণমেণ্ট চলিতেছে। মাস ছয়েক হইল দক্ষিণ চীনের লোকেরা ক্যাণ্টনে এক রিপাব্লিক স্থাপন করিয়াছেন। এই রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট সুন য়াৎ-সেন। ইঁহারা উত্তর চীনের (যার কর্ম্মকেন্দ্র পিকিন) একতিয়ার মানিতে চান না।

সুন মহাশয় মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে লিখিয়াছেন :—"ওয়াশিংটনের বৈঠকে উত্তর চীন কোনও প্রতিনিধি পাঠাইতে অধিকারী নয়। পিকিনের গবর্ণমেণ্ট বে-আইনি এবং চীনে জনসাধারণের মতের বিরোধী। দক্ষিণ চীনের গবর্ণমেণ্টই আসল চীনা সরকার।" যুক্তরাষ্ট্র সুনের মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্কের চরমপন্থী কাগজে কাগজে পড়িতেছি—"ওয়াশিংটনের সম্মেলনকে লড়াইয়ের আয়োজন কমাইবার সম্মেলন বলা হইতেছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে এই বৈঠকে লড়াইয়ের আয়োজন বাড়াইবারই চেষ্টা চলিতেছে। সর্ব্বঘটেই এইরূপ দেখিতেছি। প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ একৃতিয়ার ও সাম্রাজ্য এবং পরপীড়ন পাকাপাকি করিবার ফন্দিই আঁটিতেছেন।"

বার্লিন

২৩শে নবেম্বর, ১৯২১

(২)

মার্চ্চমাসে হলাণ্ডের হেগ নগরে সমর-বিরোধী জনসঙ্ঘের এক কংগ্রেস বসিয়াছিল।

অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, সুইডেন, ডেন্মার্ক ও সুইটজার্ল্যাণ্ড হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন।

ইঁহাদের মূলমন্ত্র—"কোন প্রকার যুদ্ধের জন্যই এক দামড়িও খরচ হইতে দিব না, এক মুহূর্ত্তও খাটিব না এবং একজন শিপাহীকেও লড়িতে যাইতে দিব না।"

সমর-বিরোধী সঙ্ঘের সভ্যেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পাকা মোসাবিদা প্রচার করিয়াছেন। লড়াইয়ের জন্য সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারি করা যাহাতে বন্ধ থাকে তাহার জন্য ইঁহারা হরতাল সুরু করিবেন। লড়াইয়ের জন্য পল্টন বাছাইয়ের কথা উঠিলেই ইঁহারা তাহার বিরুদ্ধে আড়কাঠির কাজ করিবেন। যাহারা পূর্ব্ব হইতেই ফৌজের কাজ করিতেছে তাহাদিগকে এই কাজে ইস্তফা দিতে পরামর্শ দেওয়া হইবে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার অধীনে দুনিয়ায় যে যে স্থলে পরপীড়িত জাতি রহিয়াছে সেই সকল দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইঁহারা বিদ্রোহের স্বপক্ষে মত প্রচার করিতে বাধ্য থাকিবেন। অধিকন্তু যাহাতে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টগুলা এই সমুদয় বিদ্রোহ দমন করিতে অসমর্থ হয় তাহার জন্য ইঁহারা যত্ন লইবেন।

হলাণ্ডের এক কাগজে এই সমর-বিরোধী বিশ্বসঙ্ঘের এক কার্য্য তালিকা বাহির হইয়াছে। এসিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতার জন্য ইঁহাদের আগ্রহ যেরূপ দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে কখনও কোন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় দলের চিন্তায় বা কাজে সেরূপ দেখা যায় নাই।

বার্লিন

২৫শে নবেম্বর, ১৯২১

(৩)

ওয়াশিংটনের সম্মেলনের উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় কাগজে ভারতীয় স্বরাজের স্বপক্ষে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা হইতেছে। বষ্টনের 'আমেরিকান' বলিতেছেন—"ভারতবর্ষে আজকাল যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে সেই আন্দোলনের যথার্থ খবর দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরই জানা কর্ত্তব্য। প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তি-সমস্যা ভারতীয় স্বরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অধিকন্তু যাঁহারা জগৎ হইতে লড়াই বস্তুটাই তুলিয়া দিবার জন্য মাথা ঘামাইতেছেন, অথবা লড়াইয়ের খরচা কমাইবার আন্দোলনে মেহনৎ করিতেছেন তাঁহারাও ভারতবাসীর রিপাব্লিক স্থাপনের প্রয়াসে বিশ্বের প্রভূত মঙ্গল দেখিতে পাইবেন।"

'আমেরিকান্' যুক্তরাষ্ট্রের এক অতি ক্ষমতাশালী দৈনিক পত্র। এই কাগজের সম্পাদক গ্রেনভিল ম্যাকফার্ল্যাণ্ডের সাহায্যে ওয়াশিংটন সহরে এক ভারতীয় স্বরাজ-সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভার কর্ম্মকর্ত্তারা বিশ্ব-সম্মেলনে সমবেত জগতের প্রতিনিধিদিগকে ভারতবর্ষের আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্য জোগাইতেছেন।

বষ্টনের স্বাধীনতা-ভবনে ভারতীয় স্বরাজ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিবার জন্য ইয়াঙ্কিরা সেদিন এক বিরাট সভা ডাকিয়াছিল। সেই সভায় মহিলা সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীমতী জোসেফিন বেনেট্ ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা কামনা করিয়াছেন। মার্কিন মহলে বেনেট পত্নীর নাম আছে।

নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক 'নেশ্যানে' পড়িতেছি এক সম্পাদকীয় মন্তব্য। হ্বিলার্ড সাহেব লিখিয়াছেন—"ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের খবরগুলা মার্কিন কাগজে আজও বড় হরপে ছাপা হইতেছে না বটে, কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকার কংগ্রেসে কংগ্রেসে আজকাল যে সকল তর্কপ্রশ্ন লইয়া সাদা চামড়াওয়ালা লোকেরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির দুইশত সভ্য দিল্লীতে বসিয়া তাহা অপেক্ষা গভীরতর সমস্যায় হাত দিয়াছেন। ভারতবাসীর আন্দোলনে একমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এমন নয়। গোটা এসিয়ায় শ্বেতাঙ্গ নরনারীর এক্তিয়ার কতটুকু বজায় থাকিবে তাহাও এই হিন্দুমুসলমানের স্থিরীকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতেছে।"

ইয়াঙ্কি স্থানের সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল এবং মাথাওয়ালা লোকমাত্রেই এই সাপ্তাহিকের মত অনুসারে আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। হ্বিলার্ড স্বয়ং বহু আমেরিকা প্রবাসী ভারতসন্তানের বন্ধু ও সহযোগী।

বার্লিন,
৩০শে নবেম্বর, ১৯২১

(৪)

বিলাতের নামজাদা সাহিত্যরথী ওয়েলস্ সাহেবকে লণ্ডনের 'ডেলি মেল' কাগজ সংবাদদাতারূপে ওয়াশিংটনে পাঠাইয়াছেন। অথচ ওয়েলসের লেখা কোন প্রবন্ধই 'ডেলি মেলে' ছাপা হইতেছে না।

রগড় মন্দ নয়। 'ডেলি মেল' চাহেন ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের মিত্রতা। কিন্তু ওয়েলস্ তারে খবর পাঠাইতেছেন ফ্রান্সের বিপক্ষে।

ভিন্ন ভিন্ন কাগজের ভিন্ন ভিন্ন মত। কাজেই সংবাদদাতারাও ঠিক সেই সুর বজায় রাখিয়া খবর ঢুঁড়িতে অথবা তৈয়ারি করিতে বাধ্য। এই জন্যই অতি সাবধানে খবরের কাগজের বিদেশী সংবাদগুলা পড়া আবশ্যক। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ পুষ্ট করিবার ফিকির তল্লাস করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে ইয়োরামেরিকার খবর পাঠায় রয়টার কোম্পানী। এই কোম্পানী ইংরেজ। কাজেই রয়টারের সংবাদে একমাত্র ইংলণ্ডের স্বপক্ষের এবং বিলাত-ঘেঁসা খবর ও মত পাওয়া যায়।

ভারতবাসী আজ দুনিয়া মন্থন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, দুনিয়ার শক্তিগুলাকে নিজ স্বার্থের প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কাজেই এখন ইয়োরামেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভারতীয় এজেন্ট, করেস্পণ্ডেণ্ট সংবাদদাতা ইত্যাদি মোতায়েন করিবার দিন আসিয়াছে। কেবল রয়টারের দেওয়া সংবাদ লইয়া ভারতের সংবাদপত্রগুলা বহুকাল কাটাইয়াছে। এখন খবরের কাগজের পরিচালনায় দেশের "স্বাধীন পন্থা" কায়েম করা দরকার। স্বদেশী আন্দোলনের এই দিকেও নজর দিবার জন্য শীঘ্রই কয়েকজন অগ্রণীর দেখা পাওয়া চাই।

বার্লিন

১ ডিসেম্বর, ১৯২১

(৫)

সুইটজার্লাণ্ডের লীগ অব নেশ্যন্‌সকে আমেরিকার পররাষ্ট্রবিশেষকেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক ইয়োরোপীয় আফিস বা বৈঠকখানারূপে নিন্দা করিতেছেন। এখনকার আসরে ফ্রান্সের ঠাঁই এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। প্রায় কোনও প্রস্তাবেই ফ্রান্সের স্বপক্ষে লোকমত পাওয়া যায় না।

রুমেনিয়া, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভোকিয়া এবং জুগোস্লাভিয়া, প্রধানতঃ এই চার দেশ ফ্রান্সের কথায় সায় দিয়া থাকে। কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পঞ্চাশ রাষ্ট্রের অধিকাংশই ইংরেজের হুকুম তামিল করিয়া চলে। এমন কি ইতালী এবং বেলজিয়ামও অনেক সময়ে ইংরাজের কথায় উঠে বসে।

ইতালীর পুরাণো পররাষ্ট্রসচিব নিট্টি সাহেব একখানা কেতাব লিখিয়াছেন, নাম "শান্তিহীন ইয়োরোপ"। নিট্টি বলিতেছেন —"দুনিয়ায় শান্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই লীগটাকে আগাগোড়া বদলানো আবশ্যক হইবে।"

বার্লিন

৭ ডিসেম্বর, ১৯২১

(৬)

আঙ্গোরার ন্যাশন্যালিষ্ট তুর্কিদের সঙ্গে সন্ধি কায়েম করিয়া ফরাসী গবর্মেণ্ট ইংরাজের বিরুদ্ধে খোলাখুলি কামান দাগিলেন। এশিয়া-মাইনারের রূপা, লোহা এবং অন্যান্য ধাতুর খনিতে ইংরেজ এবং ইতালীয়ানদের কতকগুলা একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই সন্ধির সর্ত্তে ইংলণ্ড ও ইতালীর সেই স্বার্থ মারা পড়িবার সম্ভাবনা।

আঙ্গোরা ফ্রান্সের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতেছেন বটে। কিন্তু অপর পক্ষে ফরাসী গবর্মেণ্টের যম বোল্‌শেভিক রুশিয়ার সঙ্গেও কমালপাশা 'সেলাম আলেকম' চালাইতেছেন। ইনি রুশিয়াকে

জানাইয়াছেন—"রুশের সঙ্গে তুর্কের যে সকল কথাবার্ত্তা চলিয়া আসিতেছে সেইগুলা অটুট থাকিবে। রুশিয়াকে তুরস্ক স্বকীয় মিত্র বিবেচনা করিয়াই চলিবে।"

ফরাসী-তুর্ক সন্ধিতে একটা মজার সর্ত্ত আছে। বহুকাল ধরিয়া পশ্চিমা খৃষ্টান গবর্মেণ্ট-গুলা তুরস্কের অধিবাসী খৃষ্টান নরনারীদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার এক্তিয়ার ভোগ করিতেছিল। এই নয়া মোসাবিদায় তুর্ক মুল্লুকে খৃষ্টান সরকারদের কেরদানি জাহির করা নেহাৎ কঠিন হইবে।

বার্লিন

১০ ডিসেম্বর, ১৯২১

(৭)

আয়র্লণ্ডের কপালে "হোমরুল" ছিল! দেখিতেছি শেষ পর্য্যন্ত আইরিশ জাতির অনেক লোকই হোমরুল হজম করিতে প্রস্তুত। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াঙ্কি সমাজেও যে সকল আইরিশ নরনারী বাস করে তাহাদেরও অনেকে লয়েড জর্জ্জের নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইতেছে। আয়র্লণ্ড আর একটা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজীলাণ্ড হইতে চলিল।

আইরিশরা যতদিন বিদ্রোহী ছিল ততদিন ইহারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ভারত সন্তানের সঙ্গে একজোটে কাজ করিয়াছে। ভারতীয় ন্যাশন্যালিষ্টরা অনেক সময়ে আইরিশ ন্যাশন্যালিষ্টদের সাহায্য পাইয়াছে। আমেরিকায়,—এমন কি ইংলণ্ডেও—আয়র্ল্যণ্ড ভারতবর্ষের এক মস্ত সহায় ছিল।

এখন হইতে ক্যানাডা অথবা অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতবাসীর যেরূপ সম্বন্ধ, আয়র্লণ্ডের সঙ্গে আমাদের সেইরূপ সম্বন্ধ থাকিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রেই আয়র্লণ্ড ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিবে এবং অস্ত্রধারণ করিবে। এইরূপ বুঝিয়া রাখা আবশ্যক।

কিন্তু ডি ভ্যালেরা সহজে হোমরুলে মজিবার ব্যক্তি নন। একদল লোক মজিয়াছে ঠিক, কিন্তু ডি ভ্যালেরার দল পুরাপুরি স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্রোহের নিশান নামাইবে না।

আয়র্লণ্ডে নরম দলে চরম দলে আড়াআড়ি নূতন কিছু নয়। এমন কি ডি ভ্যালেরাও যদি আজ কিংবা কাল ঠাণ্ডা মারিয়া যান, তাহা হইলেও কাল কিম্বা পরশু এক নূতন গরম দলের আবির্ভাব আইরিশ সমাজে অবশ্যম্ভাবী। ষোল আনা স্বাধীনতার আন্দোলন আয়র্লাণ্ডে জাগিয়া থাকিবেই থাকিবে।

বার্লিন,

১৪ ডিসেম্বর ১৯২১

(৮)

আয়র্লণ্ডকে হাত করিতে পারিলে ইয়াঙ্কি স্থানে ইংরেজরা ভারতীয় আন্দোলন কাবু

করিতে পারিবেন এইরূপ ভাবিয়া লয়েড জর্জ্জ আমেরিকায় আসিতেছেন। কিন্তু মার্কিণ সমাজে আইরিশরাই ভারতীয় স্বরাজের একমাত্র বন্ধু নয়। আইরিশ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য জাতীয় লোকে যুবক-ভারতের প্রচেষ্টায় "কায়েন মনসা বাচা" সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

লড়াইয়ের সময়ে লাজপত রায় আমেরিকায় ভারতীয় হোমরুল প্রচার করিতেছিলেন। মার্কিণ জাতি লাজপত রায়কে এই কারণে বিশেষ সম্মান করে নাই,—অনেকেই তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল। যখন জগতের সকল জাতিই স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করিতেছে সেই সময়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত যাঁহার বক্তৃতায় বা রচনায় পাওয়া যায় না তাঁহার সমাদর ইয়াঙ্কির মুল্লুকে কঠিন। তথাকথিত হোলরুলের স্বপক্ষে তাতিয়া উঠা মার্কিণদের পছন্দসই নয়।

১৯২০ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্ক সহরে "আমেরিকান সোশিয়ালিষ্ট পার্টি" ভারতীয় স্বাধীনতার দাবী সম্মান করিবার জন্য এক প্রস্তাব তুলিয়া ছিলেন। ইয়াঙ্কি সমাজেই ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে এই প্রথম দলবদ্ধ আন্দোলন।

সেই বৎসরই আমেরিকার আর এক দল ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। সেই দলের নাম "ফার্ম্মার-লেবার পার্টি"। এই "কিষাণ-মজুর দলের" প্রথম কংগ্রেস বসন্তকুমার রায়কে বক্তৃতা দিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন।

"ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কস অব্ দি ওয়ার্ল্ড্" (বা দুনিয়ার মজুর) নামে ইয়াঙ্কি স্থানে এক বিপ্লবপন্থী দল আছে। ইহারা কোনো রাষ্ট্রনৈতিক দলের সামিল নয়। প্রধানতঃ ফ্যাক্টারি সংক্রান্ত এবং শ্রমজীবীদের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় চরম আন্দোলন চালানো ইঁহাদের কার্য্য।

এই দলের তাঁবে বার চোদ্দটা বড় বড় দৈনিক, সপ্তাহিক ও মাসিকপত্র চলিতেছে। কাগজগুলা আট ভাষায় সম্পাদিত হয়। ইঁহাদের উদ্যোগে ভারতীয় স্বাধীনতার অনেক কথা মার্কিণ মুল্লুকের নগরে পল্লীতে, নানা ভাষায়, নানা বক্তৃতামঞ্চে প্রচারিত হইয়াছে।

বৎসর কয়েক হইল বৃটিশ রাষ্ট্রদুতের প্রেরণায় মার্কিণ গবর্মেণ্ট প্রায় বিশজন ভারতীয় চরমপন্থী যুবককে আমেরিকা হইতে খেদাইয়া দিবার হুকুম জারি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়াঙ্কি স্থানের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল অঞ্চলের সকল প্রকার মজুরদলের কর্ম্মকেন্দ্র হইতেই এই সরকারী হুকুমের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ রুজু করা হয়। মজুর দলের কর্ম্মকর্ত্তারা ফেডারাল দরবারের কাণ ঝালাপালা করিয়া ছাড়েন। শেষ পর্য্যন্ত 'ভিতিবিরক্ত' হইয়া মার্কিণ সরকার ভারতীয় ঐ যুবকদিগকে রেহাই দিয়াছেন।

তিনজন ভারত সন্তান এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুলে সিয়াটল্ সহরে বাস করিতে ছিল। ইহাদের জন্য সহরের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের কেন্দ্র পরিষৎ তাঁহাদের চরম ক্ষমতা খাটাইতে রাজি ছিলেন। ইঁহাদের বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তারা বলিয়াছিলেন—"ওয়াশিংটনের ফেডারাল দরবারের নিকট আমরা যে সকল দরখাস্ত পাঠাইয়াছি তাহাতে নির্ব্বাসনের হুকুম যদি রদ না হয় তাহা হইলে

সিয়াট্‌ল্ সহরের সকল মজুরসমাজেই ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা করিব। গোটা সহর জুড়িয়া হরতাল চলিতে থাকিবে। সিয়াট্‌ল বন্দর হইতে যাহাতে কোনো ভারত সন্তানকে নির্ব্বাসিত করা না হয় তাহার জন্য আমরা জিম্মাদারী লইতেছি।”

বার্লিন,
১৬ ডিসেম্বর ১৯২১

(৯)

ইতালীর সঙ্গে ফ্রান্সের মন কষাকষি চলিতেছে। ভূমধ্যসাগরের জনপদে জনপদে এই দুই রাষ্ট্রের আড়াআড়ি শীঘ্র থামিবার নয়।

রোমের ‘টেম্পো’ কাগজে প্রকাশ যে ফরাসীরা ইতালীর সীমানায় এক প্রকাণ্ড আকাশযানের কারখানা খুলিয়া ইতালীকে শাসাইতেছে। আমেরিকার কাগজে কাগজে ইতালীয়ানরা ফরাসীদের সেনাবিভাগের বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচার করিতেছে দেখিতেছি।

ফ্রান্স, আফ্রিকান সৈন্য যাহাতে ইয়োরোপে ব্যবহার করিতে না পারে, তাহার জন্য মার্কিণমত তৈয়ারী করা ইতালীয়ানদের এক লক্ষ্য বুঝা যাইতেছে। অধিকন্তু জুগোস্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুমেনিয়া এই তিন দেশে ফরাসী গবর্মেণ্ট যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে লড়াইয়ের সরঞ্জাম বেচিতে না পারে তাহার জন্যও ইতালী ওয়াশিংটনের সম্মেলনে এক বড় আন্দোলন রুজু করিয়াছে।

এই দুই ক্ষেত্রেই জার্ম্মাণির এবং ইতালীর স্বার্থ একরূপ। ইতালীয়ানরা প্রকারান্তরে জার্ম্মাণদেরই যেন প্রতিনিধি।

‘রেস্টো দেল কার্লিনা’ বলিতেছেন—“পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশে ফ্রান্সের মূলধন খাটিলে ইতালীর বাণিজ্য কমিতে থাকিবে। আবার ফ্রান্সের টাকা পোলাণ্ডের সেনাবিভাগে খরচ হইলে ইতালীর বিপদ অবশ্যম্ভাবী।”

ইতালীয়ানদের ফরাসীবিদ্বেষ দেখিতেছি ‘কোরিয়েরে দেলা সেরা’ দৈনিকেও। সম্পাদক লিখিয়াছেন—“ফ্রান্স যদি নিজকে ‘দাঁত পর্য্যন্ত সশস্ত্র’ রাখিতে চায় আর পূর্ব্ব-ইয়োরোপের নয়া রাষ্ট্রগুলাকেও নিজের আদর্শে চৌপর দিনরাত রণবেশে সাজাইয়া রাখিতে চায় তাহা হইলে ফ্রান্সকে দুনিয়ার লোক একঘরে করিয়া রাখিবে না কেন?”

ইতালীয়ান সমাজে এই ধরণের জার্ম্মাণি-ঘেঁসা মত প্রকাশিত হইতেছে। কাজেই বাজারে গুজব, যে ইতালীতে এবং আমেরিকায় জার্ম্মাণির লোকেরা দেদার টাকা খরচ করিতেছে।

শ্রীবিনয় কুমার সরকার

শান্তি

নাম ছিল তাহার পাষাণী। কেহ আদর করিয়া গরীবের ঘরের মেয়ের এই নাম রাখে নাই। পাঁচ মাসের শিশুকন্যাকে সংসারের সকলের চেয়ে বড় আশ্রয় ও স্নেহে বঞ্চিত করিয়া হরিপ্রিয়া যেদিন সেই অজানা দেশের সন্ধানে চলিয়া গেলেন,—সকলেই যাহার উদ্দেশে যাত্রী কিন্তু তথ্য যাহার কেহ জানে না,—সেদিন পিসিমা যখন মায়ের শ্লথ হস্ত দুখানি সরাইয়া দিয়া জননীর শেষ স্নেহ আলিঙ্গনের নিবিড় বন্ধন হইতে কুন্দকলিকার মত সুন্দর শিশুটিকে নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন, তখনও হতভাগিনী মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল না। জননীর মৃত্যুশীতল হিমস্পর্শ হইতে উষ্ণ আরামপ্রদ পিসিমার কোলটিতে আসিয়া শিশু হাসিল; সে হাসির অর্থ কেহ বুঝিতে পারিলে কি ইহাই বুঝিত যে জীবন ও মরণ এমনই শিশুর খেলা—যে তাহা লইয়া শোক করা বৃথা?

মেয়েকে কোলে লইয়া পিসিমা বলিলেন,—"রামদয়াল, তোর মেয়েটি কি পাষাণী রে? মরা মায়ের কোলছাড়া করে কেড়ে নিলাম, একটি বার একটুও কাঁদ্‌লে না?" শোকে মুহ্যমান রামদয়াল তখন স্ত্রীর অন্তিমশয্যার পার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। তুলসীতলায়,—যেখানে হরিনাম শুনিতে শুনিতে হরিপ্রিয়া সেই দয়াময়ের পাদোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে,—যাঁহার করুণা ব্যতীত মানুষের অন্য ভরসা নাই,—এখনও মৃতদেহ সেইখানেই শায়িত। আত্মীয় বন্ধুজন শ্মশানযাত্রার আয়োজন ও বয়স্কা প্রতিবেশিনীগণ মধ্যে মধ্যে দু'একটি সান্ত্বনা-বাক্যে রামদয়ালকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রামদয়াল এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, দিদির কথা শুনিয়া একেবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তারপর পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ভগ্নীর ক্রোড় হইতে কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অকস্মাৎ পিসিমার কোলছাড়া হইয়া এবং পিতার শোকের এই আতিশয্যে ভীত হইয়া শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসিমা তাড়াতাড়ি তাহাকে রামদয়ালের কোল হইতে আপনার বুকে লইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

মাতৃহীনা শিশু পিসিমার যত্নেই প্রতিপালিত হইতে থাকিল, এবং তাঁহার প্রদত্ত পাষাণী নামই তাহার রহিয়া গেল, নূতন করিয়া আর তাহার নামকরণ হইবার কোনো প্রয়োজন রহিল না।

(২)

রামদয়াল জাতিতে নমঃশূদ্র। অবস্থা তত ভাল নহে তবে একেবারে অচল নয়। বিঘা চারেক জমি আছে, এক হাল গরুও আছে; দেবতার অকৃপায় ফসলের অনিষ্ট না হইলে

একরকম পোষাইয়া যায়। বয়সও তাহার চল্লিশ পার হয় নাই এবং বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, বিনয় এবং পরিশেষে অনুযোগ তাহাকে অষ্ট প্রহরই জানাইয়া দিত যে তাহার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা কত আবশ্যক। তথাপি লক্ষ্মীছাড়া গৃহের প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্মীর পুনরাবির্ভাবের বিষয়ে রামদয়ালের কিঞ্চিন্মাত্রও উৎকণ্ঠা দেখা যাইত না, অধিকন্তু ভগিনীর অনুরোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরক্তির মাত্রা বর্দ্ধিত হইত এবং এইকথা লইয়া রাগারাগি বকাবকি করিয়া এক এক দিন সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত; এবং তাহাকে পাড়ার চন্দ্রনাথের দাওয়া কিংবা হরিচরণের আড়ত হইতে বলিয়া কহিয়া বাড়ী আনিয়া খাওয়াইতে রাসমণিকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইত। এই সকল কারণে ভ্রাতার বিবাহ সম্বন্ধে রাসমণির আগ্রহ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল।

পাষাণীকে রামদয়াল গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। গুরুমহাশয় মহিম সরকার বলিতেন পাষাণী তাঁহার পাঠশালের সর্দ্দার প'ড়ো—এমন তীক্ষ্ণ মেধা, এত তীব্র বুদ্ধি তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ গুরুগিরিতে আর কখনও দেখেন নাই। এমনি ক্ষিপ্রতার সহিত সে কঠিন অঙ্ক কষিত যে সে যখন গুরুমহাশয়কে শ্লেটখানি দিয়াছে তখনো ক্লাসের ছেলেরা বিষয়টা যে কি তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। গুরুমহাশয় পরদিনের জন্য যে পড়া দিতেন পাষাণী সেইদিন পাঠশালাতেই তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিত। পাঠশালার অন্যান্য ছেলেমেয়েরা পাষাণীর এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা কতক শ্রদ্ধা, কতক হিংসার চক্ষে দেখিত—এবং এই কারণেই তাহার সহিত মিশিতে ভয় পাইত। পড়ায় কিংবা খেলায়, পাঠশালায় কিংবা বাহিরে পাষাণীর কাছে কখন তাহাদের অজ্ঞতা ধরা পড়িবে এবং তাহাদিগকে অপ্রতিভ হইতে হইবে ইহা মনে করিয়া তাহারা পাষাণীর সহিত মিশিতে চাহিত না, কারণ এই অসামান্য-বুদ্ধিসম্পন্না মেয়েটি ব্যঙ্গকৌতুকেও অনন্যসাধারণ ছিল এবং তাহার শ্লেষও ছিল ধারালো। কেবলমাত্র একজন পাষাণীকে ভয় করিয়া চলিত না। সে চন্দ্রনাথ মণ্ডলের ছেলে শচীকান্ত। শচীকান্ত পাষাণীর সঙ্গেই পড়িত এবং প্রথম প্রথম তাহার এবং পাষাণীর মধ্যে ক্লাসের স্থান অধিকার লইয়া বেশ একটু রেষারেষি চলিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে পাষাণী পড়াশুনায় শচীকান্তকে পরাস্ত করিবার আগ্রহ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। ক্লাসে প্রথম হইবার তাহার যে একটা প্রবল জেদ ছিল তাহা সে একেবারেই ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় শচীকান্তকে প্রধান স্থানটি ছাড়িয়া দিল। শচীকান্ত ইহাতে যে একটা দ্বিধা বোধ করিত তাহাও পাষাণী সহ্য করিতে পারিত না। শচীকান্তের আত্মসম্মানবোধে আঘাত করিয়া সে তাহাকে ইহা ভুলাইতে চেষ্টা করিত যে সে লেখাপড়ায় পাষাণীর চেয়ে হীন। পাষাণী বলিত "শচীদা, মেয়েছেলের সঙ্গে যে পড়ো এই তো তোমার যথেষ্ট অপমান, এর উপরও যদি তুমি ক্লাসে প্রথম না থাকো তবে আমি আর পড়বো না।" শচীকান্ত বলিত, "তুইই তো আমাকে ফাষ্ট থাকতে দিস্ না।" পাষাণী

হাসিয়া উত্তর দিত, "চেষ্টা করলেই তুমি পার থাক্‌তে, তুমি তো আদবেই পড়ো না, তা কি হ'বে ? আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধি ত কত বেশী।" শচীকান্ত এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ ও প্রীতির অভিষেক উভয়ই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া ভাবিত, পাষাণী নিজে যখন তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছে তখন ইহা মিথ্যা নহে।

গুরুমহাশয় সেদিন একটী বড় জটিল অঙ্ক দিয়াছেন, ক্লাসে কেহই কষিতে পারে নাই, তাই তিনি বলিয়া দিয়াছেন সকলে বাড়ীতে চেষ্টা করিয়া যেন অঙ্কটি করিয়া লইয়া আসে। সারা সকালবেলা ধরিয়া অঙ্কটি ঠিক করিয়া শ্লেট বই হাতে পাঠশালার রাস্তায় পাষাণী গিয়া শচীকান্তকে ডাকিল,

"শচীদা"

"কিরে পাষাণী ?"

"আঁক হয়েছে ?"

"উঁহু"

"তবে কি হ'বে শচীদা ?"

"তোর হয়েছে ?"

পাষাণী মিথ্যা কথা বলিল। কহিল, "হয়নি আমার শচীদা, তুমি আর একবার চেষ্টা করে দেখ না ভাই যদি হয়।" শ্লেট পেন্সিল লইয়া শচীকান্ত অঙ্ক কষিতে বসিল, পাষাণী দাঁড়াইয়া কাঁধের উপর দিয়া দেখিতে লাগিল শচীকান্ত ভুল করিতেছে, পাষাণী বলিল,

"শচীদা"

"কিরে ?"

"আচ্ছা, এই যোগফলটিকে যদি এই রকম করে বর্গ কষে নেওয়া হয় তা'হলে কি ঠিক হয় শচীদা ?" শচীকান্ত পাষাণীর কথামত বর্গ কষিয়া দেখিল অঙ্কের ফল মিলিয়াছে তখন সে পাষাণীর পিঠ সজোরে চাপড়াইয়া বলিল "সাবাস মেয়ে! এত বড় আঁকটী কষে ফেল্‌লি!" পাছে এই কৃতকার্য্যতার প্রশংসা তাহার লভ্য হয় এই ভয়ে পাষাণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "আমি কোথায় কষলাম, নিজে করে আমার দোষ।" শচীকান্ত হাসিয়া বলিল, "দোষ কিরে, গুণ বল না। আজ গুরুমহাশয়কে একথা বল্‌তে হ'বে।" পাষাণী তখন গুম্‌ করিয়া শচীকান্তের পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মিথ্যাবাদী! পণ্ডিত মহাশয়কে গিয়ে বলে দিচ্ছি তুমি আঁক কষেছো, আর আমার নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে।" স্কুলে গিয়া পাষাণী ক্লাসের সকল ছাত্রের সম্মুখে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় শচীদা একলা আঁক করতে পেরেছে, আর কেউনা, আমিও না।"

কদাচিৎ শচীকান্ত পাষাণার এই স্বেচ্ছাদত্ত দান স্কুলের প্রথম স্থানটী অধিকার করিতে নারাজ হইয়া উঠিলে পাষাণী অস্থির হইয়া উঠিত। ইদানীং পণ্ডিত মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে পাষাণী আর আগেকার মত 'সর্দ্দার পড়োর' স্থান রাখিতে পারে না, তাই তিনি কোন দিন ইচ্ছা করিয়াই শচীকান্তকে ক্লাসের সকলের নীচে বসাইয়া পাষাণীকে সকলের উপরে বসাইতেন। কিন্তু ইহাতে ফল হইত না। পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্ন করিলে পাষাণী বলিত,

"জানিনা, পণ্ডিত মশাই"

"জানিনা কিরে? এত সহজ পড়া, এও শিখে আসিস্ নি? দিন দিন তোর কি হচ্ছে বল্‌তো? বৃত্তি পরীক্ষায় ত তাহ'লে তুই শচীকান্তকে কিছুতেই এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বিনি।"

বৃদ্ধ শিক্ষক বিরক্ত হইয়া বক্‌বক্ করিতে লাগিলেন, পাষাণী উত্তর দিল না মুখ গোঁজ করিয়া রহিল। ক্লাসের সর্ব্বনিম্নে বসিয়া শচীকান্ত বুঝিল ইহা তাহাকেই প্রথম স্থান দিবার জন্য পাষাণীর চাতুরী মাত্র, তাই সকল ছাত্রের প্রশ্নোত্তর দিবার অক্ষমতা জ্ঞাপনের পর যখন গুরুমহাশয় তাহাকে প্রশ্ন করিলেন তখন সেও উত্তর দিল, "জানিনা।" পাষাণীর এই আত্ম-বিসর্জ্জন ও তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই মিথ্যা অভিনয় এক একবার তাহার পক্ষেও বিরক্তিজনক হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই যে নিজেকে ছোট করিতে চায় তাহার সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। শচীকান্তের উত্তর শুনিয়া পাষাণী ধমক দিয়া উঠিল, "মিথ্যাবাদী! লজ্জা করে না বল্‌তে যে জান না? মেয়েদের সঙ্গে পড়্‌তে এসে ক্লাসে সবচেয়ে নীচে বসে আছ, আর বলা হচ্ছে 'জানি না।' তোমার মত এমন নির্লজ্জ, বোকা, মিথ্যাবাদী ছেলের সঙ্গে যদি আর পড়ি ত আমার নাম মিথ্যা।" বই শ্লেট তুলিয়া লইয়া পাষাণী ছুটিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় ডাকিলেন, সে উত্তর দিল না। ক্লাসের একটি ছেলেকে পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইলে তাহার হাত জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাষাণী বাড়ী ফিরিল। যাইয়া পিসিমাকে বলিল স্কুলে সকলে তাহাকে বড় বিরক্ত করে সে আর পড়িবে না। পিসিমা রামদয়ালকে বুঝাইলেন মেয়ে দশ বছরে পা দিয়াছে আর তাহার পাঠশালায় ছেলেদের সঙ্গে পড়া ভাল দেখায় না; পাষাণীর পড়া বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা শচীকান্ত খেলা করিবার জন্য তাহাদের বাড়ীতে আসিলে পাষাণী তাহাকে গালি পাড়িল, চুল ধরিয়া টানিল, আড়ি দিল, মারিল। শচীকান্ত যখন কিছুই বলিল না তখন নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর কিশোরের ধর্ম্ম অনুসারে কিছুদিন পরে উভয়েরই অজ্ঞাতে একদিন আবার যখন দুইজনের ভাব হইয়া গেল তখন শচী বলিল, "পাষাণী, ইস্কুলে ফিরে চল্।" শুনিয়া পাষাণীর মুখ শুকাইল। জীবনের কত বড় একটা আনন্দকে সে নিজের মুখের কথায় জলাঞ্জলি দিয়াছে তাহা সে ভুলে নাই। পাষাণী বলিল, "দিব্যি কেটেছি যে শচীদা, ফিরে যাওয়া আর হ'বে না।" শচীকান্ত চুপ করিয়া রহিল।

(৩)

পাষাণীর স্বামী নিমাইএর মত এমন নিঃস্ব লোক প্রায় দেখা যায় না। ঘরজামাই রাখিতে পারিবে বলিয়া রামদয়াল তাহার সহিত পাষাণীর বিবাহ দিয়াছিল। রামদয়াল যতদিন বাঁচিয়াছিল ততদিন খাওয়া পরার কষ্ট ছিল না বলিলেও হয়। পিসিমার আগেই কাল হইয়াছিল, বিবাহের এক বৎসর পরে পাষাণী পিতাকেও হারাইল। তাহার পর দরিদ্র কৃষক পরিবারে আমাদের দেশে যাহা সাধারণতঃ হয় তাহাই হইল, মহাজনের দেনার কৃপায় নিমাই ও পাষাণী বাপের ভিটা ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইল। নিমাই গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী 'জন্' খাটিয়া যাহা আনে তাহাতে দুইটি প্রাণীর দুই বেলা আহারের সংস্থান হওয়া কঠিন। কত রাত্রে যে পাষাণী হাঁড়ির সমস্ত ভাত স্বামীর পাতে ঢালিয়া দিয়া, তাহার আহারের পর ভাত খাইবার অছিলায় রান্নাঘরে দেরী করিয়া কেবলমাত্র জল খাইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে নিমাই তাহা জানিত না। গ্রামের প্রান্তে ছোট্‌টো দু'খানি কুঁড়ে ঘর। বৈশাখের ঝড়ে তাহার চাল অর্দ্ধেক উড়িয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহাতেও খড় নাই—ইহাই এখন তাহাদের বাড়ী। ঘর দু'খানির মধ্যে দারিদ্র্যের চিহ্ন মাটির হাঁড়ি ছেঁড়া মাদুর ও কাঁথায় নিদারুণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। নিমাই বাড়ী ছিল না, আজ সকাল বেলায় সে কাজের চেষ্টায় ভিন্ন গ্রামে গিয়াছে, সন্ধ্যা হইয়া গেল এখনও সে ফিরে নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মেঘ করিয়া হাওয়া দিতেছিল, ভাঙ্গা বেড়ার মধ্য দিয়া আঁষাঢ়ের জলো হাওয়া জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতা পাষাণীকে এক একবার কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। ক্ষুদ্র শিশুটিকে সে তখন নিজের বুকের মধ্যে জড়াইয়া শরীরের উত্তাপে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ হইতে সযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

বাহির হইতে কে ডাকিল, "পাষাণী!"

ছেঁড়া কাপড়খানি ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া মাদুরের উপর উঠিয়া বসিয়া পাষাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

কেহ জবাব দিল না, কিন্তু রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া যে ভিতরে প্রবেশ করিল তাহার হাতে লণ্ঠন ছিল, সেই আলোতে পাষাণী চিনিল, শচীকান্ত। পাষাণী বলিল, "শচীদা, তুমি?"

শচীকান্ত কিছু বলিল না, মাদুরের একপাশে নীরবে বসিল।

ঠাণ্ডায় ও গোলমালে খোকা উঠিয়া গিয়া কাঁদিতেছিল, পাষাণী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল; পাশ ফিরিয়া আঁচল আড়াল দিয়া তাহার মুখে স্তন দিল কিন্তু সমস্তদিনের অনশনের পর দুধ শুকাইয়া গিয়াছে; মাই মুখে লইয়া দুধ না পাওয়াতে ক্ষুধার্ত্ত ছেলে বিরক্ত হইয়া হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। উপবাসী মাতা ক্ষুধাতুর সন্তানের ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শচীকান্ত বারণ করিল না, বাধা দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, পাষাণী একটু শান্ত হইলে শচীকান্ত বলিল,

"পাষাণী"

"কি শচীদা ?"

"তোর বড় কষ্ট—নারে ?" শচীকান্তের নিকট কিছু গোপন নাই ইহা পাষাণী বুঝিল, গোপন রাখিবার ইচ্ছাও তাহার ছিলনা। আজ তাহার বড় দুর্দ্দিনেই শচীকান্ত তাহাকে দেখা দিয়াছে। চোখের জল মুছিয়া সে বলিল, "হাঁ, শচীদা"। শচীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা এত কাঁদে কেনরে" ?

পাষাণী বলিল, "সারাদিন কিছু খাইনি, বুকে আমার দুধ নেই, টেনে টেনে কিছু পাচ্ছেনা তাই ক্ষিদেয় কাঁদছে।"

শচীকান্ত বলিল, "তুই যদি আমাদের ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকিস তাহ'লে তোর শরীরও সারে, খোকারও কষ্ট হয় না, যাবি তুই ?"

অন্য সময়ে হইলে হয়তো পাষাণী মনে মনে দ্বিধা করিত, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত হয়ত যাইতে চাহিত না ; কিন্তু আজ বুভুক্ষু শিশুর মমতা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, চিন্তার অবসর কিংবা ক্ষমতা আজ তাহার ছিল না।

পাষাণী বলিল, "তোমাদের বাড়ী ? সত্যি আমাকে নিয়ে যাবে শচীদা ? আঃ! তাহ'লে তো ছেলেটা আমার খেয়ে বাঁচে। তোমার দুটী পায়ে পড়ি আমায় নিয়ে যাও, আর সহ্য হয় না।" বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল তাহার গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর খোকাকে মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া পাষাণী বলিল, "মামাবাড়ী যাবি খুকু ? মামাবাড়ীতে কত দুধুভাত—ধন খাবে, খোকা বাবু খাবে।" বলিতে বলিতে পাষাণীর শুষ্কমুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল।

শচীকান্ত বলিল, "তবে পাল্কি দরজার কাছে আন্‌তে বলি ?"

পাষাণী বলিল "হাঁ।"

পাল্কিতে উঠিয়া পাষাণীর স্বামীর কথা মনে পড়িল, বলিল, "শচীদা, ওঁকে তো বলে যাওয়া হ'লনা, কি মনে—"

শচীকান্ত বাধা দিয়া বলিল, "সে ঠিক হয়ে যাবে এখন, আমি খবর দেব নিমাইকে।"

(৪)

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পাষাণী বলিল; "শচীদা, এতো তোমাদের বাড়ী নয়।"

শচীকান্ত বলিল, "এটা আমার নতুন বাড়ী।"

শচীকান্ত মিথ্যাকথা কহে নাই, পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের সঙ্গে পৃথক হইবার জন্য সে এই নুতন বাড়ী প্রস্তুত করিতেছিল, এখনো তাহা শেষ হয় নাই। একটি ঘরে

তক্তাপোষের উপর পাতা পরিষ্কার বিছানায় পাষাণী খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়া শচীকান্তের আনিয়া দেওয়া গরম দুধ ঝিনুক দিয়া খাওয়াইল, তারপর নিজে খাইল। অনেকদিন পরে পাষাণী আজ বড় আরাম অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল বাহিরে মেঘ কাটিয়া গিয়া যেমন চাঁদের আলোতে পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে, তেমনি শচীদার স্নেহের আলোতে তাহারও সংসারটুকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আজ পুরাতন কথা তাহার মনে আসিতেছিল। পাষাণী হাসিয়া বলিল, "সেই ইস্কুলের কথা মনে পড়ে শচীদা ?"

শচীকান্ত বলিল, "পড়ে।"

পাষাণী এবার খুব হাসিল ; বলিল, "তোমাকে কিন্তু বড় জ্বালিয়েছি তখন—না ভাই ? তা তুমিও কম করনি, তোমার জন্যই শেষে আমাকে স্কুল ছাড়্‌তে হ'লো—মনে পড়ে ?"

সব কথাই আজ শচীকান্তের মনে পড়িতেছিল। পাষাণীর কতবড় আত্মত্যাগ, কতটা ভালবাসিলে মানুষ এমন করিয়া আপনাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে শচীকান্ত তাহা এখনো স্থির করিতে পারে নাই। কিন্তু সে ভালবাসা যে অপূর্ব্ব, তাহা পাইলে যে মানুষ ধন্য হইয়া যায় ইহা সে অনুভব করিতেছিল। শচীকান্ত হঠাৎ মুখ তুলিয়া পাষাণীর চোখের উপর দৃষ্টি রাখিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "তুই তখন আমাকে খুব ভালবাস্‌তিস্ পাষাণা —নারে ?"

পাষাণী তাহার সরল চক্ষু দুটি শচীকান্তের চোখের উপর নিবদ্ধ করিয়া উত্তর দিল, "খু—ব, তখনো বাস্‌তাম, এখনো বাসি শচীদা।"

অন্ধকারে অপ্রত্যাশিত আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পথিক যেমন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়ায় শচীকান্ত পাষাণীর এই সরল স্নেহমাখা কথা কয়টির আঘাতে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল, কিন্তু পরক্ষণেই উত্তেজিত হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সেরকম ভালবাসা নয় রে পাষাণী ;—তুই সে ভালবাসার কি বুঝ্‌বি ? তোকে আমি আজ সাত বছর যে ভালবাসা দিয়ে পূজো করছি, তুই কি তা একেবারেই বুঝ্‌লিনে ? ওরে তোর কি হৃদয় নেই ? তুই কি সত্যিই পাষাণী ?"

পাষাণী কানে হাত দিয়া জিভ কাটিয়া বলিল, "এসব কথা তোমার বল্‌তে নেই শচীদা, আমার একথা শুন্‌লেও পাপ।"

শচীকান্ত বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর তীব্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "পাপপুণ্য আমি জানিনে পাষাণী, আমি জানি শুধু যে আমি আমার সমস্ত বুকের ভালবাসা দিয়ে তোকে ভালবাসি। আমি তোকে চাই, সেই জন্যই আজ আমি তোকে এখানে এনেছি। পাষাণী, আজ তুই একবার বল্ তুই আমাকে ভালবাসিস্, তুই আমার হ'বি।"

শচীকান্ত পাষাণীর দিকে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিল ; পাষাণী পশ্চাতে সরিয়া গিয়া ধমক্ দিয়া উঠিল, "শচীদা তুমি আমাকে ছুঁয়োনা বলে দিচ্ছি।

আমার গায়ে যদি তুমি হাত দাও, তাহ'লে এইখানে আমি আজ রাত্তিরে গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।" শচীকান্ত আর অগ্রসর হইল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল, তাহার পর পাষাণী ডাকিল, "শচীদা"—শচীকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া পাষাণীর মুখের দিকে তাকাইল। কারণ, এই চিরপরিচিত নামটীতে অপরিমেয় মমতা মাখাইয়া পাষাণী তাহাকে ডাকিয়াছিল। শচীকান্ত দেখিল পাষাণীর চোখে অশ্রুবিন্দু। পাষাণী বলিল, "শচীদা, তুমি এইখানটায়—এই তক্তাপোষের উপর বোসো, আমায় তোমার পায়ের কাছে বসতে দাও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

শচীকান্ত তক্তাপোষের উপর বসিল, পাষাণী মাটিতে বসিয়া বলিতে লাগিল, "শচীদা, তোমাকে আমি যে কত ভালবাসি আজ তোমার কাছে তা লুকোলে কিছুতেই চল্‌বেনা। মেয়ে মানুষকে তোমরা বড় ভুল বোঝো শচীদা, তাদের মনটি যে কত কচি বয়সে বড় হয়ে উঠে সে খোঁজ তোমরা পাও না। আমার দশ বছর বয়সের ভালবাসার কাছে তোমার মনটিকে আজও হার মান্‌তে হচ্ছে।" বলিয়া পাষাণী হাসিয়া চোখের জল মুছিল। শচীকান্ত চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল। পাষাণী বলিতে লাগিল, "যখন শুন্‌লাম তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না, তখন আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। একবার ভেবেছিলাম তোমাকে সব কথা খুলে লিখি—তুমি তখন কল্‌কাতায়, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। বিয়ের রাত্তিরে তোমাকে আমাদের বাড়ীতে দেখেছিলাম, তুমি খুব উৎসাহে কোমর বেঁধে কায কর্‌ছো। আচ্ছা, শচীদা, রায়েদের বাড়ীতে রাধারমণের মন্দিরে তোমাতে আমাতে যে সন্ধ্যাবেলা আরতি দেখ্‌তে যেতাম তা তোমার মনে পড়ে ?"

শচীকান্ত বলিল, "পড়ে।"

"মনে আছে আরতির পর যখন আমি ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্‌তে যেতাম, তখন তুমি মানা কর্‌তে শচীদা, বল্‌তে ঠাকুর দেবতাকে ছুঁতে নেই—দূর হ'তে পূজা কর্‌তে হয় ?"

শচীকান্ত ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল যে সকল কথাই তাহার স্মরণে আছে।

পাষাণী বলিল "আমার বিয়ের রাত্তিরে যখন দেখ্‌লাম তুমি নিজে খাট্‌ছো, তখুনি বুঝ্‌লাম এ বিয়েতে তোমার সম্মতি আছে। আমার মনে হ'লো তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে চিরদিনের মতো দূরে সরিয়ে দিলে। তুমি তখন আর আমার শচীদা রইলেনা; আমি মনের মধ্যে তোমাকে দেখ্‌লাম—তুমি আমার রাধারমণ, আমার ঠাকুর, তোমাকে ছুঁতে নেই—সারা জীবন দূর থেকে আমাকে পূজা কর্‌তে হ'বে।"

মুখ তুলিয়া শচীকান্তের দিকে চাহিয়া পাষাণী দেখিল শচীকান্ত নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে।

পাষাণী বলিতে লাগিল, "তুমি জান্‌লে না, কিন্তু তোমার পায়ের ধূলো মাথায় করে নিয়ে আমি তোমার দেওয়া কঠিন বোঝা ঘাড়ে তুলে নিলাম, সংসার পাতালাম। কত দুঃখের সে

সংসার তা তুমি জান শচীদা, তবু এই-ই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, এতেই মেয়েমানুষের পুণ্য। আজ তুমি সেই সংসার নিজের হাতে ভাঙবে? আমাকে পাপে টানবে? আমার রাধারমণ তার সিংহাসন ভেঙ্গে ধূলোয় গড়িয়ে পড়্‌বে? পাষাণী থাক্‌তে তা হ'বেনা শচীদা। মনে আছে জোর করে ইস্কুলে আমি তোমাকে উঁচুতে রেখেছি, আজ আমার সকল জোর দিয়ে আমি তোমার নীচু হওয়া বন্ধ করে রাখবো। আমরা কাদামাটি দিয়ে গড়া মানুষ, আমাদের ধূলোখেলা কি তোমার সাজে ঠাকুর? ছিঃ।" পাষাণী চুপ করিল, শচীকান্ত তখনো কাঁদিতেছিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর পাষাণী ডাকিল, "শচীদা!"

"কিরে পাষাণী?"

"আমার একটা কথা রাখ্‌বে?" শচীকান্ত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পাষাণী বলিল, "উঁহু, তা হ'বেনা, খোকার মাথায় হাত দিয়ে তিন সত্যি কর।" শচীকান্ত তাহাই করিল। তখন পাষাণী বলিল, "শচীদা এই গ্রাম ছেড়ে তোমাকে যেতে হবে। তুমি বড়লোক, তা পার্‌বে, আমরা গরীব, কুঁড়ে দু'খানা সরাবার সামর্থ্য নেই। যতদিন আমি বাঁচবো, তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে না, আমি না খেয়ে মরছি যদি শোন—তবুও না। মরণের দিনেও তুমি আমাকে দেখা দিয়োনা শচীদা—"

শচীকান্ত বাধা দিয়া বলিল, "এত বড় শাস্তি আমায় দিস্‌নে পাষাণী, আমি সইতে পার্‌বো না।"

পাষাণী হাসিয়া বলিল, "শাস্তি তোমার নয় শচীদা, যাকে শাস্তি দিলাম সে যদি সইতে পারে তবে সে তোমারই পায়ের ধূলোর জোরে।"

শচীকান্তকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া সেইখানকার ধূলামাটি লইয়া পাষাণী মাথায় দিল, কপালে মাখিল, গায়ে মাখিল, অনিমেষনেত্রে শচীকান্তের দিকে তাকাইয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে একবার ডাকিল, "ঠাকুর আমার, আমার রাধারমণ।" তারপর ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস

ঈশান

অতীতের আমি ইতিহাস, আমি সাক্ষী অমোঘ জীবনের;
কর্ম্মে গ্রথিত কর্ম্মের হারে সূত্রটি আমি সীবনের।
পরিধিশূন্য বারিধি ভরিতে তোদেরই সঙ্গে জুটেছি;
নাশিতে নারিয়া নরের দুঃখ করুণ চক্ষে ছুটেছি।
ফলিছে করিছে জরা ও মরণ চির চেতনার তরুতে;
কোথা যুগান্ত নন্দিয়া কবে সঞ্জীব হ'ব মরুতে।

বাংলার নবযুগের কথা

নবম কথা

হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

(১)

আজিকালিকার বাঙ্গালী বোধ হয় অনেকেই নবগোপাল মিত্রের নাম জানেন না, কিন্তু বাংলার নবযুগের কথায় তাঁহার জীবন ও কর্ম্ম উপেক্ষা করা সম্ভব নহে; করিলে এই যুগের একটা প্রধান অধ্যায় অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নবগোপাল মিত্র কলিকাতা সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। কলিকাতা বা আদি-ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন মহর্ষিকে ছাড়িয়া আসিয়া নূতন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হ'ন, সে সময়ে মহর্ষির ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবগোপাল মিত্র মহাশয় তাঁহার কর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদিগের যে সাধারণ সভা আহ্বান করেন, সে সভায় নবগোপাল মিত্র মহাশয় উপস্থিত হইয়া কেশবচন্দ্রকে পদে পদে বাধা দিবার চেষ্টা করেন। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে নবগোপাল বাবু সেকালের শিক্ষিত সমাজের নিকটে সুপরিচিত হ'ন। ইহার দুই তিন বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন করিতে উদ্যত হয়েন, তখনও নবগোপাল মিত্র মহাশয় কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষরূপে এই আইন যাহাতে পাশ না হয় তাহার জন্য বিশেষ আন্দোলন করেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রচলিত হিন্দু বিবাহের পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম-বর্জ্জিত অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি নিজের পরিবারে প্রবর্ত্তিত করেন। এই পদ্ধতি শাস্ত্রানুমোদিত, মহর্ষি ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। শালগ্রাম হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের মুখ্য অঙ্গ নহেন। বিবাহ-কালে শালগ্রাম সাক্ষীগোপালের মতন উপস্থিত থাকেন বটে, কিন্তু পূজা অর্চ্চনা প্রাপ্ত হ'ন না। হিন্দু বিবাহের মুখ্য অঙ্গ হোম বা কুশণ্ডিকা এবং সপ্তপদীগমন। মহর্ষি তাঁহার বিবাহ-পদ্ধতিতে এই দুইটী অঙ্গকেই রক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতিকে তিনি সুসংস্কৃত এবং পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত সত্য হিন্দু-বিবাহ-পদ্ধতিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ বিবাহ যে সর্ব্বতোভাবেই আইন-সঙ্গত নহে, মহর্ষি একথা স্বীকার করেন নাই। এই জন্য পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত ব্রাহ্মবিবাহকে আইন-সিদ্ধ করিবার জন্য মহর্ষি ইংরাজের দ্বারে উপস্থিত হন নাই। ইংরাজ বিদেশী রাজা। ইংরাজ রাষ্ট্রপতি হইয়াছে

বটে, কিন্তু সমাজ-পতি হয় নাই ; কখন হইতেও পারিবে না। ধর্ম্ম-সাধনে ও সামাজিক জীবনে বিদেশী ইংরাজ-রাজের কোনও প্রকারের অধিকার ঘুণাক্ষরেও প্রবেশ করিতে দিলে, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ত গিয়াছে বটেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের ও সামাজিক শাসনের স্বাধীনতাটুকুও লোপ পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। এইজন্য মহর্ষি এবং কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ কেশবচন্দ্রের নূতন আইনের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই বিরোধে নবগোপাল মিত্র মহাশয় একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। আর যদিও একটা বিশেষ আইন লইয়া এই বিরোধের উৎপত্তি হয়, ইহার মূলে একদিকে স্বাদেশিকতা ও অন্যদিকে স্বদেশের বৈশিষ্ঠ্য ও জ্ঞান-গরিমার প্রতি উপেক্ষা, এই দুইটী ভাব লুকাইয়া ছিল। মহর্ষি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই কেশবচন্দ্রের এই প্রয়াসের প্রতিবাদী হন। এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে মহর্ষির কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজ গভর্ণর-জেনারেলের নিকটে এক আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনে তাঁহারা বলেন যে—(১) ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজের বহির্ভূত নহেন ; এই আইন পাশ হইলে তাঁহাদিগকে হিন্দু-সমাজ-বহির্ভূত হইতে হইবে, এবং এইরূপে বহির্ভূত হইলে তাঁহাদের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী ; (২) হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিগের বিবাহ-প্রণালী স্বতন্ত্র, অথচ তাহাদিগের জন্য রাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এরূপস্থলে ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রণালী নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি ? (৩) নূতন ব্যবস্থাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকাতে উহা ব্রাহ্মগণের হৃদয়ব্যথা উৎপাদন করিয়াছে। এই আবেদনে আরও অনেক কথা ছিল। কিন্তু উপরিউক্ত তিনটী আপত্তি হইতেই মহর্ষি এবং তাঁহার অনুচরেরা যে স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই বিশেষভাবে কেশবচন্দ্রের এই চেষ্টার প্রতিবাদ করেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। নবগোপাল মিত্র মহাশয় সেকালের এই স্বাদেশিকতার একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। আর এই জন্যই তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই বিরোধে প্রবৃত্ত হ'ন।

(২)

আজিকালি আমরা স্বাদেশিকতা বলিতে কেবল হিন্দুয়ানী বুঝি না। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এভাবটা ফুটিয়া উঠে নাই। সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির এদেশের উপরে কোনও বিশেষ দাওয়াদাবী আছে, ইহা শিক্ষিত-সমাজের মনে উদয় হয় নাই। ইংরাজ যেমন পরদেশী, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত লোকেরা এদেশের মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানকেও সেইরূপ পরদেশী বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের বাংলা সাহিত্য ইহার বিশেষ প্রমাণ। সে কথা ভগবদ্ কৃপায় সময় ও শক্তি পাইলে ক্রমে খুলিয়া বলিব। আর এই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দু ধর্ম্মের

শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম বিবাহবিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই নামের দ্বারাই তাঁহার স্বাদেশিকতার আদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সে সময়ে অন্য আদর্শের অনুসরণ একরূপ অসম্ভব ছিল বলিলেও হয়। ইংরাজেরা এদেশে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই ফলে আমরা বহু শতাব্দীর ঘোর নিদ্রার অবসানে আধুনিক চিন্তা ও কর্ম্ম জগতে জাগিয়া উঠিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষার শত প্রকারের ত্রুটী ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে। আর হিন্দুরাই সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হয়েন। মুসলমানেরা বহুদিন পর্য্যন্ত এই নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহাদের লুপ্ত গৌরবের ও হৃত তক্তখানির স্মৃতি বুকে ধরিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের আত্মমর্য্যাদার অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা প্রথম হইতে ভারতের এই নবজাগরণের মাঝখানে আসিয়া পড়িতে পারেন নাই; শিক্ষিত হিন্দুদিগের সঙ্গেও সাধারণ স্বদেশাভিমানের ভূমিতে আসিয়া মিলিত হন নাই। এই সকল কারণে আমাদের প্রথম যুগের স্বাদেশিকতাকে যে হিন্দুত্বের অভিমানকেই আশ্রয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এইজন্যই আধুনিক বাংলার প্রথম স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহামেলা নামে অভিহিত না হইয়া হিন্দুমেলা নামে অভিহিত হয়।

যেমন নামে সেইরূপ ভাবে ও কার্য্যেও ইহা হিন্দুমেলাই হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই মেলাতে যে সকল বক্তৃতাদি প্রদত্ত হয়, তাহা সকলই হিন্দু ভাবের দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর গুণ গরিমায় পরিপুষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সুপ্রসিদ্ধ ভারত-গাথা—

জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়—

নবগোপাল বাবুর প্রথম হিন্দু মেলার জন্য রচিত হয় এবং মেলার উদ্বোধনের দিনে গীত হইয়াছিল। স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের—

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ,
তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র শস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হায়রে দেশের কি দুর্দ্দিন!

ছুঁচ সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশলাই কাটি তাও আসে পোতে
খেতে শুতে যেতে প্রদীপটী জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল-টেনা ডোর-কোপীন।

সত্যেন্দ্রবাবুর "গাও ভারতের জয়" এবং ৺মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন" এই দুইটী সঙ্গীতের মধ্যেই নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত হিন্দু-মেলার অন্তরঙ্গ ভাবের ও আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিবাবু ভারতের প্রাচীন শৌর্য্য-বীর্য্যের স্মৃতি জাগাইয়া স্বদেশবাসীদিগকে এই নবযুগের নূতন শৌর্য্য-বীর্য্য সাধনায় প্রবৃত্ত করেন। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সাধনার একটা নূতন পাঠশালা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাংলার ছোট লাট ছিলেন। তাঁহার শাসনকালেই আমাদের স্কুল-কলেজে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়। ইংরাজী রকমের ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং বড় বড় স্কুলে এক একজন জিমন্যাষ্টিক মাষ্টারও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্যারেলাল বার (parallel bar) হরাইজণ্টাল বার (horizontal bar) টে্পিজ প্রভৃতি বিলাতী ব্যায়ামের উপকরণ লইয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। নবগোপাল বাবুও একটী ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শঙ্কর ঘোষের লেনের মোড়ে নবগোপাল বাবুর পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল। ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে শঙ্কর ঘোষের লেনের ভিতরে ১ নং বাড়ীতে নবগোপাল বাবুর এই "আখড়া" ছিল। এই আখড়াতে বিলাতী ব্যায়ামের সকল সরঞ্জামই ছিল, কিন্তু নবগোপাল বাবু কেবল বিলাতী ব্যায়াম শিখাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। আখড়ার বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে লাঠিখেলা, তরোয়াল-খেলা, গুলেল-খেলা এবং বন্দুক-ছোড়া পর্য্যন্ত শেখান হইত। নবগোপাল বাবু ঘোরতর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন, এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে ব্রিটিশের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়, অহর্নিশ তাহারই ধ্যান করিতেন। ভারতবর্ষ বাহুবলে ইংরাজের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাঁহার এই ধারণা ছিল। সুতরাং ইংরাজ তাড়াইতে হইলে এই বাহুবলেরই ভজনা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু অন্নবল ব্যতিরেকে বাহুবল লাভ সম্ভব নহে। আবার ইংরাজ আপনার ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে নিরন্ন ও বিবস্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইংরাজের কবল হইতে স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে না পারিলে দেশের লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে না, অন্নবস্ত্রের অভাবে অনশনে ও রোগে শীর্ণ এবং নিদারুণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া রহিবে। সুতরাং স্বজাতির বাহুবলের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। স্বদেশের বিপণি হইতে বিদেশের পণ্যকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে। দেশের কৃষি ও শিল্পের চরম উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। এই সকলই—ব্যায়াম-চর্চ্চা, অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহারশিক্ষা, স্বদেশের পণ্যজাতের পুনরুদ্ধার—নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের স্বদেশ-পূজার মুখ্য উপকরণ হইয়াছিল। এই সকল ভাব ও আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি হিন্দু-মেলার প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩)

হিন্দু মেলাতে স্বদেশী পণ্য প্রদর্শিত হইত, ব্যায়ামাদির পরীক্ষা হইত, এবং স্বাদেশিকতা উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত, পণ্য ও ব্যায়াম প্রদর্শকদিগকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করা হইত এবং যথাযোগ্য মূল্যবান পুরস্কারও দেওয়া হইত। বৎসরে একবার করিয়া মেলা বসিত। কিন্তু বৎসর ধরিয়া নবগোপাল বাবু এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা ইহার আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। শঙ্কর ঘোষের লেনের আখড়ায় ব্যায়াম-চর্চ্চা হইত। তখনও অস্ত্র-আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক-ছোড়া বা তরোয়াল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু মেলার বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তারা পাখী শিকারের ভান করিয়া বন্দুক-ছোড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন। এই হিন্দু মেলাতেই প্রথম নূতন রকমের তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল এরূপ মনে পড়ে। ত্রিপুরা জিলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতনামা ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া—অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া—মহেন্দ্র বাবু তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় চিলেন। একটা তাঁত তিনি প্রস্তুত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে যেন মহেন্দ্র বাবুর এই নূতন তাঁত হিন্দু মেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সঠিক কহিতে পারি না; কিন্তু এরূপও শুনিয়াছি যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দু মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন। তাহা অসম্ভব নহে; কারণ তখন নবগোপাল বাবু ও তাঁহার সঙ্গীরা নূতন স্বদেশীভাবে একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে এই সময়েই জ্যোতি বাবুরা নন্দী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রবিবারে রবিবারে ধাপার মাঠে শিকার করিতে যাইতেন।

(৪)

কয়বার এই মেলাটা বসিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। শেষবারের মেলাতে একটা জাঁকালো রকমের মারামারি হয়। তার পর হইতেই হিন্দু-মেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই মেলাতে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। টালায় রাজা বদনচাঁদের বাগানে এই মেলা বসে। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহযোগে কলিকাতার ছাত্রমহলে একটা নূতন স্বদেশ-প্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন। সে কথা সবিস্তারে আর একদিন কহিব। আমরা কেবল সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়াই ক্ষান্ত রহি নাই। স্বদেশের উদ্ধারের জন্য যৌবন-সুলভ উৎসাহ ও কল্পনার প্রেরণায় যথাসম্ভব আয়োজন এবং উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। এই ভাবের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের "আখড়া"য় যাইয়া ভর্ত্তি

হই। এই সূত্রেই সেবারকার হিন্দু-মেলাতেও আগ্রহসহকারে যোগদান করি। মনে পড়ে যেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এবারে বোধ হয় তিনি কোনও বক্তৃতা করেন নাই। কে কি বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা কিছুই মনে নাই। মনে আছে কেবল মারামারির কথা। আর একরূপ আমা হইতেই এই মারামারির হয় বলিয়া তাহার ইতিহাসটা আমার জীবনের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরের পরে ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন হয়। বাগানটা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল বাঙ্গালীরাই যে মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা নহে; দু'দশজন ইংরাজ দর্শকও উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ দর্শকদিগের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব স্যারজন ষ্ট্রাচি, এই দুই জনের নাম মনে আছে। বক্তৃতাদি ঘরের ভিতরে হইয়াছিল। বাহিরের ময়দানে ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন হয়। আমি একখানা চৌকি লইয়া ব্যায়াম দেখিবার জন্য বাহিরে যাইয়া এক যায়গায় বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন হ্যাটকোটধারী পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমার পিছনে দাঁড়াইলেন। ইঁহারা ইংরাজ কি ইউরেষিয়ান ছিলেন, ঠিক বলিতে পারি না। পুরুষটি অতি রূঢ়ভাবে আসিয়া আমাকে চেয়ারটা ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না, যেমন বসিয়াছিলাম তেমনই বসিয়া রহিলাম। তখন সাহেবটি আমাকে চৌকি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিলেন। আমি তখন উঠিয়া চৌকিখানার সামনের পা দু'খানি শক্ত করিয়া ধরিলাম ও নীরবে চেয়ারখানিকে তাঁহার হাতছাড়া করিবার জন্য শরীরের সকল বল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। আমরা দু'জনে চেয়ার লইয়া টানাটানি করিতেছি দেখিয়া দু'একটি বাঙ্গালী যুবক আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের একজন সাহেবের হাতে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সাহেব তখন চেয়ারখানি ছাড়িয়া দিয়া ছেলেদের সঙ্গে ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিলেন। আমি তখন চেয়ারখানি লইয়া জনতার বাহিরে আসিয়া একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইলাম। তখন সাহেব-বাঙ্গালীতে পুরাদস্তুর মারামারি সুরু হইয়াছে। তারপর পুলিস আসিয়া হাজির হইল। লাইন্যাম নামে একজন ইংরাজ চিৎপুর অঞ্চলের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি মেলাতে উপস্থিতও ছিলেন। মারামারি আরম্ভ হইলে সেখানে ছুটিয়া যান। ইহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু তিনি সেখানে যাইয়াই সাহেবদের পক্ষ অবলম্বন করেন; এবং শুনিয়াছি যথাসাধ্য বাঙ্গালীদিগকে মারিয়া তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করেন। বাঙ্গালীরা তখন লাইন্যাম সাহেবকেও শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়। সে সময়ে কলিকাতার বাঙ্গালী পড়ুয়ার দলে একজন অসাধারণ শক্তিশালী পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার হাতে লাইন্যাম নিরতিশয় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন; শুনিয়াছি তিনি লাইন্যামের দুটা হাতে ধরিয়া কাঠুরিয়ারা যেমন করাত দিয়া কাঠ চিরে, সেইরূপ ভাবে একটা আমগাছে ঘষিয়াছিলেন। সামান্য, মারামারির জন্য যতটা না হউক, স্থানীয় পুলিসের সাহেবের এই লাঞ্ছনার দরুণই পুলিসের হল্লা হয়। হনুমান

সিংএর দল খালি গায়ে মালকোচা মারিয়া, কোমরে চাপরাশ বাঁধিয়া বাগানে যাইয়া উপস্থিত হন। শত্রুপক্ষের এই নূতন শক্তি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী যোদ্ধৃবর্গ একটা ইটের ঢিবির উপর যাইয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই ইট ছুড়িয়া পুলিসের দলকে আটকাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাগানের ফটকের কাছে কোনও ইট পাটকেল ছিল না। ফটকের সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে বাঙ্গালা যোদ্ধাদিগের ব্যূহ। পুলিসেরা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ ধরিয়া এই লড়াইটা চলিল। শুনিয়াছি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত নাকি ইহা চলিয়াছিল। শুনিয়াছি বলিতেছি এইজন্য যে আমি এই যুদ্ধের প্রথমেই পুলিসের হাতে বন্দী হই। আমা হইতেই মারামারির সূত্রপাত্র ; মারামারির মূল কারণ চেয়ারখানি আমি হল্লার বাহিরে আসিয়াও প্রাণ দিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে একজন পুলিসের জমাদার ও দুইজন কনেষ্টবল একটী যুবকের পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া বেদম মুষ্ট্যাঘাত করিতেছে। আমার মনে হইল যে ওই যুবকটী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস। আমি অমনি সেই চেয়ার লইয়া যাইয়া সেই জমাদার ও কনেষ্টবলদের আক্রমণ করিলাম। তাহারা তখন সেই যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে ধরিল ; আর অমনি আরও পাঁচ ছয়জন পুলিস আসিয়া আমাকে ঘেরাও করিল। যে যুবকটিকে পুলিস মারিতেছে দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া গিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম সে সুন্দরীমোহন নহে। সুন্দরীমোহন তখন অন্যত্র মারামারির বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে পুলিস ঘেরাও করিয়া মারিতেছে দেখিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া নিজের শরীর দিয়া আমার শরীরকে রক্ষা করিতে গেলেন। তখন পুলিস তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল। এইরূপে আমরা দু'জনে সকলের আগে বন্দী হই। আমাদের দু'জনকে যখন পুলিস থানায় লইয়া যায়, তখনও দলে দলে হনুমান সিংএর দল বদনচাঁদের বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহার পরেই লড়াইটা ভাল করিয়া জমাট বাধে। কাজেই সকল ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখি নাই। লাইন্যামের লাঞ্ছনাও দেখি নাই ; বাঙ্গালী যুবকদিগের রণনীতিও দেখি নাই। কি করিয়া যে তাহারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অব্যর্থ সন্ধান ইট ছুঁড়িয়া পুলিসের কটককে ফটকের মুখে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাও দেখি নাই। এ সকল পরে শুনিয়াছি।

এই মারামারির সংস্রবে সুন্দরীমোহন এবং আমি ছাড়া আরও দুইজন গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের একজন নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের কুটুম্ব ; তাঁহার জামতার সহোদর। ইনি হাওড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক বা জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার ছিলেন। শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে আমাদের বিচার হয়। শোভাবাজারের রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তখন শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নবগোপাল বাবুর কুটুম্বের পঞ্চাশ টাকা ও আমার কুড়ি টাকা জরিমানা হয়। সুবিচার হইয়াছিল কিনা সে কথা তুলিতে চাহিনা।

(৫)

নবগোপাল বাবুর একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজ ছিল; নাম—National paper. (ন্যাসনাল পেপার) কাগজখানির ইংরাজি প্রায় আগাগোড়াই ভুল থাকিত। ইহাও তাঁহার স্বাদেশিকতারই একটা লক্ষণ ছিল। বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল। না। এই স্বাদেশিকতাই নবগোপাল মিত্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। আর সে যুগের বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে হাতে কলমে এই স্বাদেশিকতার আদর্শটাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এইজন্য বাংলার নবযুগের ইতিহাসে নবগোপাল মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার হিন্দু মেলাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ডাক পেয়াদা

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা তপ্ত মাটি ফাটুচে রোদে,
রক্ত আঁখির ভীষণ রোষে সকল ধরা চক্ষু মোদে।
দরজা-আঁটা সব ঘরেতেই মগ্ন সবে নিদ্রাসুখে'
প্রাণের মৃদু শব্দটুকু নাইক যেন দিনের বুকে।
অগ্নিশিখা লক্‌লকিয়ে জ্বলছে সুদূর দগ্ধ মাঠে,
এমন সময় একমনে কে চল্‌ছে ছুটে তপ্ত বাটে?
সুদূর পানে নিমেষহারা দৃষ্টিখানি বদ্ধ আছে,
ডাক পেয়াদা;—সুধার বাটী দেবতা দিলেন ওরই কাছে।
ওর রূপেতেই উজাড় হ'ল লাবণ্যেরি সোনার খনি,
ও-ই হৃদয়ের তৃষ্ণাহরা, স্বপ্নভরা চোখের মণি!
ও-ই মরমী মরম বোঝে প্রাণটা শুধুই দরদভরা
ছুটছে পথে দারুণ রোদে তরুণ হৃদি আকুল করা
চোখের কাছে উঠ্‌চে ভাসি, মিষ্টি করুণ পূর্ণ দিঠি
ওর্ কাণেতে ফিস্‌ফিসিয়ে বল্‌ছে কথা কতই চিঠি!
কেউবা জানে নবীন প্রেমের চুম্বনেরি গোপন কথা
কেউবা জানে শূন্য রাতের অশ্রুকরুণ ব্যাকুল ব্যথা,
অভিমানের কেউবা পুঁজি, কেউ করেছে মিষ্টি আড়ি
মিথ্যে রাগে অন্ধ হয়ে হচ্ছে কারো মুখটি হাঁড়ি।

এমনি ক'রে গুঞ্জরণে কতই কথা বাজছে কানে
চতুর ঠারে গোলাপমুখী কেউবা খর দৃষ্টি হানে !
ডাক পেয়াদা মত্ত আছে সব চিঠিরই গুপ্তপ্রেমে,
হর্ষ ব্যথা গোপন কথা মূর্ত্তি ধরে আস্‌চে নেমে ।
তাইত ছোটে ক্লান্তিবিহীন ডাক পেয়াদা অচিন দেশে,
শূন্য মাঠের সঙ্গে যেথায় ঝল্‌সে যাওয়া আকাশ মেশে ।
দুপুর বেলায় স্বপ্নপুরে ও-ই ছোঁয়াল সোনার কাঠি,
ওর চোখেতেই শীতল হ'ল গ্রীষ্মকালের তপ্ত মাটি !
আধেক ঘুমে—'ঝুমুর'—শুনে সুপ্তমুখে ফুট্‌চে হাসি,
জাগ্‌ছে আশা এই বুঝিবা তৃপ্ত হ'ল প্রণয় রাশি !
ঘুমন্ত এ পুরীর মাঝে আস্‌ছে গো কোন রাজার ছেলে,
জাগবে বুঝি নিদ্রালসা ওর চোখেরই দৃষ্টি পেলে !
আপন মনে নিঝুম হয়ে একলা ঘরে বসে আছি,
দৃষ্টি হারা চক্ষু ঘোলা, আস্তি কালের বৃদ্ধ মাছি !
ইচ্ছে করে দুপুর তাতে ওর মতনই যাইগো ছুটে,
পরাণ চাহে ওর মতনই রোদের গায়ে উঠতে ফুটে !
ক্লান্ত পথের বাঁকের কাছে মাঠের শেষে হাত ছানিতে,
ডাক্‌বে মোরে রৌদ্রশিখা দৌড়ে যাব হৃষ্ট চিতে ।
ওর সাথে খুব খাতির ক'রে ভাগ বসাব গোপন প্রেমে,
কর্‌ব আদর মোর প্রিয়ারে শীতল গাছের ছায়ায় থেমে ।
ঘোম্‌টা টানা খামের চিঠি মুগ্ধ করে শোভন সাজে,
আমার বুকের হর্ষ ব্যথা ক্ষুদ্র ওরি বক্ষে বাজে ।
তাই আজি ওই ডাক পেয়াদা রঙ ফলাল আমার প্রাণে,
দুপুর বেলার শূন্য গো ও-ই ভরল নিবিড় মুগ্ধ গানে ।
দিচ্চে ঢেলে আমার প্রাণে স্বপ্নপুরীর স্নিগ্ধ সুধা,
শান্ত হ'ল ওর দিঠিতে তপ্তদিনের ভীষণ ক্ষুধা ।
ছুট্‌চে পথে ডাক পেয়াদা স্বপ্নভরা চোখের মণি,
ওর রূপেতেই হচ্চে উজাড় লাবণ্যেরি সোনার খনি !

শ্রীগণেশচরণ বসু

আবিষ্কারের প্রথম স্তর।

বর্ত্তমান জগৎ আর শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের জগতের মধ্যে অনেক প্রকারে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এখন মোটামুটি বলিতে হইলে পৃথিবী ক্রমেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। তখন যাহা ছিল না, এখন তাহার অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। তখন যাহা ছিল, তাহাও অনেক অপূর্ব্ব প্রকারে সংস্কৃত হইয়া এখন নূতন আকারে মানুষের সেবায় লাগিতেছে। তখন যে যে কার্য্যের জন্য যে সব দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, তাহার কথা শুনিতেও যেমন কৌতূহল হয়, আজিকার যুগের বহু প্রকারে উন্নত বিবিধ আবিষ্কার যে ভাবে আবিষ্কারক কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার কথা জানিতে বা তাহা দেখিতে পাইলে তেমনই বিশেষ আনন্দলাভ হইয়া থাকে। কোন বিশাল সাম্রাজ্যের বা একটা মহাজাতির উৎপত্তি ও আদি কথা, কোন বিরাট মানবের শৈশব কথা, কোন ইতিহাসবিখ্যাত নগরের পত্তন বা প্রসিদ্ধ সৌধের সৃষ্টি কথা, এমন কি একটা ঐতিহাসিক বা অতি বৃহৎ তরুর উৎপত্তির বিবরণ,—সকলই শুনিতে অতি মনোরম।

অতি প্রয়োজনীয় যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অধুনা মানুষের জীবনের সকল দিক বহু অংশে পরিবর্ত্তিত বা আলোড়িত করিয়া দিয়াছে, সেই সকল সর্ব্বপ্রথম কি ভাবে উদ্ভাবিত হইয়া ক্রমে উন্নত হইয়াছে, কোন পুরাতন বৈদেশিক মাসিকের পৃষ্ঠায় তাহার চিত্রাদি সংবলিত বিবরণ পাঠে লোভ সংবরণ করিতে না পারায়, তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।
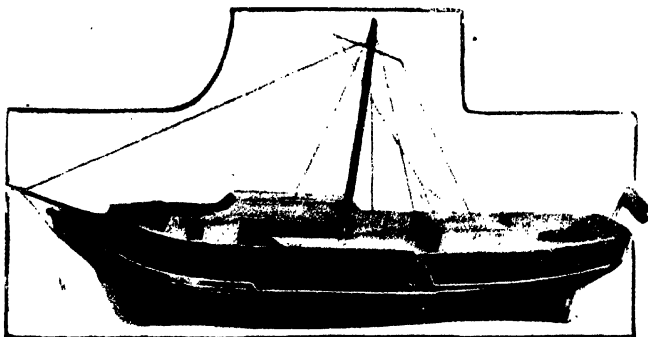
ইউরোপের প্রথম সওদাগরী জাহাজ "কসেট।"

যে সকল আবিষ্কারের কথা লিখিত হইবে তাহার উপকারিতা যথেষ্ট হইলেও, সকল গুলিই আমাদের দেশের উন্নতির কারণ স্বরূপ হইয়াছে কিনা তাহার আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়, ইহা বলিয়া রাখা ভাল।

যে কোন কলকারখানা, যন্ত্রপাতি পরিচালনের জন্য কোন একটা শক্তির প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথম মানুষের হাতই সেই শক্তি দিবার একমাত্র আধার ছিল। তৎপরে অশ্বগবাদি পশুর শক্তি নিয়োজিত হয়, এবং যতদিন পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শক্তির কথা অজ্ঞাত ছিল ততদিন উহা এবং ক্রমে বায়ু ও জলস্রোতের শক্তি মানুষের কাজে লাগিতেছিল।

যে বাষ্পের ব্যবহার বর্ত্তমান ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির মূল কারণ, যাহার প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকার আজ এত সম্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহা প্রথম শিল্পযন্ত্রাদিতে কার্য্যে লাগানর কথা খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এলেকজেণ্ড্রিয়ার হিরো কর্ত্তৃক লিখিত একখানি বায়ুবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকে প্রথম দৃষ্ট হয়। মিশর দেশের মন্দিরে দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলির স্পন্দন দ্বারা দর্শকের মনে ভাব বিপর্য্যয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মযাজকগণ বাষ্পের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই মূল্যবান শক্তি উৎপাদক সামগ্রীর কথা সাধারণের এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে মারকুইস্ অব উরষ্টার (Marquis of Worcester) বাষ্পের সাহায্যে চালিত একটি জলোত্তোলন যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ইহাই বাষ্প-সাহায্যে পরিচালিত যন্ত্রের প্রথম সফল উদাহরণ। ইহার পর হইতেই বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহারের দ্রুতভাবে বৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে থাকে।

ঘোটকহীন বাষ্পীয় শকট সর্ব্বপ্রথম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস্ জোসেপ্ (Nicholas Joseph) নামক একজন ফরাসী এঞ্জিনীয়ার প্রথম পরিকল্পিত করিয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে উহার বিশেষভাবে উন্নতি সাধন করেন। সাধারণ রাস্তায় মাত্র ঘণ্টায় সওয়া দুই মাইল পথ চারিজন লোককে লইয়া যাইবার ইহার ক্ষমতা ছিল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালের উইলিয়ম মরডক্ (William Murdock) আর একখানি বাষ্পশক্তি-চালিত-যান তাঁহার নিজ আদর্শমত প্রস্তুত করেন। উহা ক্ষুদ্রাবয়বের জিনিষ; এক হইতে দুই মাইল মাত্র অতি সামান্য ভার লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ইহাই ইংলণ্ডের ঐ শ্রেণীর প্রথম আবিষ্কৃত যান।
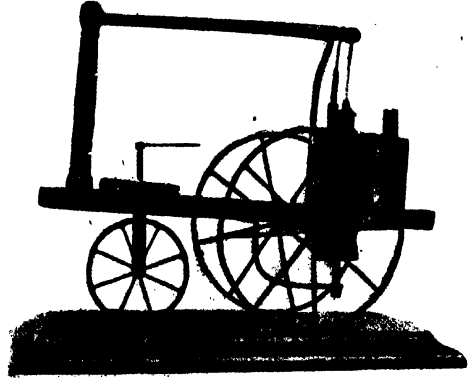
উইলিয়ম মরডকের আবিষ্কৃত প্রথম বৃটিশ বাষ্পশক্তি
(পরিচালিত গাড়ী)

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্যার গোল্ডস্ওয়ারথি গার্নি (Sir Goldsworthy Gurney) একখানি বাষ্পীয় যান নির্ম্মিত করেন এবং তাহা তিন বৎসর পরে গ্লাউচেষ্টার হইতে চেল্টেন্হাম্ পর্য্যন্ত রীতিমত ভাবে চালিত হইবার ব্যবস্থা হয়। উহারই কিছু পরে লণ্ডন সহরে প্রথম ঘণ্টায় ১২ হইতে ২৫ মাইল গতিতে যাইবার মত গাড়ীর চলাচল আরম্ভ হয়। এই সময় গভর্ণমেণ্ট উচ্চহারে শুল্কস্থাপন করায় এবং ঘণ্টায় ৪ মাইল মাত্র গতি আইনদ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ায় ও প্রত্যেকবার গাড়ি চলিবার কালে তাহার অগ্রে একটি লাল নিশানধারী লোক যাইতে বাধ্য করায় এই নব উদ্ভাবিত যানের উন্নতি বিষয়ে গুরুতররূপে বাধা হয়।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড ট্রেভিথিক্ (Richard Trevithick) বাষ্পীয় শকটের জন্য প্রথম লৌহ পথের কল্পনা করেন এবং পেনিড্রাম ও মার্থার টিড্ভিলের মধ্যে প্রথম লৌহপাত নির্ম্মিত পথ প্রস্তুত হয়। ২৫ টন ভারবাহী এঞ্জিন তাহার উপর চালিত হইতে থাকে। কিন্তু এই পথ অতি সত্বর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকায় অশ্বচালিত গাড়ির অপেক্ষা ব্যয়াধিক্যহেতু ব্যবসার হিসাবে ইহা অসুবিধাজনক বিবেচিত হইল। চারি বৎসর পরে আবিষ্কারক ইস্টন্স্কয়ারে বৃত্তাবৃত্তি রেলপথ বসাইয়া ঘণ্টায় ১২ মাইল গতিতে গাড়ি চালাইয়া সাধারণকে উহা দেখাইবার এবং অল্প মূল্য দিয়া উহাতে আরোহণ করিবার সুযোগ করিয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রথম বাষ্পচালিত যাত্রী গাড়ি।
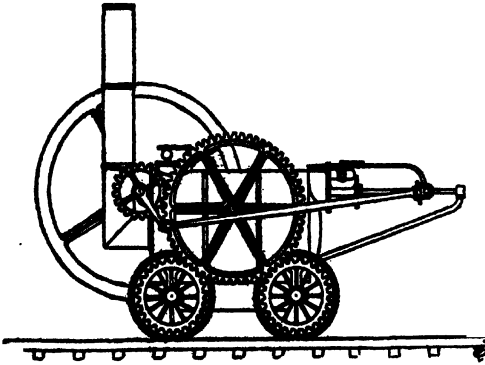
রিচার্ড ট্রেভিথিক্ আবিষ্কৃত প্রথম রেলওয়ে এঞ্জিন।

সাধারণের জন্য প্রথম রেলগাড়ি ষ্টক্টন্ ও ডার্লিংটনের মধ্যে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। উহাতে প্রথম 'লোকোমোশন' নামক একখানি মাত্র এঞ্জিন ব্যবহৃত হইত। উহা, আর, ষ্টিথেন্সন্ কোম্পানির দ্বারা নির্ম্মিত হয়। প্রথম মাল বহনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া অতি শীঘ্র ইহা যাত্রী গাড়িতে পরিণত হইয়াছিল। উক্ত "লোকোমোশন" এঞ্জিনখানি এখনও ডার্লিংটনে ঠিক ব্যবহারোপযোগী অবস্থাতেই আছে।

সুপ্রসিদ্ধ "পাফিং বিলি" (Puffing Billy) নামক আর একখানি এঞ্জিন—যাহাকে ভুলক্রমে লোকে প্রথম গঠিত এঞ্জিন বলিয়া থাকে—উহা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইলাম্ কয়লার খাদে উইলিয়ম্ হেড্লে (William Hedley) দ্বারা গঠিত হয় এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া এক্ষণে সাউথ্ কেনশিংটন্ যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

উক্ত ধারাবাহিক বিবরণগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে সাধারণতঃ লোকের যে জানা আছে জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্স্ই বাষ্পীয়যানের প্রথম আবিষ্কারক, তাহা ভ্রমাত্মক।

বিদ্যুৎদ্বারা শক্তি সঞ্চালনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও গত শতাব্দীর প্রথম হইতে উহার বিবিধ প্রকারে পরীক্ষা চলিতেছে। চুম্বকদণ্ডের নিকট কুণ্ডলীকৃত তার সঞ্চালনে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কথা ফ্যারাডে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। ঐ শক্তির সাহায্যে অদ্যাবধি বহু অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার যাহা হইতেছে ও হইয়াছে এই সকলেরই মূল ফ্যারাডের আবিষ্কার।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ওয়াইল্ড (Dr. Wilde) প্রথম ডাইনামোর আবিষ্কার করেন এবং পর বৎসর বিলাতের রয়েল্ সোসাইটিতে ব্যক্ত করেন যে, এইরূপ একটি ছোট যন্ত্র হইতে

উৎপন্ন সামান্য শক্তিকে অন্য প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যায়। দুই বৎসর পরে স্যার চার্লস্ হুইট্‌ষ্টোন্ (Sir Charles Wheetstone) রয়েল সোসাইটিতে স্ব-চালিত ডাইনামো প্রথম উপস্থাপিত করেন।
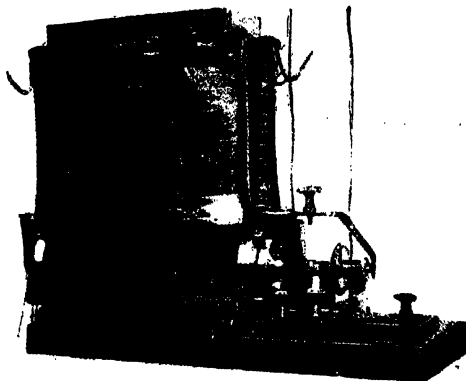
প্রথম স্ব-চালিত ডাইনামো (স্যার চার্লস হুইটষ্টোন দ্বারা ১৮৬৭ সালে আবিষ্কৃত)

জলোত্তোলনের জন্য বাষ্প সাহায্যে প্রথম পাম্পযন্ত্র ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে টমাস্ সাভ্‌রি (Thomas Savery) প্রথম আবিষ্কার করেন। খনির ভিতর হইতে জল তুলিয়া ফেলিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট কার্য্যকরী হইয়াছিল।

অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য দমকলের কথা পূর্ব্বোল্লিখিত হিরোর গ্রন্থে পাওয়া যাইলেও ইংলণ্ডে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড নিউশ্যাম্ (Richard Newsham) উহার প্রথম আবিষ্কার করেন। তদনীন্তন ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জর্জ্জের নিকট ইহা প্রদর্শিত হয় এবং সেণ্ট্ জেমস্ প্রাসাদের জন্য তিনি একটি কলের ফরমাইস করেন। ইহার আবিষ্কার তখন এত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, যে তৎকালীন কোন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, বৃটনের একটি প্রদেশ লাভ হওয়ার অপেক্ষা ইহা অধিক লাভের হইয়াছিল।
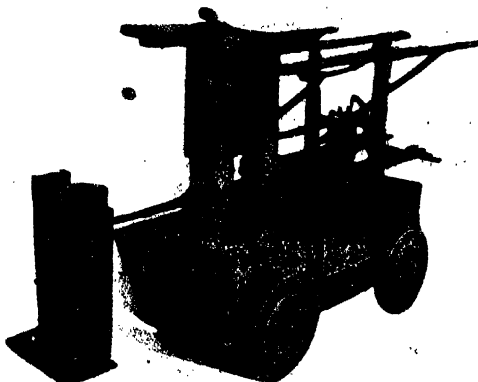
রিচার্ড নিউশ্যাম আবিষ্কৃত প্রথম দমকল

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্ ব্রেথওয়েও জন্ ইরিক্‌শন্ (Messrs John Braithwaite and
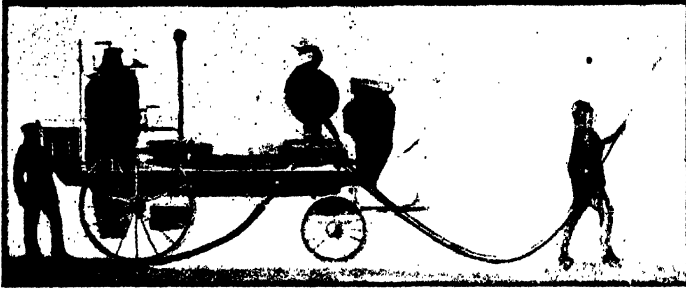
১৮২৯ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত দমকল।

John Ericsson) বাষ্পচালিত এক বৃহদাকার দমকল নির্ম্মাণ করেন, ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ হইতে ৪০ টন জল ৯০ ফুট উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইত।

ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে বহু আবিষ্কার নিত্য সাধিত হইলেও, যে কার্পাস-শিল্প এ কালে ইংলণ্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহা যে সময়ে পুরাকালে ভারতবর্ষে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে সময় ইংলণ্ডে ইহা একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল বলিলেও অন্যায় হয় না। তখন তথায় তুলা পিঁজিয়া হাতে পাকাইয়া অতিনিকৃষ্ঠ শ্রেণীর সূতা প্রস্তুত হইত। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সেখানে এক খাই সূতা তৈয়ারির চরকার প্রথম প্রচলন হয়। তৎপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে সূতা তৈয়ারি ও বস্ত্র শিল্পের জন্য ক্রমেই বহু প্রকার যন্ত্র তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে স্যার রিচার্ড্ আর্করাইট্, (Sir Richard Arkwright) বিবিধ আবিষ্কার দ্বারা ঐ শিল্পের যুগান্তর আনিয়াছিলেন। তিনিই সূতা কাটা যন্ত্রের উদ্ভাবনা করেন।
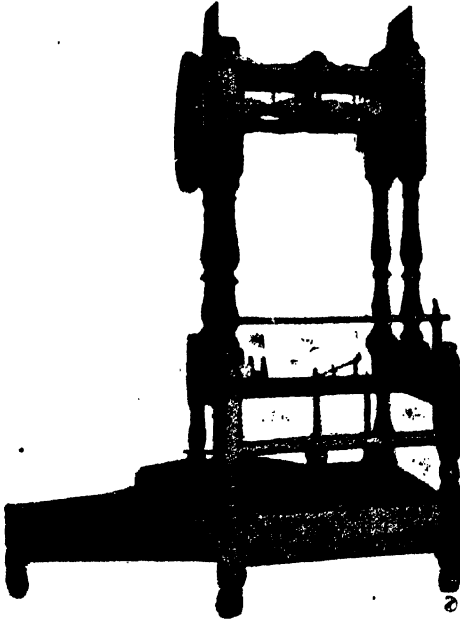
স্যার রিচার্ড আর্ক রাইটের সূতা কাটা যন্ত্র।

বস্ত্র শিল্পের উন্নতির সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য আনয়ন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সেলাইয়ের উৎকর্ষ সাধন একান্ত প্রয়োজন। প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে সেলাইয়ের জন্য অস্থি
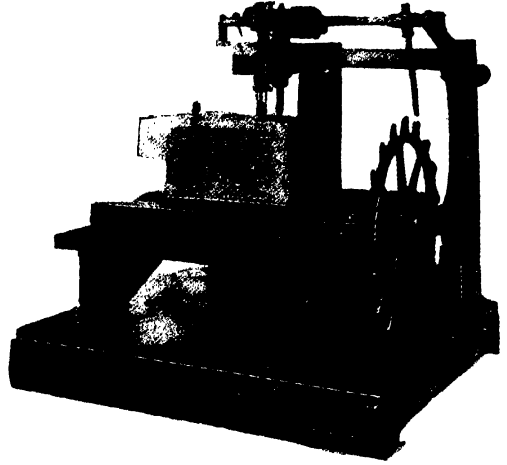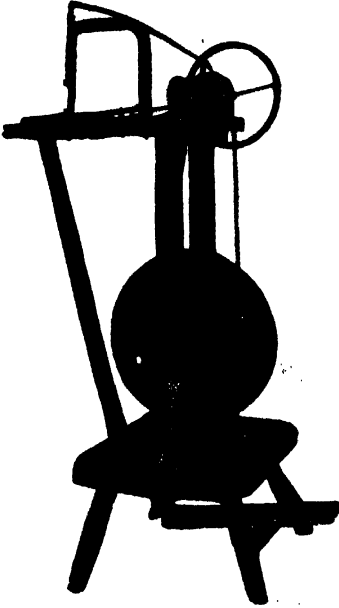
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে আবিষ্কৃত সেলায়ের যন্ত্র।

টমাস সেণ্ট কর্ত্তৃক ১৭৯০ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত সেলায়ের যন্ত্র

নির্ম্মিত এক প্রকার ছুঁচ ব্যবহৃত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে ষ্টীলের ছুঁচ ইংলণ্ডে প্রথম নির্ম্মিত হয়। ২০০ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া রেডিচ্‌ নামক স্থানে উহা প্রস্তুত হইত।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টমাস্ সেণ্ট্ (Thomas Saint) নামক লণ্ডনের এক কারিগর প্রথম সেলায়ের কল তৈয়ারি করিবার চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া উহার পেটেণ্ট্ গ্রহণ করেন। উহাতে এক খাই সূতায় কাজ হইত, কিন্তু কোন কোন বিষয় অসম্পূর্ণ থাকায় কাজের বেশ সুবিধা হইত না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইলাএস্ হো (Elias Howe) প্রথম পূর্ণাঙ্গ সেলাইএর কল আবিষ্কার করেন।
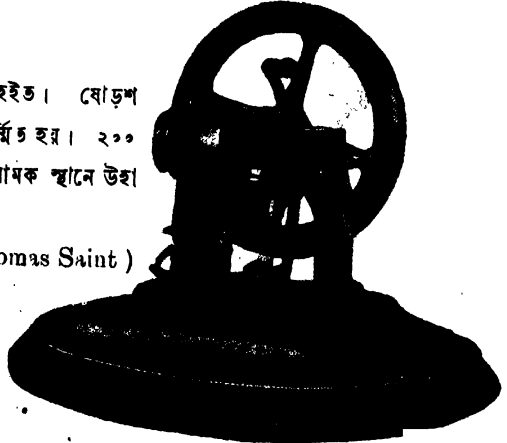
ইলাএস্ হোর আবিষ্কৃত সেলায়ের যন্ত্র।

১৪২৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম ব্যবহারের কথা জানা যায়। সে সময় ছাপিবার সমস্ত বিষয়টা একখণ্ড কাষ্ঠে খোদাই করিয়া ছাপা হইত। ইহাতে কাজের পক্ষে বেশ সুবিধা না হওয়ায়, বিশেষ একবার ব্যবহারের পর এ ব্লক্ অব্যবহার্য্য হওয়ায় উহার অপরবিধ উন্নতির চেষ্টা হইতে থাকে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত এ শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সীসার দ্বারা নির্ম্মিত প্রত্যেক স্বতন্ত্র অক্ষরের সাহায্যেছাপিবার প্রণালী ইংলণ্ডে উইলিয়ম্
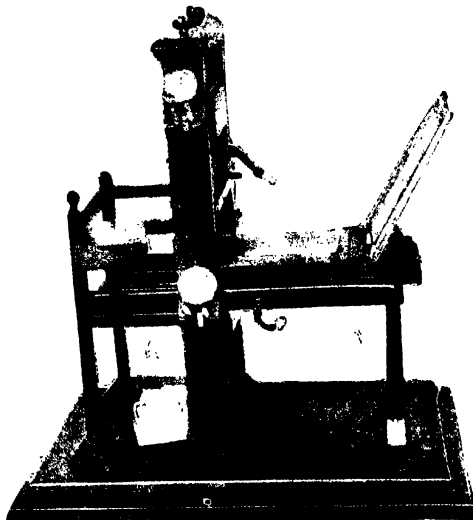
১৪৭৪ খৃঃ অব্দে ক্যাক্সটনের ব্যবহৃত প্রথম হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র।

ক্যাক্সটন্ (Willam Caxton) দ্বারা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমে জার্ম্মাণী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে পর পর বিবিধ উপায়ে ছাপার উৎকৃষ্ট ও আবশ্যক যন্ত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে।
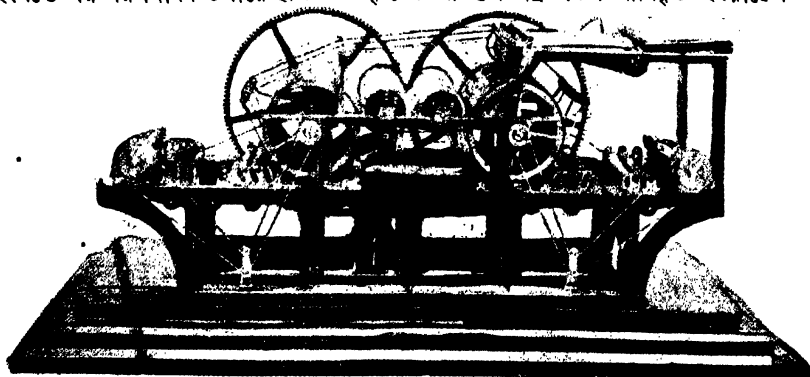
কাগজের দু'পিঠ একসঙ্গে ছাপিবার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। (১৮১১ খৃঃ)

ছাপাখানার পর টাইপ্ রাইটারের মত কোন যন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব হওয়া স্বাভাবিক। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে হেনরি মিল্ (Henry Mill) প্রথম যন্ত্র সাহায্যে লিখিবার একটি কল আবিষ্কার করেন। এই কলের নমুনা বা কোন নক্সা প্রভৃতি কোথাও এক্ষণে আর দেখা যায় না। সুতরাং উহা কিরূপ ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। যে আদিম টাইপ রাইটারের কথা এখন জানা আছে, উহা অন্ধদিগের লিখিবার উদ্দেশ্যে প্রথম কল্পিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইয়র্ক সহরের লিট্‌লডেল্ সাহেব (Mr. Littledale) উহার আবিষ্কার করেন। উহাতে কাষ্ঠের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস্ হুইট্‌ষ্টোন্ (Sir Charles Wheatstone) টেলিগ্রাফের কার্য্যের সুবিধার জন্য অপর প্রকার কল উদ্ভাবন করেন। এতাবৎ এই সকল লিপি যন্ত্রে সাধারণের বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। পরে যে যন্ত্র লোকের প্রকৃত অভাব দূর করিতে সমর্থ হয় এবং সাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হয়, তাহা সি, ল্যাথাম্ সোলস্ ও কার্লস গ্লিডেন (C. Latham Sholes and Carlos Glidden) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া নিউ ইয়র্কের ই, রেমিংটন্ এণ্ড সন্সের কারখানায় প্রস্তুত হয়। উহা আজিও অন্যান্য বহু প্রকার টাইপ্ রাইটারের তুলনায় ভাল।
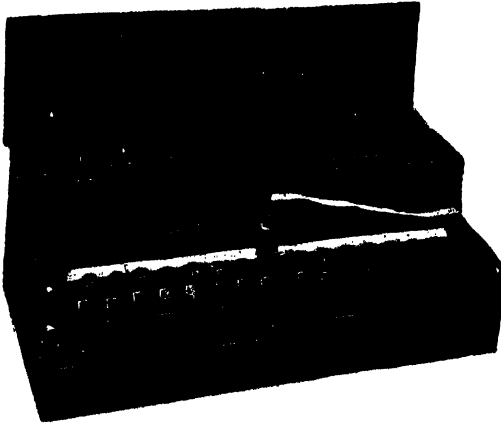
সার চার্লস হুইট্‌ষ্টোন আবিষ্কৃত প্রথম ব্যবহারোপযোগী টাইপ রাইটার যন্ত্র।

ফনোগ্রাফ্ ;—টমাস্ এডিসন্ কর্ত্তৃক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। প্রথম উহা খুব সহজ ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা দ্বারা যন্ত্র সংলগ্ন সূত্র সাহায্যে একখানি কোমল টিনের পাতে কথা বা শব্দের একটা দাগ গৃহীত হইত। পরে যখন বুঝা গেল, ঐ ধাতুতে অঙ্কিত দাগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তখন উহার পরিবর্ত্তে মোম ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এ যন্ত্রের উন্নতি বিষয়ে অপর কাহারও বিশেষ কোন কৃতিত্বের উল্লেখ দেখা যায় না।
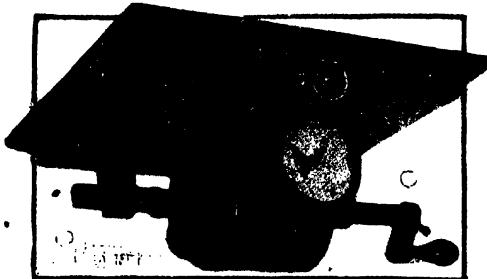
এডিসন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত প্রথম ফনোগ্রাফ যন্ত্র।

বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কার ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। স্যার ফ্রান্সিস্ রোণাল্ড্ (Sir Francis Ronalds) প্রথম টেলিগ্রাফ দ্বারা দূরে সঙ্কেত পাঠাইতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হইয়া উহার উন্নতি বিষয়ে চেষ্টা করিতে বিরত হন। প্রথম কার্য্যকারী টেলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যরণ পি, এল্, সিলিং (Baron P. L. Schilling) কর্ত্তৃক ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এই যন্ত্র এক্ষণে সেণ্ট-পিটর্সবর্গের ইম্পিরিয়ল একাডেমি অব সায়ন্স গৃহে রক্ষিত আছে। টেলিগ্রাফের যন্ত্রে অধুনা যে ফিতাকলের ব্যবহার হইয়া থাকে ইহা প্রথম স্যার চার্লস্ হুইট্‌ষ্টোন্ কর্ত্তৃক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পেটেণ্ট করা হয়।
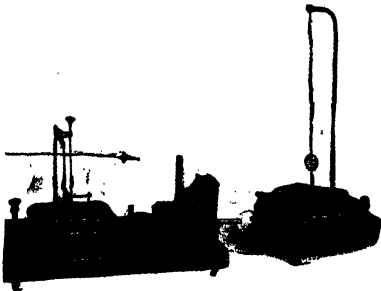
ব্যারণ পি, এল, সিলিংয়ের আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কিয়দংশ।
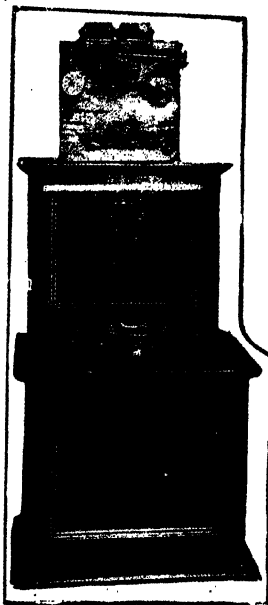
প্রথম উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফের ফিতাকল।

শ্রীহরিহর শেঠ

রমণীর কথা

আমরা নারী। পুরুষ আমাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সে স্থান অন্তঃপুর। সেই আমাদের রাজ্য। পুরুষের জগতের সর্ব্বত্র অবাধ গতি, সর্ব্বত্র স্বাধীনতা, আমাদের সীমা ক্ষুদ্র অন্তঃপুর রাজ্যেই নিবদ্ধ। উহার সীমা ছাড়াইয়া উঠা আমাদের যেন সাধ্যাতীত।

আমরা মা। কিন্তু মাতৃত্বের দাবী আমরা কতখানি করিতে পারি? কয়জন আমাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা পাইয়াছে? আমরাই যখন প্রকৃত শিক্ষা কি তাহা জানি না, তখন সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দ্বারা কিরূপে হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা আগে কর্ত্তব্য।

আমরা পাইয়াছি মাথার উপর উন্মুক্ত খানিকটা নীলাকাশ। আমাদের শিক্ষার মত তাহাও সীমাবদ্ধ। লোকে বলে আকাশ অসীম, আমার তাহা সসীম দেখি। আমরাই যখন সীমাবদ্ধ তখন কোন বস্তুই অসীম হইতে পারে না এই আমাদের ধারণা। আমাদের শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের পরে কয়েকখানা বই যদি হইয়া থাকে। কোনও ক্রমে দ্বিতীয় ভাগটা সারা করিতে পারিলে আমাদের অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আর বেশী পড়াইতে গেলে কোমলতা বিনষ্ট হইবে, মাতৃত্বপদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, মেয়েরা পুরুষোচিত কঠোর ব্যবহার শিখিবে। ছেলের লেখাপড়ার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি একটু থাকে; কেননা, তাহারা উপার্জ্জন করিবে। শুধু এই একটা উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোনও উদ্দেশ্য যে তাঁহাদের আছে পুত্রের শিক্ষায় তাহা বোধ হয় না।

সন্তানের শিক্ষার ভার আমাদের উপর। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা মাতার কাছে, পিতার কাছে নয়। কিন্তু আমাদের মত মা তাহাকে কতখানি শিক্ষা দিতে পারে? আমাদের গৃহরাজ্যের শিক্ষাটাই বেশী। সম্মুখে খানিকটা যে নীল আকাশ দেখা যায় সন্তানকে সেইটুকুই দেখান, সেইটুকুর ইতিহাসই তাহাকে জানান চলিতে পারে। আমাদের নিজের কাছে যাহা দুর্ব্বোধ্য, শিশুর কাছেও তাহা দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যায়। আমরা, আমার মা, ঠাকুর মা প্রভৃতির নিকট হইতে শুনা উপকথা গুলি তাহাদের শুনাই! আমরা নিজেরাও তাহার মধ্য হইতে যেমন কোনও সত্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি নাই, গল্পকে কেবল গল্প বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি, তাহারাও তাহার চেয়ে বেশী কিছু শিক্ষা করে না, অর্থাৎ যে সাহস বীরত্ব, যে উচ্চ মহান্ শিক্ষা আমাদের দেশে একদিন উত্তেজনাময় আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া পরে উপকথারূপে গণ্য হইয়াছে, তাঁহা যে সত্য, এবং চেষ্টা করিলে যে সেই শিক্ষার সাহস বীরত্ব তাহারাও লাভ করিতে পারে,—তাহাদের পরে যাহারা জন্মিবে নিজেরা যে তাহাদের আদর্শ-স্বরূপ, ইহা ভাবিতে তাহারাও চিরউদাসীন। চিরন্তন প্রথানুযায়ী তাহারাও

হাঁ করিয়া গল্প গিলিয়া যায় মাত্র, আমরাও বুঝাইয়া বলিতেও পারি না, তাহাদের জড়তাও দূর করিয়া দিতে পারি না কারণ আমরাই যে এই শিক্ষায় শিক্ষিত। মাতা যাহাদের অলসপ্রকৃতি—সন্তান তাহাদের আর কতদূর কার্য্যতৎপর হইতে পারিবে? এমনই করিয়া যে সময়টা তাহার প্রকৃত শিক্ষার, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মাতাই তাহাদের জীবনের ভিত্তি প্রথম গাঁথিয়া তুলেন। আমরাই মা, আমাদের উপরই দেশের আশাভরসাস্থল শিশুগুলির ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিতেছে।

দেশের মধ্যে একটা "স্পৃশ্যাস্পৃশ্য" সঙ্কোচ জাগিয়া আছে। কেন? তাহাও কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে? এ সঙ্কোচ ত আমাদেরই জন্য। আমরা জানি অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করিলেই স্নান করিতে হয়,—অনেক সময় প্রায়শ্চিত্তেরও আবশ্যক হয়। ইহাতেই যে আমরা শুদ্ধ হইব, তাহাতে আমাদের কোনও সংশয় থাকে না। আমরা শিশুকালে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, এখন তাহাই শিক্ষা দিতেছি।

এই যে ফুলের মত ছোট ছোট মেয়ে ছেলেগুলি, ইহারাই আবার সন্তানের পিতামাতা হইবে; এক একটী সংসারের ভার ইহাদের স্কন্ধে পড়িবে। ইহারা আবার নিজেদেরই শিক্ষা বিতরণ করিয়া তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবে।

আমরা স্বাবলম্বন কাহাকে কহে জানি না। আমরা জানি একজন না একজন আমাদের ভার গ্রহণ করিবেই। আমরা আরও জানি যে, যদি এমন কেহ আমাদের না থাকে তবে আমাদের কাজ ভিক্ষা। পরের দুয়ারে দাসীবৃত্তিই নারীর সম্বল। আর কোনও লক্ষ্য আমাদের সামনে থাকে না কারণ আমরা কখনও সেদিকে চাহি না। এই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা।

আমরা জানি শুধু বিবাদ করিতে। এ কাজটি বড় সুন্দর। সেটা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে গণনীয়। একটি পাঁচ বছরের মেয়ে কেমন করিয়া বিবাদ করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানে। বিবাদে জয়ী হইয়া যে কতদূর আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সেও জানে—এ বিদ্যা শিখাইবার বেশী প্রয়োজন হয় না। আর না বিবাদ করিলেই বা আমাদের চলে কই? পুরুষদের সব আছে—সমাজ আছে—পাঁচটা বাহিরের বিষয় লইয়া চীৎকার করিবার আছে ছুটাছুটি করিবার আছে। তাহারা খবরের কাগজে আর্টিকেল লিখিতেছে—মিটিংয়ে দেশের উন্নতির জন্য মোটা গলায় লেক্‌চার দিতেছে। তাহাদের সময় বেশ কাটিয়া যায়, আমাদের সময় কাটে কি করিয়া? স্বাধীনতা কি, স্বাবলম্বন কি তাহা আমরা জানি না। আমরা জানি আমরা চিরকাল এমনই ভাবে বাস করিবার জন্য, অন্তঃপুরের প্রাচীরের আড়ালে নিজেদের চিরকাল লুকাইয়া রাখিবার জন্যই, সৃষ্ট হইয়াছি। স্বাবলম্বন কথাটার অর্থ যদি কেহ আমাদের কাছে প্রকাশ করে, আমরা আতঙ্কে কম্পিত হই। বাপ রে, যে ঠুন্‌কো আমাদের জাতি, এখনই ভাঙ্গিয়া গেলে আর জোড়া দেওয়া ভার হইবে।

বাহিরের কথা অনেক কানে না আসিলেও দুই একটা কথা যে না আসে এমন নয়। মেয়েদের

জাগাইবার জন্য যে অনেকে চেষ্টা করিতেছেন তাহাও জানি। কিন্তু সেটা যে আমাদেরই জন্য তাহা ভাবি কই? আমরা বলি ওসব কাজ আমাদের নয়, পুরুষের। তাহারা তাহাদের কাজ করিয়া যাক, আমরা কেন তাহাদের বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইয়া মরিতে যাই?

আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণী আমরা, কিন্তু রাজ্য শাসন যে কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা আমরা অনেকেই জানি না। আমরা যাহা হইতে পারিতাম তাহা হই নাই, যাহা আমরা করিতে পারিতাম, তাহা আমরা করি নাই।

কিন্তু আমরা যে এই অলস প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কাহাদের জন্য? যাহারা সকল কাজ হইতে আমাদের তফাৎ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের জন্য নহে কি? আমাদের একটুও সাহস নাই। কেন আমরা পথে ঘাটে অকারণে লাঞ্ছিত হইব? আমরা এমন ভীরু স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি যে অন্তঃপুর ছাড়িয়া এক পা বাড়াইতে গেলে আমাদের একজন শক্ত পুরুষ অভিভাবকের দরকার। যদি কেহ আমাদের অপমান করে, নীরবে আমাদের তাহা সহিয়া যাইতে হয়। কেহ আমাদের নিকটে আসিলেই আমরা বাতাহতকদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হই। এ ভীরুতা বাল্যাবধি আমাদের অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত।

মেয়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া। তাহাদের অতি শিশুকাল হইতেই কঠোর শাসনের তলে থাকিতে হয়। যে সময়টা বিকাশের, সে সময়টা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ভয়টাই তাহাকে বেশী পরিমাণে দেখানো হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যে শক্তিটা আছে, তাহাকে প্রকাশিত হইবার অবকাশ দেওয়া হয় না। অন্য দেশে যে সময়টা বালিকাকাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমাদের দেশের মেয়েরা সেই সময়ে গৃহের বধূ, অনেক সময়ে সন্তানের মা। তাহাদের নিজেদের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। মাথার উপর অথচ অসময়ে অনেক দায়িত্ব আসিয়া পড়ে।

অনেক কার্য্য করিবার সময়ে অভিভাবকের উক্তি শুনিয়াছি, মেয়েদের জন্য এ কাজ নয়, এ কাজ করিতে নাই—ইত্যাদি। আমরা একটা বিরুদ্ধ কাজ করিয়া মাসাবধি তাহার জন্য তিরস্কার সহ্য করিয়াছি। এমনই করিয়া আমরা কেবল একটী জড় বস্তুতে পরিণত হইয়া লুকাইয়া রাজত্ব করিতেছি।

শুনিতে পাই পূর্ব্বকালে এই দেশেরই মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মায়ের সুশিক্ষা পুত্রে সঞ্চালিত হইয়াছিল, তাই আমাদের দেশ সুসভ্য, উন্নত, মার্জ্জিতরুচিযুক্ত ছিল। আমাদের দেশে বীরের অভাব ছিল না, বীর মাতা, সতী স্ত্রী, আদর্শ ভগিনীরও অভাব ছিল না। সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত লোকেরও অভাব ছিল না। সে দিন আজ কোথায়? স্বপ্নসম তাহা আজ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। দিনে দিনে কুসংস্কার বাড়িয়াছে, জড়তা আসিয়া আমাদের জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা এমন হইয়াছি যে যুদ্ধ বিগ্রহের নামে কাঁপিয়া উঠি। এই তো সে দিন জার্ম্মাণ যুদ্ধে আমাদের রাজার পক্ষে যখন ভারতবাসীর দাঁড়াইবার কথা হইয়াছিল, তখন

আমরা অনেকেই পুত্র ভ্রাতা বা আত্মীয়কে ছাড়িয়া দিতে রাজি হই নাই। অনেকেরই অঞ্চল নয়ন জলে ভিজিয়াছিল। অনেক যুবক লোকের কাছে প্রশংসা পাইবার মানসে নাম লিখাইয়াও আমাদের কাতরতা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া শেষে উপস্থিতিদিনে গৃহ মধ্যে লুকাইয়া ছিল।

এই আমরা নারী, এই আমরা মা। মা বলিয়া গর্ব্ব করিবার কি আছে আমাদের? আমাদের দেশে নারীর জাগরণ, নারীর স্বাবলম্বন, সে এক কল্পনাতীত ব্যাপার। একজন জাগিবে, দশজনে হয় তো তাহাকে চাপিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিবে। পুরুষেরা বাহিরে কর্ম্মঠের ন্যায় কাজ করিবেন, ভিতরে আসিয়া বিশ্রাম করিবেন, দশটা সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা বলিবেন। আমরা যেন এই কথাগুলি জানাইবার ও জানিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। আমরা স্ত্রীলোক—আমাদের কোনও দায়িত্ব নাই। কোনও দিকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নাই।

জানি না কোন কালে আমাদের নারীভাগ্যে এমন দিন আসিবে যে দিন প্রত্যেক রমণীই নিজের কর্ত্তব্য নিজে বিবেচনা করিবে, প্রত্যেকেই প্রকৃত মা বলিয়া নিজের গৌরব করিতে পারিবে। প্রত্যেক গৃহ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে! কবে এমন দিন আসিবে যে দিন দেশের সুখ দুঃখ প্রত্যেক নারী অনুভব করিতে পারিবে? সে দিন কত দূরে? আমার ক্ষীণ দৃষ্টি ততদূরে যাইতে পারিতেছে না, তাই বলিতেছি "হে প্রভু! আমার দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ কর। ভবিষ্যতের যবনিকা তুলিয়া দাও আমার সম্মুখ হইতে। যতদিন পরেই সেদিন আসুক না কেন, আমি সেদিন বর্ত্তমান থাকি বা না থাকি, এখন সেই দৃশ্যটী দেখিয়া আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাক। আমি একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকি—উঠ ভগিনীগণ, জাগো! প্রকৃত মা হইবার দিন আসিতেছে, সেজন্য নিজকে প্রস্তুত কর, অন্যকে জাগাও।"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী

উৎসবান্তে

চলে গেছে শরৎরাণী আকাশ রাণীর সম্ভাষে;
স্বচ্ছ জলে আজও তাহার চোখের তারার রং ভাসে।
জল টলেছে দীঘির নীচে; পাঁক পড়েছে বক্ চরে;
মাঠের সীমায় বিশ্ব-রমা স্মৃতির মালা জপ করে।
ছেঁড়া-খোঁড়া পদ্ম পাতায় ডাহুক, পিপি সঞ্চরে;
নদীর বাঁকে চকা ডাকে,—হুতাশ লাগে অন্তরে।
দিগ্‌বধূ আর গুহ্য কি গায় কুজ্‌ঝটিকায় মুখ ঢেকে;
আলো-এ ঝরে ধাঁধার আঁধার যুগের পর যুগ থেকে।

হারানো খাতা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কাঙাল বলিয়া করিওনা হেলা—আমি পথের ভিখারী নহিগো "

—রবীন্দ্রনাথ

মানুষের হৃদয়রহস্য যে দেবতাদেরও অপরিজ্ঞাত,—এ কথা অস্বীকার করা চলে না; এবং সুস্বীকারও কেহ করে না। কিসে যে তার সুখ, আর কত অল্পেই তার দুঃখ, বুঝিয়া ওঠাই ভার। নিরঞ্জন যতদিন পরিমলের শিক্ষকতা করিতেছিল, অস্বস্তির তার যেন অন্ত ছিল না, এমনকি একদিন সে অশান্তির সীমা ছাড়া হইয়া গিয়া বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতেও উদ্যত হইয়াছিল। আবার যখন আপনা হইতে সেই দুরূহ কার্য্যটা তার ঘাড় হইতে নামিয়া পড়িল, অমনি বোঝা গেল যে, যেটাকে সে অসহ্য পীড়ন বোধ করিতেছিল, ঠিক সেইটিতেই তার সব চেয়ে বড় সুখের উপাদান অলক্ষ্যভাবেই নিহিত ছিল। বিগতজীবন প্রিয়তমের মূর্ত্তি মানুষ প্রাণপণে স্মরণে আনিয়া তাহারই ধ্যানস্থ হয়, অথচ প্রাণও কাঁদে। ওই সম্মানিতা ছাত্রীটীর সর্ব্বাবয়বে কোনও হারানিধির পূর্ণ সাদৃশ্য অনুভব করিতে থাকিয়া তাহাকে সহ্য করা যেমন নিরঞ্জনের পক্ষে কঠিন আবার তেমনই বুঝি তাহার মধ্যে একটা দুরন্ত লোভও তাহারও অজ্ঞাতে তাহার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে প্রচণ্ড অধিকার স্থাপন করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে পূর্ব্বে বুঝে নাই, পরে বুঝিল। পরিমল যে আর তাহার নিকটে পড়া লইতে আসে না, একদিকে ইহাতে সে খুসী হইয়াও আর একদিকে কিন্তু হইতে পারিল না। আবার নিজের মনের এই ক্রুটীটুকু লক্ষ্যে আসিতেই অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে মনকে কঠিনভাবে সে পীড়ন করিয়া বলিল,—

"খবরদার! পাগলামী করোনা; তোমার স্বপ্ন তোমার মধ্যেই থাক, বাইরে তার ছবি যেন কোন মতেই না ফুটে!"—

প্রেসের অল্প স্বল্প কাজ হাতে লইয়া সে ক্রমে তার প্রায় সব টুকুই নিজের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিল এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তার এতদিনের যে শক্তি, যে অধ্যবসায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই আবার জাগিয়া উঠিল। একবাক্যে সবাই স্বীকার করিল যে, এমন উদ্দীপনা, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মক্ষমতা আর তীক্ষধী সর্ব্বদা এসব কাজে পাওয়া যায় না। যারা এতদিন তাহাকে অপ্রকাশ্যে উপহাস ও প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছিল, তাঁরাও লজ্জা পাইল।

বস্তুতঃ মানুষের শক্তির আধার কখন যে খালি হইয়া যায় আবার কিসে ভরিয়া উঠে, তার কোন সময় ঠিক করা নাই। উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে কত উৎকৃষ্ট বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট

হয়, অথবা বপন করাই ঘটে না। নিরঞ্জন একটু একটু করিয়া যেন তার হারানো শক্তি এই আশ্রয়ে আসিয়াবধি খুঁজিয়া পাইতেছিল। পরিমলের সঙ্গে মাসখানেকের মেলামেশায় তার মরিচাধরা বুদ্ধির কৃপানে শান পড়িয়াছে; এবার কাজের মধ্যে ডুবিতে পাইয়া তার উপরের সমস্ত ধূলী জঞ্জাল যেন ধুইয়া গেল। এখন সে আর তত অন্যমনস্ক হয় না; মাসমাহিনার টাকাগুলা দিতে আসিলে খাজাঞ্চিকেই উহা জমা রাখিতে বলিয়া গোটাকতক শুধু চাকরমহলে বাঁটিয়া দেয়। হরে খানসামার দল মুখ বাঁকাইয়া উহা গ্রহণ করে ও নিজেদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা করিয়া বলে, "বাছা হনু আমাদের এবার চালাক হচ্চেন দেখি যে।" আর একজন বলিলেন "হবে না, এখন যে পেটে রাজা সায়েবের ভাত পড়েচে, ও-ভাতকে হজম করে চলতে পারা কঠিনরে ভাই; ওর জোরে অনেক 'পোঁটাচুন্নির বেটা চন্দন বিলাস' হয়ে উঠ্‌লো।"

যে খাতাখানার কথা সেদিন পরিমল তার স্বামীর কাছে বলিতেছিল, সেখানায় মধ্যে মধ্যে নিরঞ্জন নিবিষ্ট হইয়া কি লিখিত। সেটার আরম্ভ ছিল এই রকম—

"এই মলাট-ছেঁড়া চার পয়সা দামের খাতাখানা হাতে পেয়ে আজ হঠাৎ ডায়রি লেখার কথা মনে পড়ে গেল। কতকালেরই যে অভ্যাস ছিল, সেটা কিছু আর বিচিত্র নয়! কিন্তু নয়ইবা কেন? আমার এ জীবনটার সকলই যে বৈচিত্র্যময়, এর মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কারগুলো এখনও যে কেমন করেই না মরে গিয়ে বেঁচে আছে এবং সুযোগ পেতেই মাথা তুলে খাড়া হচ্চে, এইটেই তো ঘোর আশ্চর্য্যের বিষয়। নিজেই আমি অবাক হয়ে গিয়ে ভাবচি যে তাহ'লে আমার দ্বারা এখনও আবার এ পৃথিবীর কোন কোন কাজ কর্ম্মও চালালে চলে! আশ্চর্য্য, ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে কিন্তু!

"আচ্ছা, আমি কি ছিলুম, সেটাও একটু একটু করে মনে কর্ব্বার চেষ্টা করা বোধ হয় নেহাৎ মন্দ নয়! যা' ছিলুম আর এখন যা' হয়ে দাঁড়িয়েছি এ থেকে আমিই আমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনে, তা আর পাঁচজনে কেমন করে পারবে? সে পারবার কিছু দরকারও নেই, সে লজ্জা আমি আমাকে কোন মতেই দিতে পারবোনা;—না না, আমার অতীত! আমার সোনার স্বপন! আশার আনন্দে উৎসাহে সম্মানে ভালবাসায় ভরা আমার বাল্য কৈশোর যৌবনের অতীত! যত মাধুর্য্য যত আকর্ষণই তোমার মধ্যে থাকে থাক, তুমি শুধু আমার ধ্যানধারণার মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাক। পথের ভিখারী নিরঞ্জনের কাছে তুমি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদের মতই গোপন আকাঙ্ক্ষার ধন হয়েই থাক, এই কর্ক্কশ বন্ধুর শুষ্ক বর্ত্তমানের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে আমি তোমায় আঘাত করবোনা, লজ্জা দেব না।

"নিজের কথা ভাব্‌তে গেলেই মনে হয় এর আগে যে জন্মটা আমার চলছিল, সেটা যেন শেষ হয়ে গিয়ে এখন আর একটা চল্‌চে, আর বস্তুতঃও তো তাই! আমার সে জন্মে আমার চেহারা ঠিক কার্ত্তিকের মতন না থাক্ ঘরে পরে সবাই যে আমার রূপের তারিফ্ করেছে, সে তো আমি নিজের কানেই শুনেছি। আর এখন, আমায় দেখলে লোকে শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

আবার ছোট ছোট ছেলেরা কেঁদে ফেলে—পালিয়ে যায়! জন্ম আমার ঠিকই বদলে গেছে, তবে এবারে জাতিস্মর হয়ে জন্মেছি বলেই এত জ্বালা। পুরানো কথা মধ্যে যেমন কিছুদিন ভুলে গিয়েছিলেম, তেমনি বরাবরের জন্য একেবারেই যদি ভুলে যেতেম, ঢের ভাল হতো। তবে দুঃখ এই যে, জন্ম নতুন পেলেও এবারে আর কচি ছেলে হয়ে জন্মে মার বুকে ঠাঁই পেলেম না, একটু একটু করে বাড়্‌তে গিয়ে ছেলেরা যে অবসর টুকু পেয়ে নেয়, সেও আমার ভাগ্যে যুটলো না,—একবারে এই বাজপড়া তাল গাছের মতন আমাকে নিয়ে আমার এই নব জন্ম আরম্ভ হলো।

"আচ্ছা, বাড়ী ছিল আমাদের চট্টগ্রামের যে দিকটায়, সে সবই তো দেখছি ঠিক ঠিক মনে পড়ে আচ্চে। মধ্যে কিন্তু এসব কথা এমন করে মনে করতে পারতাম না। আমার ঠাকুরদা মশাই শুনেছি নেহাৎ হাবা গোবা ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর এক বিশ্বাসী (!) আমলার কারসাজীতে পড়ে সমস্ত জমিদারীটি হারিয়ে ফেলে মনের দুঃখে এইখানে এসে বাস করতে থাকেন, এই আমার মার কাছে শুনেছি, তার আগে তিনি গাজন হাটের এগার আনির জমিদার ছিলেন।

"আমার বাবাকে আমার বেশ স্পষ্ট করেই মনে আছে। ফরসা রং, একহারা পাতলা লম্বা চেহারা, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কি উদার মনই তাঁর ছিল! আমার বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। একবার সূর্য্যাস্ত খাজনার দায়ে ঐ গাজন হাটের তালুক—তখন আর তা এগার আনি নেই ষোল আনাই তখন গিরিশচন্দ্র মিত্রেরই হয়ে গেছে—সেই তালুক লাটে ওঠে। বাবা খুব সামান্য দামে তাঁর সেই নিজের পৈতৃক বিষয় একজন চাপরাসীকে দিয়ে কিনিয়ে রাখেন এবং পরের দিন নিজের হাতে পত্র লিখে যারা তখন তাঁর ন্যায্য বিষয় অন্যায্য ভোগ করছিল তাদেরই খবর দেন যে কেনবার টাকাটা পেলেই তিনি ওদের তালুক ফিরিয়ে দেবেন। হলোও তাই। আমার আজও সেই কথা মনে কর্‌তে আহ্লাদে আর গৌরবে বুক কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে! আমি সংসাসে এসে কার জন্যে কি করলুম?

"পিতৃহীন হয়েছিলেম, নিতান্ত অসময়ে। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কল্‌কাতায় পড়তে গেছি, বিনামেঘে যেন বজ্রাঘাত হলো! ভাই বোন আমার আর কেউ ছিল না। মার পক্ষে বড্ডই কষ্টকর। ছুটীর সময়টুকুই তাঁর কাছে থাকি, বারমাস একলা।

"কল্‌কাতার হোষ্টেলে যাঁরা বাস করেছেন, আমাদের মতন পাড়াগেঁয়ে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য অঞ্চলের ছেলে গেলে তাদের সেখানে যে কত বড় দুর্দ্দশা ঘটে সে হয়ত জানা আছে। কোন্ সময় অন্যমনস্ক হয়ে একজন 'কেডারে ডাকে?' বলে ফেলেছে, আর রক্ষা আছে! খোঁজ করে করে তাই, নিজের স্বজাতী (?) দেখেই ভাব করে ফেলা যেত এবং আমার এক ঘরের পড়সী হলেও পশ্চিমবঙ্গকে 'দূরে পরিহার' চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকতেম। কারণ, আমাদের পক্ষে তাঁরা ছিলেন একটু 'দুর্জ্জন'।

"কালীপদ আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। জীবনে সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে

হৃদয়ের সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করতে যাওয়া, কি ঘনিষ্ট যোগই যে সে হয়েছিল ! এত ভালবাসা বোধ হয় আর কারুকেই বাসতে পারিনি, আর না,—বাসতে পারবোও না। এখন কি আর সে ভালবাসবার শক্তিই আমার মধ্যে আছে ? মন ছিল তখন একটা কাদার তালের মতন, তাকে রকম বেরকম করে ছাঁচে ঢেলে নিলেই হলো, এখন হয়েছে সে একখানা নিরেট পাথর। তাকে ভাঙ্গাও যায় না, গড়াও যায় না।

"কালীপদ আমায় প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিল বটে ; তবু আমার মতন নয়। সে তার জীবনের মস্ত বড় কথাটাই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আমি হলে তা' পারতুম না। যাকে ভালবাসলেম, তার সঙ্গে যদি একটা মস্ত বড় আড়ালই রেখে দিলেম, তাহলে আর প্রাণে প্রাণে যোগ হবে কোনখান দিয়ে ? গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে যদি একটা প্রকাণ্ড পাহাড় গেঁথে ওঠে, তাহলে যুক্তবেণীর সব মহিমাই যে তুচ্ছ হয়ে যায়। কালীপদর যে আমায় না জানানো গোপন কথা ছিল, সে আমি জানতে পারলেম একেবারেই অসময়ে ;—যেদিন পুলিসের লোকে আরও কজন ছেলের মধ্যে তারও ঘর তোলপাড় করে' একটা ছোট্ট রকম বোমার সরঞ্জামের সঙ্গে তাকেও ধরে হাতে হাতকড়ি দিয়ে ও কোমরে বেঁধে নিয়ে চলে যায়। আমাকেও দুদিন একটু টানাটানি করেছিল ; কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ বুঝে ছেড়ে দিলে।

" 'পদ'র সঙ্গে শেষ দেখা তার আন্দামানে যাবার আগের দিন। দেখা হতেই খুব হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলে। হাত তার বাঁধা, দণ্ডিত অপরাধী পাছে কিছু করে বসে— তার কিন্তু সে মতলবই নয়। খুব প্রফুল্ল হয়ে সোৎসাহে অনেক কথাই সে অনর্গল বলে গেল। তারপর সবের শেষ অনুরোধ আমায় এ জন্মের মতই সে জানিয়ে দিলে।

" 'রমেশ ! তোমার তো বিয়ে হয়নি, তুমি সুখদাকে বিয়ে করতে পারো না ? তাহলে এ জন্মটার মতন নিশ্চিন্ত হয়েই ঘানি ঘোরাই এবং যাতে শীঘ্রই আর একটা নূতন জন্ম পাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেখি।'

"আমি বিস্মিত হয়ে বল্লাম 'সুখদা কে ?'

" 'কেন তোমায় তো আমার বোনের কথা আমি বলেছিলুম ! সুখদা তারই নাম। ধরো এই আমার মতনই তাকে দেখ্‌তে।—পারবে না ?'

"আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর করলেম 'কেন পারবো না, ঈশ্বর সাক্ষী তোমার বোনের জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।'

" 'পদ' খুসী হয়ে আমায় তার বাঁধা হাত দিয়ে জীবনের শেষে আলিঙ্গন চুকিয়ে দিল। সেই শেষ ! জীবনের প্রথম প্রভাতে যা পেয়েছিলেম, জীবনের প্রথম প্রভাতেই তাকে হারিয়ে ফেল্লেম ! বিশ্বাসের গণ্ডী দিয়ে বেঁধে সে যাকে আমায় সঁপে দিয়ে গেল, তাকেও আমি নিজের পাপে নষ্ট করে ফেলেছি—হারিয়ে গেছে। কিন্তু দুজনকার স্মৃতিই আজও আমার বুকে আগুন হয়ে ঠিক্‌রে

পড়ছে, উল্কা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ভুলতে আজও একজনকেও তো পারিনি!—আর কি কোন দিন পারবো?

"—কে আসচে? তিনিই কি? কেন তাঁকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে? সুখদা যদি রাণী হতো, তা'হলে তাকেও ঐ রকম সুন্দর দেখাতে পারতো। মানুষে মানুষে মিল থাকে দেখেছি, কিন্তু এতটা মিল এর আগে আর কখনও দেখিনি!"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"আমার প্রাণের ব্যাকুলতা হেরি শত্রু যেন না হাসে
আমারে বেদনা দিতে যেন কেহ না পারে নিন্দাভাষে।"

—তীর্থ সলিল।

প্রবল মানসিক উদ্বেগে ও উত্তেজনায় সুষমার সে রাত্রে জ্বর আসিল এবং দিন দুই সে সেই জ্বরের কষ্টে ও মনের কষ্টে বিছানা লইয়া রহিল। নিজের উপরে তার যেন ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছিল। এমন কালা মুখ তাহার, যে সেকি কোথাও বাহির করিবার উপায়ই নাই? যাক্ তবে সুড়ঙ্গের মধ্যে বিষেভরা সাপের মত এ জন্মটা তার লোকচক্ষের বাহিরে, শুধু তাদের নির্ম্মম আলোচনার মধ্যেই কাটিয়া যাক। মনে পড়িল, নরেশ সেদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন "স্বাধীনতার মধ্যে কি দুঃখ নাই? লজ্জা নাই?" সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গলদশ্রু-নেত্রে দু'হাত জোড় করিয়া আত্মগতই কহিতে লাগিল, "দেবতা আমার! দেবতা আমার! তোমার দিব্যদৃষ্টি যে সেদিন এত সূক্ষ্মভাবে আমার এই অপমান দেখ্‌তে পেয়েছিল, তা তো আমি জানিনি! কেন তবে আমার অজ্ঞতার আবদার গ্রাহ্য করলে?" তারপর সবিস্ময়ে সে ভাবিল, যে পৃথিবীতে নরেশচন্দ্র আছেন, মিঃ গুহর মত লোকেও সেখানে কেমন করিয়া জন্মায়!

ডাকের পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। সুষমার নামে কালে ভদ্রে একখানা পত্র আসিলে সেখানা নরেশচন্দ্রের নিকট হইতেই আসে। আজও সেই বিশ্বাসেই পরিপূর্ণচিত্তে সাগ্রহে পত্রখানা লইয়া মাথায় ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ সুষমার লক্ষ্য হইল, উপরের হস্তাক্ষর নরেশচন্দ্রের নহে এবং খামখানা অন্য ছাঁদের। চিঠি লিখিবার লোকের বালাই তাহার কোন খানেই তো নাই, কে লিখিল তাহাকে এই চিঠি! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মোটা খামখানা সে মাথার কাঁটা দিয়া খুলিয়া ফেলিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের লেখা, আর সম্পূর্ণরূপেই অবমাননাজনক ইহার বর্ণবিন্যাস। ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া চারি পৃষ্ঠা চিঠির শেষে খামের স্বাক্ষরটা উল্টাইয়া দেখিতে গেল। সেখানে লেখা আছে—"তোমার একান্ত দর্শনাভিলাষী সুরেশ্বর বসু।" চিঠির উপরে এ বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর নম্বর দেওয়া রহিয়াছে। তখন মিঃ গুহর কথা তাহার স্মরণ হইল। তাহার

প্রতিবেশী সুরেশ্বর বোসকে সে চেনে কিনা এই প্রশ্ন তিনি তাহাকে সেদিন করিয়াছিলেন এবং সুরেশ্বর মিঃ গুহর বন্ধু। প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া গেল। অতি সামান্য পঠিত পত্রখানা সে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, আবার কি ভাবিয়া তাহা গদির তলায় তদবস্থাতেই রাখিয়া দিল। সে পত্রে যেসব কথা লেখা হইয়াছে তাহার আভাস দু'চার পুংক্তির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং সেদিন মিঃ গুহের মুখে সে কথা শুনিতেও তো তার বাকি নাই। রাজা নরেশচন্দ্র তাহাকে যেভাবে রাখিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে এক্ষণে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদপেক্ষায় অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাহারা উহাকে রাখিতেই প্রস্তুত, ইত্যাদি অনেক কথাই সেই পত্রে লেখা আছে। পত্রখানা নরেশকে দেখান উচিত বোধেই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল না।

কানাই সিং বিস্তর রাগারাগি করিয়াও তাহাকে রাঁধাইতে না পারিয়া বিষম ক্রোধে গজ গজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল, "তা'হলে হামিও আজ আর রুটি বানাবো না। এমন করে রোজ রোজ উপোস দিলে যে তোর জান বার হয়ে যাবে খুঁকি বউয়া! থোড়া কুচ তো আদমী মুখেমে দেয়।"

তারপর নিজের তৈরি আটার রুটি ও আলুর তরকারি বানাইয়া এক ঘটি জল ও থালায় খাবার আনিয়া তার সাম্নে ধরিয়া দিয়া বলিল "লে'এখন উঠে বৈঠ্‌কে খা'লে বাবা ; দুটো খা'লে।"

সুষমার চোক দিয়া এতক্ষণের পর তাহার চোক নাক জ্বালা করিয়া অকথ্য যন্ত্রণারাশি তপ্ত অশ্রুর আকারে ছুটিয়া বাহির হইল। নিজের যে অরুন্তুদ মর্ম্মব্যথা তার মনের ভিতরে জমাট বাধিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রচণ্ডবলে আঘাত করিতেছিল, এই একমাত্র স্নেহ করিবার বুড়া সাথীটির এইটুকু স্নেহাভিব্যক্তিতে সেই অব্যক্ত দুঃখ তাহার ব্যক্তের সীমায় ফিরিয়া আসিল। সে খাবার কোলে করিয়া ক্রমাগত চোকই মুছিতে লাগিল।

কানাই সিং সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "খেয়ে লে বউয়া ; খেয়ে লে, তোর অসুখ কুচ্ছু বাড়বে না, আমার কথায় বিশোয়াস্ কর। কচি বাচ্চা, কত উপোস কর্‌বি বল্ দেখি ?"

অনেক কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া সুষমা তার পুরাতন বন্ধুর যত্নের দান মোটা রুটির দু'এক খানা খাইয়া তখন বুঝিতে পারিল, এটুকু পাওয়ার তাহার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া সে তখন স্নেহকারীকে একটু খুসী করিবার জন্য তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, "সিংজী! আচ্ছা তোমার বউ মেয়েরা সেখানে গেলে তোমার রুটি গড়ে দেয় তো ? সেখানে তো নিজে রাঁধতে হয় না ?"

কানাই সিং একগাল হাসিয়া জবাব দিল "আরে নারে বউয়া! সেখানে হামি কিসের দুঃখে নিজে রাঁন্‌তে যাব ? কিস্‌মতিয়া, ববুয়া হামার বড়া পুতো নান্‌কিয়ার মা সবকোই রুটি পাকিয়ে দেয়, আমি বৈঠে খাই। সেখানের রুটি বড়া মিট্ লাগে। পানীয়ে মিঠা বহুত। আহা কব্ না কব্ খেতে পারবো, সে'তো নাজানে কুছ্!"

সুষমা অকস্মাৎ কি যেন একটা ক্ষীণ আলোক-রেখা ঐটুকু পরিতাপের বেদনার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতে দেখিতে পাইল। সে একেবারে কাঙ্গালের মতন ব্যাকুল হইয়া দুচোকভরা আগ্রহ লইয়া কানাই সিংহের মুখের পানে চাহিল।

"সিংজী! আমায় তুমি ফেলে যেও না! বরং আমায় সঙ্গে করে তোমার দেশে নিয়ে চল, তাই নিয়ে চলো সিংজী! যাবে?"

কানাই এই কাতর ও ব্যগ্র আবেদনে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও এ প্রস্তাবেই মহা সন্তুষ্ট হইয়া গেল। আপ্রান্তমুখ দন্ত বিকশিত করিয়া গদগদকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "হামার বাড়ী গিয়ে কি তুই থাকতে পার্‌বি খুঁকি বউয়া! সে যে মাটির বাড়ী, তার ফুসের চাল। কি করবো গরীব আদমী। রাজা বাবু তোকে যেতে দেবে কেন?"

সুষমা উত্তেজিত আবেগে অধীর হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল "খুব দেবেন, খুব দেবেন। আমি কোথাও সরে যেতে পেলে তিনিও যে রাহুমুক্ত হ'ন,—কেন দেবেন না? কিন্তু আমি গেলে তারা কি আমায় ঘরে ঢুক্‌তে দেবে, সিংজী? আমি কোথায় থাকবো?" সুষমার অর্দ্ধেকটুকু উৎসাহ এই চিন্তাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁটার টানের মতই চলিয়া গেল।

কানাই সিং জিব কাটিয়া ত্রস্তস্বরে "সে কিরে বাবা! কেন তুই কার কাছে কি কছুর করেছিস্ রে?" বলিয়া সস্নেহআদরে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বহির্দ্বারে খটাখট খটাখট করিয়া অসহিষ্ণুভাবে কাহাকে কড়া নাড়িতে শোনা গেল। রাজাবাবুর পত্রবাহক বিশ্বাসে দুজনেই ত্রস্ত হইল। নতুবা এমন সুখজনক আলোচনার মধ্য হইতে কানাই সিংকে এত শীঘ্র কেহ উঠাইতে পারিত না।

খানিক পরে উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, রাজাবাবুর লোক নয়, ব্যারিষ্টার সাহেব সুষমার দুদিনের কাজ কামাইয়ের কৈফিয়ৎ কাটিতে আসিয়াছেন। সে অনেক করিয়া বলিয়াছিল যে ববুয়ার এখন বড় অসুখ, দেখা কিছুতেই হইবে না, তাহাতে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না, শেষকালে কানাই সিংকে বিরক্ত দেখিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহাকে বলেন, দেখা করাইয়া দাও তো এটা পাইবে! কানাই তাঁহাকে উত্তম মধ্যম ঝাড়িয়া দিত, শুধু পাছে ববুয়ার মনীবকে চটাইলে ববুয়া তার উপর রাগ করে, তাই সে পারে নাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদো কাঁদো গলায় আগ্রহে বলিয়া উঠিল "অমন নোক্‌রী তুই করিস্‌নে খোঁকি! হামি রাজাবাবুকে বল্‌বো তোর টাকায় আঁটচে না, আর কিছু বাড়িয়ে দিতে। হামার রাজাবাবু তেমন নয়।"

কানাই সিংহের আনিত সংবাদে এদিকে সুষমার অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিয়া সে দ্বারের দিকে সভয় দৃষ্টি রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বলিয়া

উঠিল "কিছুতে না, কিছুতে না, সিংজী! দেখ যেন সে আমার বাড়ীতে না ঢুকতে পারে। তুমি যে করে হয়, তাড়াও তাকে, তাড়াও। যদি এখানে এসে পড়ে—শিগ্‌গির যাও।"

বিস্মিত কানাই সিং কি বলিব'র জন্য মুখ খুলিতে গেলে, দারুণ অধৈর্য্যের সহিত সে তাহাকে ঠেলিয়া দিল, "আঃ যাওনা সিংজী, এক্ষুণি হয়ত এখানে এসেই উপস্থিত হবে।"

কানাই সিং প্রস্থান করিলে ছুটিয়া আসিয়া সুষমা ঘরের সব কয়টা দরজা জানালায় খিল আঁটিয়া দিল। তার হাত পা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া যাইতেছে।

বিশ্বপ্রিয় বাবু পরের দিন সকাল বেলায় আসিয়া নিজের নামছাপা কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন "সবিনয় নিবেদন,—রাজাবাহাদুরের অনুরোধে আমিই আপনার জন্য মিঃ গুহর বাড়ীর চাকরী জোগাড় করিয়াছিলাম, যদি সেখানে কোন অসঙ্গত কিছু ঘটিয়া থাকে, তার জন্য আমিই প্রধানতঃ দায়ী, এবং আমিই জবাব দিতে বাধ্য। সেজন্য আমার সব কথা জানাও উচিত। অতএব যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে মিনিট কতকের জন্য আপনার বাহিরের ঘরে আপনার কোন বিশ্বাসী লোকের উপস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে।"

পত্র লেখার ধরণে বিশেষতঃ পূর্ব্বেই নরেশের পত্রে তাঁহার 'বন্ধু' বলিয়া ইঁহার উল্লেখ থাকাতে সুষমা কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া রাস্তার ধারের অব্যবহারে পতিত আসবাবহীন বৈঠকখানা ঘরখানায় বিশ্বপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

বিশ্বপ্রিয় তাহাকে নমস্কার করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সবিনয়ে কহিল, "মিঃ গুহর কাছে কাল রাত্রে শুনলুম, আপনি আর তাঁর স্ত্রীকে বাজনা শেখাতে যাচ্ছেন না; আপনার না যাবার কারণ জানতে কাল তিনি এখানে এসেছিলেন, আপনি দেখা করেন নি, অপরন্তু আপনার চাকরের হাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন।"

সুষমা আসিবার সময় নিজের রুক্ষচুলগুলা টানিয়া মাথার উপর কুণ্ডলী করিয়া জড়াইয়া আসিয়াছিল, চোখে একজোড়া চোক ওঠার সময়কার নীল চশমা ও গায়ে একখানা মোটা র‍্যাপারে সে নিজেকে লুকাইবার ইচ্ছায় ঢাকা দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার দিকে চোখ পড়িতেই বিশ্বপ্রিয় যেন আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। রাজা নরেশের আশ্রিতা যে এতটাই ছেলে মানুষ এ ধারণা তার মোটেই ছিল না। আরও বিস্ময়বোধ হইল তার নিরাড়ম্বর ও অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া,—এ যেন একটী নেহাৎ সাদাসিদা স্কুলের মেয়ে। একে আর কিছু যে মনে করিতেই পারা যায়না।

ধীর এবং স্থিরকণ্ঠে সুষমা উত্তর করিল, "তিনি যা বলেছেন সব সত্যি, শুধু তাঁকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন, আমি তাঁর বাড়ী আর চাকরী করবো না, তাঁরা যেন দয়া করে আমায় বিরক্ত না করেন।"

অনুমানে সকল কথাই বুঝিয়া লইয়া বিশ্বপ্রিয় কিছু দুঃখিত কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মৃদু মৃদু বলিলেন "রাস্‌কাল! আচ্ছা তাকে আমি দেখে নেবো। কিন্তু আপনার কাছে আমিই অপরাধী হয়ে পড়লেম। আচ্ছা এবারে আমি বিশেষ জানাশোনা ভদ্রঘর দেখে আপনার জন্য খুব ভাল চাকরী ঠিক করে দোব দেখবেন।"

সুষমা নতমুখে বলিল "আমার আর চাকরীর ইচ্ছা নেই।"

বিশ্বপ্রিয় সলজ্জে মাথা হেঁট করিলেন এবং তারপর নত মুখেই কহিলেন "সংসারে মিঃ গুহ অল্পই জন্মায় জানবেন।"

সুষমা কহিল "তা, আমি জানি, কিন্তু আমার স্থান ও যে বড়ই স্বল্প পরিসর। ক'জন আমায় বাড়ী ঢুকতে দিতে রাজী হবেন?"

এই অকুণ্ঠিত ও নির্ভীক আত্মাভিব্যক্তিতে বিশ্বপ্রিয় একদিকে যেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তেমনি আর একদিক দিয়া ইহাতে তাঁহার আলোচনার পথও মুক্ত হইয়া গেল। তিনি তখন ঘরের মধ্যের দ্বিতীয় চৌকিখানি টানিয়া দিয়া সুষমাকে বলিলেন "বসুন, আপনার সঙ্গে এসম্বন্ধে আমি একটুখানি আলোচনা করতে চাই। আপনার বিষয়ে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে আমার যতটা জানা আছে, আব নিজেও যেটুকু আজ আপনাকে দেখেও আমি বুঝেছি, সাধারণ সমাজ আপনাকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবেনা আমার বিশ্বাস। আমি সবকথা জানিয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করবো এবং ধরে নিচ্চি, তাতেও যদি না কৃতকার্য্য হতে পারি, তাহলে — "

বিশ্বপ্রিয় একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল "আমার সমস্ত খবর পেয়েও কি ব্রাহ্মসমাজ আমায় তার মধ্যে স্থান দিতে প্রস্তুত হবে?"

প্রশ্নের ধরণে, আর ঐ 'সমস্ত' কথাটার উপর জোর দিয়া বলাতে বিশ্বপ্রিয় মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিয়া একটু যেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া এক রকমে জবাব তৈরি করিয়া লইলেন "'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম' সমাজ সে কথাটা জানে বৈ কি!"

সুষমা নিজের অস্পষ্ট হইয়া পড়া কণ্ঠস্বরকে সুস্পষ্টতর করিয়া তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল "জন্মগত অপরাধের কথা নয়; যে অধিকারে মিঃ গুহ আমায় অবমানিত করাকে অপরাধ বা পাপ বোধ করেন নি, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা কি আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি বদল করতে পারবেন? অথবা আমি যা আছি, লোকের মনে তাহাই থেকে যাব, অথচ যে দেবদেবীদের আমি মনে মনে বিশ্বাস করি, শুধু বাহিরে স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে তা করিনে, আর যে নির্গুণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার ধ্যান বা ধারণা কাছেও গিয়ে পৌঁছতে পারে না, সকলের মধ্যে সগর্ব্বে স্বীকার করে নিতে হবে যে, তাঁরই উপাসক আমি? এত পাপের মধ্যে আবার এতবড় একটা প্রতারণা কেন করতে যাব? হিন্দুসমাজে মেশবার অধিকার আমার নাই থাক্‌, তবুও মনে প্রাণে যে আমি হিন্দুই।"

এর পর আর বিশ্বপ্রিয় কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দু'একবার ক্ষীণ ভাবের প্রতিবাদ চেষ্টা করিতে গিয়া পরাভূতবোধে শেষে অনেক চেষ্টা করিবার পর নিজের সকল দ্বিধা ও লজ্জা সংবরণ করিয়া লইয়া তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতির সহিতই মরিয়াভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—

"এই সামান্য ক্ষণের কথায় বার্ত্তায় আপনাকে আমি চিনেছি। রাজার কথা,—সত্য কথাই বল্‌বো—পূর্ব্বে আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন আমি আপনার তেজস্বিতায় ও সরলতায় মুগ্ধ হয়ে সব কিছুই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে নিতে পেরেছি। আপনি আমাদের সমাজে আসতে চান; আমি সযত্নে আপনাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা করে তুলতে আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তুত হবো। আপনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে না আসতে চান, তা'হলে আপনাকে নিরাপদ ও সম্মানের স্থান দেবার জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিতই আপনাকে সিবিল ম্যারেজ অ্যাক্টের হিসেবে বিবাহ করতেও সম্মত জান্‌বেন। আপনার মত মহিলার এ অবস্থায় থাকা অনুচিত এবং যারা থাক্‌তে দেয়, তারা অপরাধী।"

সুষমা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উঁহাকে নমস্কার করিল, কৃতজ্ঞতার সজলকরুণস্বরে সে কহিল, "আপনি আমায় যে কথা মুখেও বল্‌তে পারলেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা' আমার চিরদিনই মনের ভিতর গাঁথা থাক্‌বে, কিন্তু আমি যে কোন সমাজের লোকের স্ত্রী হবার যোগ্যা নই; আমার সম্বন্ধে এখন থেকে আপনারা শুধু নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করেন, এই আমার শেষ ভিক্ষা।"

বিশ্বপ্রিয়রও আর বলিবার কথা যোগাইল না। দুজনেই বিদায় লইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

"হত ভাল যদি হতে কুৎসিত অথবা সে হ'তে বলী
ভয়ে আসিতনা ভালবাসিত না চরণে যেতনা দলি।"
—তীর্থ সলিল।

অশান্তির আগুন যখন জ্বলিতে আরম্ভ হয়, ইহার যেন শেষ দেখা যায় না। কোথা দিয়া ও কেমন করিয়া যে রাজা নরেশচন্দ্রের সহিত সুষমার বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবরটা দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল বলা কঠিন, কিন্তু কলিকাতার ধনী মহলে যাঁরা ও-সংবাদ রাখিয়া থাকেন এবং নরেশচন্দ্রের সুন্দরী আশ্রিতার সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ একটু আগ্রহ মনের মধ্যে চাপা ছিল, তাঁদের মধ্যের দুএক জন ধনীলোকের মোটর সুষমার দরজায় ধাক্কা মারিয়া গেল। কেহবা বন্ধু পাঠাইলেন। কানাই সিং হুকুমবরদারী করিল। রাজার পত্রবাহক ভিন্ন সকলকেই বিদায় করিয়া দিতে হুকুম ছিল,—ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা কানাইয়ের স্বভাব, কানাই সেই বিষয়ে কোন ত্রুটী দেখাইল না।

শেষে ডাক্তার করুণানিধান বাবু দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কি করা উচিত ঠিক না পাইয়া কানাই সিং মুনিবকে খবর দিতে গেল। ডাক্তার নোটবুকের পাতা ছিঁড়িয়া পেন্‌সিলে লিখিয়া দিলেন,—সে যে কাহারও সহিত দেখা করিতেছে না, তাহা তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু তার সঙ্গে কথা স্বতন্ত্র। তিনি সুষমার বাল্যকালে কতবার রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আসিয়া তার গান শুনিয়া গিয়াছেন যে। তখন হইতেই তিনি সুষমার জন্য পাগল, কেবল নরেশের বন্ধুত্বের খাতিরেই এতদিন চুপ করিয়াছিলেন, তাঁর স্ত্রী মারা গিয়াছে।—সুষমার রূপ ধ্যান করিয়া তিনি আর নূতন সং সাজিতে পারেন নাই।

কানাই সিং ঈষৎ ক্ষুব্ধভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, "আজ নয়, কাল আসিবেন।" এদের উদ্দেশ্য সেও বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সুষমার কার্য্যে তার বুক অহঙ্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এবার তাহা চূর্ণ হইতে বসিল, ভাবিয়া সে মর্ম্মে আহত হইল।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণচিত্তে নিজের খাটিয়ায় বসিয়া পড়িয়া সবেমাত্র উচ্চারণ করিয়াছে "সীতারাম! সীতারাম!"—এমন সময় উপর হইতে ডাক আসিল "সিং জী!"

মুখভার করিয়া কানাই গিয়া নিরুত্তরে কাছে দাঁড়াইল, বিস্মিত হইয়া দেখিল, ঘরের মেজেয় বসিয়া সুষমা চোখ মুছিতেছে, বোধ করি কাঁদিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই সে আহত শিশুর ন্যায় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মর্ম্মবিদারীস্বরে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল "সিংজী, ভাইয়া! আরতো আমি এদেশে থাকতে পারচিনে, আমায় তোমার দেশে তুমি নিয়ে চলো।"

কানাই সিং এই দু দিনের ব্যাপারে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াই ছিল। সে যেমন প্রীত তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া রুখিয়া উঠিল "বউয়া! তুই কাঁদিস্ না, তুই হামার বেটী আছিস, বেটীসে বড় করে হামি তোকে মেনেছি, হামি তোর হুকুম পেলে ওই দুষমন্-বাবুদের নাক ভেঙ্গে দিতে পারি। তুই হুকুম দে দেখি তোকে কোন জানোয়ার কাঁদাতে আসতে পারে।"

সুষমা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল "না কানাই ভাইয়া! কারুকে আমি কিছু বলবো না। ওদের দোষ কি? ওরা চিরদিন আমাদের মতন লোকেদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে আসতে পেরেছে, পারছে, ওরা তাই জানে। আমাদের মধ্যেও যে মানুষের প্রাণ আছে, ইজ্জৎবোধ আছে, তাতো কোনদিন কেউ ভাবতে শেখেনি। সমাজ তো আমাদের রক্ষার কোন উপায় করেনি, কেউতো আমাদের দোরে দোরে গিয়ে উদ্ধারের উপদেশ শোনায়নি, আমাদের নিয়ে শুধু পুতুল খেলাতে পেরেচে। আমরা যে মানুষ সেটুকু শুদ্ধু ভুলে গেছে। ওদের বলবার আছে কি? এর জন্য আমরাও যে দায়ী।"

কানাই সিং রাগিয়াই ছিল, সে তেমনি উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "রাজা বাবুরই তোমার খবর না লেওয়া খুব কসুর হচ্চে। হামি এখনি গিয়ে সব হাল উঁকে জেনিয়ে আসচি।"

"সিংজী ভাইয়া! আমায় একলা রেখে যেওনা, তবে আমায় শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে চলো।"

কানাই যেন এতক্ষণের পর নিজে আশ্বস্ত হইয়া উহাকেও আশ্বস্ত করিতে চাহিয়া বারবার করিয়া বলিতে লাগিল ; "তাই চল্ বউয়া ! তাই চল্ হামার রাজাবাবু তোকে দুঃখু পেতে দেবেনা ; এমন করে থাকলে তুই মরিয়ে যাবি।"

বেলা তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে পাখার হাওয়ায় গ্রীষ্মতাপ কিছুই অনুভূত হইতেছিল না বটে ; তবে বহির্জগতে তখনও পচা ভাদ্রের রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ বেলা অবসানের পথে আলস্য শ্লথ গতিতে ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতেছিল, যাইবার জন্য তার বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিলনা। পশ্চিমাকাশে সূর্য্যের দেখা নাই ; কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী রাজার শাসনকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যেমন তাঁহার শাসন প্রভাব কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শাসিত প্রদেশকে প্রভাবান্বিত রাখে, তেমনি তাঁর মহিমাজাল তখনও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে গৌরব বিস্তৃত করিতেছিল। নরেশচন্দ্র নিজের আফিস ঘরে দু'একজন কর্ম্মচারীর সহিত কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন ; এইবার উঠি উঠি করিতেছেন এমন সময় কানাই সিং দ্বারে দাঁড়াইয়া বারকতক কাশিয়া নিজের পরে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া লইল এবং তারপর সেলাম ঠুকিয়া ডাকিল "মহারাজ !"

"কে ? কানাই সিং ? যুগল ! পালমশাই ! আজ আমি এইবার উঠি কাল আর একবার ঐ খসড়াটা ভাল করে দেখেশুনে দেওয়া যাবে।"

নরেশ কানাই সিংয়ের কাছাকাছি হইয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের খবর ভাল তো কানাই সিং ?" হাতে চিঠি আছে কিনা দেখিয়া লইলেন।

কানাই সিং দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "খবর কাঁহা কিছু আচ্ছা হায় মহারাজ ! বউয়াজী বহুত তক্‌লিবসে হ্যায়। হাম উন্‌কো সাথ করকে হিঁয়া লে আয়া।"

"নিয়ে এসেছ ! তাকে !—" নরেশ যেন ভয়ত্রস্তভাবে চমকিয়া উঠিলেন।—"কি হয়েছে তার ? আমায় খবর দিলেই হোত।"

কানাই সিং সুষমাকে সত্যসত্যই ভালবাসিয়াছিল, একেই সে সুষমার প্রতি 'মহারাজের' ব্যবহারকে প্রশংসা করিতে কোনমতেই সমর্থ হইতেছিল না, তার উপর ইঁহার সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অথচ সুষমার অর্থাভাবে অবমাননাজনক চাকরী করিতে যাওয়া, বিশেষ তাহারই পরিণামে এত দুঃখভোগ, তাহার মনকে অত্যন্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে সুষমার আগমন সংবাদে নরেশকে বিপন্নভাবাপন্ন দেখিয়া সে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। মনীবের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া সে অভিমান-পরিপূর্ণ বিরক্তস্বরে জবাব দিল, "মহারাজ ! হুকুম ফরমাইয়েতো হাম হামারা বউয়াজীকো আপনা দেশপর যাঁহা হামারা বেটী পুতো হ্যায় হুঁয়াই লে চলে, লেকেন গরীব পরবর ! গরীবকা বাচ্চা কো উপর এইসা বেখেয়াল হোকে রহ্‌না ঠিক বাত নেই হ্যায়।"

ভৃত্যের নিকট তিরস্কৃত হইয়া নরেশচন্দ্রের চিন্তা-বিপন্নতা গভীর লজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। আত্মচিন্তায় বিরত হইয়া তখন আস্তে আস্তে উহাকে প্রশ্ন করিলেন "সুষমা কোথায় ?"

গাড়ীর মধ্যে ফটকের বাহিরে আছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কানাই সিংয়ের সহিত অগ্রসর হইলেন।

পিছনে কর্ম্মচারী দুজনের মধ্যে যুগল তখন নিম্নস্বরে অপরজনকে সম্বোধন করিল "ব্যাপারখানা শুন্‌লে তো পাল মশাই! বাইজী সাহেব যে বাড়ী চড়োয়া হয়ে এসে উপস্থিত হলেন দেখছি। আসা যাওয়া কমেছে কিনা, অম্‌নি গেরো কষতে বাড়ী বয়ে ছুটে এসেছেন।"

পালমশাই চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া মুচকিহাসির সহিত টিপ্পনী কাটিল "ভাইরে ওরা হলো জলের কুমীর, ওদের দাঁতের মধ্যে যার গর্দ্দান পড়েচে সে কি আর কখন তা' বার করে নিতে পারে? এতো রাঘব বোয়াল নয় যে উগরে দেবে।"

"এইবারেই আমাদের রূপসী রাণী ঠাকরুণটীর সিংহাসন টলমলে হলো, যা হোক ভাই, আমার কিন্তু একবারটী ওর রূপখানা কোন রকমে দেখে চক্ষু দুটো সার্থক করে নিতে হবে। শুনেছি নাকি মাগীটা আরমানী বিবি।"

পাল কহিল "দুর ছোঁড়া! আরমানী কেন হতে যাবে, সে যে কাশ্মীরী।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

বীর হাম্বীর

ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। এ সময়ে একদিকে মোগল পাঠানের অস্ত্র ঝঞ্ঝনায় যেমন বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিতেছিল, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের রসাস্বাদনে সকলে নব নব প্রীতি অনুভব করিতেছিল, আবার কাব্য রসের মধুর ধারাও বঙ্গপল্লীকে আপ্লুত করিয়া তুলিতেছিল। দায়ুদ খাঁ, কতলু খাঁ ও ওসমানের রণভেরীর সঙ্গে ঈশা খাঁ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের সমর-দুন্দুভি যেমন বাজিয়া উঠিতেছিল, তেমনি তোড়রমল্ল, আজিম খাঁ এবং মানসিংহেরও বিজয়-বাদ্যে চারিদিক কম্পিত হইতেছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে সকল দিকে যেমন প্রীতির স্রোত বহিয়া যাইতেছিল, তেমনি আবার মুকুন্দরামের চণ্ডী গানে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে মধুরতার তরঙ্গ ছুটিয়া চলিতেছিল।

এই যুগে যাঁহার নাম পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার কিছু পরিচয় দিতেছি। সেই পুরুষ সিংহ রাজা বীর হাম্বীর নামে প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম বঙ্গের পার্ব্বত্য ও অরণ্য-সঙ্কুল প্রদেশে এক প্রাচীন রাজবংশ বহুকাল হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সপ্তম শতাব্দী হইতে তাঁহাদের রাজত্বের আরম্ভ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই রাজবংশ উত্তর ভারতবর্ষ হইতে আগত বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। ইঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণে ইঁহাদিগকে বাগদী রাজাও বলিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের বাগদী জাতির উপর ইঁহাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হওয়ায়, সম্ভবতঃ তাঁহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই রাজবংশ মল্ল-রাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ। যিনি এই বংশের আদি পুরুষ, তাঁহার নাম রঘুনাথ মল্ল, তিনি আদি মল্ল নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। আদি মল্ল লাউ গ্রামে আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ৬৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে মল্লাব্দ প্রচলিত হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আদিমল্লের পুত্র জয়মল্ল তৎকালীন পশ্চিম বঙ্গের অধীশ্বর পদমপুরের রাজাকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম বঙ্গের আধিপত্য লাভ করেন, এবং বিষ্ণুপুর তাঁহার রাজধানী হইয়া উঠে। জয়মল্লের সময় হইতে বিষ্ণুপুর মল্ল রাজবংশের রাজধানী হইয়া আসিতেছে। এই বংশের ৪৮ জন রাজার রাজত্বের পর বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরের সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি রাজা ধাড়ি মল্লের পুত্র বলিয়া মল্লরাজগণের বংশপত্র হইতে জানিতে পারা যায়। বীর হাম্বীরের রাজত্ব লাভের কিছু পূর্ব্বেই বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন পাঠান অধিপতি দায়ুদ খাঁ মোগল হস্তে আপনার মস্তক বলি প্রদান করেন। বাঙ্গলায় মোগল রাজত্বের সূচনা হইল বটে, কিন্তু পাঠানেরা তখন পর্য্যন্তও স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া বঙ্গভূমির পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপেই তাহাদের করতলগত হয়। দায়ুদের অনুচর কতলু খাঁ পাঠানদিগের নেতৃস্বরূপে উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম বঙ্গ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর প্রদেশ পাঠানদিগের অধিকারভুক্ত হয়, দামোদর নদ মোগল পাঠানের রাজ্য সীমা হইয়া উঠে। মোগল সুবেদার খাঁজান, আজিম খাঁ ও সাহাবাজ খাঁর সহিত ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষের পর মোগলেরা কতলু খাঁকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। পাঠানেরা বঙ্গদেশে কোনরূপ অত্যাচার করিবে না বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। সাহাবাজ খাঁ তাহাদের সহিত এইরূপভাবে সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠানেরা সন্ধি পত্রের কথা পালন না করিয়া, আবার বঙ্গদেশে আপনাদের পতাকা উড়াইতে আরম্ভ করে, এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থল অধিকার করিয়া বসে। বিষ্ণুপুরের রাজারাও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

বাঙ্গলার এইরূপ রাজনৈতিক অবস্থার সময়েই বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরূঢ় হন। পাঠানেরা তাঁহাকে তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করে। কতলু খাঁর সে আহ্বান বীর হাম্বীরকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল, তিনি আপনার সৈন্য-সামন্ত লইয়া পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া, মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাঠানদিগের পতাকামূলে

উপস্থিত হইয়া, তিনি তাহাদেরই সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হন। সেই সময়ে রাজা মানসিংহ বাঙ্গলা ও বিহারের সুবেদার হইয়া আসিলেন। সৈয়দ খাঁ তাঁহার সহকারীরূপে বাঙ্গলার শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। পাঠানেরা আবার যখন বঙ্গদেশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন মানসিংহ বিহার হইতে ঝাড় খণ্ডের পথে উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করিতে ইচ্ছুক হন। মানসিংহ ভাগলপুরে উপস্থিত হইয়া, সৈয়দ খাঁকে তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। কিন্তু সে সময়ে বর্ষাকাল আগত প্রায় বলিয়া, সৈয়দ খাঁ রাজাকে বর্ষা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। মানসিংহ অগত্যা তাহাতেই সম্মত হন। ১৫৯১ খৃঃ অব্দে তিনি বর্দ্ধমানের পথে উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করিয়া, দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্ত্তী জাহানাবাদে শিবির সন্নিবেশ করেন। বিহার খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গলার গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হন। রাজা জাহানাবাদে বর্ষা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া, সৈয়দ খাঁর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কতলু খাঁ পাঠানগণকে সমবেত করিয়া, উড়িষ্যা হইতে মোগল শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি জাহানাবাদ হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে ধরাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং বহু সৈন্যসামন্ত দিয়া বাহাদুর খাঁকে রায়পুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। বাহাদুর খাঁ রায়পুরে উপস্থিত হইলেন, রাজা মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে একদল সৈন্যের সহিত বাহাদুরের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। বাহাদুর তখন বাধ্য হইয়া দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল, এবং সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। কিন্তু তলে তলে কতলুর নিকট সাহায্যের জন্য সংবাদ দিল। কতলু তৎক্ষণাৎ বাহাদুরের সাহায্যের জন্য অনেক সৈন্য পাঠাইলেন। জগৎ সিংহ পাঠানদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, নিশ্চিন্ত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বীর হাম্বীর সময়ে পাঠানদিগের সাহায্যের জন্য আপনার লোক জন লইয়া বাহাদুর খাঁর সহিত যোগ দিয়াছিলেন। পাঠানেরা যে জগৎ সিংহকে আক্রমণ করিবে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া, জগৎ সিংহকে সতর্ক হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু জগৎ সিংহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে পাঠানেরা জগৎ সিংহের শিবির আক্রমণ করিয়া বসিল। তখন তিনি শিবির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বীর হাম্বীর তাঁহাকে এই ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া গেলেন। রাজা মানসিংহ এই সংবাদ অবগত হইয়া কি কর্ত্তব্য তাহারই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিকাংশের মতে জাহানাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, সলিমাবাদে পিছাইয়া যাওয়া স্থির হয়। কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া, পাঠানদিগকে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করেন। ইতিমধ্যে মোগলদিগের সৌভাগ্যক্রমে দশ দিনের পীড়ায় কতলু খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। পাঠানেরা তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। এদিকে অত্যন্ত বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় ও মোগল সৈন্যেরা অবসন্ন হইয়া পড়ায়, রাজা মানসিংহ পাঠানদিগের প্রস্তাবে সম্মত হন। সম্রাট আকবরের নামে

আদেশ প্রচার ও মুদ্রা অঙ্কিত করিতে পাঠানেরা স্বীকার করিয়া লয়। সমগ্র দেশবাসীকে বাদশাহের অনুগত ও বাধ্য থাকিতে হইবে, জগন্নাথ প্রদেশ মোগলদের অধীনে থাকিবে, এবং রাজভক্ত জমিদারগণের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না বলিয়া স্থির করা হয়। পাঠানেরা চাতুর্য্য ও কাপট্য অবলম্বন করিয়া, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। কতলুর পুত্র সাহারিয়র দেড় শত হস্তী ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া মানসিংহের নিকট উপস্থিত হন, ও তাঁহাকে নজর প্রদান করেন। তখন রাজা মানসিংহ আবার বিহারে ফিরিয়া যান।

এই সময় হইতে বীর হাম্বীর সম্পূর্ণরূপে মোগলদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে যখন সাহাবাজ খাঁর সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যা মাত্র লইয়া পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করে, সেই সময়ে বীর হাম্বীরের পিতা ধাড়িমল্ল মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মোগল সুবেদারকে রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।* তাহার পর আবার পাঠানেরা বিষ্ণুপুর রাজ্য তাহাদের অধিকারভুক্ত করিলে, বীর হাম্বীর তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য হন। মানসিংহের সময় হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপেই মোগল পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেজন্য পাঠানেরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। যতদিন পর্য্যন্ত কতলুর উকীল খাজা ঈশা জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি পাঠানদিগকে শান্তভাবেই রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পাঠানেরা আবার মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। তাহারা জগন্নাথদেবের মন্দির অধিকার করিয়া বসিল, এবং মোগলভক্ত বীর হাম্বীরের রাজ্যেও অনেক উপদ্রব ঘটাইল। মানসিংহ তখন আবার পাঠানদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে স্থলপথে ও জলপথে মোগলবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করিল। বাঙ্গালার নায়েব সুবেদার সৈয়দ খাঁ কিছুদিন পরে আসিয়া যোগ দিলেন। ক্রমে পাঠানদিগের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন আবার পাঠানের সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। মানসিংহ তাহাতে সম্মত না হইয়া, ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাঠানেরা মেদিনীপুরের জঙ্গলে অবস্থিতি করিতেছিল। সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায়, তাহারা সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া, মোগলদিগকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল। কতলুর পুত্রগণ তাহাদিগকে চালিত করিতেছিলেন। সেই সময়ে খাজা ঈশার পুত্র ওসমান খাঁও পাঠানদিগের অন্যতম নেতা হইয়া উঠেন। মোগলের কামান গর্জ্জনে পাঠানগণের হস্তিসকল বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহাদের গোলাবর্ষণে পাঠান সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অদম্য উৎসাহে অস্ত্র চালনা করিয়াও মোগল-সৈন্যের সম্মুখে পাঠানেরা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মানসিংহ অগ্রসর হইয়া, জলেশ্বর অধিকার করিলেন। পাঠানেরা কটকদুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিল। কটকের জমীদার রামচাঁদ পাঠানদিগেরই পক্ষ অবলম্বন

---

* Bengal District Gazetteers Bankura ধাড়িমল্লের স্থলে ধাড়ি হাম্বীর লিখিত আছে। ধাড়ি হাম্বীর বীর হাম্বীরের পিতা নহেন,—পুত্র,—ধাড়ি মল্লই তাঁহার পিতা।

করিয়াছিলেন। মানসিংহ কটকে উপস্থিত হইয়া, সৈন্যদিগকে দুর্গ অবরোধ করার জন্ত আদেশ দিলেন। এই সুযোগে তিনি পুরীধামে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথ দেবের দর্শনপূজাদি করেন। দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পাঠানেরা আবার সন্ধির প্রস্তাব করিতে থাকে। মানসিংহ পুরী হইতে কটকে ফিরিয়া আসিয়া, সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। সন্ধিতে উড়িষ্যা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। পাঠানেরা বাদশাহকে তাহাদের হস্তিসকল প্রদান করিয়া শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে স্বীকার করে। কটকের জমীদার বাদসাহের রাজকোষে রাজস্ব দিতে বাধ্য হন। পাঠানেরা খলিকাবাদ বা যশোহরে জায়গীর প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের সহিত উড়িষ্যাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তাই বঙ্গকবি গাহিয়াছিলেন,——

"ধন্ত রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপাদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধীপ।"

কিন্তু ইহার পরও পাঠানেরা শান্তভাব অবলম্বন করে নাই, ওসমান খাঁর অধীনে তাহারা আবার রণভেরী নিনাদিত করিয়া বঙ্গরাজ্যে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে থাকে। মানসিংহ আবার তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ক্রমে পশ্চিমবঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লয়। অবশেষে সুবেদার ইসলাম খাঁ চিস্তির সময়ে ওসমান খাঁ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিলে বাঙ্গালায় পাঠান বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পশ্চিমবঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় এবং রাজা বীর হাম্বীরও শান্তিতে বাস করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি ধর্ম্মালোচনায় মন দিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করায়, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মে। কিরূপে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট তিনি শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে, তাহা বলিতেছি। শ্রীনিবাসাচার্য্য নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে বাল্যকালে অধ্যয়নাদি করিয়া, পিতার মৃত্যুর পর মাতাকে লইয়া কাটোয়ার নিকট যাজিগ্রামে মাতামহালয়ে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া, চৈতন্যদাস নাম পাইয়াছিলেন। পিতার নিকটে চৈতন্যলীলা শ্রবণ করিয়া, শ্রীনিবাসের চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি জন্মে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি এসময়ে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস গৌড়ভক্তগণের দর্শনের জন্য পুরীধাম ও নবদ্বীপাদি ভ্রমণ করিয়া, বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেই সময়ে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া জীবগোস্বামী শ্রীনিবাসকে 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। গৌড় দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচারের জন্য জীবগোস্বামী প্রভৃতি শ্রীনিবাসাচার্য্যকে ভক্তিগ্রন্থাবলী সহ পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে নরোত্তম এবং

শ্যামানন্দও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য গোস্বামীরা আদেশ করেন। তখন শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ তিনজনে মিলিয়া গৌড়-দেশাভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহারা ক্রমে বিষ্ণুপুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, রাত্রিকালে নিদ্রিত হইলে, বীর হাম্বীরের লোকেরা তাঁহাদের গ্রন্থগুলি লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা সেই গ্রন্থরত্নসমূহ দেখিয়া, সযত্নে রাখিয়া দেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গ্রন্থসমূহ অপহৃত হইয়াছে জানিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইয়া পড়েন। পরে নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে পাঠাইয়া দিয়া, শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর নগরে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজা বীর হাম্বীরের লোকেরা তাঁহার গাড়ী লুট করিয়া, গ্রন্থগুলি লইয়া আসিয়াছে। নগরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায়, তাঁহাকে লইয়া তিনি রাজসভায় গমন করেন। রাজা তখন তাঁহার সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রীনিবাসের সহিত আলাপ পরিচয়ের পর রাজা তাঁহাকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলে, শ্রীনিবাস তাহাতে সম্মত হইয়া, এরূপভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, রাজা তাহাতে বিহ্বল হইয়া, আচার্য্যের চরণে লুটাইয়া পড়েন, এবং তাঁহারই গ্রন্থরত্ন অপহৃত হইয়াছে জানিয়া, সমগ্র গ্রন্থ শ্রীনিবাসকে ফিরাইয়া দেন। রাজা তাঁহার শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে, শ্রীনিবাস তাঁহাকে প্রথমে হরিনাম উপদেশ দিয়াছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিবেন বলিয়া অবগত করান। বিষ্ণুপুর হইতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে তথায় বিবাহাদি করিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে গমন করেন, ও তথা হইতে তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্যামানন্দের সহিত আবার বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং রাজা বীর হাম্বীরকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই সময় হইতে জীবগোস্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার চৈতন্যদাস নাম হয়। রাজা বীর হাম্বীর কালাচাঁদ নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বীর হাম্বীরের তৃতীয় পুত্র রাজা রঘুনাথ সিংহ ৯৬২ মল্লাব্দে বা ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে কালাচাঁদের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কালাচাঁদের মন্দিরের শিলালিপি হইতে তাহা জানা যায়। বিগ্রহ সকলের সেবার তত্ত্বাবধানের জন্য রাজা বীর হাম্বীর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষকে কামদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বীর হাম্বীরের মহিষী রাণী সুলক্ষণা ও জ্যেষ্ঠপুত্র ধাড়ি হাম্বীরও শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরের অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্য্যকে বিষ্ণুপুরে বাস করাইয়াছিলেন। গুরুর ও তাঁহার প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের নিকট হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া, বীর হাম্বীর অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। একসময়ে বীররস যাঁহার আদরের বস্তু ছিল, এক্ষণে শান্তরসে নিমগ্ন হইয়া আসিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই অভিলাষ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি একজন বৈষ্ণব প্রধান বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের রসাস্বাদন করিয়া, বৈষ্ণবগ্রন্থাদি ও পদাবলী আলোচনা করিয়া, রাজা বীর হাম্বীরের পদ রচনার ও ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি কাব্যরসেরও রসিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের সঙ্গে রাজা বীর হাম্বীরেরও নাম গ্রথিত আছে। তাঁহার দুইটি প্রসিদ্ধ পদ যাহা সাধারণতঃ বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের মধুর রসে নিমগ্ন হইয়া যান, তাঁহাদের মনে স্বতঃই কবিতার স্ফুরণ হয়। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃপালাভ করিয়া, যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনায় নব নব প্রীতি অনুভব করিতেছিলেন, তখন বাগ্দেবী যে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহবর্ষণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিক বীর হাম্বীরের পদাবলী তাঁহাকে একজন পদকর্ত্তা বলিয়াই প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে সময়ে বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণ আপনাদের পদরচনায় বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, বীর হাম্বীরও সে সময়ে চৈতন্যদাস নামে তাঁহাদের পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। * এইরূপে আমরা বীর হাম্বীরকে তিন রসেরই রসিক বলিয়া জানিতে পারি।

বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের রক্ষিত মল্লরাজগণের বংশপত্র হইতে জানা যায় যে, বীর হাম্বীর ৮৯৩ মল্লাব্দ বা ১৬৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে ৯২৫ মল্লাব্দ বা ১৭১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আকবরনামায় লিখিত তাঁহার কথা এই সময়ের মধ্যেই পড়িয়া যায়। তদ্ভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং পঞ্চকূট রাজগণের বংশপত্র হইতেও ঐরূপই স্থির হইয়া থাকে। বীর হাম্বীরের পরবর্ত্তী রাজগণের মন্দিরলিপির সময়ও ইহার সমর্থন করে। পশ্চিমবঙ্গের পাঠানগণের উপদ্রব নিবারিত হইলে, ১৫৯৩ খৃঃ অব্দের পরে শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় †।

* "শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ভ'য়ে তাহা নাহি জানাইল॥" —ভক্তিরত্নাকর।

দীনেশচন্দ্র তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে চৈতন্যদাসের ১৫টি পদের উল্লেখ করিয়াছেন।

† শ্রীনিবাস ভক্তিগ্রন্থ সমূহের সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতও আনিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত রচনার সময় ১৫৩৭ শক বা ১৬২৫ খৃঃ অব্দ বলিয়া যে মত প্রচলিত আছে, বীর হাম্বীরের সময় আলোচনা করিলে, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে ১৫০৩ শক বা ১৫৮১ খৃঃ অব্দ এবং ১৫৭৩ খৃঃ অব্দ ইহার রচনার সময় বলিয়াও জানা যায়, ইহাদের কোনটিতে উহা রচিত হইয়া থাকিবে। পঞ্চকূটের রাজা হরিনারায়ণ সিংহ বীর হাম্বীরের সমসাময়িক ও শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থে জানা যায়। পঞ্চকূট রাজগণের বংশপত্রে তিনি ১৫১১ শক বা ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৪৭ শক ১৬২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার সময়ে তিনটি মন্দির নির্ম্মিত এবং বিষ্ণুপুর দুর্গের সংস্কার সাধিত হয় বলিয়া কথিত হইয়া আছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার পৌত্র বীরসিংহ বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মল্লরাজ বংশের দ্বিতীয় রাজা জয়মল্ল হইতেই বিষ্ণুপুর দুর্গের সূচনা হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রাজা বীর হাম্বীর হইতেই বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, এবং বিষ্ণুপুরের রাজগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের রক্ষকস্বরূপ হইয়া উঠেন। বীর হাম্বীরের পর বিষ্ণুপুরের সকল রাজাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গোপাল সিংহের প্রবল অনুরাগের কথা আজিও বিষ্ণুপুরে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমরা রাজা হাম্বীর সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহারই আলোচনা করিলাম। দুঃখের বিষয় এই সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ পাইবার উপায় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস বলিলে, বাঙ্গালীজাতিরই ইতিহাস মনে করা উচিত, কয়েকজন রাজা বাদশাহ বা সুবেদারের সৈন্য পরিচালনাকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে না।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

আক্কেল সেলামী

আমার বাবা মফস্বলে ডাক্তারি করতেন, আর আমি সেখানকার হাই-স্কুলে লেখাপড়া শিখ্‌তাম। কলকাতায় খুব ছেলে বেলায় একবার গিয়েছিলাম, সেখানকার কথা ভাল করে মনেই ছিল না। আমি যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তখন বাবা কি কাজে কলকাতায় গেলেন, স্কুলের ছুটি ছিল বলে আমাকেও সঙ্গে নিলেন। আমরা গিয়ে আমার মেশোমশায়ের বাড়ীতে উঠ্‌লাম। মাসীমা, মেশোমশাই, আমার মাসতুতো বোন আশা তিনজনেই আমাদের পেয়ে খুব খুসী হয়ে উঠলেন। আশা আমার চেয়ে মাস তিনেকের ছোট হলেও পরম ভক্তি ভরে আমায় দাদা বলে ডাক্‌তে আরম্ভ করল। সেও বেথুন স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়্‌ত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মেশোমশায় আমাদের পড়া জিজ্ঞেস করতে লাগ্‌লেন। আশা আমার চেয়ে ঢের ভাল উত্তর দিল। আমার ভুলগুলো কিন্তু সবাই আমার বুদ্ধির অল্পতার ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের স্কুলের পড়ানর দোষ বলেই ধরে নিলেন। মেশোমশাই বাবাকে বল্‌লেন— প্রভাতকে ঐ পাড়াগেঁয়ে স্কুলে না পড়িয়ে কলকাতায় পড়ালে হয় না? আমার এখানে থেকেই পড়্‌বে।

নানা কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল আমি মেশোমশাইএর বাড়ীতে থেকেই পড়্‌ব। বাবা দেশে ফিরে গেলেন।

আমি সহরের জলহাওয়ায়, আর মেশোমশাইএর বাড়ীর সাহেবী আবহাওয়ায়, বেশ সুসভ্য হয়ে উঠ্‌লাম। ছুটিতে যখন বাড়ী যেতাম তখন সেখানকার ছেলেরা আমায় দেখে অবাক্ হয়ে থাক্‌ত।

একটা বিষয়ে আমি মোটেই 'আপ্ টু ডেট্' অর্থাৎ 'কেতা দুরস্ত' হতে পারি নি। মেয়েদের দেখলেই আমার বিষম লজ্জা উপস্থিত হত। আশার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ভাব ছিল, কিন্তু তার বন্ধুরা কোন দিন আমাদের বাড়ীতে এলে আমি কনে বউটির মত লুকিয়ে থাক্‌তাম।

আশা তার এক বিশেষ বন্ধু রমলার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিছুতেই আমাকে রাজি করাতে পারেনি। মেয়েদের সঙ্গে মিশতাম না বটে কিন্তু ঐ জাতটি সম্বন্ধে মোহ আমার কিছু কম ছিল না। তাদের চোখে একজন 'হিরো' প্রতিপন্ন হবার ইচ্ছেটা খুবই ছিল ; কিন্তু স্বাভাবিক সঙ্কোচ সে ইচ্ছার পথে অন্তরায় ছিল।

তবু আশা যখন এসে গল্প করত যে মেয়েরা আমার বাঁধান খাতা, কি মলাট দেওয়া বইএর প্রশংসা করেছে, তখন মনে মনে আমি গর্ব্বিত হয়ে উঠতাম। আশা আরও বল্‌ত—আমার মত দাদা বড় দেখা যায় না যে বোনের এত কাজ করে দেয়।

এসব শুনে আমি আরও খুসী হয়ে আশার খুঁটি নাটি ফরমাস্ গুলো খাটতাম। সেটা যে নিজের বোনকে সাহায্য করার চেয়ে অন্যের বোনের 'তারিফ' পাওয়ার জন্যেই, তা আশা বেচারী বুঝ্‌ত না। পুরুষ মানুষের মনস্তত্ব সম্বন্ধে সে অতটা বিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি বলে আমার কাজগুলো, তার প্রতি গভীর স্নেহের নিদর্শন মনে করে বেজায় কৃতজ্ঞ হয়ে উঠত।

দুবছর কেটে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে আমরা দুই ভাই বোনে কলেজে ঢুকলাম। এই সময়ে মেশোমশাইএর শরীর খুব খারাপ হওয়াতে ডাক্তারেরা তাঁকে হাওয়া বদলাতে যেতে বললেন। মাসীমাকেও সঙ্গে যেতে হল। আশার পড়ার ক্ষতি হবে বলে মাস ছয়েকের জন্যে হোষ্টেলে থাকা ঠিক হল। আমিও এক মেস্-এ উঠলাম। আশার 'ভিজিটার্স লিষ্ট'এ একা আমারই নাম রহিল।

আমি নিয়মিতভাবে আশার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম আর প্রত্যেক বারই তার নানা রকম জিনিস কিনে দেবার ফরমাস নিয়ে আস্‌তাম।

একবার এক প্যাকেট চিঠির কাগজ কিনে দেবার পরে আবার এক প্যাকেট কিন্‌বার ফরমাস হল।

আমি অবাক হয়ে বল্‌লাম—সে কি! এই ক' দিনেই অত কাগজ ফুরিয়ে ফেল্‌লে ?

আশা লজ্জিত হয়ে বল্‌ল—না, এ আমার জন্যে নয়, আর একটি মেয়ের। ওদের

কেউ কিনে দেয় না বলে ওরা আমাকে দিয়ে সব কেনায়। তুমি পাছে বিরক্ত হও এতগুলো জিনিস কিনতে, তাই আমার বলে চালাচ্ছিলাম। তা দেখ প্রভাত দা', রাগ কোর না, 'তোমার মত লক্ষ্মীছেলে দেখা যায় না' মেয়েরা সবাই একথা বলে।

আমি মনের আনন্দটুকু গোপন করে গম্ভীর হয়ে বললাম—তা আর কি হয়েছে, কিনে দেবো এখন।

এইভাবে ফরমাস খেটে অন্তরালবর্ত্তিনীদের খুসী করেছি মনে করে আমারও দিন খুসীতে কাটত।

একদিন আশা আমার হাতে একপাটি জুতো আর ৬॥০ টাকা দিয়ে বলল—দুদিনের মধ্যে এই মাপে একজোড়া খুব ভাল জুতো কিনে দিতে হবে। ভূপেন বাবুর মেয়ের বিয়েতে তার 'ক্লাস্ ফ্রেণ্ডস্'দের সব নেমন্তন্ন হয়েছে। এদিকে রমলার মোটেই ভাল জুতো নেই—না কিনে দিলেই নয়।

কি আর করি? টাকা ক'টা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জুতোর মাপ দেখলাম—বেশ ছোট্ট পা খানি! রমলার গল্পও আশার কাছে কতই শুনি। পড়ায় তার মত ক্লাসে কেউ নেই। 'ম্যাট্রিক্' পড়বার সময় সে আই, এ কোর্স প্রায় নিজে শেষ করে ফেলেছিল।

জুতোটি হাতে নিয়ে রমলার রূপ সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করতে করতে ট্রামএ উঠে 'চাঁদনীর' দিকে চললাম। নিশ্চয়ই তার ছোট্ট পা দুখানি খুব সুন্দর। খুব ভাল দেখে জুতো কিনতে বলেছে। তা'ত কিনতেই হবে। নয়ত অমন চমৎকার পায়ে মানাবে কেন? তবে ৬॥০ টাকায় খুব ভাল জুতো পাব কি? কল্পনায় রমলার পা ধ্যান করতে করতে জুতোখানা প্রায় বুকে চেপে ধরে বাইরে চেয়ে দেখি 'চাঁদনী' এসে পড়েছে!

ট্রাম থেকে নেবে দোকান ঘুরতে আরম্ভ করলাম। চীনে বাড়ীর জুতো বেশ সস্তা দামেই ছিল। তা' আমার পছন্দ হল না। কোমল পায়ে অমন খসখসে চামড়া যে ব্যথা দেবে। ৬॥০ টাকায় বিলিতি জুতো বিশেষ 'পছন্দ সই' দেখলাম না। 'নিউ মার্কেট' যাব কি না ভাবছি, মনে হল বিলিতি দোকানে 'সেল্' হচ্ছে সস্তায় হয়ত ভাল জিনিস পেতে পারি।

'হল এণ্ড এণ্ডার্সন্'এ প্রথম ঢুকলাম। সেখানে জুতোর 'ষ্টল'এ গিয়ে আমার বাঁশবনে ডোম-কানা-গোছের অবস্থা হল। বুঝতেই পারিনা কোনটা নি! যেটা পছন্দ হয় সেটাই দেখি হয় ৩০৲ নয় ৪০৲ টাকা।

বহুকষ্টে কমদামের দিকে গিয়ে একটা পছন্দ করলাম। দাম শুনলাম—৩৩৸৴০। সেখান থেকে বেরিয়ে 'হোআইট্এওয়ে লেড্ল'তে ঢুকে পড়লাম। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে যেখানে হাফ প্রাইস্এর প্লাকার্ড টাঙ্গান রয়েছে, সেইখানে জুতো যাচাই আরম্ভ করলাম।

৫৷৬ টাকা দামের কয়েক জোড়া জুতো দেখে প্রাণে ভরসা হল। একটা পছন্দ সই

জুতো হাতে নিয়ে দেখ্‌ছি, একজন 'এসিষ্টাণ্ট' এসে আমায় বল্‌লেন এ জোড়া কি চাই? আমি তাঁর ফর্সা মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেল্‌লাম—হাঁ।

তিনি জুতো জোড়াটি আমার হাত থেকে নিয়ে 'প্যাক্' করে বিল শুদ্ধ আমায় দিলেন। বিলের দিকে তাকিয়ে, দেখি—সা—ড়ে বা—ই—শ! চক্ষু স্থির!!

বোকামীর পরিচয় আর বেশী দিতে ইচ্ছে হল না। তিনখানা দশটাকার নোট বার করে দিলাম! নিজের মুর্খতার লজ্জায় মুখখানা 'বেগুনি' হয়ে উঠ্‌ল বোধ হয়। মেম্ সাহেব ভাবলেন তাঁকে দেখে 'ব্লাশ্' কর্‌ছি। একটু মুচকে হেসে টাকা নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পাঁচ মিনিট পরে 'চেঞ্জ' শুদ্ধ বিলটা আমায় দিয়ে গেলেন; আমি কোনমতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম।

বিকালে জুতো জোড়া নিয়ে দামের টিকিটখানা ছিঁড়ে ফেলে আশাকে দিলাম। আশা জুতোটা রমলাকে দিয়ে এসে বল্‌ল—প্রভাতদা তুমি সেল্‌এ কিনেছ বুঝি? 'হোআইট এওয়ে'র নাম দেখ্‌লাম বাক্সের গায়ে। রমলা বল্‌ছিল আজকাল ওখানে 'সেল্' হচ্ছে। কিন্তু সেলএ সব সময় ঠকা হয়। কতকালের পুরানো জুতো তা কে জানে। ও এত করে বলে দিয়েছিল ভাল জুতো আন্‌তে—তা যাক্ ও ত আর ফেরানো যাবে না, সময়ও নেই, তা ছাড়া—

আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল। এত দাম দিয়েও শেষে কিনা পছন্দ হল না। দিয়ে ছিলেন ত ৬॥০—আশা আবার বল্‌ল—প্রভাত দা 'চেঞ্জ' কিছু ফিরেছে?.........রাগে যেন আমার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, খুচ্‌রো ছ আনা পয়সা আছে। কোন কথা না বলে সেই পয়সা আশার হাতে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

* * * * * *

ভুপেন বাবুর মেয়ের বিয়েতে আমারও নেমন্তন্ন হ'য়েছিল। খাওয়ার পর বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌ছি, দেখি হোষ্টেলের 'ব্যস্' এসে দাঁড়াল!

মেয়েরা একে একে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আশার পাশেই একটি মসীবিনিন্দিত মেয়েকে দেখে 'ও বাবা কি কালো' ভেবে মুখ ফিরিয়ে নেবার সময় তার পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল!—আমার সেই ২২॥০ টাকা দামের জুতো!.........

কল্পনার রমলা বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়াতে বেশ একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম। তারপর আগাগোড়া ব্যাপারটি মনে হতেই নিজের বোকামিতে নিজেই মনে মনে হেসে মেস্‌এর দিকে চল্‌লাম। সে মাসে হাত খরচের জন্যে আর একটি পয়সাও রইল না।

সেই থেকে আমার 'শিভাল্‌র‍্যাস্ ডিস্‌পোজিশানটা' জন্মের মত চাপা পড়ে গেছে।

শ্রীসুনীতি দেবী

"চন্দ্রগুপ্ত"-এর গান *

[রচনা———————স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্-এ]

(ষষ্ঠ গীত)

ছায়ার সঙ্গিনীগণ।

বেহাগ—খাম্বাজ ——————— খং।

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজ মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে;
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু সাগরে জীবন তরণী।
উলসি' উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু;
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্তে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।

চঞ্চল-চল-চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে; ছুটুক ভাতি নয়নে;
উঠিয়া গীতি-মধুর-মন্ত্র
লুটিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র,
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি' ধরণী অরুণবরণী॥

[স্বরলিপি———————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

১ ০ ২ ০ ৩
গা মা II{পা না | না র্সা | র্সা র্সা | র্রর্সা র্রর্সা | র্রর্সা পা |
আ জি গা ও ম হা গী ত ম০ ০হা০ আ০ ন

৩
| -ধা ধা I মগা মা | পপা পধা | -পধণা ধা | মা পধা | পধপা মা
ন্ দে বা০ জ মৃ দ০ ০০ঙ্ গ গ ভী০ র০০ ছ

০ ৩
| -গা গা I সা -গা | গা গা | গা মা | পা না | না -র্সা |
ন্ দে পা ল্ তু লে দা ও ভে সে যা ক্

১ ০ ২ ০ ৩
| র্সনা র্সা I পা না | না র্সা | র্সা র্সা | র্রর্সা র্রর্সা | র্রর্সা -ণধা |
শু০ ধু সা গ রে জী ব ন ত০ র০ ণী০ ০০

| পমগা · মা}II
'আ০০ জি'

---

* "চন্দ্রগুপ্ত"-এর গানের স্বরলিপি 'বঙ্গবাণী'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II{মা মা | ণা ধা | ধা ণা | না র্সা | র্সা র্সনা | -র্সা র্সা I
উ ল সি ০ উ ছ লি উ ঠু ক নৃ ০ ত্য

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা র্সনা | র্সা র্রা | -া র্সা | না র্সর্রা | র্সা ণণা | -া ধা I
ক ঙ্ক০ ক স ন্ ধি জী ব০ ন মৃ ০ ত্যু

I মা -া | মা গা | গা মা | পা না | না র্সা | -র্সনা র্সা I
ম ন্ গ না মি য়া আ সু ক ম ০র্ ত্তো

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
I পা -না | না র্সা | র্সা র্সা | র্রর্সা র্রর্সা | র্রর্সা -ণধা | পমগা মা}II
স্ব র্ গে উ ঠু ক ধ০ র০ নী০ ০০ 'আ০০ জি'

১ ৪
II{সা -া | গা গা | গা গা | মা মা | মা মা | -া মা I
চ ঞ্ চ ল চ ল চ র ণ ভ ঙ্ গে

I মা ধা | ধা পধা | -ণা ধা | মা -ধা | পধপা মা | -া গা I
উ ঠু ক লা০ ০ স্ত অ ঙ্ গে০০ অ ঙ্ গে

I মা ধা | ধা পধা | -ণা ধা | পা ধা | পা মা | গা গা I
ছু টু ক হা০ ০ স্ত স র স অ ধ রে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I সা গা | গা -মা | -ধা পা | মা গা | মপমগা -মা | -া -া}I
ছু টু ক আ ০ জি ন য় নে০০০ ০ ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪ ৫
I { মা মা | পা ধা | -া না | না র্সা | র্সা র্সনা | -র্সা র্সর্সা I
উ ঠি য়া গী ॰ তি ম ধু র ম॰ ॰ন্ দ্র॰

I র্সা র্সনা | র্সা র্রা | র্রা র্সা | না -র্সর্রা | র্সা পা | -া ধধা I
লু টি॰ য়া নি উ ক স্ ॰র্ ব্য চ ন্ দ্র॰

I মা মা | মা গা | গা মা | পা না | না র্সা | র্সনা র্সা I
অ স হ পু ল . কে উ ঠু ক শি হ্॰ ॰ রি

০ ৩ ৪
I পা না | না র্সা | র্সা র্সা | র্রর্সা র্রর্সা | র্রর্সা -পধা | পমগা মা } IIII
ধ র ণী অ রু ণ ব॰ র॰ ণী॰ ॰॰ 'আ॰॰ দ্রি'

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৬)

নিউ ইয়র্ক মার্কিণের একটা প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। এই সহরেই মার্কিণ সভ্যতার ধন বৈভবের দিকটা খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমে সর্ব্বত্রই কাঞ্চন-কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকার কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রধান আড্ডা নিউ ইয়র্ক। শিকাগোতে আর এক দিক দিয়া মার্কিণের ব্যবসা-বাণিজ্য অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে কিন্তু শিকাগোর ধনী সমাজে নিউ ইয়র্কের ধনকুবেরদিগের মতন, অন্ততঃ আমি যখন আমেরিকায় গিয়াছিলাম তখনও, তেমন কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইংরাজেরা সমাজের শ্রেষ্ঠীদিগের কথা কহিতে যাইয়া upper ten—মাথালো দশজন—এই পদ ব্যবহার করেন। গণতন্ত্র মার্কিণ দশটিমাত্র লোককে মাথায় করিয়া রাখিতে রাজী নহে। নিউ ইয়র্কের idiom অথবা বচনভঙ্গীতে upper ten কথা নাই। সেখানে লোকে upper four hundred অর্থাৎ

মাথালো চারশ, লোকের কথাই কহিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে মার্কিণেরদের গণতন্ত্রপ্রকৃতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় অভিজাতবর্গের মধ্যেও একটা জনতার সৃষ্টি না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আমেরিকার লোকেরা সর্ব্বদাই ইংরাজদের অপেক্ষা বড় হইয়া থাকিতে চাহে। ইংরাজের বচন-ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া upper ten কথা ব্যবহার করিলে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। এই জন্য এই দশকে চল্লিশ গুণ বাড়াইয়া তাহারা upper four hundred বলে। সকল বিষয়েই আমেরিকানদিগের ইংরাজের সঙ্গে একটা রেষারেষি জাগিয়া আছে।

একদিন এই রেষারেষিটা খুবই বেশী ছিল। একদিন আমেরিকার লোকেরা ইংরাজের নিন্দাবাদ না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। আমি যখন আমেরিকায় যাই, তার পূর্ব্বেই স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধটা হইয়া গিয়াছে। এই লড়াইয়ের পূর্ব্বে আমেরিকা বিশেষভাবে কোনওই সমরায়োজন করে নাই। তাহার নৌসেনা নামমাত্র ছিল বলিলেও চলে। নৌযুদ্ধে সে সময়ে আমেরিকা কিছুতেই স্পেনের সঙ্গে আঁটিয়া আসিত না। যুদ্ধটা বেশী দিন চলিলে কে হারিত, কে জিতিত তাহাও ঠিক বলা যায় না। আর যুদ্ধটা যে বেশীদিন চলে নাই, তাহার কারণ ইংরাজের নীতি-কুশলতা। ইংরাজ কোনও পক্ষ অবলম্বন করিল না, কিন্তু মার্কিণের আশেপাশে নিজের যে স্বত্ব-স্বার্থ আছে তাহার রক্ষার জন্য আপনার নৌবহর পাঠাইয়া দিল। ইহার ফলে কি জানি শেষে ইংরাজ মার্কিণের সঙ্গে যোগ দেয় এই আশঙ্কায় স্পেন তাড়াতাড়ি মার্কিণের সঙ্গে সন্ধি করিয়া বসিল। ইংরাজের এই চালই যে সেই যুদ্ধে এই সন্ধির পথ খোলসা করিয়া দিয়াছিল, মার্কিণের লোকেরা ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিয়াছিল এবং এইজন্য তাহাদের মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, প্রকাশ্যে ইংলণ্ডের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে। অনেক মার্কিণীয়দিগের মুখে একথা শুনিয়াছি যে তারা ইংরাজকে ভাল বাসুক আর না বাসুক, স্পেনের সঙ্গে মার্কিণের যুদ্ধে অপরোক্ষভাবে ইংলণ্ড আমেরিকার যে সাহায্য করিয়াছিল, সেকথা তাহারা ভুলিতে পারে না। মার্কিণের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় হইতে একশ' বছর ধরিয়া আমেরিকার লোকের মনে ইংরাজের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাবটা জাগিয়াছিল, এসময় হইতে তাহা কমিতে আরম্ভ করে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সঙ্গে মার্কিণের নূতন সৌহার্দ্দ্যের সূচনা হয়।

আমি যখন আমেরিকায় যাই তখনও বুয়র যুদ্ধের শেষ হয় নাই। সে সময় আমেরিকার লোকেদের অন্তরের সহানুভূতি বুয়রদের সঙ্গেই ছিল। কিন্তু বাহিরে এ ভাবটা ফুটিয়া উঠিত না। ঘরাও কথাবার্ত্তাতেই কেবল ইহার পরিচয় পাইতাম। এখনও আমেরিকার লোকেরা ইংরাজকে সত্যসত্যই ভালবাসে কিনা জানিনা। সভ্য জগতের আন্তর্জ্জাতিক প্রীতি বা International সখ্য 'খলের পীরিতি'র মতনই হইয়া আছে—

"খলের পীরিতি বালির বাঁধ।
কভু হাতে দড়ি, কভু হাতে চাঁদ।"

সুতরাং ইংরাজ ও মার্কিণীয়ের এই নূতন সখ্যের সত্য মূল্য কি এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জাপান-বিভীষিকা প্রকট হয় নাই। দুই বৎসর মধ্যে জাপান প্রবল পরাক্রান্ত রুশসাম্রাজ্য-শক্তিকে পরাভূত করিয়া সভ্যজগতে যে আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তখনও তাহার কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রুশ-জাপান যুদ্ধের মাঝখানে ইংরাজ রাতারাতি জাপানের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া য়ুরোপের পররাষ্ট্রনীতিতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা রেষারেষি জাগিয়া উঠিয়াছে। যদি কখনও এই বৈরভাব বাহিরে ফুটিয়া উঠে ও মার্কিণে জাপানে একটা যুদ্ধ বাধিয়া যায় তাহা হইলে ইংলণ্ডের উপরেই সেই সংগ্রামের পরিণতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে। এই জন্য আমেরিকা এখন ইংলণ্ডের সঙ্গে সত্যসত্যই একটা প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে চাহে। বিশ বৎসর আগে এ প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তখন মার্কিণের লোকেরা বাহিরে যাহাই বলুক না কেন, ভিতরে ভিতরে ইংরাজকে ভাল চক্ষে দেখিত না।

অথচ এই ঈর্ষার প্রেরণাতেই এক শ্রেণীর মার্কিণীয়েরা প্রাণপণে ইংরাজের অনুকরণ করিতেও ব্যস্ত ছিল। এবিষয়ে অনেক খোসগল্প নিউ-ইয়র্কে শুনিয়াছিলাম। একটা মজার গল্প এখনও মনে আছে। মার্কিণীয়েরা ধনকুবের হইয়া উঠিলেই ইংরাজ লাট-সমাজের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়া উঠে, ইহা সকলেরই জানা আছে। ইংরাজ অভিজাত সমাজের নিঃসম্বল বংশধরগণও ধনের লোভে নিজের দেশে যে ব্যবসায়ী সমাজের সঙ্গে খাওয়া বসা করিতে চাহেন না, মার্কিণের সেই ব্যবসায়ী-দিগেরই কন্যারত্নকে নিজেদের অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমেরিকার সমাজে ইংরাজদের মতন প্রাচীন বংশমর্য্যাদার সহায়ে কোনও কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, কিন্তু আমেরিকার ধন-কুবেরেরা একটা প্রাচীনত্বের গৌরব গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। অতি প্রাচীন সর্ব্বত্রই নবীনের মধ্যে ভগ্নাবশেষরূপেই বিদ্যমান থাকে। মার্কিণের আভিজাত্য-লোলুপ ধনিগণ এইজন্য নিজেদের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার সময়, এইরূপ গল্প আছে যে, প্রাচীরের ভগ্নস্তূপ রচনা করিয়া থাকেন। এক জায়গায় কতকগুলি রাজমিস্ত্রী একজন ধনীর বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছিল। তাহারা একদিক দিয়া গড়িয়া আর একদিক দিয়া ভাঙ্গিতেছিল। এই অদ্ভুত ভাঙ্গা গড়ার কাজ দেখিয়া একজন আগন্তুক ইহার মর্ম্ম, জিজ্ঞাসু হইলে তাহারা কহিয়াছিল—We are building ruins, অর্থাৎ আমরা প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ গড়িতেছি। গল্পটা ষোল আনা সত্য হউক আর নাই হউক, ইহার ভিতরে মার্কিণের ধনী সমাজের চরিত্রের একটা পরিষ্কার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে ভাবের প্রেরণায় ইহারা প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ গড়িয়া তুলিয়া ইংরাজের সমকক্ষ অথবা ইংরাজ অপেক্ষা বড় হইতে চাহে, সেই ভাবের প্রেরণাতেই ইংরাজ যেখানে সমাজের দশজন শ্রেষ্ঠীর বা upper ten এর কথা কহে, আমেরিকার লোকেরা সেখানে upper four hundredএর কথা কহিয়া থাকে।

(১৭)

নিউ ইয়র্ক যেমন মার্কিণের ধনবৈভবের কেন্দ্রস্বরূপ, বষ্টন সেইরূপ মার্কিণের জ্ঞান-গৌরবের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়; এবং আমার মনে হয় যে পূর্ব্ব আমেরিকায় বষ্টন যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, পশ্চিম আমেরিকায় মিড্‌ভিল্ কতকটা তাহার অনুরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে। পশ্চিম আমেরিকায় এক মিড্‌ভিলেই মাদকতা নিবারণ সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য গিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, বোধ হয় এই মিড্‌ভিলেই নিউইয়র্কের National Temperance Societyর সংস্রবে আমার শেষ বক্তৃতা হয়। মিড্‌ভিল্ মার্কিণের একটা বড় শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে দুইটা বড় কলেজ আছে। এই দুইটা কলেজেই বিশেষ ভাবে তত্ত্ববিদ্যার বা Theologyর আলোচনা হইয়া থাকে। ইহার একটা কালেজ য়ুনিটেরিয়ান বা একেশ্বরবাদী খৃষ্টীয়ানদিগের; অন্যটি মেথডিষ্ট্ সম্প্রদায়ের। কলিকাতার ধর্ম্মতলার রাস্তায় থোবর্ণ সাহেবের বড় গীর্জ্জা আছে। ইহা মেথডিষ্ট্ সম্প্রদায়ের গীর্জ্জা। থোবর্ণ সাহেব এই গীর্জ্জার প্রতিষ্ঠা করেন। আমার প্রথম যৌবনে তিনি এই গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ক্রমে ভারতের মেথডিষ্ট্ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মযাজক বা বিশপের পদ প্রাপ্ত হন। বিশপ থোবর্ণ এই মিড্‌ভিল্ তত্ত্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। মিড্‌ভিলে আমি নিউইয়র্ক Temperance Societyর পক্ষে বক্তৃতা করিতে যাই বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই মিড্‌ভিলের য়ুনিটেরিয়ান তত্ত্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকটে ধারাবাহিকরূপে হিন্দু একেশ্বরবাদ বা Hindu Theism সম্বন্ধে অন্ততঃ তিনটি বক্তৃতা দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। অক্সফোর্ডে মাঞ্চেষ্টার কলেজে থাকিবার সময়েই মিড্‌ভিলের য়ুনিটেরিয়ান কলেজের অধ্যক্ষেরা আমার নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইংলণ্ডে য়ুনিটেরিয়ান মণ্ডলীর নিকটে আমি মাঝে মাঝে যে বক্তৃতা দিতাম, লণ্ডনের য়ুনিটেরিয়ান সম্বাদ পত্র Inquierorএ তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইত। এ সকলও বোধ হয় তাঁহারা জানিতেন। এইজন্য আমি মিড্‌ভিলে যাইতেছি শুনিয়া তাঁহাদের কলেজে বক্তৃতা দিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন। মিড্‌ভিলে এই কালেজের ইতিহাসের অধ্যাপক বার্ব্বার সাহেবের বাড়ীতে আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা হয়। বার্ব্বার সাহেব এখনও বাঁচিয়া আছেন কিনা জানি না। আমি যখন মিড্‌ভিলে যাই তখনই তাঁহার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় সেই বৎসরই তিনি কালেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বার্ব্বার সাহেবের মতন এমন সুমধুর সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক আর দুটি আমেরিকায় আমি দেখি নাই। তিনি ভারতের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। নিজে সংস্কৃত জানিতেন। আর ইহার চাইতে আরও বড় কথা এই যে তাঁহার পুত্র কন্যারা সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত পড়িয়া হিন্দু সভ্যতা ও সাধনার অনুশীলনেই একরূপ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মেয়েরা তখন বাড়ী ছিলেন না। যে ক'দিন

মিড্‌ভিলে ছিলাম দিবারাত্র বার্ব্বার সাহেবের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা এবং সাধনার বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাতেই কাটিয়া গিয়াছিল। আমাদের মীমাংসা-শাস্ত্রের কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায় কিছুই জানেন না বলিলেও হয়। এই মীমাংসা-শাস্ত্রে আধুনিক য়ুরোপের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার যে অদ্ভুত মীমাংসা করিয়াছে, বার্ব্বার সাহেবও তাহার কথা জানিতেন না। আমি যখন কহিলাম যে, য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছিল, বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে সে সকল প্রশ্ন উঠিয়া তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তখন সে কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। খৃষ্টীয়ান জগতে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে যে বিরোধ উঠিয়া শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সেই বিরোধ আমাদের দেশেও উঠিয়াছিল এবং আমাদের প্রাচীন মীমাংসকেরা অতি সহজভাবে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কহিয়াছেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা কোথাও তাঁহার এই বিপুল সৃষ্টির মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনও কিছু করেন নাই। রূপ দেখিবার জন্য চক্ষুমাত্রই দিয়াছেন, আর একটা দ্বিতীয় দর্শনেন্দ্রিয় দেন নাই; সেইরূপ শব্দ শুনিবার জন্য কাণ, গন্ধ গ্রহণের জন্য নাসিকা, স্পর্শের জন্য ত্বক, এইরূপে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া জীবকে এই শব্দ স্পর্শরূপরসগন্ধময় বিষয়জগতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই সকল ইন্দ্রিয়ই এই বিষয় রাজ্যের সত্যাসত্যের একমাত্র প্রামাণ্য যন্ত্র বা উপায়। বিষয়জ্ঞানের জন্য শাস্ত্র প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করে না। সে তত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অধিকারে, শাস্ত্রের অধিকারের বাহিরে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না, সেই জ্ঞান মাত্রই শাস্ত্র প্রচার করে। এইজন্য শাস্ত্রের প্রথম সংজ্ঞা হইল অদৃষ্টার্থকং শাস্ত্রম্। কিন্তু এখানেও সকল গোল মিটিল না। জগতে ইন্দ্রিয়াতীত অনেক বস্তু থাকিতে পারে। সে সকলের সঙ্গে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুর কোনও সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। জীবের পরমার্থ লাভের পথ প্রদর্শনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই পরমার্থ লাভের নামই মুক্তি বা মোক্ষ। সুতরাং শাস্ত্রের দ্বিতীয় সংজ্ঞা হইল, মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্। তারপর শাস্ত্র স্বয়ং বারংবার একথা কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের মুক্তি হয় না, হইতে পারে না। এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, সুতরাং অদৃষ্টার্থক। আর ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যখন মুক্তি হয় না, তখন এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রতিপাদকও বটে। এইরূপে অতি সহজ যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাচীনেরা শাস্ত্রের অতিপ্রাকৃত মর্য্যাদা স্বীকার না করিয়াও তাহার একটা যুক্তিযুক্ত প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী খৃষ্টীয়ানেরা যদি আমাদের মীমাংসা-শাস্ত্রের সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে অতি সহজেই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বা Science ও Religion এর বিবাদটা মিটাইয়া, বিজ্ঞানের রাজ্যে বিজ্ঞানের প্রাধান্য এবং ধর্ম্মের রাজ্যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে পারিতেন। বার্ব্বার সাহেবের সঙ্গে এই সকল প্রসঙ্গে আমার মিড্‌ভিল প্রবাসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

মিড্ ভিলে মেথডিষ্ট্‌দিগের কলেজেও আমায় একদিন প্রায় পাঁচশতাধিক যুবক-যুবতীর নিকটে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। আমি খৃষ্টীয়ান নহি বলিয়া তাঁহাদের কোনওই দ্বিধা বোধ হয় নাই। গীতার 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' এই শ্লোকার্দ্ধ অবলম্বনে এই বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এই পর্য্যন্ত মনে আছে।

মিড্ ভিলের একটা কথা কোনও দিন ভুলিব না। বার্ব্বার সাহেব যখন হার্ভাড্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, সে সময়ে এমার্সনের 'ব্রহ্ম' শীর্ষক ছোট কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 'ব্রহ্ম'কে তাঁহারা 'ব্রাহ্‌ম্' উচ্চারণ করিতেন। কেহই এই কবিতাটির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহাদের নিকটে একেবারে দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহে। এইজন্য সেকালের মার্কিণীয় ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কোনও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের অবতারণা হইলেই, অথবা একজন আর একজনের মনোভাব বুঝিতে না পারিলেই বলিত, "যে 'ব্রাহ্‌ম্'। এই গল্পটা হইতেই মার্কিণের শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত এমার্সনকে যে কেন বোঝে না, ইহার হদিশ্ নির্ণয় করিতে পারা যায়। এমার্সনের এই কবিতাটি এখানে উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

Brahma.

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

Far or forgot to me is near ;
Shadow and sunlight are the same ;
The vanished Gods to me appear ;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill who leave me out ;
When me they fly, I am the wings ;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings.

The strong Gods pine for my abode,
And pine in vain the secred seven ;
But thou, meek lover of the good !
Find me and turn thy back on heaven.

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

মাটি

সংসার কি ধূলা মাটি ? তুচ্ছে আমি মুহ্যমান ?
এই যে আমার খুঁটি নাটি,— এইত আমার শিরের মাটি ;
এতেই গড়ি বিশ্ব-নাথে, এ যে তাঁহার উচ্চ দান।

অনন্তানন্দের পত্র

ভায়া,

আমি 'বলশেভিক' মত প্রচার করতে আরম্ভ করেছি মনে করে তুমি যে ঠাট্টা করেছ তোমার সে ঠাট্টাটা একেবারে মাঠে মারা গেছে। তার কারণ হচ্চে এই যে বলশেভিক মত প্রচার করতে গেলে সেটা আগে ভাল করে জানা চাই। কিন্তু আমার ও সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। তাদের মতামত যতটুকু জানি তার সবটুকু যে সত্য, তা আমার মনে হয় না; তবে তাদের গোড়াকার একটা কথা যে খুবই খাঁটি তাতে আর ভুল নেই।

কথাটা এই যে ইউরোপে যে Democracy খাড়া হয়েছে তার সঙ্গে Demosএর বড় একটা খোঁজ খপর নেই। পার্লামেন্টের ফাঁদ পেতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ধরবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যাদের ভোট দেবার ক্ষমতা নেই, তাদেরও যে দুর্দ্দশা, যাদের ভোট দেবার ক্ষমতা আছে, তাদেরও প্রায় তাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। ব্যবসা বাণিজ্য বা কল-কারখানা করে যারা হাতে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছে, আইন-কানুন গড়বার ক্ষমতাও তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে। শাসনযন্ত্র তারাই চালায়, সন্ধিবিগ্রহ তারাই করে, আন্তর্জাতিক সভা সমিতি ডেকে তারাই মোড়লী করে। যাদের পয়সা নেই তাদেরও কেতাবী স্বাধীনতা থাকতে পারে; কিন্তু সে স্বাধীনতায় পেট ভরে না, দুঃখ ঘোচে না।

এই দুঃখের চাপে, পেটের জ্বালায় সাধারণ লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা সর্ব্বত্রই তারা বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে শাসনযন্ত্রটা অধিকার করবার চেষ্টা করছে। রুশিয়ার অপরাধ এই যে সে কার্য্যটা তারা সকলের আগে করে ফেলেছে। তাই সারা ইউরোপের মোড়লের দল চারিদিক থেকে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। আর তাদের দেখাদেখি আমরাও সেই চীৎকারে যোগ দিয়েছি। ব্যাপারটা যে সব সময় বেশ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি তা মনে হয় না।

আমাদের দেশে ঠিক ঐ জিনিষটা এখনও এসে পড়েনি; তবে এসে পড়াও বিচিত্র নয়। আমাদের দেশের রাজনীতিজ্ঞ পুরুষেরা এখনও পার্লামেন্টের স্বপ্ন দেখছেন তা জানি; কিন্তু তার কারণ শুধু এই যে তাঁরা ইংরেজের ইতিহাস পড়ে রাজনীতি শিখেছেন আর ইংরেজের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে পার্লামেন্টের ইতিহাস একেবারে জড়ান। তাদের ধারণা হচ্চে এই যে ইংরেজ যখন পার্লামেন্ট পেয়ে স্বাধীন হয়ে উঠেছে, তখন আমরাও ঐ রকম একটা কিছু পেলেই বেশ গুছিয়ে উঠ্‌ব। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাধীনতা পাওয়াটা অত সোজা বলে মনে হয় না। ইংলণ্ডের যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তারাই সেখানকার অভিজাত শ্রেণীকে মেরে ধরে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়েছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের হাতেই রাজ্য চালাবার

ক্ষমতা। তারা শুধু ইংলণ্ডের নয়, এদেশেরও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা যখন আমাদের দেশে বাণিজ্য করতে আসে তখন মোগল রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছে; দেশের শাসনভার তখন ছোটখাট রাজারাজড়াদের উপর। এক মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সে সমস্ত রাজারাজড়ার সঙ্গে দেশের লোকের বড় একটা নাড়ীর টান ছিল না। তাই এদেশের লোকের সাহায্য নিয়ে সে সমস্ত রাজারাজড়াকে হটিয়ে দেওয়া ইংরেজের পক্ষে বিশেষ শক্ত হয়নি। এত বড় দেশকে কি করে জয় করে ফেললুম একথা ভেবে ইংরেজ মাঝে মাঝে নিজের বাহুবলের খুব তারিফ করে থাকেন; কিন্তু এটাতে অবাক হবার বিশেষ কিছু নেই। তখন ভারতবর্ষে যে শাসনপ্রণালী ছিল সেটা Feudal system। ইংরেজের সঙ্ঘবদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (Bourgeois) ধাক্কায় সেটা ভেঙ্গে গেল। সর্ব্বত্রই তাই হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যেই গড়ে ওঠে। এদেশের তখন যে রকম অবস্থা তাতে একটা প্রবল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। তা যদি পারত, তা হলে ভারতবর্ষ অধিকার করা ইংরেজের পক্ষে অত সোজা ব্যাপার হতো না। দীপশিখা নিবে যাবার সময় যেমন একবার জ্বলে ওঠে ১৮৫৭ সালে Feudal ভারতও তেমনি জ্বলে উঠেছিল।

তারপর বর্ত্তমান ভারতের আরম্ভ। ইংরেজের আমলে দেশে যে ধনী শ্রেণী (Bourgeois) গড়ে উঠেছে কংগ্রেস তাঁদেরই সৃষ্টি। যাঁরা ইংরেজের রাজত্বকালে ধনবান হয়ে উঠেছেন, ইংরেজের সঙ্গে সমান অধিকার পাবার কল্পনা আর ইচ্ছা তাঁদেরই মনে উঠেছে। জমিদারই বল, আর উকিল ব্যারিষ্টারই বল, আর বোম্বায়ের কলওয়ালারাই বল, সবই ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি। ইংরেজের ক্ষুরে এঁদের মাথা মুড়ান। সুতরাং ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে রকম, এঁদেরেও অনেকটা তাই। এঁরা মুখে যে স্বাধীনতার জয়গান করেন, সেটার সোজা বাংলা মানে হচ্চে এই যে ইংরেজের বদলে এঁরা এদেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার চান।

কিন্তু কলকারখানা বা ব্যবসাবাণিজ্য করে বা জমিদারী চালিয়ে যেখানে দশজন ধনবান হয়েছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ দশহাজার জন দরিদ্র হয়েছে। এই সব দরিদ্রদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা যে বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর সুহৃদ নয় তা বলাই বাহুল্য।

এই সমস্তলোক যে দিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে সেদিন থেকে এই কথাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এদের স্বার্থ আর এদেশের ধনবানদের স্বার্থের মধ্যে অনেকটা বিরোধ আছে। সেই দিন থেকে Moderate আর Extremist এর সৃষ্টি। যারা ধনবান তারা সহজে গোলমালের মধ্যে বা অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাইবে না; নিজেদের ধনসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তিটা একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই তারা ষোল আনা বিদেশী শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হয়ে পড়বে। আর হচ্চেও তাই।

আজ যারা Nationalismএর পতাকা তুলেছে, সরকারী বড় বড় চাকরীর বাজার যদি সস্তা হয়ে যায়, তা হলে এদল থেকেও অনেক লোক ভেঙ্গে পড়বে। Ireland-এ যে দেখতে পাচ্ছ Free Stater আর Republicanএর ঝগড়া, এর মধ্যেও Bourgeois আর Proletariat এর ঝগড়া লুকিয়ে আছে। আমাদের দেশেও সৌখিন Nationalism-এর পিছনে পেটের জ্বালার Nationalism লুকিয়ে আছে। তার সন্ধান পেয়ে জাতীয় দলের অনেক নেতা এখন থেকেই আঁতকে উঠছেন। অথচ সেটা একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই। দেশের অন্ততঃ বার আনা লোক এই দীন হীন কাঙাল। দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে এই সর্ব্বস্বান্ত, দরিদ্রদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। দেশ স্বাধীন না হলে তাদের দুঃখ ঘোচে না; সুতরাং তারা স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন ঘুষে ভুলবে না।

সেদিন আমার একজন বন্ধু বলছিলেন—এরা'ত শূদ্র; এদের হাতে রাজশক্তি গিয়ে পড়্‌লে সেটাত শূদ্ররাজ্য হয়ে পড়বে! আর শূদ্ররাজ্য'ত ভারতের আদর্শ নয়। ওটা একদম্ Bolshevik ব্যাপার।

কথাটা মিথ্যা বলেই আমার মনে হয়। Bolshevikরা কি চায় তা আমি ঠিক জানিনে: কিন্তু আমি যা চাই তা খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। আমার প্রথম কথা হচ্চে এই যে যারা পরিশ্রম করে খায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাই তাদের অন্তর্গত; যারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে নিষ্কর্ম্মা হয়ে খেতে চায় সমাজে তাদের স্থান নেই; থাকা উচিতও নয়। তারা শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণও নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, বৈশ্যও নয়, শূদ্রও নয়। তারা একেবারে বেদবাহ্য।

খাঁটি ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা Aristocracy বা Bourgeois দলভুক্ত নন, তাঁরা এই proletariatএর অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ এই Proletariatএর মাথা, এদের শিক্ষাগুরু। ব্রাহ্মণের কাজ, এদের শিক্ষিত, সমর্থ, সংঘবদ্ধ করে তোলা। আজকাল যারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নামে পরিচিত, তারা ক্ষত্রিয়ও নয় বৈশ্যও নয়; কেননা তারা ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের শাস্ত্রীয় আদর্শ মানে না। তারা নিজেদের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। সমাজকে তারা ভরণপোষণও করে না, সমাজকে রক্ষাও করে না। এদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

আজকাল আমাদের দেশে Nationalist বলে যে দল গড়ে উঠেছে, খাঁটি Nationalismএর ধাক্কায় তা ভেঙ্গে চুরে যাবেই। যারা অর্থ চায়, প্রতিপত্তি চায়, বচন দিয়ে কাজ সার্‌তে চায়, তারা আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। যারা সমাজকে ঐশ্বর্য্য বা আভিজাত্যের চাপে দাবিয়ে রাখ্‌তে চায়, যারা সমগ্র সমাজের মঙ্গল না দেখে শুধু শ্রেণী বিশেষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য চায়, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যারা দেশকে চায়, সমাজকে চায়, স্বাধীনতাকে চায় তাদের ঐ লাঞ্ছিত Proletariatদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আর তাদের মাঝখান থেকে নূতন ব্রাহ্মণ, নূতন ক্ষত্রিয়, নূতন বৈশ্য সৃষ্টি করে তুলতে হবে। এই নূতন সমাজ গড়ে তোলবার ভার যারা নেবে

তারাই এ যুগের ব্রাহ্মণ। তাদের নির্ভীক হওয়া চাই, জ্ঞানী হওয়া চাই, সমাজের জন্যে সর্ব্বত্যাগী হওয়া চাই।

ঠিক এরকম সমাজ ভারতবর্ষে হয় ত আগে গড়ে ওঠে নি; কিন্তু ক্রমাগত গড়ে তোলবার চেষ্টা যে হয়েছিল তাতে আর ভুল নেই। যাঁরা এই রকম সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরাই সমাজ শাসনের ক্ষমতা জ্ঞানী, নির্লোভ ব্রাহ্মণের হাতে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ আদর্শটা একেবারে এ দেশের নিজস্ব সম্পত্তি। যাঁরা শুধু জন্মগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, তাঁরা এ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন; কিন্তু এ আদর্শটা এদেশে বেঁচে আছে। এ দেশ শুধু লাঠির শাসন বা টাকার শাসন মানবে না। টাকা বা লাঠি যদি ব্রাহ্মণ্যের অনুগত না হয় তা হলে তা এদেশে চলবে না। এই আদর্শের নামে যারা দেশকে ডাক দেবে তারাই ভবিষ্যৎ গড়বে; তারাই সমস্ত সমাজের সংহত শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দেশে স্বাধীনতা আনবে। আজকালকার Bourgeois nationalism ভেঙ্গে যাবেই যাবে।

তোমার Aristocracy বা Barristocracyকে কেন যে সন্দেহের চক্ষে দেখি, কেন যে শুধু মাড়োয়াড়ী বা ভাটিয়া আদর্শে আমার মন ভরে না, কেন যে গরীবদের উপর ঝোঁক দিই তা হয়ত বুঝেছ। Bolshevism বলে এটাকে উড়িয়ে দিলে এটার উপর অবিচার করা হবে। এটা খাঁটি এ দেশের আদর্শ। এ আদর্শ মানেনি বলেই এ দেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা ইংরেজের পুঁথি পড়ে যে স্বরাজের আদর্শ আমদানি করছ সেটা ইউরোপের পচা Democracy। ইউরোপের অঙ্গ থেকেই তা খসে পড়তে আরম্ভ করেছে।

চিঠিখানা ক্রমে বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করছে; সুতরাং আজ এইখানেই ইতি।

শ্রী "অনন্তানন্দ"

প্রতিধ্বনি

("যুগান্তর" সম্পাদকের উক্তি)

আমাদের লক্ষ্য কি ?—আমাদের লক্ষ্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে 'আমরা চাই স্বরাজ' সকলেই বলিবে কিন্তু তাহাতেও আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না—লক্ষ্য অলক্ষ্যের মধ্যেই লুকাইয়া রহিল—পরিষ্কার হইল না।

দেশমধ্যে একটা রাজনীতিক হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, হাজার হাজার লোক জেলে গিয়াছে, ভারতীয় অসহযোগ আন্দোলনের নানা প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে, কেহ কেহ ইহাতে না কি বলশেভিকির গন্ধও পাইতেছেন। ফলে অনেক বৈদেশিক বৈপ্লবিকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা চাও কি ?" ইহার উত্তর কিছুই নাই, অগত্যা নানা প্রকার সমাজতত্ত্বের (Sociologic) দার্শনিক উত্তর দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

আমরা চাই স্বরাজ অর্থাৎ নিজেদের রাজত্ব। বিদেশীর হাত হইতে শাসনযন্ত্রটা বাহির করিয়া নিজেরা গ্রহণ করিব—নানা আইন বাঁচাইয়া একথাই নেতারা বলেন—তাহাই 'জাতীয় লক্ষ্য' 'জাতীয়ত্ব' (Nationalism) 'আমাদের রাজনীতিক ধর্ম্ম' নামে আখ্যা পাইতেছে। এই জন্য আমরা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি; এবং আশা করিতেছি, জাতি আমাদের সঙ্গে জাগিয়া উঠিবে। ভারতের গণবৃন্দকে (Mass) আমাদের সঙ্গে লইবার জন্য নানা প্রকার ফন্দি নেতারা করিতেছেন। যুদ্ধকালীন প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই, এবং আরো কয়টা কারণে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। উকিল ব্যারিষ্টার দ্বারা কেবল মন্তব্য পাশ করাইলে চলিবে না ইহা বুঝিয়াই দেশের গণ-শক্তির সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু জগতে কোথাও অশ্রমজীবী ও কুশীদজীবী বাবুর দলের (Bourgeois) কথায় গরীব শ্রমজীবী গণ-বৃন্দ (Mass) মাতে না, ভারতেও তাহার অন্যথা হয় না। সেই জন্য নানা প্রকার ধর্ম্মের ধূয়া তুলিয়া নিরক্ষর ধর্ম্মভীরু গণবৃন্দকে মাতাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কথঞ্চিৎ সফল হইলেও আন্দোলন তাহাতে টেঁকে নাই। ফলে অন্য রাস্তা খুঁজিতে হইতেছে। ক্ষণেকের জন্য জনগণকে মাতান শক্ত নহে—তাহা হুজুকেও সম্ভব হয়। দেশ যদি ইউরোপের ন্যায় organised থাকিত তবে হয়ত এই অসহযোগ আন্দোলনেই শাসকবর্গের কাছ হইতে ইচ্ছানুরূপ বস্তু লাভ করা যাইত। কিন্তু আমাদের হইয়াছে—"ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দারে"র অবস্থা। নেতারা দেশটাকে organised না করিয়াই গণবৃন্দকে ক্ষেপাইলেন—পরে চরকা খদ্দরের সাহায্যে স্বরাজ-প্রাপ্তির জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন! এক্ষণে 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'র ন্যায় নানা মন্তব্য বাহির হইতেছে, "বরদোলির রেজলিউশন" পাশ না হ'লে হয়ত এক চোট দেখা যেত, লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল বয়কট না করিয়া সেখানে ঢুকিলে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল কথাটা আমরা কি যে চাই তাহা স্পষ্ট করিয়া জানি না। মডারেটরাও নন, চরমপন্থীরাও নন, অসহযোগীরা নন, এবং বৈপ্লাবিকেরাও নন!

সকল পন্থাই দেশের গণবৃন্দকে খাঁটাইয়া (Exploit করিয়া), নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক মতলব সিদ্ধি করিতে চাহিতেছেন, গণবৃন্দের মুক্তির জন্য কেহ কিছু করেন না! মডারেট অসহযোগী বিপ্লবপন্থী সকলের পক্ষেই একথা প্রযুজ্য।

কেহ হয়ত বলিবে, কেন ভারতেও ত স্থানে স্থানে শ্রমজীবীদের organise করা হইতেছে?—হইতেছে সামান্য, তাহারও পত্তনে ভুল হইতেছে। কারণ যাহারা কর্ত্তা, তাঁহারা গণবৃন্দের class consciousness জাগাইতে চেষ্টা করেন না, বরং তাহাদের class interest না দেখিয়া তাহাদের দ্বারা নিজেদের কার্য্য সাধন করাই হইতেছে এই সব Bourgeois organiserদের মতলব। ইহা দ্বারা গণবৃন্দের গোলামীর ও exploitation-এর শৃঙ্খল আরও দৃঢ়ীভূত করা হইতেছে মাত্র। এই জন্যই আমাদের লক্ষ্য কি, সেই কথার মীমাংসা শুনিতে চাহি।

'সাহেবঘেঁষা' 'সহযোগী' 'চরমপন্থী' বা 'বিপ্লববাদী'—কাহারই কিছু ঠিক ঠিক প্রোগ্রাম (programme) নাই, যাহা আমরা আদর্শে পৌঁছিবার জন্য গণবৃন্দের সম্মুখে দিতে পারি।

এ পর্য্যন্ত যত কিছু প্রোগ্রাম হইয়াছে সবই উক্ত কয়প্রকার দলের বিশেষ একটা ঝোঁক বা প্রবৃত্তির মাপ কাটিতে।

এখন দেখা চাই যে, জগতের গণবৃন্দ সাধারণতঃ conservative, নূতন কিছু তাহারা গ্রহণ করিতে চাহে

না, পারে না। সুতরাং অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে একটা আদর্শ দিতে হইবে। সেই অল্প সংখ্যককেই সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আদর্শানুযায়ী গমনশীল করিয়া তুলিতে হইবে।

যাহারা দেশের রাজনৈতিক মুক্তি চাহেন তাহারাই এই 'অল্প সংখ্যক' লোক। ইহাদের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন দল, অসহযোগী, সহযোগী, চরমপন্থী, বিপ্লবপন্থী রহিয়াছে। ইহাদের জনগণের জন্যই কাজ করিতে হইবে। জনগণের মুক্তির যে পথ তাহাই জগতের মুক্তির পথ। জনগণের মধ্যে তাহাদের সত্তাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কোন প্রকারে নিজেদের স্থায়ী সুখ সুবিধার কথা ভাবিলে চলিবে না। আর জগতের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের জীবনযুদ্ধে জয়লাভের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। নতুবা আমরা বাবুর দল স্বরাজ পাইব, না পাইব তাহাতে এই বিরাট mass-এর কি ?

একদিকে যেমন চরকা খদ্দর দ্বারা Imperial capitalist দের তেমন কোনও ক্ষতি করা যাইবে না, অপর দিকে cottage industry দ্বারা ভারতের modern industrialism কিছুতেই আটকান যাইবে না। একথা বুঝিতেই হইবে। এইদিকে দৃষ্টি দিয়া অর্থনীতির কথা ভাবিতে হইবে।

ভারতের কোটী কোটী লোকের কথা ভাবিয়াই চলিতে হইবে। আমাদের কুশীদজীবীদের nationalism-এর কোনও মানে হয় না। ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনের দার্শনিক ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, ভারতীয় সমাজে নব পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত একটা ভারতীয় Bourgeoisie দল উঠিয়াছে। ইহারাই উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, মোক্তার, প্রফেসার, জমিদার, ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক (Industrial magnates) ইত্যাদি। ইহারাই কংগ্রেস, হোমরুল, খেলাফৎ কমিটি করিয়া অসহযোগী সহযোগী হইয়া ইংরেজের সঙ্গে বিবাদ করিতেছে। ঝগড়াটা হইতেছে, ইংরেজের বুরোজোয়াজির (Bourgeoisie) সঙ্গে ভারতীয় বুরোজোয়াজির। উদ্দেশ্য ভারতের শাসন-যন্ত্রটা হাতে লওয়া। ভারতের কলওয়ালারাও এতে যোগ দিতেছে। কারণ তাহাতে তাহাদের সুবিধাই। ইহারাই নিজেদের সুবিধার জন্য গণবৃন্দকে হাতে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। এরই নাম আমাদের Bourgeois Philosophy ও Patriotism. কাহাদের জন্য স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই ? গণবৃন্দের দারিদ্র্য দূর করার কি প্রোগ্রাম আছে ? ভারতের economic problem-এর কিসে মীমাংসা হইবে,—সে কথা কেহ বলে না। জনগণের দুঃখ কিসে দূর হইবে সে সন্ধান কেহ দেন না। বিভিন্ন Social classes ও Social forces এর ঘাত প্রতিঘাতে কি resultant force generate করিতেছে, কি social, economic forces ভারতে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার কোনও নিশানা পাই না। তাই বিদেশের কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বুঝাইতে পারি না যে, আমরা কি চাই এবং কেন কি চাই ?

মোট কথা, গণবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হইবে। তাহাদের স্বার্থরক্ষা ও তাহাদের সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থিক ও ধর্ম্মের অত্যাচার ও exploitation হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের কাজ করিতে হইবে। তবেই তাহারা আমাদের সহায় ও সম্পদ হইবে।

গণসমূহকে চিরকাল চাপিয়া রাখা যাইবে না। তাহাদেরও কালে শ্রেণীজ্ঞান লাভ হইবে। Economic forceএ এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তখন তাহারা পুরাতন social-polityর ভিতর মুণিত হইয়া থাকিতে চাহিবে না। সকল শ্রেণীকে সকল দিকেই সমান অধিকার দিতে হইবে—কোনও জাতীয়তার বা বিলাতী nationalismএর নামে ধূয়া তুলিয়া গণবৃন্দের কল্যাণকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। দেশের মুক্তিকামীদের তখন মেজিনী, গ্যারিবল্ডী ও আনন্দ মঠের romantic story ছাড়িতে হইবে। এখন কার্ল মার্ক্স ও ম্যাস মুভমেণ্টের চর্চ্চা করিতে হইবে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

—শঙ্খ, ১৩ই কার্ত্তিক।

ছিটে ফোঁটা

নন্দী-সংবাদ

নন্দী কহে, মণ্ডপেতে গন্ধ পেয়ে সিন্নির,
" একি ঘেন্না ! মান্‌টা বেশী কর্ত্তা থেকে গিন্নির !
শিবের মাথায় পড়ে কলা, দেবীর ভোগে মাংস ;
দুর্গা পূজায় বেজায় ঘটা,—শিবের সময় sham show ?
কেউ মানে না পুঁথির নীতি, মুখেই বলে সাম্য।
এবার মোরা কর্ত্তা ভৃত্যে না হয় হ'ব ব্রাহ্ম।"
গণেশ বলেন,—" সর্ব্বনাশ ! " কহেন কার্ত্তিক—" নন্দী !
বঙ্গদেশে এসেও শেষে শিখলে না সে ফন্দি,—
যা খুসি খাও চপ্ কাট্‌লেট্ রোষ্ট-ক্রোকে-আণ্ডা,
বক্তৃতাতে বল্‌বে,—তুমি সাত্ত্বিকতার পাণ্ডা।"
হাসির চোটে কেঁদে নন্দী চক্ষু দু'টি রগড়ান্ ;
হেসে-কেঁদে গেলেন কার্ত্তিক ; এল পয়লা অঘ্রাণ।

* * *

ছোট-বড়

হরিন্নাম-ই গরীয়ান্,—হরি স্বয়ং উহ্য ;
পূজা আচার চেয়ে হচ্চে ভোগের ভোজ্য পূজ্য ;
শোকের চাইতে বড়লোকের জন্য জাঁকে শ্রাদ্ধ,—
সে উৎসবে স্কুলের ছুটি,—ওঠে খোলের বাদ্য।
বামুন থেকে পৈতা পোক্ত,—দেখ্‌তে পাবে ভাব্‌লেই ;
স্ত্রীর চেয়ে যৌতুকটি বিয়ের বেলায় lovely ;
বিদ্যার চেয়ে সাধ্য কর্‌তে হয় যে noteএর ছত্র ;
লেখার ঘটার চেয়েও পটে ই শোভে মাসিক পত্র।
বেড়ে যাচ্ছে দৃষ্টান্ত যতই ভেবে গণ্‌ছি ;—
গুরুর চেয়ে চেলা শক্ত, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি।

* * *

ভব-ভার

দিলেন ফেলে ভবের বোঝা গজ-কচ্ছপ-বাসুকী ;
কি যে বলি সে রিকর্ম্মের কর্ম্মে সবাই যা খুসী।
কেহ কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ, কেহ গজ-পণ্ডিত দাঁড়াল,—
কেউবা শিরে চৌষট্টি-হাজার ফণা বাড়াল,
তুল্‌ল তারা ধরার বোঝা,—তিন্‌টি বীরে টক্ করে' ;
ধরা পেলে নবভিত্তি কুলা পানা চক্করে।
দেবেরা সব স্বর্গপুরে নিচ্চে তুলে তচ্ছবি ;
ইন্দ্র ভাবেন হেসে,—হ'বে নব গজ-কচ্ছবি।

* * *

পূজার তত্ত্ব

(বড় গল্প)

দত্ত গৃহিণী তাঁহার বলয় ও বাঁক সুশোভিত সুগোল বাহুখানি দোলাইয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—

"তা আমি তোমায় বলে দিচ্ছি তুমি বুঝে সুজে বিয়ের ঠিক কর। নরেশ আমার কত আদরের ছেলে,—এমন কার হয় ? বি এ পাশ করেছে, এম, এ পড়ছে, ওর বিয়ে তুমি যার তার ঘরে দিতে পার্ব্বে না।"

রামসদয় দত্ত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উপনগরে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর পুত্র নরেশচন্দ্র এবার বি, এ পাশ দিয়া এম, এ পড়িতেছেন। তাঁহারই বিবাহের জন্য চারিদিক হইতে কথা হইতেছে। গৃহিণী হৈমবতী জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনের মত বিবাহ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর ডানাকাটা পরীর মত ঘর আলো করা বউ চাই, বাক্সভরা গহনা চাই, মনের মত রূপা ও কাঁসার দানসামগ্রী চাই, সেই সঙ্গে নগদও চাই। ঘরের ভেঙ্গে পরের মেয়ে আনায় তাঁর মত নাই। নিজের পিতৃগৃহের অবস্থা তেমন ছিল না, এখন সুদ শুদ্ধ সেটা আদায় করিতে চান।

এদিকে রামসদয় দত্তের এক বন্ধু, তাঁহার অন্য এক বন্ধুর সুন্দরী কন্যার কথা বলিয়াছিলেন। গৃহিণীকে তিনি সেই কথা বলায় গৃহিণী ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া রামসদয় দত্ত বলিলেন,—

"সব কি একাধারে হয় ? তুমি টাকা চাও, সুন্দরী মেয়ে চাও, ভাল কুটুম চাও, তা কি করে হবে বল ?"

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"কেন হবেনা আমায় তাই বল, কিসের দুঃখে হবে না ? নরেশ কি যে-সে ঘরের ছেলে ? না যে-সে ছেলে ? আমার এই প্রথম সন্তান, ওর বিয়েতে সাধ-আহ্লাদ কর্ব্ব না ? তোমার যে কি কথা আমি বুঝতে পারি না।"

রামসদয়। ওগো একেবারে অত মেজাজ গরম কর কেন ? কথাই শোন না। নবীনবাবু বলছিলেন কনের বাপ পশ্চিমে কি কাজ করেন, ডাক্তারি করেন বুঝি—

গৃহিণী। ডাক্তারি করেন তবেত তাঁর ঢের টাকা।

রামসদয়। তুমি বড় অবুঝ, ডাক্তারি কল্লেই টাকা কি করে হবে ? ডাক্তার বুঝে ত হবে! ক্যাম্বেলে পাশ ডাক্তার তাঁর আবার কত টাকা হবে ? তা ছাড়া বলে দিয়েছেন বেশী টাকা দিতে পার্ব্বেন না। তাঁর আরো মেয়ে আছে। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী—

গৃহিণী। মেয়ে দেখবেত ? না নবীনবাবুর কথাতেই হয়ে যাবে ?

রামসদয়। দেখবো বইকি! তাঁরা কলকাতায় মেয়ে এনে দেখাবেন। আর নবীনবাবু কি আমায় মিছে কথা বলবেন।

গৃহিণী। আজকালকার দিনে আমি কাউকেই বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। আপনার লোকই গলায় ছুরী দিতে পাল্লে ছাড়ে না;—তা আবার তোমার নবীনবাবু।

রামসদয়। নবীনবাবু অমন লোক নন। তাঁর এতে লাভ কি ? তিনি হলেন বামুন, আমরা কায়স্থ।

গৃহিণী। তা বটে, তা মেয়ের বাপ কি দেবে থোবে শুনেছ কি ?

রামসদয়। মেয়ের বাপ ত শুনছি বলেছেন, দু আড়াই হাজারের মধ্যে সব সারবেন।"

গৃহিণী ব্যস্তভাবে বলিলেন—না না কাজ নাই আমার অমন ঘরে। নরেশ আমার বেঁচে থাক। ওর বিয়ে ঢের ভালো ঘরে হবে। আমি একশ ভরি সোনা নিয়ে হীরে জড়োয়াতে মুড়ে তবে মেয়ে আমার ঘরে আনবো। লক্ষ্মীছাড়ার ঘর থেকে কে মেয়ে আনবে ? ওসব হবে না বলে দিচ্ছি।

রামসদয়। হাঁগা, তা তোমার অত টাকায় দরকার কি ? ছেলেত আর শ্বশুর বাড়ীর মাসোহারা খাবে না ?

গৃহিণী। বালাই ষাট অমন অলক্ষুণে কথা বল কেন ? মাসোহারা ফাসোহারা তার শত্রু খাক্, সে খেতে যাবে কেন ? তা বলে যাদের ঘরে কিছু নাই এমন ঘরের মেয়ে আমি আনছিনে। ছেলের আদর যত্ন হবে না।

রামসদয় হাসিয়া কহিলেন—"তাহলে তোমার বাপের বাড়ী থেকে ত আমি খুব ঠকেছি, তোমার ছেলের চেয়ে আমার খিদে বেশী ছিল।"

যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। গৃহিণী মুখ ভার করিয়া রাগতকণ্ঠে বলিলেন—“যাও আর অমন করে সকাল বেলায় আমার বাপ মা তুলোনা বলছি।”

কর্তা বিশেষ প্রমাদ গণিলেন। এমন সময় দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা বিমলা আসিয়া বলিল “বাবা এই নাও, নবীনবাবু কি পাঠিয়েছেন দেখ।”

রামসদয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্যাকেটটি খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, “ওগো দেখ দেখ কি সুন্দর মেয়েটি, কেমন মুখের ভাব।”

গৃহিণী আগ্রহের সহিত দেখিয়া বলিলেন, “হাঁ তা মন্দ দেখতে নয়। তবে সুন্দরী কোথায়? একে তা' বলে সুন্দরী বলা যায় না, কেমন যেন লম্বা লম্বা চেহারা, আর বড় রোগা, নয়?

রামসদয় একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—“আমাদের বঙ্কিম বাবু ত বলেই দিয়েছেন,—মেয়েদের রূপ সমালোচনায়, শেষে কি হয়—তা হরিদাসী বৈষ্ণবীতে প্রমাণ। এটা তোমাদের স্বভাবের দোষ, মেয়ে ত বেশ সুন্দর একহারা দেখতে।”

গৃহিণী। একটু থমথমে চেহারা, না? আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে বেশ লাল লাল, ছোটখাট হলে বেশ মানায়।

রামসদয়। মেয়েটির নামও বেশ,—'ললিতা দাসী',—এই দেখ লেখা রয়েছে; হাতের লেখাটিও মন্দ নয়।

বিমলা পিতার হস্ত হইতে ছবিটি লইয়া বলিল,—“এই আমাদের দাদার বউ হবে? বেশ দেখতে গো।”

গৃহিণী। “যা তুই আর এখন বক্‌বক্‌ করিসনে। বিয়েতে যা জ্বালিয়েছিস্ তা এখনো ভুলিনি। দেখ গিয়ে গয়লানী দুধ এনেছে কি না। রঘুকে বলগে যা, ঘটিটা যেন ভাল করে ধুয়ে নেয়, আর যেন দাঁড়িয়ে থাকে, না হলে, গয়লানী ঠিক জল মিশিয়ে দেবে।

বিমলা চলিয়া গেল। যাইবার সময় ছবিখানি লইয়া গেল।

রামসদয়। কি বল তাহলে মেয়ের বাপকে লিখি,—মেয়ে এনে দেখিয়ে নিয়ে যান ও আমরা আশীর্ব্বাদ করে আসি।

গৃহিণী একটু ইতঃস্তত: করিতেছিলেন, কি বলেন তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় বিমলা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, “মা, দাদাকে আমি ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম, মেয়েটি কেমন দেখতে! দাদা বল্লে 'বেশ', তাহলে দাদারও পছন্দ হয়েছে!”

রামসদয় হাসিয়া বলিল, “তাহলে তোমার আর অমত কি?

গৃহিণী। আচ্ছা একেবারে পাকা কথা দিওনা। মেয়ের বাপকে মেয়ে নিয়ে আসতে লেখো। আর দেনা পাওনার কথাটাও জেনে নাও।

রামসদয়। আচ্ছা তাই হবে, তবে মেয়েটি হাত ছাড়া হলে এমন সুন্দরী মেয়ে আর পাবে না, তা বলে রাখছি। তোমার টাকার কি দরকার?

গৃহিণী। টাকা কি আমার নিজের জন্য চাচ্ছি ? সাধ আহ্লাদ চাই। পাঁচজনে এসে কুটুম বাড়ীর জিনিস দেখে ছি! ছি! কর্ব্বে সে কি ভাল ? আর আজকাল জানত কত ঘটা সবাই করে। নিজের মেয়ের বেলায় কি হল ?

রামসদয়। সেই জন্যইত মেয়ের বিয়ের ধাক্কা বুঝেছি। গরীবকে জবাই কর্ত্তে ইচ্ছা নাই।

গৃহিণী। আমি ত সেই জন্যই নরেশের বিয়েতে তার সুদ শুদ্ধ আদায় কর্ব্ব, না হলে ছেলের বিয়ে দিচ্ছিনে।

রামসদয়। আচ্ছা তাই হবে, যাই নবীন বাবুকে বলিগে যে তোমার মত আছে। এইবার দেনা পাওনার কথাটা তাঁরা কি বলেন দেখি।

গৃহিণী। গয়না দিতে মানা কোরো, তারা টাকা ধরে দিক। সে পশ্চিম দেশে ভাল সেকরা কোথায় পাবে ? আর আজকালকার নূতন ফ্যাসানের গয়নার মর্ম্মইবা কি বুঝবে ? তা তুমি টাকা ধরে নিও।

রামসদয় 'তথাস্তু' বলিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

(২)

একদিন সন্ধ্যার পর ললিতার মা জগৎমোহিনী দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। একটি তোলা উনানে রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছিলেন, নিকটে দাসী বসিয়া রুটি বেলিয়া দিতেছিল। একটু দূরে বসিয়া ছোট পুত্র কন্যা দুটী আহার করিতেছিল।

ঘরে একটি লণ্ঠনের কাছে বসিয়া বড় দুটী পুত্র সুবোধ ও সুশীল পাঠাভ্যাস করিতেছিল, ললিতাও বসিয়া পড়িতেছিল, ললিতার কালকার পড়া করা হয় নাই, মাষ্টার আসিয়া পড়া লইবেন। সে দাদারা খোসামোদ করিলেও যখন পড়া বলিয়া দিল না দেখিল, তখন মাকে বলিল, "মা দেখ দাদা একটু পড়া বলে দিচ্ছেনা।"

সুবোধ। তোমার যদি কেবল পড়া বলে দেব, ত আমার পড়া হবে কখন ?"

ললিতা। তোমার ত এক্‌জামিন হয়ে গেছে।

সুবোধ। তোমারই এক্‌জামিনের পড়া না ?

এমন সময় ললিতার পিতা নীরদচন্দ্র সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া জগৎমোহিনী বলিলেন "লতা, দেত মা ওঁর আর দাদাদের ঠাঁই করে। দুখুরাকে ডাক জল দিয়ে যাক্।

জগৎমোহিনী স্বামীর আহার সামগ্রী থালায় বাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "খেতে বোস, দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

নীরদচন্দ্র বসিয়া পড়িলেন। তার পর ছোট পুত্রটিকে বলিলেন, "খোকা তোমার কি হচ্ছে ?"

খোকা চারি বৎসরের। সে আধ-আধ-স্বরে বলিল, "লুটি খাচ্ছি।"

খুকী দুই বৎসরের একটু বেশী; সে হাসিয়া বলিয়া উঠিল "লুতি লুতি।"

জগৎমোহিনী ছেলে দুটির ও ললিতার খাবার দিয়া বলিলেন "লতি, খেতে বোস্"।

দাসী গিয়া দুধের বাটীগুলা সব আনিল। তিনি বলিয়া দিলেন, "দেখিস বড় বাটীর দুধ নড়াসনে। কাল খাবার হবে। ওকি খুকীর দুধের বাটী আনলি কেন? যা তাকের উপর রেখে আয়।"

আহারাদি সমাপ্তের পর ললিতা আসিয়া পিতার হস্ত ধরিয়া বলিল, "বাবা আমার ইংরাজী পড়াটা একটু বলে দেবে চল, না হলে কাল মাষ্টার মশায় এলে পড়া দিতে পার্ব্বনা। দাদাকে এত করে বল্লুম, তবু বলে দিলেনা।"

নীরদচন্দ্র। আর কদিনই বা পড়বি? এই বারত শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে।

ললিতা। আমি কখনো যাবনা, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা।

পিতার চক্ষে জল আসিল, ঘরে গিয়া কন্যার পাঠ বলিয়া দিতে ব্যস্ত রহিলেন।

খোকা খুকী তখন সুর ধরিয়াছে, মা কাজ কর্ম্ম সারিয়া আসিবেন তবেত তাহাদের লইয়া শয়ন করিবেন। তাহারা উভয়েই ঘুমে কাতর ও 'মা' 'মা' করিয়া সমস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া নীরদচন্দ্র ডাকিলেন, "শীগ্‌গীর করে কাজ সেরে না এলে কি করে হবে? এদের কান্নায় কি শেষকালে বাড়ী ছাড়তে হবে?"

সুশীল গিয়া তাহাদের শান্ত করিল। রাত্রে পুত্র কন্যারা নিদ্রা যাইবার পর নীরদচন্দ্র বলিলেন, "শুন্‌চো, আজ নবীনের চিঠি এসেছে।"

জগৎমোহিনী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কি লিখেছেন? তাঁরা কি বলেছেন?"

নীরদচন্দ্র যা বলেছেন তাতে ত আমার ভরসা হয় না

জগৎমোহিনী। তবু শুনি। এতক্ষণ যে বলনি?

নীরদচন্দ্র। ছেলে মেয়েদের সামনে বল্লে কি ভাল হত? নবীন লিখেছে তাঁরা নগদে দু'হাজার চান, তারপর বরাভরণ, ফুলশয্যা। তার মানে আড়াই হাজার। তা ছাড়া আমাদের কলকাতায় যেতে হবে, হয়ত বাড়ীও ভাড়া কর্ত্তে হবে। বিয়ের রাত্রের খরচ, যাতায়াতের খরচ। সাড়ে তিন হাজার খরচ হবে। আমি ত বিয়ে দেব না লিখে দিয়েছি।

জগৎমোহিনী। ওমা সে কি? আমায় না বলে তুমি লিখলে কেন?

নীরদচন্দ্র। তোমায় বল্লে কি উপকার হত বল? টাকা কোথা থেকে আনতে শুনি?

জগৎমোহিনী। ছেলে এম-এ পড়ছে, বাবা অমন রোজগার কচ্ছেন, অত টাকা মাইনে পান, সরকারী চাকরী। এই প্রথম ছেলে, কত আদরের বউ হবে।

নীরদচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"বুঝিত সব, কিন্তু রুধির চাই যে। এত রুধির আসে কোথা থেকে বল? আমায় বিক্রি কল্লেও ত সাড়ে তিন হাজার টাকা দাম হবে না।"

জগৎমোহিনী। তবে কি হবে? বড় সাধ ছিল, ঐ পাত্রের সঙ্গে লতার বিয়ে হয়। আমার এই প্রথম কাজ, মেয়ে আমার কত সুখে থাকবে, তা হলনা।

নীরদচন্দ্র। সাধ কি সব সময় মেটে? থাক, এখন বিয়ে দিয়ে কাজ নাই। এই ত বার বছরের মেয়ে, আরো দু বছর যাক্। ছেলে দুটোকেও ত পড়াতে হবে। সুবোধকে কলেজে পাঠিয়েছি, সুশীলও আসছে বছর যাবে। মেসের খরচ, পড়ার খরচ, আর আজ কাল যা বই কেনা —আমার মত অবস্থার লোক আর কত পার্ব্বে? নিজেরা কত কষ্টে চালাচ্ছি তা ত দেখছো? তোমার হাতে ওই কাঁচের চুঁড়ি আর শাঁখা, নিজেরও কত বেশভূষা তা দেখছ।

জগৎমোহিনী। সবিত দেখছি, নিজেদের যা হবার হয়েছে, মেয়েটা যদি সুখী হত—এমন সুন্দরী মেয়ে—

নীরদচন্দ্র। আজ কাল সুন্দরী বল্লে ত হবে না। রূপচাঁদই সব চেয়ে সুন্দর। তারই মহিমা বেশী—তার রূপেই সব ঢাকা পড়ে যায়। যার যত টাকা বেশী, তার তত লোভ, তত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে চলেছে। আমি নবীনকে স্পষ্ট লিখে দিয়েছি দেড় হাজারের বেশী দিতে পার্ব্ব না। হাজার গহনার জন্য, পাঁচশো বরাভরণ ও ফুলশয্যার জন্য। আর শ পাঁচেকের ভিতর সব সেরে ফেলবো। তা হয়ত হবে না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি। ছেলের বাপ বড়লোক, ছেলেও শিক্ষিত, তবু এ বেচা কেনা কেন? মেয়ে অমন সুন্দরী, যা দিতে পারি তাই নাও না বাপু। তা ত হবে না, এ যেন জবাই করা। দিন দিন সমাজটা কি হচ্ছে বল দেখি! আমাদেরও দিয়ে হয়েছে, আমরাও ছাই পাশ না পাঁশ করেছিলাম—তখন ত এত দর কষাকষি ছিল না, এ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা; পছন্দ হল বিয়ে দাও। আমাদের মেয়ে আমরা যা পার্ব্ব গা সাজিয়ে দেবো। তা নয় এত চাই, অত চাই, আমাদের সর্ব্বস্ব ধন মেয়ে তুলে দিচ্ছি তাতে ঠকাবনা, দু'চার শ টাকাতেই ঠকাব? তাই গহনা না নিয়ে নগদ টাকা চাই। এই ধর্ম্মের নামে, আমাদের দেশে কি অধর্ম্মই ঢুকেছে। এই বিয়ে—যা পুণ্যের জিনিস ছিল, যা পবিত্র জিনিস ছিল, তা' হাট বাজারের জিনিসের মত হয়েছে। তার দাম কষাকষি হয়ে, সে কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে? সমস্বরে আজকালকার বাপ মাকে, আর অমন শিক্ষিত সব ছেলেকে। মুখে সব গান্ধীর চেলা হয়ে দেশ উদ্ধার কচ্ছেন, এদিকে যে কি সর্ব্বনাশের পথ খুলে চলেছেন, তার ঠিকানা নাই। আমি ও-ঘরে বিয়ে দেব না ঠিক করেছি।

জগৎমোহিনী। অমন সম্বন্ধ কি হাত ছাড়া কর্ত্তে আছে? মেয়ের সুখও ত দেখতে হবে, কত আদরের মেয়ে—

নীরদচন্দ্র। মেয়ে ত সকলেরি আদরের ধন, সুখে থাকবে তাও বুঝলাম, কিন্তু টাকাটা কি চুরি কর্ব্বে বল ?

জগৎমোহিনী। তা কেন বলবো ? মেয়ের বাপকে একটু নরম হতেই হয়। তোমার মেজাজ অত রুক্ষ হলে চলবে কেন ?

নীরদচন্দ্র। আচ্ছা আমায় কি কর্ত্তে বল ? যখন তাঁরা বলছেন যে অত টাকা না হলে বিয়ে দেবেন না, আমি তখন তাঁদের কি বলবো বল ? তাঁরা যেখানে বেশী টাকা পাবেন সেখানেই ছেলের বিয়ে দেবেন। বাঘেরা যেমন একবার রক্তের স্বাদ পেলে ঘাড় ভাঙতে প্রস্তুত হয়, আমাদের সমাজে এই অর্থপিশাচরা তেম্নি দেশের সর্ব্বনাশ করে ফেললে। মেয়ে হলেই বাপ মার গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। একি বেচাকেনা নাকি ? এত দাও, না হলে হবে না ; দিতে না পার ; সোজা পথে হাঁকিয়ে দিয়ে বলবে—চলে যাও। আবার ডেকে দর কষাকষি হবে। বিবাহ জিনিসটা কত পবিত্র, কত স্বর্গীয়, তাকে একি ঘৃণিত শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা হচ্ছে ! তার উপর বিয়ের পর কেমন কুটুম হবে কে জানে ? সারা বছর তত্ত্ব করা আছে, কি করে কি হবে বল ? আমি ত ভরসা পাচ্ছি না। কাল দেখি দু'চার জনের সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁরা কি বলেন। নবীন ত যথাসাধ্য চেষ্টা কচ্ছে।

জগৎমোহিনী। কোন রকমে ধার ধোর করে দাও। তারপর না হয় শুধে ফেলবে।

নীরদ্। শুধবো কিসে ? আমার ত আর জমীদারী নাই যে তার আয় থেকে শুধবো। দেখছ ত কাজের বাজার, নিত্যি আনি নিত্যি খাই। তিন হাজারের ঝক্কি সামলান কি আমাদের কাজ ? আমাদের মেয়ের বিয়েতে কাজ নাই।

জগৎমোহিনী। ওসব কাজের কথা নয়। ঈশ্বরের দয়া হলেই হবে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে-- এ তিন বিধাতাকে নিয়ে,—তাঁর মন হলেই হবে। তাঁহারা যখন এই সব কথাবার্ত্তায় মগ্ন, তখন বালিকা ললিতা স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের ঘোরে 'মা' 'মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা কাছে গিয়া দুবার ডাকিয়া বলিলেন-"লতা লতা কি হয়েছে ?"

ললিতা তখনও ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নের মধ্যে অচেতন।

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

মহাপ্রভুরা মাপে জোঁকে,
লোকে ততক্ষণ শিঙে কোঁকে।

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস

উত্তর বঙ্গের জলপ্লাবন *

জলপ্লাবনে উত্তরবঙ্গে যে ধ্বংসলীলা সাধিত হইয়াছে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। রাজসাহী, বগুড়া, এবং পাবনা এই প্লাবনে ভীষণভাবে পীড়িত হইয়াছে এবং তত্রত্য গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন নরনারীগণ দুর্দ্দশার চরমসীমায় পৌছিয়াছে। এই ভীষণ জলপ্লাবনের কারণ উপলব্ধি করিতে হইলে এই অংশের নদী ও রেলপথের সংস্থান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আদমদীঘি ও নসরতপুরের মধ্যবর্ত্তী ভগ্ন রেলপথ।

দুইদিক হইতে আসিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র গোয়ালন্দে মিলিত হইয়া একটী কোণ সৃষ্টি করিয়াছে। এই কোণের দুই বাহু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে দিনাজপুর, রংপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা অবস্থিত। গঙ্গার এবং ব্রহ্মপুত্রের মহানন্দা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি উপনদী ও শাখানদী এই অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল স্থান যে কিরূপ নদ নদীপূর্ণ, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এই সকল স্থানে যেমন প্রতিবৎসর

* এই প্রবন্ধের সমস্ত চিত্র শ্রীচারুচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে মুদ্রিত।

অল্পবিস্তর বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা, সেইরূপ নদীপ্রাচুর্য্য বশতঃ এইস্থানে জলনিকাশের সুবিশেষ সুবিধা। পাবনা ও রাজসাহী জেলার মধ্যে চালন বিল নামক এক নিম্নভূমি আছে। এইরূপ বগুড়া জেলায়ও আর একটী বিল আছে, তাহার নাম রক্তদহ। বর্ষার প্রাচুর্য্য হইলে এই দুইটী বিল প্রায় এক হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, বরং পলি পড়িয়া চাষের সুবিধাই হইয়া থাকে। এতদঞ্চলের লোকেরাও এইরূপ অল্পবিস্তর প্লাবনে অভ্যস্ত এবং এইজন্য তাহারা উচ্চভূমি দেখিয়া সাধারণতঃ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে গ্রামবাসিগণ জিনিষপত্র বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছে।

এই বন্যাপীড়িত স্থানে অনেকগুলি রেলপথ আছে। সারা হইতে একটী বড় রেল ও একটী ছোট রেলপথ পাশাপাশি সান্তাহার পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং ছোট রেলপথটী তথা হইতে বরাবর উত্তর দিকে জলপাইগুড়ি অবধি গিয়াছে। সান্তাহার হইতে আর একটী রেলপথ পূর্ব্বোক্ত পথের সহিত সমকোণ করিয়া পূর্ব্বদিকে বগুড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সে পথের প্রায় সমান্তরাল আর একটী রেল-পথ অল্পদিন হইল সারা হইতে সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুতরাং চালনবিল ও রক্তদহ উত্তরদিকে

সান্তাহার-বগুড়া, পশ্চিমদিকে সারা-সান্তাহার এবং দক্ষিণদিকে সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথ দ্বারা বেষ্টিত।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে যে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে ২৪শে তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত নদীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। এদিকে বৃষ্টির জল নদীযোগে বাহির হইতে না পারিয়া আত্রাই নদীর তীর বাহিয়া দক্ষিণদিকে ছুটিতে লাগিল এবং বালুর ঘাটের উপর দিয়া সান্তাহার ষ্টেশনের উত্তরে জামালগঞ্জ ও আক্কেলপুরের মধ্যবর্ত্তী সান্তাহার-

আদমদীঘির পশ্চিমে ভগ্ন রেল পথ। রেল লাইন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

জলপাইগুড়ি রেলপথ ২৫শে তারিখে ভগ্ন করিয়া প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরে সান্তাহার-বগুড়া রেলপথের অনেকস্থল ভগ্ন করিয়া রক্তদহ ও চালনবিল প্লাবিত করিয়া সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথে প্রতিহত হইল। পরিশেষে এই রেলপথের ভাঙ্গুড়া ও গৌখারা ষ্টেশন দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলও অল্প ভগ্ন হইয়াছিল।

দিনাজপুর হইতে আর একটী প্রবাহ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া নওগাঁ বিভাগ প্লাবিত করিয়াছিল। কিন্তু সারা হইতে সান্তাহার পর্য্যন্ত ছোট ও বড় রেলের দুইটী পথ পাশাপাশি থাকাতে ইহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই দুইটী রেলপথে জলনিকাশের উপযোগী সুবন্দোবস্ত নাই, এবং এই দুইটী সমান্তরাল রেলপথের পয়ঃপ্রণালীগুলিও পাশাপাশি নহে। সোশ্যাল সার্ব্বিস লীগের মিঃ জে, সি, রায় ৬ই নবেম্বর তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, বড় রেলপথ প্রস্তুত কালে, ছোট রেলপথের অনেক পয়ঃপ্রণালী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কতকগুলির বিস্তৃতিও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই স্থানে

মৃত জীবজন্তুর দেহ প্রোথিত করণার্থ অনুসন্ধানরত কর্ম্মিগণ।

জলরাশি প্রতিহত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। মাঠ ডুবিল, ধানক্ষেত জলের তলে অদৃশ্য হইল, ক্রমে লোকের উঠান, বাড়ী, ঘর জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত হইল—চারিদিকে জলরাশি ধূ ধূ করিতে লাগিল—নিরুপায়, নিরাশ্রয় লোক সকল ক্রমে উচ্চভূমি, পরে ঘরের চালে, তারপর বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিল। আর শিশু, আতুর, অক্ষমগণ—তাদের কথা আর বলিতে ইচ্ছা হয় না। ঘর, দ্বার, বৃক্ষাদি পতনের প্রবল শব্দ জলস্রোতের হুহুঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়া যে ভীষণ

তর্জ্জন গর্জ্জনের সৃষ্টি করিল, তাহা ভেদ করিয়া এই হতভাগ্য, নিরাশ্রয় বন্যাপীড়িতগণের হাহাকার-ধ্বনি শৈলশিখরে হুজুরদিগের অনুকম্পা উৎপাদনে সক্ষম হইল না। কিন্তু তাহাদের এই হাহাকারধ্বনি তাহাদের প্রতিবেশিগণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত আহত করিয়াছে। তাহার ফলে দেশের মধ্যে যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা অদ্ভুত। দেশের নরনারী, দেশের বালকবৃদ্ধ, দেশের ছাত্র সম্প্রদায় প্রাণপণে এ দুঃস্থ প্লাবনপীড়িতগণের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যুবক সম্প্রদায়ের সাহায্যে দেশের নেতৃবর্গের অনেকেই ঘটনাস্থলে অন্ন, বস্ত্র,

একটী বিধ্বস্ত জমাদার ভবন।

ঔষধাদি বিতরণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। আর নেতার নেতা মহানুভব প্রফুল্লচন্দ্র রায় সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিয়া, সর্ব্বশ্রেণীর সকলের মধ্যে সহৃদয়তার ইন্ধন জ্বালাইয়া দেশের মধ্যে এক মহাপ্রাণতার উদ্বোধন করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবন দেশের মহা সর্ব্বনাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা জানিবার অবসর দিয়াছে যে, ভারতের সহৃদয়তা সুপ্ত হইলেও লুপ্ত হয় নাই।

এতদ্‌প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১২ই অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত কমিউনিকে দিনাজপুর হইতে যে পশ্চিম বাহিনী জলধারা সারা-সান্তাহারের পাশাপাশি যুগল রেল-পথের পশ্চিমদিকে প্রতিহত হইয়াই পাঁচ ফিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ মাত্র নাই। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার বেণ্টলী এই ভীষণ জলপ্লাবনের কারণ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি সান্তাহার অঞ্চলে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন।

করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, এই অঞ্চলে জলনিকাশের পথ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে, কিন্তু রেলওয়ে ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা প্রধানতঃ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। সুতরাং রেলপথ ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তাগুলিই এই জলপ্লাবনের জন্য কতকাংশে দায়ী। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার এই মতামতের কথা তিনি গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিয়াছেন। দেখা যাউক ইহার ফল কি হয়।

সান্তাহারে বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি।
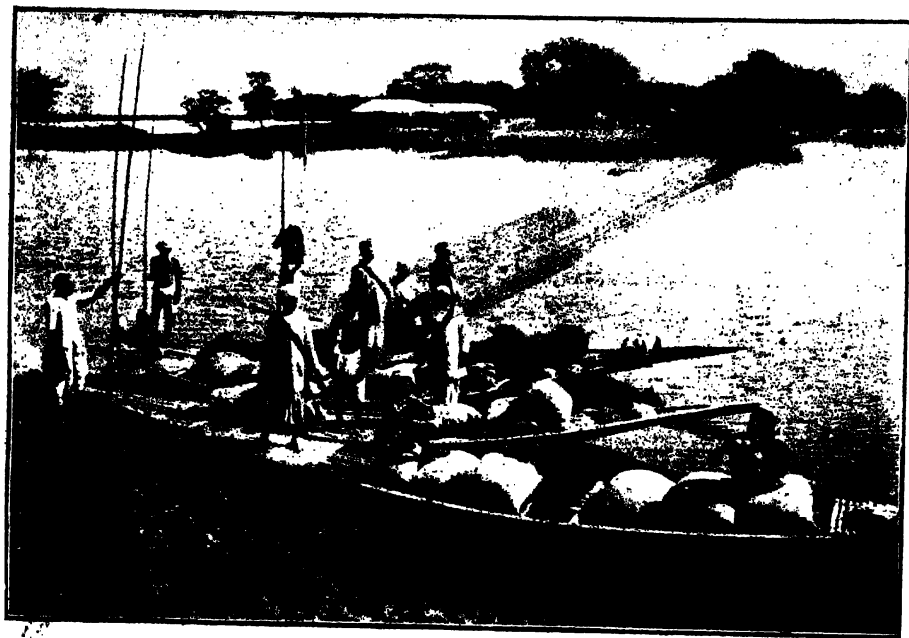
অগ্রহায়ণে

আকালি শিখ—পঞ্জাবে যে আগুন লাগিয়াছে তাহা নিবিতেছে না। প্রতিদিন আকালি শিখদের লইয়া হাঙ্গামার কথা শুনিতেছি, তাহারা দলে দলে ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইতেছে শুনিতেছি, কিন্তু আগুন নিবিতেছে না, বরং অধিকতরপ্রভাবে জ্বলিতেছে। হাঙ্গামার মূল বলিয়া আমরা যাহা জানি, তাহাতে এমন কিছু নাই যে, রাজ সরকারের পক্ষে সহজে শান্তি স্থাপন করা অসম্ভব।

আমাদের অধোগতির দিনে মঠ ও মন্দির প্রভৃতির ব্যবস্থায় ভারতের সর্ব্বত্র যাহা ঘটিয়াছে, পঞ্জাবেও তাহাই ঘটিয়াছে; মঠ ও মন্দির প্রভৃতি যে সকল সম্পত্তি উৎসর্গ করা হইয়াছে, মোহন্ত ও পূজারীরা অধিকাংশস্থলে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছে না। শিখদের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য, দুঃস্থদের দুর্গতি মোচনের জন্য বড় বড় দাতারা বহু মঠে ও মন্দিরে অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন; পঞ্জাবে এই মঠাদির সংখ্যা অনেক, উহাদের সংস্সৃষ্ট সম্পত্তিও অনেক। শোনা যায় যে, অনেক স্থলেই মোহন্তেরা বিলাসে ডুবিয়াছে ও বড় বড় সম্পত্তির আয় তাহাদের নিজেদের সেবায়ই ক্ষয় করিতেছে। ধর্ম্মের দানের এই কুৎসিত পরিণতি যাহাতে না হয়, তাহার জন্যই আকালি সম্প্রদায়ের শিখেরা মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া মন্দির, মঠ ও তৎসংসৃষ্ট সম্পত্তির সুব্যবস্থার জন্য দল বাঁধিয়া মন্দির ও মঠ আক্রমণ করিয়াছে। একা আকালিরা নয়,—পঞ্জাবের সকল শ্রেণীর শিখদের সুশিক্ষিত পদস্থ প্রতিনিধিরা উক্ত অধর্ম্ম নিবারণের জন্য একটি সভা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন; এই সভার অধ্যক্ষেরা আকালিদের অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী।

প্রথমে যখন আকালিরা দল বাঁধিয়া আন্দোলন করিল, ও মঠ মন্দির দখল করিতে লাগিল, তখন রাজ সরকার তাহাতে বাধা দেন নাই। তাহার পর সহসা (হয়ত ভবিষ্যতে রাজদ্রোহ হইবে ভয়ে) রাজ সরকার আকালি শিখদের প্রতি ও সুনির্ব্বাচিত শিখ সভার প্রতি বিরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজ সরকার বলেন যে, সংস্কারকেরা মন্দির ও মঠ প্রভৃতি দখল করিতে হয় করুক, কিন্তু তাহাদিগকে ভূ-সম্পত্তি দখল করিতে দিবেন না, এবং ভূ-সম্পত্তি গুলিতে মোহন্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। স্বার্থপূর্ণ লোকেরা নির্বীর্য্য ও মধুর বচন রচনায় পটু হয়; তাহাদের স্বার্থপ্রণোদিত কথা শুনিয়া রাজ সরকার যদি উগ্রভাব ধরিয়া থাকেন, তবে বড়ই ভুল করিয়াছেন। এক দিকে অসহযোগ পন্থীরা, ও অন্যদিকে কয়েকজন রাজদ্রোহী এই আকালিদিগকে নাকি দলে টানিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উহারা ঐ সকল দলের লোকদিগের ছায়াও মাড়ায় নাই। এই কথা ইংরেজদের চালিত সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। তবুও ইহাদের প্রতি সরকার বিরূপ কেন?

আকালিরা সরকারের অনুমতিতেই অমৃতসরের অদূরবর্ত্তী গুরুকাবাগ দখল করিয়াছিল; তবুও ঐ বাগের কাঠ কাটার অপরাধে তাহারা চোর বলিয়া দণ্ডিত হইল; ফলে দাঁড়াইল যে শান্তভাবে দলে দলে শিখেরা আসিয়া গুরুকাবাগে পৌঁছিল, ও পৌঁছিতেছে আর দলে দলে উহাদিগকে চালান করিয়া দণ্ড দেওয়া হইতেছে। নিরস্ত্র ও নির্ব্বিরোধী শিখদের উপরে পুলিশের লোকেরা যে অমানুষী অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত আণ্ড্রুজ মহোদয় লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে হৃৎকম্প হয়।

* * *

ভাবী পার্লেমেণ্ট—এবারে ইংলণ্ডের রাজশাসনের কর্ত্তৃত্ব কোন্ দলের লোক পাইবেন, এ চিন্তা আমাদের নাই। আমাদের বেলা সকল রাজনৈতিক দলের একই মূলমন্ত্র—ভারতকে দখলে রাখিতে হইবে; এই রক্ষা-কল্পে কোন্ পদ্ধতি উপযোগী, তাহা লইয়া কেবল দলে দলে কেন, শাখায় শাখায় মতভেদ আছে ও থাকিবে। আমরা পার্লামেণ্টের কথা পাড়িয়াছি,

বোনার ল।

লয়েড জর্জ।
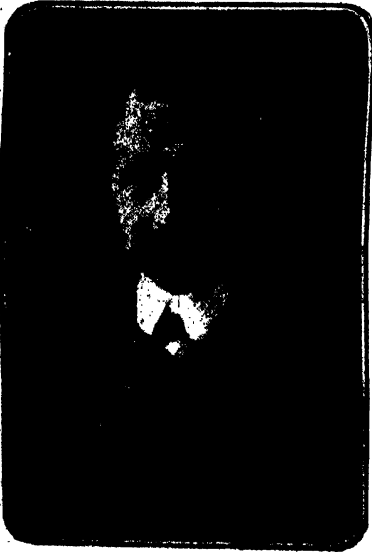
সেই প্রসঙ্গে কিছু শিখিবার জন্য। প্রভুত্ব লাভের জন্য বিলাতের দলে দলে প্রতিযোগিতার লড়াই আছে, কিন্তু যখন মহাযুদ্ধ বাধিল, তখন সকলে দলাদলি ছাড়িয়া রাষ্ট্র শাসনের জন্য দলনির্ব্বিশেষে উপযুক্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিল; এই মিলিত দলের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জ্জের পরিচালনায় যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি হইয়া গিয়াছে। যিনি বিপদের দিনে কর্ম্মকুশল বলিয়া স্বীকৃত

হইয়াছেন, তিনি যে সুখ-শান্তির দিনে অকর্ম্মা তাহা নয়; কথা এই যে, নিরাপদের সময়ে মিলন না হইলে চলে, এবং যে কোন দল প্রভুত্ব চালাইতে পারেন; তাই মিলন ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন পার্লামেণ্ট বসাইবার প্রস্তাব হইল। মিলিত দলের নেতা বা রাজমন্ত্রী লয়েডজর্জ্জ পদত্যাগ করিয়াছেন, আর এখন অস্থায়িভাবে রক্ষণশীলদলের প্রতিভূরূপে শ্রীযুক্ত বোনার ল মন্ত্রীদল গড়িয়াছেন। কনসার্বেটিব বা রক্ষণশীল দলেরই এবার জয় হইবার সম্ভাবনা; কারণ পুরাতন লিবারল দল এখন নানাভাগে বিভক্ত, এবং এই বিভক্ত দলগুলির মধ্যে শ্রমজীবীদের স্বত্ব রক্ষার দল অধিক পুষ্ট,—আর সেই শ্রমজীবীদের দলের প্রতি বহুলোকের গভীর অনাস্থা। এই অনাস্থার কারণ এই যে শ্রমজীবীদের দলের লোকেরা অনেক বিষয়ে রুশিয়ার বল্‌শেবিকদের মন্ত্রে দীক্ষিত। ধনী দরিদ্রের ও উচ্চ-নীচের প্রভেদ ঘুচাইতে গিয়া বল্‌শেবিকেরা রুশিয়ার যে দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছে; তাই যে কোন নীতির মন্ত্রে বল্‌-শেবিকদের নামের গন্ধ আছে, তাহা তাহারা সুবিচারে হউক বা অবিচারে হউক, প্রত্যাখ্যান করিতে চায়। ইংলণ্ডের নীতি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, আমরা কি সাধারণভাবে সুখ-শান্তিতে বাস করিতেছি বলিয়াই স্বরাজ-সাধনার জন্য বহুদলের আবির্ভাব হইয়াছে, ও দলে দলে লড়াই চলিতেছে?

আলিপুর জেলের কথা—আলিপুর জেলের কয়েদীরা গত বৎসর একবার বিদ্রোহ করিয়াছিল,—সম্প্রতি এবৎসর আবার করিল। এরূপভাবে কয়েদীদের বিদ্রোহ, জেলের ইতিহাসে নূতন। যাহাদের হাত পা বাঁধা, পালাইবার সুবিধা নাই, দাঙ্গা করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নাই, আর কর্ত্তৃপক্ষেরা গুলি চালাইলেই যাহারা মরিবেই মরিবে, তাহারা যে কেন মরিয়া হইয়া বিদ্রোহ করে, তাহার যথার্থ অনুসন্ধান হয়ত হইতেছে; বাহিরের রিপোর্টে যাহা প্রকাশ, তাহাতে মূল কারণ তেমন বোঝা যায় না; শাসন-নীতিতে এসকল বিষয়ের গোপন অর্থাৎ Confidential report হইবার উপযুক্ত কারণও থাকে। যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, যেরূপভাবে কয়েদীদের প্রতি গুলি চালান হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন ছিল না; খুন জখম না করিয়াই উহাদিগকে শান্ত করা যাইতে পারিত।

ইতালীর নূতন গবর্ণমেণ্ট—মহাযুদ্ধের পর ইতালিতে অনেক লোক বল-শেবিকদের অরাজকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল, আর তাহার ফলে অনেক বাড়ী ঘর ও দোকানপত্র লুট হইতেছিল। ইতালির রাজসরকার ঠিক পঙ্গু না হইলেও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; তাই নূতন বিদ্রোহীদলকে কেহ দমন করিতে পারে নাই। এই অবস্থা দেখিয়া দেশের মধ্য-শ্রেণীর সুশিক্ষিত ও কর্ম্ম-পটু লোকেরা অনেকে এক সঙ্গে জুটিয়া অরাজকতার বিদ্রোহ দমাইতে উদ্যোগী হন; এই দল ফাশেষ্টি নামে পরিচিত। রাজসরকার প্রথমে ফাশেষ্টিদিগকে একটু উৎসাহিতই করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন উহারা ক্ষমতা-শালী হইয়া উঠিল এবং বিদ্রোহ থামাইতে গিয়া কর্ত্তৃত্ব

চালাইতে লাগিল তখন রাজসরকার ভীত হইলেন, কিন্তু ফাশেষ্টিদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। ফাশেষ্টিদলে অনেক অথ্রষ্টীয়ান আছেন; তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইলেও সংযত-চরিত্র, এবং সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ঘুচাইয়া সুশাসন স্থাপনের পক্ষপাতী। ইঁহারা বাহুবলে অরাজক-দলকে পরাভূত করিয়াছেন এবং যাঁহাদের হাতে রাজ্য-শাসনভার ছিল, তাঁহাদের হাত হইতে একরকম বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতেই রাজ্যভার কাড়িয়া লইয়াছেন। ফাশেষ্টিরা প্রচার করিয়াছেন যে ইঁহারা রাজভক্ত; তাই রাজা ইঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু না করিয়া ইঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। ফাশেষ্টিদলের নেতা শ্রীযুক্ত মুসোলিনি রাজ-মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং সেই ক্ষমতাশালী দলই রাজার অধীনে রাজ্য-শাসনের ভার পাইয়াছেন।

তুর্কীদের নবজাগরণ—মহাযুদ্ধের পর তুর্ক সম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; মিশরের উপর তুর্কের আধিপত্য ত গিয়াছেই, তাহা ছাড়া আরব দেশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও মেসোপটেমিয়ায় নূতন রাজত্ব বসিয়াছে; এগুলির পুনরুদ্ধারের কোন আশা দেখা যায় না। বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে এশিয়ার উত্তর পশ্চিমে আনাতোলিয়ায় তুর্কীদের যে রাজ্য বসিয়াছিল, তাহার সহিত সাম্রাজ্যের মূল ভাগ কনস্তান্তিনোপলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না; ইউরোপে কন্‌স্তান্তিনোপল্‌ টুকু লইয়াই ওস্‌মনের বংশধর নামে মাত্র সুলতানি করিতেছিলেন। এবার আনাতোলিয়ার অধিনায়ক নীতিজ্ঞ ও বীরচূড়ামণি মুস্তাফা কমাল পাশা রাজ্য হইতে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া তুর্ক রাজ্যে নব জীবন আনিয়াছেন। ইংরেজেরা, ফরাসীরা, ও ইতালীয়েরা এবারে কমাল পাশার দাবী—বহুপরিমাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং ইউরোপ আদ্রিয়ানোপ্‌ল পর্য্যস্ত তুর্করাজ্যের প্রসার বাড়িতে দিয়াছেন ও ইউরোপীয় ভাগের সহিত আনাতোলিয়াকে যুক্ত হইতে দিয়াছেন।

তুর্কীরা বুঝিয়াছেন যে ইউরোপের সঙ্গে টক্কর দিতে হইলে, ইউরোপীয়দের মধ্যে স্থিতি বজায় রাখিতে হইলে পুরাতন পদ্ধতি চালাইলে চলিবে না। সমগ্র রাজ্যে প্রজা-তন্ত্রশাসনের ব্যবস্থা হইতেছে এবং সকল বিভাগে নূতন সংস্কার চলিতেছে। নূতন জাতীয় দলের চালকেরা বনিয়াদি সুলতানকে বলিয়াছেন যে প্রজাদের মনোনীত ব্যক্তি দেশের অধিনায়ক হইবেন এবং তিনি সুলতান থাকিতে পারিবেন না; তাঁহারা ইহাও জানাইয়াছেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি জড়াইয়া জাতিকে দুর্ব্বল করিবেন না, এবং সেইজন্য সুলতানদের বংশপ্রবর্ত্তক ওস্‌মানের যে কোন উপযুক্ত বংশধরকে রাষ্ট্রের সঙ্গে অসম্পর্কিতরূপে খলিফা করা হইবে। সুলতান একথা শুনিয়া নাকি বলিয়াছেন, যে তিনি বরং নিজের মুল্‌লুক ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিবেন, কিন্তু নূতন দলের আদেশ পালন করিবেন না। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানা নাই, তবে গোলমাল দেখিয়া ইংরেজপ্রভৃতিরা জানাইয়াছেন যে, তুর্করাজ্য সম্বন্ধে সকল কথা বিচারের জন্য এমাসে যে সভা হইবার কথা ছিল, তাহা এখন স্থগিত থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র—যাঁহারা আত্ম-সংহারের বুদ্ধিতে,—শনির

তাড়নায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-কারিতা, সম্মান ও গৌরব ধ্বংস করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি দিবার জন্য ও লোক সাধারণকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিত-ব্রত বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইংরেজী সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকলেরই সযত্নে পড়া উচিত। যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে, জ্ঞানের কঠোর তপস্যায় সুধীসমাজের অগ্রণী, যাঁহার সুশিক্ষায় ও বদান্যতায় বহুসংখ্যক দরিদ্র যুবক দেশের কৃতী সন্তান হইয়াছেন, খুলনার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে উদ্ধার করিয়া এবং উত্তর বঙ্গের উপস্থিত দুর্গতিমোচনে শরীর, মন ও অর্থ নিয়োগ করিয়া যিনি সর্ব্বসাধারণের পূজার্হ হইয়াছেন, তাঁহার নিঃস্বার্থবাণী এদেশে উপেক্ষিত হইতে পারে না। তবে যাঁহারা জিদের বশবর্ত্তী, এবং ক্ষমতালাভের মোহে স্থায়িহিতবিস্মৃত, তাঁহারা কি করিবেন, জানি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অনিষ্ট করিতে পারিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা আত্ম-মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অনিষ্টসাধনে অতি নগণ্য ব্যক্তিও কৃতী হইতে পারে, কিন্তু হিতসাধন অত্যন্ত কঠিন। জিদ্‌ওয়ালারা যদি একবার উল্টাদিকে আপনাদের ক্ষমতার পরীক্ষা করিতেন, তবে আত্মপ্রসাদ উড়িয়া যাইত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আগ্রহে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, একবার ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও হিংসা ভুলিয়া, সকলে যেন দেশের পরম হিতকর বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে উদ্যোগী হয়েন; সমালোচনার নামে যেন বিষের জ্বালা ঝাড়িয়া আত্মসংহার না করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় যে স্বাধীনতা দেখা যায়, উহাই উহার কাল হইয়াছে; এই স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্ম্মম যন্ত্রবিশেষে পিঁশিবার জন্য কয়েকজন পদস্থ বাঙ্গালী সচেষ্ট। দুর্দ্দিনের এই আভাস পাইয়াই প্রফুল্লচন্দ্র কলম ধরিয়াছেন।

সেড্‌লার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে উন্নত করা ও তাহার পুষ্টিবিধান করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, ইহা বিলাতের ভূতপূর্ব্ব অণ্ডার সেক্রেটরী হের্টজেল (Hertzel) মহোদয় তাঁহার নূতন প্রকাশিত Blue-book-এ লিখিয়াছেন; লোক-সাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার নামে ও হুজুগে উচ্চশিক্ষাকে খর্ব্ব করিলে যে, দেশের সর্ব্বনাশ হয়, আর উচ্চ-শিক্ষার প্রসার বাড়াইয়া সুশিক্ষক প্রস্তুত করিয়া যে ধীরে ধীরে সাধারণ শিক্ষার পথ খুলিতে হয়, ইহাও সেই ব্লু-বুক নামক রিপোর্টে আছে। সুপণ্ডিত প্রফুল্লচন্দ্রও তাহা বলিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়টির এখন যে সম্মান আছে ও স্বাধীনতা আছে, এবং এখন সকল বিভাগের জন্যই যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা তিল মাত্র নষ্ট করিলেও জাতীয় অকল্যাণ সাধিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় যে মরিতেছে পুষ্টির অভাবে, অর্থাৎ অর্থ সাহায্যের অভাবে, কিন্তু অপব্যয়ের জন্য নয়, একথা স্বাধীনচেতা নিঃস্বার্থ সাধু প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন। এমন হতভাগা কেহ নাই যে, তাঁহাকে তিল পরিমাণেও গোলামি বুদ্ধিতে পরিচালিত বলিবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের আচার্য্য, কিন্তু যে ভাবে তিনি এক কপর্দ্দকও না লইয়া কর্ত্তব্যসাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে

কাজ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা সকলের জানা ভাল। এ বৎসর তাঁহার অধ্যাপনার নিয়মিত মেয়াদ ফুরাইবার পর আগেকার মত মাসিক হাজার টাকা বেতনে আর ৫ বৎসরের জন্য যখন তাঁহাকে নিয়োগ করা হইল, তখন তিনি সিণ্ডিকেট ও সেনেটকে জানাইয়াছেন যে কর্ত্তব্যসাধনের জন্য তিনি তাঁহার পদের কার্য্যে করিতে থাকিবেন, কিন্তু এখন ৬০ বৎসর বয়সের পর অধ্যাপনার কাজের জন্য একটি পয়সাও লইবেন না ; তাঁহার প্রাপ্য টাকা (৫ বৎসরে ৬০০০০৲) ব্যবহারিক রাসায়নিক বিদ্যা শিক্ষার ব্যয়ের জন্য অথবা ভাইস্‌চান্‌সেলার ও সেনেটের বিচারিত অন্য কোন সুশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই মহাত্মার উক্তির মর্য্যাদা বুঝাইবার জন্য বক্তৃতার প্রয়োজন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় আগে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা উহা যে বহুগুণে উন্নীত, পোষ্ট গ্রাজুয়েটের আর্টস ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই সুশিক্ষা ও মৌলিক গবেষণা যে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং উপযুক্ত অর্থ পাইলে যে বিশ্ববিদ্যালয়টী দেশের পরম কল্যাণ সাধন করিবে, ইহা সকল অবস্থা অভিজ্ঞ প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যাপনা করেন তাঁহারা যে উপযুক্ত ব্যক্তি এবং অনায়াসেই তাঁহাদের বেতনের হার যে অন্যত্র দ্বিগুণের বেশী হইতে পারে ও হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন। সরকারের প্রভিন্‌শিয়াল চাকরীতে যে এই অধ্যাপকদের মত যোগ্য না হইয়াও অনেকে অধিক টাকা পাইয়া থাকেন, এবং পেন্সন পাইতে পারেন, তাহাও ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহার কথা বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করিবার পথ নাই তাঁহার কথায় যদি ক্ষমতা-লোলুপদের সুবুদ্ধি না জাগে, যদি বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচকদের সুমতি না হয়, তবে কি দেশের লোকসাধারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা, সম্মান ও হিত-ব্রত রক্ষার জন্য অগ্রসর হইবেন না ?

আচার্য্য মাকডোনেল—রায় বাহাদুর জি, সি, ঘোষ তাহার একমাত্র পুত্র নির্ম্মলেন্দু ঘোষের স্মৃতির জন্য বিদ্যালোচনার যে ফণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন তাহার টাকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে। এবার প্রথম বৎসরে তুলনা মূলক ধর্ম্ম বিষয়ে আটটি বক্তৃতা দিবার জন্য স্বনামখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মেকডোনেল সাহেব বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অক্সফোর্ড হইতে এখানে আসিয়াছেন। বক্তৃতার সূচনায় অক্সফোর্ডের সংস্কৃতাচার্য্য মেকডোনেল মনোজ্ঞভাবে তাঁহার মজঃফরপুর জেলায় জন্মের কথা ও ভারতের প্রতি প্রাণের টানের কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বক্তৃতাগুলি সরস ও শিক্ষণীয় হইতেছে।

বঙ্গে লোকক্ষয়—রেলের রাস্তায় জল নিঃসারণের পথ বন্ধ হওয়ায় আমাদের এই জলাদেশে রোগ বাড়িয়াছে ও বাড়িবে, এ কথা বহুকালপূর্ব্বে পরলোকগত সুধী দিগম্বর মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি না ছিলেন ডাক্তার, না ছিলেন "শাদা",—তাই তাঁহার কথা

মত কোন কাজ হয় নাই। এবারে উত্তরবঙ্গ যখন ভাসিয়া গেল, তখন বিশেষজ্ঞেরা অনেকেই জলের স্থিতি ও গতি দেখিয়া বুঝিলেন যে, যথেষ্ট পরিমাণে পুল থাকিলে এতটা জল দাঁড়াইত না ও দেশের দুর্দ্দশা হইত না। বড় কর্ত্তাদের কিন্তু অ...কে সে কথা অগ্রাহ্য করিলেন। এবারে আর কথাটি নাই,—সরকারী গোরা ডাক্তার ও স্বাস্থ্যের কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলে বাঙ্গালার সকল স্থানের মানচিত্র আঁকিয়া ও সেই মানচিত্রে রেলের রাস্তা আঁকিয়া অকাট্য যুক্তিতে দেখাইতেছেন যে, বহুপরিমাণে পুল না রাখায়, উপযুক্তভাবে জলনিঃসারণ ও জল বিলি সম্বন্ধে কত গোল ঘটিয়াছে, শস্য উৎপাদনে কত বাধা ঘটিয়াছে, এবং মেলেরিয়ার প্রভাব বাড়িয়া কিরূপে ভীষণ লোকক্ষয় হইতেছে। ইহাতেও কি একটা সুব্যবস্থা হইবে না? কথাটি উঠিতেই কিন্তু স্থানে স্থানে রব উঠিয়াছে যে, বেণ্টলের কথা সত্য বটে, অবস্থার প্রতীকারও চাই, তবে কাজ করিবার অত টাকা কোথায়? আমরা বলিয়া রাখি যে, মানুষ মরিলে তাহাদের ভূতেরা মিলিটারীর ভয়ে টেক্স দিবে না।

* * *

অর্থ-সঙ্কট—স্বাস্থ্য রক্ষার বিধান করিয়া মানুষ বাঁচাইবার টাকা নাই, সুশিক্ষায় মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়াইবার টাকা নাই,—কারণ সমর বিভাগ প্রভৃতিতে ব্যয় অধিক। আমরা সামরিক নীতি জানি না, কাজেই সমর বিভাগের গুরু প্রয়োজনের বিষয় আমাদের ধারণার অতীত। তবে এবারে দেরাদুনে সামরিক বিদ্যালয় খুলিতেছে, আর সেখানকার উপযুক্ত ছাত্রেরা সমর বিভাগের বড় চাকরী পাইবে, শুনিতেছি; এ অবস্থায় হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা সমর-তত্ত্বের সমালোচনা করিতে পারিবেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে নীতিজ্ঞ জাতির বড়লোকদের উক্তি ধরিয়াই দু'একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের অর্থাভাবের দিনে সমর বিভাগের জন্য যখন কয়েক মাস পূর্ব্বে অনেক টাকার বরাদ্দ হইয়াছিল, তখন এদেশের অনেক অভিজ্ঞ ইংরেজ বলিয়াছিলেন যে, যে সময়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, সে সময়ে দরিদ্র দেশের অত টাকা সমর বিভাগের জন্য রাখা উচিত নয়। সম্প্রতি লর্ড মেষ্টন বলিয়াছেন যে, ভারত শাসনে অর্থের অভাব অনায়াসেই দূর করা যায়, যদি সমর বিভাগের অযথা ব্যয় কমাইয়া দেওয়া হয়, বাণিজ্যে রক্ষণনীতি চালান যায়, এবং শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকেই অধিক পরিমাণে বড় চাকুরীগুলি দেওয়া যায়। এ প্রস্তাবগুলির কোনটিই যে অযৌক্তিক অথবা সুশাসনের বিরোধী, তাহা কেহই দেখাইয়া দেন নাই; যাঁহারা এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহারা শুধু উপহাস করিয়া কথাটি উড়াইয়া দিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। শীঘ্রই লর্ড ইন্‌চকেপের অনুসন্ধান সমিতি বসিবে; সেখানে সকল কথারই বিচার হইবে শুনিয়াছি। লর্ড ইন্‌চকেপ্ যথার্থই ব্যবহারজ্ঞ, কর্ম্ম-পটু ও সূক্ষ্মদর্শী; তিনি যদি বনিয়াদি গৌরবের জিদের চাপে না পড়েন, আর সকল দিকের অভাব দেখিয়া অর্থব্যয়ের একটি পদ্ধতি গড়িয়া দেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহার কথা উড়াইয়া দেওয়া সহজ হইবে না।

আইনভঙ্গ কমিটি—সারা দেশ জুড়িয়া খাজনা ট্যাক্স বন্ধ ও আইনভঙ্গ করিবার সময় আসিয়াছে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি যাঁহাদের উপর ভার দিয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য্য এইবার শেষ হইয়াছে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রবিড় উৎকল মহারাষ্ট্র ও পঞ্চনদে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে সকলে মিলিয়া খাজনা বন্ধ করিবার বা আইনভঙ্গ করিবার সময় এখনও আসে নাই। সে সময় অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে কখনও আসিবার সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কমিটি নীরব। সরকারী অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য কোথাও যদি কোন বিশেষ আইন ভঙ্গ বা বিশেষ খাজনা বন্ধ করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর তাহা স্থির করিবার ভার দিয়া সভ্যেরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

কমিটির সভ্যদিগের মতে ব্যবস্থাপক সভাগুলি এই দুই বৎসর ধরিয়া যেরূপভাবে কার্য্য চালাইয়াছে তাহাতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছেন যে আগামীবার হইতে কংগ্রেসের সভ্যেরা যেন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করিয়া তোলা। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত ভি, জে, পাটেল ও হাকিম অজমল খাঁ এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী। আর ডাক্তার আন্সারি, শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী ও শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার এই ব্যবস্থার বিরোধী।

মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা ও লোকালবোর্ডে প্রবেশ করা বিষয়ে ইঁহারা সকলেই একমত। সকলেই ইহার পক্ষে।

ইস্কুল, কলেজ বা আদালত বর্জ্জন আদর্শ মাত্র হইয়া থাকিবে। ইস্কুল কলেজ হইতে ছেলে ভাঙ্গাইবার কোন চেষ্টা হইবে না; আর যে সকল উকীল ব্যারিষ্টার আদালত ত্যাগ না করিবেন তাঁহারাও কংগ্রেসী সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিবেন না।

শ্রমজীবীদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিদিকে দৃষ্টি দেওয়া কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের কাজ ভিন্ন অপর কাজ করিবার সময় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করা যে কংগ্রেসনীতিবিরুদ্ধ নয় এইরূপ রায় বাহির হইয়াছে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করা যে সব সময়েই উচিত তাহাও এতদিনে স্থির হইয়াছে।

কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবার পর দেশময় মিটিং ও বক্তৃতা চলিতেছে। যদিও কোন কোন স্থানে কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে মত দেখা যাইতেছে, তথাপি অধিকাংশ স্থলেই জনমত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর স্বপক্ষে। এতদিন পরে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারও মত দেশের ইষ্ট করিতে হইলে সকলেরই কাউন্সিলে প্রবেশ করা উচিত—কাউন্সিলে প্রবেশ করিলে অসহযোগনীতি বর্জ্জন করা হয় না —বরং সেইখানে অসহযোগনীতিবশে কায করিলে স্বরাজ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা হইবে। কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া অসহযোগপন্থীরা

কি উপায় অবলম্বন করিবেন সে বিষয় এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে, অসহযোগপন্থীরা এবার কাউন্সিল পরিত্যাগ করায় প্রায় সব কাউন্সিলেই যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা অল্প—আর কাউন্সিলগুলি যে দেশের প্রকৃত মুখপাত্র তাহাও বলা যায় না। আগামী বৎসর দেশের নেতারা সকলে কাউন্সিলে যাইলে আর একথা বলা যাইবে না। কাউনসিলের নিকট তখন অনেক কায আশা করা যাইতে পারিবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দাস মহাশয়ের অভিমতের অনুমোদন করিয়াছে।

* * *

শিক্ষা সচীব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনঃ—কয়েকদিন পূর্ব্বে বেঙ্গলী পত্রিকা প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালার শিক্ষা সচীব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য এক আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সংবাদ সত্য কিনা সঠিক জানা যায় নাই—কিন্তু এ যাবৎ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন প্রতিবাদও বাহির হয় নাই। বেঙ্গলী যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, এই স্বরাজ সাধনার দিনে মিনিষ্টার মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন লোপ করিয়া গভর্ণমেণ্টশাসন বসাইতে চাহেন। এতকাল যখন শিক্ষাসমস্যা ইংরেজ মেম্বরের হাতে ছিল, তখন সেনেটের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা প্রসারের চেষ্টার কারণ বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু এ দেশী শিক্ষাসচীবেরও হাতে কি সেই একই ব্যবস্থা হইবে? নিজের দেশের লোকই যদি এইরূপ ব্যবহার করিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাতের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আমরা আর "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার করি কেন?

আর একটি কথা মিনিষ্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। এই যে এত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দেশ বিদেশ হইতে লোক আনিয়া কমিশন বসান হইল, তাহার রিপোর্টের কি হইল? সে রিপোর্ট অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কি পরিমাণ টাকার আবশ্যক তাহার কোন অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বেই কমিশনের প্রস্তাবগুলি নাকচ করিয়া দেওয়া হইল কোন্ যুক্তি অনুসারে? আজ তিন বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য উপর্য্যুপরি আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তরও নাই। গত ১১ই নভেম্বর সেনেটে এই মর্ম্মে আবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কিরূপ মতামত ও ভিতরে ভিতরে কিরূপ আয়োজন হইতেছে সেনেটকে তাহা খোলাখুলি বলা আবশ্যক। দেখা যাউক গভর্ণমেণ্ট কি বলেন।

শোকসংবাদ

ইন্দিরাদেবী—পরলোকগত মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় যে বিশেষত্ব লক্ষ্য করি, তাঁহার বংশেও সেই বিশেষত্ব দেখিতে পাই ; এ বিশেষত্ব সুশিক্ষা ও সংযম। মনস্বী ভূদেবের পুত্র,—৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুহিতা ইন্দিরাদেবী তাঁহার সাহিত্যিক রচনায় তাঁহার বংশ-নিষ্ঠ সুশিক্ষা ও সংযমের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। দেবী ইন্দিরা, অকালে ৪৪

["ভারতী"-পত্রিকার সৌজন্তে]

বৎসর বয়সে বিজয়া দশমীর প্রভাতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাল্য-কালে পিতামহের কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন ও সেই অল্প বয়সেই সংস্কৃত ভাল ভাল কাব্য পড়িয়া-

ছিলেন এবং সরল বাঙ্গালায় ও সংযত রীতিতে রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। পতি পুত্র লইয়া আদর্শ গৃহিণীর মত সংসারের সকল কাজ করিতেন, আর সেই কাজের মধ্যেই সাহিত্য চর্চ্চা করিবার যথেষ্ট অবসর মিলিত। সুশিক্ষায় জ্ঞান-কৌতুহল বাড়িলে, কোনরূপ বাধা বিঘ্নই মানুষকে জ্ঞান চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। তাঁহার সুরচিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে নিশ্চয় অনেক পাঠকেরই পরিচয় আছে। তাঁহার "প্রত্যাবর্ত্তন" উপন্যাসখানি যে ভাবে তাঁহার মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ভারতী পত্রিকায় পড়িলাম, তাহাতে চক্ষে জল আসিল। রোগশয্যায় পড়িয়া ইন্দিরা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবন শেষ হইতেছে ; উপন্যাসখানি ভারতীতে শেষ করিয়া না দিলে পাঠকদের দুঃখ হইবে মনে করিয়া রোগশয্যায় শুইয়াই তিনি গ্রন্থখানি শেষ করিয়াছেন। যশস্বিনী অনুরূপা দেবী, এই ইন্দিরা দেবীর ভগিনী ; অনুরূপা দেবী পরলোকগতা ভগিনীর অপ্রকাশিত ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত রচনাগুলি মুদ্রিত করিবেন শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—বৃদ্ধ সাহিত্যিক, উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ৭৩ বৎসর বয়সে বহরমপুরে জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন। নবযুগের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন, সেই সময়ে যে কয়েকজন তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার আকর্ষণে

সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন, চন্দ্রশেখর তাঁহাদের একজন। সে আজ ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময়ে যাহাকে Free thinking বলে, সেই শ্রেণীর স্বাধীন চিন্তার স্রোত এ দেশের ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে খুব প্রবাহিত হয়, এবং যুবকেরা বিশেষভাবে মিল, স্পেন্সার, মাক্‌লিনের

প্রভৃতির গ্রন্থচর্চ্চার অনুরাগী হয়েন। সাহিত্যের দিক দিয়া কার্লাইল-এর প্রভাবও তখন যথেষ্ট ছিল এবং কার্লাইলের আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া যুবকেরা জর্ম্মান কবি গেটে (Goethe)র গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পড়িতেন। চন্দ্রশেখর, সেদিনের সেই প্রভাবের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যে শ্রেণীর গ্রন্থকারদের নাম করিলাম তাহাদের বহুগ্রন্থ সযত্নে পড়িয়াছিলেন। দেশের সাহিত্যের মধ্যে তখন বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী প্রথম আলোচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং চন্দ্রশেখর এই পদাবলী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েন। তাঁহার মধুরকণ্ঠে একবার পদাবলীর গান শুনিয়াছিলাম। বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শে তিনি তাঁহার রচনাকে সর্ব্বদাই "মধুর-কোমল-কান্ত" করিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি বি, এ, পাশ করিবার পরে, প্রায় একুশ বৎসর বয়সে রাজসাহী জেলার পুঁটিয়ার হাইস্কুলে প্রধান-শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন, আর এই পুঁটিয়ায় একাকী বাস করিবার সময়ে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়; সেই বিয়োগের পরেই তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম রচনা করেন। এই গ্রন্থ পাঠকসমাজে অত্যন্ত পরিচিত; কাজেই উহার সমালোচনার প্রয়োজন নাই। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম প্রকাশের অল্প পরেই ওকালতী পাশ করিয়া বহরমপুরে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র করেন আর সেই বহরমপুরেই সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ছাড়া তিনি অন্য কোন সাহিত্যিক কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। মার্কলিনেন, স্পেন্সার প্রভৃতির অনুসরণে বিবাহের উৎপত্তির ইতিহাস প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে মাসিক পত্রে দু-চারিটি প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন নাই। শারীরিক অসুস্থতাই তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার বাধা হইয়াছিল; তবুও সেই অসুস্থ শরীর টানিয়া বহিয়া ৭৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমে যে গদ্য রচনার রীতি প্রবর্ত্তন করেন, সে রীতিতে তিনি আর অন্য কোন প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। এই সাহিত্যিকের অপ্রকাশিত কোন রচনা থাকিলে, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে মুদ্রিত করিলে ভাল হয়।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি, ৭৩ বৎসর বয়সে গত কার্ত্তিকের ৮ই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রামে বনিয়াদি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে এই যশস্বী চিকিৎসকের জন্ম হয়। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও বেহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের পন্থা অনুসরণ করিয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন, ও ভাদুড়ী মহাশয়ের যে দুহিতাটি অল্প বয়সে বিধবা হয়েন, তাহার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার এই নির্ভীক সামাজিক অনুষ্ঠানে সে দিনের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, অথচ সেদিন হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি সমাজের সকল লোকের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। যাহা তিনি হিতকর মনে করিতেন তাহা তিনি পরের মুখ না চাহিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করিয়া

গিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাঁহার কোন কাজে ঔদ্ধত্য দেখা যায় নাই। এমন কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক দেখি নাই, যিনি তাঁহার সাধুতায়, সৌজন্যে, শিষ্টাচারে ও নিঃস্বার্থ পরোপকারে প্রীত ও মুগ্ধ হয়েন নাই। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার সুচিকিৎসার যশ আছে, কিন্তু কখনও তাহার নিত্যপ্রফুল্ল চরিত্রে অবিনয় দেখা যায় নাই। তাঁহার

জ্যেষ্ঠ পুত্র আমেরিকার এম্, ডি, ও সুচিকিৎসক, মধ্যম পুত্রটি বারিষ্টার ; এবং তিনি তাঁহার সকল দুহিতাকেই সৎপাত্রস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই সাহিত্যের পত্রিকায় উল্লেখ করিতে পারি যে, ডাক্তার মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন সাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তিসম্পন্ন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। যিনি আপনার পরিবারকে ও সমাজকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার গুণের কথা স্মরণ করিয়া ধন্য হই।

চিত্রপরিচয়

খুদাবক্স লাইব্রেরীর নাম কাহারও নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। ইহাতে যে সকল অমূল্য পাণ্ডুলিপি আছে, তন্মধ্যে তৈমুর ও তাঁহার বংশাবলীর ইতিহাস অন্যতম প্রধান দর্শনীয় দ্রব্য। "সমসাময়িক ভারতে" এই পাণ্ডুলিপির কয়েকখানি অমূল্য চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

উক্ত পাণ্ডুলিপি খানি আকারে ১৫" × ১০½ ইঞ্চি—ইহাতে ৩৩৮ পৃষ্ঠা আছে। পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে বাদশাহ শাহজাহানের হস্তাক্ষর রহিয়াছে।

'বঙ্গবাণীর' এই সংখ্যায় আকবরের জন্ম নামক যে চিত্রখানি বহুবর্ণে প্রকাশিত হইল, তাহাতে আকবরের জন্মবৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনাটী ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরে অমরকোট নামক স্থানে ঘটে। মাতা সবুজ বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া পালঙ্কোপরি শয়ান রহিয়াছেন। সদ্যজাত শিশু ধাত্রীক্রোড় আলোকিত করিতেছেন। হুমায়ুন তখন পলাতক—তথাপি সর্ব্বত্রই আনন্দের উৎস ফুটিয়াছে। দুর্গ হইতে একব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন এবং একজন স্ত্রীলোক জ্যোতিষীকে আকবরের জন্মের সংবাদ প্রদান করিতেছে। চিত্রের নিম্নভাগে তার্দ্দিবেগ খাঁ হুমায়ুনের নিকট পুত্র হইবার সংবাদ নিবেদন করিতেছেন।

বহুবর্ণে চিত্রখানি মুদ্রিত হইলেও খুদাবক্স লাইব্রেরীর আদিম চিত্রের সহিত ইহার যে তুলনা হয় না, তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

অশুদ্ধি সংশোধন।

---

৪৩৯ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তিতে "জ্যোতি বাবু" স্থলে "সত্যেন্দ্র বাবু" হইবে.
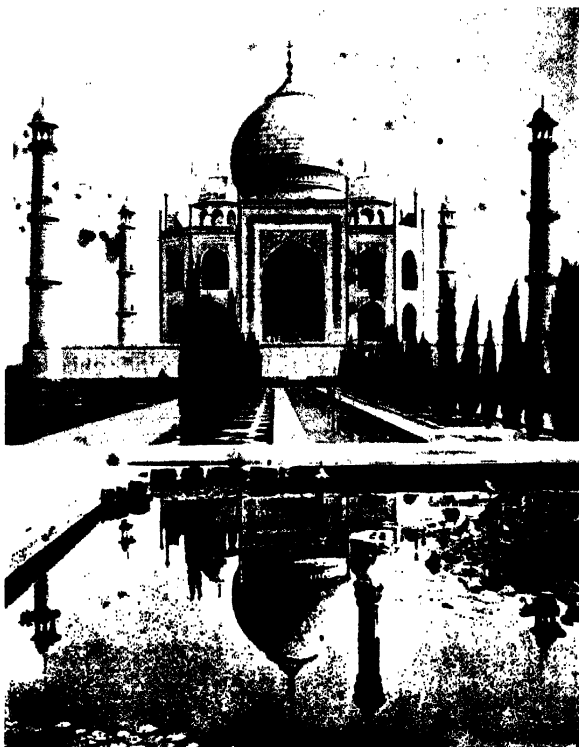
Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.

মমতাজ ও তাঁহার স্মৃতিমন্দির তাজমহল।

"আবার তোরা মানুষ হ"

প্রথম বর্ষ } পৌষ { দ্বিতীয়ার্দ্ধ
১৩২৮-'২৯ } { ৫ম সংখ্যা

বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি তিনটা সন্দর্ভ লিখিয়া বুঝিলাম যে, এখনও সমাজগত পরিভাষা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে। পারিভাষিক অবগতি ঠিকমত না হইলে, আমি পরে যাহা বলিব, তাহার অনুসরণ অনেকেই করিতে পারিবেন না। আর একটা কথা এইখানে বলা প্রয়োজন। আমি যাহা লিখিয়াছি বা লিখিব মনে করিয়াছি, তাহা অনেকের পক্ষে অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে; কেহ কেহ আমার কথা উদ্ভট বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। আদি ও মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থ সকলের পূর্ব্ববৎ পঠন-পাঠন বিদ্বজ্জন সমাজে প্রচলিত থাকিলে এতটা কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হইত না। শূন্য পুরাণ হইতে দাশুরায়ের পাঁচালী পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরের খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে, বিশেষতঃ শূন্য পুরাণ, ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ণ এবং বৈষ্ণব মহাকাব্য সকলের সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালীর প্রতিযুগের সমাজ-বিন্যাসের পটমালা এমনভাবে মানসনয়নে প্রতিভাত হইবে, যাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে জানিলে, সত্যই মনীষী মাত্রেরই হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, অনেকেই চমৎকৃত হইবেন। আমার বড় সাধ যে, আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত যুবজন, Scientific method

বা ন্যায়ানুগত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আদিম ও মধ্যযুগের বাঙ্গালা মহাকাব্য সকলের Analysis বা বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতার পরিচায়ক সামাজিক ইতিহাসের বেদী সৃষ্টি করেন। তাই শুধু অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার উদ্দেশ্যে, অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছি যে, কোন মহাকাব্যের আলোচনা করিলে সমাজের কোন চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পরে যদি বিধাতা অবসর সৃষ্টি করিয়া দেন ত ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঙ্গল, এই তিন প্রধান ধারার মাঙ্গলিক মহাকাব্য সকলের বিশ্লেষণ করিয়া আমার উক্তি সকলের যাথার্থ্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। মাসিক পত্রের সন্দর্ভে ইঙ্গিত করা ছাড়া, খবর দিয়া রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইবার গোটাকয়েক পরিভাষিক শব্দের বিচার করিয়া দেখিব, এই বিচারে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আংশিক ফুটিয়া উঠিতে পারে।

ব্যবসায়গত জাতি বিচার

বৌদ্ধযুগের সময় হইতে নব ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের অভ্যুত্থানের কাল পর্য্যন্ত প্রায় দেড়হাজার বৎসরকাল বঙ্গদেশে, মগধে ও উৎকলে, এবং ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশেও বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ লোপ পাইয়াছিল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছাড়া বর্ণ-ব্রাহ্মণ সকল বৌদ্ধ সমাজের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। তাই রঘুনন্দন লিখিয়া গিয়াছেন যে, কলিকালে অর্থাৎ বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় হইতে ভারতবর্ষের সমাজ দ্বিবর্ণে পরিণত হইয়াছিল বা হইয়া আছে; ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ নাই এবং থাকিবেও না।

এটা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বৌদ্ধমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৌরহিত্য কার্য্যে বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণকেই নিযুক্ত করিতেন; খাঁটি ব্রাহ্মণ পাইলে তাঁহারা শ্রমণগণকে নিযুক্ত করিতেন না; শ্রমণগণ প্রধানতঃ প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই নীতি জৈন প্রধানগণ অবলম্বন করিয়া চলিতেন, এখনও সকল জৈন মন্দিরে সারস্বত বা গৌড় ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যের কাজ করেন। শ্রমণ-দিগের মধ্যে প্রায় শতকরা আশীজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার ফলে, বৌদ্ধ একাকারের প্রভাব কালেও ব্রাহ্মণ জাতির বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। অশোকের সময়েও ব্রাহ্মণের একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা ছিল। পক্ষান্তরে শক, হূণ, অহীর বা আশিরীয় ও ইরাণী প্রভৃতি রণদুর্ম্মদ জাতি সকল ভারত-বর্ষে আসিয়া ক্ষাত্র শক্তির প্রভাব দেখাইয়া ক্ষত্রিয় পদ বাচ্য হন। বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই সকল জাতি ক্ষাত্রবর্ণের বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। শ্রেষ্ঠী বণিক জাতি সকল পূর্ব্বেই জৈনপ্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, পরে বৌদ্ধ একাকারের কালে বৈশ্য ও শূদ্র এক বর্ণে পরিণত হয়। ফলে কয়েকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া, আর সকল বৈদিক শ্রেণীভুক্ত জাতি শূদ্রের সহিত সম্পিণ্ডিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হয়। বৌদ্ধগণ পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়ীর প্রতি আস্থাবান ছিলেন, তাই যখন যে সম্প্রদায় যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেই বৃত্তি সেই সম্প্রদায়কে

পুরুষানুক্রমিকভাবে ধরিয়া থাকিতে হইয়াছে। ফলে ক্রমে ক্রমে সমাজের মধ্যে বৃত্তিগত এক একটা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই Profession castes সৃষ্টির মূল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সামাজিক অংশের ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে এই বৃত্তিগত জাতিসৃষ্টির মূল পাওয়া যায়। কেহ এক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাহার জাতিনির্দ্দেশের পরিবর্ত্তন ঘটিত। আজকাল নাপিত কেবল দাড়ি গোঁফ কামায়, নখচুল কাটে; বৌদ্ধযুগে নাপিত শল্যচিকিৎসক ছিল, অনেক ব্রাহ্মণ এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নাপিত আখ্যা লাভ করিত। রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের নাপিত (Royal surgeon) একজন বৌদ্ধ মহাযানী ব্রাহ্মণ ছিলেন; চাঁদবর্দ্দয়ের পুস্তকে এইটুকু বেশ খোলসা করিয়া লেখা আছে। মূলে মহাযানী ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ হইলে কি হয়, নাপিতবৃত্তি অবলম্বন হেতু সে ব্রাহ্মণ নাপিত জাতি ভুক্ত হইয়াছিল। বৃত্তিগত জাতি বিচারে Rigidity of caste জাতিভেদের অলঙ্ঘ্য গণ্ডী যে ছিল না, বা এখনও নাই, আমি তাহাই বলিতে চাহি। গন্ধবণিক, তিলি, তাম্বুলী প্রভৃতি জাতির আসল ও পুরাতন কুলজীর পাৎড়া আলোচনা করিলে বেশ জানা যায় যে, পুরাতন জৈন ও বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীর দল হিন্দুর প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া ক্রমে এবম্বিধ বৃত্তিগত বণিক জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কায়স্থের বাহাত্তর ঘরের পরিচয় বিশ্লেষণ করিলে বেশ জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগের অনেক বৃত্তিগত জাতি কায়স্থ দল ভুক্ত হইয়াছে,—অনেক শ্রেষ্ঠী, অনেক পুরাতন বণিক কায়স্থ আখ্যা লাভ করিয়াছে। বৃত্তিগত জাতি মূলতঃ বৌদ্ধ বনীয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত; নবশাখ নামটাই উহার পোষক প্রমাণ। নবশাখ শব্দের অর্থই এই যে, অভিনব ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের উহারা নূতন শাখা—নূতন কাণ্ড; পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ ভুক্ত ছিল না, এখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহাও Rigidityর পরিচায়ক নহে।

আকার সাম্য

পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন হিন্দুর আকার সাম্যের রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই আকার-সাম্যকে Typical Evolution বলিয়া আমি মনে করি; বাস্তবপক্ষে উহা Typical Evolution ছাড়া অন্য কিছু নহে। একটা গল্প বলিব। তান্ত্রিক নিবন্ধকার ব্রহ্মানন্দ গিরি এক পাঠান রমণীর প্রেমে পড়িয়া যৌবনে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সাজে, পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে, ভাবে, ভাষায় পুরাদস্তুর মুসলমান হইয়া যান। পরে তাঁহার কুলগুরু আসিয়া বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বলেন তুমি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া তন্ত্র ধর্ম্ম অবলম্বন কর, তোমার পত্নী ও সন্তান সন্ততি সকলকে আমি পুরশ্চরণ করাইয়া পুনরভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত। সেকালের মানুষে বিচারে হারিলে, অবিচারিতচিত্তে বিজেতা পণ্ডিতের আজ্ঞা অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। ব্রহ্মানন্দ গিরি তাহাতেই রাজী হইলেন। পরন্তু গুরু বলিলেন, তোমার পক্ষে তন্ত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে কোন বাধা নাই বটে, সমাজ তোমাকে

গ্রহণ করিবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না; কেননা তোমার আকারে এবং আচারে এখনও পাঠানী বা ইস্‌লামী ভঙ্গী যেন অনপনেয় লেখায় চিহ্নিত রহিয়াছে। ঐ লেখা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অবয়ব ও রুচিগত সাম্য না ঘটিলে হিন্দু তোমাকে দলভুক্ত করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ গিরি এই আকার-সাম্য সাধন জন্য দ্বাদশ বৎসরকাল জপ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। শেষে সাধনকালে এক মহাপুরুষের কৃপাবশে তিনি দশনামী সাধক. সম্প্রদায় ভুক্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। ইহাইত Typical Evolution! পাঠান, ভুটিয়া, তিব্বতী, আরাকানী, মঙ্গোল প্রভৃতি সকল জাতির মানুষকেই তন্ত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করা চলে, পরন্তু তাহাদের অভিনব ব্রাহ্মণ্য সমাজে চালাইতে হইলে, জাতীয় বিশিষ্টতার পরিচায়ক আকারগত, অবয়বগত, ভাবগত, ভাষাগত সাম্য সাধন সকলকে করিতে হইত। Dum Pa এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া গুরু ডুম্ব নাম পাইয়াছিলেন। কাপালিক ব্রাহ্মণ, কাপালিক জাতি এই পদ্ধতির ভিতর দিয়া আসিয়া হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ ত মূলতঃ Scythian বা Babylonian অথবা Chaldean ছিলেন। আকার সাম্য ঘটাইয়া এবং দৈবজ্ঞের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সমাজে ব্রাহ্মণের আসন লাভ করেন। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণের সমাদর পাইয়া থাকেন। এই সঙ্গে পশ্চিমের "ভূমিহর বাভনের" কথাও ভাবিতে হয়। ইহারা সর্বাই শাক বা শাকদ্বীপী; স্বয়ং শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থও শক ছিলেন। আকার সাম্য ঘটাইয়া কালে ইঁহারা হিন্দুসমাজ ভুক্ত হন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আচার-ধর্ম্মের বেষ্টনীর মধ্যে সকলকে রাখিয়া, ব্রতনিয়ম, বিধিনিষেধের বন্ধনীতে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ্য Type বা আদর্শের উন্মেষসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তাই তিনি সৎ-শূদ্র বলিয়া এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন, ব্রাহ্মণ-আকার-আকারিত, ব্রাহ্মণভাবে ভাবুক বৈদ্য ও কায়স্থগণ সৎশূদ্র আখ্যা লাভ করেন। ছিল দিন যখন আকারে ও অবয়বে ব্রাহ্মণ অনুরূপ কায়স্থ ও বৈদ্য বাঙ্গালায় বিরাজ করিত; উহারাই হিন্দুর জাতিগত বিশিষ্টতাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। আমি তাই আকার সাম্যকে Typical Evolution বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

জাতি বিন্যাস

বৌদ্ধযুগের একাকারের পরে শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে যখন নূতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়, তখন সেই একীকৃত, সমীকৃত বৌদ্ধসমাজকে ছাঁকিয়া, ছানিয়া, বাছিয়া-ঝাড়িয়া তবে হিন্দুসমাজ-বিন্যাস ঘটান হইয়াছিল। মহাযানী এবং হীনযানীদিগের নানাবিধ শাখা-উপশাখার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ এতটাই কদর্য্য হইয়াছিল, এমনই সাঙ্কর্য্যপূর্ণ হইয়াছিল যে এই ছাঁকা ছানা বাছা-ঝাড়ার কাজ এক শতাব্দীর মধ্যে শেষ হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য ও নৃসিংহদেবের চেষ্টার

প্রভাবে সর্ব্বাগ্রে দাক্ষিণাত্যে,—কঙ্কণ, কর্ণাট, দ্রবিড় ও দ্রাবিড়দেশে—এই শুদ্ধি সাধনের কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে কান্যকুব্জ ও মিথিলায় উহার সম্প্রসারণ ঘটে, শেষে বঙ্গদেশে উহার সমাপ্তি ঘটে। একপক্ষে দাক্ষিণাত্যের চেল ও পাণ্ড্যদিগের বংশধরগণ বঙ্গাধিকারী হওয়াতে, অন্য পক্ষে কান্যকুব্জ হইতে সমাগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠা বঙ্গীয় সমাজে হওয়াতে কতকটা দক্ষিণের আদর্শে, কতকটা কান্যকুব্জ ও মিথিলার আদর্শে বাঙ্গালার নব সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হয়। পুরাতন একটা সমাজের উপর নূতন একটা কিছুর বনীয়াদ বসাইতে হইলে অনেকটা আপোষ (Compromise) করিতেই হয়। বাঙ্গালায় সে আপোষ একটা পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল, তাই বাঙ্গালার বিশিষ্টতা একটু স্বতন্ত্র আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই বাঙ্গালী এখনও তাহার এই স্বাতন্ত্র্য অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। এই সমাজিক শুদ্ধি সাধনাটা ঠিকমত বুঝিতে হইলে গোটা কয়েক গোড়ার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

(১) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জগতের প্রথম ও প্রধান প্রচারের ধর্ম্ম (Proselytysing Religion.) বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

(২) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম হওয়াতে উহাই আদিগণবাদের (Democratic Religion) ধর্ম্ম বলিয়া মান্য ও গ্রাহ্য হইয়াছে।

(৩) বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে প্রাকৃত ও পালিভাষায়, অর্থাৎ জনগণের ভাষায় প্রচারিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণই ভারতবর্ষের অভিজাতবর্গের সংস্কৃত ভাষাকে পরিহার করিয়া জনসাধারণের পালি ভাষায় ধর্ম্মতত্বের সিদ্ধান্তরাশি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে।

(৪) শাক্যসিংহ শক বা Scythian ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকগণের মধ্যে অনেকেই শক বা Chaldean বা হূণবংশাবতংস ছিলেন। ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, প্রচার ধর্ম্মের আবিষ্কার এবং ধর্ম্মে গণবাদের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শক-মনীষা-সঞ্জাত ; উহা আর্য্য-মস্তিষ্ক প্রতিভাত নহে।

সিদ্ধাচার্য্যগণ

বৌদ্ধদিগের এই মূল তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার সহজিয়া ও তান্ত্রিক প্রধানগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের ও ব্যাখ্যানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল ধর্ম্মপ্রচারক ব্যাখ্যাতাগণকে সিদ্ধাচার্য্য বলা হইত। ইহাদের এক সম্প্রদায় কেবল গান করিয়া, ছড়া কাটাইয়া সদ্ধর্ম্ম (সহজমত ও বৌদ্ধধর্ম্ম) প্রচার করিতেন, আর এক শ্রেণী কেবল ব্যাখ্যাতা ছিলেন এবং নিজেদের অর্জ্জিত "সিদ্ধাই" বা সিদ্ধির সাহায্যে জনগণকে স্বদলভুক্ত রাখিতেন। এই সিদ্ধাচার্য্যগণের গান ও পাঁচালী বাঙ্গালা সাহিত্যের বনীয়াদ ; বাঙ্গালা ভাষার বেদী। কত সিদ্ধাচার্য্য যে ছিলেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না ; তবে লুই, কাহ্ন, শবর, নাগার্জ্জুন, ডাক, নাঢ় প্রভৃতিই অধিকতর

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাহ্নই বাঙ্গালায় কীর্ত্তনের প্রচলন করেন, তাঁহার রচিত অসংখ্য গীত বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গীত হইত। "কানু ছাড়া গীত নাই" এই প্রবচনের মূলে সিদ্ধাচার্য্য কাহ্নই আছেন, কানু শ্রীকৃষ্ণ নহেন। শ্রীচৈতন্য দেব ও প্রভুপাদ নিত্যানন্দ এই সিদ্ধাচার্য্যগণের দলবলকে আত্মসাৎ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। নাঢ় ও নাঢ়ী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, সিদ্ধাচার্য্যের পদ পাইয়া এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারীবৃন্দকে রাঢ়ের সন্ধ্যা ভাষায় নাঢ় ও নাঢ়ীর দল বলিত; শ্রীমন্নিত্যানন্দ ইহাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদলভুক্ত করেন এবং পরে উহারাই "নেড়া নেড়ী" বলিয়া পরিচিত হয়। এই সকল সিদ্ধাচার্য্যসৃষ্ট সম্প্রদায়ে "পণ্ডিত" উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ যজন-যাজনের কাজ করিতেন। ইহা ছাড়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এবং ভুসুর পরগণার বংশজ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বাস করিতেন। বল্লাল সেনের আমলে বা তাহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ দলে দলে আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করে। তাহারা এই সকল আদিম বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকে অনেকটা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালায় একটা বড় রকমের আপোষ করিবার চেষ্টা হয়। সে চেষ্টার ফলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের উন্মেষ না ঘটাতে, পরে কান্যকুব্জ হইতে এবং তাহারও পরে মিথিলা ও অযোধ্যা ও মায়াপুর হইতে নূতন ব্রাহ্মণের আমদানী করা হয়। বল্লাল সেনের সময়ে উৎকল ও দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক ব্রাহ্মণের আমদানী করা হয়। বলিতে কি দক্ষিণের নামবুদরীদের ব্যবহারের আদর্শে বাঙ্গালায় এক সময়ে ব্রাহ্মণের রীতিমত চাষ চলিয়াছিল। সে চাষের কাহিনী পুরাতন কুলজীগ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। উহা সেই স্থানেই প্রচ্ছন্ন থাকুক। পরে যদি কখনও Scientific basis বা ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি অনুসারে সমাজতত্ত্বের উদ্ঘাটন চেষ্টা হয়, তখন উহার প্রকাশ এবং প্রচার করিলে চলিবে। তবে পরবর্ত্তী বজ্রযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রভাবে, সিদ্ধাচার্য্যগণের ব্যাখ্যাত সহজ মতের প্রচার প্রভাবে বাঙ্গালায় তথা উত্তর ভারতে Sexual morality কেমন ধিক্কারজনক পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে সমাজে গোড়ায় কি রীতিতে জাতি-বিন্যাস ঘটিয়াছিল তাহা জানা প্রয়োজন। হিন্দুর সামাজিক যত কদাচার তাহার প্রায় সকলেরই মূল বৌদ্ধ-শৈথিল্য ও সমাজ-বিক্ষেপ। কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ সিদ্ধাচার্য্যদিগের সহিত আপোষের বিষময় ফলস্বরূপ। কেবল এইটুকুই নহে; পাঠানদিগের আগমনের পরে সিদ্ধাই দলের নর-নারী যে ভাবে পাঠানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন, তাহারই কু-ফল সামলাইবার উদ্দেশ্যে, শোণিতগত দোষের Cauterisation and absorptionএর প্রয়াসে কৌলীন্য থাক্, মেল, পাল্‌টি প্রকৃতি প্রভৃতির উদ্ভাবন হয়। কৌলীন্য প্রথা Social distillation বা সমাজকে চোয়াইয়া পরিশুদ্ধ করিবার নামান্তর মাত্র। কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নহে। যে সকল বৃত্তিগত এবং ছাঁকা-ঝাড়া জাতি নবীন হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত আছে; কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখদিগের মধ্যে কৌলিন্য

আছেই ; আর এই কৌলীন্য বৌদ্ধ বা সহজ মতের দোষ ঢাকিবার নামান্তর মাত্র, social cauterisation and absorptionএর উদাহরণ মাত্র। পরে যদি কখনও বাঙ্গালীর সমাজ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ রীতিমত হয়, তখন এই সকলের বিচার হইবে। এখন ইঙ্গিতই করিয়া রাখি।

জাতি বিচার

সর্ব্বাগ্রে বলিয়া রাখি যে, বাঙ্গালার তথা উত্তর ভারতের জাতি বিভাগ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নহে, উহা বৃত্তিগত শ্রেণী বিভাগ ছাড়া অন্য কিছু নহে। যখন বৃত্তিগত শ্রেণী বিভাগ তখন উহার রদ-বদল হয়ই ; নবাগতের প্রবেশ সম্ভবপর। উহাতে কোন কালে কখনই Rigidity বা কমঠতা ছিল না। ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালার জাতি বিভাগ স্থিতিস্থাপকতা গুণসম্পন্ন ছিল। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য আচার ধর্ম্মের প্রভাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছিল। উত্তরে বরেন্দ্রে নাটোর, পুঠিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জমীদারবর্গের উদ্ভব ফলে, সুষঙ্গ রাজের প্রতিষ্ঠা প্রকট হইবার পরে, বাগড়ীতে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ প্রবল হইবার ফলে ব্রাহ্মণ্য আবরণ সমাজ শরীরের উপর একটু কঠোর হইয়া বসিয়াছিল। সেই আবরণ সমেত হিন্দু-সমাজকে ইংরেজ হাতে তুলিয়া লয়েন এবং নবদ্বীপ, ত্রিবেণী ও ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণের পরামর্শ অনুসারে, জজ পণ্ডিতদিগের বিচার-সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং হাইকোর্টের রুলিঙ্ এবং আইন-কানুনের প্রভাবে এই ব্রাহ্মণ্য আবরণ এখন যেন সমাজের উপর জাঁতিয়া বসিয়াছে। Orthodoxy বা গোঁড়ামী ইংরেজের আমলে এবং শিক্ষা প্রভাবে যত উৎকট হইয়াছে, উহা এত উৎকট পূর্ব্বে কখনই ছিল না। তাহার উপর নবীন ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ সনাতন সমাজের দিকে একেবারে তাকাইতেন না, কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন না, ইংরেজ পাদরী এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহা বলিতেন, তাহাই বেদবাক্য বিবেচনা করিয়া সেই সুরে গলা মিলাইয়া ইঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। ফলে সমাজ বিষয়ে অজ্ঞতা সমাজের স্তরে স্তরে যেন জাঁতিয়া বসিয়া আছে, উহাকে যেন অপসারণ করিবার উপায় নাই। এমন কি আজকাল যাঁহারা ইংরেজি হিসাবে জাতিভেদ মান্য করিয়া চলেন না, তাঁহাদের অনেকের জাতিগত মূল উৎপত্তির ইতিহাস কথা যদি খুলিয়া বলি, তবেই তাঁহাদের ইংরেজি orthodoxy চাগিয়া উঠিবে, লেখককে জব্দ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিবেন। আসল কথাটা কি জান ? এখনও বাঙ্গালী জাতির বারো আনা অংশ বৌদ্ধ ও সহজ মতের সিদ্ধান্তে ও আচার পদ্ধতিতে আচ্ছন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সহজ মতের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্মের পনর আনা অংশ বজ্রযান এবং কালচক্রযানের স্তম্ভের উপরে সুবিন্যস্ত। কি শাক্ত তান্ত্রিক, কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাহারও সাধন ধর্ম্মে জাতিবিচার নাই ; আর এই দুই ধর্ম্ম এখনও বাঙ্গালীর সমাজ শাসন করিতেছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ এবং সহজমত প্রধান সমাজের মসালা দিয়া আধুনিক হিন্দু-সমাজ গঠিত ; রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে দাশু রায়ের

পাঁচালী পর্য্যন্ত সমগ্র খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য ইহার সাক্ষী ও প্রমাণ। এমন অবস্থায় বাঙ্গালীকে বেদাচার-সম্পন্ন আর্য্য হিন্দু বলিয়া গালাগালি করিলে অভিজ্ঞ মাত্রেই উপেক্ষার হাসি হাসিবে।

জাতির পারিভাষিক অর্থ

বাঙ্গালার কুলজী সাহিত্য অনুসারে জাতি শব্দের অর্থ বৃত্তি—ব্যবসায়—জীবিকা। "জাতঃপাৎ" হওয়ার অর্থ বৃত্তিচ্যুত হওয়া, জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইতে বঞ্চিত হওয়া। কারণ বৃত্তি-ব্যবসায় জীবিকা সকলেরই জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রাহ্মণেই যে অন্য জাতীয় মানুষকে এক ঘরিয়া করিত তাহা নহে, অনেক সময়ে অন্য জাতীয় মানুষে ব্রাহ্মণকে উৎকট ভাবে একঘরিয়া করিয়া রাখিত। একটা গল্প কথা বলিব। যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের মাল, কাপড় ধুতী এদেশে আমদানী হইত না, কার্পাস-শিল্প এই ভারতবর্ষের ভারতবাসীর একচেটিয়া শিল্প ছিল, ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস বস্ত্র অন্য বিদেশে রপ্তানী হইত, তখন শিল্পী ও বণিক জাতি সকলের প্রভাব সমাজের উপর প্রবলভাবে প্রকট ছিল। তখন সকল জাতিই অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিত। ভাদুরের অর্থাৎ রামপুরহাটের নিকট ভদ্রপুরের নন্দকুমার (মহারাজ নন্দকুমার) মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবী সেরেস্তায় বড় চাকরী পান। নূতন বড় মানুষ হইয়া তিনি একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে সকল প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং আচ্ছাদন মুর্শিদাবাদ হইতে খরিদ করিয়া আনেন। ভাদুরের তন্তুবায়ের দল বলিল, একি ঠাকুর, তোমার দুর্গোৎসবে, আমরা চিরকাল,—অসময়ে ও সুসময়ে—তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে কাপড় যোগাইয়া আসিয়াছি, আমাদের বয়ন করা বস্ত্রেই এতকাল দেবীর আবরণ বস্ত্র হইয়াছে, আর আজ তুমি হঠাৎ ধনী হইয়াছ বলিয়া কি বালুচরের চেলী দিয়া পূজার কাজ সারিবে, আমাদের বয়ন করা কাপড় লইবে না ? বিদেশের কাপড় আনিয়াছ, ভাল কথা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তাঁতের কাপড় তোমাকে লইতে হইবে। গ্রামের শিল্পীর পোষণ পালন করিতে না পারিলে বা সে পক্ষে অবহেলা করিলে যে মায়ের পূজা সিদ্ধ হইবে না, মা ত তোমার একলার নহে। মহারাজ নন্দকুমার তখন নূতন বড় মানুষ। তিনি গ্রামের তন্তুবায়দিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফলে তন্তুবায়ের দল তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিল, ক্রমে সে ঘট উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসিল ; পশ্চিম বাঙ্গালার তন্তুবায় সমাজ পণ করিল যে, মহারাজ নন্দকুমারকে আমরা কাপড় যোগাইব না ; ক্রমে অন্য শিল্পী জাতি সে ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। বৎসরেকের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের এমন দশা ঘটিল যে, পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার কোন হাটে বা গঞ্জে তাঁহাকে কেহ কাপড় যোগাইত না ; গ্রামে প্রবেশ করিতে তিনি পারিতেন না ; মুটে মোট বহিত না, নাপিত কামাইত না, ধোপা কাপড় ধৌত করিত না। অথচ তখন মহারাজ হুগলীর ফৌজদার এবং মুর্শিদাবাদের নিজামতীর নায়েব দেওয়ান। শেষে মহারাজকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। মহারাজের উপর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা এই

হইল যে, তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন এবং নবশাখ ও অন্য শিল্পীজাতি সকলকে জগন্নাথ দেবের আটুকে ভোগ খাওয়াইবেন। মহারাজ নন্দকুমারের এই প্রায়শ্চিত্ত রাঢ়দেশে একটা বড় জাঁকের ব্যাপার হইয়াছিল; নানা প্রকারের ছড়া এবং পাঁচালী এই উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। একটা শ্লোক মনে আছে,—

" ভাদুরের নন্দকুমার,
লক্ষ বামুন কর্‌লে শুমার।
কেউ পেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো ॥ "

মোট কথা এই, 'বর্ণ' হিসাবে জাতির প্রয়োগ বাঙ্গালায় কখনই হইত না; জাতি বলিলেই বৃত্তি বুঝাইত, ব্যবসায় বুঝাইত। এক জাতি হইতে একঘরিয়া হইলে লোকে দেশান্তরে যাইয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্য জাতিভুক্ত হইয়া থাকিত। সেকালের জাতি বিষয়ক প্রবচন গুলির আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত কথাই সপ্রমাণ হইবে। একটা উদাহরণ দিব,—

"জাত হারালে কায়েত"

ইহার প্রকৃত অর্থ এই, শিল্পী বণিক জাতীয় কেহ বৃত্তিচ্যুত হইলে কায়স্থ দলভুক্ত হইত। মৌলিক কায়স্থ তাহারাই যাহারা মূলতঃ কায়স্থ জাতির পুষ্টিসাধন করিত, যাহাদের ছানিয়া ছাকিয়া কুলীন গজাইত। এই মৌলিক কায়স্থ সমাজের বিশ্লেষণ করিলে এখনও বেশ ধরা যায় যে অনেক বণিক, শিল্পী, শ্রেষ্ঠী এই বাহাত্তর ঘরের আবরণে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহা ছাড়া জাতি অর্থে বৃত্তি, কায়স্থ জাতির কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্পগত বৃত্তি নাই। কায়স্থ লেখক, করণ, জমীদার, পাটোয়ারী, চাকুরে, ভৌমিক,—কায়স্থ করে না কি, হয় না কি? কায়স্থের মধ্যে রাজপুত আছে, ক্ষত্রিয় আছে, বৈশ্য আছে, বণিক আছে; অথচ জাতির হিসাবে কায়স্থের কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি নাই। তাই কুলজীর বচন হইল—জাত হারালে কায়েত। আর একটা প্রবচন আছে,—

" ধানে আমন, জেতে বামুন।"

ইহার অর্থ ইহা নহে যে, ধানের মধ্যে যেমন আমন ধান শ্রেষ্ঠ, জাতির মধ্যে তেমনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। আমনের চাষে যেমন অতি পরিশ্রম করিতে হয়, রোয়া বোয়া নিড়েন প্রভৃতি কত কি করিতে হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ জাতির চাষে বা সৃষ্টিতে, বিস্তৃতিতে ও পুষ্টিতে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। পুরাতন কুলজী গ্রন্থে, বিশেষতঃ এড়ু মিশ্রের পাতড়ায় এই সিদ্ধান্ত কথা স্পষ্ট ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। এই ছোট্ট একটি প্রবচনে কত বড় সামাজিক রহস্য লুকান আছে, তাহা ভাবিয়া দেখ দেখি।

জাতির বেদী গণতন্ত্র

আমাদের এই বৃত্তিগত জাতিভেদের মূলে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসি প্রকট হইয়া আছে। জাতির গণ্ডীর মধ্যে ধনী নির্দ্ধনের বিচার নাই, পণ্ডিত মূর্খের বৈষম্য নাই, সবাই সমান অধিকারে অধিকারী। আবার কোন জাতিই অপর কোন জাতি হইতে ন্যূন নহে; প্রত্যেক জাতিই self-sufficient and self-contained. এমন কি ব্রাহ্মণ জাতিকেও অপর জাতি, জাতির হিসাবে বড় বলিয়া মান্য করে না; ব্রাহ্মণ যজন-যাজন করেন, গুরু পুরোহিতের কাজ করেন তাই পূজনীয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যে জাতির হিসাবে ব্রাহ্মণ জাতিকে খুব বড় করিয়া ধরা হইয়াছিল বটে, পরন্তু বাঙ্গালার অন্য সকল প্রদেশে ও খণ্ডে ব্রাহ্মণের, জাতির হিসাবে, এতটা আদর ছিল না। এমন কি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মান্য হয় নাই।

ভাষা ছাড়া সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা ইঙ্গিতে আমি বলিলাম। সে সমাজ নাই, তাহার স্মৃতিও সজীব নাই, সকল কথা গোছাইয়া বলিতে হইলে একখানি বিরাট সামাজিক ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। আমি দিদিমার কাহিনী শুনানর মতন, সেই ভাবী ও ভাব্য ইতিহাসের জন্য গোটাকয়েক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাই। তোমরা মাঝে মাঝে একটা "হুঁ" বলিলে আমি আশ্বস্ত হইব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

হারানো খাতা

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মোরে পুষ্প দিলে বলে পুড়িছে অন্তরে,
পুড়িয়া মরুক পুষ্প দিব কেন তারে?

—মহাভারত।

পরিমল মুক্তার মালা জড়ান খোঁপার উপর একটি পাতাশুদ্ধ সাদা গোলাপ পরিয়াছে, গায়ে তার পাতলা গোলাপী বেনারসীর হাতখোলা জ্যাকেট, তাহাও বোম্বাই মুক্তায় খচিত এবং মুক্তার ঝালরগুলি তার নব কিসলয়চিক্কণ স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যে ভরা মসৃণ বাহুর উপর অতি সুন্দরভাবে দোল খাইতেছিল। কানের হীরা কয়খানা সন্ধ্যা শুকতারার মতন উজ্জ্বল এবং গলায় একাবলী মুক্তার হার তেমনি স্থূল ও সুগোল। গোলাপ ঝাড়ের বুটাকাটা সন্ধ্যাকাশের মতই সমুজ্জ্বল গোলাপী আভাযুক্ত সাড়ীর আঁচল হালফ্যাসানে হীরার পিনবদ্ধ, হাতে একখানা

পালকের পাখা,—এই রকম সাজগোজ করিয়া সে সান্ধ্য আকাশের শোভা দেখিতে ছাদে উঠিয়া ছিল,—অন্নদা আসিয়া জানাইল রাজাবাবু ডাকিতেছেন। পরিমলের মন যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সকল ভূষা তখনই সার্থক হয়, যখন এই সাজান দেহ তার যথার্থ আদরের পাত্রের আদরের স্পর্শ ও প্রশংসার দৃষ্টি লাভ করে।

"কি গো! কি ভাগ্যি যে এমন অসময়ে গরীবের গরীবখানায় রাজামশাইএর পায়ের ধুলো পড়লো? বলি, কোনদিকের সূর্য্যি আজ কোনদিক দিয়ে অস্ত গেল?"—বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারই দিকে উদ্বিগ্নমুখে অগ্রসর স্বামীর মুখ সে দেখিতে পাইল; এবং তাহার আনন্দোত্তেজনা ও সুখাবেগে স্পন্দিত হৃদয় যেন অকস্মাৎ স্রোতোহত হইয়া থমকিয়া গেল। উদ্যত অধরের সরস হাস্য এবং ব্যগ্র বাহুর সাগ্রহ আমন্ত্রণ নিরুদ্ধ রাখিয়া সেও উৎসুকনেত্রে উঁহার হাস্যলেশহীন গম্ভীর এবং উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভরসা করিয়া যেন কোন প্রশ্নই করিতে পারিল না।

নরেশ একবার তাহার দিকে চাহিয়া 'এসো' বলিয়াই নীরবে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গলার স্বরে কোন কিছু অভাবনীয় ঘটনার আভাস পাইয়া পরিমল চমকিয়া উঠিল, শঙ্কিতমুখে উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে?"

নরেশ ঘরের মধ্যে আসিয়াই পরিমলের দিবানিদ্রা উপভুক্ত বিছানাটার একধারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, পরিমল নিকটে আসিতেই নিজের পাশে তাহাকে জায়গা দিয়া সন্দেহশঙ্কিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পরিমল! আজ আমাদের মস্ত বড় পরীক্ষার দিন। তুমি যদি আজ অকপটে আমার সাহায্য করো, তবেই আমি রক্ষা পাই।"

পরিমল কোন অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়া কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবো বলো?"

নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,—কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিবেন তিনি যেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তাঁহার উৎসাহ ও দৃঢ়তাপূর্ণ চিত্ত অকস্মাৎ যেন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পরিমলের অবস্থাও এই সময়টুকুর মধ্যে যেন উহার চেয়েও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কি শুনিবে সে যে তার কোন আন্দাজই করিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরেশ তাঁর বক্তব্য কথাটা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"একটী অনাথা মেয়ে সংসারে অনেক নিগ্রহ ভোগ করে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, তুমি যদি তাকে আশ্রয় দাও।"

বুকচাপিয়াধরা প্রবল আতঙ্কটা যেন একখণ্ড স্বচ্ছ লঘু শরৎ মেঘের মতই সরিয়া গেল। স্বামীর বিষণ্ন চিন্তিত মুখের উপর কৌতুকপূর্ণ সহাস্য দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে ভর্ৎসনার স্বরে কহিয়া উঠিল, "ও মাগো! কি মানুষ তুমি! আমি বলি কি না জানি হয়েছে।"

বলিয়াই স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া সুখের আবেগে গলিয়া পড়িয়া বলিল, "তা'বলে অতটা হিংসুটে আমায় মনে করো না, এতলোক তোমার বাড়ী আশ্রয় পাচ্চে আর সে মেয়েমানুষ বলেই আমি বুঝি তাকে রাখতে দিলে বুক ফেটে মরে যাবো, এই তুমি মনে করলে ? বেশতো রাখনা তাকে।"

নরেশ স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনের এবং অজস্র অনুতপ্ত আদরের মধ্যে অপরাধবিব্রত হইয়া পড়িয়া তাহার দিকে না চাহিয়াই চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এর সব ভার তোমায় কিন্তু নিতে হবে। আমি না বুঝে এতদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছিলুম, আর তার ফলেই আজ ওর এই বিপন্ন দশা। তুমি এবার ওকে সেই দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোমার স্বামীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে, কেমন পরি ?"

পরিমল নিজের আনন্দস্মিত দৃষ্টিতে কৌতুক ও কৌতূহল ভরিয়া কি কথা বলিতে গিয়াই যেন কোন নূতন পথের চিন্তাধারায় আর একধারে চলিয়া গেল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "মেয়েটির নাম কি ?"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নরেশ যেন একটুখানি থতমত খাইয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "সুষমা তার নাম, সে—

পরিমলের বাহুর বাঁধন শিথিলমূল হইয়া তাহার স্বামীর কণ্ঠ হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল। শুষ্ক ফুলের মধ্য হইতে যেমন করিয়া কঠিন ফলের গুটি বাধিয়া উঠে, তেমন করিয়া তাহার আনন্দ বিকশিত প্রফুল্ল মুখের সমুদয় রেখা যেন সেই মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত কঠোর হইয়া দেখা দিল। সে নরেশের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়া দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলিয়া ত্বরিতকণ্ঠে কহিল "আমার বদলে যদি রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে, তাহলে কি আজ আমার কাছে যে কথা বলতে পারলে, সেই কথা তার কাছেও তুমি তুলতে পারতে ? নিতান্ত গরীব বলেই না আমায় তুমি তোমার রক্ষিতার সঙ্গে একত্রে বাস কর্ব্বার কথা বলতে দ্বিধা পর্য্যন্ত করলে না।— কিন্তু জেনো, গরীব হলেও আমি ছোট লোকের মেয়ে নই যে একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে একবাড়ীতে থাক্‌বে।"

নরেশ এই অপ্রত্যাশিত ক্ষুব্ধ স্বরের তীব্র তিরস্কারে যেন অবাক্ হইয়া গেলেন। সুষমার পরিচয় যে ইহারও নিকট কিছুমাত্র গোপন নাই, মায় তাহার নামটা শুদ্ধ, এ খবর তাঁর জানা ছিল না, তাই এই কথার ঘায়ে তাঁর যেন সকল আশাই একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া ক্ষণকাল সুষমা সম্বন্ধে নিজের অবিমৃষ্যকারিতার অনুতাপ ধিক্কারে নীরব হইয়া থাকিয়া পরে আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"তুমি যদি আমায় একটুও ভালবেসে, এতটুকুও শ্রদ্ধা করে থাক পরিমল! তা'হলে অভিমান ছেড়ে দিয়ে আমার এই বিপদের দিনে আমার সহায় হও। পরের মুখে অনেক কথাই

শোনা যায়, তার মধ্যে অনেক অসত্যও থাকে; আগে সকল কথা নিরপেক্ষভাবে জেনে শুনে তার বিচার করে তবেই রায় দিতে হয়। সুষমাকে আমি এতটুকু কচি মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এক রকম মানুষ করেছি। তার জন্ম অপবিত্রা মায়ের গর্ভে; কিন্তু নিজে সে অতি পবিত্র তাকে স্থান দিলে তোমার বাড়ী নিতান্তই কলঙ্কিত হবে না। যে সব ঝি চাকরানীদের তোমরা বাড়ীতে ঢুকতে দাও, তাদের সঙ্গে ওর তুলনাও হয় না।"

পরিমল স্বামীর বেদনাহত ও অত্যন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া একবারটী যেন নিজের মনের মধ্যে একটা দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া ফেলিয়াছিল। পরক্ষণেই তাহার পুরাণো কথা মনে পড়িয়া গেল। সৎ-শাশুড়ী, বৈমাত্র-ননদ, অন্নদা ঝি সবাই যে এ বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই তাহার এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীটার সংবাদ তাহাকে শুনাইয়া দিতে একটুও বিলম্ব করিতে পারে নাই। শাশুড়ী এমন কথাও আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে, "নরেশের তো বিয়ের সাধে বিয়ে করা নয়; নেহাৎ লোক দেখাবার জন্য একটা বউ এনে রাখা। সুষমা ব'লে তার যে বাইজি আছে তার মতন সুন্দরী নাকি বাংলাদেশে আর জন্মায়নি। পাছে তার মনে কষ্ট হয় তাই নরেশ কুৎসিত দেখে বউ এনেছে। সেই তো সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কিনা, এই পরিমলকে তার বাঁদী হতে না হলেই এখন বাঁচা যায়।"

সেই হৃদয়ভেদী তীক্ষ্ণ শর পরিমলের মর্ম্মের মধ্যে যে বেঁধানই ছিল; নিষ্ঠুর ও কঠিন হইয়া থাকিয়া সে শান্ত অথচ অবিচলিত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল "তোমার এত বাগান্ এত বাড়ী রয়েছে সে সবের অধিকার তুমি ওকে দিতে পারো, শুধু আমায় যেটুকু দিয়ে ফেলেছ সেইটুকু ছাড়া। ও যদি স্বর্গের দেবীও হয়, তবু আমার কাছে ওর জায়গা হবে না।"

এবার নরেশের মনও বেজায় গরম হইয়া উঠিল। বিরক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তিনি কথার উপর জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি তার অপরাধ?"

পরিমল দেহ ঋজু ও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বামীর মুখে নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া ধরিয়া স্পষ্টস্বরে কহিল, "তার অপরাধ এতই প্রবল যে তাকে দেওয়া ভালবাসা ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব বোধে তুমি আমার' মত তুচ্ছকেও তুচ্ছ বোধ করতে পারো নি। কিন্তু ভুল করেছিলে। রাজার মেয়েরও যেমন, ভিখারীর মেয়েরও তেম্‌নি, মন বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বুকের ভিতরে ভরা আছে। তুমি যাকে ভালবাস, তাকে আমার পাশে বসে ভালবাসবার সুযোগ আমি তোমায় দিতে পারবো না। যদি তাকে এ বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব দেবে বলেই স্থির হয়ে থাকে, তা'হলে হুকুম করো আমিই না হয় বাগানে গিয়ে থাকি। এক বাড়ীতে ভদ্র কন্যার আর পতিতার থাকা চল্‌বে না।"

নরেশকে একেবারে স্তম্ভিত বাক্যহীন দেখিয়া নিজের উদ্গত অশ্রু কোন মতে সম্বরণ করিয়া লইয়া রোষক্ষুব্ধ ও উচ্ছ্বসিতস্বরে পুনশ্চ কহিল, "কিম্বা বাগানও যদি তার হাওয়া খাবার

জন্য দরকার পড়ে যায়, কাজ নেই আমায় দিয়ে। তার চেয়ে দেশের বাড়ীতে নতুন মায়ের কাছে আমায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দাও, ততক্ষণের জন্যে শুধু তোমার তাকে—"

নরেশ একটা সুদীর্ঘতর নিশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "পরিমল! বিপন্ন আশ্রয়ার্থীকে তোমার দয়ার মধ্যেই সঁপে দিতে চেয়েছিলেম, এমনভাবে নেবে জান্‌লে সে চেষ্টা করতে আসতেম না। ভাল তাকে একবারটী চোখেই দেখ, —ভাল মন্দ লোক তো চোখে দেখেও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ডাকি তাকে?"

পরিমল দু'হাত তুলিয়া দু'চোক ঢাকিয়া মাথা নাড়িল।—"আমার স্বামীকে আজও যে ভুলিয়ে রেখেছে আমি তার মুখ দেখবো না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজদুঃখ।

—রামায়ণ।

তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে
কহিল পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে?

—কথা।

নীচের তলার একটা ঘরে সুষমা একাকিনী মেজের উপর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যেন একগাছি ছিন্ন লতিকার মতনই বসিয়া পড়িয়াছিল। রাজা নরেশচন্দ্রের এই সুবিপুল ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাসাদ ভবনে প্রবেশ করিয়াই তার সমস্ত মনটা যেন লজ্জায় অনুতাপে সঙ্কোচে ও ধিক্কারে গুটাইয়া অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। আকস্মিক ও নিরুপায়তার ভয়ের তাড়নায় সে কানাই সিংহের প্রস্তাবিত এই কাজটা করিয়া ফেলিবার পরক্ষণ হইতেই তার মনের মধ্যে কিসের একটা অস্বস্তির ঝড়, তুফান তুলিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছিল। নিশ্চিন্তে নিদ্রিত গৃহস্থের সুখনিদ্রার অবসরে তাহাকে হৃতসর্ব্বস্ব করণোদ্দেশ্যে চৌর্য্যবৃত্তি করিতে আসিয়াছে এম্‌নি একটা দ্বিধা ও আতঙ্ক যেন তাহার লোভের মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া উঠিতেছে বলিয়া তার বোধ হইল যতক্ষণ নরেশ তাঁর স্ত্রীর সম্মতি আনিতে গিয়াছিলেন, তার মধ্যে একটা অকথ্য লজ্জা ও অত্যন্ত তীব্র সঙ্কোচে সুষমার যেন উঠিয়া সে ঘর সে বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা করিতেছিল। ছিছি ছিছি, কেন সে মরিতে এ বাড়ীর পবিত্রতার মধ্যে উঁহাদের দাম্পত্য সুখের মাঝখানে নিজের এই কলঙ্কলাঞ্ছিত পাপছায়া ফেলিতে আসিয়া দাঁড়াইল? সে কি গৃহস্থ ঘরে পা রাখিবার যোগ্য!—

নরেশ আসিয়া সঙ্কোচে মৃদুচরণে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই সুষমার মনের ক্ষীণ দীপশিখাটুকু নিমেষেই নিবিয়া গেল। সে মুখ তুলিল না, নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না, কোন প্রশ্ন না করিয়াই যেমন ছিল তেম্‌নি নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ হইয়া

রহিল। শুধু এতক্ষণের পর একটা প্রবল রোদনোচ্ছ্বাস ভিতরে ভিতরে তাহার বক্ষকে মথিত ও কণ্ঠকে পীড়িত করিয়া অতি তীব্র বিস্ফোটকের মতই বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

বহুক্ষণ এম্‌নি ভাষাশূন্য অসহ্য নীরবতার মধ্য দিয়া নিজেদের বেদনাকে প্রশমিত হইয়া আসিবার অবসর দান করিয়া এবং তারপর নিজের মনের মধ্যের চক্রাকারে মথিত ক্রোধ ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের জ্বালাকে কথঞ্চিৎ দমনে আনিয়া নরেশচন্দ্র যথাসাধ্য সৌম্যভাব অবলম্বনের চেষ্টা পূর্ব্বক বলিলেন "চলো সুষমা! তোমায় এখনকার মতন বেলগাছিয়ার বাগানে নিয়ে যাই।"

সুষমা এই কথাটুকুর মাঝখান দিয়া যেটুকু বা বাকি ছিল, সেটুকুও বুঝিয়া লইয়া এইবার তার নৈরাশ্য ভয় ও বেদনা বিহ্বল চক্ষু দু'টি সুধীরে উঠাইয়া নরেশচন্দ্রের গম্ভীর ও স্থির সঙ্কল্পপূর্ণ দুই চোখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "কানাই সিংয়ের দেশেই আমাকে পাঠিয়ে দিন, তার বুড়ি মা আছে, মেয়েরা বউয়েরা আছে, তাদের মধ্যে আমি বেশ থাকবো। বাগান বাড়ীতে আমি যাবো না।" সুষমার কণ্ঠে ভৎর্সনার ভাব প্রকাশ পাইল।

নরেশ কহিলেন—"সুষমা! আমার স্ত্রী হয়ত ঠিকই মনে করিয়ে দিয়েছে, আজও হয়ত আমি তোমায় ভালবাসি। অথচ আমার জন্যই তুমি বিশ্বের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার তরঙ্গে পড়ে, হাবুডুবু খেতে খেতে অসহায় অনাদৃত ভেসে ভেসে বেড়াচ্চো, আর আমি নিজেকে নিয়ে গৌরব ও সুখ-সম্ভোগ করাচ্চি। না, আর তা হবে না। আজ রাত্রেই তোমায় আমি বিয়ে করবো। বলতে তো কেউ কিছুই বাকি রাখেনি, আরও যতখুসী নিন্দা করুক। আমি কারু কথাই শুনবো না, তুমি আমার স্ত্রী!"

সুষমা নরেশের কথার ভঙ্গীতে ও তাহার দৃঢ় কণ্ঠশব্দে অবাক ও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সভয়চক্ষে তাহার ক্রোধ ও আবেগোত্তেজিত মুখের দিকে বারেক চকিত কটাক্ষ করিল, তারপর তার পায়ের কাছে পড়িয়া আকুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে বলিল "না, না, সে আমি হ'তে দোবনা। আমি জন্মের মতন চলে যাচ্চি, আর কক্ষনো আমার নামও আপনি শুন্‌তে পাবেন না, এবারকার কথা শুধু ভুলে যাবেন।" সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

নরেশ তাহার কাছে একটুখানি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, স্থিরকণ্ঠে কহিলেন "তুমি ভুলে যাচ্চো, তোমায় কখন ত্যাগ করবো না বলে যে তোমার মার কাছে আমি স্বীকার করেছিলেম। বিবাহ ভিন্ন অন্য রকমে তোমায় আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে সে দেখ-চোই তো? অতএব ভালমন্দ যাই হোক এই আমাদের পথ, এর পরিণাম যা হবার হবে—উপায় কি তার?"

সুষমা তখন তাহার বিষাদসমাচ্ছন্ন অশ্রুধৌত মুখখানি উন্নমিত করিল; দুঃখের অশনি প্রহারে ফাটিয়া পড়া অন্তরের ব্যথা 'চাপিয়া সেই অশ্রু প্রবাহের মধ্যেই অত্যন্ত করুণ একটুখানি হাসিয়া

সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "আরও একটা উপায় আছে ভুলে যাবেন না ; অপরের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে সেটা আমি নির্ব্বাচন করতে ভরসা করিনি ; কিন্তু যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হ'ন তাহলে অগত্যাই সেই পথটাকেই আমায় বেছে নিতে হবে। আমি মরবো।"

নিরতিশয় ব্যথা ও লজ্জানুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহলে তুমি কি করতে বলো? স্রোতের মুখে তোমায় ভাসিয়ে দেব?"

সুষমা তাঁহার গম্ভীর ও শোকাহত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু ও শান্তভাবে জবাব দিল, "সামান্য কিছু টাকা দিন, কানাই সিংয়ের দেশেই আমি যাব।"

নরেশ চলিয়া গেলেন, কিছু পরে আসিয়া দেখিলেন, সুষমা একা নাই, তার সঙ্গে নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

নরেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নিরঞ্জন একঝলক আনন্দের হাসির সহিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "এই যে আমার আনন্দময়ী—"

সুষমা ত্রস্তে বাধা দিল "আমায় অমন কথা বলবেন না আমি আপনার অতি দীন হীন মেয়ে।"

নরেশ নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত কহিলেন "তোমাদের দুজনে চেনা-শোনা হলো কি করে?"

শুনিয়া হঠাৎ নরেশ যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক ক্ষীণ আলোক রেখার সন্ধান পাইলেন। হাত ধরিয়া বলিলেন "নিরঞ্জন! যাকে তুমি মা বলে উল্লেখ করতে যাচ্ছিলে একান্ত অসহায়া জেনে অনেক মন্দলোকে তার সঙ্গে কুব্যবহার করতেও দ্বিধা করচে না। তারই রক্ষার ভার তুমি যদি নাও, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আমি তোমায় চিনেছি, তুমি আমার চেয়েও একার্য্যের বেশী উপযুক্ত। আমার নিজের মধ্যেও একটা লোভের আগুন জ্বলন্ত হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি ওকে মা' বলেছ—তুমিই পারবে। আমি গো ও চোক নিয়ে প্রথম থেকে ওকে দেখিনি!"

নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তার এ নূতন চাকরী এক মুহূর্ত্তেই স্বীকার করিয়া লইল। তখন স্থির বিজলীর মত চোকদুটী নরেশের সদ্যচিন্তাভারবিমুক্ত ঈষৎ প্রসন্নমুখে স্থাপন করিয়া সুষমা কহিল, "কিন্তু কার ভার ওঁকে নিতে হচ্চে, সেটা আমার বাবার আগে থেকেই জেনে নেওয়া উচিত যে।"

এই বলিয়া নরেশকে বাক্যবিমুখ দেখিয়া সে নিজেই নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া অকম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "আমি একজন অতি হীনজীবী পতিতার মেয়ে, বাবা! সমাজে আমার জায়গা নেই বলে, ছোট বেলা থেকে রাজাবাহাদুর দয়া করে আমায় একটী স্বতন্ত্র বাড়ীতে রেখে পালন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষে যা হয়ে থাকে সেই ধরে বিচার করে, লোকে আমার জন্য ওঁর দেবচরিত্রেও কালি মাখাতে ছাড়ে নি। স্বাধীনভাবে কোন চাকরী নিয়ে থেকে ওঁর দেওয়া আশ্রয় ছাড়লে হয়ত কালে আমার ও ওঁর নাম স্বতন্ত্র হয়ে পড়বে, এই আশা করেছিলুম, হিতে বিপরীত হলো, ভয় পেয়ে আজ এখান অবধি আমার দুষ্প্রবেশ্য জেনেও ছুটে এসেছিলেম। আমি হয়ত

ওঁর সুখের রাহু।" আকস্মিকোদিত বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া সুষমা চুপ করিয়া দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করাতে তার চোখের জল গোপনেই সাদা পাথরের মেজের কঠিন বক্ষ আর্দ্র করিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নিরঞ্জন সব কথা শুনিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল "মা! সমাজ বন্ধনের মধ্যে জাতি নীতি কুল গোত্র এ সমুদয়ের নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু তার বাইরে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে শুধু চাই চরিত্র ও ত্যাগ। তোমার ক্ষুদ্র ইতিহাসে ওদুটি জিনিষই প্রভূতপরিমাণে দেখতে পেলুম। আমরা মায়ে ছেলেতে যদি কোন সেবাশ্রমে, যদি কোন পুণ্যক্ষেত্রের সন্ন্যাসীপরিচালিত কর্ম্মশালায় কাজ নিই, তাহ'লে তোমার মা কি ছিল, সে প্রশ্নও যেমন অনাবশ্যক হয়ে যাবে এবং তোমার—"

নরেশ গভীর আবেগ ও আনন্দোত্তেজনায় নিরঞ্জনকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়া উঠিল "ঠিক বলেছ নিরঞ্জন; সুষমার মত মেয়েরা যখন সমাজের জন্য নয়, তখন ওদের জন্য কোন সামাজিক জীবের আশ্রয়ও সুসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে কথাবার্ত্তা কইবো। ওদের মতন মেয়েদের জন্য একটি সন্ন্যাসিনী পরিচালিত আশ্রম করতে পারার বোধ হয় খুবই দরকার আছে।"

নিরঞ্জন উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এক সময় আমার মনের এটা একটা মস্তবড় কল্পনাই ছিল, মিসনরীরা যেমন (ফাউণ্ডলিং) পথে কুড়নো ছেলে মেয়েদের জন্য আশ্রম করে রাখে, ঠিক তেমনি হিন্দুসমাজ থেকে কেন করা হয় না? যে সব পতিতা মেয়ে, সুপথে ফিরতে চায়, তাদের আশ্রয় কোথায়? এই সুষমা মায়ের মতন নিষ্পাপ হয়েও যারা মায়ের পাপের ফলে এ জন্মটা সমাজের বাইরে, অথচ সৎপথে থেকে দৃঢ় তপস্যায় ক্ষয় করতে সমর্থ, তারা কেন সে সুযোগটুকু পাবে না? বৈষ্ণবের আখড়া বা মঠধারীদের আড্ডা যথার্থ রক্ষামন্দির যে নয়, সে জ্ঞান সকলের নেই। এদের দ্বারাও কতকাজ যে করিয়ে নেবার আছে। যে কাজ মিসনরী মেয়েরা এবং তাদের আশ্রিতা পালিতারা করচে, সে সবই এরা পারে; আর সুতোকাটা তাঁতবোনা সেবাশ্রম করে দুস্থের যত্ন সেবা ইত্যাদি আরও কি কিছু কম করবার আছে? তবে কেন এত শক্তি অনর্থক অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে? পথভ্রষ্টের জন্য কি পথ সহজ করে কেউ দেবে না?"

সুষমা দুজনকার পায়ের গোড়াতেই প্রণাম করিয়া উঠিয়া আনন্দসজলচক্ষু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের কদাকার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে কহিল "বাবা! আমায় ওই রকম করেই তুমি এইবার সার্থক করে তোল। এখন মনে হচ্চে, তাহলে আমার মতন হতভাগ্য জীবনেরও দরকার তো কোথাও আছে!"

নিরঞ্জনের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া সুষমা চলিয়া গেল। একদিক দিয়া অতুল শান্তিতে এবং আর একদিক হইতে একটা তীব্র ব্যথায় নরেশচন্দ্রের প্রাণটা যেন হাহা করিয়া উঠিল। এতদিন পরে সুষমা যে তার প্রকৃত পথের সন্ধান ও সে পথের যথার্থ আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারই আনন্দ আর তার সঙ্গেই, এতদিনের পর সুষমার সকল

সম্বন্ধ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার ব্যথা একটু তীক্ষ্ণ হইয়াই মনে বাজিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা দুজনেই যে মস্ত বড় প্রলোভনকে জয় করিয়া অম্লান ও অপ্রতিহত রহিলেন, ইহার গৌরবও তাঁহার সেই ক্লিষ্ট চিত্তকে কম সান্ত্বনা দিল না। (আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅনুরূপা দেবী

তাজ-স্বপ্ন

(১)

শিরতাজ মন'তাজ মহারাজ্ঞী ওগো মমতাজ
বিশ্বকবি বন্দে তোমা আজ!
সাম্রাজ্যের সম্রাটের বিন্দু বিন্দু মুকুতা জমাট,
আঁখির সোহাগে ফুটি অপরূপ মর্ম্মর বিরাট,
—চিরনব শুভ্র শান্ত স্ফটিক সুন্দর উঠিয়াছে গড়ি, –
সমগ্র বিশ্বের প্রেম এক মহাসৌধরূপ ধরি,
মরি মরি মরি!
আপনার মহিমায় আপনি উজ্জ্বল,
ধুতুরা-ধবল!

(২)

তুষার-রজত-কান্তি চন্দ্রকিরীটিনী মমতাজ
বিশ্বশিল্পী বন্দে তোমা আজ!
অশ্রান্ত যমুনা অই নিশিদিন ক্রন্দনের সুরে,
তব স্তুতি গেয়ে যায় বিহগের কলকণ্ঠ ঘুরে,
তরঙ্গের রঙ্গে ভঙ্গে র'চে তব বিরহীর গাথা,
ঝরে তব পাদপদ্মে প্রণয়ীর পঞ্জরের ব্যথা
—লক্ষ মর্ম্মকথা!
শ্যামশষ্পশয্যাতটে সুগন্ধি মলয়
ভৃত্য হ'য়ে রয়!

(৩)

পারিজাত নিঙাড়িয়া শশিকলা বিনির্ম্মিতা তাজ
বিশ্বকর্ম্মা-রচা কারু কাজ!
কুবেরলুণ্ঠনকরা মাণিক্যের অযুত সম্ভার,
অন্তহীন লালিত্যের কাব্যকলা চারু চমৎকার,
কল্পনা অতীত এক বৈভবের বিপুল বিকাশ,
সম্রাজ্ঞীর পূজা হেতু সম্রাটের শ্রেষ্ঠ অভিলাষ
প্রেমের আবাস!
অনশ্বর অতুলন সমাধিভবন
লাঞ্ছিতনন্দন!

(৪)

বৈজয়ন্ত ধাম একি মর্ত্তলোকে রচিয়াছ তাজ
ইন্দ্রপুরী পায় হেরে লাজ!
অসীম ঐশ্বর্য্যে তব কাঁপে যক্ষ অলকার পুরে—
সুপ্তিম্লান সব মণি, মূক কবি—ভাষা নাহি স্ফুরে,
চিত্রকর চিত্রার্পিত, রহে শুদ্ধ তুলিকারে ভুলি,
বিশ্বের গুঞ্জন-গীতি পদপ্রান্তে ছন্দে বন্দে দুলি'
—পড়ে কুতূহলী।
সাধিয়াছ অভিনব অসাধ্য সাধনা
সুধন্যা ললনা!

(৫)

সামান্যা মানবী নহ তুমি হে অপ্সরী তাজ!
নহ শুধু কল্পনার আজ!
সত্য তুমি, নিত্য তুমি, মৃত্যুহীন অন্তহীন রাণী.
বিশ্ববিজয়িনী তুমি সৌন্দর্য্যের উপাস্য রমণী;
কবির কবিতা তুমি, সঙ্গীতের সুললিত সুর,
—প্রেমিকের প্রেম তুমি,—সম্পদের কোটি কোহিনুর,
মুগ্ধ সুরাসুর!
পুণ্যা তুমি, সতী তুমি শ্রীলক্ষ্মি শ্রীমতি—
চির আয়ুষ্মতি!

(৬)

রহ রহ বিনিদ্রিতা অয়ি বিশ্ব-বিমোহিনী তাজ
জাগিওনা জাগিওনা আজ!
জন্ম জন্ম শান্ত তৃপ্ত হর্ষাতুরা বিহ্বল প্রেমিকা,
অচেতন মহাঘুমে আত্মহারা আনম্র লতিকা
রহ অনাহতা। জাগিলে টুটিয়া যাবে নিখিল বন্ধন,
নিমেষে বিদীর্ণ বিশ্বে উচ্ছ্বসিবে আকুল ক্রন্দন,
প্রলয় স্পন্দন!
নগ্ন হ'য়ে সব গর্ব্ব পরে যাবে ঝরে
দৈন্যের মাঝারে!

শ্রীঅবনীকুমার দে

সভ্যতার মধ্যযুগ

পুরাতনের স্থান নিতাই নূতনের দ্বারা পরিপূরিত হইতেছে। পুরাতন ক্রমে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া যাইতেছে, আবার দীর্ঘকালের পর সেই সকলেরই নমুনা সংগৃহীত হইয়া

সেকালের দন্ত চিকিৎসা।

৫০০ বৎসর পূর্ব্বের পদস্থা রমণীর শিকার যাত্রা।

বর্ত্তমানের কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, ক্রমোন্নতির ধারা ঠিক করিবার জন্য, আধুনিকের উৎকর্ষ প্রমাণের জন্য সযত্নে যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে, বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের

অঙ্গ পরিপুষ্ট হইতেছে, পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় হইতেছে। আবার কিসের নিয়মে ঠিক জানিনা, অনেক পুরাতন ঠিক পূর্ব্বেরই বেশে বা সামান্য একটু বহিরাবরণে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া নূতনকে হটাইয়া দিতেছে। এই নিয়মেই জগতের কাজ চলিতেছে।

আমরা এখানে পুরাতনের আলোচনায়, বা কাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হইবে তাহা নির্ণয়ে, প্রবৃত্ত হই নাই। কর্ম্ম জগতে যাহারা এখন উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেই পশ্চিমবাসীদের যে সকল পুরাতন এখন পৃথিবীর বিশাল পরিত্যক্ত ভাণ্ডারের বিস্মৃতির স্তূপমধ্যে পড়িয়া ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহার অন্য আলোচনা কিছু নহে, কেবল-মাত্র কতকগুলি চিত্র পাঠক পাঠিকাদিগের উপহারের জন্য সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

পুরাকালে দুষ্টার সাজা দিবার ব্যবস্থা।

দিন যতই অগ্রসর হইতেছে সমাজে, সংসারে, যুদ্ধে, শান্তিতে, আহারে, বিহারে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, কর্ম্মে, অবসরে জীবনের সকল দিকেই নূতন আসিয়া পুরাতনের স্থান অধিকার করিতেছে। সেই সকল পুরাতন কতক আমাদের স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতক পুস্তকাদিতে, চিত্রে বা পুরাতত্ত্বের সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে। কত পুরাতন প্রথা, কত সামাজিক ব্যবস্থা, জীবন যাপনের কত প্রকার উপায়, কত ব্যবসায়, কত সংস্কার, কত সাজ পরিচ্ছদ যাহা তখনকার লোককে সুখ, সাচ্ছন্দ্য, সভ্যতা, রাজ্যরক্ষা ও শাসন, এমন কি জীবন রক্ষা করিবার ক্ষমতা দিতে পারিয়াছিল, এখন তাহা ক্ষমতাহীন অচল, আমাদের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুরাতনের ছবিগুলি যেভাবে চিত্রিত তাহাতে উহাদের বিষদ বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। উহা হইতেই বর্ত্তমান কলকারখানার যুগের সুসভ্য ইংরাজদের তৎকালীন কামার, কুমোর, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার, ধোপা, নাপিত, দরজি প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষগণের আড়ম্বরহীন সরল ব্যবসা-পদ্ধতি, তখনকার যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, দুর্গ আক্রমণ প্রথা, সাজ পোষাক, ভোজন প্রথা, বিলাসী ধনীর ভ্রমণ

সজ্জা অপরাধী ব্যক্তির সাজার ব্যবস্থা, অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতির বেশ পরিষ্কার একটা

প্রাচীন কালের দুর্গ আক্রমণ।
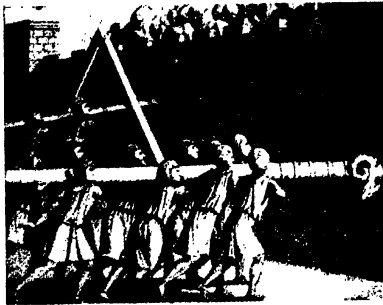
পুরাকালের দুর্গ বিধ্বংসী মহাযন্ত্র।

ধারণা করিতে পারা যায়। সেই কারণ প্রবন্ধের কলেবর অকারণ বৃদ্ধি না করিয়া ছবিগুলির সহিত উহার বিষয়গুলির মাত্র উল্লেখ করিয়া দিলাম।
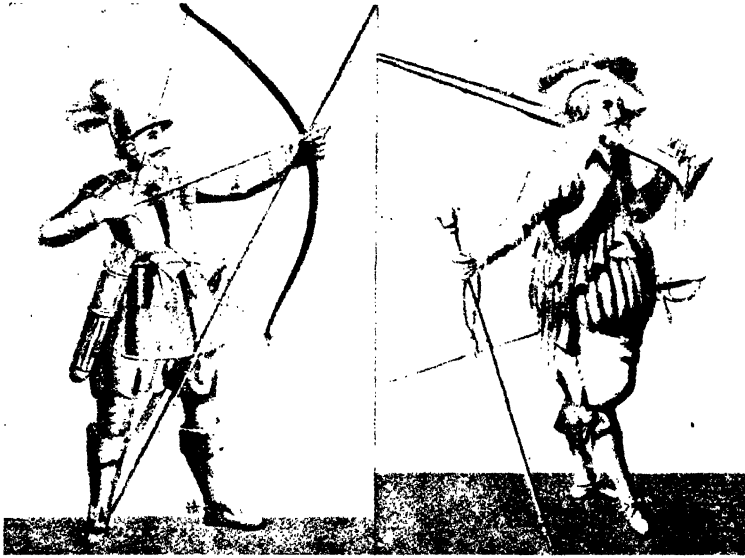
অগ্নিবাণ আবিষ্কারে পূর্ব্বের বৃটীশ।

পূর্ব্বকালের বন্দুকধারী সৈনিক

প্রাচীন কালে ধনী রমণীর পোষাক।

প্রাচীন কালের অশ্বারোহী সৈন্য।

শ্রীহরিহর শেঠ

হাঁস্থুলি

(১)

জঠরের জ্বালা বড় জ্বালা। দেশে আকাল হইলেও ক্ষুধা তাহার কাজ ভোলে না। গরু বাছুর জলের দামে বিকাইয়াছে, তৈজস পত্র একে একে পরহস্তগত। শেষ সম্বল, একমাত্র কন্যা দুলালীর গলার রূপার হাঁসুলিটী। কন্যা কিছুতেই সেই হাঁসুলি ছাড়িবে না, কাঁদিয়া অনর্থ করিবে, স্বামী স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া তাই সেই হাঁসুলিটী কাড়িয়া লয় নাই।

পিতামাতা দুইদিন অনাহারে থাকিয়াও কন্যার আহার জোগাইয়াছে, আজ তৃতীয় দিবসে তাহাও জুটিবে না।

স্ত্রী বলিলেন, আজ দুর্গোৎসবের দিনে অভুক্ত থাকিলে গৃহস্থের অকল্যাণ। দুলালীর হাঁসুলিটী নিয়ে যাও, সাত টাকার জিনিষ, নিদেন পাঁচটা টাকাও ত পাবে। আজ সকলে মিলিয়া পেট ভরিয়া আহার করিব। অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হইল, দুলালী এখনও নিদ্রিত, মা হাঁসুলিটী খুলিয়া দিবে।

(২)

দুলালী ক্ষুধায় ছটফট করিতেছে। মা উনানে জল চাপাইয়া দিয়াছে। চাল নিয়ে এই এলো ব'লে।

(৩)

গরীব কৃষক জমিদার বাড়ী ছাড়া আর কিছু চেনে না। সকাল বেলা থেকে বসে আছে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। দুর্গোৎসবের ধূম, সবাই ব্যস্ত, এক দীন প্রজার সাক্ষাৎ করার মতন তুচ্ছ কাজ কারো হিসাবে আসে নাই। বেলা তৃতীয় প্রহরে কৃষকের ভাগ্য ফিরিল,— বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। নকল ও খারাপ রূপার তৈরী জিনিষ, কখনই সাত টাকা খরচ পড়ে নাই; সব জুচ্চোরি। তিনি জোর একটী টাকা দিতে পারেন। কৃষক অধীর হইয়া পড়িয়াছে— স্ত্রী কন্যা তাহার আশাপথ চাহিয়া আছে—দেরী করা চলেনা—এক টাকাতেই সম্মত হইল। কিন্তু টাকাটা এখনই চাই, বড় দরকার। বাবু হাঁসুলিটী হাতে করিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর বাবুর দেখা নাই। কৃষক প্রতি মুহূর্ত্ত অতি কষ্টে কাটাইতেছে—আশা, বাবু এখনই আসবে—এখনই সে টাকা পাবে—চাল কিনিয়া বাড়ী ফিরিবে, সমস্ত দিনান্তে স্ত্রী কন্যার মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিবে।

(৪)

সন্ধ্যার আরতি। ঢাক ঢোল কাঁসী বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। বাড়ী আনন্দে মুখরিত। কৃষক এই আনন্দের মধ্যে তার বেসুরো মনোভাব লইয়া একটা উৎপাতের মতন বাবুর পা জড়াইয়া

ধরিল—এখনিই তার টাকাটা চাই। বাবু অবজ্ঞাভরে পা ছাড়াইয়া লইলেন—তোমার দু বছরের খাজনা বাকী পড়িয়াছে। এই টাকাটা তোমার নামে খাতায় উসুল করিয়া লইতে বলিয়াছি। এখনো ত তোমার দেনা শোধ হয় নি সেটা মনে রেখো।

অন্নপূর্ণার আগমনে আনন্দের অভাবে গৃহস্থের অকল্যাণ—অতএব আনন্দ চলিতে লাগিল।

কৃষকের বেসুরো রাগিণী আনন্দের স্রোতে বাধা দিতে পারিল না; কারণ, ততক্ষণ তিন দিনের অনাহার ও হতাশা তাহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখিয়াছিল।

শ্রীমতী কিরণবালা সেনগুপ্তা

"খেয়া"

ওরে আমার নেয়ে !
　　ওপার হ'তে এস এপার
খেয়ার তরী বেয়ে।
　ঘাটে বেলা কাট্‌ছে একা—
　মিলিয়ে এল পারের রেখা ;
　সন্ধ্যাবেলার আঁধার রাশি
　　নাম্‌ছে আকাশ ছেয়ে।
পার করে দে' এবার মোরে
　　ওরে আমার নেয়ে ॥
ছুট্‌ছে নদী কল্‌কলিয়ে
　　হাজার লহর তুলে' ;
ঢেউএর সাথে নৃত্য তালে
　　উঠ্‌ছে হৃদয় দুলে'।
দিনের খেলা সবার মাঝে
সাঙ্গ হ'ল বিজন সাঁঝে,—
ঘরের পানে পাড়ি এবার
　　আনন্দ গান গেয়ে ॥

শ্রীবেলা গুহ।

জার্ম্মান আভিজাত্য

যুদ্ধের আগের কথা জানি না, কিন্তু যুদ্ধের পরে জার্ম্মানিতে দেখ্‌তে পাই, যে এদের গর্ব্ব ও বিদেশীদের প্রতি অবজ্ঞা, ইংরাজের চেয়ে অনেক কম। তার প্রমাণ,—আমি ত অনেক রীতিমত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে একটু ভালরকম মেলামেশারই সুযোগ পাচ্ছি, যেটা বিলাতে অসম্ভব বল্লেই চলে। সেখানে আভিজাত্যের ত বটেই, ভদ্রমধ্যবিত্তের গৃহদ্বারও আমাদের পক্ষে খোলা নয়।

প্রথমত দেখ্‌তে পাই যে এরা আমাদের প্রতি যে ভাল ব্যবহার করে, সেটা মৌখিকের চেয়ে একটু বেশী—যেহেতু এরা প্রায়ই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে থাকে। অনেক পরিবারে যাওয়া মাত্রই এরা সজ্জনের মত ভোজ্যদানে অতিথিসৎকার করে থাকে। সঙ্গেসঙ্গে ইংরাজজাতির কথা মনে না হয়েই পারে না। ভোজ্যদান ত দূরের কথা, ইংরাজেরা ভারতীয়দের চা খেতেও নিমন্ত্রণ করে না,—যদিও তাদের অবস্থা বর্ত্তমান জার্ম্মান মধ্যবিত্তের অবস্থার চেয়ে ঢের ভাল। শুধু খাওয়ান ছাড়াও জার্ম্মান ভদ্রলোকেরা আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। একজন এদেশবাসিনীর মুখে শুন্‌লাম, যে জার্ম্মানদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে এরা বিদেশীকে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে তত নারাজ নয়। অবশ্য আমি একথা বল্‌ছি না, যে এরা Walt Whitmanrএর "Unscrew the locks from the doors"-রূপ আদর্শবাদের বশবর্ত্তী হয়ে বিশ্বপ্রেমের অনুশীলনের জন্যই বিদেশীকে স্বাগত সম্ভাষণ করে থাকে; এদের মধ্যেও যূথবদ্ধ মানুষের মত স্বীয় যূথকে সবচেয়ে বড় মনে করার দুর্ব্বলতা আছে। আমি শুধু এই সাদা সত্য কথাটি বল্‌তে চাই, যে ইংরাজ জাতির চেয়ে ঢের কাছ থেকে এদের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে আমি যে পরিমাণে তৃপ্তি পেয়েছি, এদের আভিজাত্যের নমুনাতে ঠিক সেই পরিমাণেই দুঃখিত না হয়েই পারি নাই; কারণ, এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যেটুকু সংস্পর্শে এসেছি,—আমার গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীর দৌলতে একটু নিকট থেকেই এদের দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি, যেহেতু লৌকিক সান্ধ্যভোজাদির পার্টি এঁরা প্রায়ই দেন ও তাতে আমি প্রায় সব সময়েই যোগ দিতে বাধ্য হই—তাতে এদের parasitic অবস্থা, বৃথা আত্মাভিমান এবং দরিদ্রের প্রতি গভীর ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা দেখে এদের হৃদয়হীনতার প্রতি বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে যায়। Oscar Wilde মহোদয়ের নাটকগুলিতে ইংরাজ আভিজাত্যের ক্ষুদ্রতার কথা যখন প্রথম পড়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল যে তিনি শুধু ব্যঙ্গ কর্ব্বার জন্যই তাদের তিলরূপ দোষকে তাল করে দেখেছেন। এখানকার আভিজাত্যের সঙ্গে এই কয়মাসের পরিচয়েই আমার সে ধারণা দূর হয়েছে। আভিজাত্য বোধ হয় সর্ব্বত্রই এইরূপ। আমি এবিষয়ে কেবল

আমাদের দেশকে বাদ দিয়ে বৃথা স্বজাতির গৌরব করা রূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের আভিজাত্য নিজের মুখে এতটা কায়মনোবাক্যে মগ্ন থাকে না। তারা অন্ততঃ পূজা উৎসবাদিতে সাধারণকে নিমন্ত্রণ করে থাকে। এরা কিন্তু দেশের নাড়ীর সংশ্রব একেবারে বর্জ্জন করেছে। Oscar Wilde লিখিয়াছেন:—"You rich people of England, you do'nt know how you are living. How could you know? You shut out from your society the gentle and the good. You laugh at the simple and the pure." এখানেও এদের আভিজাত্যের চা, সান্ধ্য-ভোজন প্রভৃতি পার্টিতে এদের কথাবার্ত্তা শুনে ও তার ভঙ্গী দেখে আমি প্রথম উপলব্ধি করি যে Wilde মহোদয় এটা অনুভব করেছিলেন বলেই লিখেছিলেন, ব্যঙ্গ কর্ব্বার জন্য এদের সামান্য দোষকে বড় করে দেখেন নাই। এরা এতই স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয় যে জগৎ তাদেরই জন্য, যে অপরের কোনও দাবীদাওয়ার দিকে কর্ণপাত করাও দরকার মনে করে না। একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন আমার গৃহকর্ত্রী মহোদয়া আমাকে বলেন, যে শ্রমজীবীদের জন্যই তাঁদের অসুবিধা দিন দিন বাড়তে চলেছে, কারণ তারা তাদের অবস্থা ক্রমেই আরও ভাল কর্ত্তে চায়, আভিজাত্যের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম দেখায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ কথাগুলি সামান্য নয়; এতে এই অসার সম্প্রদায়ের সমগ্র মনস্তত্ব উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। আমি সেদিন ভেবেছিলাম ও আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম যে মানুষের মনের কতখানি অধোগতি হলে তবে সে এই রকম একদেশদর্শী ও অন্ধ নৈতিক অবস্থায় উপনীত হতে পারে, যাতে সে গরীবের দাবীদাওয়াটা অন্যায় বলে দৃঢ় বিশ্বাস কর্ত্তে পারে,—যেন জগৎ মোটেই তাদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আভিজাত্যের উপর এই ভেবে খানিকটা শ্রদ্ধা ছিল, যে জগতে ললিতকলা ও refinement এর ক্রমবিকাশের জন্য এরা মানুষের অনেকটা ধন্যবাদার্হ; কিন্তু তাও সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কেন, বল্‌ছি।

প্রথমতঃ সঙ্গীতাদি ললিতকলার ক্রমবিকাশের গৌণভাবে সহায়তা করার জন্য এ সম্প্রদায়কে তাদের প্রাপ্যটা আগেই দিয়ে রাখা ভাল; 'কারণ আমি স্বীকার করি যে রাজা উজীর সম্প্রদায় অনেক স্থলেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য অর্থ সাহায্য করে' গুণীকে সৃষ্টি কর্ব্বার অবসর দিয়েছেন। আমাদের দেশে হিন্দুস্থানী কলাবিৎরা রাজা ও জমিদারদের দ্বারা আগে পুষ্ট হতেন, ও এখনও অনেক স্থলে হন। এদেশেও Opera সঙ্গীতের বিকাশার্থে ফরাসী ও ইতালীর রাজা-উজীর সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছেন। কিন্তু মহাত্মা আকবর প্রমুখ দু'চার জন সত্যই সঙ্গীত রসিকের কথা ব্যতিক্রম হিসেবে বাদ দিয়ে সাধারণভাবে আমি বল্‌তে চাই, যে খুব বেশীর ভাগ স্থলেই এইসব রাজা-উজীর মহোদয়গণ সঙ্গীতানুরাগের প্রেরণাতেই যে অর্থব্যয় কর্ত্তেন তা নয়,—নিজের অহমিকা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করার জন্যই সভায় দু'চার জন

গুণীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ করে আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর্ত্তেন। আমার এরূপ ধারণা হয়ত প্রথম দৃষ্টিতে কারুর কারুর কাছে একটু বেশী সাহসিক মনে হ'তে পারে; কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, ললিতকলায় গুণী হ'তে গেলে ত কথাই নাই প্রবুদ্ধ উপভোগের ক্ষমতা অর্জ্জন কর্ত্তে হ'লেও তদর্থে অন্ততঃ কিছু শ্রম স্বীকার করে শিক্ষালাভ করা দরকার; কাজেই ঐ উক্তিটির সম্ভবতা সম্বন্ধে সংশয় স্বতঃই কমে আসে। অভিজাত-কুলোদ্ভব মহামহোপাধ্যায়গণের শ্রমে বৈরাগ্য, শিশুর সরলতার মতই সার্ব্বভৌতিক। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে শুধু পারিষদবর্গ পরিবৃত হয়ে সর্ব্বদা নিজ মহিমা কীর্ত্তন শ্রবণের পরিধির মধ্যে থাক্‌তে থাক্‌তে মানুষের মনের অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, তখন কোনও সত্য গুণীর যথার্থ তারিফ কর্ত্তে পারা অসম্ভব হয়ে ওঠে,—যদি সে গুণী সেলাম বাজাতে কার্পণ্য প্রকাশ করে। যে সঙ্গীতের রস গ্রহণ, সেলাম বাজানর উপর নির্ভর করে, সে রসগ্রহণ কি দরের, তা সহজেই অনুমেয়। এ রকম মনের অবস্থায় কোনও প্রবুদ্ধ রসভোগ সম্ভবে না; সত্য রসগ্রাহিতার ভঙ্গী, আরাধকের, উপাসকের; উদ্ধতের, বঙ্কিমগ্রীবের নয়। আমাদের দেশে এক সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক (?) ও গুণী (?) জমিদারের প্রাসাদে আমার সৌভাগ্য বশতঃই হোক্ বা দুর্ভাগ্য বশতঃই হোক্ একবার প্রবেশলাভ ঘটেছিল। তিনি যতক্ষণ সঙ্গীত সম্বন্ধে লম্বাচওড়া মত প্রকাশ কর্চ্ছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেটা তত দুঃসহ হয়ে ওঠেনাই, কিন্তু যখন তিনি একটি বাক্স হার্ম্মোনিয়ম খুলে তাঁর "ভৈরবী"তে পারদর্শিতা দেখাতে নানারূপ লোমহর্ষক স্বরবিন্যাস সুরু করে দিলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল, এ মা বীণাপাণির আরাধনা না,—এ তাঁর আর্ত্তনাদ। অথচ ইনি একজন সঙ্গীতবেত্তা ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক বলে খ্যাত। এই আমার মনে হয়, যে আমরা একটা মস্ত বড় ভুল করে বসি,—যখন গুণীর কিছু আর্থিক পুরস্কার লাভ দেখেই তার আদরলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ি। এতে গৌণভাবে যে সহায়তার কথা উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া অন্য কোনও সত্যকার সহায়তাই হয় না, কারণ গুণীর কাছে অনেক সময়ে টাকা দরকারী হ'লেও তাতে তার হৃদয়ের একটী তন্ত্রীও বেজে ওঠে না,—যেমন শ্রোতার যথার্থ রসগ্রাহিতাতে বেজে ওঠে। কাজে কাজেই গুণীকে অনেক সময়ে যে টাকার জন্যই সৃষ্টি কর্ত্তে চেষ্টা পেতে হয়, এটা জাগতিক নিয়মে অসংখ্য ছোট বড় tragedyর অন্যতম বলে মনে করা ছাড়া গতি নাই! "বাহবা, বহুত-আচ্ছা-মিঞা"-রূপ পিঠ চাপ্‌ড়ানতে সে সর্ব্বদা ক্লিষ্টই হয়, কিন্তু তার অন্তর্জগতে পুলকশিহরণ জাগে তখন, যখন সে শ্রোতার মধ্যে "তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী"-রূপ কথায়ই সৌন্দর্য্য উপাসকের অস্তিত্বের পরশ পায়। প্রসিদ্ধ গায়ক নীলকণ্ঠ একদিন এক মস্ত রাজা না জমিদারের বাড়ীতে কীর্ত্তন গাইছিলেন। জমিদার বাবু ও অন্য সকলের কাছ থেকে অজস্র পেলা-বৃষ্টি হচ্ছিল। কেবল এক কোণে একটি দরিদ্র লোক সময়ে সময়ে বেশী উচ্চস্বরেই "আহা, আহা" করে ফেল্‌ছিল। জমিদার বাবু মহা খাপ্পা;—"দাও ত বেকুবকে দূর করে।" সকলে যখন হৈ হৈ করে রসভঙ্গ-

কারীকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে ছুটলেন, তখন নীলকণ্ঠ পেলার সংগৃহীত অর্থ জমিদার বাবুকে ফেরৎ দিয়ে বল্লেন, "তবে আমাকেও বিদায় দিতে আজ্ঞা হোক্, কারণ আমি কেবল ঐ বেকুবের জন্মই গাইছি এবং আমি বাইরে গিয়ে তাকে একলাই গান শোনাব।"

জার্ম্মানির মত সঙ্গীতানুরাগের জন্ম খ্যাতনামা দেশেও সঙ্গীতের প্রতি এদের আভিজাত্যের মনের ভাব দেখে আমার এই সত্যটি বেশী করেই মনে হয়েছে, যে আর্টের প্রতি এদের outlook অন্যত্রের ন্যায় অগভীর, এই হৈ-হৈ-করে-জাহির-করা অনুরাগ কৃত্রিম। সঙ্গীতকে এরা মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অনুভূত একটা অনুপম বিকাশ বলে মনে করে না ও তা'তে এদের হৃদয়ের একটি তন্ত্রীও বেজে ওঠে বলে মনে হয় না। কারণ দেখিতেছি যে ভাল গায়ক গায়িকারা গানের সময়েও এরা পার্টি প্রভৃতিতে সোৎসাহে গল্পালাপ করে এবং গল্পালাপের বিরামের সময়েও সঙ্গীত শোনে,—একটা গভীর ঔদাসীন্যে সঙ্গীত-চর্চ্চাকে এরা অনেকটা ফেশান্‌এর খাতিরেই স্বীকার করে নেয়। এক্ষেত্রে অবশ্য আমি এদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কোনও কথা বল্‌ছি না। সৌভাগ্য বশতঃ এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গীতানুরাগ বাস্তবিকই অকৃত্রিম এবং এরাই সঙ্গীতের বিকাশের মন্দিরে চিরকাল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। এ বিষয়ে নিঃসংশয় হবার জন্ম কেবল দু'চার দিন ভাল ভাল কন্‌সার্টে যাওয়া দরকার। অনেকে ভাল সঙ্গীতের টিকিট পাবার জন্ম ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে ভাবে অপেক্ষা করে থাকে, প্রত্যেক ভাল কন্‌সার্ট-হলই এমন পরিপূর্ণ দেখা যায়, ও গায়ক গায়িকার লভ্য প্রশংসাধ্বনি ও হাততালি আমাদের প্রাচ্য কর্ণকুহরকে যেরূপ বধিরপ্রায় করে তোলে, ও গানান্তে "আর একটি গান, মাত্র আর একটি"-রূপ অনুরোধ যেভাবে ক্রমাগতই পুনরুক্ত হতে থাকে, তাতে সঙ্গীত যে এদের জীবনের কতখানি স্থান অধিকার করে, তা অতি অল্প সময়েই প্রতীয়মান হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য যে এই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই আভিজাত্য শ্রেণীর। আমার মনে হয় যে স্বার্থকে আজীবন কেন্দ্র করে বলার দরুণ এই শেষোক্ত শ্রেণী হৃদয়ের সেই রসসম্পৎ হারিয়ে বসেছে, মান অভাবে কোনও ললিতকলাই মানুষের মনে অনুরাগ বাড়াতে পারে না! সম্মিলনাদিতে এরা জাতির সমালোচনা করে, নিতান্ত superficial ভাবে, যথা ;—ইতালীয়ান—নিষ্ঠুর, স্পানিশ—নোংরা, ফরাসী—কলুষিত, রুমেনিয়ান—বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি ; এর মধ্যে একটি বিশেষণও আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। তবে এমন কায়মনোবাক্যে superficial সম্প্রদায়ের জগতের সম্বন্ধে লম্বাচওড়া মতামত শুন্‌তে শুন্‌তে সময়ে সময়ে বেশ মজা লাগে—যতক্ষণ না এই সব-এ নিতান্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়া যায়। মনে হয় Oscar Wildeএর কথা :—"People to-day have become so throughly superficial that they do not understand the philosophy of the superficial."

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বার্লিন—১৯২২

রাণী

(১)

তোমায় আমি করব রাণী
ছিল মনে
গিয়েছিলাম রাজত্বেরই
অন্বেষণে।
গেলাম তোমার বাঁধন ছিঁড়ি
পার হয়ে বন নদী গিরি
জিজ্ঞাসিলাম মিল্‌বে কোথা,
জনে জনে ;
তোমায় আমি করব রাণী
ছিল মনে।

(২)

আমি ছিলাম তোমার ভাবেই
আত্মহারা।
রাজা যারা আমার মতই
মানুষ তারা,
আমার মতই কাঁদে হাসে,
খায়, পরে, গায়, ভালবাসে,
আমিই তবে কেন রবো
লক্ষ্মীছাড়া ?
আমি ছিলাম তোমার প্রেমে
ক্ষ্যাপার পারা।

(৩)

এই ধারণায় ঘুরে এলাম
দেশে দেশে,
তুল্লেনাক পিঠে, কোনো
হাতীই এসে।
খুল্লনাক সিংহদুয়ার,
উঠ্‌ল নাক জয় জয়কার,
"আসুন হুজুর" বল্লেনাক'
উজীর হেসে।
তোমার পাশে কাঙাল বেশে
এলাম শেষে।

(৪)

মেলেনাক রাজত্বটা
কেবল খুঁজে,
এখন আমি ঘুরে ঘুরে
দেখ্‌ছি বুঝে ;
মেলেনাক ভিক্ষে করে
জিন্‌তে তা হয় গায়ের জোরে,
জিন্‌তে তা হয় শৌর্য্য দিয়ে
অনেক যুঝে,
মিল্‌ল নাক দেশবিদেশে
এলাম খুঁজে।

(৫)

উল্টে বরং করতে ভড়ং
পুঁজি পাটা
সব গেল মোর খুঁজতে গিয়ে
রাজত্বটা ;
চোর ভেবে রাজপ্রহরীরা
দিল আমায় অনেক পীড়া,
পাগল বলেও পেলাম অনেক
লাথি-ঝাঁটা,
নিঃস্ব আমি, গেছে সবি
পুঁজিপাটা।

(৬)

পাইনি বলে' তবু হতাশ
হইনি রাণী,
একটি নূতন দেশের আমি
খবর জানি।
তার অধিকার আমায় পেতে
হবে নাক কোথাও যেতে।
আমার পানে চাওলো, তোল'
বদনখানি,—
সেথায় আমি করব তোমায়
মহারাণী।

(৭)

আমার মানস- রাজ্যে, বস'
সিংহাসনে,
বিহার কর আমার প্রেমের
কল্পবনে।
রাজ্য, আমার জীবন জুড়ে
তায় তব জয়কেতন উড়ে।
কাব্য-রমা বর্‌বে তোমা
আলিঙ্গনে,
হে কল্যাণি, হওলো রাণী
চিৎভুবনে।

শ্রীকালিদাস রায়

"চন্দ্রগুপ্ত"-এর গান *

[রচনা——————স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্-এ]

(সপ্তম গীত)

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালা।

মিশ্র দেশ——————একতালা।

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে' আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে,—
"আয় চলে' আয়, ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে।'
বলে—"আয়রে ছুটে.' আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধু মাসে ;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা,
চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।

কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে' মরিস মিছে
দেখ্ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে,' ঘরের ছেলে, আয় চলে' আয়
আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ, ওরে ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে' আছিস্ পরবাসে?"

* "চন্দ্রগুপ্ত"-এর গানের স্বরলিপি 'বঙ্গবাণী'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

[স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

			২		৩			০		
ণা	ণা	II	ধা	ধা	পা	-া	পমা	মা	মা	-া
ও	ই		ম	হা	সি	ন্	ধু র্	ও	পা	র্

১				২							
মা	মা	-া	I	মা	-পধা	পা	-া	মগা	রসা	রা	পা	পা
থে	কে	০		কি	০ ০	স	ঙ্	গী০	ত০	ভে	সে	আ

১			১				২´		
(পা	পধা	ণা)	পা	-া	-া	I	-া	া	পা
সে	'ও০	ই'	সে	০	০		০	০	কে

পা	পা	-ধণা	ণা	ণা	-া	র্সা	ণা	-া I
ডা	কে	০ ০	ম	ধু	র্	তা	নে	০

২´			৩			০		
I ধা	ধা	-ণধা	পা	মা	-া	মা	-া	পা
কা	ত	০ র্	প্রা	ণে	০	"আ	য়	চ

১			১				২´		
(মা	মা	-া)	পা	মমা	মমা	I	মা	-ধা	ধা
লে	আ	য়	লে	আঁয়	ওরে		আ	য়	চ

৩			০			১			
ধা	ধা	-া	ধা	ধা	-পা	পধণা	ণা	পধণা	II
লে	আ	য়	আ	মা	র্	পা০০	শে"	'ও০ই'	

	২´			৩			০		
II	ধা	ধা	-া	পা	-া	পমা	মা	মা	-া
	ম	হা	০	সি	ন্	ধু র্	ও	পা	র্

১				২			৩		
া	না	না	I	না	-া	না	না	না	-র্সা
০	ব	লে		"আ	য়	রে	ছু	টে	০

০ ১ ২´
| র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সর্সা I র্সা র্রা র্সা |
আ য় রে ঝ রা হেথা না ই ক

৩ ০ ১
| ণা -ধা পপা | মা পা র্রা | (র্রা র্রর্গর্মা ননা)} |
মৃ ০ তু্য০ না ই ক জ রা০০ 'বলে'

১ ২´ ৩
| র্রা র্রা র্সননা I {না না -া | র্সা -া র্সা |
জ রা হেথায় বা তা স্ গী ০ তি

০ ১ ২´
| র্সা -র্রা র্সা | ণা ধা -পা I পা পা -ধপা |
গ ন্ ধ ভ রা ০ চি র ০০

৩ ০ ১
| মমা -গা রা | রা মা গা | রা রা ররা} I
স্নি গ্ ধ ম ধু মা সে হে থা০য়

২ ৩ ০
I মা মা -পা | পা পা -া | মা পা -র্সা |
চি র ০ শ্যা ম০ ল্ ব সু ন্

১ ২´ ৩
| র্সা র্সা -া I র্সর্রা র্সা -ণা | ধধা -পা পপা |
ধ রা ০ চি০ র ০ জ্যো ৎ স্না

০ ১
| পা ধা -া | পধণা ণা পধণা II
নী লা ০ কা০০ শে" 'ও০ই'

২ ৩ ০
II ধা ধা -া | পা -া পমা | মা মা -া |
ম হা • সি ন্ ধুর্ ও পা র্

১ ২´ ৩
| ননা সা সা I {রা রা -া | রা রা -গমপা |
বলে "কে ন ভু তে র্ বো ঝা • • •

০ ১ ২´
| রা রা -া | রা রা সসসা I মা মা -া |
ব হি স্ পি ছে, ভূতের্ বে গা র্

৩ ০ ১
| মা মা -া | মা মা -পধা | (পমা ননা সসা)} |
খে টে • ম রি • স্ মিছে, 'বলে কেন'

১ ২ ৩
| পা মা মমমা I {ধা ধা -া | ধা -া ধা |
মি ছে দেখ্ঐ সু ধা • সি ন্ ধু

০ ১ ২´
| ধা ণা ধা | পা -া -া I পা -ধা পা |
উ ছ লি ছে • • পূ র্ ণ

৩ ০ ১
| মা -া গা | মা ধা পা | (ধা ধধা র্সর্সা)} |
ই ন্ দু প র কা শে 'দেখ্ ঐ'

১ ২´ ৩
| ধা র্সা র্সর্সা I র্সা র্সা -া | নর্সা র্সা -া |
শে ভু তের্ বো ঝা • ফে• লে •

০ ১ ২´
| ণা ণা -া | ধা ধা -া I পা ধা পা |
ঘ রে র্ ছে লে • আ য় চ

৩ ০ ১
| মা গা -া | মা ধা -া | পধণা ণা পধণা II
লে আ য় আ মা র্ পা•• শে" 'ও•ই'

২´ ৩ ০
II ধা ধা -া | পা -া পমা | মা মা -া |
ম হা • সি ন্ ধুর্ ও পা র্

১ • • {২ ৩
| ননা না না I {না না -া | ননা না -র্সা |
বলে "কে ন কা রা • গৃ হে •

০ ১ • • ২´
| র্সা র্সা -া | র্সর্সা র্সা র্সর্সা I র্সর্রা র্সা -ণা |
আ ছি স্ বন্ ধ ওরে ও• রে •

৩ ০ ১ • • • •
| ধা পা -ধপা | মা পা -র্রা | (র্রর্রা ননা ননা)} |
মূ ঢ় •• ও রে • অন্‌ধ 'বলে কেন'

১ • • {২ ৩
| র্রর্রা র্রা র্সনা I {না না -া | র্সা -া র্সা |
অন্ ধ ওরে সে ই • সে • প

০ ১ ২।
| র্সর্রা র্সা -ণা | ধা পা পা I পা পা -ধণা |
র• মা • ন ন্ দ যে আ ••

৩ ০ ১ .
| ধা পা -মগা | রা গমা গা | (রা -া র্সা)) |
মা রে • • ভা ল• বা সে • 'ওরে'

১ ২´ ৩
| রা রা রা I মা মা -পা | পা পা -া |
সে কে ন ঘ রে র্ ছে লে •

০ ১ ২´
| মা পা -র্সা | র্সা র্সা -া I র্সর্রা র্সা -ণা |
প রে র্ কা ছে • প• ড়ে •

৩ ০ ১
| ধা পা -া | পা ধা -া | পধনা ণা পধণা IIII
আ ছি স্ প র • বা•• সে° 'ও•ই'

পূজার তত্ত্ব

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

সকল দেশেই প্রায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা মিলিয়া একটি বৈঠকের স্থান করিয়া, তাহার নাম 'ক্লব' দেন। ইহা এখন সর্ব্বত্রই প্রায় প্রচলিত। যখন সে দেশে প্রথম 'ক্লব' হয় তখন উৎসাহ দেখে কে? তখন সকলকার মনে উৎসাহ বিদ্যুতালোকের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাই সকলেই তার উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। খেলাধূলার খুব ধূমধাম ছিল। প্রত্যহ কয়েকজনে মিলিয়া টেনিস খেলিতেন। সন্ধ্যার সময় কখনো কখনো পিং পং খেলা হইত। প্রত্যহ নিয়মিত তাসের ধুম চলিত, দাবা পাশাও হইত।

তাহার উপর সকলকার সময়োপযোগী কথাবার্ত্তাও হইত। হাসি তামাসা মধ্যে মধ্যে তর্কে পরিণত হইত।

নীরদচন্দ্র যখন ক্লবে উপস্থিত হইলেন তখন দু-চারিজন মেম্বর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অভয় বাবু বলিলেন "এই যে নীরদবাবু, আসুন, আসুন। আজকাল ত আপনাকে দেখিতেই পাই না, ডুমুরের ফুল হলেন নাকি?"

নীরদচন্দ্র। আর মহাশয়, আপনাদের ত আর আমাদের মত ভাবনা নাই। দিব্যি আরামে আছেন। আমার যে কন্যাদায়।

বিশ্বেশ্বর বাবু কাগজ পড়িতেছিলেন; চক্ষু হইতে চশমা নামাইয়া বলিলেন, "কন্যাদায়! এরি মধ্যে? সে কি মশায়? আপনার কন্যা বালিকা মাত্র, এখনই বিবাহ!"

নীরদচন্দ্র। আমাদের যত শীঘ্র কন্যা পার হয় সেই ভাল। অভয় বাবুর ও বালাই নাই। আর আপনাদের ত অল্প বয়সে বিবাহ দিবার আবশ্যক নাই। আপনার ভাবনা কিসের? আমাদের ত মেয়ের বিয়ে দিতে হবে মনে হলে গায়ে জ্বর আসে। আর আজকালকার বাজার ত জানেন।"

রমেশ বাবু। আরে ছি, ছি, আজকালকার বাজারের কথা আর বলবেন না মশায়, মেয়ে নিয়ে মারা গেলাম। আর মা ষষ্ঠীর দয়ারও ত সীমা নাই। সুরমার বিয়ের জন্য কি নাকালই না হচ্ছি।

নীরদচন্দ্র। তা আপনাদের বামুন জাতে এখনো আমাদের জাতের মত দর কষাকষি চলে নি। আমাদের সব ওজনে চাই। একভরি সোনা কম হলে হবার জো নেই।

রমেশ বাবু। বিয়ে কোথায় ঠিক হচ্ছে?

নীরদচন্দ্র। নবীনকে চেনেন? আমার এক ক্লাস ফ্রেণ্ড। তাঁরই পরিচিত কোন ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এম-এ পড়্ছে। বাপ ইঞ্জিনিয়ার। রামসদয় দত্তের নাম শুনেছেন কি?

রমেশ বাবু। না মশায় নাম শুনিনি। তা বাপ বড়লোক, ছেলে এম-এ পড়ছে, এইত বেশ, তা খাঁই কত?

নীরদচন্দ্র। নগদ গহনার জন্য দুহাজার, বরাভরণের ও ফুলশয্যার জন্য পাঁচশো।

অভয় বাবু। তা দিয়ে ফেলুন, এত খুব সস্তা, এখনি দিয়ে ফেলুন।

নীরদচন্দ্র। বলা যত সহজ, কাজে করা কি তাই? দি কোথা থেকে মশায়? মাথাটি বাঁধা দিতে হবে দেখ্‌ছি।

রমেশ বাবু। মেয়ের যখন বিয়ে দিতেই হবে, একটু যদি কমাতে পারেন দেখুন। হাতের কাছে এমন পাত্র পেয়ে কি ছাড়া উচিত?

নীরদচন্দ্র। আমি নবীনকে লিখে দিয়েছি অত পার্ব্ব না, দেড় হাজারের মধ্যে হলে দেব।

বিশ্বেশ্বর বাবু কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"শুনুন, কি খবর, বাজে কথা ছেড়ে দিন, এখন আমাদের দেশের বাতাস কোনদিকে বইছে,—এ সময় মতিলাল নেহেরুর মত

লোক অনায়াসে জেলখানায় চলে গেলেন,—সি, আর, দাস একমাত্র পুত্র নিয়ে হাসতে হাসতে জেলখানাকে ঘর করে নিলেন,—সুভাস বসু আই-সি-এস পাশ করে, সে কাজও কেমন করে ছেড়ে দিয়ে লোককে কি শিক্ষা দিলেন। আর দলে দলে ছেলেরা কিসের মন্ত্রে, সব ছেড়ে জেলে যেতে উন্মত হয়েছে। এই সময় আমাদের দেশে পয়সা দিয়ে মেয়ে বিক্রি করা কি উচিত? কবি সত্যেন দত্ত কি লিখেন নি—

> কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
> পালনীয়া, শিক্ষণীয়া, রক্ষণীয়া মোটে নয়?
> ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে, করেন তারা সদ্‌গতি,
> কামড় তাদের অর্দ্ধরাজ্য, পরের ধনে লাখপতি।
> হায় অভাগ্য! বাঙলা দেশের সমাজ বিধির তুল্য নাই,
> কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই॥

আপনারা এই টাকা নেওয়াটার আর প্রশ্রয় দেবেন না।

রমেশ বাবু। এ একেবারে সত্য কথা। যার বাড়ীতে ২।৪টি কন্যা, সে বাপ মার রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। ভিটে মাটী উচ্ছন্ন গিয়ে ধারে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যাচ্ছে। কবির ভাষায় বল্‌তে হয়,—

> মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য অর্থপিশাচ হৃদয়হীন,
> করছে পেষণ, করছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রি দিন।
> পুত্রবন্ত বেহাই ঠাকুর, বেহাই জায়া বেহায়া,
> বামন অবতারের মত, বার করেছে তেপায়া।

আমাদের দেশে যে কি করে এই প্রথা যাবে তা'ত ভেবে উঠতে পারা যায় না। এখানকার ছোট লোকেরাও হাসে যে আমরা জামাই কিনি। আজকালকার দিনে, এই উন্নতিশীল সমাজে, ছেলেরা বাপ মার কথা না শুনে দিব্যি কলেজ স্কুল ছেড়ে জেলে যেতে প্রস্তুত হচ্ছে, বাপ মার কথা না শুনে ঘর ছেড়ে যাবে বল্‌ছে। গান্ধী মহাত্মার বাণী তাদের মর্ম্মে মর্ম্মে জেগে উঠেছে। বিবাহের সময় কিন্তু তারা বাপ মার খুব বাধ্য হয়ে পড়ে। তারা কি বাপ মাকে এ বিষয়ে বাধা দিতে পারে না? সে সময় তাদের দৃঢ়চিত্ততা কোথায় চলিয়া যায়? হীরার আংটি ও ঘড়ি, ঘড়ির চেনের বাহারটাই বেশী করেই চেনে। হঠাৎ মা বাপের এত বাধ্য সন্তান হয় যে মেয়েকেও চোকে দেখে না। তারপর বাসরঘর থেকে মুখের ভাবের কি পরিবর্ত্তন! একবারও বুঝেও দেখেনা যে একটি ছোট মেয়ের প্রতি কত অবিচার করা হচ্চে। দেখে শুনে যাচাই করে বিয়ে কল্লেই হত। বিয়ের পর আবার কি ব্যবহার। কথায় কথায় স্ত্রী ত্যাগ হচ্ছে, এ যেন পুরান কাপড় বা ছেঁড়া জুতা। আজকালকার এইত নব্য শিক্ষিত হিন্দু ঘরের ছেলে।

বিমল বাবু নব্য শিক্ষিত। তিনি বলিলেন,—"আপনারা কেন এতে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? নগদ

টাকা চাইলে বিয়ে দেবেন কেন? বিয়ে দেওয়াটা ত আপনাদের হাত। তার চেয়ে মেয়েকে লেখা পড়া শেখান। তাকে সুশিক্ষা দিয়ে বাপের কর্ত্তব্য পালন করুন, এমনভাবে মেয়ে বলি দিয়ে কি ফল?"

করালী বাবু একপাশে বসিয়া সব শুনিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে বিবিয়ানা শিখিয়ে কি লাভ? তাহলে তারা কি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পার্ব্বে? আমাদের শাস্ত্রেই আছে, স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীন, বয়সকালে স্বামীর অধীন, বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন। এ সব মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়ে কি লাভ হবে? ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন লাগান হবে।"

বিমলবাবু। কেন লেখাপড়া শিখলেই কি যত দোষ? আর তাতেই ঘরে ঘরে আগুন লাগবে? স্ত্রীকে উপযুক্ত করে নেওয়া কি উচিত নয়? তাদের এরূপভাবে বন্দী করে রেখে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু বাড়তে না দিয়ে, তারা যে পরাধীন সেই কথাই তাদের জন্মাবার পর থেকে কি জানিয়ে দেওয়া উচিত? পতি দেবতার পূজা কত্তেই হবে, তা সে যেমনই হউক না কেন, যত কষ্ট দিক না কেন?

করালীবাবু। নিশ্চয়ই; এইত আমাদের শাস্ত্রের বচন, আমাদের দেশে আমাদের ঠাকুমা, মা সবাই মেনে চলেছেন, আর মেয়েরাই বা পার্ব্বে না কেন? ছেলেবেলা থেকে তাদের যা কাজ তাই শিখুক। তারা ঘরের লক্ষ্মী ঘরের কাজ শিখুক। লেখাপড়া জানা যে একটু আদটু ভাল নয়—তা বলছি নে, একটু হিসাব রাখতে শিখুক, দুএকখান চিঠি লেখবার ও পড়বার মত বিদ্যে হলেই ঢের। ইংরাজী পড়বার কোন দরকার নেই, ম্লেচ্ছ ভাষায় বুদ্ধি শুদ্ধি সব বিগড়ে যাবে। তার চেয়ে সংস্কৃত শিখুক কাজ দেবে—দেবতা ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকবে। আজকাল বিবিয়ানা শিখেইত দেশ যেতে বসেছে।

বিমলবাবু। লেখাপড়া শিখে মেয়েদের উন্নতি হচ্ছে না? তারা নিজেরা কত কাজ কর্ত্তে পাচ্ছে, কত পথ আছে, বিয়ে না হলেও তারা কত কাজ কর্ত্তে পারে। মেয়েদের স্বাধীনতা দিন, দেখুন তারা কি চায়।

বিশ্বেশ্বরবাবু। আমিও ঠিক ওই কথা বলি, আমাদের সমাজে ছেলে মেয়েদের সমান স্থান না হলে কখনো সমাজের উন্নতি হবে না—

করালীবাবু। রেখে দিন আপনাদের সমাজ, চিরকাল আমাদের সনাতন প্রথায় যা হয়ে আস্‌ছে, তাই হওয়া উচিত।

বিশ্বেশ্বরবাবু। ইতিহাসে কি তাই লেখে? মহাভারত রামায়ণের সময় কি মেয়েদের এম্নি ধরে ধরে বিয়ে দেওয়া হত? তারা নিজেরাই পতি নির্ব্বাচন কর্ত্ত, তাদের কেহ এসে নির্ব্বাচন কত্ত না। মেয়েরা সভায় এসে দাঁড়াত, পথে ঘাটে চল্‌ত, ঘোড়ায় চড়্‌ত, যুদ্ধক্ষেত্রে

যেত, রাজ্য চালাত। সে সব কি সনাতন প্রথা নয়? এই নারী জাতি কত সম্মানের পাত্রী—কবি বলেছেন শুনুন—

"যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্য-ভেদ,
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ, সকল স্বেদ,
পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,
যাদের গৃহ, যারাই গৃহ, কর্ম্মে যারা উৎসাহ—
যাদের পূজায় দেবতা খুসী, যাদের লাগি ধনার্জ্জন,
পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি, দুঃখ ভোলা যাদের মন।
উচ্চে যাদের করবে বহন, উদ্বাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ? ক্লৈব পরের প্রত্যাশায়।
সত্যিকারের পুরুষ যারা, ফিরত নাক ভিখ্ মাগি
শিবের ধনুক ভাঙ্ত তারা, কিশোরীদের প্রেম লাগি।"

আমাদের দেশে মুসলমানের রাজত্ব এসেই সব গোল হয়ে গেছে। শুধু বাংলা দেশের দশা এই, নাহলে বম্বেতে, পঞ্জাবে, মারহাট্টা দেশে কোথাও এমন নিয়ম নেই।

বিমলবাবু। আমিও ত তাই বলছি। স্বাধীনতা না দিলে, কি করে মেয়েরা নিজকে চালাতে শিখবে? আর দেশের উন্নতিই বা কিসে হবে?

বিশ্বেশ্বরবাবু। মাতৃজাতির বিকাশ ক্রমশঃই এইরূপ বিবাহে নিকাশ হ'য়ে যাচ্ছে, তার উপায় কি?

করালীবাবু। আপনারা আলোকপ্রাপ্ত, আপনাদের কথা আলাদা, আমাদের সনাতন প্রথা মেনে নিতেই হবে।

বিশ্বেশ্বরবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইল। তখন তাড়াতাড়ি মহেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আমার গান শুনুন মশায়—কান্ত কবির গান, এখন ওসব তর্ক থাক।" এই বলিয়া তিনি হারমোনিয়মএ সুর দিয়া ধরিলেন—

"কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ
তাই বুঝে সংক্ষেপে কচ্ছি ফর্দ্দ সমাপন।
নগদ চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নি বেজার,
বলেন এবার বরের বাজার কসা কি রকম
কিন্তু তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে কি বিষম।"

গান শুনিয়া খুব হাসির কলরোল পড়িয়া গেল। পরে পরে আর কয়েকটী গানের পর, কেহ কেহ তাস খেলিতে ব্যস্ত হইলেন। নীরদচন্দ্র গৃহে ফিরিবার জন্য বাহির হইলেন, রমেশবাবুও

তাঁহার সঙ্গ লইলেন। কারণ, তাঁহারও বাড়ী ঐ পথে। পথে যাইতে যাইতে নীরদচন্দ্র বলিলেন—"মেয়ের বিয়ের কথা উত্থাপন করে ত আজ মহা মুস্কিল হয়েছিল। যার হয় সেই জানে, বিয়ে যখন দিতেই হবে তখন আর তর্কে কি প্রয়োজন ?"

রমেশবাবু। সে ত সত্য কথা। যা চিরকাল চলে আসছে তাকে ছেড়ে চলাত সহজ নয়। লোকবল, অর্থবল সব চাই, কি বলুন।

নীরদচন্দ্র। মনের বলও দরকার। সেটা যখন নাই তখন আর এসব বিষয় ভাবায় কোনও ফল নেই।

ক্রমে তাঁহারা নীরদবাবুর গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। নীরদবাবুর ছোট ছেলেটি ছুটিয়া আসিয়া একখানি হলদে খাম হাতে দিয়া বলিল, "বাবা, এই টেলিগেলাপ এসেছে।" নীরদচন্দ্র তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িয়া রমেশবাবুকে বলিলেন, "ললিতার ছবি দেখে পছন্দ হয়েছে; নগদ দু'হাজার গহনার জন্য, আর বরাভরণ ফুলশয্যা ইচ্ছামতন দিলেই চল্‌বে।"

রমেশবাবু। উচ্চ বাচ্য করে কাজ নাই। দিয়ে ফেলুন। আপনি সৌভাগ্যবান তাই বিনাক্লেশে এমন পাত্র পেয়ে গেলেন। যাই হোক আমাদের সন্দেশ খাওয়াটা ফাঁক পড়ে না যেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পর নীরদচন্দ্র অন্তঃপুরে গমন করিবামাত্র জগৎমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা কিসের টেলিগেরাম ? কারো অসুখ করেনি ত ?"

নীরদচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "না গো না, এইবার তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে। রামসদয় বাবু দেড় হাজারের স্থলে দুই হাজারে রাজী হয়েছেন, ফুলশয্যা বরাভরণ ইচ্ছামত দিলেই হবে। এই বৈশাখ মাসেই বিয়ে দিতে হবে, এখন কি কর্ব্ব তা বল ? পাত্রও ত চোকে দেখিনি।

জগৎমোহিনী। কাল চিঠি দাও যে তুমি গিয়ে পাত্রকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে যাবে, দিন তাঁরা ঠিক করে লিখুন।

নীরদচন্দ্র। এই কয় দিনে সব কি করে হবে ? টাকার জোগাড়, অন্য সব জোগাড় হয়ে যাবে কি ?

জগৎমোহিনী। যখনি বিয়ে দেবে তখনই ত ভাবতে হবে,—যেমন করে হোক জোগাড় কর্ত্তেই ত হবে,—যেমন করে পার দেনাপত্র করে ঠিক করে দিয়ে দাও। গয়না ত গড়াতে হবে না যে ভাবনা। নগদ গুণে ধরে দিতে হবে, এখনও প্রায় মাসখানেক আছে, সব হয়ে যাবে। মেয়ে আমার সুপাত্রে পড়বে, বড় ঘরে পড়বে, সুখে থাকবে, এই আমাদের ঢের। যাক্ ভগবান যে মুখ তুলে দয়া করে চেয়েছেন এই আমাদের ভাগ্যি।

তখন পিতামাতা দুজনে মিলিয়া কত সাধ আশা করিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায় কত আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। নিজেদের দুঃখ কষ্ট কিছুই মনে করিলেন না। ললিতার মা হাতের

চুড়ি কয়গাছি রাখিয়া সব গহনাগুলি বিক্রয় করিতে মনঃস্থ করিলেন, নতুবা অর্থে সঙ্কুলান হয় না। যেখানে যা কিছু ছিল সব কুড়াইয়া তিন হাজার হইবে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নিজেদের কষ্টে কি হবে.—মেয়ে ত সুখী হবে—এই হল তাঁদের প্রথম চিন্তা ও প্রধান চিন্তা।

নীরদচন্দ্র সপরিবারে বৈশাখ মাসের প্রথমে কলিকাতায় আসিলেন, বৈশাখের মাঝামাঝি বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। নীরদচন্দ্র তাঁহার এক আত্মীয়ের বাটী হইতেই বিবাহ দিবার স্থির করিয়াছিলেন। গহনা গড়াইবার হাঙ্গামা ছিল না। পাকা দেখার আগের দিন, নীরদচন্দ্র দু' এক জন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া কুড়িখানি ১০০৲ শত টাকার নোট গণিয়া দিয়া আসিলেন। সেই সময় একবার পাত্রটিকেও দেখিয়া লইলেন। বেশ দিব্য নধর চেহারা। নীরদচন্দ্রের মনটা বেশ প্রফুল্ল হইল। ফিরিবার পথে একজন সঙ্গী বলিল "মহাশয় সেদিন শুনেছিলাম, একজনরা মেয়ের বিবাহ দিবার ঠিক করে নগদ টাকাতেই সব সারলেন, বিয়ের রাত্রের খাওয়াটি ছাড়া, সব নগদে ধরে দিলেন। পাছে গোলমাল হয় তাই কালী বাড়ীতে গিয়ে মা কালীকে সাক্ষী করে দিলেন।"

নীরদ বাবুর আত্মীয় বল্লেন "আমাদের দেশে ক্রমে যে কি হবে তা বলা যায় না। ক্রমে ক্রমে ভদ্রতা আর কিছু থাকবে না। বিশেষতঃ এই কলকতা সহরে, লোকে আড়াআড়িতে কত কাণ্ড কচ্ছে। এখন মেয়ের বিয়েতে লুচি পোলায়ের সঙ্গে ইংরাজী ধরণও চাই। কেবল টাকার শ্রাদ্ধ, আর যে যত কর্ব্বে তারই তত গর্ব্ব বাড়ছে। যাদের আছে তারা যত ইচ্ছা করুক না কেন। গরীবের যে প্রাণ যায়। শুধু কি এই শেষ হল? এখন আবার বিয়ের পরই তত্ত্বর ধূম পড়বে। অনুষ্ঠানের ক্রুটী হবার যো নেই। বরের বাড়ী থেকে যেমন তেমন এলে বা না এলেও ক্ষতি নেই, মেয়ের বাড়ী থেকে ক্রুটি হবার যো-টি নেই। তা'হলেই সর্ব্বনাশ!"

পাকা দেখার দিন আর নীরদচন্দ্র বেশী খরচ করেন নাই। বরপক্ষীয়েরা ৮।১০ জন আসিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইল। রামসদয় বাবুর মেয়েটিকে পছন্দ হইল, আসল কথা তিনি সাদাসিদে লোক, মেয়েটি যখন আসিয়া প্রণাম করিল তাহাকেই পুত্রবধূরূপে দেখিয়া লইলেন, ভাল মন্দ বুঝিলেন না। গলায় একটি হার দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের তেমন সুবিধার মনে হইল না। যাইবার সময় পথে একজন রামসদয় বাবুকে বলিলেন "মশাই আপনার বেহাইকে বলবেন, বিয়ের রাত্রের খাওয়াটা যেন একটু ভাল হয়, ওঁরা পশ্চিমের লোক, কলকাতার কায়দা হয়ত জানেন না।"

বাড়ীতে সকলে ফিরিলে গৃহিণী হৈমবতী বলিলেন, "হাঁ গা, মেয়ে কেমন দেখলে?"

রামসদয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ মেয়ে।"

হৈমবতী। সত্যি বলছ? না ঠাট্টা করছ।

রামসদয় বাবু। না গো ঠাট্টা কর্ব্ব কেন, আজ বাদে কাল ঘরের বৌ হবে মিথ্যা কথার দরকার কি ?

হৈমবতী। রং কার মত হবে ?

রামসদয় বাবু। তোমার মত নয়, তোমার চেয়ে নিরেশ।

হৈমবতী। সে কি গা, এই না নবীন বাবু বলেছিলেন রং ফরসা !

রামসদয়। তা তোমার মত না হলে বুঝি রং ফরসা হয় না ? তুমিই না হয় একবার দেখে এসো।

হৈমবতী। না বাপু কুটুম বাড়ী যে, আমি যেতে পার্ব্বো না। তবে নরেশ যদি দেখে আসে ত দেখুক, তাকেইত ঘর কর্ত্তে হবে, কি বল ?"

রামসদয়। সে বেশ কথা, নরেশ একবার দেখে আসুক, আশীর্ব্বাদের আগে গেলেই ভাল হত।

হৈমবতী নরেশকে বলিলেন, "নরেশ, মেয়েটি তুমি একবার দেখে এসো, তা'হলেই বেশ হবে।"

নরেশ হাসিয়া মুখ নত করিয়া বলিল, "না মা, বাবা দেখে এসেছেন তা হলেই হবে। বাবা কি আর মিছে বলবেন ?"

হৈমবতী গিয়া স্বামীর কাছে বলিলেন, "নরেশ যাবে না ; সে বলেছে তুমি দেখেছ তাইতেই হবে।"

পাশ করা পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান তোমরাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। কথার মত তোমাদের মনটিও যদি সরল হত, সংসারে তা' হলে কত মঙ্গল হত।

নীরদচন্দ্র দু'চারিটি আত্মীয় লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেন। তিনি এক জোড়া সোণার বোতাম মাত্র দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। সেখানে উপযুক্ত সমাদর পাইয়া সকলে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে আসিলেন।

সোণার বোতাম দেখিয়াই ত হৈমবতী জ্বলিয়া উঠিলেন। কলিকাতা সহরে কি গহনা মেলেনা ? এই পিতলের মত ইংরাজী সোণার বোতাম, না আছে পাথর, না আছে হীরা মুক্তা। তিনি বড় ভাবনায় পড়িলেন। তবে ত ফুলশয্যা যা আসিবে জানা যাইতেছে।

বিবাহের দিন তাঁহারা ধূমধাম করিয়া অধিবাসের তত্ত্ব পাঠাইলেন, জিনিস যত হোক না হোক লোক সংখ্যা তার বেশী। ছোট ছোট থালা ধরিয়া সারি সারি লোক আসিয়াছে। সে গুলির আদর অভ্যর্থনা ঠিক না হলেই বিপদ ;' তাদের সন্তুষ্ট করিলে তবে বেহাই বাড়ীর সকলে সন্তুষ্ট হইবেন। প্রত্যেকের হস্তে এক একটি রৌপ্য মুদ্রা দিতে হইবে। তাদের আহারাদির পর নীরদচন্দ্রের নিকট সংবাদ আসিল আরও মাছ তরকারীর দরকার। বৈকালে খাওয়া দাওয়ার জন্য আরো কিছু মুদ্রা খসিল।

বরের পিতা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বর এম-এ পড়িতেছেন, তবু যেন বেচা কেনার মত বিবাহ। আমাদের দেশে কনের বাপ নগদ টাকা দিয়া মেয়ের কাছে চিরকালের গোলামী করিবার জন্য বর কিনিয়া দেন। আর বরের বাপ শুধু রৌপ্য মুদ্রার লোভে নিজের সার ধনকে বাজারের দ্রব্যের মত বিক্রয় করিয়া বসেন। ইহা আজকালকার দেশাচার। যে যত ধনী তাঁর আকাঙ্ক্ষাও তত বাড়িয়া চলে,—তাঁরাই অধিক মূল্যে পুত্র বিক্রয় করেন। ঘর নাই, কুল নাই, বংশ মর্য্যাদা নাই, সুন্দরী নাই, শিক্ষিতা নাই, গুণবতী নাই, শুধু টাকা! হায় টাকা! তুমি মহিমময় বট, কিন্তু তুমি যে স্থায়ী নও এই যা দুঃখ। তোমার মায়ায় বদ্ধ হইয়া কেন লোকে আত্মমর্য্যাদা হারায়, সে কথা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই।

বিবাহের সময় সময় নীরদচন্দ্রের আত্মীয় কুটুম্বেরা বলিলেন, "মেয়েকে কি কি গহনা দান করিবে? গহনা কোথায়?"

নীরদচন্দ্র বলিলেন, "গহনা তাঁরা লইয়া আসিবেন।"

খুব ধূমধামে, ইংরাজী বাদ্য বাজাইয়া, আলো করিয়া, চার ঘোড়ার গাড়ীতে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়া বর বিবাহ করিতে আসিলেন। বিবাহের সভায় বরের পিতা এক বাক্স গহনা বাহির করিয়া দিলেন, সে অনেক গহনা। বাড়ী শুদ্ধ লোকের সব গহনা একত্রিত করিয়া আনা হইয়াছিল। সে সোণার মুকুটের বাহার কত! মুক্তার সেলি, জড়োয়া বালা, সাত নর, সকলি মহামূল্য। সকলে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। নীরদচন্দ্র ও জগৎমোহিনী দেখিয়া পুলকিত হইলেন। সেই সকল মহামূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে সেই সুশিক্ষিত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করা হইল। নীরদচন্দ্রের সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া সকলেই মুখে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তবে এত সহজে, এত সুলভ মূল্যে, এমন পাস করা ধনী জামাই পাওয়া গেল দেখিয়া অনেকের অন্তরদাহও হইল।

বিবাহের ক'নে শ্বশুরবাড়ী গেল। শাশুড়ী অপ্রসন্নমুখে বউ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি পালনের পর হৈমবতী রামসদয় বাবুকে গিয়া বলিলেন, "এই তোমার সুন্দরী মেয়ে? কটা চুল, কগাছাই বা মাথায় আছে; চোক দুটি মোটে সুন্দর নয়, রোগা, কি মেয়েই তুমি এনে দিয়েছে। তখনি আমি জানি নবীন বাবুর চালাকি। এ রকম শত্রুতা করে কি লাভ হল?"

রামসদয় বাবু। আমিত কিছু মন্দ দেখছিনা। তুমিও ভালবেসে দেখো, সুন্দর লাগবে।

হৈমবতী। পোড়া কপাল সুন্দরের। আমার অমন সুন্দর ছেলের কিনা এই কাঠের তক্তার মত বউ এনে দিলে?

রামসদয় বাবু বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া সে যাত্রা প্রাণ বাঁচাইলেন।

নরেশচন্দ্র মার কাছে আসিয়া বিবাহের আংটিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই আংটি দিয়েছে, দেখেছ ?"

হৈমবতী। সবি দেখ্‌ছি বাছা। চোকে ভেল্কির খেল লাগিয়ে দিয়েছে; কেমন সব দেখলে ?

নরেশচন্দ্র। দেখবো আবার কি? তোমরা আমায় জবাই করেছ তাই মনে হচ্ছে। ওইত মেয়ের রূপ। বাবা কি বলে সুন্দরী বল্লেন ? আমার চেয়ে ঢের রং কালো।

হৈমবতী। তোমায়ত দেখতে বলেছিলুম—

নরেশচন্দ্র। বাবা দেখেছেন, আর ছবির সঙ্গেত কিছুই মেলে না।

হৈমবতী। আর কি হবে, এখন আরত ফেলতে পার্ব্বোনা—

নরেশচন্দ্র। তুমিই রেখো, আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত !

পুত্র চলিয়া গেল। হৈমবতী গর্ব্ববিস্ফারিত নয়নে পুত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনিও যে কন্যার মা সে কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁর সোণার চাঁদ ছেলে যে বউয়ের মুখ দেখে ভুলে যায় নাই, সেইটেই তাঁর পরম তৃপ্তির কথা হল। পুত্রসৌভাগ্যে হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

ফুলশয্যার দিন সকালে নীরদচন্দ্র সংবাদ পাইলেন ভালরূপ তত্ত্ব করিতেই হইবে, নতুবা কোন মতে চলিবে না। তিনি ফুলশয্যায় যাহা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়া জিনিসপত্র অল্পদামে কিনিয়া অনিয়াছিলেন, আবার যা যা পারিলেন সব ফিরাইয়া, তাঁহার যতদূর সাধ্য তিনি যোগাড় করিয়া ফুলশয্যা পাঠাইলেন। যাহা ব্যয় করিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহাপেক্ষা ঢের ব্যয় বেশী হইল। বিদেশে কে টাকা ধার দিবে,—স্ত্রীর চুড়ি কয়গাছিও বিক্রয় করিতে হইল। হাতে শাঁখা দিয়াও জগৎমোহিনীর মুখে হাসি ধরেনা, মেয়ে বড় ঘরে পড়িয়াছে, সুখী হইবে। কত আশা !

ফুলশয্যার তত্ত্বও হৈমবতীর মনোমত হইল না। রূপার বাসন মোটে দুটি, তাও ফঙ্গবেনে, —ছুঁতে গেলে যেন বাতাসে উড়ে যায়। কাঁসার দান সামগ্রী কি ছোট ছোট. কেন তাঁরাও ত মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন, রূপার ঘড়া থেকে আরম্ভ করে কি দেন নাই ? খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল সব দিয়েছেন। আজকালত জামাইয়ের ঘর সাজিয়ে দেবার নিয়ম। আহা কি অন্যায়ই করেছেন— চৌধুরীরা লাখপতি—কি বিষয় তাদের—মেয়েটি নিয়ে কত সাধাসাধি কল্লে, কি দুর্ব্বুদ্ধি হল তখন— বিয়ে দিলেন না। মেয়েটি কাল—তা হলেই বা ? কটা রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন ? তবু ওইত রংয়ের ছিরি, যদি নিজের বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলের মতও সুন্দরী হত বর্ত্তে যেতেন। আর কটা লোকই বা তত্ত্ব নিয়ে এলো। বরের জলখাবার কিনা একটা কাঁসার থালায় এলো, জামাই সেই ফল খাবে ? কি বলে মা হয়ে এই শুভ কর্ম্মের দিন কাঁসার থালায় খাবার তুলে দিবেন ? বাড়ীতে দামী দামী রূপার রেকাব রয়েছে। মনের দুঃখ মনে রেখে কোন রকমে শুভ কর্ম্ম সেরে ফেললেন।

বিবাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল। নীরদচন্দ্র বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,

"এইবার তাঁকে কার্য্যস্থানে যাইতে হইবে। যদি মেয়েকে এই সঙ্গে পাঠান তাহলে সব দিকে সুবিধা হয়।" রামসদয়বাবু অন্দরে গিয়া গৃহিণীকে এই আবেদন জানাইলেন। হৈমবতী বলিয়া উঠিলেন, "না, না, মেয়ে এখন পাঠাব না। আমরা নিয়ে যাব। এখন সেখানে গিয়ে দরকার নেই।"

রামসদয়বাবু। ছেলেমানুষ,—এইবার পাঠাও, পরে আনিও।

হৈমবতী। তোমার পরামর্শে যা হবার হয়েছে, এখন আর কোন কাজে হাত দিওনা। আমি যখন পাঠাব না বলেছি, পাঠাবনা।

রামসদয়বাবুর বাহিরে খুব নামডাক। ইঞ্জিনিয়ার লোক, তাঁর ভয়ে সকলে তটস্থ। কিন্তু গৃহিণীর নিকট তাঁর মুখে কথা বাহির হইত না। বেদবাণীর মত সকল আজ্ঞাই তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইত।

রামসদয়বাবু নীরদচন্দ্রকে গিয়া বলিলেন, "এখন দিন কতক থাক। কার্য্যস্থানে বৌমাকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানেই সব জানাশোনা লোক, আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তে চাইবে। পরে পাঠাইয়া দিব। এই কটা মাস বাদে পূজার সময় আপনি একবার এসে নিয়ে যাবেন, তাহলেই ত বেশ হবে।"

নীরদচন্দ্র বলিলেন, একবার মেয়ের সহিত দেখা করিয়া যাইবেন। রামসদয় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, এবার আর অনুমতি গ্রহণ করিলেন না।

পিতাকে দেখিয়া ললিতার দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। পিতার হাত ধরিয়া বলিল "বাবা, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।" হায় পিঞ্জরের বিহঙ্গিণী। এখন তুমি কারারুদ্ধ। দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাইবার আর তোমার অনুমতি নাই। এই পিঞ্জরও সুখের হয়, যদি আদর যত্ন পাওয়া যায়, বালিকার মন অনায়াসেই সেই নূতন স্থানে বসিয়া যায়। বনের পশু, পক্ষী, মূক প্রাণী,—বশ মানে, আর শিশু বালিকা বশ মানিবেনা? বিবাহের পরই যে তার শিশুকাল চলিয়া গিয়া তাহাকে এক অপূর্ব্ব স্থানে বসাইয়া দেয়, যেখানে সে নিজেই কোনও কূল পায় না।

নীরদচন্দ্র অশ্রুসজলনেত্রে মেয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। তাহার কয়েকদিন বাদে সপরিবারে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

ললিতার মা ফিরিয়া আসিবার পর তাঁর পরিচিত মহিলারা সব আসিয়া দেখা করিয়া "কেমন বিবাহ হইল?" "ললিতা কেন এলোনা?" "জামাই কেমন?" "কি দিয়াছে?" এই সব প্রশ্ন তাঁহাকে করিতে লাগিলেন। ললিতার মা বিশেষ সন্তোষজনক কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। কি দিবেন? বিয়ের কনেকে পাঠায় নাই, সেই যে মেয়েকে বাসি বিয়ের দিনে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া এসেছেন আর চক্ষে দেখেন নাই, এ কষ্টে তাঁর মন জ্বলিয়া যাইতেছিল। তবু তিনি সংযত হইয়া বলিলেন, "ললিতাকে এখন পাঠাননি, পূজার সময় পাঠাবেন বলেছেন।"

"তা জিনিস পত্তর কেমন দিলে থুলে?"

"বিয়ের দিন ত এক বাক্স গহনা এনেছিলেন, তাই পরিয়ে নিয়ে গেলেন! আমরা ত নগদ বয়েই দিয়েছিলুম।"

তন্মধ্যে একজন বলিলেন "তা জামাই কেমন হল ?"

জগৎমোহিনী। সেইত বিয়ের রাত্রে আর বাসি বিয়ের দিন দেখেছি, দেখতে ত বেশ।

তন্মধ্যে একজন বলিলেন, "আহা বেঁচে থাক, সুখী হোক। তোমার প্রাণ শীতল হোক।"

তাঁরা যে যার ঘরে ফিরিয়া গিয়া কেহ কেহ বলাবলি করিলেন, "বড় ঘরে কুটুম্বিতা করে লতার মারও মেজাজ হয়েছে।"

এদিকে হৈমবতী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া স্বামীর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

আষাঢ় মাসে রথের তত্ত্ব ২০৲টি টাকা মণিঅর্ডারে আসিল দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। এ কি রকম কুটুম! এ কি ঘরে ছেলের বিয়ে দিলেন! ডাক্তারি করে শুনে, না দেখে না শুনে দিয়ে তিনি কি অন্যায় কাজই করেছেন। 'আচ্ছা সামনেই ত পূজার তত্ত্ব—সে সময় কি করে দেখি, যদি তেমন তেমন হয়, দেখিয়া লইব।

হায় বঙ্গদেশের জননী, তোমার এ কি অধঃপতন মা! তুমিও ত কন্যার জননী, কন্যার মায়ের প্রাণ কি তুমি ভুলিয়া গেছ? আজ পুত্রের জননী হইয়া তোমার একি ভাব? এ কলঙ্ক কালিমা শীঘ্র ধুইয়া ফেলিয়া জননী মুর্ত্তি ধর, বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হোক।

ললিতা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা, সে পশ্চিমে লালিতা। বাঙ্গালা দেশের কথা সে কিছুই জানিত না। সংসারের কোনও জ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। সে যেখানে থাকিত অত বিবাহের ঘটাও ছিল না, নববধূদিগের মধ্যে স্বামীর প্রণয় কাহিনীরও আলোচনা নাই, কাজেই সে বিষয়ে সে একেবারে অজ্ঞ। বাপ মার আদরের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কথায় কথায় "বুড়ো ধাড়ী এটুকু জান না, মা বাপে কি কিছু শেখায় নি, এঁটোর বিচার নেই, জাতের বিচার নেই, এসব ম্লেচ্ছপানা কেন।" শুনিয়া শুনিয়া তার ভয়ে সর্ব্বদা মুখ শুকাইয়া যাইত। ক্রমাগত মুখে ঘোমটা টানিয়া চোখের জল লুকাইবার চেষ্টা করিত। বার বছরের মেয়ের কোনও জ্ঞান নাই কেন? তার যে বিবাহের পর দিনই মায়ামন্ত্রে সব জানা উচিত ছিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী যদি মায়ের মত স্নেহে বালিকাকে কোলে টানিয়া মিষ্টি কথায় সব শিখাইতেন, সে যে দুদিনে পোষা পাখীর মত সব শিখিয়া লইত। ভয়ের স্থানে ভালবাসায় কৃতজ্ঞতায় প্রাণ পূর্ণ হইত। হৈমবতী কি তাঁর নিজের বধূ অবস্থা সব ভুলিয়া গেছেন? না তিনি যে নিগ্রহ সহিয়াছেন সব এই বধূর উপর শোধ তুলিবেন? তিনি দেখিলেন যে কলিকাতার মেয়েরা যেমন চালাক চতুর হয়, এ মেয়ে তেমন কিছুই নয়। একটুও কাজ কর্ম্মের শ্রী নাই। একদিন ভাত খাইবার সময় বাঁ হাতে জলের গ্লাস ধরিয়া মুখে জল ধরিল।' তাঁর ত চক্ষু স্থির, আবার কিনা সেই এঁটো হাত লইয়া মাথায় দিল। কি ম্লেচ্ছের ঘরেরই মেয়ে এনেছেন। ছিঃ, ছিঃ! তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্নান করান হইল। বলিদানের ছাগশিশুর মত ললিতার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। তজ্জন্য তাকে আরো তিরস্কার শুনিতে হইল—"দোষ করে বুড়ো ধাড়ীর আবার ন্যাকা কান্না, ওসব চালাকী এখানে চলবে না।"

হৈমবতী তারপর শুনিলেন, ললিতার মা পূজা করে না, এখনও মন্ত্র লন নাই। তাঁহারা যার তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যান। অখাদ্য কুখাদ্যও তা'হলে খান। তা'হলে ত তারা ব্রহ্মজ্ঞানীদের দল। তবে তাঁরা পরের জাতি নষ্ট করবার জন্য এমন ঘরে কেন মেয়ের বে দিলেন? তিনি প্রাণপণে ললিতাকে আচার বিচার শিখাইতে ব্যস্ত হইলেন।

মা ত বৌকে আচার শিখাইতে ব্যস্ত, পুত্র তখন প্রণয় লইয়া ব্যস্ত। ললিতা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা—প্রণয়ের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। নরেশচন্দ্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি স্ত্রীর সহিত প্রণয়চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে সেকালের প্রণয় নহে, আধুনিক ইংরাজী সমাজের সভ্যতার অনুকরণে। ললিতা না পারে উত্তর দিতে, না বুঝে সে সব কথা। নরেশচন্দ্রের আবার অভ্যাস—বাংলার সহিত ইংরাজী বলা। ললিতা ইংরাজী ফার্ষ্টবুক মাত্র আরম্ভ করিয়াছিল সে কিছুই বুঝিতে পারে না। সে স্বামীকে দেখিলেই ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পড়িত, তাহার মনে হইত শাশুড়ীর বকুনিও এর চেয়ে ভাল, আর সহজ। নরেশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এই বুনো মেয়েকে লইয়া কি করিবেন? তাহার সহিত কোন কথা কহিলেই সে মা বাবার কথা কয়, ভাই বোনের গল্প করে, না হয় ত তার পোষা বেরাল ছানাটির জন্য দুঃখ করে।

নরেশচন্দ্র মায়ের নিকট গিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ মা। আমিত কোনমতে একে নিয়ে ঘর করতে পারি না। আমি এর আশা ছেড়ে দিলুম।"

বঙ্গের ঘরে ঘরে কত নরেশচন্দ্র আছে তার সংখ্যা নাই। বাহিরে তাঁরা দেশের জন্য মাতিয়া উঠেন, ঘরে মাতৃভক্ত হন, আর নব বিবাহিতা বালিকা বধূর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দু'চার দিন দেখেন, তারপর নির্য্যাতনের পালা আরম্ভ হয়। যত দোষ সেই বালিকার উপর পড়ে। কেন, বিবাহের পূর্ব্বে যেমন করিয়া মেকি টাকা বাজাইয়া লওয়া হয়, সেই রকম ছুড়িয়া ফেলিয়া মেয়েও বাজাইয়া লইলেই ত হয়। তা হলেত এই বালাই থাকে না। পছন্দ হয় বিবাহ কর, না হয় করিও না। বাপ মাকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অন্যের সর্ব্বনাশ করা কেন? অন্যের প্রাণে এ আঘাত দেওয়া কেন? এই পাপে যে দেশ যাইতে বসিয়াছে, এই নারী জাতির মর্ম্মবেদনা কি সেই অন্তর্য্যামা দেবতার পায়ে পৌঁছিতেছে না? নারীর অপমান কি তিনি সহিবেন? তিনি দেখিতেছেন; ভরা ভারি হইলেই নৌকা ডুবিবে। যখন হিন্দুমতে বিবাহ করিবে, পিতা মাতার বাধ্য হইবে, তখন স্ত্রীকে তার নিজের পদ দিবে। বালিকাবধূর প্রতি অযথা অন্যায় কখনও করা উচিত হয় না। কথায় কথায় শাসন, কথায় কথায় পরিত্যাগ,—এযেন একটা খেলার সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য এটা বেশী দিন থাকে না—দু'চার বছর; সেই অগ্নি পরীক্ষায় যে বালিকা টিঁকিয়া যায় সেই জয়ী হয় ও আপন অধিকার সময়ে পায়। অনেকেই সেই অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হইয়া অকালে শুকাইয়া যায়। তাহার আর ফুটিবার অবসর হয় না। (আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

লোক শিক্ষায় আমেরিকার মুক্তহস্ততা

শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যত অর্থ ব্যয় হয়, এত আর কোথাও হয় কিনা বলা সুকঠিন। যেমন গভর্ণমেণ্ট তেমনি জনসাধারণ শিক্ষার জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় করেন। দাতাকর্ণ কার্ণেগীর দানের কথা বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও অজানা নাই। মৃত্যুকালে ইনি ইঁহার অগাধ সম্পত্তির এক অংশ মাত্র টাকা শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য ব্যয় করবার উইল ক'রে যান। ঐ উইলে শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের জন্য ব্যয় ছাড়া আর একটী নূতন রকমের উল্লেখ ক'রে গেছেন। যারা কোনও বিশেষ জ্ঞানের, শিক্ষার বা জগতের উন্নতির কাজে নিজেদের জীবন ব্যয় ক'রবেন তাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করা। শিক্ষা বিভাগে যারা কাজ করেন, তাদের বৃত্তি বা বেতন এত কম যে তাদের অভাব চিরস্থায়ী থাকে। তাই অনেকের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাক্‌তেও অর্থাভাবে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার ও জগতের উন্নতির জন্য দিতে পারেন না। কার্ণেগীর নূতন নিয়মে কিন্তু আমেরিকার এই অভাবের অনেকটা পূরণ হয়েছে।

গত ১৫ বৎসর মাত্র এই ফণ্ড্ স্থাপিত হয়েছে। ইতিমধ্যে উহা হইতে ৯০৯ জন শিক্ষা বিভাগের বিশিষ্ট লোককে পেন্সন বা বৃত্তি হিসাবে মোট ৭,৯৬৪,৩৯৯ ডলার (১ ডলার বর্ত্তমানে প্রায় ৩৷৷০ টাকা) দেওয়া হয়েছে।

ইহার মধ্যে এ দেশের ৩টী সুবিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রের বিশিষ্ট শিক্ষককে, (হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে ৬২৫০০০ ডলার, ইয়েল (yale) বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজনকে ৫৪৮০০০ ডলার ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজনকে ৪৬৪০০০ ডলার) ও অন্য ১৬টী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে মোট ৩২০০০০০ ডলার, এবং বাকী টাকা ৮০টী বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রকে শিক্ষার উৎসাহেব জন্য দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কার্ণেগীফণ্ডে মোট ২৪,৬২৮,০০০ ডলার আছে, ইহার ১৫,১৯২০০০ ডলার কায়েমী (Permanent General Endowment)ফণ্ড্; ৭,৫৭১০০০ ডলার আগামী ৬০ বৎসরের জন্য পেন্সন্‌ফণ্ড্; ১,২৫০,০০০ ডলার শিক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধান ফণ্ড্ (Educational Enquiry); ৬৯০,০০০ ডলার শিক্ষাকেন্দ্র সাহায্য ফণ্ড্।

একমাত্র কার্ণেগীই যে শিক্ষার জন্য দান করেছেন, এধারণা যেন কেউ না করেন। অবশ্য কার্ণেগীর দানের পরিমাণ বেশী, অন্য অনেক ধনী, সাধারণঅবস্থাসম্পন্ন ও এমন কি অনেক দরিদ্রও তাদের সাধ্যানুযায়ী দান বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রকে করে গেছেন। আজ যদি আমেরিকার শিক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে এইরূপ সাধারণের দানের টাকাগুলি তুলে নিয়া কেবল গভর্ণমেণ্টের টাকা রাখা যায় তবে অধিকাংশ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। যতগুলি শিক্ষাকেন্দ্র এরূপ সাহায্য পাচ্ছে তাদের সম্পূর্ণ তালিকা দিতে অনেক যায়গার আবশ্যক। মোট ৬০১টী বিশ্ববিদ্যালয়

ও কলেজের মধ্যে ১২৬টী ১০০০০০০ ডলার হইতে ৪৫০০০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত সাধারণের দান পাইয়াছে। বাকীগুলি এত বেশী না পেলেও কয়েক হাজার থেকে লক্ষ পর্য্যন্ত অনেকে পাইয়াছে, এখানে বিশেষ কয়েকটীর নাম উল্লেখ করছি।

নাম	পরিমাণ	১৯২১—২২	
		ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা
১। হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫,০০০,০০০,	৭৪৪৫	৮৯১
২। কলম্বিয়া ,,	৩৪,৪৭৩,৩০৪	২৫৭৩৪	১৫০৬
৩। চিকাগো ,,	৩০,০০০,০০০	১১৩৬৫	৩৭৭
৪। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ,,	২৭,৪২৬,২৩৫	১১১৮২	৯৬৫
৫। ষ্ট্যান্‌ফোর্ড ,,	২৬,২৬১,৯৪১	২৪৯৫	৩৩৩
৬। ইয়েল ,,	২৪,০০০,০০০	৩৮২০	৫৮৭
৭। কর্ণেল ,,	১৭,০৯৭,৯২১	৫৭০০	৭০০
৮। রচেষ্টার ,,	১৫,২০১,২৯১	১৫৫৮	৫৫
৯। বষ্টন্‌টেক্‌নলজি ,,	১৫,০০০,০০০	৩৪৩৬	৩৫৭
১০। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	১২,৯৪৩,৩৯৩	৩৫৪৬	১০০
১১। প্রিন্স্‌টন্ ,,	১০,৬৮০,০৮০	১৯৬৭	২১৩
১২। টেক্‌সাস্ ,,	১০,০০০,০০০	৪০৭০	২৫২
১৩। রাইস্‌ইনষ্টিটিউট্	১০,০০০,০০০	৭৩৬	৫৫
১৪। জন্‌স্‌হপকিন্‌স মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১০,০০০,০০০	৬৪৮৭	৩৯০

ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে আমেরিকার জনসাধারণ দেশের শিক্ষার জন্য কত অর্থ ব্যয় করেন। উপরোক্ত ৬০৩টী ছাড়া বহু প্রাইভেট স্কুল ও কলেজ আছে। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট অনুসারে ১৯১৭-১৮ সালে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২২৩,৮৪১ ছাত্র ও ১৫১৫১৮ ছাত্রী পড়িয়াছে। একমাত্র নিউইয়র্ক ষ্টেটেই ২৯৬৩১ ছাত্র ও ১৫৮৯৫ ছাত্রী পড়েছে। এই সকল কলেজের লাইব্রেরীতে মোট ২৩,০০০,০০০ খানা বই আছে, (এ ছাড়া সাধারণ লাইব্রেরী ত আছে)। সমস্ত কলেজগুলির বই, যন্ত্রাদি ও আস্‌বাব পত্রের মূল্য মোট ৮৯,৭৬৬,৭৯৩ ডলার; জমির মূল্য ১০৪,০৬৯,৪৮১ ডলার; বাড়ীর মূল্য (ছাত্রাবাসের মূল্য ৫৫,১৪৩,০৪৫ ডলার) ৩২৯,৯৮৭,৫৫৮ ডলার; এবং মোট ১৬৬০৯ জনে ছাত্রবৃত্তি (Scholarship) পাইতেছিল।

ঐবৎসর ১৩১৬০ ছাত্র ও ৬৪৩ ছাত্রী ডাক্তারী; ১০৯৯৮ ছাত্র ও ৮২২ ছাত্রী আইন; ৮৫৭৩ ছাত্র ও ৭৮০ ছাত্রী ধর্ম্মশাস্ত্র (Theology), ১২৫০ ছাত্র মাত্র পশুর ডাক্তারী (Veterinary medicine); ৮১৮৫ ছাত্র ও ১২৯ ছাত্রী দাঁতের ডাক্তারী (Dentistry); ৩৫৯৭ ছাত্র ও ৪৫৬ ছাত্রী কম্পাউণ্ডারী; বাকী ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্ট্‌স্ ও সায়েন্স্ পড়ে।

এইবার প্রাথমিক ও হাইস্কুল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জানাচ্ছি। জন সাধারণের দান হাই স্কুল পর্য্যন্ত খুব বেশী দেখা যায় না, তবে একেবারে নাই তাহা নয়। অনেক সহৃদয় লোক নিজের

বা মা বাবার নামে স্কুল স্থাপন করেছেন—তার সম্পূর্ণ খরচ তার সম্পত্তির উপর। শুধু গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে চলে। কতকগুলি স্কুল Y. M. C. A., Y W. C· A. প্রাইভেট স্কুল ইত্যাদিতে গভর্ণমেণ্ট কোনও খরচ দেন না। তবে গভর্ণমেণ্টের মতানুযায়ী কাজ করা হয়। বাকী সমস্ত স্কুল গুলি গভর্ণমেণ্টের খরচে চালিত হয়।

১৯১৮ সালে যুক্তপ্রদেশে ৫—১৮ বছর বয়স্ক লোকের সংখ্যা মোট ২৭,৫৮৬,৪৭৬ জন। এর মধ্যে ২০,৮৫৩,৫১৬ জন স্কুলে যায়। (বাকীগুলি বিদেশীয় বলিয়া আইনানুসারে শিক্ষা বাধ্যতা-জনক নয়) এই লোকগুলির শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টকে মোট ১০৫,১৯৪ জন শিক্ষক, ও ৬৫০,৭০৯ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করতে হয়। এদের মোট বেতন লাগে ৪২৬,৪৭৭,০৯০ ডলার এবং এই শিক্ষার জন্য দেশের সর্ব্বসমেত খরচ হয় ৭৬৩,৬৭৮,০৮৯ ডলার।

এদেশে হাইস্কুল পর্য্যন্ত পড়ার সমস্ত খরচ গভর্ণমেণ্ট দেয়। বেতন ত' লাগেই না, তাছাড়া বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, কালী, দোয়াত, নিব, ব্লটীং পর্য্যন্ত বিনামূল্যে দেওয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলে ব্যায়াম, সামরিক ড্রিল, যুক্তপ্রদেশের ইতিহাস, ইংরাজী ভাষা ও অগত্যা অন্য আর একটী ইউরোপীয় ভাষা ও স্বাস্থ্যনীতি বাধ্যতা নিয়মে সকলকে শেখান হয়। অনেক যায়গায় ছেলে-মেয়েদের একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ান হয়, আবার কতক যায়গায় ভিন্ন স্কুল আছে। এদেশের সকল স্কুল কলেজ জুনের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ থাকে। কিন্তু ঐ সময়ের জন্য শিক্ষককে বেতন দেওয়া হয়।

যথেষ্ট টাকা থাকায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করতে পারেন, এবং আবশ্যকানুযায়ী যন্ত্রাদি যোগাইতে পারেন।

শুধু স্কুল কলেজে পড়লেই জ্ঞান পূর্ণ হয় না এধারণা এদেশে অনেকের আছে। তাই দেখা যায় অধিকাংশ লোকে কলেজ শেষ ক'রে দেশভ্রমণে যায়। যার পয়সা আছে তার ত কষ্ট নাই। কিন্তু যার অবস্থা তেমন ভাল নয় তারও চেষ্টার ক্রটী নাই, অনেকে জাহাজে নানা রকম চাকরী নিয়ে দেশভ্রমণে যায়।

তা'ছাড়া (বোর্ড অফ্ এডুকেশন) শিক্ষা বিভাগ সাধারণের জ্ঞানের জন্য পাব্লিক (লেকচার) বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। যারা চাকরী করেন, বা দিনের বেলায় ব্যবসা করেন এবং বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের জন্য, নানাস্থানে নানা বিষয়ের বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে। শুধু যে আমেরিকার লোক দিয়া এ বক্তৃতা দেওয়া হয় তা নয়। বিভিন্ন দেশীয় লোক দিয়ে বিভিন্ন দেশের কথা বক্তৃতা দেওয়ান হয়, (এবৎসর আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লওয়া হইয়াছে)। সন্ধ্যার পর কন্সার্ট বা ভাল বাজনার ব্যবস্থা করা হয়। হাজার হাজার লোক এই সমস্ত সুযোগ লইয়া নিজেদের জ্ঞান ও আমোদ বৃদ্ধি করে।

শ্রীশরৎ মুখার্জি

বাংলার নবযুগের কথা

দশম কথা

সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র

(১)

কোনও সমাজে নূতন চিন্তা ও ভাবের প্রেরণায় যখন একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, কবিতা, নাট্যকলা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই নূতন জীবন আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এ সকলের দ্বারাই সেই সমাজের নবচেতনা ও নূতন প্রাণতার প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিতে ধর্ম্মতত্ত্ব, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য গাথা পর্য্যন্ত জাতির ভাব ও চিন্তা যে দিকেই নিজেকে ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তার সাকুল্যটা বুঝায়। বাংলার নবযুগের সাহিত্য বলিতে এইরূপ সাকুল্যটাই বুঝি। অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যা, কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতুম পেঁচার নক্সা," প্যারিচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল," ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা, মাইকেলের মহাকাব্য ও গীতিকাব্য, এসকলের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিদিগের আধুনিক গান পর্য্যন্ত সকলই বাংলার নবযুগের নূতন সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। তবে এ সকল নূতন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই নবযুগের প্রাণবস্তুর নিগূঢ় সাড়া থাকিলেও, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টিতে এই প্রাণবস্তুর প্রকাশের তারতম্য আছে। কোনও সাহিত্যসৃষ্টিতে এই প্রাণবস্তু বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা আত্মপ্রকাশের অবসর পায় নাই। আর এই তারতম্য আছে বলিয়াই যে সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এই প্রাণবস্তু বিশেষভাবে ফুটিয়াছে, তাহাকে বিশিষ্ট অর্থে বাংলার নবযুগের সাহিত্য কহিতে পারা যায়। এই অর্থেই বাংলার নবযুগের সাহিত্যে বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই কারণেই বাংলার বর্ত্তমান নবযুগের সাহিত্যের কথা কহিতে যাইয়া বিশেষভাবে প্রথমে বঙ্গদর্শনের কথাই কহিতে হয়।

(২)

কিন্তু বঙ্গদর্শন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। সাহিত্য মাত্রেই চিন্তা ও ভাবের বাহন। বাংলার বর্ত্তমান নবযুগের ইতিহাসে প্রথমে যুগপ্রবর্ত্তকরূপে রাজা রামমোহনকে দেখিয়াছি। সুতরাং রাজা রামমোহনই বাংলার নবযুগের সাহিত্যেরও প্রথম প্রবর্ত্তক

একথা বলা বাহুল্য মাত্র। রাজা রামমোহন যে চিন্তা ও সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযোগী করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে সেই ধারাকেই স্বল্পবিস্তর রক্ষা করেন, এবং কোনও কোনও দিকে তাহাকে নূতন খাতে চালাইয়া গভীর এবং প্রশস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলার নবযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজেরও একটা বিশিষ্ট স্থান এবং মর্য্যাদা আছে। সে কালের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অক্ষয়কুমারের ত কথাই নাই, তাঁহারই হাতে তত্ত্ব-বোধিনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বিত্তাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেও একসময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী সভার নিকট সম্বন্ধ ছিল। কালীপ্রসন্নসিংহ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র, ইঁহাদেরও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান এবং তত্ত্ববিত্তালয়ে বক্তৃতাদি দ্বারা বাংলার নবযুগের সাহিত্যে যে অসাধারণ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, লোকে একথা এখন মনে না করিলেও ইতিহাস একথা কখনই ভুলিতে পারিবে না। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একদিকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, অন্যদিকে সাহিত্যেও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমসময়ে বাংলার নবযুগের সাহিত্যকে ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা এবং আদর্শ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর কেশবচন্দ্রও বাংলাসাহিত্যে তাঁহার অলোকসামান্য বাগ্মিতাপ্রভাবে অসাধারণ শক্তিসঞ্চার করিয়া ছিলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ বাংলার নবযুগের সাহিত্যে একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। যে স্বাধীনতা ও মানবতা এই যুগের মূল সূত্র হইয়া আছে, সেই স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা সমগ্র জাতির চিন্তা ও ভাবকে ভাল করিয়া অধিকার করিতে পারিতেছিলনা। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই আদর্শ অনেকটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ভিতরে বাঁধা পড়িয়াছিল। যাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, তাঁহারাই কেবল এই আদর্শের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। যাঁহাদের অন্তরে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, তাঁহারা ইহার সাড়া পাইলেও ভাল করিয়া এই আদর্শটাকে ধরিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার আদর্শ দেশের সাধারণ লোকের প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার সাধনেই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা এই ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যোগ দিলেন না বা দিতে পারিলেন না, তাঁহারা বাংলার নবযুগের নূতন সাধনা হইতে স্বল্পবিস্তর বঞ্চিত রহিয়া গেলেন। নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। আর এই সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে বাংলার নবযুগের নবীন সাধনার পুরোহিত-রূপে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।

(৩)

বঙ্গদর্শন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করে। বঙ্গদর্শন প্রচারের পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা বই পড়িতেন না বলিলেও চলে। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী স্কুলে পড়া হইত। রঙ্গলালের কবিতাও স্কুলপাঠ্য কবিতাবলীতে কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। এ সকল স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ ব্যতীত শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ কোনও পরিচয় ছিল না। বালকেরা স্কুল বুক সোসাইটীর প্রচারিত "চীনদেশীয় রাজকন্যার কথা" প্রভৃতি "গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী"র দু'পাঁচখানা কখনও কখনও পড়িত। যারা গল্প পড়িতে ভালবাসিত তাহারা "গুলে বকওয়ালী", "কামিনীকুমার" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতীয় উপন্যাস আগ্রহ সহকারে গিলিত। আরব্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদও তখন হইয়াছে। অনেকে এখানিও আদর করিয়া পড়িতেন। মাইকেলের কবিপ্রতিভা তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যাহ্নগগনে যাইয়া উঠিয়াছে। "মেঘনাদ বধ" এবং "ব্রজাঙ্গনা" গ্রন্থখানিই সেকালের বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম রত্নরূপে শিক্ষিত সমাজের অতিশয় আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সকলে মেঘনাদবধের গুণকীর্ত্তন করিলেও ততটা পঠনপাঠন করিতেন না বা করিতে পারিতেন না। সেকালের সাধারণ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর পড়া সোজা ছিল না, বুঝা কঠিনই ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মাইকেলের প্রভাব শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হুতুমপেঁচা ও আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয়। এবং এ দু'খানাও শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হইয়া উঠে। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ," "নবীন তপস্বিনী," "জামাই বারিক" এবং "সধবার একাদশী"ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর নাটকে সেকালের সমাজচিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজের উপরে তখনকার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে মোটের উপরে ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতাসাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজ-সংস্কার, ইহাই আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ ছিল। এই দুইটী লক্ষণই এই যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটী দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্মযুগ, আর এক বঙ্কিমযুগ। বঙ্গদর্শন এই বঙ্কিমযুগের সূচনা করেন।

রাজা রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজ য়ুরোপীয় চিন্তার প্রভাবে অনেকটা বদলাইয়া যায়। সুতরাং রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসাহিত্যও য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবেই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে। অক্ষয়কুমারের ত কথাই নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যেও বিদেশের প্রভাব অন্তঃসলিলের মত

প্রবাহিত। ব্রাহ্মযুগের বাংলা সাহিত্যে কাজেই তেমন একটা মৌলিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান নবযুগের বাংলা সাহিত্যে এই মৌলিকতাটা প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে, বঙ্গদর্শনে। এই জন্যই বঙ্গদর্শন আধুনিক বাংলার চিন্তা এবং ভাবে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী আগ্রহসহকারে বাংলা সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করেন। বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলরূপে উদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সূর্য্যস্বরূপ; আর তাঁহাকে ঘিরিয়া অক্ষয়চন্দ্র, তারাপ্রসাদ, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি নবীন সাহিত্যরথী সকল বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া বাংলার বর্ত্তমান নব যুগের সাহিত্যে এক নূতন অভিব্যক্তিধারার সূচনা করেন।

(৪)

অষ্টাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর ফরাসীস্ চিন্তার এবং সাধনার ইতিহাসে Encyclopedists দের যে স্থান, আধুনিক বাংলার সাধনা এবং চিন্তার ইতিহাসে বঙ্গদর্শন কতকটা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আজিকালি বাংলার ইতিহাসের চর্চ্চা অনেকেই করিতেছেন। অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিতে বাংলার বৈশিষ্ট্যের খোঁজ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও অনেক সন্ধান হইতেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা বাংলার এবং ভারতবর্ষের যে কল্পিত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম; এবং সেই ইতিহাসের আলো লইয়াই নিজেদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় চরিত্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম। বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ. বাংলার যে ইতিহাস গড়িয়াছেন, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর একটা সত্য ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসে বাংলার চরিত্র সাধনার যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় বিস্তর আছে, এই কথাটা প্রচার করেন। এইরূপে বাংলার আধুনিক স্বাদেশিকতাকে বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে ঐতিহাসিক সত্যের উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই কাজটা আরম্ভ করেন, স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদর্শনের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নষ্ট হয়; এবং তিনি যে গবেষণার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের সিদ্ধিপথে যথাসম্ভব অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যথাসাধ্য একরূপ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই কাজটা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধেতে ইহার কতকটা প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গোটা ভারতবর্ষই অত্যন্ত নির্জ্জীব অবস্থায় পড়িয়াছিল। জনসাধারণে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে একটা স্বাদেশিক শক্তির সামান্য সাড়া পাইয়া, সেই গোলমালের নিঃশেষ হইলে পরদেশী প্রভুশক্তির অদ্ভুত প্রতাপে একান্তভাবে অভিভূত হইয়া

পড়িয়াছিল। ইংরাজের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির ভয়ে দেশটা একেবারেই জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা দেশে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকোপ বেশী দেখা যায় নাই। সুতরাং এই বিপ্লবের অবসানে ইংরাজ যে নৃশংস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, বাংলার লোকে তাহাও দেখে নাই। বেহার, প্রয়াগ, অযোধ্যা এবং দিল্লী অঞ্চলেই এই মূর্ত্তিটা বিকটভাবে প্রকট হইয়াছিল। একটু শক্তিশালী লোক দেখিলেই, এরূপ শুনা যায়, ইংরাজ তাহাকে পলাতক বিদ্রোহী বলিয়া গুলি করিয়া মারিয়াছে, পথের লোক ধরিয়া গাছের ডালে ফাঁসী দিয়াছে, এবং এইরূপে তাহার লোকসংহারের অপরিসীম ক্ষমতা জাহির করিয়া, দেশের লোককে একেবারে দমাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও বেহার, কাশী, প্রয়াগ এবং অযোধ্যা অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত এ সকল 'কাহিনী' স্মরণ করিয়া একেবারে কাঁপিয়া উঠিতেন। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা যখন এই দেশব্যাপী জুজুর ভয়টা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য ইংরাজের পণ্য এবং ইংরাজের স্কুল, কলেজ, আইন-আদালত এবং ব্যবস্থাপক সভাদি বয়কট করিবার প্রস্তাব করি, তখন কংগ্রেসের বেহার ও অযোধ্যার প্রতিনিধিরা বারম্বার একথা কহিয়াছিলেন যে ইংরাজ যে কি বস্তু বাঙ্গালী তাহা জানে না। ইংরাজের ভীষণ মূর্ত্তি ও ক্রূর প্রকৃতির যে পরিচয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা পাইয়াছিল, তাহা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যেও তাহারা ভুলিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই স্মৃতি যাহাদের অন্তরে এখনও জাগিয়া আছে, তাহারা কিছুতেই ইংরাজকে আর ঘাঁটাইতে রাজী হইবে না। সুতরাং বাংলার স্বদেশী ও বয়কটের কথা সে সকল অঞ্চলে চালানো অসম্ভব। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যখন দেশের লোকের মনোগতি এরূপ ছিল, তখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা কি ছিল, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে।

উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের জনসাধারণে যেরূপ ইংরাজের ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় সেইরূপ ইংরাজ-ভক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী ইংরাজকে তেমন ভয় করিত না, কিন্তু সত্যই ইংরাজকে ভালবাসিত এবং ভক্তি করিত। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে পল্লীবাসী নিরক্ষর বাঙ্গালীরা প্রবলের দ্বারা প্রপীড়িত হইলে কোম্পানী বাহাদুরের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিত। ইংরাজ দেশে শান্তি আনিয়াছে। চোর ডাকাতের ভয় নষ্ট করিয়াছে, ধর্ম্মাধিকরণের সমক্ষে ধনী ও নির্ধন, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, প্রবল ও দুর্ব্বল—সকলকে এক করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বাঙ্গালী ইংরাজকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। দেবতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে যতটুকু ভয় মিশিয়া থাকে, বাঙ্গালীও ইংরাজকে ততটুকু ভয় করিত বটে; কিন্তু দেবতার ভয় ভক্তকে পঙ্গু করে না। ইংরাজ রাজের ভয়েও বাঙ্গালী জড়সড় হইয়া যায় নাই। এ গেল জনসাধারণের কথা। দেশের নূতন ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজের ভাবের ভাবুক হইয়া, ইংরাজের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবশতঃ তাহার নিকট স্বল্পবিস্তর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ

সত্যকাম ও সত্যবাক্, এ ধারণাটা তাঁহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ যে মিছা কথা কহিতে পারে, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বকার শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এইজন্য ইংরাজ এদেশের সম্বন্ধে যখন যাহা কহিত, তাহাকেই তাঁহারা বেদবাক্যরূপে মানিয়া লইতেন। সম্মোহন শক্তি (hypnotism) দ্বারা অভিভূত হইয়া, সম্মোহনকর্ত্তার আদেশে মূঢ় মানুষ্ যেমন মুখে নুন লইয়া কহে চিনি খাইতেছি, সেইরূপ নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীও তাহার সম্বন্ধে ইংরাজ যাহা কহিত তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন। ইংরাজ কহিল, ভারতবর্ষটা একটা মহাপ্রদেশ মাত্র; কখনও ভারতবর্ষে একটা জাতি বা নেশন গড়িয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয় একতা বা ন্যাশনাল ইউনিটি (National unity) ছিল না, এখনও নাই। ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী তাহাই মানিয়া লইলেন। জাতি বা নেশন গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া ভারতবর্ষীয়েরা কখনও কোনওপ্রকারের স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ভারতবাসীর দেশ আছে, কিন্তু রাষ্ট্র নাই, সমাজ ছিল কিন্তু কখনও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে সকল গুণে য়ুরোপের শক্তিশালী জাতিসকল গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষে কদাপি সে সকল গুণের অনুশীলন হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়েরা কখনও য়ুরোপের সমকক্ষ ছিল না, এখনও নাই; কোনওদিন হইতে পারিবে কিনা কে জানে? এইরূপে ইংরাজ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগকে অদ্ভুত সম্মোহন মন্ত্রের দ্বারা মূঢ় করিয়া রাখিয়াছিল।

(৬)

এই সাংঘাতিক মোহটা প্রথমে ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করেন, বঙ্গদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রই বর্ত্তমানযুগের ইংরাজী-নবীশদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদর্শনের সাহায্যে বাঙ্গালীর অন্তরে একটা স্বাজাত্যাভিমান জাগাইবার চেষ্টা করেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের এই চেষ্টার বিশেষত্ব এই যে বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যা কল্পনার উপরে নহে, কিন্তু সত্যের উপরে স্বজাতির এই আত্মশ্লাঘাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এসকল বিষয়ের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বদাই যুক্তি ও বিজ্ঞানের হাত ধরিয়া চলিতেন। অযৌক্তিক বা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের বিরোধী কোনও হেতু বা মতবাদ অবলম্বন করিয়া নিজের ঈপ্সিত মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই। প্রসঙ্গকল্পে এখানে তাঁহার "বিবিধ প্রবন্ধের" "বাঙ্গালীর বাহুবল"শীর্ষক প্রস্তাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—বাঙ্গালীর কোনও উন্নতির ভরসা আছে কি না? অনেকে এ বিষয়ে সন্দিহান। কেন না, বাঙ্গালীর বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই মানিয়া লইয়াছেন যে বাঙ্গালীর বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। বাঙ্গালীর বাহুবল কখনও ছিল না। তদানীন্তন কালের ইতিহাসের যতটা খোঁজ পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা বাঙ্গালীরা বহুকাল হইতেই যে খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বল-গঠন ছিল, ইহা প্রমাণিত হয়। বাংলার জলবায়ু প্রভৃতিই বাঙ্গালীর এই দুর্ব্বলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

বাঙ্গালীর আহার-বিহারের ব্যবস্থা এবং বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক রীতি এই দুর্ব্বলতাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এসকল আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কহিতেছেন যে, "বাঙ্গালীর শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা একরূপ সিদ্ধ। কেন না, দুর্ব্বলতার নির্বার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।" তবে কি বাঙ্গালীর ভরসা নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কহিয়াছেন তাহা আজিকালিকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষেও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের দুই উত্তর দিয়াছেন। প্রথম উত্তর :—

"শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে; কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেক অংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন; এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে............ .."

কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক বলকে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। কারণ শারীরিক বল মানুষের উন্নতির মূল না হইলেও যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োজন। যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানেও অনন্যসাধারণ শারীরিক বল ব্যতীত উন্নতি ঘটে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কহিতেছেন তাহার সাকুল্যটাই এখানে তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্বনগরে, সর্ব্ব গ্রামে, সকল বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই তবে কি বাঙ্গালীর ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, **শারীরিক বল বাহুবল নহে।**

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ, তথাপি হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্যজাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর-গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গুর-পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল,—কাবুলীর সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা ইংরাজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরাজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।"

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র কহিতেছেন যে বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক অপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ বাঙ্গালীর উদ্যম নাই, ঐক্য নাই, সাহস নাই এবং অধ্যবসায় নাই। বাঙ্গালী যদি এই সাধনচতুষ্টয় অবলম্বন করিতে পারে তাহা হইলে বাঙ্গালী জগতের ইতিহাসে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে। এই সাধনার ভিত্তি উন্নতির অভিলাষ।

"বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষমাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা

তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পাইলে উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

"যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্য, সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।"

"সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণবিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।"

"যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।"

"অতএব যদি কখনও (১) বাঙ্গালার কোনও জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালী-মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি এই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালীর অবশ্য বাহুবল হইবে।"

"বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।"

সতের বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলি সফল হইয়াছিল। সকল বাঙ্গালীর অন্তরে না হউক, কতকগুলি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বাধীনতা-সুখের অভিলাষ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই অভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে ইহার জন্য কতকগুলি বাঙ্গালী প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন বাঙ্গালীর সাহস এবং বাহুবলেরও কতকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আধুনিক বাংলার ইতিহাসের এই অধ্যবসায়ের দোষগুণের কথা আর যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণরূপেই সপ্রমাণ হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর যে স্বাধীনতাসুখের অভিলাষের প্রেরণায় বাংলার আধুনিক ইতিহাসের এ অধ্যায়টি রচিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বাঙ্গালীর অন্তরে নানাদিক দিয়া সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া ছিলেন।

(৭)

প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্রই বোধহয় সর্ব্বপ্রথমে এদেশের লোকের মনে ইংরাজের প্রভুত্ব, প্রতাপ এবং জ্ঞানগৌরব যে একটা গভীর হীনতাবোধ জন্মাইয়াছিল, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি কখনও মিথ্যা বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও প্রকারের শূন্যগর্ভ আত্মাভিমান বা স্বাজাত্যাভিমান জাগাইতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গী এই ছিল যে তিনি বিপক্ষের কথার মধ্যে যেটুকু অতি অপ্রীতিকর সত্য থাকিত, তাহা অম্লানবদনে মানিয়া লইতেন। বাঙ্গালী শারীরিক বলসম্বন্ধে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন, বাঙ্গালীর বাহুবলের বিচার করিতে যাইয়া একথাটা অস্বীকার করেন নাই। এই সত্য কথাটা মানিয়া লইয়া তিনি কহিলেন——

শারীরিক বল বাহুবল নহে।

"ভারতকলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে, ভারতবর্ষ পরাধীন কেন, এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি সত্য এবং যুক্তির ধারালো অস্ত্রে প্রথমে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা বহুকাল পরাধীন হইয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের শক্তি ও শৌর্য্যের অভাব বা হীনতা এই পরাধীনতার কারণ নহে। হিন্দুরা কাপুরুষ, য়ুরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই এ কথাটা আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার য়ুরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন আর না করুন, সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের কাছে, মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ, বিদেশীয়দিগের মুখে যে সভ্যজগতে এই কলঙ্কের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ইহার তিনটী কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই। "আপনার গুণগান আপনি না গাহিলে কে গায়......রোমকদিগের রণপাণ্ডিত্যের প্রমাণ রোমক-লিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয় গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই। কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।" হিন্দুদিগের এই কলঙ্কের দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুরা মোটের উপরে পররাজ্যাপহারী ছিল না। "যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষামাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্যলাভে কখনও ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই।" আর এই কলঙ্কের তৃতীয় কারণ, হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। পরাধীন কেন? এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই প্রাচীন কাল হইতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রহিত ছিল। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব।

"সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য-নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য-সম্পত্তিরক্ষায় যত্ন; বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এসকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা এ সকল নূতন কথা।"

কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে স্বজাতিপ্রতিষ্ঠার ভাব ভালই হউক বা মন্দই হউক, কোনও

দিন প্রবল হইয়া উঠে নাই। ইহাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মূল কারণ। কিন্তু ভগবানের বিধানে ইংরাজ আমাদিগের এই উপকার করিতেছে যে "যাহা আমরা কখনও জানিতাম না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শোনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্ত-ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটি আমরা এই প্রবন্ধে ("ভারত কলঙ্ক") উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না। এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality or nation বুঝিতে হইবে।"

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রই এই জাতি প্রতিষ্ঠা ব্রতের একরূপ প্রথম ও প্রধান পুরোহিত। ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দিকে বাঙ্গালীর চিত্তকে বিশেষভাবে প্রেরিত করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই কথাটাই সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই বঙ্কিম-যুগের বাংলা সাহিত্যের মূল কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ভারতের অধঃপতনের মূলমন্ত্র

আজকাল অনেকেই ভারতের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন। কেহ বলেন রোগ-শোক ও ক্রমাগত দুর্ভিক্ষে আমাদের জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়াছে। অন্যজন বলেন, ভারতের আবহাওয়াই আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আর একজন বলেন, না না তাহা নয়; এদেশের জমীর উর্ব্বরতা ও অনায়াসলব্ধ জীবিকাই আমাদিগকে অলস ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া দিয়াছে। আবার অনেকের মতে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেই ভারতের সুদিন আবার ফিরিয়া আসিবে। এইরূপ নানা মতের ঘূর্ণিচক্রে পড়িয়া বিষয়টি অতিশয় জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমি যতদূর বুঝিতে পারি ইহার মধ্যে একটিও ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ নহে। ভারতের মরণ-কাঠি একটি মাত্র মন্ত্রে পাওয়া যায়—"জগৎ মিথ্যা; জীবন ক্ষণস্থায়ী।"

ভারতের পতন আজ ঘটে নাই। দেশের আবহাওয়া বা রোগে ও দুর্ভিক্ষে আমাদের জীবনী-শক্তি নষ্ট করে নাই। বিদেশীর কামান ভারতের স্বাধীনতা হরণ করে নাই। যেই দিন ভারতবাসী "জগৎ-মিথ্যা" মন্ত্র গ্রহণ করিল, সেই দিন হইতেই ভারতের অধঃপতন

ঘটিয়াছে। যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতবাসীর কর্ণে জগত মিথ্যা এই একই মন্ত্র নানাভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে পৈতৃক উত্তরাধিকারীসূত্রে কর্ম্মকোলাহলময় সংসারের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ও বিজাতীয় তাচ্ছিল্যের ভাব আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। একদিন বা দুইদিনে ইহা হয় নাই। যুগযুগান্তের প্রচার ও সাধনার ফলে ভারতবাসী সংসারের প্রতি এত বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, মাঝি-মাল্লা সকলেরই মন ও মুখে একই কথা বিভিন্ন আকারে শুনিতে পাওয়া যায়—জগত মিথ্যা। সম্রাট তাঁহার সিংহাসন ছাড়িয়া নিত্যধামের খোঁজে জঙ্গলে চলিয়া গেলেন,—বিশাল বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না। ব্যবসায়ী ব্যবসা ছাড়িয়া দিল। কৃষক তাহার চাষ ত্যাগ করিল। নৌকার মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল। সকলে জীবনের পূর্ব্বাহ্নেই সব তল্পীতল্পা গুছাইয়া হাত পা গুটাইয়া জীবন নদী পার হওয়ার প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া কেবল মাঝিকে ডাকিতেছে—

"আমায় পার করি দে মাঝি ভাই,
আমার খেয়ার কড়ি সঙ্গে নাই,
মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারিনা।"

ইহাই হইল আমাদের মনের প্রকৃত ভাব। আমরা বিশ্বের গুরুতর প্রতিযোগিতার ঘাত প্রতিঘাতের দিনে প্রবল স্রোতের মুখে হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। আর যে উজান বাহিতে পারি না। শরীরে সে বল নাই, মনে সে উৎসাহ নাই।

কথায় বলে যে যাহাকে চায় না, সে তাহাকে পায় না। জগৎ আসিয়া অনেকবার আমাদিগকে বরণ করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু আমরা বারবারই তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছি। আমরা যখন জগৎকে মিথ্যা বলিয়া অবমাননা করিলাম, তখন কি তার একটুকুও আত্ম সম্মান নাই যে আবার যাচিয়া বরণ করিয়া লইবে। আমরা ঘরের কোনে চোখ মুদিয়া ধ্যানে আছি, আর একজন ঘরের সব লুঠ করিয়া লইয়া গেল। সে দিকে একটুকুও খেয়াল নাই। ঘরের একটি ছেলে ছয়মাস মেলেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে মারা গেল। আত্মীয় স্বজন আসিয়া বলিলেন—"বৃথা কাঁদিয়া লাভ কি? নিয়তি অখণ্ডনীয়।" পণ্ডিত আসিয়া উপদেশ দিলেন—"সে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। মায়া, মায়া, সব মায়া।" ছেলেটির ঔষধ পথ্যের কোন চেষ্টা হয় নাই; কারণ মৃত্যু যখন একদিন আসিবেই, তখন চিকিৎসায় লাভ কি? আত্মার শক্তি বাড়াইবার জন্য শরীরের পাশবিক শক্তি কমান আবশ্যক। তাই আমরা তিন বেলার পরিবর্ত্তে দিনে এক বেলাই আহার করি। আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণিহিংসা নিবারণের জন্য বহু পূর্ব্বেই মাছমাংস ছাড়িয়া নিরামিষভোজী হইয়াছেন। আবার সে দিন সার জগদীশ আবিষ্কার করিলেন, লতা পাতারও প্রাণ আছে। তাই আমরা এখন

নিরামিষ ছাড়িয়া কেবল লবণ দ্বারাই এক বেলার কাজ সমাধা করি। কিন্তু যাহারা অতি আধ্যাত্মিক তাহারা বলিলেন, ধান গাছওত উদ্ভিদ, তাহারও প্রাণ আছে ; তাই আমরা আবার ভাতের বদলে কেবল বাতাস খাইয়া দুই দিনের পান্থশালার ক্ষণস্থায়ী জীবন ফাঁকি দিবার মতলবে আছি।

মানুষ-সৃষ্টি বিধাতার এক অপূর্ব্ব রহস্য। তিনি সিংহ ব্যাঘ্রকে শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য তীক্ষ্ণ দাঁত ও ধারাল নখর দিলেন। শীতপ্রধান দেশের পশুকে দীর্ঘ লোম দ্বারা আবৃত করিয়া মায়ের উদর হইতেই পৃথিবীতে পাঠাইলেন। হরিণ গরু প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীর জন্য বিশাল পৃথিবী তৃণ দ্বারা সাজাইয়া রাখিলেন। এমন কি কীট পতঙ্গকে পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য তাহার দেহের রং-এর বাসস্থানের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন। কিন্তু মানুষের মত এত দুর্ব্বল প্রাণী জীবজগতে আর নাই। তাহার না আছে প্রখর নখর, না আছে শরীরে শক্তি। সে যখন পৃথিবীতে পদার্পণ করিল, অন্যান্য বিশালদেহ শক্তিশালী প্রাণীরা তাহার দুর্ব্বল শরীর দেখিয়া তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া এক গাল হাসিয়া লইয়াছিল। বিধাতা মানুষকে কিছুই দিলেন না সত্য ; কিন্তু সকল অস্ত্রের সেরা—বুদ্ধি ও উদ্যম দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মানুষ নিজ বুদ্ধি ও উদ্যম দ্বারা প্রাণী জগতের উপর আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিল। আজ আকাশ পাতাল, দুর্গম পর্ব্বত ও বিশাল সমুদ্র মানুষের নিকট হার মানিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

মানুষের শরীরের গঠন দেখিলেই বুঝা যায় বিধাতা তাহাকে পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় দিয়া আভাষ দিয়াছেন, স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। কেবল জপতপের জন্য জীবন হইলে তিনি আমাদের হাত-পা দিতেন না, উদর নামক জিনিষটির সৃষ্টি করিতেন না। জীবন যদি একটা ছায়াবাজী—

> "কেন এত গ্রহ তারা শশাঙ্ক তপন ?
> 　　কেন এত ফুল ফল
> 　　কেন রৌদ্র বৃষ্টি জল
> কেন এত শীত গ্রীষ্ম অনল পবন,
> উদ্দেশ্য বিহীন যদি মানব জীবন ?"　　(কায়কোবাদ)

গৃহ পরিবার ছাড়িয়া উদাসীন হওয়া মহাপাপ। ইহা বিধাতার নিয়মের বিরুদ্ধে একটা ঘোর বিদ্রোহিতা। জীবন-সংগ্রামে তিষ্ঠিতে না পারিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলাম ইহার চেয়ে স্বার্থপরতা, ইহার চেয়ে কাপুরুষতা আর কি হইতে পারে ? পাহাড়ে জঙ্গলে মুক্তি পাওয়া যায় না। কর্ম্মকোলাহলময় সংসারের "অসংখ্য বন্ধন মাঝে" মুক্তির সন্ধান করিতে হইবে। এই যে আমরা রোগে শোকে ভুগিতেছি, না খাইয়া মরিতেছি, ঘরে বাহিরে পরের পদাঘাত লাভ করিতেছি, বিধাতার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের ইহাই আমাদের প্রকৃত শাস্তি, যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত।

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

জয়লক্ষ্মী

বিহারীবাবুকে তাঁর চেনাশোনা লোকেরা সাধুলোক বলে জান্‌ত। তাদেরই মধ্যে অনেকে আবার তাঁকে বোকা বলে ঠাট্টা করত। সারাটী জীবন তিনি পাটনাতেই কাটিয়েছিলেন্‌। তাঁর বাল্যবন্ধু বিকাশবাবু বল্‌তেন—বিহারীর ক'টা খুব গুণ আছে। মুখে যা' বলে কাজেও তাই করে। আর মুখে যা' বলে তাও সে যে-ভাবে চিন্তা করে সেই ভাবের কথাগুলিই বলে। এ আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি।

তাই যেমন হয়—বিহারীবাবুর দারিদ্র্য কোনও দিনই ঘুচ্‌ল না। ঐ ভাবের সঙ্গে আর সংসারের অভাবের সঙ্গে কোনও দিনই সন্ধি করতে পারলেন না। অর্থাভাব জীবনসঙ্গী হয়ে রইল। বিহারীবাবুর স্ত্রীর নাম জয়লক্ষ্মী। দুটী মেয়ে ও তিনটী ছেলে। বড় মেয়েটী বেশ বড় হয়েই যক্ষ্মা হয়ে মারা যান্‌। দ্বিতীয়টীর নাম হেমলতা। বড় ছেলেটীর নাম চৈতন্য, দ্বিতীয় গৌর, তৃতীয়টী গোরা। হেমলতা ছেলেদের সকলের বড়—কাজেই তাদের দিদি।

বিহারীবাবু প্রথম জীবনে স্কুলমাষ্টারী করতেন। অনেকদিন নির্ভাবনায়ই কেটে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন তাঁর মনে হোল হয়ত অকারণে স্কুলের ছেলেদের তিনি শাস্তি দেন, তাই হঠাৎ চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে এসে জয়লক্ষ্মীকে বল্‌লেন—এখন থেকে একবেলা রান্না হবে। আমি মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে এসেছি। জয়লক্ষ্মী হেসে বল্‌লেন—তার জন্য একবেলা রান্না হবে কেন? দুবেলাই খাবার জুটবে।

তারপর ঘরের বারন্দায় ভাঙ্গা মোড়ার উপর বসে কয়েকদিন কেটে গেল। বিহারীবাবু বাড়ীর বাইরে গেলেন না। তখন শীতকাল—উত্তুরে হওয়া—মাথার উপর থেকে পুরোণশাড়ীর এক টুক্‌রা কাপড় কানপটীর মতন বেঁধে বিহারীবাবু একদিন সেই মোড়ার উপর বসে আছেন। খানিকটা রোদ্‌ বিহারীর পায়ের উপর পড়েছে—যাবার পথে যেন বিহারীর শীতক্লিষ্ট পাদুখানি দেখে তার দয়া হয়েছিল।

চাপরাশ-আঁটা ডাকপিয়ন্‌ এসে একখানি পোস্টকার্ড বিহারীর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। বিহারী কোঁচার ভিতর থেকে হাত দুখানি বের না করে বল্‌লেন—ঐখানে রেখে যাও।

ডাকপিয়নের অনেক কাজ। কার জন্য কি খবর নিয়ে যাচ্চে সে তার খোঁজ রাখে না— শুধু খবর পৌঁছে দেওয়া নিয়েই তার কাজ। কত লোক যে তাকে কত ভালবাসে – কত আশায় যে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে তাও সে জানেনা। এক এক বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়েরা যখন উৎসুক হয়ে হাতবাড়িয়ে তার হাত থেকে বাড়ীর চিঠি কেড়ে নেয় তখনই দু-একবার তার মুখে হাসি দেখা যায়। তা নইলে তার নিয়মিত আসা যাওয়ার মধ্যে সে যে মানুষ তার কিছুই পরিচয়

পাওয়া যায় না। আট বা দশ টাকা মাসে পেয়ে তার বুঝি পরের মুখের দিকে তাকাবার অবসর নাই। বেচারী সে!

বিহারী কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে হেমলতাকে ডেকে বল্লেন—একটা চিঠি এসেছে—পড়ে দিয়ে যাওত মা।

চিঠি পড়া হয়ে গেলে হেমলতাকে বল্লেন—তোমার মাকে ডেকে দাও। জয়লক্ষ্মী এসে দাঁড়াতে পোষ্টকার্ডটার দিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে বল্লেন—পড়ে দেখ।

পড়া হয়ে গেলে জয়লক্ষ্মী বল্লেন—তাতে কি হয়েছে? প্রীতিদের ত অনেকদিন আগেই আসার কথা ছিল। এখানকার স্কুলে যে সে পড়বে—কি, চুপ্ করে রইলে যে?

বিহারী মুখ না তুলেই উত্তর করলেন—তা' পড়ুক।

বুধবারে চিঠি এল—শুক্রবার সকালবেলা চন্দ্রকান্ত বাবু তাঁর মেয়ে প্রীতিকে নিয়ে বিহারীর বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। জয়লক্ষ্মী ও হেমলতা এগিয়ে এসে প্রীতিকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রীতির বাপ চন্দ্রকান্তকে কেরোসিন কাঠের তালিমারা হৃতগৌরব একখানি বেতের চেয়ার দেখিয়ে বিহারী বল্লেন—বসো, তারপর?

চন্দ্রকান্ত গলা থেকে শালের গলাবন্দটা খুলতে খুলতে বল্লেন—আমি ভেবেছিলাম চৈতন্যরা কেউ বোধ হয় ষ্টেশনে যাবে। ওরা সব কেমন আছে? ভেতরে পড়ছে বুঝি?

বিহারী উত্তর করলেন—না, রান্নাঘরে উনুনের কাছে বসে আছে। স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত একটু বিস্মিত হয়েই বল্লেন—কেন? বিহারী একটা হাতের উপর অন্য হাতটা মুঠো করে রেখে নাড়তে নাড়তে বল্লেন—কেন মানে—আমার এখন চাকরী বাকরী নাই। আমি হেড্মাষ্টারকে বলেছিলাম—আপনি যদি এ মাসটা চালিয়ে দেন তাহলে আমি আস্চে মাসে ওদের দুমাসেরই মাইনে একসঙ্গে দিয়ে দেব। তা' ওঁর ইচ্ছা থাক্লেই বা কি করবেন্! ওঁরও ত উপরে হেড্মাষ্টার আছেন—তাঁর সইবে কেন? স্কুল করে ত আর দাতব্য করতে বসেন নি। টাকা ছিল—বাবা মারা যাবার পরে বাবার নামে নূতন জমীদারী খুলে দিয়েছেন—তিনি বল্লেন—নাম কাটিয়ে দাও।

চাকরী নাই কেন তোমার? তুমিত সেই স্কুলেই মাষ্টার ছিলে গো?

ছিলাম—এখন নাই। ভাল লাগ্লনা—ছেড়ে দিয়েছি।

তাহলে—এখন——

——এখনও যেমন তখনও তেমন। কবে কি হবে তা' ভেবে লাভ কি। ঐ 'বে'—'বো'—'বা'র প্রতি আমার কোনও কালেই আসক্তি নাই। চোখের সামনেরটাই সব চাইতে বড় সত্যি।

——হেমলতা একখানি কাঁচের পিরীচের উপর একটি লোহার পেয়ালায় চা নিয়ে এসে চন্দ্রকান্তের কাছে ধরল।

চন্দ্রকান্ত বল্‌লেন—আমরা যে সকালবেলা ট্রেনেই চা' রুটি সব খেয়ে এসেছি। চল বিহারী একটু বাজারের দিকে যাওয়া যাক্।

বিহারী বল্‌লেন—এবার একটু রোদ উঠেছে, ওদের পড়াতে হবে। সকালবেলাটা আগুনের কাছে থাকে। ঘরের ভিতর বড় অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। তুমিই একলা যাও—রাস্তা ঘাট ত সবই চেন।

চন্দ্রকান্ত চা খেয়ে বাজারে চলে গেলেন।

বিহারী হেঁকে বল্‌লেন—এবার তোমরা সব পড়্‌বে এস।

হেমলতা ও ছেলেরা বই নিয়ে এল। বিহারী গৌরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—চৈতন্য কোথায় ?

জয়লক্ষ্মী ভিতর থেকে এসে বল্‌লেন—ওকে ভোরে উঠেই বাজারে পাঠায়েছি। একখানা থালা দিয়ে দিয়েছি—যদি কিছু আন্‌তে পারে।

বিহারী একবার চোকদুটী বড় করে জয়লক্ষ্মীর দিকে তাকালেন।

জয়লক্ষ্মী বল্‌লেন—না, বাঁধা দিতে পাঠাইনি। বিক্রী করতে পাঠিয়েছি। ওখানা একেবারে নতুন ছিল। তোমার বিয়ের সময়কার।

বিহারী ছেলে মেয়েদের পড়িয়ে উঠে স্নান করে নিলেন।

চন্দ্রকান্ত বাজার করে এসে বল্‌লেন—কিহে, স্নান করে ফেলেছ ? কোথাও বেরুবে নাকি ?

জুতোর ভিতরে একখানা খবরের কাগজ মুড়ে পুরতে পুরতে বিহারী বল্‌লেন—হ্যাঁ, একটু আগেই বেরুতে হবে ভাই। একটা কাজের চেষ্টায় যাব।

চন্দ্রকান্ত হেসে বল্‌লেন—তা যাও-যাও। সন্ধ্যের সময় গল্প হবে না হয়।

শুক্র শনি দুদিনই বিহারী সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে যান্—সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে জয়লক্ষ্মীর হাতে দুএকটী করে টাকা দেন্।

রবিবার সকালবেলা চন্দ্রকান্ত বল্‌লেন—আজ প্রীতিকে স্কুলের বোর্ডিংএ রেখে আস্‌ব। কাল থেকে একেবারে পড়া আরম্ভ করবে, কি বল ?

বিহারী বল্‌লেন—তা বেশ।

আহারাদির পর প্রীতিকে নিয়ে চন্দ্রকান্ত স্কুলে চলে গেলেন। বিকেলের দিকে জয়লক্ষ্মী বিহারীকে জিজ্ঞেস করলেন—এ ক'দিন টাকা পেলে কোথায় ?

বিহারী বল্‌লেন—একটাকা চার আনা করে হাজার—হ্যাণ্ডবিল্ বিলি করে।

জয়লক্ষ্মী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লেন—হ্যাণ্ডবিল্ ? কিসের ?

আমাদেরই স্কুলের একজন মাষ্টার জগতবাবু বাড়ীতে বসে আরেকটা কারবার চালান। জগতশুদ্ধ বুঝি তাই! তিনি একটা মাথার তেল বের করেছেন। খুব নাকি ভাল তেল। টাক্ সেরে যায়—মাথায় চুল বাড়ে। তারই তেলের হ্যাণ্ডবিল্ বিলি করেছি এ দুদিন। সহর ছেয়ে দিয়েছি এ দুদিনে। আজ রবিবার—পথে লোকজন থাক্‌বে না বলে আজ আর বেরুইনি। বেশ কাজ, কোন ছল চাতুরী মিথ্যের সম্পর্ক নাই।

জয়লক্ষ্মী কিছু না বলে ঘরের ভিতর চলে গেলেন। সন্ধ্যের সময় চন্দ্রকান্ত বাবু এসে বল্‌লেন—রাত্রের ট্রেণেই যাচ্চি হে আমি। প্রীতিটাকে মাঝে মাঝে এনো তোমার কাছে। শনি রবিবারে ওদের ছুটী। তোমার বাড়ীতে পাঠাবার কথা বলে এসেছি।

জয়লক্ষ্মী ঘরের ভিতর থেকে বেরুতে বেরুতে বল্‌লেন—বেশ করেছেন—নিশ্চয় আস্‌বে। আপনার খাবার তৈয়েরী হয়েছে—এই বেলা বসুন একটু আস্তে ধীরে খাবেন।

দুই বন্ধুতে গল্প স্বল্পের পর চন্দ্রকান্ত ষ্টেশনের দিকে বিদায় হলেন।

সোমবার সকালে আহারাদি সেরে বিহারী আবার বিজ্ঞাপন বিলি করতে বেরুলেন। কাজটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। বেশ সোজাসুজি কাজ। কোনও গোল নেই। একেবারে হাতে হাতে কাগজ দেওয়া তাতেও গোল নেই—আর গুণে যতগুলি বিলি হয়েছে তার দাম হাতে হাতে পাওয়া। পথে দাঁড়িয়ে বিলি করতে করতে প্রায় বেলা পড়ে এসেছে—স্কুল কাচারী ছুটী হয়েছে। পাট্‌না সিটির দিকে ট্রাম চলেছে। সবাই ব্যস্ত। বাড়ীর দিকে চলেছে। বিহারীর পাশে একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হাতে একখানি বড় রুমালে ক'টি ফুলকপি বাঁধা পুটুলি। তার ভিতর দিয়ে মাছের একটা ল্যাজও দেখা যাচ্চিল। অনেকক্ষণ থেকে বাবুটী বিহারীকে লক্ষ্য করছিলেন। বিহারীও দু'একবার তা বুঝ্‌তে পেরেছেন। ভদ্রলোকটী এগিয়ে এসে বিহারীকে বল্‌লেন—দেখি মশাই, কিসের বিজ্ঞাপন?

পড়ে বল্‌লেন—একি আপনার তৈরী তেল?

না, আমারই একজন বন্ধু প্রস্তুত করেছেন।

বিজ্ঞাপনে যা' লেখা আছে—সব সত্যি? সত্যি টাক্ সেরে যায়?

টাক্ সারে কিনা জানিনা। তবে তিনি শিক্ষিত লোক—তিনি কি আর মিথ্যাকথা ব'লে পয়সা রোজগার করবেন।

ট্রাম এসে পড়েছিল। লোকসাগরে কোথায় তিনি মিলিয়ে গেলেন! কিন্তু তাঁর কথাগুলি বিহারীর পাশে তখনও দাঁড়িয়ে রইল। যা লেখা আছে তা কি সব সত্যি!

তারপর বিহারী যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে এলেন তখন জয়লক্ষ্মী রান্নাঘরে একঘর ধোঁয়া করে তার মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছেন। ছাতাটা দরজার উপর ঝুলিয়ে রেখেই বিহারী রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলেন। হেমলতা বাবার পেছনে পেছনে গিয়ে দেখে বাবা মায়ের হাত ধরে হিড়হিড়

করে শোবার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে আস্‌চেন। ছেলেরা তেলের প্রদীপের আলোর চক্রটী থেকে অন্ধকারের দিকে সরে গিয়ে বস্‌ল।

বিহারী খাটের উপর বসে পড়ে বল্‌লেন—বসো, উনোন ধরাতে হবেনা—কিছু আন্‌তে পারিনি।

জয়লক্ষ্মী হেমলতার দিকে ফিরে বললেন—যাওত মা, আরেকটু হাওয়া করলেই কয়লাগুলো ধরে উঠ্‌বে। আর দেখ, বিকেলে যে আক্‌ কখানা কেটে রেখেছি তা' একখানি রেকাবীতে করে নিয়ে এস।

বিহারী ডেকে বল্‌লেন—চৈতন্য, একগ্লাস খাবার জল নিয়ে এসত বাবা।

জয়লক্ষ্মী বিহারীর হাত থেকে ছেঁড়া শালখানা·নিয়ে বল্‌লেন—আগে মুখে চোখে জল দিয়ে নাও তারপর জল খেও। চৈতন্য, আগে দেখত বারান্দায় ঘটীতে জল আছে কি না। গামছাখানা মোড়ার উপর রেখে এস।

বিহারীর দ্বিতীয় পুত্র গৌরের বারমাসই প্রায় সর্দ্দি লেগে থাক্‌ত। কারণে অকারণে সে হাঁচ্‌তে আরম্ভ করে দিত। সময় লগ্ন না দেখে অহেতুকী এরকম হাঁচীতে বাড়ীর সবাই বড় তার উপর বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ত। এই হাঁচিটি ছাড়া, সে যে বেঁচে আছে তা' অনেক সময়ই টের পাওয়া যেতনা। সে যখন বিছানায় শুয়ে থাকৃত, তা' দেখে অনেক সময়ই মনে হোত কেউ যেন তাড়াতাড়িতে বিছানার উপর কাপড় ছেড়ে রেখে গিয়েছে। নিত্য আহারের শাক্‌ পাতার চাইতেও সে দিন দিন লঘু হয়ে উঠ্‌ছিল আর তেম্‌নি লম্বা হয়ে চলেছিল। বিহারীকে নিয়ে জয়লক্ষ্মী যখন এরূপ ব্যস্ত ঠিক্‌ সেই সময়টাতে গৌর সেই অন্ধকার কোন্‌টী থেকে পর পর হেঁচে যেতে আরম্ভ করল। হাঁচি শুনে বিহারী সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডেকে বল্‌লেন—জেগে আছ গোরা? ছোটছেলে গোরার একটা মস্ত বড় বাহাদুরী ছিল। তার জন্য তার বাপমায়ের কখনও কাপড় জামা কিন্‌তে হোত না। সে বছরের পর বছর ছোট হয়েই চলেছিল। চৈতন্য বড়—তার মেজাজও একটু বড় রকমের ছিল। আর খেয়ে না খেয়ে কি রকম করে যে সে মোটা হচ্ছিল তা' বাড়ীর কেউ ঠিক্‌ করে উঠ্‌তে পারত না। প্রতিদিন সকালবেলা উঠেই যেন দেখা যেত তার জামা কাপড় আগের দিনের চাইতে ছোট হয়ে গিয়েছে। সম্ভবমত সে কাগড় গৌরের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হোত। কিন্তু মাসাধিকের বেশী গৌর সে কাপড় জামা ব্যবহার করতে পারত না। এরূপ দ্বিবিধ ভাইয়ের অব্যবহার্য্য জামাকাপড় গোরার গায়ে এসেই পড়ত। সেগুলি তার গায়ে বড় হওয়া ভিন্ন কোনও কালেই ছোট হোত না।

ঐ নিত্য অভাবের উৎসবের মধ্যে বিহারীর গৃহে এদের নিয়ে বেশ আনন্দের হাসি উঠ্‌ত। বিহারী জয়লক্ষ্মীও খুব প্রাণভরে হাস্‌তেন। এও তাই হোল। বিহারীর প্রশ্নের উত্তরে গোরা যখন সেই কোন্‌টী থেকে একটি অত্যুচ্চ নিশ্বাসের মত 'না' বল্‌ল তখন বিহারীর আর জয়লক্ষ্মী

দুজনেই হেসে উঠ্‌লেন। বেগতিক দেখে গৌর পালাবে মনে করে যেমন চৌকী থেকে নাম্‌তে যাবে অম্‌নি হেঁচ্ছ—করে তেলের প্রদীপটীর উপর হেঁচে ফেল্‌লে। জলমেশান তেলের প্রদীপটী নিভে গেল। চৈতন্য জল আন্‌তে অন্ধকারে চৌকাটে পা লেগে ঘটিশুদ্ধ পড়ে গেল। এবার ঘরময় হাসি উঠ্‌ল। সেই হাসির তরঙ্গের মধ্যে বেজে উঠ্‌ল—খন্ খন্ খন্—আর একটী শব্দ—মাগো। সেই সঙ্গে ঘরটী একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। জয়লক্ষ্মী বালিশের তলা থেকে দেশালাই বের করে প্রদীপ ধরালেন। আর সেই আলোর শিখার কম্পনের সঙ্গে ঘরময় হাসির রোল্ উঠ্‌ল। হাঁটু ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চৈতন্য ঘটী করে জল আন্‌তে চল্‌ল। হেমলতা তার সবুজ রঙ্গের কাঁচের চুড়ীর ভাঙ্গা টুকুরাটী খুলে ফেলে আক্‌ক'খানি কুড়াতে বসে গেল। গৌর বাইরে ছুটে গিয়ে একনাক সর্দ্দি ঝেড়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌ল—বাঁ—বাঁ—ফেঁচ্‌চো।

আবার সবাই হেঁসে উঠ্‌ল। জয়লক্ষ্মী এবার একটু জোর করে গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—আর হেসে কাজ নেই—যাওত মা—অনেক রাত হয়ে যাবে নয়ত। চাল আর ডাল ক'টা একসঙ্গেই চড়িয়ে দাওগে। আর দেখ দুটো বেগুণ আছে—আচ্ছা থাক্—ওটা নাব্‌লে আমিই পুড়িয়ে দেব অখন্। ছোট ছেলে গোরা কাপড়ের ভিতর থেকে মুখটি বের করে এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ মা—খিচুড়ী?

খাওয়া দাওয়ার পর ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে জয়লক্ষ্মী বল্‌লেন—কালও কি সকালে বেরুবে?

—জয়লক্ষ্মীর চোখ্ ছল্ ছল করে উঠ্‌ল—অন্ধকারে বিহারী তা' দেখ্‌তে পেলেন্ না।

আর্দ্রস্বরে তিনিও উত্তর করলেন—না খুব তাড়া নেই। তাদের বলে এসেছি, আমি আর বিজ্ঞাপন বিলি করবনা। কি জানি, তেলের যে সব গুণ লিখেছে তা' যদি সব সত্যি না-হয়!

জয়লক্ষ্মী বল্‌লেন—তার আর কি হয়েছে— বেশ করেছ। এখন প্রায় এক সপ্তাহ চালিয়ে নিতে পারব। এ ক'দিনের টাকা থেকে তিন চারটে টাকা এখনও আছে। বাজারের খরচত এ কয়দিন চন্দ্রকান্তবাবুই করেছেন কিনা।

বিহারী হেসে বল্‌লেন—তাই বল। আমি ভেবেছিলাম আজ ছেলেগুলো না খেয়েই থাক্‌বে। ভারী বাহাদুর!

বাহাদুর না? আচ্ছা বেশ, কালই আমি সব টাকাগুলি খরচ করে বাজার করাব?

না, না, তুমি বাহাদুর না! তুমি আমার অদৃষ্টের উপরেও বাহাদুরী খেল্‌চ!

সেই নিস্তব্ধ বিপুল অন্ধকারে জয়লক্ষ্মীর একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিহারী বলে উঠ্‌লেন—দয়াল, দয়াল!

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৮)

নিউইয়র্ক পূর্ব্ব আমেরিকার বাণিজ্য-কেন্দ্র। সেইরূপ শিকাগো পশ্চিম আমেরিকার একটা প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। শিকাগো সহরটা নিউইয়র্কের মতন বড় কিনা ঠিক বলিতে পারি না। শিকাগোতে বেশীদিন আমায় বাস করিতে হয় নাই। নিউইয়র্কের সঙ্গে যতটা পরিচিত হইয়াছিলাম, শিকাগোর সঙ্গে সেইরূপ পরিচয় করিবার অবসর পাই নাই। শিকাগো পশ্চিম আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ানদিগের একটা প্রধান আড্ডা। য়ুনিটেরিয়ানদিগের নিমন্ত্রণেই আমি শিকাগো গিয়াছিলাম। সেবারে শিকাগোতে পশ্চিম আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ানদিগের একটা বড় বৈঠক হয়। এই বৈঠকের বা সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিকাগোর য়ুনিটেরিয়ান মণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সভ্যের গৃহে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ভদ্রলোকটী এবং তাঁহার গৃহিণী আমায় অত্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় যে তাঁহার নামটি আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। সহর হইতে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূরে ইঁহারা থাকিতেন। শিকাগো সহরটা মিসিগান হ্রদের উপরে পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই হ্রদটা খুব বড়। শিকাগো হইতে তাহার পরপার দেখা যায় না। লম্বায় দু'শ মাইলেরও উপর হইবে। এই হ্রদের পারেই একটা নূতন ভদ্র-পল্লী গড়িয়া উঠিতেছিল। আমি যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, তিনি এই পল্লীতেই বাস করিতেন। সেখানে তখনও বেশী ঘরবাড়ী প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু ট্রাম কোম্পানীর গাড়ী রীতিমত যাতায়াত করিত। বিশ ত্রিশ ঘরের লোকের গতিবিধির সুবিধার জন্য ট্রাম কোম্পানী কি লোভে পাঁচ ছয় মাইল ট্রাম লাইন গড়িয়াছিল, প্রথমে আমি ইহার মর্ম্মটা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তারপর এই একরূপ জনশূন্য পথে অনেকগুলি মদের দোকান দেখিয়া আরও বিস্মিত হই। এই বিজনস্থানে এত মদেরই বা কাটতি হয় কিরূপে? আর না হইলে কিসের আশায় এ সকল মদের দোকানই বা খোলা হইয়াছে, আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, শীতের ক'মাস এ দোকানগুলি বন্ধ থাকে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সহরের লোক হাজারে হাজারে হ্রদের ধারে খোলা ময়দানে প্রতিনিয়ত রোদ-হাওয়া খাইতে ও আমোদ প্রমোদ করিতে আসে। সে সময় শিকাগোর নাগরিক ও নাগরীরা এই অঞ্চলের খোলা ময়দানকে নিজের বিলাসভবন করিয়া তোলে। এই সকল লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য ট্রাম কোম্পানীই এই বিজন পথে এতগুলি মদের দোকান খুলিয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমি আঁতকাইয়া উঠিলাম। বলিলাম, "বলেন কি? এ যে

একেবারে খোলা ময়দান। একেবারে পশু যারা নয়, বিন্দু পরিমাণেও মনুষ্যত্ব যাদের জন্মিয়াছে, তারা কি এতটা নির্লজ্জ হইতে পারে?" আমার বন্ধুটি কহিলেন, "শিকাগো যে কতটা নির্লজ্জ আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন না। একদিন যদি সঙ্গে চলেন, তবে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারি।" সে কাহিনী যথাস্থানে বর্ণনা করিব। শিকাগোতে যাইয়া মার্কিণ সমাজের যে জঘন্য চিত্রের পরিচয় পাইয়াছিলাম, আমার শিকাগো-প্রবাসের স্মৃতির মধ্যে তাহা সকলের চাইতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেইজন্য এই কথাটা সকলের আগে মনে পড়িল।

(১৯)

শিকাগোতে য়্যুনিটেরিয়ানদিগের যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহার নাম Western Unitarian Conference। এই বৈঠকটা খুব জাঁকালো হয় নাই। এখানে আমি খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদের সঙ্গে হিন্দু একেশ্বরবাদের তুলনায় সমালোচনা করিয়া একটা বক্তৃতা দিই। হিন্দু একেশ্বরবাদ বলিতে বিশেষভাবে বৈষ্ণব-বেদান্তই বুঝায়। আর বৈষ্ণব-বেদান্তে একটা ত্রিত্ববাদ বা Trinityও আছে, একথা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। খৃষ্টীয়ান ত্রিত্ববাদ বা Trinityর ভিতরে যে একটা নিগূঢ় সত্য আছে, অন্যে পরে কা কথা, খুব বড় বড় খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত ইহা ধরিতে পারেন না। বিলাত-প্রবাসকালে একদিন আমাকে রিপন সহরে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ধর্ম্মযাজক ডিন ফ্রিম্যাণ্টেলের (Dean Freemantle) বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ডিন সাহেব, আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে কহে যে, ঈশ্বর, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা, ইঁহারা একে তিন ও তিনে এক,—One in onisia, different in hypostatis—ইহার অর্থটা কি? ইঁহাদের মধ্যে ভেদই বা কোথায়, অভেদই বা কোথায়?" ডিন সাহেব সরলভাবে কহিলেন, "আমি ইহার অর্থ বুঝি না।" নির্ভীক সত্য কথা কহিলে অনেক ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয়ানকেই এই প্রশ্নের এই উত্তর দিতে হইবে। ইঁহারা এই ত্রিত্ববাদ বা Trinityকে মানববুদ্ধির অনধিগম্য একটা নিগূঢ় রহস্য বা mystery বলিয়া ধামা চাপা দিয়া রাখিতে চাহেন। অন্য পক্ষে য়্যুনিটেরিয়ানেরা বা একেশ্বরবাদী খৃষ্টীয়ানেরা এই ত্রিত্ববাদকে একটা বিরাট মিথ্যা কল্পনা বলিয়া একেবারেই ঠেলিয়া রাখেন। এই ত্রিত্ববাদের মধ্যে যে সত্যটুকু আছে, তাহা আমাদিগের বৈষ্ণব-বেদান্তের আলোতেই কেবল ধরা পড়ে। শিকাগোর য়্যুনিটেরিয়ান-দিগের বৈঠকে আমি এই কথাটাই যথাসাধ্য ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

(২০)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে আমাদের বৈষ্ণব-বেদান্তের ত্রিত্ববাদটি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাগবত-কার কহিতেছেন যে যাঁহারা তত্ত্ববস্তু জানেন, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্বনামে অভিহিত

করেন। অদ্বয়-জ্ঞানস্বরূপ যে তত্ত্ববস্তু উপনিষদ তাহাকেই ব্রহ্ম কহেন। যোগিজনেরা এই অদ্বয়-জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ববস্তুকেই পরমাত্মারূপে ভজনা করেন; আর ভাগবতেরা এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুকেই ভগবান কহিয়া থাকেন। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, এই তিনই একই অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর বিবিধ প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিলয়ের কারণ ও আশ্রয়রূপেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি। যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, যাহাতে বিশ্বের স্থিতি, যাহার প্রতি বিশ্বের গতি, উপনিষদ তাহাকেই ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম সাংখ্যের অচেতনপ্রধান নহে। এই ব্রহ্ম জ্ঞানবস্তু। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—এই সূত্রে বেদান্ত ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রে সকল বেদান্তের সমন্বয় করিয়া সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, অদ্বিতীয় বা অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তুকে জগতের জন্ম-আদি কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্মই ভাগবতের অদ্বয় জ্ঞানবস্তু। অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর অর্থ এই যে এখানে জ্ঞাতা স্বয়ংই নিজের জ্ঞেয়। জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে কোনও কিছু জ্ঞেয় নাই। এই অদ্বয়-জ্ঞানস্বরূপ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যেমন জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় পরস্পর হইতে ভিন্ন নহেন, সেইরূপ যে ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধের উপরে আনন্দের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই ভোক্তা এবং ভোগ্যও এক। ব্রহ্ম যেমন আপনি আপনার জ্ঞাতা এবং আপনিই আপনার জ্ঞেয়, সেইরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আপনিই আপনার ভোক্তা, আপনিই আপনার ভোগ্য। অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু বলিতে এই সকলই বুঝায়। আর ব্রহ্মের বা অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর জ্ঞাতৃ এবং ভোক্তৃস্বরূপকে পুরুষ এবং জ্ঞেয় এবং ভোগ্যস্বরূপকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে প্রকৃতি কহিয়াছেন। এইরূপে অদ্বয় জ্ঞান-স্বরূপের মধ্যে একটা অচিন্ত্য ভেদ এবং অভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগের বৈষ্ণব বেদান্ত তাঁহাদিগের এই ত্রিত্ববাদ করিয়াছেন। যেই ব্রহ্ম সেই পরমাত্মা, সেই ভগবান—এই তিনই এক বস্তু। আর সেই বস্তু অদ্বয় জ্ঞানবস্তু। কিন্তু স্বরূপে এক হইলেও প্রকাশে ভেদ আছে। ইহাই খৃষ্টীয়ান তত্ত্ববিদ্যার ভাষায়—One in onisia, different in hypostatis।

ভাগবতের ব্রহ্ম খৃষ্টীয়ান তত্ত্ববিদ্যার পিতা বা Father। ভাগবতের পরমাত্মা বা অন্তর্যামী খৃষ্টীয় তত্ত্বের Holy Ghost। আর ভাগবতের ভগবান্ খৃষ্টীয়ানদিগের পুত্র Son। মোটামুটী এইরূপই বলিতে পারা যায়। কিন্তু খৃষ্টীয়ান তত্ত্বে পিতার মধ্যে পুত্র এবং অন্তর্যামী বা Holy Ghost বাস করিতেছেন। পিতাই পূর্ণতত্ত্ব; পুত্র এবং অন্তর্যামী বা Holy Ghost এই পূর্ণতত্ত্ব হইতেই প্রসৃত বা প্রকাশিত হইতেছেন। আমাদের বৈষ্ণব ত্রিত্ববাদে কিন্তু ভগবানই পূর্ণতত্ত্ব। ব্রহ্ম এই পূর্ণতত্ত্ব ভগবানের অঙ্গ-আভা মাত্র; তেজ যেমন সূর্য্যের বাহ্য প্রকাশ। আর অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা ভগবানের অংশবিভব বা কলাবিভব। এইখানে খৃষ্টতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রভেদ।

বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া যখন তাহার রহস্যভেদ ও মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটন করিতে যাই, তখন অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মেতে যাইয়া সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব-সমস্যাই মানুষের নিকটে একমাত্র সমস্যা নহে। যেমন একটা ব্রহ্মাণ্ড বা cosmic order আছে, মানুষের ভিতরে সেইরূপ একটা ভাণ্ড বা mental orderও আছে। এই ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেরই অনুরূপ। এই mental order ঐ cosmic orderএরই প্রতিচ্ছায়া। ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখীন হইয়া যে সমুদয় প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, নিজের ভাণ্ডের প্রতি চাহিয়া অন্তর্জীবনের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেও সেইরূপই নানা প্রশ্নের উদয় হয়। ব্রহ্মাণ্ড যেমন বিচিত্রতাময়, এই ভাণ্ডও সেইরূপ বিচিত্রতাময়। ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রতার মধ্যে একত্ব খুঁজিতে যাইয়া যেমন অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হই, সেইরূপ ভাণ্ডে বা আমাদের অন্তর্জীবনের অশেষ বিচিত্রতার মধ্যে সেই একত্বের সন্ধানে যাইয়া সাক্ষী-চৈতন্য বা অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মারূপে অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর অনুভূতি প্রাপ্ত হই। কিন্তু এখানেই সকল সমস্যার শেষ হয় না। ব্রহ্মাণ্ড বা cosmic order, ভাণ্ড বা mental order ছাড়াও আর একটা বিশাল ও জটিল জগত আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। ইহা মনুষ্যজগত বা সামাজিক জগত বা social order। মানুষে মানুষে যে বিচিত্র সম্বন্ধ, এই বিচিত্রতার মূলেও আমরা একত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। এই বিচিত্র সম্বন্ধসম্পন্ন মানুষই এখানে আমাদিগের ধ্যানের ও অনুশীলনের বিষয়। এই মানুষ বিচিত্র জ্ঞানে, বিচিত্র রসে, বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্য দিয়া একটা বিচিত্র পূর্ণতার দিকে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতেছে। মানুষের সামাজিক জীবন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের ছবির পটস্বরূপ। এই সামাজিক জীবনের পটেই এসকল বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে দিয়া মানুষ নিজের পরিপূর্ণ স্বরূপটীকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এখানেও সেই একই প্রশ্ন। এই বিচিত্র সম্বন্ধজালের সূত্রের মূল কোথায়? এই বিচিত্র নাট্যের নট কে? এই প্রশ্নের সমাধানের সন্ধানে যাইয়া আমাদের ভাগবতেরা ভগবদ্‌তত্ত্বে পৌঁছিয়াছিলেন। যে অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রতার মধ্যে ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত, যে অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু অন্তররাজ্যে পরমাত্মারূপে বিরাজিত, সেই অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুই নিখিলরসামৃত ভগবান। এই ভগবানই পূর্ণতত্ত্ব, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা ভগবানের প্রকাশ মাত্র। এই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, স্বরূপতঃ এক হইয়াও প্রকাশতঃ এবং আকারে বিভিন্ন। খৃষ্টীয়ান ত্রিত্ববাদ অনুভবে ধরা যায় না; এইজন্যই ইহা একটা রহস্য হইয়া রহিয়াছে। আমাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে এই ত্রিত্ববাদ অনুভবগ্রাহ্য। বিশ্বসমস্যার এবং আত্মসমস্যার মীমাংসাতে প্রবৃত্ত হইলেই এই বৈষ্ণব-তত্ত্বের সন্ধান এবং সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসাধনার চাবি দিয়া খৃষ্টীয় তত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিলেই তাহার সত্য এবং মর্ম্মটা প্রকাশিত হইতে পারে। এখানে কোনও রহস্যের দাবী নাই, কোনও অতিপ্রাকৃতের কথা নাই। এখানে বিশ্বাস প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান খৃষ্টজগতে আত্মজিজ্ঞাসার কোথাও যদি নিবৃত্তিলাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের হাত ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে।

পশ্চিম আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ানমণ্ডলী সকলের বৈঠকে বা Western Unitarian Conferenceএ শিকাগোতে এই ভাবেই খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ এবং হিন্দু একেশ্বরবাদের পরস্পরের তুলনায় আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার কথাগুলি যে শ্রোতাদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলাম, এমন মনে হয় না। য়ুনিটেরিয়ানেরা ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বগুলিকে নিজেদের চিন্তা এবং সাধনাতে বড় একটা আমল দিতে চাহেন না। ভাসাভাসা ভাবে ধর্ম্মসাধন করিয়া মোটামুটী সাধু-চরিত্র লাভ করাই ইহাঁরা ধর্ম্মজীবনে চরম আদর্শ বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ ইহাঁরা নিতান্ত সরাসরিভাবে এই ত্রিত্ববাদকে একান্ত মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন; সুতরাং এই "মিথ্যার" ভিতরেও যে কোনও প্রকারের সত্য থাকা সম্ভব, এ কথা ইহাঁদের কল্পনাতেও আসে না। এইজন্য আমার কথাগুলি ইহাঁদের প্রাণে যাইয়া কোনও সাড়া দিল, এরূপ বোধ হইল না। য়ুনিটেরিয়ানদিগের নিকটে এ কথা না কহিয়া সুশিক্ষিত সদ্বিদ্বান এবং উদারসাধনাশীল Trinitarian বা ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয়ানদিগের কাছে এ কথা কহিলে বোধ হয় তাঁহারা ইহার কতকটা মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিতেন।

(২১)

উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল Subjection of Women বা নারীগণের পারিবারিক ও সামাজিক বশ্যতা বা দাস্যতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আধুনিক স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনের সূচনা করেন। গত সত্তর আশী বৎসরের মধ্যে য়ুরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের পারিবারিক দাস্যতা ও অধীনতা প্রায় একরূপ দূর হইয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির উপরে কোনও স্বত্ব স্বামীত্ব ছিল না। বিবাহকালে স্ত্রীলোকদিগের দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যাবতীয় বিষয়সম্পত্তিও তাহাদের স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকারে ও কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যাইত। তার পরে বোধ হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Married Women's Property Act অথবা বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের সম্পত্তিবিষয়ক আইন পাশ হইয়া ইংলণ্ডে স্ত্রীস্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। এইরূপে গত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন পারিবারিক পরাধীনতার শৃঙ্খল একরূপ নিঃশেষেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মোটের উপরে আজিকালিকার ইংরাজ বা মার্কিণীয় স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বতোভাবে প্রায় পুরুষদিগেরই মত স্বাধীন স্বাবলম্বী এবং স্বানুবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আর একটা নূতন দাসত্ব শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিতেছে। আগে ছিল পরিবারের দাস্যতা; এখন হইয়াছে দোকানের বা কলকারখানার দাস্যতা। আগে স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ পরিবারের পুরুষদিগের অধীন হইয়া থাকিতেন। এই অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কোনও বিষয়ে তাঁহাদের পক্ষে স্বাবলম্বন ও স্বানুবর্ত্তন আশ্রয় করা সম্ভব ছিল না। সে শৃঙ্খল এখন আর নাই। কিন্তু অন্যদিকে স্বাবলম্বন এবং স্বানুবর্ত্তন আশ্রয় করিতে যাইয়াই স্ত্রীলোকেরা কঠোর

জীবনসংগ্রামের মাঝখানে যাইয়া পড়িয়াছেন। উপার্জ্জনের অধিকার পাইলেই উপার্জ্জনের শক্তি জন্মে না। পরিবারের মধ্যে থাকিয়া উপার্জ্জনশীল পুরুষদিগের আশ্রয়ে বাস করাতে আগেকার স্ত্রীলোকদিগকে হাটে-বাজারে যাইয়া জীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইত না। অতি অল্প স্ত্রীলোকেই বেতনভুক্ ছিলেন। এখন অধিকাংশ স্ত্রীলোককেই জীবিকার জন্য পরের চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। অথচ প্রায় সকল চাকুরীর পথই পুরুষেরা দখল করিয়া বসিয়া আছেন—অন্ততঃ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বসিয়া ছিলেন। আমি যখন আমেরিকায় যাই, তখন অধিকাংশ মার্কিণ স্ত্রীলোকই বড় বড় দোকানে চাকুরী করিতেন। এসকল চাকুরী পাইবার জন্য এত স্ত্রীলোক জুটিতেন যে এই প্রতিযোগিতার ফলে যাঁহারা চাকুরী পাইতেন, তাঁহারাও উপযুক্ত বেতন পাইতেন না। গ্রাহকদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন বিক্রেতার একটা প্রধান ধর্ম্ম। আমেরিকার বড় বড় দোকানের মালিকেরা এইজন্য রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রীলোকদিগকেই তাঁহাদের দোকানে চাকুরী দিতেন। আবার কেবল রূপ ও যৌবন থাকিলেই চলিত না; পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যও থাকা চাই। যে সকল স্ত্রীলোক নিউইয়র্ক বা শিকাগোর বড় বড় দোকানে চাকুরী করিতেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে হইত। অশোভন পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলে দোকানের মালিকেরা সে সকল স্ত্রীলোকদিগকে সরাসরিভাবে বরতরফ করিয়া দিতেন। অথচ গরীব বেচারীরা যে বেতন পাইত, তাহার দ্বারা এইরূপ ফিট্‌ফাট্ পোষাক পরা একরূপ অসম্ভব ছিল বলিলেও চলে। অনেক সময় ঘরভাড়া ও পোষাকের খরচ দিয়া ইহাদের অন্নসংস্থানের জন্য মাহিয়ানার কিছুই প্রায় থাকিত না। এ অবস্থায় এসকল হতভাগিনীরা করে কি? দোকানের চাকুরী ছাড়া ইহারা আর কিছুই করিতে পারে না। সেরূপ কোনও শিক্ষাই ইহাদের নাই। অথচ দোকানে চাকুরীর ত ব্যবস্থা এই! এ অবস্থায় নিজের শরীর বেচিয়া অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা ভিন্ন এ হতভাগিনীদিগের আর কোনও প্রকারের গত্যন্তর ছিল না। এই কথাটা শিকাগোতে যাইয়াই ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম।

(২২)

কহিয়াছি যে আমি যাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম, তিনি একদিন আমাকে শিকাগো সহরের দুর্নীতির দৃশ্যগুলি দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। আমি দেখিতে রাজী হই; কিন্তু পুলিশের লোক সঙ্গে না থাকিলে এ অভিজ্ঞতালাভ আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে, ইহা বলি। গৃহস্বামী তাহার ব্যবস্থা করিতে রাজী হয়েন। ইঁহার জুতার Sole বা তলা তৈয়ার করিবার একটা খুব বড় কারখানা ছিল। এই কারখানায় জুতা তৈয়ার হইত না, কেবল তলা তৈয়ার হইত। প্রতিদিন এই কারখানা হইতে হাজার হাজার জুতার তলা প্রস্তুত হইয়া যাইত। আর এক কারখানায় আর একজন ধনী জুতার উপরের ভাগটা তৈয়ার করিয়া দিতেন। একটা তৃতীয় কারখানায় জুতার এই ভিন্ন ভিন্ন অংশ জোড়া দিয়া গোটা জুতাটা প্রস্তুত হইত।

শিকাগোর জুতার ব্যবসায়ে এই শ্রমবিভাগের পদ্ধতি দেখিতে পাইলাম। আমার গৃহস্বামী তাঁহার কারখানার Superintendentকে ও একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীকে লইয়া একদিন আমাকে শিকাগো সহরের নৈশ দৃশ্যাবলী দেখাইতে গেলেন। সে নিদারুণ করুণ দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় সহরে একতলার নীচের তলাকে basement কহে। একতলার মেজে প্রায় সদর রাস্তার সমতল কিম্বা তাহার চাইতে একটু উঁচু। ইহাকেই ইংরাজীতে Ground-floor কহে। কিন্তু সদর রাস্তাগুলি কতকটা আমাদের রেল লাইনের মত সহরের সাধারণ সমতল ভুমি হইতে অনেকটা উঁচু। সুতরাং এসকল সহরের বাড়ীগুলির পিছনটা সদর রাস্তা এবং তাহাদের একতলা হইতে অনেক নীচু। সদর রাস্তা হইতে যাহাকে একতলা বলিয়া মনে হয়, বাড়ীর পিছন হইতে দেখিলে তাহাকেই দু'তলা বলিয়া মনে হইবে। পিছন দিক থেকে দেখিলে যাহাকে একতলা বলিয়া মনে হয় তাহারই নাম basement। সদর রাস্তা হইতে এই basementএর সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। Basementএর পিছনের দিকের জানালা-দরজা খোলা উঠানে রুজু হইয়াছে। সুতরাং সদর রাস্তা হইতে ঢুকিবার সময় এই ঘরগুলিকে হঠাৎ মাটীর নীচের ঘর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। লণ্ডন সহরের basementএ বহু ভদ্রলোক বাস করে। এই basementএ অনেক বড় বড় সৌখীন দোকানপাটও আছে। শিকাগোতেও তাহাই আছে।

প্রথমেই আমার গৃহস্বামী, তাঁহার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ এবং শিকাগো পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী এবং আমি—আমরা চারিজন সহরের একটা বড় রাস্তার উপরে এইরূপ একটা basementএ যাইয়া নামিলাম। ঢুকিয়াই দেখিলাম, এটা একটা খুব সৌখীন জলপানের দোকান বা Refreshment Hall। এখানে চা, কোকো, কফি, সোডা, লিমনেড্ এবং নানাপ্রকারের মদ্য পাওয়া যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুট, প্যাটি বা মাংসের সমুসা, স্যাণ্ডুউইচ প্রভৃতি "চাট"ও মেলে। ঘরটা আলোকমালায় সুসজ্জিত। ইহার পাশেই একটা বড় হল। মাঝখানের দেয়ালে দরজা নাই, কেবল খিলান আছে মাত্র। সেই হলে অনুমান শতাধিক মার্ব্বেল পাথরের গোল টেবিল ছড়ানো বা সাজানো আছে। আর প্রত্যেক মার্ব্বেল টেবিলের পাশে একটি দুটি করিয়া স্ত্রীলোক সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এইরূপে প্রায় দেড়শত যুবতী মণ্ডলে সেই ঘরটা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। আমার গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা কারা? সহরের এতগুলি বারবনিতা কি এখানে আসিয়া জনতার সৃষ্টি করিয়াছে?" তিনি কহিলেন, "ইহাদিগকে ঠিক বারবনিতা বলা যায় না। ইহারা শিকাগোর Shop-girls; অর্থাৎ দোকানে কাজ করে। কিন্তু সেখানে যে মাহিয়ানা পায়, তাহাতে ইহাদের দোকানে হাজিরা দিবার পোষাকের খরচ করিয়া বেশী কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। যাহা থাকে, তাহার দ্বারা হয় কেবল ঘরভাড়াটা চলে, খাওয়া চলে না; না হয় খাওয়া চলে, কিন্তু ঘরভাড়া কুলায় না।

অতএব গরীব বেচারীরা নিতান্ত প্রাণের দায়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এসকল আড্ডায় আসিয়া নিজেদের নারী-ধর্ম্ম বেচিয়া হয় বাসস্থানের না হয় অন্নের সংস্থান করিয়া লয়। এই সহরে এইরূপ অনেকগুলি আড্ডা আছে।” “এই আড্ডাটা সর্ব্বাপেক্ষা Decent বা সুশীল বলিয়া তোমাকে এইখানে লইয়া আসিয়াছি,” এ কথাটা গোয়েন্দা পুলিশের কর্ম্মচারী মহাশয় কহিলেন। দরজার পাশেই একটা মার্ব্বেল টেবিল পাতা ছিল। এই টেবিলটা কেহ অধিকার করে নাই দেখিয়া আমরা চারিজন সেইখানে যাইয়া বসিলাম। গোয়েন্দা পুলিশের কর্ম্মচারিটি তখন হলের ভিতরে যে সকল স্ত্রীলোক বসিয়াছিল তাহাদের একজনকে ইসারা করিলেন। সে আমাদের টেবিলে আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। দোকানদারের লোক আসিয়া তখন আমরা কি জলযোগ করিব জানিতে চাহিল। আমার গৃহস্বামী পুলিশ সাহেব এবং এই স্ত্রীলোকটির জন্য দুই গ্লাস সাম্পেন, তাঁহার কারখানার সুপারিনটেণ্ডেণ্টের জন্য একগ্লাস বিয়র আনিতে হুকুম দিলেন। তিনি নিজে মদ স্পর্শ করেন না। তাঁহার জন্য ও আমার জন্য একগ্লাস করিয়া লেমনেড আসিল। আমরা সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে তাহাই পান করিতে লাগিলাম। দোকানদারের যা লাভ, এইরূপে মদ বেচিয়াই হয়। এ সকল যায়গায় গেলেই কিছু না কিছু খাদ্য বা পানীয় কিনিতেই হয়। ইহাই সে দেশের রীতি। কিছুক্ষণ পরে সেই স্ত্রীলোকটি পুলিশ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল—“আমার সঙ্গে তোমার কোন কাজ আছে কি?—Have you any serious intention? —না থাকিলে আমায় মাপ কর, আমি এখানে তোমার কাছে বসিয়া থাকিতে পারি না।” সাহেব তখন তাহাকে ‘Good night’—বলিয়া বিদায় দিলেন। আমরাও সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম। তখনও রাত্রি বেশী হয় নাই, বোধ হয় নয়টা সাড়ে নয়টা মাত্র। সুতরাং এখানে তখনও নাগরিকদিগের ভিড় জমে নাই।—শুনিলাম রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত শিকাগো সহরে গণ্ডায় গণ্ডায় প্রায় প্রত্যেক বড় ও সমৃদ্ধ সদর রাস্তার উপরে এইরূপ গণিকার হাট বসিয়া থাকে। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এ সকল কথা পড়িতাম বটে, কিন্তু সহজে বিশ্বাস করা কঠিন হইত। এবারে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিলাম, ইহার জন্য দায়ী কে?

কহিয়াছি এসকল স্ত্রীলোকেরা বারবনিতা নহে, ইহা তাহাদের বৃত্তি নহে; কেবল পেটের দায়ে ইহাদিগকে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া এইরূপে নারীর সর্ব্বস্ব ধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি বেচিয়া বেড়াইতে হয়। এসকল স্ত্রীলোকের ভবিষ্যতের কথা উঠিলে, আমার গৃহস্বামী কহিলেন যে ইহাদের মধ্যে অনেকে ক্রমে দুপয়সা জমাইয়া স্থানান্তরে যাইয়া বিবাহাদি করিয়া ভদ্রজীবন যাপন করিয়াও থাকে।

বাড়ী ফিরিবার পথে তখন রাত্রি প্রায় এগারটা হইবে এক যায়গায় একটা জনতা দেখিয়া গাড়ী থামাইতে হইল। আমি ভাবিলাম যে এখানে বুঝি একটা মারামারি বা খুনোখুনি হইয়াছে।

কিন্তু সন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহা নহে। নিউইয়র্কে সেদিন বড় একটা ফুটবলের ম্যাচ ছিল। তারযোগে সে ম্যাচের হারজিতের খবর আসিয়াছে; আর একটা দোকানের দরজায় বিজলীর আলোকের হরফে সেই খবরটা প্রচারিত হইতেছে, তাহারই জন্য এই বিপুল জনতা। আমার গৃহস্বামী কহিলেন যে এই ফুটবল ম্যাচের উপলক্ষে শিকাগোতে সে দিন অনেক জুয়াখেলা চলিয়াছে; যারা এই খেলার সূর্ত্তির টিকিট কিনিয়াছিল তারা কে জিতিল, কে হারিল, ইহা জানিবার জন্য উৎকন্ঠিত হইয়া আছে; আর এই জন্য সংবাদটা জানিবার আগ্রহে এখানে এই জনতা হইয়াছে। ইহাও আধুনিক য়ুরোপায় সমাজের মতিগতির একটা লক্ষ্য।

(২৩)

শিকাগো হইতে আমি সেণ্টলুই (St. Louis) যাই। সেণ্ট লুইও পশ্চিম আমেরিকার আর একটা বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। রেলগাড়ী হইতে সহরটাকে একটা প্রকাণ্ড মৌমাছির বা বোল্‌তার চাকের মতন দেখাইতে লাগিল। শিকাগো হইতে যে রেল গিয়াছে তাহা সহরের সমতল অপেক্ষা অনেক উঁচু। সুতরাং গাড়ীতে বসিয়া সহরটাকে অত্যন্ত ঘিঞ্জি মনে হইতে লাগিল। য়্যুনিটেরিয়ানদিগের ভজনালয়ে রবিবারে উপাসনা ও বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত ছিল। সেণ্ট লুইতে স্থানীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর একটা ক্লাব আছে। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় তখনও ইহার নাম Nineteenth Century Club ছিল। এই ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ ও আমি সেণ্টলুই যাইতেছি শুনিয়া তাঁহাদের ক্লাবের সভ্যদিগের নিকটে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সোমবারে সন্ধ্যার পরে ক্লাবের সভ্যদিগের একটা ভোজ হয়। এই ভোজের সঙ্গেই আমার বক্তৃতারও বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এখানে বক্তৃতা করি। "ঈশ্বর-দর্শন" যতদূর মনে পড়ে এই বক্তৃতার মূল কথা ছিল। ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে বা জগতের পরমতত্ত্বকে—যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে-জগতের স্থিতি, যাঁহার প্রতি জগতের গতি এবং যাঁহাকে লাভ করা জগতের নিয়তি,—সেই তত্ত্বকে যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তাহাই সার্ব্বজনীন ঈশ্বরতত্ত্ব। তাহাই পরমতত্ত্ব। তাহার মধ্যেই বিশ্বসমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের এই পরমতত্ত্বকে বা ঈশ্বরতত্ত্বকে শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করি। নিজের অন্তরে আমরা এই তত্ত্বকে আমাদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং রঞ্জিনী বৃত্তির মধ্যে সাক্ষী চৈতন্য এবং আনন্দরূপে অনুভব করি। আবার এই পরমতত্ত্বকেই ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বা নরোত্তম বা Super-man রূপে এবং সমষ্টিগত মানব-সমাজে নারায়ণ কিম্বা Humanity রূপে দেখিতে পাই। এই তিনভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের বা ব্রহ্মতত্ত্বের বা পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। ইহার মধ্যে মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরের পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়। মানুষের ভিতরে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া, মানুষের মানবধর্ম্মকে idealise এবং spiritualise করিয়া এক প্রকারের ঈশ্বরদর্শনলাভ সম্ভব। কিন্তু এ দেখা অনেকটা মনগড়া দেখা। এই অনুভূতি

অত্যন্ত আধ্যাত্মিক বা Subjective। এইরূপে ঈশ্বরের স্বতঃপ্রকাশিত স্বরূপ দেখিতে পাই না। স্বরূপ দেখিতে পাই সাধুমহাজনদিগের মধ্যে। সাধুমহাজনের জীবনে ও চরিত্রে ঐশ্বরিক ধর্ম্ম সকল পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলে। এই সকল সাধুমহাজনগণের সাক্ষাৎকার লাভই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ। ইহাই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন। He who has seen the Son has seen the Father—যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে। যীশু খৃষ্টের এই কথার ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম। এইভাবে ঈশ্বরদর্শনলাভ করিতে হইলে মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিতে হয়, নিজেকে দেবতা করিয়া তুলিতে হয় এবং সমাজের আর দশজনকেও দেবতা করিয়া তুলিতে হয়। এইজন্যই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার সময় নিজেদের ঈশ্বরস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি, নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

অর্থাৎ আমি দেবতা, ইতর কিছু নহি। আমি ব্রহ্ম, শোক ও মোহের অধীন নহি। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আমি নিত্যমুক্তস্বভাব-সম্পন্ন। এই শ্লোকের দ্বারা ব্রাহ্মণ আপনার প্রতিদিনের উপাসনার উদ্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজের মধ্যে এ সকল ঐশ্বর ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে এ সকল ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই দিক দিয়া দেখিলে লোকসেবা, সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাবিস্তার, এ সকলই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শনের সাধনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। প্রতিমাপূজকেরা যেমন আপনার দেবতামূর্ত্তিকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলে ও বিবিধ বেশভূষার দ্বারা ভক্তিভরে সাজাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত ঈশ্বরদর্শনপিয়াসি ভক্তদিগকে এই জীবন্ত মানববিগ্রহকে জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে, স্বাধীনতাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঈশ্বরধর্ম্মের দ্বারা সাজাইয়া তুলিতে হইবে। তখন মানুষ আর ঈশ্বরের খোঁজে আকাশে পাতালে ছুটিয়া বেড়াইবে না; নিজের পরিবার ও পরিজনের মধ্যে, নিজের সমাজে ও দেশে এবং বিশ্বমানবের ভিতরে আপনার ইষ্টদেবতাকে খুঁজিবে ও পাইবে। এই বক্তৃতাতে এই কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

পশ্চিম দেশে ধনীতে ও জনেতে বা শ্রমজীবীতে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়া আছে। আর এই জন্য সেখানে সর্ব্বদাই শ্রমজীবীদের ধর্ম্মঘটও হইয়া থাকে। আমি যখন সেণ্ট লুইতে যাই সহরের ট্রামের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। আমি যাইবার পূর্ব্বে ক'দিন ট্রাম চলাচল বন্ধই ছিল। আমি সেণ্ট লুই গেলে পরেও পুলিশের লোকে পাহারা দিয়া ট্রাম চালাইত। আমার সেণ্ট লুই প্রবাসের প্রথম দিনে দু'এক যায়গায় ছোটখাটো মারামারি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সহরে বাহির হইয়া দেখিলাম, স্থানে স্থানে ট্রাম চালাইবার বিজলীর তার হইতে কেরোসিন তেলের

টিন ঝুলিতেছে। কোথাও বা ছেলেদের টিনের বাজনা (Kettle drum) ঝুলিতেছে। অনেক যায়গায়েই এইরূপে ধর্ম্মঘটের লোকেরা ট্রামচলা আটকাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এত উৎপাত উপদ্রব করিলেও সহরের পুলিশ কোথাও ট্রামের লোকদের উপরে কোনও জুলুম করিতে চেষ্টা করে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সে দেশের গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপেই প্রজার অধীন। আর যাদের ভোট দিয়া গভর্ণমেণ্ট চলে তাহাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। সুতরাং মার্কিণের গভর্ণমেণ্ট সহজে এই শ্রমজীবীদিগের কোনও সম্প্রদায়কে ঘাটাইতে চাহেন না। আমার সেণ্ট লুই ছাড়িবার পূর্ব্বেই এই ঝগড়াটা মিটিয়া যায়। এবং ট্রামের শ্রমজীবীরা যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইয়া পুনরায় কাজে যাইয়া জোটে।

সেণ্ট লুইতে আমি যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, তাঁহার নাম প্রেসিডেণ্ট্ উড্ওয়ার্ড। আমেরিকায় স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষদিগকেও প্রেসিডেণ্ট কহে। উড্ওয়ার্ড সাহেব তখন সেণ্ট লুই ম্যান্যুয়েল ট্রেনিং স্কুলের (St. Louis Manual Training School) অধ্যক্ষ ছিলেন। এই স্কুলটি আমেরিকার একটা প্রসিদ্ধ স্কুল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মার্কিণ যুবকেরা এই স্কুলে পড়িতে আসেন। নামেই স্কুলের পরিচয়। এখানে কেবল কেতাবী বিদ্যা শেখান হয় না। প্রথম হইতেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুতার, কামার প্রভৃতির কাজও শেখান হইয়া থাকে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এই স্কুলটা একটা বার্ত্তিক বিদ্যালয় বা Technical School বা Technological Collegeও নহে। এখানে ছুতার কামার প্রভৃতির কাজ শেখান হয়, ছুতার কামার প্রভৃতি তৈয়ার করিবার জন্য নহে, কিন্তু এই সকল বার্ত্তিক বিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধানের জন্য। হাতে কলমে সূত্রধরের কাজ করিতে যাইয়া এখানে ছাত্রেরা প্রত্যক্ষভাবে জ্যামিতির বা Geometryর মূল সূত্রগুলির পরিষ্কার জ্ঞানলাভ করে। কামারের কাজ শিখিতে যাইয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রাকৃত বিজ্ঞানের এবং রসায়ন বিদ্যারও কতকগুলি মূল বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভবলাভ করিতে পারে; বস্তুর আকার ও ওজনবোধ জন্মিয়া থাকে। এইভাবে মানসিক উন্নতির বুনিয়াদ এবং উপায়রূপেই এই স্কুলে manual training দেওয়া হয়। আমেরিকার আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান প্রায় সর্ব্বত্রই এই manual trainingকে শিক্ষার বুনিয়াদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।—সেণ্ট লুইতে যাইয়া ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম। সেণ্ট লুই ম্যান্যুয়েল ট্রেনিং স্কুল দেখিয়া আমার শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে কোনও কেতাব পড়িয়া সে জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ইয়োরোপের চিঠি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১০)

বার্লিন, ২ জানুয়ারি, ১৯২২

বার্লিনের "আল্‌গেমাইনে এলেক্‌ট্রিসিটেট্‌স্‌ গেজেলশাফ্‌ট" জগৎপ্রসিদ্ধ বিদ্যুতের কারখানা। এই কারখানার পরিচালক শ্রীযুক্ত ফেলিক্‌স্‌ ড্যয়েচ্‌। ড্যয়েচের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল।

হ্বিয়েনার "নয়েস্‌ হ্বীনার মাগেন্নাট" দৈনিকে ড্যয়েচের কতকগুলা মত প্রচারিত হইয়াছে। ড্যয়েচ বলিতেছেন—"রাইন দরিয়ার কিনারা হইতে প্রশান্ত সাগরের ব্লাডিবষ্টক বন্দর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে প্রায় ত্রিশ কোটি নরনারীর বাস। এই ত্রিশ কোটি লোকের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হইলে জগতের অন্যান্য দেশের লোকেরা অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য।"

"দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক শস্য উৎপন্ন হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সমুদয় জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায় এবং রুশিয়ায় বিক্রী হইত। কিন্তু এক্ষণে অর্থাভাবে এই সকল অঞ্চলের লোকেরা দক্ষিণ আমেরিকার "মেজ্‌" বাজড়ি খরিদ করিতে অসমর্থ। কাজেই দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা এই কৃষিজাত সম্পদ স্বদেশেই জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহার করিতেছে। এ এক অদ্ভুত বরবাত।"

"মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশে প্রদেশেও অনেক মাল গুদামে পচিতেছে। বিলাতী লিভারপুলের আড়তেও গাঁট গাঁট পশম পড়িয়া রহিয়াছে। এইগুলা কিনিবার লোক জুটিতেছে না। রুশিয়ার পনর কোটি চাষী অনেক বিদেশী মাল খরিদ করিতে পারিত। কিন্তু এখনো রুশিয়াকে ইয়োরোপ ও আমেরিকা বয়কট করিয়া রাখিয়াছে!"

(১১)

বার্লিন, ৪ জানুয়ারি, ১৯২২

রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মাণির হামদর্দ্দি বেশ ঘনাইয়া উঠিতেছে। ফেলিক্‌স্‌ ড্যয়েচ বিবেচনা করেন যে, সোহ্বিয়েট গবর্মেণ্ট রুশিয়ার শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে উল্টাইতে চেষ্টা করিলে রুশিয়ার মহা উৎপাত সৃষ্ট হইবে। তাঁহার মতে এই গবর্মেণ্ট স্বীকার করিয়া চলাই প্রত্যেক দেশের কর্ত্তব্য।

রুশিয়ার রেলপথগুলা মেরামতের ব্যবস্থা হইয়াছে। জার্ম্মাণি এঞ্জিনিয়ারদের ডাক পড়িয়াছে। সাত শ নয়া এঞ্জিন জার্ম্মাণিতে তৈয়ারি হইতেছে—রুশিয়ায় রপ্তানির জন্য। কয়লার অভাবে তেল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। তেলের খনিগুলা পুনরায় কাজে লাগাইবার

চেষ্টা চলিতেছে। বিলাত হইতে কয়লা আমদানি করিবার সুযোগ পাইলেই রুশিয়ার শিল্প দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারিবে।

শুনা যাইতেছে,—রুশ কিষাণেরা নাকি আজকাল বোল্‌শেহ্বিকীদের শিক্ষা বিস্তারের ফলে অনেকটা "মার্জ্জিত" হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগৃহে সঙ্গীতের কেতাব, চিত্রশিল্প, বাদ্যযন্ত্র, গালিচা, গ্রামোফোন ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে নগরের ধনী লোকেরা এইসব দ্রব্য রাখিত। বিপ্লবের ফলে নগরের নরনারী গরীব হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গ্রামের চাষীরা অনেকটা স্বচ্ছল। কাজেই কিষাণরা সহুরে বাবুদের আসবাব আনিয়া নিজ নিজ ঘরে সাজাইতেছে।

(১২)

বার্লিন, ৬ জানুয়ারি, ১৯২২

ম্যাঞ্চেষ্টারের "গার্জ্জিয়েন" কাগজে এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ লিখিতেছেন—"প্রত্যেক বালক ও বালিকাকে ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার যুগ আসিয়াছে। সমাজকে অথবা রাষ্ট্রকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহার নিয়মে প্রত্যেক নরনারী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কিছু না কিছু নয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।"

বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের জন্য এ এক অতি উঁচু আদর্শ। সবই অবশ্য পয়সার খেলা। ওয়েল্‌স্ বলিতেছেন—"পৃথিবীর কোনো দেশেই যথেষ্ট সংখ্যক পাঠশালা নাই। যে সকল দেশের প্রত্যেক পল্লীতে পাঠশালা আছে সেই সকল দেশেও পাঠশালাগুলায় যথোচিত আসবাবপত্র যন্ত্র-কেতাব ইত্যাদির অভাব। অধিকন্তু উপযুক্ত উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপকের সংখ্যাও সর্ব্বত্রই নেহাৎ কম। উচ্চ স্কুলেজের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও কোথাও প্রচুর পরিমাণে টাকা পাওয়া যায় না। কাজেই কি শিক্ষাবিস্তার, কি বিজ্ঞানের সিমানা বাড়াইবার আয়োজন সকল ক্ষেত্রেই সুযোগ নিতান্ত অল্প।"

বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণতাগুলা ওয়েল্‌স্ তলাইয়া আলোচনা করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন—"সকল দেশেই বহুসংখ্যক লোক দুঃখের সহিত বলিয়া থাকে—'অমুক বিদ্যার অমুক শাখা শিখিবার দিকে আমার ঝোঁক ছিল। আমার ইচ্ছা হয় আমি অমুক অমুক নয়া বিজ্ঞানের খানিকটা দখলে আনি। কিন্তু উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ। মনের সাধ মনেই রহিয়া গিয়াছে। জ্ঞান অথবা শক্তি বাড়াইবার যথোচিত সুযোগ আমার কপালে জুটে নাই।'"

কাজেই ওয়েল্‌স্ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"জগতের কয়জন লোক জোরের সহিত বলিতে পারেন—'আমার মস্তিষ্কের যতখানি ক্ষমতা ছিল আমি তাহার ততখানি অনুশীলন করিতে সমর্থ হইয়াছি?' তাঁহাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গুণিয়া বলা সম্ভব।"

পৃথিবীর অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষই শারীরিক হিসাবে অপুষ্ট ও দুর্ব্বল এবং মানসিক মাপ কাঠিতে বেঁটে, খোঁড়া বা পঙ্গু। প্রায় প্রত্যেক লোকই মাত্র আধখানা বা সিকিখানা জীবনের স্বাদ

চাখিতে সমর্থ। পুরা ষোলআনা জীবনের ক্ষমতা ও কৃতিত্ব সংসারে একদম দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

অতএব ওয়েল্‌সের প্রশ্ন এই—"জগতের এই দুর্দ্দশা চিন্তাশীল লোকেরা আর কতদিন চোখ বুঁজিয়া দেখিতে থাকিবে?" যখন কোনো মহাজন বা ব্যবসাদার কোনো ধাতুর খনিতে টাকা খাটাইতে প্রবৃত্ত হন তখন কি তিনি কেবলমাত্র শতকরা বিশ বা ত্রিশ অংশ মালের উৎপত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকেন? কখনই না। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পুরাপুরি একশ ভাগ—অথবা কম্‌সে কম নব্বই অংশ পাইতে ইচ্ছা করেন।

ওয়েল্‌সের মতে শিক্ষাবিধান সম্বন্ধেও মানুষের এই নিয়মই মানিয়া চলা উচিত। "চাই ষোলআনা মানুষ"—ইহাই নয়া শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

(১৩)

বার্লিন, ৮ জানুয়ারি, ১৯২২

মার্কুস গার্ভি নামক আফ্রিকার এক নিগ্রো বীর দুনিয়ার নিগ্রোজাতির কল্যাণ-সাধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছেন। ইনি আফ্রিকা মহাদেশে এক বিপুল নিগ্রো স্বরাজ কায়েম করিতে যত্নবান্। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গার্ভির দল খুব ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। এই দলে এক্ষণে প্রায় চার লাখ মার্কিণ নিগ্রোর নাম দেখিতে পাই।

ওয়াশিংটনের বিশ্বসম্মেলনে গার্ভি এক নালিশ পাঠাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন—"হ্বার্সাই (Versailles) সন্ধিতে নিগ্রোদের মতামত লওয়া হয় নাই। আফ্রিকার ভাগবাটোয়ারা ফাণ্ডে ও নিগ্রোদিগের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই। এই দুই ক্ষেত্রেই নিগ্রোজাতির উপর শ্বেতাঙ্গেরা জুলুম করিয়াছেন। এই জুলুম নিগ্রোরা আর সহিবে না।"

নিগ্রোদের জোর দেখিয়া মিউনিকের এক বড় জার্ম্মাণ-সভার কর্ম্মকর্ত্তারা গার্ভির দলকে তারিফ করিতেছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন—"ফ্রান্স বহুসংখ্যক আফ্রিকাবাসীকে তাহাদের মতামত না জিজ্ঞাসা করিয়াই দুনিয়ার নানাস্থানে যুদ্ধের কাজে লাগাইয়া থাকে। এক্ষণে বহুসংখ্যক আফ্রিকান আমাদের রাইন জনপদে জার্ম্মাণজাতির উপর অত্যাচার করিবার কাজে মোতায়েন আছে। হ্বার্সাইয়ের সন্ধিতে আফ্রিকাবাসীদের গোলামী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করা হইয়াছে।"

এই সন্ধির বিরুদ্ধে আফ্রিকাবাসীরা দাঁড়াইতেছেন দেখিয়া জার্ম্মাণরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ স্বরাজ স্থাপন করিতে না পারিলে জগতে শান্তি আসিবে না।

(১৪)

বার্লিন, ১০ জানুয়ারি, ১৯২২

ফ্রান্সের কান সহরে আর একটা আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন বসিয়াছে। লয়েড জর্জ্জ এই সভায় এক "ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র" গড়িবার প্রস্তাব তুলিয়াছেন।

এই প্রস্তাবে ফরাসী, ইতালিয়ান বা জার্ম্মাণরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে নাই বুঝিতেছি। ইংরেজের ধাপ্পায় ইয়োরোপীয়েরা মজে না।

ইয়োরোপীয়ানরা সকলেই বরং সাবধান হইতেছে। এই তথাকথিত "ইয়োরোপীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের" ছল করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য নিজ ধনশক্তি এবং ব্যবসায় শক্তিকেই প্রবল হইতে প্রবলতর করিতে উদ্যোগী। ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্মাণি ও রুশিয়া এই চার দেশকে কোণ ঠেশা করিয়া ইংলণ্ড দুনিয়ায় একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে চলিয়াছে—এই দৃশ্য কোনো ইয়োরোপীয়ানেরই ভাল লাগে না। কেবল শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি চলিতেছে। ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই ইংরেজের দুস্‌মন বিস্তর আছে। প্রতিদিনই সর্ব্বত্র ইংরেজের শত্রুসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছেও।

জেনেভার তথাকথিত "লীগ অব নেশ্যন্সে"র কাণ্ডকারখানায় বিশ্ববাসী ইংলণ্ডের উপর তিতিবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বুকের উপর বসিয়া ইংরেজ আজ পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতেছে, কাল বাল্টিক সাগরের উপকূলস্থিত জাতিপুঞ্জকে নাকে দড়ি দিয়া টানিতেছে, পরন্তু এশিয়ার মুসলমান সমাজকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িতেছে। না জার্ম্মাণি, না ইতালী, না ফ্রান্স—এই বিলাতী একচ্ছত্র শাসন বরদাস্ত করিতে রাজি। আমেরিকা ত চিরকালই বিরোধী। আর আজ বোল্‌শেভিক রুশিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের যমদূতরূপে এশিয়ার সুহৃৎ ও অভিভাবক। এই সকল কারণেই যুবক ভারতের স্বরাজ আন্দোলন্ দেখিয়া ইয়োরামেরিকার লোকেরা এক নবশক্তি লাভ করিতেছে।

(১৫)

বার্লিন, ১৫ জানুয়ারি ১৯২২

ইতালী ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের ক্ষমতা কমাইতে সচেষ্ট। ফ্রান্সও এই হিসাবে ইতালীর মিত্র এবং ইংলণ্ডের শত্রু। এই কারণেই ইংলণ্ড ফ্রান্সে ও ইতালীতে ঝগড়া পাকাইয়া তুলিতে উদ্যোগী। তাহা সত্ত্বেও এই দুই জাতি সকল প্রকার ইংলণ্ডের ভেদ নীতি সামলাইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দুনিয়ার মত তৈয়ারী করিবার জন্য বিলাতী সাহিত্যরথী এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ সর্ব্বদা বাহাল আছেন।

ফ্রান্সে এবং ইতালীতে বন্ধুত্ব কায়েম হইলে ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ রণতরীর প্রতাপ কমিতে পারিবে। তাহা হইলে এশিয়াবাসীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টা খানিকটা সাহায্য পায়। তুরস্কের আঙ্গোরা গবর্মেণ্টের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফ্রান্স এবং ইতালী ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছেন।

ইংলণ্ড আঙ্গোরার ন্যাসন্যালিষ্ট তুর্কদের শত্রু এবং গ্রীসের মিত্র। আবার ইতালী এবং ফ্রান্স উভয়েই আঙ্গোরার মিত্র এবং গ্রীসের শত্রু।

(১৬)

বার্লিন, ১৯ জানুয়ারি ১৯২২

জাপানী লেখক শ্রীযুক্ত কাওআকামি নিউ ইয়র্কের "হেরাল্ড" দৈনিকে জাপানের পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নানা কথার পর লেখক বলিতেছেন—

"জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ডের মিত্রতা আছে বটে। কিন্তু ভারতবাসীরা স্বয়ং যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সুরু করে তাহা হইলে জাপান ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে বাধ্য নয়। জাপানের জনসাধারণ জাপানসরকারকে কখনো ভারতীয় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ফৌজ পাঠাইতে দিবে না।"

জাপানকে সর্ব্বদাই ইয়োরামেরিকার লোকেরা তাহার মাঞ্চুরিয়া-নীতি লইয়া গালাগালি করিয়া থাকে। তাহার উত্তরে জাপানীরা বলিতেছেন—"ভাল কথা। যেদিন ইংলণ্ড জগতে তিব্বতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে সেইদিন জাপান ও মাঞ্চুরিয়াকে স্বাধীন করিয়া দিবে।"

জাপান সম্বন্ধে ভারতবাসীর জ্ঞান বিস্তৃত ও নিরেট হওয়া আবশ্যক। না বুঝিয়া শুনিয়া জাপানকে বেকুবের মতন গালাগালি করা কোনো কোনো ভারতীয় দলের একটা ফ্যাশন দাঁড়াইয়া যাইতেছে!

(১৭)

বার্লিন, ২২ জানুয়ারি ১৯২২

বোল্‌শেহ্বিক রুশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব শ্রীযুক্ত টিচেরিণ, মস্কোর "প্রাভ্‌ডা" এবং "ইৎস্‌-ভেস্‌ভিয়া" কাগজে রুশগবর্মেণ্টের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ছাপিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে যে, এশিয়ার সকল দেশের সঙ্গে সোহ্বিয়েট রুশের সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বাড়িয়াছে।

ভল্‌গা জনপদের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত রুশ নরনারীর সাহায্যকল্পে সোহ্বিয়েট সরকার তুরস্ক হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য পাইয়াছে। পারস্যসরকার রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি কায়েম করিয়াছে। পারস্যে ইংলণ্ডের ক্ষমতা সম্প্রতি নেহাৎ কম।

আফ্‌গানিস্তানের সঙ্গে রুশিয়ার বন্ধুত্ব অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে। রুশেরা আফ্‌গানজাতিকে শিল্পে ও শিক্ষায় মজবুদ করিয়া তুলিবার জন্য ভার লইতেছে। রুশ গবর্মেণ্টকে আফ্‌গানিস্তান এক বড় মুরুব্বি বিবেচনা করিতেছে।

চীনা রিপাব্লিকের প্রতিনিধি মস্কো গিয়াছিলেন। সেখানে চীনারুশ বাণিজ্যসন্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রুশিয়ার প্রতিনিধি চীনে পৌঁছিয়াছেন। মঙ্গোলিয়ার সঙ্গেও রুশিয়ার লেনদেন বিষয়ে মিত্রতা সুরু হইয়াছে।

মোটের উপর দেখিতেছি ১৯২২ সালের প্রারম্ভে এশিয়ার নরনারী রুশিয়ার নরনারীকে খাঁটি নিঃস্বার্থ স্বাধীনতাপ্রেমিক এবং স্বরাজপ্রবর্ত্তক মিত্র বিবেচনা করিতেছে। ইংরেজের চোখ টাটাইতেছে আর বুক ধড়্‌ ধড়্‌ করিতেছে। জার্ম্মাণরা ইহাতে খানিকটা সুখীই আছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

জীবনই স্ব-তন্ত্রতা

আজকাল জাতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে নারীরও জাগবার কথা উঠেছে। নারীর বাঁধন, নারীর দুঃখ, নারীর অভাব, নারীর অপমানে অচলায়তনের হিন্দুর মন আজ অনেকখানি নড়েছে। এ জাতি বাঁচতে চায়, মরণ-ভীত জাতি আজ জীবনামৃতের সন্ধানে বেরিয়েছে, নূতন শঙ্খনাদে আজ চারিদিকে দেখ সৃষ্টির সাড়া। মানুষ যে সত্যের প্রকট বিগ্রহ, তার দু'টি রূপ, সত্য আর তার লীলা, দেবতা আর তার সৃষ্টি, ভাব আর তার তনু। ভগবান এক হলেও সৃষ্টির মাঝে নামতে গিয়ে দুই, এইভাবে দুই বলেই তাঁর সত্যঘন তনু থেকে যত শক্তি বেরিয়েছে তাদের সবারই যুগ্ম ব্যঞ্জনা, যুগল রূপ, দ্বিধা প্রকাশ। আকাশের বিজলী লোহার তারে ধরতে গেলে তারের দুই মুখে সে শক্তির দুই রকম প্রকৃতি জাগে। এই হিসাবে পুরুষ ও নারী একই সত্য-প্রেরণার যুগল বিগ্রহ, তারই হরগৌরী রূপ। এ জগতে মানুষের সব খেলা, সব সৃষ্টি, সব ভাব এই দু'জনকে নিয়ে সার্থক ও পূর্ণ। যারা এমন করে নিবিড় সংযোগে যুক্ত, শক্তি দ্যোতনায় এক, তাদের এক অঙ্গে মৃত্যুর পরশ পড়লে অন্য অঙ্গও মরে আসে; তারা বাঁচে তো এক সঙ্গেই বাঁচে, মরে তো এক সঙ্গেই মরে, তাদের সৃষ্টি স্থিতি বৃদ্ধি ও ক্ষয় একই শিবের নৃত্যরঙ্গে হয়। তাই আজ আমাদের দেশেও পুরুষ নূতন জীবনে নবসত্যে বেঁচে উঠছে বলে নারীরও অবশ অঙ্গে সাড়া জেগেছে।

নারীকে আমরা কবিতায় কলায় নাটকে উপন্যাসে শক্তি বলি, তারা যে সত্যকার জীবনে কত দিকে কত ভাবে শক্তিরূপিণী তা' সহজ দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। কোথাও সে শরণের পরম ছবি মা, কোথাও সে শৈশবের খেলার সাথী বোন, কোথাও সে আনন্দের সহধর্ম্মিনী স্ত্রী, কোথাও সে তোমারই জীবনের হোমে উত্থিতা নব মন্ত্ররূপিনী কন্যা। নারী দশমহাবিদ্যার মত বহুরূপধারিণী, নব রসে চতুঃষষ্টি কলায় কলায় বিচিত্র রসময়ী এ নারীকে ছেড়ে জীবনের কোন অঙ্গই পূর্ণ নয়, কোন সাধনাই সফল নয়, কোন মন্ত্রই সিদ্ধ নয়। নারী যেমন বহুরূপে বহুভাবে বহু রস সত্তায় পুরুষকে ঘিরে আছে, পুরুষও তেমনি বহু আশ্রয়ে, বহু অধিষ্ঠানে বহু সত্যে নারীকে ধরে আছে।

আজকাল নারীর নূতন জীবন-বেদ যাঁরা প্রলয়জল থেকে উদ্ধার করতে চান, যাঁরা নারীকে সত্য করে সার্থক করে গরীয়সী করে গড়তে চান, তাঁরা দু'দলের মানুষ। কেউ বলেন পুরুষ থেকে নারীকে মুক্ত কর, নিয়মকে ভাঙ্গ, গণ্ডীকে মুছে দাও, তাকে মানুষ হতে দাও আগে, নারী সে নিজের সহজ ছন্দে আপনি হবে। অপর পক্ষ বলেন, নিয়মের রেখায় গণ্ডীর আঁকে ধর্ম্মের প্রেরণায় আগে নারীর সতীত্ব, নারীধর্ম্ম, তার কমনীয় লালিত্য ও মাধুরী অক্ষুণ্ণ রাখ,

তার পরে সেই গণ্ডী বড় করে অল্পে অল্পে তাকে মুক্তি দিও। একদল শিবের চেলা, ভাঙনের গুরু; আর একদল বিষ্ণুর চেলা, স্থিতির গোঁড়া, পুরাতনের ছাঁচের মামুলী মিস্ত্রী। অথচ সত্য আছে দুই দিকেই, ভেঙ্গে ভেঙ্গেই গড়তে হয়. গড়তে গড়তেই ভেঙ্গে যাওয়াই সার্থক ভাঙ্গা। ভেদও যত বড় সত্য, মিলনও তত বড় সত্য, একটি আর একটির মুখাপেক্ষী, এ ওর পরিপোষক। নারীর নূতন জীবন গড়্তে হলে দু'টি দিক রক্ষা করে তা' গড়তে হবে, নারীকে মুক্তি দিয়ে আর পুরুষের সঙ্গে তার সার্থক মিলন রচনা করে।

একদিন হিন্দুজাতি ছিল জীবন্ত, তার রক্তের তালে তালে ছিল সৃষ্টির সুর। তখন তারা যুগে যুগে নূতন স্মৃতি লিখে লিখে সমাজকে জীবনের সঙ্গে রূপান্তর করে নিয়ে চলতো। তারপর বহুশতাব্দীর পরবশতায় হিন্দুর ঋষিত্ব ঘুচে গেল, তার সত্য দৃষ্টির অপলাপের সঙ্গে সঙ্গে সৃজন করতেও সে ভুলে গেল। তখন থেকে পুরাতন নিয়েই তার কারবার, তাই তখন নিয়ম হ'লো শক্ত, ছাঁচ হ'লো কঠিন, গণ্ডী হ'লো দুরতিক্রম্য। সেই থেকে সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, কলায়, সাহিত্যে আমরা অচলায়তনে অচল হয়ে বসে আছি। তারপর যখন কালের আবর্ত্তনে আবার জীবনের সাড়া এলো, নূতনের প্লাবন বইলো, তখন সেই নেশায় গতিকাণা মানুষ নিয়মের, বাঁধনের, অচলতার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। রুখে গিয়ে তারা বলল, "দে সব ভেঙে দে।"

এই যে রাগ, এ রাগও সৃষ্টির বিধানে আপনি উঠেছে, এ 'অসহিষ্ণুতারও কারণ আছে, সার্থকতা আছে। নারীকে আমরা যে কেবল বেঁধে ক্ষুদ্র করেছি তা' নয়, নারীর সঙ্গে এসে যেখানে মিলেছি সেটি তার মাটির আঙিনা, দেহ ও প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণার ভোগপুরী। চিন্ময়ী নারীর পদ্মাসনা স্বরস্বতীরূপ সেখানে নাই, যার পদতলে পশু ও যার শূলে বিদ্ধ অসুর, সে অপরূপ শক্তির দুর্গা সেখানে নাই, সেখানে আছে মূঢ়া মৃন্ময়ী নারী, চঞ্চলা কামনাতুরা প্রাণময়ী নারী। জ্ঞানের মনের ভূমি হতে আমাদের স্ত্রীপুরুষের মিলন মাটির দিকে নেমে গিয়ে বিরাট মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। এ মিলনে জগত্তারণ বিশ্বপাবন কোন সত্তাই নাই, এ মিলন দেহের দিকেই শুধু টানে, প্রাণের ক্ষুধায় বাঁধে, হৃদয়ের স্নেহকাতরতায় অন্ধ করে। তাই আজ দিন এসেছে নারীকে শুধু নূতন করে মুক্তি দেবারই নয়, বৃহত্তর সত্যতর মিলন রচনারও। নারীর সঙ্গে পুরুষের ভেদকেও সত্য করতে হবে, আবার মিলনকেও সত্য করতে হবে।

এই কথা বুঝলেই সব কথা বোঝা হবে, যে, সত্য যা' তা' তার অখণ্ডতায়ও যেমন সত্য তার বিচিত্রতায়ও, তেমনি সত্য। একটি আর গুলিকে ধরে আছে, পূর্ণের মাঝে তার যত দ্বৈত সবই সার্থক, সবই ঠিক। তাই মুক্তি আর বাঁধন বিরোধী নয়, একত্ব আর ভেদে অসামঞ্জস্য কোথায়ও নাই। যারা মুক্তি চায় তারা বাঁধনকে ছিঁড়তে হবে বলে বাঁধনকে বিষ-চোখে দেখে, মনে করে বাঁধন বুঝি বড় মিথ্যা, বড় মারাত্মক। কিন্তু সে কথা যথার্থ নয়, বাঁধনেরও সত্য আছে, রেখার বাঁধনে নির্ব্বিশেষকে ঘিরেই না রূপের রচনা, গণ্ডীর মাঝে বিপুলকে ভাগ ভাগ খণ্ড খণ্ড

করেই না সৃষ্টির খেলা। দুইই সত্য, মুক্তিও সত্য, বাঁধনও সত্য। নদী যেমন তার উৎসের দিকে খোলা, আর সঙ্গমের দিকে খোলা, অথচ দুই তটের কোলে কোলে বাঁধা, জীবন রচনা করতে হবে সেই ভঙ্গী ধরে। যে সত্য মানুষের জীবনে রূপ নেয়, কি সাহিত্যে, কি কলায়, কি সমাজে, কি ধর্ম্মে, সকল জায়গায়ই সেই সত্যকে দুই দিকে মুক্ত রেখে তট-বেষ্টনের মাঝে নানা রঙ্গে বইয়ে নিয়ে চলতে হবে। তাকে ফুটতে দিতে হবে একেবারে অবাধ মুক্তির উৎসে, তাকে গিয়ে পড়তে দিতে হবে তেমনি অবাধ অকূল সাগরে, কিন্তু বাঁধন রচতে হবে আশে পাশে। সে বাঁধনও নিরেট ঋজু কুশ্রী হ'লে চলবে না, সে তট-রেখা বেগবতী জীবন-নদীর লীলা গতির মুখে হেলবে দুলবে, এঁকে বেঁকে চলবে, তবে তো ঐরাবতের গরবনাশা প্রবাহ তার বিচিত্র নাগ গতিতে আপন ভরপুর সুখে সফল হবে।

এই যে যুগগুলি ধরে ভারতের নারীত্ব পুরাতন জীবনের মরা গাঙ্গে পঙ্কিল ধারায় বইছিল, তা' জাতির গোলামীর যুগ, নকলনবিশের যুগ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা কালের উপযোগী করে যুগে যুগে নারীর যে ছবি এঁকে গেছেন, তা' তাঁদের সৃষ্টির প্রতিভার নিদর্শন। আধুনিক আমরা সৃষ্টির কথা ভুলে, জীবনকে প্রাণের 'খর বরষায়' নূতন বিপুলতা ও গতিভঙ্গী দিতে ভুলে সেই পুরাতনেই মজে আছি, জীবনের মুক্তিকে ভুলে বাঁধনকে সার করেছি, তাই নারী আজ বিদ্রোহী, তাই তার বাঁধন আজ পায়ের শিকল। তাই আজ মুক্তি বাঁধনের বিরোধী, বাঁধন মুক্তির শত্রু। জীবনের পূর্ণ সত্য হারিয়ে গেছে, তাই সব খণ্ড সত্যগুলিও মিথ্যা হয়ে উঠে পরস্পর বিরোধী দেখাচ্ছে।

আজ আবার মুক্তিকে জীবনের ভিত করে বাঁধনকে তার সহচরী করে নিতে হবে। এই কথা স্মরণ রাখতে হবে, যে, যাকে বাঁধতে চাই সে অসাড় জড় স্থাণু নয়, সে একান্তই জীবন্ত সচল পরিবর্ত্তনময়ী কিছু। যে বাঁধনে তাকে বাঁধবো সে বাঁধন হবে আলগা, সহজ, জীবনের অতি কোমল ফাঁস গেরো; যা' দরকার মত আবার খুলে বাঁধা যায়, যে তটরেখা নদীর গতি বুঝে বেঁকিয়ে নেওয়া যায়, যে জীবনপট নাটকের রসের রঙ্গ বুঝে বার বার পরিবর্ত্তন করে নূতন পট খোলা চলে। আজ মুক্তির যুগে কোন অচলায়তনের মাঝে অমৃতের পথ মিলবে না, কি রাজনীতিতে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে, কি ধর্ম্মে আজ গড়তে হবে আঘাতের পর আঘাতে, নবীনকে ডাকতে হবে দুয়ারের পর দুয়ার খুলে খুলে, বৃদ্ধির অবকাশ দিতে হবে গ্রন্থীর পর গ্রন্থী শিথিল করে করে। জীবন যে চিরদিনই ফোটে নিবিড় কালো পটের গায়ে উজ্জ্বল আলোর রেখার ঘেরে, মুক্তি যে এখানে বাঁধনকে ভেঙে ভেঙে মূর্ত্ত হয়, বাঁধন যে এখানে মুক্তিকে ঘিরে ঘিরে রূপ দেয়। নারীর নূতন জীবন-বেদ মুক্তির পৃষ্ঠায় নূতন, সার্থক—ও সফল বাঁধনের আখরেই লিখতে হবে। নারীকে ছেড়ে দাও, মরা সমাজের ধর্ম্মের নীতির আচার বিচারের বাঁধন থেকে তাকে ছেড়ে দাও; তার সহজ নারীত্বের সত্যে অবলীলায় সে ফুটে উঠুক নারী হয়ে, মানুষ হয়ে, পুরুষের সহচরী সহধর্ম্মিনী হয়ে। সেই নূতন জীবন

তার ফোটবার সহজ ভঙ্গী আপনি প্রকাশ করবে, সত্য জীবনের সত্য নিয়ম আপনি আসবে। নিয়ম যে জীবন-দেবতার চরণ গতি, সে দেবতা চললে নিয়ম আপনি আসে; জীবনই নিয়মকে গড়ে, নিয়ম জীবনকে গড়তে পারে না, ক্ষুণ্ণ করে মাত্র। জীবন তরল বেগময়ী দ্রবধারা, নিয়ম তার তরঙ্গের মাত্রা, স্রোতের তাল; দুই-ই যদি মুক্ত থাকে তাঁ' হ'লে দু'জনেই দু'জনকে গড়ে, দু'জনেই দু'জনকে অর্থময় গতিময় ছন্দময় করে তোলে। জীবনের যে একটি ধ্রুব সত্য আছে, তার যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সার্থক ধর্ম্ম আছে, সে বিশ্বাস হারিয়েই আমরা আজ মরণের দুয়ারে। আমরা ভাবি জীবন বুঝি বুনো হাতি, সে বুঝি সত্যের কমলবন দলে দলেই চলে যায়, অঙ্কুশ প্রহার বিনা তাকে বুঝি পোষ মানানো যায় না। জীবন যে আপনি ঋষি, আপনি আপনার সত্যের দ্রষ্টা, মন্ত্রের জনক, সার্থকতার শিল্পী তা' ভুলেই ভারতবাসী আজ এত প্রাণহীন। আমাদের আবার জীবনের সত্যে শ্রদ্ধাবান হ'তে হবে, পিঁজরা ছেড়ে মুক্ত আকাশে উড়তে শিখতে হবে, অন্তর থেকে নিজের গড়া শিকল কেটে স্বাধীন স্ব-তন্ত্র হ'তে হবে। কারণ আমার ভিতরের অন্তরশায়ী নারায়ণই সব, আমার "স্ব"-ই সকল স্থষ্টির মূল তত্ত্ব, তার গড়া সহজ তন্ত্রই স্ব-তন্ত্রতা।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ছিটে-ফোঁটা

সুসমাচার

খেজুর গুড়ের গন্ধ ঢুঁড়ে বইছে বাতাস উত্তুরে;
"যাস্‌নে ভুলি' আস্‌কে পুলি" বল্‌ছে সোঁ সোঁ সুত্তুরে
ঘরে ঘরে ঢেঁকির পাড়ে উঠ্‌ছে যেন ধ্বনিয়ে,
"ঢেঁকর মকরসংক্রান্তি এল বলে ঘনিয়ে।"
সেদিন মাঘের বঙ্গবাণী পাবেন পাঠক পাঠিকা;
পিঠের সাথে মিঠে বাণী, পাথরে পাঁচ চাটিকা।

* * *

শুভযাত্রা

ওরে মজুর! "আজ্ঞে হুজুর!" কেনিয়াতে ঠাঁই নাই।
"যাব কোথা?" সেইত কথা! প্রাণের যখন থাঁই নাই—

(এই মাহাত্ম্য হিঁদুর মস্ত !) হেন মুল্লুক প্রায় নাই
যেথায় নাহি পারিস্ যেতে,—পাথেয়াদির দায় নাই ;
যেতে পারিস্ আণ্ডামানে, হণ্ডুরসে, চায়নায়,
মেরে খাইবো, টিটিকাকা,—ঠিক্ মিলেছে ! গায়নায়
দেদার পাথর পাথার ভূমি,—লোকে সে দেশ ছায় নাই ;
খেটে খেলেই পেটে জোটে ; কিসে বল আয় নাই ?
"আচ্ছা রাজী ! তবে সাজি । কিসে মোদের রায় নাই ?
মোদের দেশের নচিকেতা কোথায় বল যায় নাই ?"

* * *

সাহিত্যিক ফলার

সাহিত্যিকী কীর্ত্তি আমার,—আ মরিরে, কি লিপি ?
সোজা কথা পেঁচিয়ে রচি (বিনা রসে) জিলিপি ।
কৌশলেতে কইতে কথা, কাব্য-কলা ধরেছি ।
বুড়া ভাব ছেড়ে, ভাবের ছানা সার করেছি ;
স্পষ্ট না হ'ক তাদের বুলি,—বল্‌বে না তা' মিষ্টি কে ?
যতই বেশি মিহিদানা ততই খুসি Mystic-এ ।
খুঁজিস্‌নারে অর্থ মিছে, লেখার নীচে তলা রে !
পাবে তাহা লাগে যাহা, সাহিত্যিকের ফলারে ।

* * *

পৌরাণিক প্রশ্নোত্তর

প্র—এই কি সে বৃন্দাবন, এই কি সে মথুরা ?
কেন বা না বাজে বাঁশী,—কোথা গোপ-বধূরা ?
উ—ঝালা পালা কান,—তাই গেছে যথা নির্জ্জন;
হেথা খোলে কর্ত্তালে চেঁচামেচি কীর্ত্তন ।
প্র—কেন এতে ভগবান না হলেন শক্ত ?
উ—ভগবান থেকে ঢের বড় তাঁর ভক্ত ।
প্র—ভক্তেরা—কেন শুনি, না হলেন ঠাণ্ডা ?
উ—ভক্তের চেয়ে দড় তাঁহাদের পাণ্ডা ।
দশে মিলে করে গোল,—সে দশের চক্রে,
একেবারে মরে' ভূত ভগবান অগ্রে ।
হুড়ো দিয়ে ভগবানে, মুড়ে তাঁকে অর্চ্চে ;
এই রীতি বলবতী মন্দিরে চর্চ্চে ।

আইন আদালত

শাসন ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা—দুষ্টকে দমন করিয়া শিষ্ট পালনের জন্য যে দণ্ডবিধি আছে, তাহা ন্যায় বিচারে চালাইতে হইলে প্রয়োগ-পদ্ধতিকে ভাল করিতে হয়,—ফৌজদারী কার্য্য বিধিকে ন্যায়সঙ্গত ও ভেদ বিচারবর্জিত্ করিতে হয়; সেইজন্য এদেশের ফৌজদারী কার্য্যবিধি হইতে অপরাধীর বিচারের হিসাবে সাদায়-কালায় প্রভেদ ঘুচাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে, এবং বিচার-বিভ্রাট ঘুচাইবার সঙ্কল্পে শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। সাদায় কালায় প্রভেদ তুলিবার জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট অবলম্বনে আইনের খসড়া হইয়াছে ও শীঘ্রই উহা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইবে; খসড়াটি হাতে পাইলে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিব।

শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করিবার প্রস্তাবে যে সভা বসিয়াছিল, তাহার অভিমত মুদ্রিত হইয়াছে; সেই বিষয়ে কিছু লিখিতেছি। যিনি শাসন চালাইতে গিয়া কোন লোককে অপরাধী মনে করেন, তিনি যে সে অপরাধীকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন না, ইহা সকল সভ্যদেশে স্বীকৃত, এদেশেও স্বীকৃত। ৪২ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের ছোট লাট ইডেন সাহেব শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করিবার অনুকূলে একটি মন্তব্য লিখিয়াছিলেন; সে মন্তব্য ধরিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট কোন কাজ করেন নাই। বারিষ্টার মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ঐ প্রস্তাব তুলিয়া এদেশে সাধারণের মধ্যে উহার বিচার চালাইয়াছিলেন; এত কাল পরে সরকার বাহাদুর ঐ প্রস্তাবের উপযোগিতার বিচার করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মেজিষ্ট্রেট যদি নিজে বিচার করিয়া দণ্ড দিতে না পারেন, তবে এদেশের লোকেরা তাঁহাকে সভয়ে শ্রদ্ধা করিবে না,—এই ছিল গবর্ণমেণ্টের প্রধান আপত্তি; যখন দেখা গেল সে আপত্তি তেমন কাজের আপত্তি নয়, তখন দ্বিতীয় আপত্তি উঠিল যে, এরূপ বিভাগ বাড়াইলে অসম্ভব রকমে ব্যয় বাড়িবে। এবারকার অনুসন্ধান সভায় এই উভয় আপত্তিই বিচারিত হইয়া মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

সভ্যদের মতে বিভাগ দুইটি স্বতন্ত্র করিলে যে ব্যয় বাড়িবে, তাহা অল্প কয়েক লক্ষ টাকা মাত্র, এবং সেই ব্যয় ন্যায় বিচারের খাতিরে অপব্যয় হইবে না। সভার সুপারিস এই যে, জেলার কলেক্টার সাহেব থাকিবেন জেলার সুশাসন ও শান্তি রক্ষার কর্ত্তা ও রাজকর প্রভৃতি বিষয়ে আইন চালাইবার মালিক; আর তাঁহার অধীনে যে সকল ডেপুটী, সব-ডেপুটী থাকিবেন, তাঁহারা ডেপুটী কলেক্টার হইবেন কিন্তু মেজিষ্ট্রেট হইবেন না। যে সকল ডেপুটী, সব-ডেপুটী নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের কতগুলিকে বিচার বিভাগে লওয়া হইবে, ও তাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশনস্ জজের অধীনে মাজিষ্ট্রেটী করিবেন। ভবিষ্যতে হাকিম নিয়োগের সময়েই বিচার ও শাসন বিভাগের জন্য

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিয়োগ হইবে। একথাও হইয়াছে যে, বিচার বিভাগের হাকিমেরা শাসন বিভাগে, অথবা শাসন বিভাগের হাকিমেরা বিচার বিভাগে বদলি হইতে পারিবেন না। এই শেষ মন্তব্যটি সম্বন্ধে সভ্যদের মধ্যে মতভেদ আছে। এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মেজিষ্ট্রেটদের বিচারের আপিল হয় জেলা মেজিষ্ট্রেটের আদালতে; উহা তুলিয়া দিয়া সে আপিল জেলার জজ ও তাঁহার অধীনের বড় বিচারকের হাতে দেওয়ার সুপারিস হইয়াছে।

একটি বিষয়ে জেলা মেজিষ্ট্রেটকে বিশেষ প্রয়োজনের সময় পড়িলে বিচার করিবার ক্ষমতা দিবার কথা আছে। বিষয়টি এই:—যদি দাঙ্গা হাঙ্গামার সম্ভাবনা দাঁড়ায়, অর্থাৎ শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয়, কিংবা যদি বেরোজগার বদ্‌মায়েস বা অন্য রকমের বদ্‌মায়েসেরা উপদ্রব ঘটাইতে পারে মনে হয়, তবে জেলার মেজিষ্ট্রেটকে যদি শান্তি স্থাপনের জন্য ও দুষ্টের দমনের জন্য বিচার বিভাগের কাজের প্রতীক্ষা করিতে হয়, তবে সুশাসন চলা কঠিন হইতে পারে। সভ্যেরা এ বিষয়টির সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি কলেক্টার ও পুলিশের কর্ম্মচারীরা যাহাদিগকে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাহাদের চালানের উদ্যোগ করিয়া দেন, তাহা হইলেই বেশির ভাগ সময়ে শাসনে কোন ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। অকস্মাৎ যদি ঐ শ্রেণীর অপরাধ, বিশেষ শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়ায় তবে মেজিষ্ট্রেট নিজে বিচারের ভার লইতে পারেন; কিন্তু এস্থলে মেজিষ্ট্রেটকে নিজের হাতে বিচারের ভার লইবার কারণগুলি স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে, এবং সে কারণগুলি উপযুক্ত কিনা, তাহা জেলার জজ বিচার করিতে পারিবেন। এ সম্পর্কে মেজিষ্ট্রেটেরা যে বিচারাদি করিবেন, তাহা সকল সময়েই আপিলযোগ্য হইবে, ও সে আপিল জেলার জজের কাছে হইবে। কি ভাবে এই সুপারিশগুলি গৃহীত হইবে, তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

নানা কারণে কয়েক বৎসর পূজার ছুটীতে বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই। এবার স্থির করিয়াছিলাম যে পূজার বন্ধের সকল সময়টুকুই বাড়ীতে কাটাইব। কিন্তু, আমার এই সঙ্কল্প দেখিয়া অলক্ষ্যে একজন নিশ্চয়ই হাসিয়াছিলেন; কারণ, ছুটী আরম্ভ হইবার দিন প্রিন্সিপাল সাহেব ডাকিয়া বলিলেন যে, কলেজের ঐতিহাসিক সমিতির সদস্যবৃন্দ ঐতিহাসিক স্থান দেখিতে যাইবেন স্থির হইয়াছে এবং আমাকেই তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। ফলে, পূজার কয়দিন বাড়ীতে থাকিয়া একাদশীর দিবসই আমাকে আবার প্রবাসাভিমুখে রওনা হইতে হইল। পাটনায় পৌঁছিলাম প্রাতে—সন্ধ্যায় ছাত্রদিগকে লইয়া যাত্রা করিলাম। স্থির হইল, ভূপাল, সাঁচী,

আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী হইয়া আলাহাবাদের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। সময় নয়দিন কারণ দশদিনের দিন কলেজ খুলিবে। দিল্লী, আগ্রার জন্য সবিশেষ টান না হইলেও, মথুরা, বৃন্দাবনের নাম শুনিয়া আর একজন নাচিয়া উঠিলেন। "পথি নারী বিবর্জ্জিতা"—কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন, সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ কর। বিশেষতঃ সঙ্গে দশজন ছাত্র থাকিবে, টিকিট কেনা, লগেজ করা, গাড়ী ডাকা, আপদ বিপদে সাহায্য পাওয়া যাইবে মনে করিয়া সকলকেই লইয়া বাহির হইলাম। নয় দিনে অতগুলি স্থান দেখাইতে হইবে; বুঝিতে পারিলাম, এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু, উপায় নাই।

প্রথম কাণ্ড—ভূপাল

ভূপাল পৌঁছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে আর একবার ভূপাল আসিয়াছিলাম। তখন যুদ্ধ চলিতেছিল; যুদ্ধোপযোগী বক্তৃতা করিবার জন্য বেগম সাহেবা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ছায়াচিত্রের সরঞ্জাম সহ আসিয়া বেগম সাহেবার অতিথিরূপে ছিলাম। ভূপাল মধ্যপ্রদেশের একটী করদরাজ্য। ভূপাল রাজ্য ১৫৭ মাইল দীর্ঘ ও ৭৬ মাইল প্রস্থ; লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। বাদশাহ ঔরংজীবের সময়ে দোস্ত মহম্মদ নামক এক পাঠান এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাদসাহের মৃত্যুর পরে একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে থাকেন। মহারাষ্ট্র ও পিণ্ডারীর অত্যাচারে ভূপাল রাজ্য জর্জ্জরিত হইয়াছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি গডার্ড প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধে অগ্রসর হইবার কালে ভূপালরাজ্য হইতে বিশেষ সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন এবং তদবধি ইংরাজরাজের সহিত ভূপালের সখ্যতা চলিতেছে। ১৮১৮ সালে তদানীন্তন নবাব মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার বিধবা কুদিসা বেগম রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৮৩৭ সালে কুদিসা বেগমের জামাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদ নবাবরূপে অভিষিক্ত হন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী সেকন্দর বেগম ১৮৬৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার কন্যা শাহজাহান বেগম অতঃপর রাজত্ব করেন। বর্ত্তমান বেগম সুলতান জাহান্ বেগমের ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জালালাবাদের আহাম্মদ আলি খাঁ নামক এক সুদর্শন যুবকের সহিত বিবাহ হয়। সুলতান জাহান বেগম এক্ষণে বিধবা। তিনি উর্দ্দু ও ইংরাজীতে বিশেষ সুশিক্ষিতা। উর্দ্দুতে তিনি যে নিজ জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সুপাঠ্য। উহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদক উর্দ্দু গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Nawab Sultan Jahan Begam does not claim to have written a book that will interest the general public. But perhaps her own remarkable personality, the unique position which, as a female ruler, she holds in the Muhammadan world, together with the simple and spirited manner in which she tells her story, and the insight it affords into life in one of the most interesting as well as one of the most loyal of the Feudatory States

of India, may attract a wider circle of readers than Her Highness's modesty has allowed her to anticipate." অর্থাৎ নবাব সুলতান জাহান বেগম সাধারণ পাঠকের জন্য পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিগত চরিত্র, মুসলমানজগতে শাসনকর্ত্রীরূপে অনন্যসাধারণ স্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সরল অথচ তেজস্বী ভাষায় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং করদ রাজগণের অন্যতম রাজভক্ত রাজ্যের যে ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়, তাহা বেগম সাহেবা তাঁহার পুস্তকের যে পাঠক আশা করেন, তদপেক্ষা অধিক পাঠক আকর্ষণ করিবে।

বেগম সাহেবা রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী—স্বহস্তে প্রধান প্রধান রাজ্যকার্য্য পরিচালনা করেন। ভূপালে অবরোধপ্রথা অবশ্যই প্রচলিত কিন্তু তিনি "বুরখা" পরিধান করিয়া দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানের রাজদরবারে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার সুশাসনে ভূপাল সুশাসিত—প্রজাবর্গ সুখী ও শান্তি ভোগ করিতেছে। ইংরাজরাজের সহিত তাঁহার প্রীতির অবধি নাই।

বেগম সাহেবার কয়েকটী পুত্র আছেন—জ্যেষ্ঠ নবাব নসরুল্লা খাঁ-ই ভাবী উত্তরাধিকারী। ইনিও সুশিক্ষিত; রাজকার্য্যে পটু।

দ্বিতীয় কাণ্ড—সাঁচী

ভূপালে আমরা বেশীক্ষণ থাকিতে পারি নাই। থাকিবার সময়ও ছিলনা—খুব বেশী কিছু দ্রষ্টব্যও ছিল না। তাই আমরা সাঁচী আসিলাম। বেগম সাহেবা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাঁচীর ডাকবাংলো অধিকার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং হামিদিয়া লাইব্রারীর অধ্যক্ষ ও সাঁচী যাদুঘরের কিউরেটার প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষাল মহাশয় আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া যাহাতে আমাদের কোন কষ্ট পাইতে না হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

সাঁচীর প্রাচীন নাম কাকনাদ কিন্তু কোন প্রাচীন পুস্তকে এই নাম পাওয়া যায় না। শিলালিপিতে এই নাম দৃষ্ট হয়। স্যার জন মার্শাল অনুমান করেন যে, মহাবংশ গ্রন্থে উল্লিখিত চৈত্যগিরিই সাঁচী। এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে রাজপুত্ররূপে অশোক উজ্জয়িনীর শাসনভার গ্রহণকালে বিদিশার জনৈক শ্রেষ্ঠীর কন্যা দেবীকে বিবাহ করেন। অশোকের ঔরসে ও দেবীর গর্ভে দুই পুত্র উজ্জেনিয়া ও মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাও কথিত হয় যে, অশোকের রাজ্যাভিষেকের পরে মহেন্দ্র, ভিক্ষুরূপে সিংহলে গমন করেন এবং পথিমধ্যে বিদিশার নিকটবর্ত্তী চৈত্যগিরিতে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে দেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মহার্হবিহারে বাস করেন। সম্ভবতঃ ইহাই সাঁচীর বিহার।

বিস্তারিতরূপে সাঁচীর প্রাচীন ইতিহাস ও তাহার শিল্পসৌন্দর্য্যের আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। বারান্তরে ইহার প্রয়োগের ইচ্ছা রহিল। তবে, প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা যাইতে

পারে যে, স্যার জন মার্শাল অনুমান করেন যে অশোক অনুশাসন যে স্তম্ভে সাঁচীতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা ভারতীয় শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই। খুব সম্ভবতঃ ইহা বাক্‌ট্রিয়া প্রদেশের শিল্পীর নির্ম্মিত।

সাঁচীর প্রথম দর্শনীয় বস্তু—তাহার সুবৃহৎ স্তূপ। রেলপথ হইতেই উহা দৃষ্ট হয়। ইহা দেখিতে অণ্ডাকার—তবে উর্দ্ধাংশ কর্ত্তিত; নিম্নভাগ উচ্চ অলিন্দ দ্বারা বেষ্টিত। পুরাকালে
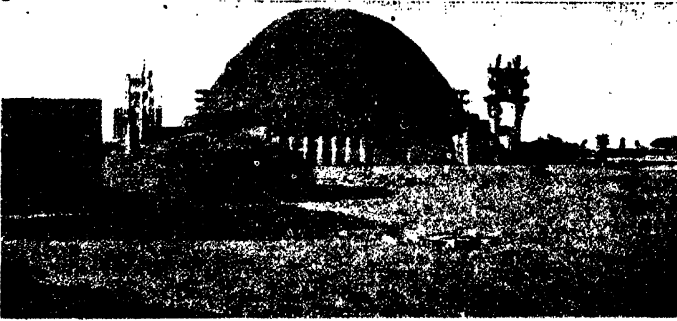
সাঁচীর সুবৃহৎ স্তূপ (উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে)

ইহা প্রদক্ষিণ পথরূপে ব্যবহৃত হইত। সমতল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথ দ্বারা স্তূপটী বেষ্টিত—ইহা প্রস্তর বেদিকা দ্বারা পরিবৃত। শেষোক্ত প্রস্তর বেদিকা চারিভাগে বিভক্ত এবং চারিদিকে চারিটী তোরণ—এই তোরণ চতুষ্টয় নানারূপে সুসজ্জিত। অনেকে মনে করেন যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয়

মঠ ও স্তূপ (দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে)

পূর্ব্বশতাব্দীতে, স্তম্ভ, স্তূপ, বেদী, তোরণ প্রভৃতিই রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু, স্যার জন মার্শাল এই মত গ্রহণীয় মনে করেন না। তাঁহার মতে স্তূপের কতকাংশ ও স্তম্ভ

এক সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার অন্ততঃ এক শতাব্দীর পরে স্তূপ প্রস্তরে আবৃত ও বেদিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তোরণচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দর্শনীয় দ্রব্য হইতেছে—স্তূপের তোরণগুলি। এগুলি স্তূপের
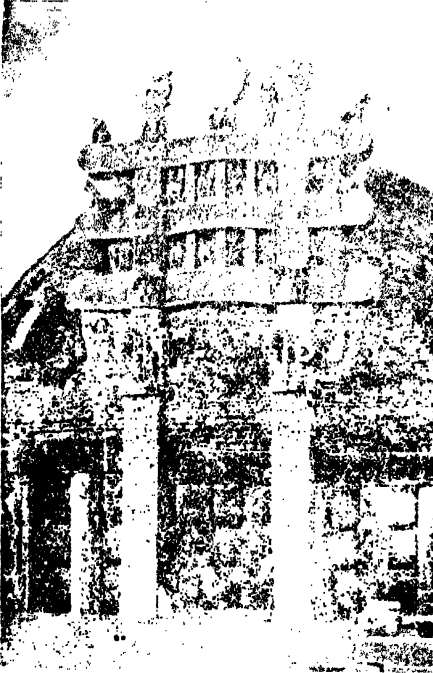
বৃহৎ স্তূপের উত্তর তোরণ

পশ্চিম তোরণের সুচিত্রিত দক্ষিণ স্তম্ভ

দক্ষিণে, উত্তরে, পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে অবস্থিত। তোরণচতুষ্টয় একইভাবে নির্ম্মিত। উত্তরের তোরণটী এখন পর্য্যন্তও সুন্দরভাবে রহিয়াছে। প্রতি তোরণের দুইটী করিয়া চতুষ্কোণ স্তম্ভ—স্তম্ভাগ্রে তিনটী করিয়া মাথাড়ী—এইগুলি কুণ্ডলিতা। স্তম্ভাগ্রগুলি বামন বা হস্তী অথবা সিংহের মুখদ্বারা সুসজ্জিত ছিল। মাথালের সহিত সুদর্শনা স্ত্রীমূর্ত্তি—যক্ষিণী সমূহ শোভা বৃদ্ধি করিত। যক্ষিণীদের দুইপার্শ্বে দুইটী করিয়া মুখ ছিল। তোরণের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে হস্তী ও সিংহের উপরে ধর্ম্মচক্র ছিল এবং ইহার উভয়পার্শ্বে চৌরী হস্তে যক্ষগণ শোভা পাইত। যক্ষগণের দক্ষিণে ও বামে ত্রিরত্ন ছিল। তোরণের অন্যান্যাংশে জাতকের ঘটনাসমূহ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার সংক্রান্ত চিত্রও দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ দিকের তোরণটী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মেজর কোল পুনর্নির্ম্মাণ করেন। ইহার কতকাংশ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তোরণটী পুনঃ প্রতিষ্ঠাকালে উর্দ্ধাংশ এবং সর্ব্ব-নিম্নস্থ চৌকাঠ উল্টা করিয়া লাগান হওয়াতে চিত্রগুলি স্তূপের দিকে রহিয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকের তোরণদ্বয়ও অন্যান্য তোরণের ন্যায় নানা চিত্রে বিভূষিত।

১৮নং মন্দির

বৃহৎ স্তূপটীর প্রায় ৫০ গজ উত্তর পূর্ব্বে ক্ষুদ্রতর অন্য একটী স্তূপ আছে। এই স্তূপেই কানিংহাম সাহেব সারিপুত্র ও মহামোগলের শরীরাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্তূপের মধ্যস্থ কক্ষে প্রস্তরের কৌটায় এই অবশেষ পাওয়া গিয়াছিল। প্রতি কৌটা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি পরিমাণে ছিল—একটীতে সারিপুত্রস্য ও অন্যটীতে মহামোগলানস্য উৎকীর্ণ ছিল। এই স্তূপের মাত্র একটী তোরণ আছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্রাকারের স্তূপ আছে।
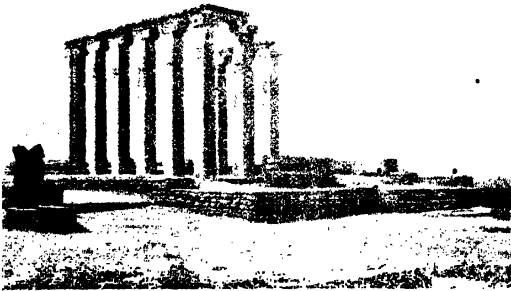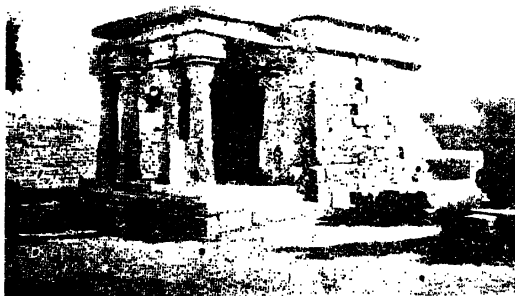
১৭নং মন্দির

বৃহৎ স্তূপের নিকটে কয়েকটী মন্দির ও মঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দির সমূহের ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। তথাপি এগুলি দেখিলে সাঁচীর প্রাচীন গৌরবের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় কাণ্ড—আগ্রা

সাঁচী হইতে আমরা আগ্রায় চলিলাম। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর বন্দোবস্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে অপেক্ষা ভাল—ডবল্ গদী, পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন কিন্তু ছাত্রেরা যে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিল তাহা অতি কদর্য্য। তাহারা কি ভাবে আছে দেখিতে যাইয়া দেখিলাম যে গাড়ীখানি বোধ হয় মাসাধিক কাল সম্মার্জ্জনীর দেখা পায় নাই। পায়খানার দরজাটী একেবারেই বন্ধ হয় না—মেথর যে কতদিন তাহাতে শুভাগমন করে নাই, তাহার হিসাব পাওয়া দুষ্কর। "থুথু ফেলা নিষেধ"—বিজ্ঞাপনটী গাড়ীতে ৩।৪ যায়গায় থাকিলেও, গাড়ীতে পা দেওয়া কষ্টসাধ্য। অথচ এত ভীড় যে এই মেজেতেই যাত্রীরা শুইয়া রহিয়াছে। এ সকল ব্যবস্থার কবে প্রতিবিধান হইবে ভগবানই জানেন।
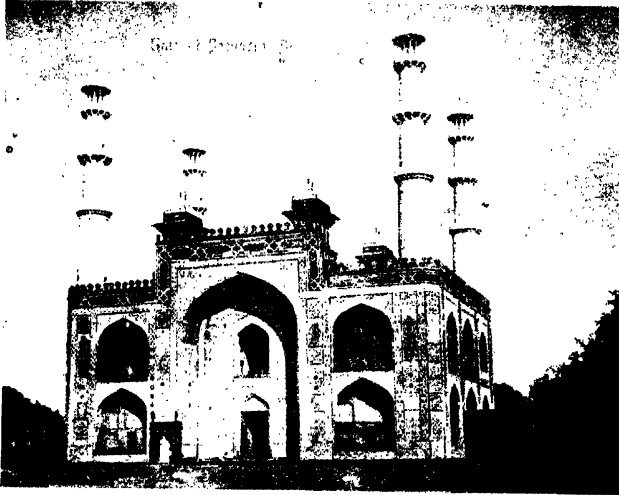
সেকেন্দ্রা তোরণ

প্রকৃতপক্ষে লোদীবংশীয় সিকন্দরই আগ্রা প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গ নির্ম্মাণান্তে ইহা প্রথমে পরগণার রাজধানীরূপে, পরে পাঠান সাম্রাজ্যের প্রকৃত রাজধানীরূপে পরিণত হয়। সিকন্দর আগ্রা সহরেই দেহত্যাগ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে ইব্রাহিম লোদীর রাজধানী পাণিপথের যুদ্ধ পর্য্যন্ত এই স্থানেই ছিল। এই যুগান্তকারী যুদ্ধের অব্যবহিতপরেই বাবর হুমায়ুনকে আগ্রায় প্রেরণ করিয়া রাজকোষ অধিকার করেন। বাবরও আগ্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। বাবরের মৃত্যুর তিন দিবস পরে হুমায়ুন আগ্রায়ই রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন এবং হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর দিল্লী অপেক্ষা আগ্রায়ই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। হুমায়ুনকে পরাভূত করিয়া শেরসাহ কিছুদিন আগ্রায় অবস্থান করিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহও ফতেপুর শিক্রীর উপর অনুরক্ত হইলেও আগ্রার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আগ্রার দুর্গ আকবর শাহেরই নির্ম্মিত। এই দুর্গ সম্বন্ধেই আইন্-ই-আকবরী বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য আগ্রার সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় বস্তু তাজমহল। ভাষায় ইহার বর্ণনা করা যায় না।

"ভূষণ তোমার সাচ্চা পাথর
ঝলসিত শত আলোর রূপ,
গোরোচনা তব কোরাণ মন্ত্র
দুঃখ তোমার জ্বেলেছে ধূপ।"

মুমতাজ মহলের মৃত্যু সম্বন্ধে ফার্সী পুঁথিতে নিম্নোক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়:—"চারিটী পুত্র ব্যতীত শাহজাহানের চারিটী কন্যা ছিল। শেষ কন্যাটীর জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মুমতাজের গর্ভে ক্রন্দনের শব্দ হইতে থাকে। এই শব্দ শ্রবণ করিয়াই বেগম জীবনে হতাশ হইয়া বাদশাহকে তাঁহার নিকটে আসিতে প্রার্থনা করেন এবং বাদশাহ তৎক্ষণাৎ শয্যাপার্শ্বে আগমন করিলে বেগম
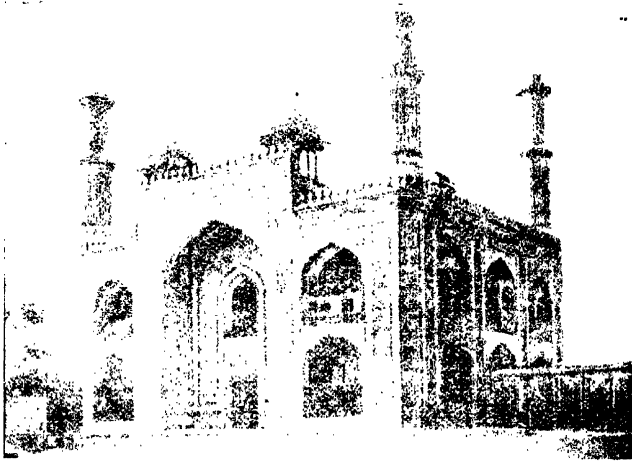
সেকেন্দ্রার প্রবেশদ্বার

ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে নিবেদন করেন। 'গর্ভিণীর গর্ভস্থ সন্তান ক্রন্দন করিলে যে গর্ভধারিণীর মৃত্যু সুনিশ্চিত তাহা সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে আমাকে এই মরধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিতে হইবে; এই সময়ে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনার পিতার রাজত্বকালে যখন আপনি বন্দী হইয়াছিলেন, তখন আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম; আপনার অন্যান্য ক্লেশেও আমি সহভোগিনী হইয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীপতি আপনাকে এই সাম্রাজ্য শাসন করিতে দিয়াছেন, কিন্তু আমার বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমি এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিতেছি। এক্ষণে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আমার শেষ দুইটী অনুরোধ রক্ষা করিবেন।' বাদশাহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বেগমকে তাঁহার প্রার্থনা জানাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

বেগম প্রত্যুত্তর করিলেন, 'পরমেশ্বর আপনাকে চারিটী পুত্র ও চারিটী কন্যা প্রদান করিয়াছেন। আপনার অন্য কোন পত্নীর গর্ভে যেন সন্তান না হয়; কারণ, তাহা হইলে আমার গর্ভজাত পুত্র ও আপনার অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানে সিংহাসন লইয়া বিবাদ হইবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে আমার সমাধিস্থলে আপনি এরূপ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিবেন, জগতে যাহার তুলনা হয় না।'

ঐতিহাসিকগণ উপরি উক্ত বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। যাহা হউক, মুমতাজের মৃত্যুতে শাহজাহান অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। বেগমের মৃত্যুর পরে তিনি এক সপ্তাহ কাল

আগরার মতিমসজিদ

ঝারোকায় উপবিষ্ট হইয়া প্রজাবর্গকে সন্দর্শন দান করেন নাই; এমন কি তিনি ফকির হইয়া সংসার ত্যাগে কল্পনা করিতেন। তাজ নির্ম্মিত হইলে বাদশাহ যাহাতে তাজের সৌন্দর্য্য অব্যাহত থাকে তজ্জন্য বাৎসরিক দুইলক্ষ মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি ইহাতে ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

"একেলার পূজা-মঠ সর্ব্বঘটে করিছে বিরাজ!
প্রেমের বিজয়-ধ্বজা তাজ!
নির্ম্মাইল অপূর্ব্ব প্রণয়ী
অভিজ্ঞান সর্ব্বকাল জয়॥
ধ্বংস হো'ক সুন্দর কবর,
চূর্ণ হোক্ মর্ম্মর বাসর,
প্রিয়ারে জীয়াল তার হিয়ার রসান!
তবু কাঁদে কায়া, না, ও ছায়া
বিশ্বময় হারাইয়া জায়া?—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান!"

তাজ দেখিয়া আমরা আগ্রাদুর্গ দেখিতে গেলাম। পূর্ব্ব হইতেই "পাশ" সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুর্গদ্বারে সশস্ত্র সৈনিক—দেখিতে দেখিতে ২।৩ জন "গাইড" (পথ প্রদর্শক) আসিয়া পড়িল। আমরা তাহাদের হাত এড়াইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুর্গের চতুর্দ্দিকে লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর। এই দুর্গেই শাহজাহান শেষ জীবনে কারারুদ্ধ হইয়া দেহপাত করিয়াছিলেন। উপযুক্ত পুত্র আওরংজেব, পিতাকে জব্দ করিবার জন্য যমুনায় রুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে শাহজাহান লিখিয়াছিলেন, "হিন্দুদের যাহাই বলি, তাহারা মৃত ব্যক্তিকেও জলদান করে; কিন্তু, তুমি এমন পুত্র যে জীবিত পিতাকেও জলদান করিতেছ না।" আর আওরংজেব প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, "যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল।"

বেশী সময় কোন স্থানেই আমাদের থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই আমরা দুর্গাভ্যন্তরস্থ মতি মসজিদ, দেওয়ানী আম্, দেওয়ানী খাস্, সমান্‌বুর্জ্জ, খাস্‌মহল, জাহাঙ্গীর মহাল দেখিয়া যমুনার বামতীরস্থ ইতিমদ্দোলার কবর দেখিতে গেলাম। এই কবর নূরজাহান্ কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা গিয়াসুদ্দিন মুহম্মদের স্মরণার্থ নির্ম্মিত হয়। জাহাঙ্গীর গিয়াসুদ্দিনকে ইতিমদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তদনুযায়ী এই সমাধি ঐ নামে পরিচিত। নূরজাহান প্রথমে ইহা রৌপ্য নির্ম্মিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু দস্যুভয়ে উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পরে, আমরা সিকান্দ্রায় গমন করিলাম। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি রহিয়াছে। ইহা সুবৃহৎ—ইহার প্রত্যেক দিকে ৭৭২ গজ দীর্ঘ প্রাচীর। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মুসলমানগণের মৃত্যু হইলে পশ্চিমদিকে মস্তক রাখিয়া সমাহিত করা হয়, কিন্তু আকবরের মস্তক পূর্ব্বদিকে রাখা হয়। সমাধি সৌধ পঞ্চতল। সমাধির নিকটে কোহিনূর রক্ষিত থাকিত।

সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি ও দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি দেখিলে কালের অবিনশ্বরতার কথা বড় বেশী মনে হয়। সন্ধ্যা হইতে না হইতে এই উভয় স্থান জনমানবশূন্য হয়—দূর দিগন্ত ব্যাপিয়া কেমন যেন এক শোকের চিহ্ন—প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল "মানব জীবন ছাই—বড় বিষাদের"; কি এক অব্যক্ত আতঙ্কে আমাদের সকলেরই হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; আমাদের মনে হইতে লাগিল—

"আঁধারে ঘুরিছে জগৎ অন্ধ,
চৌদিকে শ্মশান, শবের গন্ধ!
ছুটিছে উল্কা প্রলয়-দৃপ্ত,
বহিছে ঝটিকা প্রমাদ-ক্ষিপ্ত!
অশনি-মন্ত্র, করকা-বৃষ্টি,
নিবিড় তিমিরে লুপ্ত সৃষ্টি!"

ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রতিধ্বনি

বাহবা সেনেট

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা যে গভর্ণমেণ্টের দান নিতে অস্বীকৃত হয়েছেন, এতে আমি যার পর নেই খুসি হয়েছি। কালিদাস বহুকাল পূর্ব্বে বলে গিয়েছেন,—"যাচ্ঞা মোঘোবরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।" আর বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট যে উত্তম নয়, কণ্ঠে প্রকাশ তা করতে কিছু মাত্র দ্বিধা করেন নি। এই দো-আঁশলা গভর্ণমেণ্টের মূর্খতা সম্বন্ধে কেউ কখন সন্দেহ করেন নি। এখন দেখা যাচ্ছে ইতরতাও হচ্ছে এর আর একটি বিশেষ গুণ।

বাঙ্গালায় উচ্চ শিক্ষা নষ্ট করবার চেষ্টা বহু দিন থেকে চলছে। এ শিক্ষায় নাকি যা তৈরি হয়, তার নাম intellectual proletariat,—আর এ দল নাকি রাজ্যের কণ্টক, অতএব তাদের উচ্ছেদ করাই হচ্ছে রাজধর্ম্ম। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন প্রমুখ মহা মহারথী যখন ইউনিভারসিটিকে বধ করতে পারেন নি, তখন কর্ত্তারা কি মনে করেন, যে একটি শিখণ্ডি খাড়া করে, তাঁহারা ইউনিভারসিটিকে যমের বাড়ীতে পাঠাতে পারবেন? এ আশা দুরাশা। গভর্ণমেণ্টের হাত-তোলা না খেলে কি ইউনিভারসিটি শুকিয়ে মরবে? আমরা বাঙালীরা ধনী নই—কিন্তু আমাদের ধন না থাকুক মন আছে। আর মনের জোর যে ধনের জোরের চাইতে শত গুণ বেশি, তা মূর্খ ছাড়া আর সবাই জানে। আর উচ্চশিক্ষা নষ্ট করবার উদ্দেশ্য ত বাঙ্গালীর মনের খোরাক কেড়ে নেওয়া, যার ফলে, সে মন পঙ্গু হয়ে পড়বে।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের নিজের শিক্ষার খরচ কি আমরা নিজে যোগাতে পারব না? যে ইউনিভারসিটির দৌলতে আমরা হাকিমি করছি, ওকালতি করছি, মাষ্টারি করছি, ডাক্তারি করছি, পলিটিকস করছি, সাহিত্যিক হচ্ছি, সেই ইউনিভারসিটি রক্ষা করবার জন্য আমাদের খেটে-খাওয়া পয়সার কিছু অংশও দিতে কি আমরা রাজি হব না? আর আমরা সকলেই যদি নিজের সাধ্যানুসারে ইউনিভারসিটির অর্থ সাহায্য করি; তাহলে তাকে গভর্ণমেণ্টের কাছে আর হাত পাততে হবে না।

শুনতে পাই কর্ত্তারা মনে ঠিক দিয়ে রেখেছিলেন যে, এবার উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশী লোকের মধ্যে একটি প্রবল দল নন-কো-অপারেটাররা, তাঁদের সহায় হবেন। এরূপ আশা করায় তাঁরা যে কি অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা ভেবে আকুল হতে হয়।

এই সোজা কথাটা কি তাঁদের মাথায় কখনো ঢোকে নি যে, বাঙালী নন-কো-অপারেটাররা উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নন, তাঁরা ইউনিভারসিটির গভর্ণমেণ্টের অধীন হয়ে থাকবার বিরুদ্ধে। আশুবাবু বলেছেন যে ইউনিভারসিটি Freedom চায়। এ কথা হচ্ছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতের মনের কথা। আমরা বলি গভর্ণমেণ্টের টাকা আমাদেরই টাকা; সুতরাং শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে টাকা আমাদের দেন, সে টাকা আমাদের ভিক্ষার ধন নয়। নন-কো-অপারেটারদের বক্তব্য এই যে টাকা যারই হোক, তা যার হাতে আছে সে স্কুল কলেজের উপর প্রভুত্ব করবেই। অতএব শিক্ষা Nationalise করো। এ দু'মতের মধ্যে কোনটা ঠিক সে বিচার এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, কেন না এ কথা ঠিক যে, ইউনিভারসিটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, বাঙলার কোন দলই গভর্ণমেণ্টের সহযোগী শক্তি হবেন না। অসহযোগীরা ত নয়ই।

দরকার হলে, বাঙলা যে ইউনিভারসিটিকে শুধু টাকা দেবে তাই নয়, লোকও দেবে। আমাদের জাতের ভিতর কি এমন পঞ্চাশ জন লোক নেই, যারা ইউনিভারসিটির অধ্যাপক হবার উপযুক্ত আর যারা বিনা পয়সায় সে অধ্যাপনা করতে প্রস্তুত ?

ইউনিভারসিটি আজ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করুক, কাল দেখতে পাবেন, তার কি অর্থবল কি লোকবল কিছুরই অভাব হবে না।—ব্রাহ্মণবুদ্ধি আজও বাঙলায় লোপ পায়নি, আর যতদিন বাঙালী বেঁচে থাক্‌বে ততদিন তা বজায় থাকবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বিজলী, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

পাড়ার লোক

শাঁখের ডাকে ঢোলে ঢাকে নহবতেরতানে তানে
ওদের ছেলের হয়ে গেল বিয়ে
নববধূ এল যখন, পাড়ার লোকে দেখ্‌তে এল
কেউবা টাকা, কেউবা 'গিনি' নিয়ে।
"বেশ" বল্লে কেউবা শুধু, কেউবা বল্লে "মন্দ না"
কেউবা বল্লে—"আহা চমৎকার"
মুখের শোভা, চুলের বহর দেখলে এসে অনেক জনই
কেউবা দেখ্‌লে বালা বাজু হার!
কিন্তু রে হায় দু'দিন পরে শুকিয়ে গেল সাধের মালা
ফুলের বাগান হল মরু ধূ ধূ!
কেমন করে হঠাৎ আহা ছেলে তাদের মারা গেল
—বিধবা বেশ পরল নববধূ!
পাড়া পড়সী তখন আবার সবাই মিলে সমস্বরে
বিজ্ঞভাবে করলে আলোচনা
"অমন ছেলে মারা গেল—ওমা একি রাক্ষসী বউ
দেখিনিক এমন অলক্ষণা!"

"বনফুল

পুস্তক পরিচয়

ঘরের ডাক—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত এঘর-বাড়ী-ঘরের ঘর নয়, এ ঘর ঘরকরণা বা ঘরসংসারের ঘর নয়, এ ঘর অর্থে বংশ পরিবারও নয়। শামুক যেমন আপনার ঘরকে সঙ্গে সঙ্গে বয়ে' নিয়ে যেতে পারে—এ ঘর সে রকমও নয়। এ ঘর মাটী, জল, বাতাস, আকাশ, মাঠ, ঘাট, আলোক, ছায়া, নক্ষমালঞ্চ, কূজন গুঞ্জনের সন্নিপাত, এ ঘর—সংস্কার মায়া মমতা প্রেম করুণা নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের সমন্বয়,—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"—এ ঘরের সঙ্গে মানুষের চিরদিন নাড়ীর বন্ধন, রক্তের মিলন, প্রাণের গ্রন্থি, অন্তরের অন্তরঙ্গতা—বোধ হয় প্রাক্তন, ভবিষ্যতের, ইহপরত্রেরও যোগাযোগ। ঘরের ছেলে দূরে গেলে এ ঘর ডাক দিয়ে বলে—

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে
"যে জননীর কোলের পরে
জন্মেছিলি মর্ত্ত্য ঘরে
প্রাণভরা তোর যাহার বেদনাতে

তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে'
ধরে' তোরে রাখে নানান পাকে,
বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"

এই ঘরের সঙ্গে অন্তরাত্মার এমনি নিবিড় ও গভীর যোগ, যে দূর দূর বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার মমতাময় করুণ সুর পৌঁছায় এবং ঘরের ছেলেটি সে ডাক শুনে ঘরে ফিরে আসে। কবি যিনি তিনি গেয়ে উঠেন—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।"

অন্য সংসারী ও হিসাবী লোকেদের কেহ বা শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে—কেহবা আপনাকে নূতন জীবনেরই উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।—কেহবা ক্ষ্যাপার মতন হারাণ পরশ পাথর খুঁজতে খুঁজতে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেয়। এই ঘরের ডাক কারো কারো অন্তরের লোহার কপাট একটুও নড়াইতে পারে না এমনও মানুষ আছে। আবার কারো বা কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশিয়া সমস্ত জীবনকে তোলপাড় করিয়া দেয় এবং ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া আনে।

ঘরের ডাক যে কালেই বিফল হোক্, কল্পনা প্রবণ, মাধুর্য্য-মমতা-মণ্ডিত সহানুভূতিভরা অন্তরের নিকট কখনো তা বিফল হয় না। লেখক তাঁহার লক্ষ্মীকে ঐরূপ করিয়াই গড়িয়াছেন। তাই তার কাছে ধন মান ঐশ্বর্য্য, প্রেম বা শিক্ষা দীক্ষার টান হতে বাংলা মায়ের নাড়ীর টান এত বড়।

লক্ষ্মীর পিতা যখন খ্রীষ্টান হয়—তখন লক্ষ্মী অতি শিশু—হিন্দু সমাজের অন্তরের সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য কোনো দিন তার অনুভব করবার অবসর হয় নাই।—সে খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যেই প্রতিপালিত—বিলাতী শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াছে—বিদেশী পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার সবই তাহাকে বিজাতীয় করিয়া তুলিবে—ইহাই স্বাভাবিক—বাংলার জলবায়ু আলো ছায়া মনঃপ্রাণের সহিত তাহার তেমন পরিচয় ছিল না—তবু বাংলার নাড়ীর টান তাহার প্রাণকে টন টন করিয়া তুলিল। ধর্ম্ম সমাজ সাহিত্য শিক্ষাদীক্ষা সংসর্গ কিছুই তাহার চিন্তাতুর পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিল না। চুম্বক লৌহকেই আকর্ষণ করে—তাম্রকে নয়—দীপশিখা শলভকে প্রলুব্ধ করে—ভ্রমরকে নয়।

তাই লক্ষ্মী যখন প্রথম বাংলার পল্লীপথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহসা বঙ্গমাতা তাহার সম্মুখে অপূর্ব্ব মমতাময় বাহু প্রসারণ করিয়া দিল। সেই সঙ্গে তার জন্ম জন্মান্তরের প্রাক্তন জীবনস্মৃতি সমস্ত যেন "তাং হংসমালাঃ শরদিব গঙ্গাং মহৌষধি নক্তমিবাত্মভাসঃ" তাহাকে প্রাপ্ত হইল।

গ্রন্থকার পাশাপাশি হিন্দু ও নেটিভ খ্রীষ্টান সমাজের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন—কোনো সমাজের বা ধর্ম্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য নহে। কলাসৃষ্টির আবহ, সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ ও চরিত্র সৃষ্টির আনুকূল্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, সেইটুকুই তিনি আঁকিয়াছেন -এমন কি তিনি যে লক্ষ্মীদের পরিবারকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছেন তাহাও শুধু লক্ষ্মীকে অসহজ অস্বাভাবিক অনাত্মীয় ও বিজাতীয় ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যের মধ্যে লইয়া যাওয়ার জন্য। তাই লক্ষ্মীকে বিধর্ম্মিতা তত ব্যথা দেয় নাই—পরদেশী ভাব, বিজাতীয়তা ও পরদেশী সমাজের হৃদয়হীনতাই ব্যথা দিতেছিল। সে যে আপন দেশে থেকেও পরদেশী—'নিজবাসভূমে পরবাসী'—দেশের সঙ্গে তার আত্মীয়তা লোপ পাইয়াছে—দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও অন্তরের উৎসবের আনন্দ পর্য্যন্ত উপভোগ করিবার তাহার অধিকারও নাই। সোণার পিঞ্জরে অজস্র যত্নে প্রতিপালিত শুকের ন্যায় তাহার অন্তর ছটফট করিয়াছে—শীতপ্রধান দেশের Hot-house-এ প্রতিপালিত চারাগাছটির মত তাহার জীবন সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত। সব হতে তার বড় বেদনা—দেশ তাহাকে পর ভাবে। সে দেশকে প্রাণপণ চেষ্টায় পর ভাবিতেছে—তাহাতে বেদনা আছে—জন্মগত সংস্কার সমস্ত ভুলিবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছে—সে চেষ্টায় বেদনা আছে—কিন্তু দেশের সমাজ ও সংসার যে তাহাকে পর ভাবিতেছে—এই বেদনা মর্ম্মন্তুদ। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তার যে দ্বেষ তাহা দুর্জ্জয় অভিমান মাত্র,—সে সমাজের প্রধান অপরাধ—সে সমাজ হইতে বাহির হওয়ার সহস্রপথ কিন্তু পুনঃ প্রবেশের একটিও পথ নাই—" যেখানে আহ্বানের বাঁশী ধূলায় পড়িয়া লুটাইতেছে—বাজিতেছে কেবল করুণসুর--কেবল বিদায়—আর বিদায়।"

লক্ষ্মীর পরই আর একটী চরিত্র পাঠকের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই চরিত্রটি 'নন্দরাণী'। নন্দরাণীর চরিত্রে আমরা বর্ত্তমান হিন্দু সমাজটির—গোটাটাই নারীরূপে প্রাপ্ত হই। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অন্তরে যে মুক্তি চৈতন্য জাগ্রত হয়েছে তাহা আমরা নন্দরাণীতে পাই অথচ হিন্দুসমাজের মতই নন্দরাণী প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সংস্কারের দাসী ও প্রথার অনুচরী হইয়া রহিল। নন্দরাণীর কঠোর আত্মসংযমের সাহায্যে পাতিব্রত্যরক্ষা, সংসার ধর্ম্মের জন্য আত্মনিগ্রহ, আপনা অপেক্ষা বয়সে বড় সপত্নীপুত্রের জননীত্বের এবং আপনা অপেক্ষা মূর্খ অশিক্ষিত স্বামীর নিকট অজ্ঞতার অভিনয়—এ সমস্ত আমাদের হিন্দু সমাজ যাহা অহরহ করিতেছে তাহারই ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। একদিকে সংস্কার দাসত্ব ও অন্যদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংঘর্ষে—হিন্দু সমাজের মধ্যে যে বেদনা অরুণায়মান হইতেছে তাহা নন্দরাণীর চরিত্রকে বড়ই করুণ করিয়া তুলিয়াছে।

লেখক যে মনস্তত্ত্বে সুপণ্ডিত ও মানবচরিত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও মনোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে দক্ষ তাহা নন্দরাণীর চরিত্রাঙ্কনে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখক যে সুচিত্রকর তাহার অনেকস্থলেই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এক অংশ উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে—"মানুষের পিছন দিকটা যে মানুষের সম্বন্ধে এক কথা বলিতে পারে; লক্ষ্মী তাহা আগে জানিত না। লোকটি গালে হাত দিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল, মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলের রাশ, এলোমেলো ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, গৌরবর্ণ পিঠখানি তার অনাবৃত, কিন্তু মুখখানি তার কেমন তা কে জানে? জানে বৈকি সে! না দেখিয়াই

সে যে অনেকক্ষণ তাহা দেখিয়াই লইয়াছে—আর সেইটাই যে তার প্রকৃতরূপ—সে মুখখানি সুন্দর কি না কে জানে—কিন্তু সে যে নিতান্তই করুণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সমুখের কালজলে মৌন সন্ধ্যার ছায়াখানি যেমন করুণ—ঠিক্ তেম্‌নি করুণ।"

লেখক যে কবি তাহাও তিনি ধরা দিয়াছেন। Plato তাঁহার কল্পিত Republic হইতে কবিগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন—কিন্তু কোনো দার্শনিকের রচনা এত কবিত্বমধুর নহে। লেখকের "লক্ষ্মীও" কাব্যকে মুখে যথেষ্ট অনাদর করিতেছে—কোনো কবিই তাহার চিত্ত হরণ করে নাই—কিন্তু কার্য্যতঃ কল্পনা-প্রবণতা ও কবিত্বেই তার চরিত্রের সৃষ্টি। লেখকও তাঁর রচনায় কবিত্বকে প্রাণপণে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই—মাঝে মাঝে তাঁর রচনা খুবই কবিত্বমধুর হইয়াছে। কবিত্বপ্রকাশের অনেক উপযুক্ত ক্ষেত্রেই তিনি সংযত লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়া একথা বলিলাম।

সমগ্র পুস্তকখানির প্রাণের কথা কবির কথায় বলিয়া আমার সমালোচনা শেষ করি—

বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈস্তনুমার্জ্জনং
ভক্ষ্যং স্বাদু রসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্ত কীরস্ত মে
হা হা হন্ত তথাপি জন্ম বিটপিক্রোড়ে মনোধাবতি॥

শ্রীকালিদাস রায়

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনী কথা—তদীয় পত্নী শ্রীহরসুন্দরী দত্ত কর্তৃক লিখিত;—(২৩০ পৃষ্ঠা) ১০ খানি ভাল চিত্র সমন্বিত মূল্য ১।০—পরের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার পরিশ্রমে, উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে কেমন করিয়া একজন মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, সে শিক্ষা লাভের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অমূল্য। এ কালে যে যুবকেরা লেখা পড়া শিখিয়া উপার্জ্জনের পথ না পাইয়া হতাশ হয়েন, আর কল্পনা করিয়া ভাবেন, যে ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবন সংগ্রাম তেমন প্রখর ছিল না, তাঁহারা এই জীবন চরিত পড়িয়া সুশিক্ষালাভ করুন। দত্ত মহাশয় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চ শিক্ষা পাইবার পর গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি অর্জ্জন করিয়া ইউরোপ হইতে সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন, আর ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া প্রফুল্লমনে ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নীরোগ শরীরে সংসারের সেবা ও সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মনিষ্ঠ সুপণ্ডিত সাধুর জীবন আমাদের গৌরবের সামগ্রী।

ভজার বাঁশী—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস প্রণীত; ভাল বাঁধা ও পাতায় পাতায় চিত্র সম্বলিত ৫৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ১।০। এখানি ছেলেমেয়েদের পড়িবার বই; শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য ও সুশিক্ষার জন্য অনেকগুলি সচিত্র কবিতা আছে। যে কবিতা গুলি গান, সে গুলির এমন স্বরলিপি আছে যে সহজেই সুর শেখা যায়। কয়েকটী কবিতা বিলাতী শিশুশালার পদ্যের অনুকরণে বা অনুবাদে রচিত; তবে তাহা এ দেশের ছেলেদের কাছে বিদেশী মনে হইবে না। সুপণ্ডিত লেখককে অনুরোধ করি, তিনি যেন দ্বিতীয় সংস্করণের সময় কোন পদ্যেই অধম মিল না রাখেন। শিশু মহলে এখানি নিশ্চয়ই আদৃত হইবে।

(১) **স্বরাজ কোন পথে?** মূল্য ॥০ আনা ও (২) **বন্দীর ডায়েরী** মূল্য ১৲ শ্রীহেমন্তকুমার সরকার প্রণীত—গ্রন্থকার সুশিক্ষিত ও সুলেখক; তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য কি, তাহা নাম পড়িয়াই

জানা যায়। গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় মতবাদের তর্ক উঠিতে পারে না; অসহযোগনীতি সমর্থন করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হইয়াছে। স্বরাজ যে কোন্ পথে, তাহা কাজে দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকারকে যে দশা ভুগিতে হইয়াছে তাহা লইয়াই দ্বিতীয় গ্রন্থ লিখিত। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, গ্রন্থকার যাহা করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহা অকপট স্বদেশ অনুরাগে।

ছোটদের গল্প—শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত প্রণীত; ১২৬ পৃঃ—মূল্য দশ আনা। বই খানিতে দুই খানি ভাল ছবি আছে, আর প্রসঙ্গগুলিও সুরচিত ও শিশুদের পক্ষে মনোরম।

শেষে

(১)

স্নান করিবার জন্য ঘাটে আসিয়াই হরিমতি থমকাইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ঘাটের যাবতীয় রমণীই প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল "ওই গো এসেছেন ঘাটে। মাগো মা, গাঁ খানা একেবারে জ্বালিয়ে খেলে। আপদরা তো বিদেয়ও হয় না এখান থেকে।"

বিস্মিতা হরিমতী হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্যাপারখানা কি—কিসের জন্য সকলের কামনা যে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিবে তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার গামছাখানা পিঠের উপর ঝুলিতেছিল, সেই খানা তুলিয়া লইয়া কলসীর উপর রাখিয়া সে পা বাড়াইল।

রায়দের গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি—লজ্জাও করে না একটু, তাই আবার মুখ দেখাচ্ছে, আমরা ভাবি গাঁয়ের ছেলে—যাহোক্ সামান্য একটুকু তো লেখাপড়া জানে, ধর্ম্ম-জ্ঞানটা থাকবেই। ওমা-মা, হাজার হোক ছোটলোক তো, তা আর কত ভালো হবে। আর বংশের দোষ কি যায় গা? হরিশের বাপের কথা মনে পড়ে গা খুড়ি?—যার জ্বালায় গাঁ শুদ্ধ লোক একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল?—পুলিশ আস্‌ছে খবর পেয়েই গলায় দড়ি দিয়ে মরল? তারই ছেলে তো, কত আর ভালো হবে? তা হাজার ভদ্দর পাড়াতেই থাক, আর হাজার ভদ্দর ব্যবহারই শিখুক, কেউটের ছানা যে সে কেউটেই হয়ে থাকে।"

কথাটা শেষ করিয়া অত্যন্ত বিরাগভরে তিনি পরিধেয় বসনের অর্দ্ধাংশ জলে ফেলিয়া দুই হাতে কচলাইতে লাগিলেন। তাঁহার মিষ্ট মধুর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হরিমতী আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

খুড়ি নামধারিণী বৃদ্ধা অবজ্ঞার ভাবে একবার তাহার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "হরিশের বাপের কথা বলছো? সে তবু ছিল ভালো, ছেঁচকা চোরই ছিল। লোকের জিনিসটা পত্তরটা

বাইরে থাক্‌লে তাই নিয়ে পালাতো, এ রকম করে বুকে ছুরি বসাতো না। বাবা, বাবা, মনে কর্‌লেও গাটা কাঁটা দিয়ে ওঠে।”

প্রবীণা সতীশের মাও কয়লা দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন “আহা কি সর্ব্বনাশই হলো তাদের গা! আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে; হায়! হায়! এমন করেও মানুষের সর্ব্বনাশ করতে হয় গা! সব গয়না, নগদ টাকা সেই সিন্দুকটাতে ছিল—আহা! যখন কাঁদতে লাগল তারা লুটোপুটি খেয়ে, তখন কার সাধ্য যে চোখের জল সামলায়। এমন ডাকাতও আছে গা,—মনিবের সর্ব্বনাশ করে, তাকে পথে বসায়! আমি তাই রোজ ভাবতুম—এই আজকালকার মাগ্যি গণ্ডার দিনে হরশে মাস চালায় কি করে মাত্র বারোটী টাকায়! শুধু বউ তো নয়, একটা ছেলেও আছে। বউয়ের গায় গয়নাই বা হল কোত্থেকে, ভালো ভালো কাপড় জামা—যা আমাদের বউ মেয়েরা পায় না তাই বা পায় কোথা হতে! কে জানে যে এ পর্য্যন্ত গাঁয়ে যত চুরি ডাকাতি হচ্ছে সবই ওর কাজ।”

রায়গৃহিণী বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, “ঘেন্না ধরালে গা—একেবারে ঘেন্না ধরালে। এ যে বাঘের জাত গো, যার খায় তারই ঘাড় ভাঙ্গে। ওই যে আমাদের কথায় বলে—না—পাঁচদিন চোরের, একদিন সাধের। কথাটা নির্য্যাস সত্যি। আজ ক বছর হতে গাঁয়ে বেমালুম চুরি হচ্ছেই—কেউ ধরতে পারে না। ভিন্ গাঁয়ের লোক হলে এতদিন কি আর ধরা পড়্‌ত না? এযে নিজ গাঁয়েরই লোক গা। সবই জানতে শুনতে পাচ্ছে, কাজেই ধরা পড়বে কি? এবার যাদু আর যাবেন কোথা? বলতে গেলে—হাতে হাতেই ধরা পড়েছে।”

শিবুর দিদি কলসী মাজিতে মাজিতে বলিলেন “এবার আর রক্ষে আছে? মুখুর্য্যে মশাই নিজের চোখে তাকে দেখেছেন, আর লোকে তো দেখে নি। তিনি চেঁচাতে যাচ্ছিলেন, হরশের জুড়িদার ছুরি দেখিয়ে বললে গলা কেটে ফেলব যদি চীৎকার কর। হরশে যদিও মুখে কালি মেখেছিল তবুও তিনি চিনেছেন সে হরশে। তিনি “হরশে” বলে ডাকতেই একজন তাঁর গলা টিপে ধরেছিল। যাইহোক, এবার আর কিছুতেই বাঁচন নেই। শুনৃছি পুলিশে খবর গেছে, এখনি পুলিশ আসবে। মাগো মা কি কাণ্ডই হবে, নাজানি।

রায়গৃহিণী হরিমতির হাতের চুড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন, “মরণ আর কি? চুরি করে এনে ইস্ত্রির গায় গয়না দেওয়া হয়েছে। মাগীও কেমন—দেখ, ইস্ত্রির টিপনি না থাকলে কি স্বোয়ামী এমন জঘন্য কাজ করতে যায় গা? আমরা হলে অমন গয়না, কাপড় মরে গেলেও পরতুম না, ওর চেয়ে শুধু হাতে, থান কাপড়ে জীবন কাটানোও হাজার গুণে ভালো।”

স্তব্ধ হরিমতি আর শুনিতে পারিতেছিল না। তাহার স্বামী চোর, কাল রাত্রে সে মনিবের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, এই কথাটা বজ্রাঘাতের মতই তাহার বক্ষে বাজিয়াছিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, সে আর জলে নামিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল।

(২)

হরিশ দাসের পিতা যথার্থই চোর ছিল বটে এবং সে আত্মহত্যা করিয়াই পুলিশের হাত হইতে এড়াইয়াছিল। তখন হরিশ দশ বারো বছরের বালক মাত্র। তাহার পিতার মৃত্যুর পরে তাহার মাতুল এই পিতৃমাতৃহীন বালককে নিজের কাছে লইয়া যায়। সেখানকার স্কুলে কিছুদিন সে পড়াশুনাও করিয়াছিল। প্রায় বছর দশেক পরে সে যখন দেশে ফিরিল তখন তাহার সহিত তাহার বালিকা পত্নী হরিমতিও আসিল।

দেশে আসিয়া সে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী কার্য্যে লাগিল। বেশ বিশ্বস্তভাবেই সে এই পাঁচ বৎসর সেখানে কাজ করিতেছে। একদিনও সে মনিবের কাজে অবহেলা করে নাই, কখনও একটা পয়সাও তাহার হাত দিয়া অপব্যয় হয় নাই।

স্ত্রীর নিকটেও সে চিরবিশ্বাসী ছিল। হরিমতি তাহার নিকটে কখনও কিছু প্রার্থনা করে নাই। পরণে যেমন তেমন মোটা কাপড় পাইলেই সে সন্তুষ্ট, ভালো কাপড়, গয়না কখনও সে স্বামীর নিকট চাহে নাই। স্বামী যেদিন প্রথমে তাহার জন্য সুন্দর শাড়ী ও ব্লাউজ সেমিজ প্রভৃতি লইয়া আসিল, সেদিন সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল। ইহার কারণ— সে বরাবরই স্বামীর মুখে দারিদ্র্য দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়াছে, গতকল্য পর্য্যন্ত স্বামী বিষণ্ণভাবে দিন কাটাইয়াছে। পুত্র দুইটা পুতুল চাহিয়াছিল তাহা কিনিয়া দিবার ক্ষমতা কাল পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। হঠাৎ সে কোথা হইতে এই মূল্যবান কাপড় জামা—পুত্রের পোষাক পুতুল আনিয়া তাহাদের দিল। হরিশ তাহার বিস্ময়ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি মনিবের আর একটি কাজ করছি, তার মাইনে অনেক। আগাম মাইনে পেয়েই তোমার আর খোকার জন্য এগুলো কিনে এনেছি।"

হরিমতী তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিল। স্বামীকে সে কোন দিনই অবিশ্বাস করিতে পারে নাই, ক্রমে হরিশ গয়না নগদ টাকা আনিতে লাগিল। হরিমতী খুবই আনন্দিত হইয়াছিল—কারণ সংসারে অনটন আর রহিল না। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল "এই চাকরীটি যেন চিরস্থায়ী হয়, তা'হলে আমি যোড়া পাঁঠা দিয়ে মা কালীর পূজো দেব।"

আজ ঘাট হইতে সে যখন ফিরিল তখন সে বাত্যাতাড়িত কদলীপত্রের মতই থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার মুখ শবের মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিন বৎসরের ছেলে রাম দুয়ারের সমানেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "মা"—কিন্তু মায়ের মুখপানে চাহিয়া সভয়ে সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। কলসীটা বারাণ্ডায় ফেলিয়া রাখিয়া সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শুইয়া পড়িল।

আজ এই প্রথম সন্দেহ তাহার স্বামীর উপরে। সত্যই তো এখনো তাহার স্বামী সেই

চাকরীই করিতেছে—সেই বেতনই পাইতেছে, তবে সে এত টাকা পায় কোথায় ? সে যথার্থই কি স্ত্রীর চোখেও ধূলা দিয়াছে ? সত্যই কি সে চোর—ডাকাত ?

ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল স্বামীর নিত্যকার কার্য্যগুলি, স্বামীর আজকালকার আলাপী লোকগুলোর কথা। ভাবিতে তাহার ললাট ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কই, দু'বছর আগে এসব লোকের সহিত তো তাহার স্বামীকে মিশিতে সে একদিনও দেখে নাই। এই লোকগুলা—যাহারা আজকাল তাহার স্বামীর প্রিয়বন্ধু—ইহারা যেন সাক্ষাৎ সয়তান। কিন্তু এসব কথাও সে আগে মনে করে নাই। আজ সবই যেন স্পষ্ট হইতেছে। আজ ভাবিয়া দেখিল তাহার স্বামীর রাত্রেও নিদ্রা ছিল না। মাঝে মাঝে সে সন্ধ্যাবেলা কোথা চলিয়া যাইত, সকাল বেলায় বাড়ী ফিরিত। সে সন্দেহ করিবার অবকাশ পাইত না। কারণ—স্বামী তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। কারণ—জিজ্ঞাসা করিয়া যে কোনও একটা উত্তর পাইয়া সে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু দু'বছর আগে ত তাহার স্বামী মনিবের কার্য্য ব্যতীত কোনও দিনই রাত্র সাতটার বেশী বাহিরে থাকিত না।

স্বামীর কথা হরিমতী যতই ভাবিতেছিল ততই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। কাল সন্ধ্যাবেলায় সেই নীচ সঙ্গী কয়েকটা আসিয়াছিল, তাহার স্বামী নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া কিছু না খাইয়াই তাহাদের সহিত চলিয়া গিয়াছে, আজ এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

তবে কি সবই সত্য ? কাল যে তাহার মনিব বাড়ী ভীষণ ডাকাতি ও নরহত্যা হইয়াছে ইহার মূলে কি তাহারই স্বামী ? ভগবান—ভগবান, বিশ্বাস স্থির রাখ—হরিমতীর স্বামী যাহাই হউক,—চোর, ডাকাত বা হত্যাকারী যাহাই হউক,—অভাগিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বার বার বলিতে লাগিল "ওগো—কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে ? তোমার কিসের অভাব ছিল—কেন তুমি চোর, খুনী, এ বদনাম নিতে গেলে ? আমি তো কিছুই চাইনি তোমার কাছে। আমায় সাজাতে, আমায় পরাতে কেন তুমি এ নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন করলে ?"

(৩)

গ্রামে পুলিশ আসিয়া পড়িল। চারিদিক তোলপাড় হইতে লাগিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্পষ্ট বললেন "আমার কর্ম্মচারী হরিশ দাসেরই এই কাজ। সে আর কয়েকজন লোক নিয়ে এসেছিল। আমার মেয়ের বিয়ে হবে বলে অনেক গহনা কলকাতা হতে গড়িয়ে এনেছিলুম, অনেক টাকাও উঠিয়ে এনেছিলুম, সব সন্ধান সে জানত। আমি সেদিন রাত্রে তাকে কালীমাখা সত্ত্বেও চিনতে পেরেছিলুম। তার হাতেও একটা ছোরা ছিল। আমার ভাগনে তাকে চিনতে পেরে যেমন ধরতে গেছল, সেই সময়েই সে তার ছোরাখানা আমার ভাগনের বুকে বসিয়ে দি'ছিল।"

অনেক প্রমাণ পুলিসের হস্তগত হইল, স্পষ্টই জানা গেল, এ কাজগুলি হরিশ ব্যতীত

আর কেহই করে নাই। সুতরাং পুলিশের প্রথম কর্ত্তব্য হইল আগে হরিশের বাড়ী অনুসন্ধান করা।

তখন হরিমতী রন্ধন শেষ করিয়া পুত্রকে খাওয়াইয়া দিতেছে মাত্র। পুত্রের জন্য তাহাকে আবার উঠিতে হইয়াছে, তাহার মুখপানে চাহিয়া, আবার তাহাকেও আহার করিতে হইতেছে। হায়, মরিব ভাবিয়াও যে তাহার মরা হইবে না, তাহাকে বাঁচিতেই হইবে।

সহসা প্রাঙ্গণে হুড়মুড় করিয়া দারোগা ও কয়েকজন পুলিশ প্রবেশ করিল, খোকা একবার সেদিকে চাহিয়া সভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া মাতার বক্ষে লুকাইল। হরিমতীর বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল, মাথার কাপড়টা অল্প টানিয়া দিয়া সে বুকে সাহস করিয়া দেখিতে লাগিল কি ব্যাপার হয়!

দারোগা একবার চারিদিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে বলিলেন "কই—সেই খুনীর বউটা কোথায়,—ডাক দেখি তাকে। দুটো চারটে কথা জিজ্ঞাসা করে রীতিমত এনকোয়ারী করা যাক।"

গ্রামের চৌকীদার লক্ষণ তাড়াতাড়ি হরিমতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিমতী বলিল "চল আমি যাচ্ছি।"

পুত্রটীকে বকে ধরিয়া সেই খুনী স্বামীরই মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া—সেই পায়ের ধূলাই কল্পনায় মাথায় দিয়া অকম্পিতপদে সে আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

তাহার অবিচলিত ভাব দেখিয়া দারোগা জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, ভীতা একটী রমণী মুর্ত্তি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবে, থর থর করিয়া কাঁপিবে, কিন্তু এ তো সে নারী নহে। এ যেন দৃঢ়তারই প্রতিমূর্ত্তি।

কঠোরস্বরেই বলিলেন "কাল তোমার স্বামী গহনা টাকা এনে কোথায় রেখে দেছে বল—আর সে কোথায় আছে বল এখনই।"

হরিমতী ভূমিপানে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া উত্তর দিল "আমি কিছু জানিনে হুজুর।"

জ্বলিয়া উঠিয়া দারোগা বলিলেন "কিছু জানো না? টাকা কড়ি, গহনা—"

বাধা দিয়া হরিদাসী বলিল "আমি কিছুই জানিনে।"

দারোগা কর্কশস্বরে বলিলেন "তোমার স্বামীর খবর তুমি নিশ্চয়ই জানো।"

হরিমতী অন্ধকারপূর্ণ মুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"না"। দারোগা দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া জমাদারের পানে চাহিয়া বলিলেন "এ আচ্ছা ডাকাতনী বটে, আমার বেশ মনে নিচ্ছে চুরি ডাকাতির পরামর্শে এ মেয়েলোকও আছে। যাই হোক একে তোমার কাছে রাখ যে পর্য্যন্ত না আমাদের এনকোয়ারি শেষ হয়। একে একটু বেশী করে পীড়ন করলেই সে সব কথা প্রকাশ করবে তাতে সন্দেহ নেই। আমি একে থানায় নিয়ে যেতে চাই। সাবধান—দেখো যেন না পালায়, এর স্বামী যে কোথায় আছে তা এ বেশ জানে।"

হরিমতী জমাদারের নিকটে বসিয়া রহিল। পুত্র মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল। সাহস করিয়া কিছুতেই সে মাথা উঁচু করিতে পারিতেছিল না।

হরিমতী নতবদনে বসিয়া ছিল। তাহাকে দারোগার সঙ্গে থানায় যাইতে হইবে শুনিয়াই তাহার চোখ কান দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। আজও কেহ তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই; ছোট ঘরের বউ হইলেও সে পর্দ্দানশীন, কেমন করিয়া এই অপরিচিত লোকদের সহিত সে থানায় যাইবে? থানাও তো এখান হইতে কাছে নহে। এই চার ক্রোশ কেমন করিয়া এই ছেলেটীকে লইয়া এই দ্বিপ্রহরে সে হাঁটিয়া যাইবে? গ্রামের মেয়ে পুরুষ সবাই যে হাসিবে—সবাই যে বিদ্রূপ করিবে। সজলনেত্র দুটি তাহার একবার গগন পানে পড়িল।

পূর্ণ দুই ঘণ্টা ব্যাপী রীতিমত এনকোয়ারী সমাপ্তে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে—রক্তাক্তমুখে দারোগা বাবু বাহিরে আসিলেন। একটা পুলিসের মাথায় তাঁহার পরিশ্রমলব্ধ কয়েকটা জিনিস দ্বারা পূর্ণ একটা বাক্স চাপাইয়া দিয়া গৃহদ্বারে চাবী বন্ধ করিয়া তিনি একটা গাছতলায় বসিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পরে তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে স্নানাহার করিতে চলিয়া গেলেন, জমাদারকে বলিয়া গেলেন তাহারা যেন ডাকাতনিটাকে সঙ্গে করিয়া এখনি থানায় চলিয়া যায়। তিনি আহারাদি সমাপ্তে অশ্বারোহণে যত শীঘ্র পারিবেন থানায় উপস্থিত হইবেন।

হরিমতী একবার রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "হুজুর, আমি যথার্থাই বলছি—আমি——"

দারোগা রক্তবর্ণমুখে চক্ষু আরক্ত করিয়া অপূর্ব্বকর্কশস্বরে বলিয়া উঠিলেন "চুপ রহো হারামজাদি—বাঁদিকো বাচ্চা। আবি তোমকো থানামে যানে হোগা—আলবৎ যানে হোগা। জমাদার, ইউ মাষ্ট গো টু থানা জাস্ট নাউ উইথ দিস উইকেড উওম্যান।"

হরিমতী এবার চোখ তুলিল। সে চোখে এমন এক শক্তি ছিল যে উদ্ধত দারোগাকেও বাধ্য হইয়া চোখ ফিরাইতে হইল। হরিমতী আর একটীও কথা কহিল না। জমদার তাহাকে ডাকিবামাত্র সে পুত্রকে কোলে লইয়া তাহার পশ্চাতে থানায় চলিল।

পুত্র একবার অস্ফুটস্বরে ডাকিল—"মা"।

"বাবা আমার"।

বুকটা বুঝি হরিমতীর ভাঙ্গিয়া গেল। সে একবার বল সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ তাহাতে একবার কাঁপিয়া উঠিল।

পথে পুলিসের সঙ্গে হরিমতীকে যাইতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল হরিশের স্ত্রীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে একটা বড় বাক্স। সকলেই অনুমান করিল বাক্সে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী হইতে অপহৃত গহনা ও টাকা আছে।

মেয়ে পুরুষ সকলেই এই স্ত্রীলোকটীর ব্যবহারে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হরিমতী যাইতে যাইতে পথের লোকের মুখে তাহার উদ্দেশে গালি শুনিল—তাহার মলিন ওষ্ঠে শুধু একটু হাসির রেখা মাত্র ফুটিয়া উঠিল। সে উদ্দেশে স্বামীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল "আজ আমি যথার্থ তোমার সহধর্ম্মিণী। শুধু সুখের দিনে নয় প্রভু—দুঃখের দিনের অংশও যে আমায় বইতে দেছ এই আমার বড় শান্তি।"

কেবল ছেলেটীর জন্য তাহার একটুও শান্তি পাইবার যো ছিল না। সে কেবল তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিতেছিল। স্ত্রী হৃদয় তার আনন্দে, গর্ব্বে ভরিতেছিল—কিন্তু মাতৃহৃদয় যন্ত্রণায় লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছিল।

গ্রাম হইতে থানায় যাইবার পথে পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কাহারও কৌতুহলোদ্দীপ্ত চোখ তাহার চোখে পড়িল না বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সে চোখ অঙ্কিত করিয়া হরিমতী লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, তাহার পা দুইখানা জড়াইয়া আসিতেছিল, পশ্চাতে কনেষ্টবল তাড়া দিতেছিল "জলদী চলো—খাড়া রহো মৎ।"

তাহার কঠোর উক্তিতে রাম সভয়ে মাতার গলা দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিতেছিল, তাহার সেই সভয় ভাব হরিমতীর সকল লজ্জা সকল ভয় দূর করিতেছিল, সে প্রাণপণে হাঁটিতেছিল। পায়ে কত আঘাত লাগিল, সে তাহা গ্রাহ্য করিল না।

ঠিক দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্র মাথার উপরে। হরিমতী একবার খোকার পানে চাহিয়া দেখিল তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় খোকা কম্পিত ভীত কণ্ঠে বলিল "মা জল খাব।"

"জল খাবি বাবা"—মায়ের বক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে জমাদারের দিকে ফিরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "একটু জল যদি—"

বাধা দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, হাতের রুল দেখাইয়া জমাদার আধা হিন্দি আধা বাঙ্গালায় মিশাইয়া বলিল "হাঁ—আবি হামি পানি আননে যাতা। জলদি চল—নইলে তুহার বি শির তোড় দেগা।" অভাগিনী কোন উত্তর দিল না—চলিতে লাগিল—আবার তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল—শুধু সে পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। হায় ভগবান! তাহার বক্ষও যে শুষ্ক, একটু দুধ নাই যে সন্তানের তৃষ্ণা নিবারণ করে সে।

থানায় গিয়া যখন তাহারা পৌঁছাইল তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। জমাদার একজন কনেষ্টবলকে আদেশ দিল, যে পর্য্যন্ত দারোগা বাবু না আসেন সে পর্য্যন্ত হরিমতীকে তাহার সন্তানসহ একটা নির্জ্জন কক্ষে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

ভীমমূর্ত্তি কনেষ্টবল হরিমতীর পানে চাহিয়া বলিল "আও"। তখন হরিমতী বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতেছিল—রাম তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিল। রক্তচক্ষু কনেষ্টবলকে দেখিবামাত্র সে আতঙ্কে মায়ের কোলে মুখ লুকাইল।

হরিমতী পুত্রকে কোলে লইয়া উঠিল। কনেষ্টবল যখন একটা কক্ষে তাহাকে রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল তখন সে কাতরকণ্ঠে বলিল "দয়া করে একটু জল দিয়ে যাও। আমার জন্যে নয়—এই ছেলের জন্যে চাচ্ছি।"

চাবী দিয়া সে উত্তর করিল, "বক বক মৎ করো, দারোগাবাবু আনেসে বিলকুল ঠিক হোগা। আবি বক বক করনেসে জমাদার আয়েগা তো বহুৎ মার খানে হোগা।"

দরজা বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া সে চলিয়া গেল।

রাম দারুণ জল তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। দারুণ রৌদ্রতাপে এতখানি পথ হাঁটিয়া হরিমতীরও তৃষ্ণা পাইয়াছিল কিন্তু সে নিজের তৃষ্ণা চাপিয়া রাখিল। রামকে যে কি করিয়া সে একটু জল দিতে পারিবে এই চিন্তায় সে পাগল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই।

স্বামীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে কখন তাহার জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছিল। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সে শুনিল কে দ্বার খুলিতেছে। গৃহে তখন গভীর অন্ধকার। খোকা কোথায়? শঙ্কিতভাবে হাত বাড়াইতেই তাহার হাত খোকার গায়ে ঠেকিল। আহা! অসহ্য তৃষ্ণায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাছা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।

দ্বার খুলিয়া গেল। প্রজ্বলিত আলো হাতে লইয়া, দুজন কনেষ্টবলসহ দারোগাবাবু দরজার উপর দাঁড়াইলেন। হরিমতীর পানে চাহিয়া কঠোর বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন "এখন ও বলতে রাজি আছ কিনা? যদি বল এখনই খালাস পাবে, কাল সকালেই তোমায় গাড়ী করে বাড়ীতে পাঠাব, আর যদি না বল সাতদিন সাতরাত এখানে এমনি করে রাখব। একটু জল কি খাবার কিছু দেব না। বল এখনও যা জান—কোথায় চুরির জিনিস আছে, তোমার স্বামীই বা কোথায় আছে——"

নতমস্তকে হরিমতী বলিল "আমি কিছু জানিনে হুজুর।" দারোগা চটিয়া আগুন হইলেন—কনেষ্টবলের পানে চাহিয়া বলিলেন "এ মাগী সব জানে। জেনে শুনেও কোনও কথা বলবে না। যাও, তোমার বেত নিয়ে এসো। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বেতের বাড়ী লাগাও—আপনিই সব কথা বলবে।"

"সাঁচ্ বাৎ জনাব" বলিয়া সে চলিয়া গেল, একটু পরেই বেত আনিয়া দাঁড়াইল।

দারোগা কর্কশস্বরে বলিলেন "দেখতে পাচ্ছো এবার কি হবে তোমার?"

হরিমতী মাটীর পানে চোখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। দারোগা দাঁতে দাঁত রাখিয়া বলিলেন "কি বদমায়েস মেয়েমানুষটা। গুলুয়া, আগে ওর ছেলেটাকে পঁচিশ বেত লাগাও, তারপর ওকে একশ—" হরিমতীর বুকের ভিতর কে যেন জোরে এক ধাক্কা দিয়া গেল। সে চেঁচাইয়া উঠিল, "ওগো না না, ওকে মেরো না। আমায় যত পার মার—ভগবান জানেন আমি নির্দ্দোষী। আমি সব সহ্য করব—কিন্তু ও সহ্য করতে পারবে না"

বলিতে বলিতে সে রামকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া সে সম্মুখে যমদূতদের দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দারোগা ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "গুলুয়া, আবি উস্কো ছিনায়কে লেও।"

হরিমতী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে বক্ষাবদ্ধ রাখিতে পারিল না। শিশুর ভয়াকুল চীৎকারে ও মাতার বুক ফাটা আর্ত্তনাদে মাঠমধ্যস্থ থানাগৃহ সেই মধ্যরাত্রে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

এক ঘা বেত মারিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কোমল অঙ্গ ফাটিয়া শোণিতের ধারা বহিল। উন্মাদিনী মাতা তাহাকে কাড়িয়া লইতে গেল—"আমায় মার ওগো তোমরা আমায় মার, ও যে সহ্য করতে পারবে না, মরে যাবে, ওগো মরে যাবে এখুনি। তোমাদের কি প্রাণ নেই, তোমরা কি পিশাচ? ছেড়ে দাও বলছি আমার ছেলে ছেড়ে দাও এখুনি।"

দারোগা তেমনইভাবে বলিলেন "আগে বল—"

হরিমতী বলিয়া উঠিল "আমি কিছু জানিনে, ধর্ম্ম সাক্ষী—.

'রাখ তোর ধর্ম্ম সাক্ষী" দারোগা আর একজন কনেষ্টবলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "লছমন দোসরা বেত লে আও।"

সে রাত্রিতে থানাতে যে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় চলিয়াছিল তাহা মানুষে ধারণা করিতে পারে না। প্রহারে অজ্ঞান মাতা—আর তাহার কোলের কাছে রক্তাক্তদেহ শিশু রাম। কে জানে সে মরিল কি বাঁচিল।

বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া দারোগা মহাশয় কনেষ্টবলদ্বয় সহ চলিয়া গেলেন। এত প্রহারেও সে স্বামীর চৌর্য্যবৃত্তির কথা প্রকাশ করিল না, সে যে কি ভীষণ ডাকাতনি স্ত্রীলোক তাহা ভাবিয়াই তিনি খুব বেশী আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এরূপ কার্য্য করিতে তিনি অভ্যস্ত, ইহাতে যে কতদূর বেদনা উহাদের দেওয়া হইয়াছে, ইহার শেষ ফল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা তিনি একটুও ভাবেন নাই।

(৫)

বেলা প্রায় এগারটা বারটার সময় হরিমতীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেহের ব্যথায় যে একটা অঙ্গও নাড়িতে পারে নাই। পার্শ্বে তাহার খোকা সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে রুদ্ধশ্বাসে উঠিয়া পড়িল, তাহার বেদনা যেন নিমেষে দূর হইয়া গেল। ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল—অতি সন্তর্পণে খোকার নাকে হাতে দিয়া সে নিঃশ্বাস অনুভব করিল তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল—বল সঞ্চয় করিয়া সে বক্ষে একবার হাত দিল—তারপর—স্থির হইয়া বসিল।

নির্নিমেষনেত্রে অভাগিনী জননী পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। চোখে তাহার একফোঁটা জল দেখা দিল না। হৃদয়ে কি হইতেছিল, তাহা সেই জানে। সেখানে বুঝি স্পন্দনও ছিল না।

বেলা প্রায় একটার সময় দ্বার খুলিয়া দারোগা ও জমাদার কক্ষে প্রবেশ করিল।

হরিমতী একবার মুখও তুলিল না বোধ হয় তাহার বাহ্যিক জ্ঞান তখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

জমাদার একটু অগ্রসর হইয়া মৃতশিশুকে দেখিল, তাহার পর দারোগার পানে চাহিয়া বলিল, "একদমসে মর গিয়া দারোগা সাহেব।"

মর গিয়া—সত্যই রাম মৃত—হরিমতী বক্ষে এক প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। সে নিস্পন্দ বসিয়া রহিল। দারোগার মুখখানাও অন্ধকার হইয়া গেল। নিজের বিপদের গুরুত্ব এইবার তিনি অনুভব করিলেন। জেদের মাথায় যে কাজ করিয়াছেন তাহার চিন্তা এইবার তাঁহার মাথায় আসিল। অনেক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "এখন কি করা যায় জমাদার?"

জমাদার গোঁফে তা দিয়া বলিল "বিলকুল হাম সাফ করে গা। কুছ নেহি হোগা। হরঘড়ি থানামে এসা কাজ হোতা হৈ।"

সে হরিমতীর সম্মুখ হইতে মৃত শিশুকে উঠাইয়া লইল। হরিমতী তেমনই নিস্তব্ধে চাহিয়া রহিল। দারোগা কণ্ঠস্বর একটু কোমল করিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে এসো তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একটা উষ্ণ নিশ্বাস হরিমতীর বক্ষ ভেদ করিয়া পড়িল মাত্র। বরাবর সে দারোগার আদেশ একটাও অমান্য করে নাই,এখনও করিল না। কাল রাত্রে খোকার জামাটা সে খুলিয়া খোকার মাথায় দিয়াছিল, সেটাতে অনেক জায়গায় রক্ত লাগিয়াছিল সেইটা কেবল হাতে লইয়া সে উঠিল।

দারোগার আদেশে কনেষ্টবল একখানা কাপড় আনিয়া দিলে সে রক্তাক্ত কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল কিন্তু জামা ছাড়িল না। শঙ্কিতভাবে দারোগা বলিলেন "জামা দাও।"

হরিমতী চোখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল। আর একবারও সে এমনি একবার চাহিয়াছিল—সে দৃষ্টিতে যাহা ছিল এখন তাহার সহিত আর একটা ভীষণভাব আসিয়া মিশিয়াছে। দারোগা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না; নতনেত্রে বলিলেন "জামাটা দিয়ে যাও।" কঠোরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "না—কিন্তু তোমার কোনো ভয় নাই।"

দারোগা সরিয়া গেল। ধীরপদে হরিমতী থানার বাহিরে তাহার জন্য যে গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল তাহাতে গিয়া উঠিল।

জামাটা বুকে দিয়া সে গাড়ীর মধ্যে লুটাইয়া পড়িল। তখনও তাহার চোখে এককোঁটা জল ছিল না। দারোগার সম্মুখে যে তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল সে মূর্ত্তি আর তখন ছিল না। সে আবার মুখ ঢাকিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময়ে সে নিজ বাড়ীর দ্বারে পৌঁছাইল। সে ব্যথায় নড়িতে পারিতেছিল না

তথাপি জোর করিয়া নামিয়া পড়িল। অতি কষ্টে হাঁটিয়া গিয়া গৃহের শিকল খুলিয়া মেঝেয় শুইয়া পড়িল তারপর বুকের ভিতর হইতে সেই রক্তাক্ত জামা বাহির করিয়া সে একবার দেখিল—আবার বুকের মধ্যে রাখিল।

কত রাত তখন—ঠিক নাই—পার্শ্ববর্ত্তী আমগাছে একটা পেচক কর্কশস্বরে ডাকিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণে খোকার প্রিয় কুকুর চীৎকার করিতে লাগিল। বোধ হইল কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহের দিকে আসিতেছে। কুকুরটা চুপ করিয়া গেল, আনন্দসূচক একটা শব্দ তাহার কণ্ঠে বাহির হইল। অভাগিনী জননীর চোখে নিদ্রা নাই। তাহার হৃদয়েও আজ ভয় নাই। কে আসিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইল। সে গৃহের মধ্যস্থ কিছু দেখিতে পাইতেছিল না; কিন্তু হরিমতী খোলা দরজার উপর তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে সে ব্যক্তি ডাকিল "খোকা।"

হরিমতী উত্তর দিল না। সে বেশ বুঝিল একে।

সে আবার ডাকিল "হরিমতী।"

হরিমতী নীরব।

সে পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া একটা বাতি জ্বালাইল। সেটা পাশের একটা বেঞ্চের উপর রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এবার ভাল করিয়া হরিমতীর পানে চাহিল—ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "খোকা কই?"

হরিমতী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। শুষ্কনয়নে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া বলিল "তোমার খোকাকে দেখতে এসেছো?"

হরিশদাস স্ত্রীর মুখপানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কোনও কথা কহিবার ক্ষমতা তাহার অন্তর্হিত হইয়া গেল। স্ত্রীর মুখে এমনই একটা ভাব সে অঙ্কিত দেখিল যে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

হরিমতী তেমনিই শুষ্ককণ্ঠে বলিল "খোকাকে দেখতে এসেছ, কিন্তু খোকা আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতই চলে গেছে। তুমি কেন এ কাজ করলে?" তারপর একটু চুপ করিয়া—একটু দম লইয়া হঠাৎ বলিল, ওগো, কখনও তোমায় কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আজ তোমায় জিজ্ঞাসা করছি কেন তুমি এ কাজ করলে? আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ?"

হরিশদাস আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তাই—তাই দেখছি হরিমতী—আমার জন্যে—তোমায় অপরাধীর মত—তোমায় যখন পীড়ন করেছিল কেন তুমি বলনি আমি মামার বাড়ী গেছি? তুমি তো জানো সে জায়গা ব্যতীত আমার গিয়ে দাঁড়াবার আর কোনও আশ্রয় নেই। তা যদি বলতে তবে তো তোমায় এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হোত না।"

স্বামীর মুখের পরে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অবিচলস্বরে হরিমতী বলিল "হ্যাঁ—তা আমি জানতুম। কিন্তু বলতে পারলুম না।"

হতভাগ্য হরিশদাস স্ত্রীর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। সম্মুখে পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া হরিমতীর যে চোখে জল আসে নাই সেই চোখ ফাটিয়া এখন দরদরধারে জল ছুটিতে লাগিল। কাহারও নিকটে সে নিজের দীনতা প্রকাশ করিতে পারে নাই, সহানুভূতি পাইয়া তাহার সে দৃঢ়তা চলিয়া গেল, তাহার ভীষণ ভাবটা একটু সরিয়া গেল।

হরিশদাস কাঁদিয়া বলিল "বাস্তবিক আমি চোর, বাস্তবিকই আমি খুনি। আমার এই হাত নররক্তে রঞ্জিত হয়েছে যে। তোমার ভক্তির পাত্র আমি তো নই।" হরিমতী কোন উত্তর দিল না।

হরিশদাস রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কেন চুরি করেছি তা জানো?"

হরিমতী শান্তভাবে বলিল "জানি, আমাদের জন্যে।"

"বাস্তবিকই তাই। খোকার অভাব আমার সহ্য হয় নি। বাবুদের বাড়ীতে দেখে দেখে আমার খোকার অভাব যে কত, তা' যেন আমার স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। খোকা যে অভাব বোধ করেনি, তুমি যে অভাব বোধ করনি—সে অভাবের ভিতর, আমি দেখ্‌তেম, তোমরা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছ। উপায়ও ঠিক এমনি সময় হয়ে গেল। যাক্—হরিশ একটু থামিল—তারপর খুব আস্তে—বুঝি স্বগতঃ—বলিতে লাগিল," কিন্তু সবই রয়েছে যা চুরি করেছি, কি হবে আর এতে, আমার খোকাই যে নেই।"

হতভাগ্য দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

প্রভাতের আলো দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেই হরিমতীর চেতনা ফিরিয়া আসিল—"যাও যাও—সকাল হয়েছে যে, এখনি কেউ দেখতে পাবে।"

হরিশদাস চোখ মুছিয়া বলিল "আর এ জীবন রাখবার দরকার কি হরিমতী?

ব্যাকুলভাবে হরিমতী বলিল "না তা হবে না। যাও এখনো। সবে মাত্র ভোর হচ্ছে, এখনও পালাতে পারবে তুমি। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। যাও তুমি—"

হরিশদাস তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল "বেশ আমি যাচ্ছি, কিন্তু কে তোমায় দেখবে?"

হরিমতী বলিল "আমার দেখবার লোক ঢের আছে, তোমায় সে জন্য ভাবতে হবে না। আমার দিব্য, তুমি যাও এখনি।"

স্বামীর পদধূলি লইয়া একরকম প্রায় জোর করিয়াই সে স্বামীকে বাহির করিয়া দিল। হরিশদাস সজলনেত্রে বলিল "যাচ্ছি তবে, কিন্তু এর প্রতিশোধ নেব তবে ছাড়ব।"

হরিমতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না তা ক'র না। আমার দিব্য, তোমার খোকার দিব্য—"

"বাধা দিও না আমাকে, প্রার্থনা কর, যেন এই শেষ দেখা হয়। প্রতিজ্ঞা কর যে বেঁচে থাকবে সেই যেন প্রতিশোধ নেয়। আমি যাচ্ছি এখন—"

হরিমতী বাধা দিবার আগেই সে চাদরে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে জঙ্গলের পথ ধরিল।

(৬)

হরিমতীর মৃত্যু সংবাদ যখন হরিশদাসের কানে গিয়া পৌঁছাইল তখন প্রথমটা সে স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইয়া রহিল, তাহার পর একটু হাসিল।

যাহাদের সুখী করিবার জন্য অসৎপথে সে চলিয়াছিল, লোককে কষ্ট দিবার সময় হৃদয় কোমল হইয়া আসিলে যাহাদের দারিদ্র্য কষ্ট স্মরণ করিয়া সে শক্ত হইয়া পড়িত, তাহাদের কেহই আর বাঁচিয়া নাই। অসৎ কর্ম্মের গোড়া সেই শুধু বাঁচিয়া আছে এই ফল দেখিবার জন্য।

কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া সে চুরির গহনা টাকা সব একত্র করিয়া একটা বুঁচকি বাঁধিল। সে দিন সে জলস্পর্শও করে নাই। সন্ধ্যা হইবামাত্র সে বুঁচকিটা হাতে লইয়া নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিল। অপর সহযোগীরা তখনও বিপদের সম্ভাবনা আছে দেখিয়া গহনা ও টাকা তাহার নিকটেই জমা রাখিয়াছিল। তাহারা জানিতেও পারিল না তাহাদের দলপতি চুরির ধন লইয়া যাহার জিনিষ তাহাকেই ফিরাইয়া দিতে যাইতেছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া চোখে চশমা দিয়া কি কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। হরিশদাস একেবারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুঁচকিটা নামাইয়া বলিল "এই নিন আপনার জিনিস। কিছু খোওয়া যাইনি, দেখুন ঠিক আছে।"

বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। সে যে অপহৃত জিনিস, ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছে, এ বিশ্বাস তাঁহার হয় নাই। খানিক বাদে বলিয়া উঠিলেন "হরিশ"—

রুদ্ধকণ্ঠে হরিশদাস বলিল "হাঁ৷ আমি সেই বটে।"

"এবার কি মতলবে, আমায় খুন করতে নাকি?" বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাঁড়াইলেন।

হরিশ ম্লান হাসিল "না আমি সে মতলবে আসি নি। আপনার জিনিস যা নিয়েছিলুম তাই ফিরিয়ে দিতে এনেছি। প্রাণ দেবার ক্ষমতা নেই নইলে যে প্রাণ আমি নিয়েছি তাও ফিরিয়ে দিতে পারতুম। তবে এক কাজ করেছি, এই বুঁচকীতে আপনার টাকা ভিন্ন আর পাঁচশ টাকা আছে। যাকে আমি খুন করেছি তার স্ত্রী পুত্রকে দেবেন। আমার দাঁড়াবার আর সময় নেই মাপ করবেন।"

চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সে অদৃশ্য হইল।

পরদিন একটা আশ্চর্য্য খবর সমস্ত গ্রামখানায় ছড়াইয়া পড়িল। হরিশদাস, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গহনা, টাকা ফেরৎ দিয়াছে এবং দারোগাকে হত্যা করিয়াছে। তাহার পর সে নিজেই

সেই রাত্রে সদরে গিয়া পুলিসকে জানাইয়াছে যে, সে চারটী খুন করিয়া আসিয়াছে। একটী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনীর পুত্র, অপর দারোগা এবং আর দুটি তাহার নিজের স্ত্রী ও পুত্র।

বিচারের সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যখন ডাক পড়িল, তখন তিনি তাঁহার বাড়ী ডাকাতি ও খুন স্বীকার করিলেন। বলিলেন "হরিশ যে বলছে তার স্ত্রী পুত্রকে সে খুন করেছে, সেটা মিথ্যা কথা। যে দারোগাকে সে খুন করেছে সেই দারোগাই তার পুত্রকে মেরে ফেলেছে, তার স্ত্রীর উপর অনেক অত্যাচার করেছে।"

রক্তনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া হরিশ বলিল, "আমার স্ত্রী পুত্রকে আমি খুন করিনি? নিশ্চয়ই তারা আমার হাতে মরেছে। যাদের আমি সুখী করতে গেছলুম—না থাক। চারটে খুন আমি করেছি।"

বিচারে তাঁহার ফাঁসীর আদেশ হইল। হাসিমুখে সে জেলে ফিরিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার লইয়া কি ইংরাজী কি বাঙ্গালা মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রে, কি সভায় সমিতিতে, কি চায়ের আসরে কি বৈঠকখানা ঘরে, সর্ব্বত্রই আজ কিছুকাল ধরিয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে দর্শকরূপে এক নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন বটে, প্রকাশ্যে এই বাদানুবাদে যোগ দেন নাই সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে সে কথা আর বলা চলে না, কারণ এখন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেই প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ বাধিয়াছে। গত জুলাই মাসে ব্যবস্থাপক সভা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। প্রায় দেড়মাস গত হইলে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে এই দান সম্বন্ধে সংবাদ দিলেন আর সেই সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর বাঙ্গালা সরকারের একাউনটেণ্ট জেনারেলের একখানি রিপোর্ট পাঠাইলেন আর ইহাও জানাইলেন যে এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট চান যে একাউনটেণ্ট জেনারেলের মন্তব্য ও আরও কতকগুলি সর্ত্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সেই চিঠি ও রিপোর্ট এক কমিটিতে পেশ করিলেন। সেই কমিটির সভ্য ছিলেন—সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার নীলরতন সরকার, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু, অধ্যক্ষ হাওয়েল্‌স্ সাহেব, অধ্যাপক ক্রোহান সাহেব, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ এবং ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র। সেই কমিটি গত ১১ই নভেম্বর তারিখে এক রিপোর্ট দিলেন এবং গত ২রা

ডিসেম্বর সিনেট সভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবে সেই রিপোর্ট সিনেট গ্রহণ করিলেন; এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যদিও জনৈক রায়বাহাদুর এবং সরকারের বেতনভোগী প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক অধ্যাপক সভায় তাঁহাদের ঘোর আপত্তি জানাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, ভোট দিবার সময়ে কিন্তু তাঁহারা নীরব ছিলেন; মোট কথা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেহ ভোট দেন নাই। সিনেট কমিটির রিপোর্টে এই মত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে সর্ত্ত অনুসারে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ গ্রহণ করা কখনই উচিত নহে,—কতকগুলি সর্ত্ত গ্রহণ করা অসম্ভব, এবং একবার সর্ত্ত গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহা কিছু অল্প স্বাধীনতা এখনও আছে, তাহাও বিলুপ্ত হইবে।

এই প্রবন্ধে আমরা প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য কি তাহা সংক্ষেপে লিখিব, এবং দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কি উত্তর দিয়াছেন তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য কি তাহা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই একটা কথা মনে উঠে। সে কথাটা আর কিছু নয়, গভর্ণমেণ্ট বলিলে আমরা কি বুঝিব, অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিরোধে, অর্থাৎ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বলিলে কি বুঝায়? এখন শিক্ষা বিভাগ একজন বাঙ্গালীর অধীনে। তিনি শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী, তিনিই পরিচালক। সুতরাং তিনি কে, শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী হইবার তাঁহার যোগ্যতা কি তাহা অবশ্য আলোচ্য। মন্ত্রী মহাশয় হইতেছেন —শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উকিল ছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় খ্যাতনামা উকিল ছিলেন; দেশের রাজনীতি মঞ্চের ইনি একজন শোভাস্বরূপ ছিলেন, গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সাদরে রাউলাট্ কমিটির সভ্য নিযুক্ত করেন; ইনি মর্য্যাদার সহিত সেই কমিটির কাজ করিয়াছিলেন এবং রাউলাট রিপোর্টে নিজের নাম সহি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ, কারণ ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা নগরীর এক সমৃদ্ধ হাই-স্কুলের এবং সেকেণ্ড-গ্রেড্ কলেজের কমিটিদ্বয়ের সেক্রেটারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষা দপ্তরের বর্ত্তমান মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে এই কয়টী কথা পাঠকের ভুলিলে চলিবে না, কেন না এই ঘোর বিরোধের প্রকৃত হেতু নির্দ্ধারণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার; এবং হয় ত এই কয়টি কথা স্মরণ থাকিলে প্রকৃত হেতু নির্দ্ধারণে অল্প সুবিধাও হইতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য কি এখন তাহা আলোচনা করা যাক্। এই বৎসর ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদন পাঠান। সেই পত্রে ইহা স্পষ্ট বলা ছিল যে ১৯২১-২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। জুলাই মাসে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কাউন্সিলের নিকট আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। জুলাই মাসের ২৫শে তারিখে একাউনটেণ্ট জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ১০ বৎসরের কার্য্যকলাপের উপর একখানি রিপোর্ট পেস করিলেন।

একমাস কাল গভর্ণমেণ্ট সেই রিপোর্ট আলোচনা করিয়া ২৩শে আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকার সাহায্য সম্বন্ধে পত্র লিখিলেন আর কতকগুলি সর্ত্ত পালন না করিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে টাকা দিবেন না ইহাও জানাইলেন। গভর্ণমেণ্টের এই পত্রে ইহা স্পষ্টভাবে লেখা ছিল যে আর্থিক বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন বিশেষ শিথিলভাবাপন্ন ছিলেন, অর্থাৎ সুচারু বিলিব্যবস্থার অভাবই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ। এই অভিযোগটি একাউন্‌টেণ্ট জেনারেলের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া গভর্ণমেণ্ট ব্যক্ত করিয়াছিলেন ইহাও পত্রে স্বীকৃত ছিল। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে টাকা পাঠাইবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সমস্ত সর্ত্ত গ্রহণ করা আবশ্যক ইহাও গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন। আমরা একাউন্‌টেণ্ট জেনারেলের রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের পত্রে আরও কি কি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও বলিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি পড়িয়াছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। আর ইহা পরিশোধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আড়াই লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং বাকী টাকা সংগ্রহের জন্য গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি উপদেশ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সকল উপদেশ এখানে আলোচনা করা সম্ভব নহে তবে তাহার একটি হইতেছে এই যে, এইরূপ আর্থিক দুরবস্থার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থাবর সম্পত্তির কিছুভাগ বন্ধক রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত। গভর্ণমেণ্ট ইহাও জানাইয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় সাহায্য করা অসম্ভব নাও হইতে পারে। তবে সে টাকা দিবার সময় গভর্ণমেণ্ট নূতন সর্ত্তও করিতে পারেন।

একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া গত দশ বৎসরের ইতিহাস বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান হেতু হইতেছে অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের প্রেরিত চিঠিতে এ প্রধান হেতুর কোন উল্লেখও নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে গত বৎসর প্রায় তিন লক্ষ টাকা লোক্‌সান হইয়াছে। একাউনটেণ্ট জেনারেল ইহাও বলিয়াছেন যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার হেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহার জন্যও অর্থব্যয় হইয়াছে; এই বলিয়া তিনি কয়েকটি বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ বাৎসরিক বজেট যাহাতে ঠিক সময়ে সিনেটের নিকট পেস হয় সেই দিকে নজর রাখা কর্ত্তব্য।

এখন বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরে কি বলিলেন আলোচনা করা যাক্। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিনেট এই সকল ব্যাপার তদন্ত করিবার নিমিত্ত এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বাধীনচেতা, সত্যনিষ্ঠ,

নিরপেক্ষ, উন্নতমনা, ধীরমতি, ভগবৎপ্রেমিক জনৈক সম্পাদক কমিটির রিপোর্ট না দেখিয়াই তাঁহার মাসিকপত্রে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে লোকে এই রিপোর্ট কখনই গ্রাহ্য করিবে না, কারণ ইহা 'Packed' কমিটি; অর্থাৎ আশুবাবু ইহার সভাপতি, সুতরাং সভ্যেরা জুজুর ভয়ে সত্য প্রচার করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন। এটা নিতান্ত শিশুর মত কথা হইল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ, অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ প্রকৃত স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী যে কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিবেন না, ইহা জোর করিয়া বাঙ্গালী বলিতে পারে। সিনেট সভায় দাঁড়াইয়া আশুবাবুকেই ইঁহারা যে কতবার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা উক্ত সত্যনিষ্ঠ ও সরলমতি সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় জানেন না বলিবেন। আশুবাবুর সঙ্গে কেহ কখনও একমত হইলেই তিনি তাঁহার দলের লোক অথবা তাঁহার "চাটুকার" হইবেন, আর তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা গোপনে কেহ কিছু লিখিলেই বা বলিলেই তিনি সাধু বা নির্ভীক হইবেন—এ কথা যিনি বলেন তাঁহার সঙ্গে তর্কে পরাজয় স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। কমিটি সম্বন্ধে এই কয়টি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতা বা অব্যবস্থার জন্য আজ এই অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, এই অভিযোগের সত্যতার পরিমাণ যে কত অল্প তাহাই প্রথমে কমিটি বিচার করিয়াছেন। উচ্চ শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত সিনেট যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সকল ব্যবস্থা যে প্রতিপদে গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়া আসিয়াছেন তাহা বিশেষ দ্রষ্টব্য। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের Indian Universities Actএ ইহা স্পষ্ট বলা আছে যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার হেতু সুচারু আয়োজন করা প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কথা সত্য বটে যে এই ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যত সত্বর আর যে পরিমাণে করিতে সমর্থ হইয়াছেন অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাহা পারেন নাই। প্রথম কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এই নিমিত্ত টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১২ সাল হইতে বাৎসরিক একলক্ষ আটাশ হাজার টাকা করিয়া গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়া আসিতেছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার মাত্র আরম্ভ হইয়াছিল, তখন যদি বৎসরে এক লক্ষ আটাশ হাজার টাকা দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এখন ইহা অপেক্ষা কত অধিক পরিমাণ সাহায্য প্রয়োজনীয় তাহা সরকার বুঝিয়াও বুঝেন না। ১৯১২ এবং ১৯১৩ সালে প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্বসমেত পঁচিশ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন। সেই দানগুলিতেও যে সর্ত্ত না ছিল তাহা নহে; তবে সে সর্ত্ত অনুসারে দান গ্রহণ করিয়া কাহারও মাথা হেঁট হয় নাই। প্রধান সর্ত্ত ছিল এই যে তাঁহাদের অর্থে যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা সকলেই ভারতীয় ব্যতীত অন্য কোন জাতি হইতে পারিবেন না। যাহা হউক এই দান প্রাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের নিকট উপর্য্যুপরি আবেদন করিতে

লাগিলেন যে যখন দেশের তুইজন সুসন্তান তাঁহাদের এতদিনের সঞ্চিত স্বোপার্জ্জিত অর্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দান করিলেন, তখন অন্ততঃ তাঁহাদের সম্মানার্থ, বিজ্ঞান কলেজের সুচারু প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ব্যাপার লইয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কিরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল তাহা সব এস্থলে বলা সম্ভব নহে। পাঠকগণ যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া, রিপোর্ট পাঠ করেন তাহাহইলে দেখিতে পাইবেন যে প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের আগ্রহ এবং উৎসাহ আছে কি না। এইস্থলে মাত্র এইটুকু স্মরণ রাখিলে চলিবে যে গভর্ণমেণ্ট কদাচ স্পষ্ট বলিতে পারেন নাই যে তাঁহারা সাহায্য করিবেন না, বা করিতে পারিবেন না; প্রত্যেক পত্রে তাঁহারা আশা দিয়া আসিয়াছেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন তাঁহারা বিবেচনা করিবেন—"in conjunction with other demands." আর কিছু নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে যে অর্থ দান করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ ভাগও যদি বিজ্ঞান কলেজের স্থাপন অথবা প্রসার হেতু দান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এতটা দোষের ভাগী হইতেন না। যাহা হউক ১৯১৭ সালে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এক কমিশন বসাইলেন। সকলেরই ধারণা জন্মিল যে এইবার বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুর্দ্দিন শেষ হইল। লর্ড চেম্‌সফোর্ড সিনেট সভায় প্রকাশ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে "If the Commission were unanimous in their main recommendations, he would lose no time in giving effect to them."

কমিশন আসিল, বসিল, দেখিল, রিপোর্ট লিখিল—কিন্তু যাহার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার উপকার কিছুই হইল না। এদিকে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা কমাইতে আরম্ভ করিলেন; নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। এমন কি বাঙ্গলা দেশের মধ্যেই ঢাকাতে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ঢাকাতে একটি নূতন Board বসিল—তথাকার ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাদ্বয়ের পরিচালনা করিবার নিমিত্ত। এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের প্রকৃত মঙ্গলের এবং শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত কি না তাহা এস্থলে বিবেচনা করার প্রয়োজন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জন্য কি ক্ষতি হইল তাহাই আমাদের আলোচ্য। রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্যের অভাবে পরীক্ষার্থিগণের "ফি"ই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান সম্বল। নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইল বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা উচিত পরিমাণে বাড়িতে পরিল না, এবং সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ও কমিতে লাগিল।

১৯২১ সালে মার্চ্চ মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা নিজের স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দিলেন আর এই দান গ্রহণ করিলেন বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট। তখন যদি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এই দানের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে এই গুরুভার গ্রহণ করিতেন কি না সন্দেহ।

এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতে অনেকেই ভাসিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ছাত্র সমাজও এ সুযোগ ত্যাগ করে নাই। তাহাদের "বয়কট" ব্যবস্থা উচিত হইয়াছিল কি অনুচিত হইয়াছিল তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি না। সে আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি ক্ষতি হইয়াছিল তাহাই আমাদের এস্থলে বিচার্য্য। আর সে ক্ষতির পরিমাণ অল্প হয় নাই, কারণ একাউণ্টেট জেনারেল মহাশয় নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই "বয়কট" আন্দোলনের ফলে ১৯২১-২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি প্রায় তিন লক্ষ টাকা হইয়াছিল। কমিটি রিপোর্টে দেখাইয়াছেন যে একাউণ্টেট জেনারেল ইহা লক্ষ্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে ১৯২০-২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থিগণের নিকট যে পরিমাণে "ফি" আদায় হইবে ভাবিয়াছিলেন, বস্তুতঃপক্ষে তাহা অপেক্ষা প্রায় ৯০ হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছিল—অর্থাৎ সে বারও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অল্প হইয়াছিল। তাহা হইলে ১৯২০—২১ এবং ১৯২১—২২ এই দুই বৎসর একত্র ধরিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা এবং এই ক্ষতির জন্য কেহই বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করিতে পারেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান ঘাটতি হইয়াছে প্রায় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। বাকী ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ঘাটতি কিরূপে হইল তাহার মোটামুটি হিসাব আমরা এইবার দিব। ১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লইয়া যে গোলমাল হইয়াছিল সে কথা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে; সেই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসান হইয়াছিল প্রায় ৬০ হাজার টাকা। এ কথা একাউনটেণ্ট জেনারেল মহাশয় তাঁহার রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছেন। তারপর বিজ্ঞান কলেজের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়কে কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়া টাকা তুলিতে হয়; যুদ্ধের জন্য কাগজের দাম কমিয়া যাওয়ায় ইহাতে ৩০ হাজার টাকার উপর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য সিনেট চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। এই সকলের উপর—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার মধ্যে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্ট দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এইজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কমিয়া গিয়াছিল। এ সকল অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কোনরূপ খরচ বাড়ান দূরের কথা অনেক স্থলে ব্যয়সংকোচই করিয়াছেন। এই সকল কথা যাঁহারা জানেন না, আর যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা ও অপবাদই ক্রমান্বয়ে পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহাদের কিছু বলিতে পারি না; কিন্তু যাঁহারা এ সকল কথা সম্যকরূপে অবগত আছেন, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষই হউন, আর সত্যনিষ্ঠ সম্পাদকই হউন, তাঁহারা যদি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দোষ অথবা অসাবধানতা হেতু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহা হইলে মাত্র এই কথা বলিব যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কখনই সৎ অথবা উচ্চ নহে।

গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য কি পরিমাণে সাহায্য—আমরা মুরুব্বিয়ানা ধরণে পিঠ চাপড়াইয়া দুইটা মিষ্ট বাক্যের দ্বারা সাহায্যের কথা বলিতেছি না—কি পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহাই এইবার দেখাইব।

আর্টস্ বিভাগে ১৯১১-১৯২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বসমেত ব্যয় করিয়াছেন—২৪,২৫,৩২৪ টাকা। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের দান হইতেছে ৪,৮৭,০৮১ টাকা, পঠনকারী ছাত্রদিগের নিকট ফি আদায় হইয়াছে—৭,৯৭,৫২২ টাকা, এবং বিশ্ববিদ্যালয় জেনারেল ফণ্ড হইতে দিয়াছে ১৫,৪০,৭২১।

বিজ্ঞান বিভাগে ১৯১২—১৯২২ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয় সর্ব্বসমেত ব্যয় করিয়াছে—১৮,৬২,১৫৫। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের দান—১,২০,০০০ টাকা; তারকনাথ পালিত ফণ্ড হইতে আসিয়াছে—২,৯৮,০৯৫ টাকা; রাসবিহারী ঘোষ ফণ্ড হইতে আসিয়াছে—৩,৭৮,১৬৬ টাকা; পঠনকারী ছাত্রদের রিকট 'ফি' আদায় হইয়াছে—৬৬,৬৮৫; এবং বিশ্ববিদ্যালয় জেনারেল ফণ্ড হইতে দিয়াছে—৯,৯৯,২০৯ টাকা।

১৯২০—২১ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগে সর্ব্বসমেত ব্যয় হইয়াছিল ৮,০৯,৭৯৩ টাকা এবং গভর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন মাত্র ৬৮,১৩৫ টাকা,—অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তার হেতু বৎসরে গভর্ণমেণ্টের দান শতকরা ৮ এবং দেশের লোকের সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ৯২। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে সে দেশের জনসাধারণ কি করিত তাহা আমরা ভাবিতে পারি না।

এইবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের কেন এবং কিরূপ বিবাদ বাধিয়াছে তাহাই আলোচনা করিব। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন ভাইস চান্সেলার সার নীলরতন সরকার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার সম্বন্ধে আলাপ করিবার পর গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য করিয়া রেজিষ্টারকে আবেদন করিতে বলেন। সেই আবেদনে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত ছিল যে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের শিক্ষকবর্গের উপযোগী বেতন দিবার ব্যবস্থার নিমিত্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা একান্ত প্রয়োজন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পবেতনভোগী শিক্ষকদিগকে দুই গুণ তিন গুণ বেতন দিয়া ঢাকার কর্ত্তৃপক্ষ লইয়া যাইতেছিলেন। সরকারের রাজকোষে অর্থের বোধ হয় এতই বাহুল্য হইয়াছিল যে বাঙ্গালাতে একই প্রকারের শিক্ষা বিস্তার করিবার নিমিত্ত আর একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল, আর পুরাতনকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে নূতন প্রতিষ্ঠানটী পুরাতনের অধীনস্থ শিক্ষকদিগকে "ভাঙ্গাইয়া" আনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সরকার করিয়া দিতে লাগিলেন। যাহাহউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের নিকট শুধু শিক্ষকদিগকে উপযুক্ত বেতন দিবার জন্য যে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহারা তারকনাথ এবং রাসবিহারী প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের উন্নতিকল্পেও

সাহায্য চাহিয়াছিলেন। লালদীঘির পাড় হইতে গোলদীঘির পাড়ে একটা উত্তর আসিতে লাগিল নয় মাস। আর সে উত্তর আশাপ্রদও নহে। গভর্ণমেণ্ট বলিলেন যে তাঁহারাও "দেউলিয়া," এবং অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদের পক্ষে অর্থ সাহায্য করা কঠিন হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ১ লক্ষ ২৫ হাজার চাহিয়াছিলেন নূতন কিছু করিবার জন্য নহে; পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের বর্ত্তমান শিক্ষকদিগের জন্যই চাহিয়াছিলেন, এ কথা গভর্ণমেণ্ট যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। তাঁহাদের পত্রের শেষাংশে লিখিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কথা তাঁহাদের বর্ণগোচর হইয়াছে, সেই নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টকে আবেদন করিলে, তাঁহারা কি করিতে পারেন বিবেচনা করিবেন। অথচ যে পত্রের উত্তরে এই কথা গভর্ণমেণ্ট বলিতেছিলেন সেই পত্রেই অন্ততঃ ১লক্ষ ২৫ হাজার টাকার কথা স্পষ্ট লেখা ছিল। গভর্ণমেণ্টের এই পত্রে আর একটি কথা আছে যাহা এখন গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতীরা, এমন কি মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং দেখিয়াও দেখিতেছেন না। গভর্ণমেণ্ট তখন স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে 'Under *certain conditions* and subject to certain contingencies, the Government of Bengal are willing to help the Calcutta University." সুতরাং এ কথা যিনি বা যাঁহারা বলেন যে সর্ত্ত বসাইবার বাসনা একাউনটেণ্ট জেনারেলের রিপোর্ট পাইবার পর গভর্ণমেণ্টের মনে জাগিয়াছিল, তিনি বা তাঁহারা, আর যাহাই দাবী করুন, সত্য বলিতেছেন এ দাবী করিতে পারিবেন না।

গভর্ণমেণ্টের এ পত্র লিখিবার কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানি পত্র শিক্ষা দপ্তরে পাঠান হয়। সেই পত্রের সঙ্গে Board of Accounts এর একখানি রিপোর্ট পাঠান হইয়াছিল। সেই রিপোর্টে একথা স্পষ্ট বলা ছিল যে ১৯২১-২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি হইবে প্রায় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার। অসহযোগ আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কি ক্ষতি করিতে পারে তাহা সবিস্তারে গভর্ণমেণ্টকে বহুপূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল, কিন্তু সরকার কোনও প্রকার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক সেই সব পত্রের উত্তরও কখনও দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় একথাও গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে রাজকোষ হইতে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয় উপর্য্যুপরি গভর্ণমেণ্টকে পরীক্ষার 'ফি' বাড়াইতে দিবার জন্য সম্মতি চাহিয়াছিলেন, তখন গভর্ণমেণ্ট সে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন পরিশেষে গভর্ণমেণ্টকে বিশ্ববিদ্যালয় এই কথা বলিলেন যে যদি টাকার উচিত ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়া যাইবে।

এই পত্রের উত্তরে একমাস পরে গভর্ণমেণ্ট লিখিলেন যে তাঁহারা সে সময়ে কিছু বলিতে বা করিতে অক্ষম আর বিশ্ববিদ্যালয় যেন পুনরায় দুইমাস পরে "in greater details" আর একটি আবেদন পাঠান। বিশ্ববিদ্যালয় যে আবেদন পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে যথেষ্ট "details" ছিল,—তাহা অপেক্ষা "greater details" কি হইতে পারে তাহা গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত

অন্য কাহারও বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উপর্য্যুপরি গভর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন পাঠাইতেছিল, সকল ঘটনাই তাঁহাদের ক্রমান্বয়ে গোচর করিতেছিল—আর এক বৎসর পরে হঠাৎ গভর্ণমেন্ট বলিয়া বসিলেন যে তাঁহারা চান "greater details." কথায় বলে, "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ!"

বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করিতে গভর্ণমেন্টের বাস্তবিকপক্ষে আগ্রহ আছে কি না, এই ব্যবহার হইতে তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সব ব্যাপারই এইখানে চাপা পড়িয়া যাইত, যদি গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বয়ং মন্ত্রী মহাশয় ভাইস-চান্সেলারকে পুনরায় একটি আবেদন পাঠাইবার জন্য উপদেশ দিয়া পত্র না লিখিতেন। সে পত্রে আবার ইহাও স্পষ্ট লিখিত ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন গভর্ণমেন্টের নিকট দুইদিনের মধ্যে পৌঁছান চাই; এত তাড়াতাড়ি করিবার অর্থ অবশ্য এই হইতে পারিত যে গভর্ণমেন্ট অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিবেন। নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেরূপ একখানি আবেদন পাঠান হইয়াছিল, এইবারও দুইদিনের মধ্যে সেইরূপ আর একখানি পত্র লেখা হইল। একমাস পরে যখন বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের বজেট ব্যবস্থাপক সভায় পেস হইল, তখন দেখা গেল যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই আর্থিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। সেই সভাতে মন্ত্রী মহাশয় আবার সুযোগ পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এক চোট ঝাল ঝাড়িয়া লইলেন, অযথা ভাবে অলীক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সবিশেষ তিরস্কার করিলেন। মাসের পর মাস চলিয়া গেল, অথচ ফেব্রুয়ারী মাসের পত্রের কোনপ্রকার উত্তর গভর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিলেন না। জুলাই মাসে Supplementary বজেটে গভর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আড়াই লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় দুইজন সভ্য ব্যতীত আর সকলেই এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছিলেন। কয়েকটি সর্ত্ত পালন না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে টাকা তুলিয়া দেওয়া হইবে না, একথা তখন মন্ত্রী মহাশয় সভ্যদিগকে জানান নাই। ইহার কয়েকদিন পরে একাউন্টেন্ট জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থার উপর গভর্ণমেন্ট একখানি রিপোর্ট দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই রিপোর্ট বিবেচনা করিতে গভর্ণমেন্টের একমাসকাল সময় চলিয়া গেল। একাউন্টেন্ট জেনারেলের মন্তব্যের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বলিবার আছে কিনা জানিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, গভর্ণমেন্ট সাব্যস্ত করিয়া নিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় দোষী, এবং সেই রিপোর্টের মন্তব্য গ্রহণ ও আরও কতকগুলি সর্ত্ত পালন না করিলে তাঁহাদের পক্ষে—"as custodians of public funds"—বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করা সঙ্গত হইবে না এ কথা স্পষ্ট জানাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয় তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেন্টকে লিখিলেন যে এত সত্বর তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া সুবিবেচনার কাজ করেন নাই, সিনেটের উত্তর না শোনা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করা উচিত ছিল। সিনেট এ বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই এই রিপোর্ট ও গভর্ণমেন্টের পত্র ষ্টেট্স্‌ম্যানে বাহির

হইয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়কে গালাগালি দেওয়া যাঁহাদের ব্যবসায় অথবা যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের বাক্য আর বেদবাক্য একই গণ্য করেন, তাঁহারা এই সুযোগ ছাড়িলেন না। গভর্ণমেণ্টের সেই পত্র যে মাত্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল তাহা নহে, সাতসমুদ্র তের নদী পার করিয়া উহাকে আবার ইংলণ্ডে হাজির করা হইল। সেখানে টাইমস্ পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এক তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইল। অনেকে মনে করেন সে প্রবন্ধের মালমশলা এইখান হইতেই সংগ্রহ করিয়া পাঠান হইয়াছিল। সেই টাইমস্ পত্রের প্রবন্ধ ভারতবর্ষে আসিতে না আসিতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের Publicity office হইতে গোপনে সংবাদ পত্রের নিকট পত্র জারি করা হইল যেন এই প্রবন্ধটি সত্বর পুনর্মুদ্রিত করা হয়। সংবাদ পত্রের সম্পাদকের কষ্ট লাঘব করিবার নিমিত্ত সেই প্রবন্ধের এক এক কাপি টাইপ করিয়া প্রত্যেকের নিকট প্রেরিত হইল। এ ব্যাপারটা "কিছু নয়" বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। গভর্ণমেণ্ট তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে একখানি পত্র লিখিলেন; বিশ্ববিদ্যালয় জানাইলেন যে সিনেট এক কমিটি নিযুক্ত করিয়া একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের রিপোর্ট ও সেই পত্র বিবেচনা করিতেছেন, ইতিমধ্যে কোথায় ৬০০০ মাইল দূরে সেই পত্রের উপর নির্ভর করিয়া টাইমস্ পত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে তিরস্কার করিলেন, আর গভর্ণমেণ্ট সেই প্রবন্ধ এদেশে জাহির করিতে উদগ্রীব হইয়া গোপনে সম্পাদকদিগকে উহা পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা এই গোপনে অনুরোধ করার কথা হইতে বুঝা যাইবে।

আমরা এইবার সংক্ষেপে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের রিপোর্ট সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫॥ লক্ষ টাকার ঘাটতি কি করিয়া হইয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। উচ্চশিক্ষা প্রসার হেতু বিশ্ববিদ্যালয় যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা উচিত কি অনুচিত হইয়াছে সে কথা একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মহাশয়ের বলার অধিকার নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভাইস-চেন্সালার মহাশয় সেদিন এই সম্বন্ধে সিনেটে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহাই এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"I am constrained to enquire, what are the functions of an Acountant General; what are the functions of an auditor? An auditor is an official whose duty it is to receive and examine accounts of money in the hands of others, who verifies them by reference to vouchers and has power to disallow charges incurred without authority. It is not the function of an auditor or an Accountant General to discuss the question of policy of an institution. Where is the Accountant Ceneral, who will come forward to examine the accounts of the Government of Bengal ard say,—you have a deficit of forty lacs, sixty lacs or eighty lacs, so you should not have four members of the Executive Council or three Ministers or so many Divisional Commissioners or District Officers or Superintendents of Police? Where is the Accountant-General who will come forward

and say that Mr. Montagu or Lord Chelmsford did not launch forth a wise policy? Where is the Accountant General, who can say, while auditing the accounts of the Military Department,—you do not require so many officers or so much artillery? Where is the Accountant General who, while examining the accounts of the railway system can say,—you do not require such a big establishment, so many departments, officers, or, for the matter of that, so many engines? The Accountant-General is trotted out as a great authority on educational matters. But I ask, is he here to review the educational policy of the University? That must be done by persons qualified for the task, conscious of the requirements of a great University for the people of this country."

সংক্ষেপে ইহার এই মর্ম্মটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিসাব পরিদর্শকের কাজ এই যে, যে ভাবে টাকার খরচের ব্যবস্থা আছে, তাহা সেই ভাবে হইয়াছে কিনা তাহাই দেখা; তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা অনধিকার চর্চ্চা যে অমুক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত হইল কিনা; গভর্ণমেণ্ট অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত লোকেরা যাহা প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহার সম্বন্ধে কথা বলিবার তাঁহার অধিকার নাই।

যে সব স্থলে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মহাশয়ের সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এমন কি সে সব স্থলেও তিনি মাঝে মাঝে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। এ প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নহে; যাঁহারা ইচ্ছা করেন কমিটির রিপোর্ট পড়িলে সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। আমার এস্থলে বিজ্ঞান কলেজ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলির আলোচনা করিব। তিনি দেখাইয়াছেন যে ১৯২০-২১ সালে এই কলেজের তিনটি বিভাগে ব্যয়ের জন্য সিনেট বাৎসরিক বজেটে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থার অভাব, যথেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি সব প্রমাণিত হইল। ইহা সত্য বটে যে তিনটি বিভাগে অধিক ব্যয় হইয়াছিল। কমিটি উত্তরে কি বলিতেছেন এইবার লিখিব। প্রথমতঃ একাউণ্টেট জেনারেল এ কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে বিজ্ঞান কলেজেরই অন্যান্য বিভাগগুলির জন্য যে টাকা বাৎসরিক বজেটে মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় নাই; অর্থাৎ, দশটি বিভাগের মধ্যে যদি তিনটি বিভাগে অধিক ব্যয় হইয়া থাকে আর যদি সাতটি বিভাগে তাহা না হইয়া থাকে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি একটা মন্তব্য প্রকাশ করা সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই তিনটি বিভাগে কেন অধিক ব্যয় হইয়াছিল তাহার কারণও কমিটির রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাইতেছি। যখন এক পাউণ্ডের দাম ছিল সাতটাকার কিছু উপর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞান কলেজের জন্য বিলাত হইতে যন্ত্র এবং পুস্তকাদি আনিতে দিলেন। যখন মাল আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রতি পাউণ্ডের দাম প্রায় পনের টাকা করিয়া পড়িল। এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনরূপই দোষ থাকিতে পারে না; অথচ এই লইয়া জনৈক সমালোচক তাঁহার মাসিকপত্রিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে খুব এক চোট ধমকাইয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টের সর্ত্তগুলি লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায় যে মূল উদ্দেশ্য হইল বিশ্ববিদ্যালয়কে যতটা সম্ভব গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন করা। বাৎসরিক বজেট প্রস্তুত করা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল নিয়মাবলী করিয়াছেন তাহা গভর্ণমেণ্টের নিকট তিন মাস পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু এমন কতকগুলি সর্ত্ত আছে যাহা গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহা কিছু অল্প স্বাধীনতা বর্ত্তমানে আছে তাহাও লোপ পাইবে। গভর্ণমেণ্ট চান যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিমাসে আয় ও ব্যয়ের তালিকা মাসান্তে তাঁহাদের নিকট দাখিল (submit) করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট ইহাও চান যে বাৎসরিক বজেটও সিনেট পাশ করিবার পর বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহাদের নিকট দাখিল (submit) করিতে হইবে। এই দাখিল (submit) করার অর্থ যদি এই হয় যে গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন না করিলে বজেট ধার্য্য হইবে না, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ব্যাপারই অদূর ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্টের করতলগত হইয়া দাঁড়াইবে—বিশ্ববিদ্যালয় যদি বজেটে ইতিহাস চর্চ্চার জন্য ২০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন অথবা পালি বা সংস্কৃতপাঠ চর্চ্চার জন্য ১৫ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, নূতন বিধি অনুসারে গভর্ণমেণ্ট অনায়াসে বলিতে পারেন যে তাঁহাদের অভিমতে পালি সংস্কৃত অথবা ইতিহাসের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন সুতরাং তাঁহারা এ ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে অসমর্থ। গোমস্তার নিকট হইতে মাসে মাসে হিসাব চাহিবার অধিকার জমিদারের আছে বটে; কিন্তু সেই ভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অধীনস্থ করিবার বিশেষ আপত্তির কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখন শিক্ষা বিভাগ মন্ত্রীর অধীনে। এক এক মন্ত্রীর অস্তিত্ব সাধারণতঃ তিন বৎসরের অধিক স্থায়ী নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান যদি মাত্র গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে পরিণত হয়, তাহা হইলে কখনই দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। যদি প্রত্যেক নূতন মন্ত্রী পুরাতনের ব্যবস্থা অনুমোদন না করিয়া নূতন করিয়া সব গড়িয়া তুলিতে চান, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন হওয়া অসম্ভব। মন্ত্রী হইলেই যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় তাঁহার আয়ত্তাধীন হইবে এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। দেশের শিক্ষা প্রচার কার্য্যে যাঁহারা সত্যই জীবনপাত করিয়াছেন, শিক্ষা ব্যাপার যাঁহারা জানেন বা বুঝেন এমন লোকসমূহেরই হাতে এ ভার ন্যস্ত হওয়া উচিত। অর্থ সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া যে গভর্ণমেণ্ট control দাবী করিবেন এ কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বলা চলে না।

মোট কথা হইতেছে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫॥ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। এ কথা মানিতে হইবে যে বিশ্ব-বিদ্যালয় যাহা কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা লোকশিক্ষার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ আছে—এ কথা কেহ অস্বীকার করে না; সকল প্রতিষ্ঠানেরই গলদ আছে। কিন্তু যাঁহারা এত বড় অনুষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা যে দেশহিতৈষী নন একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। নানাপ্রকার

বাধা বিঘ্ন সত্বেও যে এত বড় একটা অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্যজনক। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কাঁটার খোঁচায় যাঁহারা অন্ধ হইয়া যান নাই তাঁহারাই এই বিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

পৌষে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচক—জিদ বড় বালাই। খুন চড়ার মত জিদ্‌ চড়িলে লোকে আপনাদের উত্তেজিত আগ্রহে সত্যে মিথ্যায় প্রভেদ ভুলিয়া যায়, আর অকপট উৎসাহে ভ্রান্ত পথে চলে। ইহারা আপনার দিকটাই অভ্রান্ত ভাবিয়া অপরকে তীব্র কটু ভাষায় গালি দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করে, আর অপরের প্রতিবাদের ক্ষুদ্র কথাও সহিতে পারে না। ইহারা যখন বলে যে, ইহাদের কথার কেহ ভুল দেখাইয়া দিতে পারে নাই, তখন ভুলিয়া যায়,—তাহারা নিজেরাই বাদী ও হাকিম হইয়া বিচার করে; ভুলিয়া যায় ভারতচন্দ্রের সেই বচন,—যে মাথাটা যখন জিদে শক্ত হয়, তখন সে শক্ত মাথায় সুযুক্তির হীরার ধার ভাঙ্গিয়া যায়।

বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করায় যে তাঁহাদের অপরাধ হইয়াছে ইহা যেন কোন কোন সমালোচক বুঝিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের লেখায় অনুমান করা যায়; বুঝিতে পারা যায়,—হয় জিদের গোঁ একেবারে থামে নাই বলিয়া, আর না হয় ভুল স্বীকার করিতে লজ্জিত বলিয়া, ইঁহারা ঘুরাইয়া-পেঁচাইয়া অতি ক্ষীণ ভাষায়,—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বপক্ষে দু'এক কথা বলিতেছেন। এই জাতীয় সঙ্কটের দিনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রকে অনুবর্ত্তন করিয়া ইঁহাদিগকে বলিতেছি,—জিদ্‌ ছাড়িয়া ও অভিমান ছাড়িয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রক্ষায় উদ্যোগী হউন।

জিদের ফলেই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক, শিক্ষা সচিব মহাশয় তাঁহার পন্থাটি ছাড়িবেন, মনে হয় না; দেশের লোকে তাঁহার বিরোধী হওয়ায়, তিনি বেশি মাত্রায় শক্ত হইবেন মনে হয়; বিশেষ তিনি অক্ষম দেশীয় লোকদের উর্দ্ধে দু-একজন ইংরেজ সম্পাদকের উপহৃত ধূনার গন্ধে মাতোয়ারা হইতেছেন।

যে সকল প্রভুত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্নতির বিরোধী, এখন তাঁহারা অতি নগণ্য ব্যক্তির মুখেও নিজেদের মনের মত কথা শুনিলে,—সাদরে তাহার উল্লেখ করিবেন। যাঁহারা নিজেদের সমালোচনার বাহাদুরী দেখিতেছেন, তাঁহারা একথা ভুলিবেন না। দৃষ্টান্ত দিতেছি। মডার্ণ রিবিউ পত্রে অনেক সময়ে শাসন প্রভৃতি বিষয়ের অনেক সমালোচনা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চপদস্থেরা তাহা পড়িয়া কখনও সে পত্রিকার নাম করেন নাই,—ঐ পত্রিকা যে ছুঁইয়া থাকেন

তাহা কখনও জানিতে দেন নাই। এবারে একজন পায়াভারী ব্যক্তি টাইম্‌স পত্রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপরে বিষ ঝাড়িতে গিয়া ঐ পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন মডার্ণ রিবিউ পত্রে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকদিগকে নীচ ও খোসামুদে বলিয়া গালি দেন, তখন এমন সুকৌশলে শ্রীযুক্ত সার্প সাহেবের কথা ও বেহার গবর্ণমেণ্টের কথা উল্লেখ করেন, যে তাহাতে খোসামুদেরাও খোসামোদের পাকা চাল শিখিতে পারে। সুদক্ষ কেপিটাল পত্রের সম্পাদক বলেন, যে, টাইম্‌সের যে প্রবন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিন্দা ও শ্রীযুক্ত যদুনাথের প্রশংসা ছিল, তাহার লেখক স্বয়ং সার্প বাহাদুর।

ক্ষমতা হাতে পাইয়া কি উপায়ে ও পদ্ধতিতে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়কে গলা টিপিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা আমরা পাঠক সাধারণকে সুপণ্ডিত নিঃস্বার্থ হিতৈষী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় পড়িতে অনুরোধ করি; কেবল তাঁহারই নাম করিলাম এইজন্য, যে কেহই বলিতে পারিবেন না, যে তিনি বৃথা ভাবের প্রেরণায় অথবা স্বার্থের বুদ্ধিতে উত্তেজিত মস্তিষ্কে কিম্বা ছল-চাতুরী করিয়া কিছু লিখিয়াছেন। হয়ত বা আগামী ১লা জানুয়ারীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শত্রুকে উচ্চউপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাইব, কিন্তু তাহা দেখিয়া যেন শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার প্রথাপদ্ধতি বুঝিতে কেহ ভুল না করেন। প্রচলিত আইন অনুসারে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর যে প্রভুতা চালাইবার অধিকার নাই, মিত্র মহাশয়কে তাহা চালাইবার প্রয়াস দেখিয়া ও বিল রচনার কথা শুনিয়া লোকের এই ধারণা তেমন অমূলক মনে হয় নাই, যে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দারুণ অভাবের দিনে "কারে ফেলিয়া" দাসখত লিখাইবার অভিপ্রায়ে উহার প্রয়োজনের অর্দ্ধেক টাকার থলেটি দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতেছিলেন। এমন মিত্রের হাত হইতে এদেশের শিক্ষা-বিভাগ আর এক বৎসরেও মুক্তি পাইবে কিনা জানি না।

* * *

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিতৈষী—যাঁহাদের গায়ে বিষের জ্বালা,—অথবা যাঁহারা নিজেদের প্রভুতা বাড়াইতে ব্যগ্র, অথবা বাহাদুরী দেখাইয়া পশার জমাইতে সচেষ্ট, তাঁহারাই কয়েকজন সাজিয়াছেন, বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমালোচক। সৌভাগ্য এই, অনেকেই ইঁহাদের মহিমা, মতলব ও মুরুব্বিআনার মানে বুঝিয়াছে। অধিকতর সৌভাগ্য এই যাঁহারা যথার্থই উচ্চপদস্থ ও সুপণ্ডিত—দেশের কাহারও নিকট যাঁহাদের পরিচয় দিতে হয় না, যাঁহাদের স্বদেশহিতৈষণা বচন-রচনায় জাহির হয় না, তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্কটের কথা শুনিয়াই উহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। পত্রিকায় পত্রিকায় ইঁহাদের নাম পড়িয়াই দেশের লোকে দেখিয়াছেন, যে যাঁহারা অনুগ্রহলব্ধ পদ পাইয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের অপেক্ষা ইঁহারা কত উর্দ্ধে। কাজেই সমালোচকদের সমালোচনার অর্থ বুঝিতে এখন কাহারও বিলম্ব হইতেছে না। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সার আশুতোষ চৌধুরী, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রভৃতি

যে কয়েকজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি নিজেরা টাকা দিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুক্তি ও স্থিতির জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সার্থক হইবে। সাহায্যের জন্য ইঁহাদের আহ্বানবাণী প্রকাশিত হইতে হইতেই প্রায় ২০০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। প্রথম তালিকায় যে সকল দাতার নাম ছাপা হইয়াছে, তাহা পড়িলেই পাঠকেরা নিঃসন্দেহে দেখিবেন যে, প্রভূত অর্থ না থাকিলেও যাঁহারা জ্ঞানে ও কর্ম্মে কৃতী পুরুষ বলিয়া সমাজে আদৃত,—ভোট কুড়াইয়া অথবা সরকারের খাতিরি মনোনয়নে যাঁহাদিগকে নাম কিনিতে হয় না, তাঁহারা এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বিদ্যা প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গল সাধনে অগ্রসর। কয়েকজন উচ্চ-শিক্ষার্থী ছাত্রদের মুখে শুনিলাম, তাঁহারা চেষ্টা করিবেন, যে সকল ছাত্রেরা একটাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা তুলিয়া দেয়। ছাত্রদের এই অনুরাগ দেখিয়া কুচক্রীরা কি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবেন না।

২রা ডিসেম্বর তারিখে সেনেটের সুপণ্ডিত সদস্যেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্মান, গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে ভাষায় তাঁহাদের মনের দৃঢ়ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সর্বত্র সাগ্রহে পঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীযুক্ত ভাইস চান্‌সেলার মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতার মর্ম্মটুকুমাত্র তারের খবরে অন্য প্রদেশের সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে; তাহা পড়িয়াই অনেক শিক্ষিত লোকের মনে সাড়া পড়িয়াছে; মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যম তারযোগে ভাইস্ চান্‌সেলারকে জানাইয়াছেন,—তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক একশত টাকা করিয়া দিতে থাকিবেন। এদেশ সত্য-নিষ্ঠার দেশ, শিক্ষানুরাগের দেশ; দুই চারিজন বিপথগামী ও বিদ্বেষ পরায়ণ, ইহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা যে অতি ন্যূনকল্পের ব্যবস্থা, আর তাহাকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করিলেও যে অমঙ্গল ঘটে, তাহা এদেশের যথার্থ মুখপাত্রদের উদ্যোগ দেখিয়াই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এই ব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য যত টাকার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্টের বাজে খরচের টাকার যে অতি নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ, তাহাও দেশের কৃতী সন্তানেরা বুঝাইয়া বুঝাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; কিন্তু ঊর্দ্ধে-টানিয়া তোলা —শিক্ষা-সচিব সে সকল ছোট কথা কানে তুলিতেছেন না। আমাদের দৃঢ় ধারণা, দেশের লোকে সানুরাগে ইহার প্রতীকার করিবেন।

* * *

সরকারের টাকার খাঁকৃতি—মশানের উচ্ছৃঙ্খল সহচরের দল ছাড়িয়া মঙ্গল স্বরূপ যখন নিজের শিব-রূপে দেখা দিয়া অন্ন চাহিলেন, তখন অন্নপূর্ণার হাঁড়ী অফুরন্ত হইল— বিশ্বের খাই খাই থামিয়া গেল। বাজে কাজে ও উড়ন-চড়ে কাজে যাহাতে টাকা খরচ

না হয় ইঞ্চকেপ কমিটী তাহাই করিবেন, মনে করি; তবে সরকারের পক্ষ হইতে (শিক্ষা বাদে) প্রত্যেক বিভাগের খরচের অতি প্রয়োজন বুঝাইয়া যে সকল তালিকা রচিত হইয়াছে, কমিটী তাহা কতখানি অতিক্রম করিতে পারিবেন জানিনা। কলিকাতা রিবিউ. পত্রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থ-শাস্ত্রের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বাজে খরচের যে সকল ফৰ্দ্দ দিয়াছেন, তাহা ইঞ্চকেপ বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, শুনিয়াছি; সেইজন্য সেগুলির উল্লেখ প্রয়োজন নাই। দেশের লোকের প্রাণরক্ষার প্রয়োজনের মত সুশিক্ষা দিবার প্রয়োজনটি যে অতি গুরু ও নিতান্ত অপরিহার্য্য, ইহা লর্ড ইঞ্চকেপ বাহাদুর নিজে জানেন, আর তাঁহার সভার সদস্যেরাও নিশ্চয় জানেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গুরু প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্টকে যে লঘু ব্যবস্থা করিবার ছিল, সেই লঘু হইতেও লঘু অৰ্দ্ধেক টাকা দিতে গিয়া শিক্ষা সচিব যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও লর্ড ইঞ্চকেপ নিজে কাছে বসিয়াই দেখিলেন। প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিলে কখনও টাকার অভাব হয় না; কাজেই বিজ্ঞদের কমিশনে সুব্যবস্থার আশা করি।

বিলাতে রক্ষিত ভারতকাউন্সিল উঠিবার নয়, কারণ গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন না যে সে কাউন্সিলটি অবসর প্রাপ্ত বুড়া ইংরেজ কর্ম্মচারীদের পিঁজরা পোল রূপে রাখা হইয়াছে; সরকার বুঝাইয়া দিবেন যে, পার্লেমেণ্টের সঙ্গে ভারত শাসনের যোগে থাকাই চাই, আর সে যোগের জন্য সুযোগ দেওয়া চাই ভারতের কথা বুঝাইবার জন্য এদেশ বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগকে। সমর বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করাও সহজ হইবে না; ভারতরক্ষার জন্য সবন্দুক পুলিশ থাকিলেই যথেষ্ট হয়, আর সীমান্তের গিরি সঙ্কটের পারেও প্রবল আক্রমণের কোন ভয় নাই বটে, তবে অনেকবার সমর বিভাগ সংক্রান্ত মন্তব্যে পড়িয়াছি যে, আয়োজন রাখিলে, প্রয়োজনের সময় একদিকে আফ্রিকায় ও অন্য দিকে ভারতসাগর ও প্রশান্ত সাগরের দিকে অতি শীঘ্র সৈন্য পাঠান যাইতে পারে। কথা উঠিতে পারে যে এরূপ ব্যয়ের ভার আমরা বহিব কেন; কিন্তু সে "কেন" শূন্যেই প্রতিধ্বনিত হইবে। ইহার মধ্যেই কমিশনের মন্তব্য জানিবার আগেই, ত্রিশজন বিলাতী ডাক্তার বহু টাকায় নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন।

রিফর্মের চাপে প্রদেশ বিভাগের বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, আর সেই বাড়াবাড়িতে আমাদের জাতীয়ত্বের প্রসার লাভে বাধা হইয়াছে; কিন্তু এ বাধার আপত্তি, ভাবের উত্তেজনার আপত্তি অর্থাৎ Sentimental আপত্তি বলিয়া গণিত হইবে। নহিলে নিদানপক্ষে আসামকে বাঙ্গলার সঙ্গে জুড়িলে দুই প্রদেশেরই উপকার হইত; তবে তাহাতেও চারি-পাঁচজন বড় ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহজে মোটা বেতন পাইবার পথ রোধ হয়। আমরা যদি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তর্ক করিতে বসি, তবে প্রতি কথায় পরাজিত হইব। লর্ড ইঞ্চকেপের ক্ষমতা আছে, যে তিনি সকল ওজর আপত্তির মূল বিশ্লেষণ করিতে পারেন, এবং কোন স্থলে বৃথায় কল্পিত গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহার নিজের জাতির লোকেরা ভারতের স্বার্থের দিকে তাকায় না, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন।

বিলাতে ও ভারতে নীতির পার্থক্য—বিলাতে লোকসংখ্যা বাড়িলে গবর্ণমেণ্ট ভাবেন যে জাতির পুষ্টিলাভ হইতেছে; আমাদের দেশে লোক বাড়িলে নীতির উপদেশে শুনিতে পাই, যে এ দেশের বর্ব্বরেরা বার্দ্ধক্যে বিবাহ না চালাইয়া অযথা পোষ্য বাড়াইতেছে।' স্কুল কলেজের পরীক্ষায় যদি বিলাতে শতকরা নিরানব্বই জন পাশ হয়, তবে মায় গবর্ণমেণ্ট সারা দেশের লোক জ্ঞানের প্রসার দেখিয়া উৎফুল্ল হইবেন; আর এ দেশে পাশের মাত্রা একটু বাড়িলেই শুনিতে পাই যে অযথা রকমে বাজে উমেদার ও আন্দোলনের লোক বাড়িতেছে। আমাদের লোকেরা চাকুরী বা উপার্জ্জনের কোন উপায় না পাইলে ক্ষুধার সময় এই গালি হজম করে যে তাহারা অকেজো লেখাপড়া শিখিয়া আত্মবিনাশ করিতেছে ও পৃথিবীর মত আকৃতি বিশিষ্ট মূলধন খাটাইয়া রোজগার না করায় পাপ সঞ্চয় করিতেছে। বিলাতে কিন্তু জনকতক মজুর যদি কাজ না পায়, ও উপার্জ্জনের বয়সে ভদ্রলোকেরা উপায় খুঁজিয়া না পায়, তবে পার্লেমেণ্টে কোলাহল পড়ে; কারণ যে রাষ্ট্রনীতিতে দেশে লোক বাড়িতে পারে না, জ্ঞানের প্রসার হয় না ও মানুষের উপার্জ্জনের প্রচুর উপায় হয় না, সে রাষ্ট্রনীতিকে ইউরোপে অধম ও ঘৃণ্য বলিয়া থাকে। স্থানের গুণে একই কথার ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়। ইহাকেই কি বলে,—বিষমপ্যমৃতং ক্বচিৎ ভবেৎ,—অমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।

কাজের শিক্ষা—শিক্ষার মর্য্যাদা বোঝেন না,—কেবল একটা ফেশান বা প্রচলিত ঢং ধরিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলেন, এমন অনেক লোক আছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি পড়ার যে কত প্রয়োজন, তাহা আমরা অনেকবার লিখিয়াছি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া বড় উপকার করিয়াছেন। যাহাকে আর্ট বিভাগের বিদ্যা বলে, উহা না শিখিলে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, –যে কল খাটাইতে যাইবে তাহার হাতে সকল কল বিকল হইয়া যাইবে, ইহা ভাল করিয়া বোঝা উচিত। সমাজতত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে আমাদের অনেক নেতাদের চালিত সংস্কারের আন্দোলন যে কোলাহলেই উপিয়া যাইতেছে, ইহা বহু দৃষ্টান্ত দিয়া মহীশুরের পঞ্চম জাতির সভায় ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অতি দক্ষতার সহিত বুঝাইয়াছেন। প্রবন্ধটির বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

প্রচলিত উচ্চ-শিক্ষায় যুবকেরা মানুষ হইতেছে না, এ অপবাদ শিক্ষার শত্রু-মিত্র অনেকেই বলেন, তবে মিত্র-শত্রু কি বলেন, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। যুবকেরা যে প্রচলিত উচ্চ-শিক্ষায় দোষে মানুষ হইতে পারিতেছে না, তাহা নয়; সে শিক্ষার আয়োজনে প্রচুর অর্থব্যয়ের অভাবেই যে দোষ ঘটিতেছে, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি, আর ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা বলিয়াছেন। বিলাতের ছেলেরা স্কুল কলেজে পড়া ছাড়া, নানা যায়গায় বেড়াইতে যায়, ও নানা অবস্থা দেখিয়া অভিজ্ঞতায় চৌকস্ হইয়া ওঠে; আর ইহারই ফলে তাহারা সংসারে যে কোন কাজে লাগিলে ভাল কাজ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশের অভিভাবকেরা

ছেলেদিগকে পড়া মুখস্থ করিতে বিদ্যালয়ে পাঠান,—ছুটি হইলে আম খাওয়াইতে ঘরে লইয়া যান, ও সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ করিয়া ভাল মানুষ তৈয়ী করেন। ফলে দাঁড়ায়,—আমাদের উচ্চ-শিক্ষিতেরা বড় বড় বচন আওড়ান, কিন্তু কাণ্ড-জ্ঞান (Common sense) শূন্য হয়েন; আর মেথু আরনল্ড প্রভৃতি পড়িবার পরে ও প্রবন্ধ রচনায় প্রাইজ পাইবার পরে, একখানি ছোট চিঠিও গুছাইয়া লিখিতে পারেন না, ও সংসারের জটিল কথা শুনিলে হাঁ করিয়া থাকেন।

শিক্ষা পরিচালকেরা যে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে ছুটির সময় নানা স্থানে পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া অভিভাবকদের মত লওয়াইবেন, তাহার উপায় নাই; একাজের জন্য টাকা ত নাইই, আর যদি অল্প কিছু থাকিত ও খরচ হইত, তবে গ্রামবাসী হইতে প্রবাসী পর্য্যন্ত সমালোচকদের কাছে বাজে খরচের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে বিদ্যার প্রতিষ্ঠানটি উঠিয়া যাইত।

তাজা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা অনেক টাকা পাইয়া বিদেশে নানা অনুসন্ধান করিতে যান; তাই তাঁহাদের বুদ্ধি ফোটে, প্রতিভা বাড়ে, ও নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয়। নিউজিলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাকমিলান ব্রাউন, প্রশান্ত মহাসাগরের ইষ্টার দ্বীপে অল্প দিন হইল, সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার যে চমৎকার নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে নৃ-তত্ত্বের অনেক নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারের অতি অল্প সময় পরেই ঐ দ্বীপটি ভূ-কম্পে সাগরের অতলে ডুবিয়াছে। আমাদের দেশের অনেক প্রথা-পদ্ধতি যদি এখন সংগৃহীত না হয়, তবে উহা কালের অতলে শীঘ্রই ডুবিবে। সম্প্রতি মিশরে প্রাচীন সভ্যতার যে জীবন্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, আর যাহাতে ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সমাজ-তত্ত্বের জ্ঞান অধিকতর হইবে, তাহার আবিষ্কারকেরা বিশ্ব-বিদ্যায়ের অধ্যাপক। আমরা যদি অধ্যাপকদের সঙ্গে পাঠাইয়া বঙ্গদেশটাকেই বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও ছাত্রেরা অনেক শিখিত ও একটুখানি চৌকস্ হইত। পূর্ব্ব বঙ্গের ছাত্রেরা পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া শিক্ষা পান, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক কোন অবস্থাই জানিতে পারেন না। মানুষ করিতে হইলে,—মনের প্রফুল্লতা বাড়াইয়া জ্ঞানের জন্য কৌতূহলী করিতে হইলে, ও অলক্ষ্যে বিনা পুঁথির শিক্ষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিতে হইলে ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়। এখনই অতি অল্প ব্যয়ের সময়ে সমালোচকেরা পাটীগণিত খুলিয়া ত্রৈরাশিক কষিয়া দেখাইয়া থাকেন যে ছাত্র পিছু কত অধিক টাকার অপব্যয় হইতেছে। ছাত্রদের বেড়াইবার ব্যবস্থা করিলে ত সমালোচকদের অঙ্ক শাস্ত্রই মূর্চ্ছা যাইবে। এখানে ছাত্রদের মানুষ হইবার কেবল একটা দিকের কথাই বলিলাম, যে কাজটা টাকা থাকিলে অনায়াসেই হইতে পারিত তাহার কথাই বলিলাম।

ইউরোপের কথা—ইংরেজ নীতিজ্ঞদের ধারণা,—আয়ার্লাণ্ডে যে নূতন ব্যবস্থা হইল তাহাতে ভবিষ্যতে একটু আধটু অস্থায়ী বিদ্রোহ ঘটা ছাড়া অন্য কোন অমঙ্গল হইবে না, বরং অচিরেই উত্তর দক্ষিণ আয়ার্লাণ্ড মিলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহায়রূপে নূতন ও সুতেজ স্বাধীন

দেশ গড়িয়া উঠিবে। সংবাদ এই যে নূতন নিয়োজিত গবর্ণর জেনারল হীলিকে দক্ষিণ আয়র্লাণ্ডের স্বাধীন রাজ্য সাদরে অভ্যর্থিত করিয়াছে, দেশের লোকেরা ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং বিদ্রোহের মাত্রা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। মন্ত্রীর কিস্তিতে ডি বেলেরার চাল মাত হওয়ায় তিনি নাকি পালাইয়া দেশত্যাগী হইতেছেন।

ফরাসীরা জার্ম্মানী হইতে সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন বেবেরিয়া রাজ্যের রাজস্ব ক্রোক করিয়া খেসারতের টাকা তুলিতেছেন আর জর্ম্মানীর রাইন প্রদেশের রূর জেলাটি কব্জায় আনিয়া বাকী টাকা তুলিবার উদ্যোগ শেষ করিয়াছেন। এ জুলুমে জর্ম্মানী যে ক্ষুব্ধ হইয়া রহিল, ও সুযোগ পাইলেই ভবিষ্যতে দাদ তুলিতে চাহিবে, তাহাই অনেকের বিশ্বাস। ইতালীর রাজমন্ত্রী মুসোলিনিকে এই জুলুমের সমর্থক দেখিয়া সকলেই দুঃখিত ফরাসী দেশেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও উদারতা বেশী ছিল বলিয়াই লোকের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস টলিতেছে। ইংলণ্ডে যখন ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন তোলেন, তখন ফরাসী মেয়েদের গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে নারী জাতির অধিকার সম্বন্ধে ফরাসী অপেক্ষা ইংরেজেরা অধিক উদার। এবারে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নারীদের ভোট দিবার অধিকার অগ্রাহ্য করিয়াছেন, দেখিতেছি। ঠিক এই সময়েই আমাদের দেশের শ্রীমতী সুধাংশুবালা হাজরা ওকালতীতে অধিকার পাইবার জন্য তাঁহার আবেদন সম্বন্ধে বেহার হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের Privy Councilএ আপিল করিয়াছেন। ফরাসী নারী অপেক্ষা ভারতের নারীরা ইহার পূর্ব্বেই মান্দ্রাজে অধিক অধিকার পাইয়াছেন।

গ্রীকেরা তুর্কীর কাছে পরাজিত হইবার পর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আপনাদের দেশে যথেচ্ছাচার করিতেছে। যুদ্ধে হারিবার ফলে যুদ্ধের সময়কার মন্ত্রীদিগকে ও সৈন্যনায়কদিগকে প্রাণদণ্ড করায় ইংলণ্ড ও ইতালি গ্রীকদিগকে একঘরে করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু ফরাসীরা কোন কোন বিষয়ে এ অমানুষিকতারও বিরুদ্ধবাদী হয় নাই। পূর্ব্বে তুর্কীরাজ্যে কোন গোল বাধিলেই গ্রীকেরা তুর্কীদের নামে অত্যাচারের অপবাদ দিত এবং তুর্কীরা উল্টা অভিযোগ করিলে কেহ শুনিত না; এবারে গ্রীকদের অমানুষিকতা ধরা পড়িয়াছে।

বীরবর কমাল পাশার চেষ্টা সফল হইবার মত হইয়াছে। লোজান্ নগরের মন্ত্রণাক্ষেত্রে তুর্কীর প্রধান প্রধান সকল দাবী স্বীকৃত হইয়াছে; এখন কেবল দর্দনলিসের পথে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত সামরিক জাহাজ চালনা প্রভৃতি বিষয়ে বিচার চলিতেছে। যদি লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ সাগরে কোন জাতিরই রণতরী থাকিতে পাইবে না, আর দর্দনলিসের পথে জাহাজ চালনা প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় জাতির বিচারাধীনে থাকিলেও তুর্কীদের প্রতিনিধি অন্য সকল জাতির প্রতিনিধিদের সভার অধিনায়ক হইবেন। তুর্কীদের হাতে সমগ্র দর্দনলিসের কর্তৃত্ব দিতেও ইংরেজ ও ইতালিয়েরা অস্বীকৃত নহেন, তবে রুষিয়া কোন ছলে বা কৌশলে ভূমধ্য

সাগরের দিকে যাহাতে যুদ্ধের বড় জাহাজ বা ডুবুরি জাহাজ আনিতে না পারে, তাহাই নাকি ইংরেজেরা ও তাঁহাদের সহায়েরা বিশেষ করিয়া দেখিতেছেন। তুর্কীর নূতন খলিফা কমাল পাশার রাষ্ট্রনীতিকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, এবং আমাদের ভারতের মুসলমানেরাও খলিফাকে সুলতান না করায় শাস্ত্র অনুসারে কোন দোষ দেখিতে পান নাই। অবিলম্বেই আঙ্গোরা ও কন্‌স্তান্তিনোপলের মিলিত গবর্ণমেণ্ট আদ্রিয়ানোপল পর্য্যন্ত শাসন বিস্তার করিয়া স্থায়ী হইবে। বিদেশীয়েরা তুর্কীর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং কুস্তুন্তনিয়া ও ইস্তাম্বুল হইতে ইউরোপীয় সমাজের নীচস্তরের পুরুষ ও নারীরা দূরীভূত হইবে।

আগামী কংগ্রেস—গয়ায় যে কংগ্রেস বসিবে, তাহার বিচার্য্য বিষয় লইয়া অনেক দিন ধরিয়া তর্ক ও আলোচনা চলিয়াছে; গতবারে আইনভঙ্গ কমিটির রায়ের বিবরণ প্রকাশ করিবার সময়ে বিচার্য্য বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সরকারী কাউনসিলে প্রবেশ করা বিষয়ে কমিটির সভ্যদের মতভেদের কথাও লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে সকল বিষয়ের বিচারের যে বৈঠক বসিয়াছিল, সেখানে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন,—আর তাহাদের মধ্যে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা গিয়াছে।

একদলের কথা এই—কাউন্সিলে ঢুকিলে অসহযোগ নীতি সম্বন্ধে গোড়ায় যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, আর দেশের লোকে মনে করিবে যে অসহযোগ নীতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা হইয়াছে। অপর দলের উত্তর এই যে, উপযোগী মনে করিলে আগেকার নির্দ্দিষ্ট পন্থা বদলাইলে ক্ষতি হয় না, আর স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও প্রয়োজনের হিসাবে কয়েকবার পন্থা বদলাইয়াছেন। দ্বিতীয় দলের বিশেষ কথা এই কাউন্সিলে যখন লোকের অভাব হইতেছে না, ও কাউন্সিলের কাজে যখন দেশের লাভ লোকসান হইবেই, তখন ভাল লোকের পক্ষে কাউন্সিলে যাওয়া উচিত; অসহযোগ পন্থীরা কাউন্সিল অধিকার করিলে, সরকারের ইচ্ছানুরূপ যে কোন আইন পাশ হইতে পারিব না।

এই মতভেদ লক্ষ্য করিয়া কয়েকখানি ইংরেজী কাগজে একটু টিটকারী দিয়া লিখিয়াছেন যে, এবারে গয়ায় সুরাটী কংগ্রেসের অভিনয় হইবে ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির হাতাহাতিতে কংগ্রেস চাপা পড়িবে। এই অশুভ ভবিষ্যবাণী কেন, যদি ইহাও সত্য হয় যে গয়াসুর মাথা তুলিয়া কংগ্রেসের আয়োজন ভাঙ্গিয়া দিবে, তাহাতেও কাহারও ভীত হইবার কিছু নাই। যদি দেশের লোক সত্যনিষ্ঠায় ও হিতৈষণার বুদ্ধিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তবে কোন প্রকারের মতভেদের কোলাহলে ও লড়াইয়ে দেশের অনিষ্ট হইবে না; সাধনা অকপট হইলে, একদিন না একদিন এদেশের দুর্দশা ঘুচিবে। মানুষে মানুষে মতভেদে মনুষ্যত্ব সূচিত হয়, অবাধ স্বাধীন চিন্তা সূচিত হয়, এবং এক দেশদর্শিতা ঘুচিয়া সুবিচারিত অনুষ্ঠানের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়। আমাদের

মধ্যে যদি পরবাদ সহিষ্ণুতা না থাকে, মতভেদের জন্য আমরা "পূজ্য-পূজা-ব্যতিক্রম" ঘটাই, তবে যথার্থই আমাদের শ্রেয়ের পথে বাধা পড়িবে।

কোন একটি সম্প্রদায় আইন-ভঙ্গ নীতির অনুসন্ধান কমিটির একটি মুখ্য উক্তিকে স্বরাজ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছেন; এই দলের লোক বলিতেছেন যে, কংগ্রেসের নেতারা অতর্কিতভাবে সরকার বাহাদুরের এই মন্তব্যটিকে সমর্থন করিয়াছেন যে, এদেশ এখনও স্বরাজ লাভের উপযোগী হয় নাই বলিয়াই দেশের লোককে অধিকতর শাসনের ভার দেওয়া যায় নাই। উপলক্ষিত রিপোর্টে আছে,— দেশের লোক যথার্থভাবে শিক্ষিত হইয়া প্রস্তুত হয় নাই বলিয়াই, কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত কোন কোন অনুষ্ঠান এখন অবলম্বনীয় নহে। রিপোর্টে যে সকল অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ঐ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, এই লেখকের মতে সেগুলি যথার্থই বর্জনীয়; স্বরাজ লাভের জন্য পৃথিবীর কোন দেশের লোকই কোন সময়ে ও কোন অবস্থায় অনুপযোগী নহে। আমায় কথাটি বুঝাইতে গেলে অতি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়; আগামী কংগ্রেসের বিচার্য্য বিষয়ের প্রসঙ্গে সাধারণভাবে একটি কথা বলিব। স্বরাজের অর্থ এই যে, যাঁহারাই এদেশের অধিবাসী আছেন বা হইতে পারেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকটে সকল রকমের উন্নতির পথ মুক্ত, এবং সমাজ শাসনে হউক অথবা রাষ্ট্র-শাসনে হউক, সকল শ্রেণীর লোকই সেই শাসন-নিয়ন্ত্রণে অধিকারী। পথ মুক্ত না থাকিলেই সকলে সে পথে যায় না এবং অধিকার থাকিলেই সকলে সে অধিকার লাভ করিতে পারে না; কিন্তু তাহাতে স্বরাজের বা মুক্তির ব্যত্যয় ঘটে না। কথাটি রেলওয়ের উপমায় বুঝাইয়া বলিতেছি।

রেল খোলা আছে; যে লোক যে হিসাবে টাকা দিয়া টিকিট কিনিবে, সে সেই হিসাবে উপরের বা নীচের দরের গাড়ীতে উঠিতে পারিবে। এ নিয়ম থাকিলে রেলের যাত্রীরা অবাধভাবে চড়িতে পারে; যাহার টাকা নাই, সে টাকা হইলেই গাড়ীতে চড়িবে। রাজ্য পরিচালন প্রভৃতি সম্বন্ধেও ক্ষমতার হিসাবে ঠিক সেই কথা। আমরা যদি কোন শ্রেণীর শিক্ষালাভে বাধা না পাই, কোন শ্রেণীর চাকুরী পাইতে বাধা না পাই, তবে স্বরাজ আমাদের হাতে। খামখেয়ালীতে অথবা অপ্রকাশিত বা অপ্রকাশ্য কারণে যদি শ্রেণী বিশেষের লোক বলিয়া বসেন যে, অমুক লোকের অমুক পথে চলিবার বা অমুক কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, এবং যথার্থই ক্ষমতা আছে কি না আছে তাহা দেখাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে কাগজে কলমে দেশের লোককে মুক্ত ও স্বাধীন বলিলে তাহারা মুক্ত ও স্বাধীন হয় না; শ্রেণী বিশেষের আধিপত্য থাকিলেই অধীনতা থাকিবে,—শ্রেণী বিশেষ গৌরাঙ্গই হউক বা কৃষ্ণাঙ্গই হউক অধিক বিস্তৃতভাবে আর আলোচনা করিব না; কেবল এইটুকু বলিব যে, কোন একটি কাজ বিশেষে যদি কোন শ্রেণী বিশেষ অক্ষম বিচারিত হয়, তবে শ্রেণী বিশেষকে সাধারণ অধিকারের হিসাবে অযোগ্য বলা চলে না। লক্ষ্য-পথ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইলে, স্বরাজলাভের পদ্ধতি লইয়া যেরূপ উত্তেজিতভাবে বিচার

চলিতেছে, তাহা থাকিবে না। আশা করি সকলে পরবাদসহিষ্ণু হইয়া ধীরভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি—১২৭৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে সর্ব্বসাধারণের জন্য নূতন ধরণের নাটক অভিনয়ের উদ্যোগে রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়; গত ২৩শে অগ্রহায়ণ এই অনুষ্ঠানের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে উক্ত তারিখে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাদের অনেকেই আর ইহ জগতে নাই। এখন কেবল জীবিত আছেন শ্রীযুক্ত ঘোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্থায়ী রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। যাঁহারা এই নাট্যশালা স্থাপনের অগ্রণী ছিলেন, তাঁহারা স্থাপন করা ছাড়াও অনেক নাট্য-সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার নাট্যকলা, নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্যের কর্ম্মিগণকে উক্ত সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকলাবিদ্ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুকে একখানি অভিনন্দনপত্র ও একটি সপুষ্প সুগঠিত রৌপ্য নির্ম্মিত পুষ্পাধার প্রদান করা হইয়াছে।

শোকসংবাদ

স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত—ইতিমধ্যে আমরা আর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবীকে হারাইয়াছি। আমাদের বঙ্গবাণীর লেখক রসশিল্পী যতীন্দ্র মোহন গুপ্ত মহোদয় আর ইহজগতে নাই। গত ১২ই নভেম্বর রাঁচী প্রবাসে যতীন্দ্র মোহন ৪৮ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে মস্তিষ্কের পীড়ায় হঠাৎ হার্টফেল হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

যতীন্দ্র মোহনের "বেহারচিত্র" নামক রসচিত্রের পুস্তকখানি তাঁহার রসসাহিত্যরচনাকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ "হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য" নারী সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, যদিও তাঁহার অনেক রচনা মাসিকপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল অতি অল্প সংখ্যকই কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১। কুহেলিকা (সামাজিক উপন্যাস) ২। চম্পা (ছোটনাগপুরের বন্য জাতির জীবন অবলম্বনে উপন্যাস) ৩। রতন (সামাজিক উপন্যাস) ৪। প্রত্যক্ষপ্রমাণ (কৌতুকনাট্য) ৫। পঞ্চরতন (বাংলার সামাজিকচিত্র) ৬। নীহারিকা ও ৭। হাসি ও অশ্রু (ছোট গল্প সংগ্রহ)।

যতীনবাবু মুঙ্গেরে ওকালতি করিতেন—আপন বৃত্তিতে ও বিষয়কর্ম্মে তিনি তত মনোযোগী ছিলেন না। সর্ব্বদা জ্ঞানানুশীলনে নিরত থাকিতেন। তিনি ধীর, সুরসিক অথচ মিতভাষী, চরিত্রবান ও পরম ভাগবত ব্যক্তি ছিলেন। ওকালতী ব্যবসাতেও তিনি অক্ষুণ্ণ সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিতেন।

মৃত্যুর যতীন্দ্রবাবু চার পুত্র ও [illegible] কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের অন্তরের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বর্গীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর ঃ—স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র, বাঙ্গালীর গৌরব, দেশহিতৈষী রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর আর ইহলোকে নাই। গত ২৩ শে অগ্রহায়ণ, শনিবার ভোরে ৫ টার সময় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। রাধাচরণ প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং নিজ ওয়ার্ডের করদাতৃগণের অভাব অভিযোগ তিনি স্বকর্ণে শুনিবার জন্য প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে আহ্বান করিতেন এবং স্বচক্ষে তাঁহাদের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া বেড়াইতেন। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সহিত তিনি প্রথমাবধিই সংসৃষ্ট ছিলেন। বয়কট আন্দোলন উপলক্ষে যখন ছাত্রেরা দলে দলে জেলে গিয়াছিল, তখন তিনিই জেলে তাহাদের আহারের অব্যবস্থার তদন্ত করিয়া গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

গত ২২শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটির কার্য্য করিতে করিতে একটু অসুস্থ বোধ করেন, এবং বাটী আসিবার পথে নিজের ডাক্তারকে লইয়া আসেন। বাটীতে কিছুক্ষণ পরেই তিনি সুস্থবোধ করেন। কিন্তু রাত্রি ৪টার সময় তিনি পুনরায় হৃদ্‌রোগে কাতর হইয়া পড়েন এবং রাত্রি ৫ টার সময় মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি বিনয়ী, অমায়িক ও স্বদেশবৎসল ছিলেন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে আমরা গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

স্বর্গীয় কাশীপতি ঘোষ—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সুবিখ্যাত 'কর্ কোম্পানী'র শিল্পী শ্রীযুক্ত কাশীপতি ঘোষ বি, ই, মহাশয় ৺কাশীধামে মারা গিয়াছেন। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে জাতীয় শিক্ষা সমিতি তাঁহাকে মার্কিণে পাঠাইয়াছিলেন। কোন স্থানে চাকুরী না লইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে মার্টিনেট—মার্কিণ পত্রে প্রকাশ যে বিখ্যাত ভূ-পর্য্যটক মার্টিনেট চীন রাজ্যে মারা গিয়াছেন। অনাহার ও অতিশ্রম নাকি তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁর শেষ অনুরোধ যে তাঁহার কবরের উপর যেন এক বাজার বসে।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.
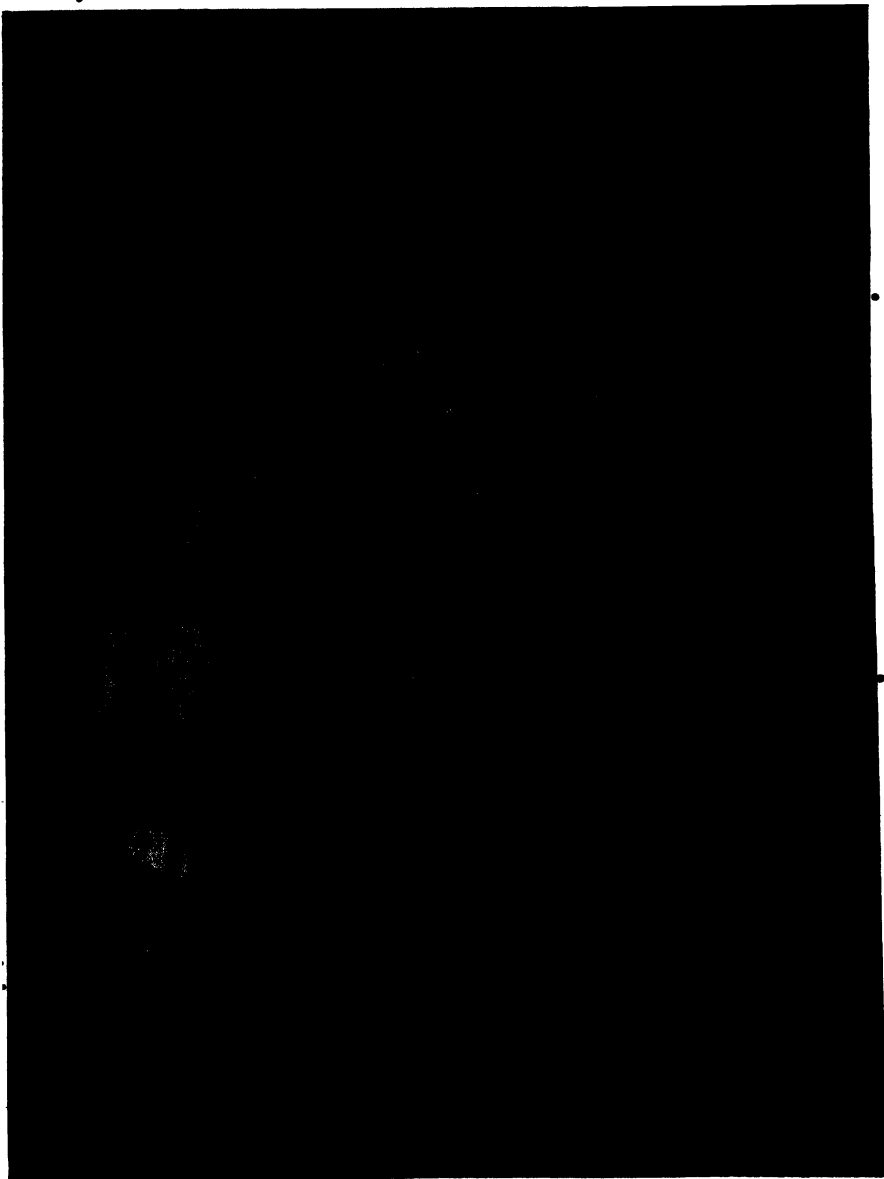
দুঃখের ভার

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী]

["কলিকাতা রিভিউ" পত্রের সৌজন্যে

"আবার তোরা মানুষ হ"

প্রথম বর্ষ
১৩২৮-'২৯

মাঘ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভবভূতি

(Sylvain Levi-র ফরাসী হইতে)

শূদ্রকের মৌলিকতা আমাদের নিকট আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে যদি আমরা গৃহস্থ-শ্রেণীয় নায়ক-নায়িকাঘটিত আর একটি নাটকের সহিত উহার তুলনা করিয়া দেখি। ভারতীয় সমালোচকেরা এই নাট্যকটিকে শূদ্রক রচিত নাটক অপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন এবং উহাঁকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকবির শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করেন :—

সেই নাটকটি ভবভূতির মালতী-মাধব। ভবভূতির সৃষ্টি করিবার প্রতিভা নাই। তাঁহার রোম্যাণ্টিক নাটকগুলি সম্ভবতঃ অনুকরণমাত্র। এবং শুধু শূদ্রকের সহিত পাল্লা দেওয়া ছাড়া মালতীমাধবকে দশ অঙ্কে বিভক্ত করিবার আর কোন সঙ্গত হেতু দেখা যায় না। এই দুই কবির মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান স্থাপন না করিয়া, ইতিহাসের হিসাবে, দুইজনকে আরও পরস্পরের কাছাকাছি আনিবার পক্ষে ইহাও আর একটা যুক্তি। ভবভূতির তারিখ কতকটা স্থির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভবভূতি কনৌজরাজ যশোবর্ম্মনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মনকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। এই পরাভব হইতেই তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত হইতে

পারে। ললিতাদিত্য ৬৯৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ; এবং এই ঘটনা হইতে যশোবর্ম্মনের উপর বিজয়লাভ একটু দূরবর্ত্তী ; পক্ষান্তরে যশোবর্ম্মন এই পরাজয়ের পূর্ব্বে, গৌড়রাজের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। এবং যশোবর্ম্মনের রাজসভার এক কবি, বাক্‌পতিরাজ 'গৌড়বহো' নামক এক প্রাকৃত মহাকাব্যে এই বিজয়ের জয়কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই কাব্যে তিনি আত্ম-গরিমাচ্ছলে বলিয়াছেন "ভবভূতির অমৃতসাগর হইতে তিনি কয়েক ফোটা অমৃত অপহরণ করিয়াছেন।" অতএব ভবভূতির উৎকৃষ্ট রচনাগুলি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের একটু পরে বিরচিত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের কুলকীর্ত্তি ও কুলপ্রথা যশোবর্ম্মন সগৌরবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কবিদিগকে উৎসাহিত করিতেন, এবং তাহাদের সহিত পাল্লা দিতেন। অলঙ্কারশাস্ত্রাদিতে তাঁহার নামে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হয়, সেই শ্লোকগুলিতে বেশ একটু লালিত্য ও রসিকতা আছে। এমন কি, তিনি "রামাভ্যুদয়" নামক একটি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাহার নায়ক। ভবভূতির প্রস্তাবনাদি হইতে ভবভূতির বংশ ও শাস্ত্রাধ্যয়নের কথা অনেকটা জানা যায়। তিনি উদুম্বর-উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ বংশ হইতে সমুদ্ভূত। এই ব্রাহ্মণবংশ বিদর্ভের (বেরার) অন্তঃপাতী পদ্মপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী, ও কাশ্যপ-গোত্রীয়। ভবভূতির পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতার নাম জাতুকর্ণী, পিতামহের নাম গোপালভট্ট, তাঁহার চতুর্থ পুরুষস্থ পূর্ব্বপুরুষ একজন মহাকবি ছিলেন ; "প্রকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার" জ্ঞাননিধি নামক এক মহাপণ্ডিতের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞাননিধি বেদ, উপনিষদ, বিবিধদর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র, মহাকাব্য, নাটক ও নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

কালিদাসের ন্যায় ভবভূতি তিনখানি নাটক রাখিয়া গিয়াছেন। দুইটি নাটক রাম-কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত,—মহাবীর চরিত, ও উত্তর-চরিত। অন্যটি মালতীমাধব—একটী স্বকপোল-কল্পিত নাটক অন্ততঃ অলঙ্কারশাস্ত্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর, কবির এই মৌলিক কল্পনা অতীব সংযত। বৃহৎকথা (=XIII কথা-সরিৎ-সাগর) হইতে তিনি এই নাটকের আখ্যানবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক ব্রাহ্মণ যখন বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে মদিরাবতী তাঁহার এক সহাধ্যায়ীর ভগিনীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন। তরুণীও সেই বিদ্যার্থীকে দেখিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে একটী মালা গাঁথিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। উহাদের বিবাহের কথা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় এক বড়-ঘরের পাত্র মদিরাবতীর পাণিপ্রার্থী হইলেন। মদিরাবতীর পিতা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইলেন না এবং প্রায়-বাগ্‌দত্ত সেই বিদ্যার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। বিদ্যার্থী হতাশ হইয়া নগর হইতে বাহির হইল, এবং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইল। তাহার নৈরাশ্য প্রশমনার্থ আর এক যুবক এই সময়ে ঐ স্থানে আসিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল। এই যুবকটী পথে বেড়াইতে বেড়াইতে এক তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যার্থীর স্থায় সেও প্রেমে পড়ে ; এই যুবকটী ঐ তরুণীকে পলাতক এক মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে ; পরে, সে তাহার দৃষ্টিবহির্ভূত হওয়ায়, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। এই দুই যুবক বন্ধু পরস্পরকে সাহস দিয়া, মাতৃকাদের মন্দিরে যাত্রা

সিলভ্যাঁ লেভি

["কলিকাতা রিভিউ" পত্রের সৌজন্যে]

করিল। উহারা যে সময়ে সেখানে উপনীত হইল, মদিরাবতীও সেই সময় বাগ্‌দত্তার সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কামদেবকে পূজা দিবার জন্য উপস্থিত হইল। আসলে আত্মহত্যা করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। মদিরাবতী হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিতে পাইল। এই যুবকের বন্ধু

উহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য, উহাদিগকে সুখী করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিল। ঐ বাগ্‌দত্তা তরুণীর সহিত আপন বেশভূষা বদল করিল; তারপর যখন প্রেমিকযুগল পলায়ন করিল, তখন এই যুবকবন্ধু মদিরাবতীর সহচরীদিগের সহিত মদিরাবতীর গৃহে প্রবেশ করিল। সেই সময় মদিরাবতীর এক সখী, বিবাহের পূর্ব্বে বিদায় সম্ভাষণ করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিল। এই তরুণীটিই সেই হস্তীর আক্রমণ ব্যাপারে ঐ যুবকের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়াছিল এবং বহুকাল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে তরুণী, দুইজনে একসঙ্গে পলায়ন করিবার প্রস্তাব যুবকের নিকট করিল। যুবক সম্মত হইল; এবং তাহার পর দুজনে পূর্ব্ব প্রেমিক-যুগলের সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিল।

ভবভূতি উক্ত ঘটনাগুলি যথাযথরূপে রক্ষা করিয়াছেন; এমন কি, এই নাটকে যে মালাগাছটী একটা বিশেষ দরকারী জিনিস, তারও খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে ছাড়েন নাই। দুই বন্ধুকে সহপাঠী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাদের বন্ধুত্ব আখ্যানের গোড়া হইতেই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ দেখাইয়াছেন। পলাতক হস্তীর পরিবর্ত্তে ভবভূতি আর এক জন্তুর অবতারণা করিয়াছেন—অর্থাৎ ব্যাঘ্র। বস্তুতঃ ভবভূতি, নায়িকার নির্দ্ধারিত স্বামীর ভগিনীকেও সখীরূপে নায়িকাকে প্রদান করিয়া আখ্যানবস্তুকে আরও জমাট করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি দুই প্রেমিক যুগলকে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত কতকগুলি বাঁধাবাধি ধরণের শাস্ত্রের যোগান দিয়াছেন। যথা:—বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকী এবং তাঁহার দুই শিষ্যা অবলোকিতা ও সৌদামিনী। বন্ধুদ্বয়ের প্রত্যেকেরই একজন প্রাণের গুপ্ত কথা বলিবার আপ্তজন আছে:—মালতীর ধাতৃকন্যা লবঙ্গিকা এবং বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকার সহচরী। নায়ক-মাধবের কলহংস নামে একজন বিশ্বস্ত পরিচারক; একজন অলঙ্কারশাস্ত্রবেত্তা বলেন, কলহংস নাটকের বিটস্বরূপ। কাপালিক অঘোরঘণ্ট এবং তাঁহার একজন শিষ্যা কপালকুণ্ডলা নাটকের আকস্মিক ঘটনাবিপর্য্যয় সাধনে সহায়তা করিয়াছে। নাট্যশালায় বিশেষতঃ স্বকপোলকল্পিত নাট্য রচনায়, মালতীমাধব নাটকে বৌদ্ধধর্ম্মের গতানুগতিক সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঘোর নিষ্ঠাবান ধর্ম্মিষ্ঠবংশ হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ ভবভূতি, একজন বৌদ্ধ তাপসীকে দূতীর ভূমিকায় বরণ করিয়াছেন। এমন লোকের বিচার সিদ্ধান্ত অবশ্য অপরিহার্য্য। নাম যাহাই হউক এই বৌদ্ধ তাপসীর অন্তরে কোন কু-ভাব আমরা দেখিতে পাই না। এই পাত্রটী নাটকের একজন প্রধান ব্যক্তি। স্বার্থসংসৃষ্ট দুই পরিবারের প্রার্থনায় রাজাকে অসন্তুষ্ট না করিয়া ইনিই প্রেমিকদিগের বিবাহ সংঘটনার্থ বিবিধ উপায়ের যোজনা করিয়াছেন। রাজার ইচ্ছা, তাঁহার পূর্ব্বসখা মদয়ন্তিকার ভ্রাতা নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ হয়। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজিকারই এক শিষ্যা অবলোকিতা একটা চাল চালিয়াছিলেন। এবং যখন মালতীর প্রাণরক্ষার কোন আশা ছিল না তখন সৌদামিনী তাহাকে রক্ষা করেন। স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণ্য-পক্ষপাতী ও পাষণ্ডদিগের বৈরী চারিত্রিক উপন্যাস "দশকুমার ও" ধর্ম্মরক্ষিতাকে দিয়া (শাক্য-ভিক্ষুকী) বারবনিতা কামমঞ্জরীর

দূতীর কাজ করাইয়াছেন। (পৃ ৫৮,২) ; রূপসী ললনা রত্নাবলী স্বীয় পতির অবজ্ঞার শাস্তি দিবার জন্য আর এক ভিক্ষুকী নিযুক্ত করেন (VI) ; নিতম্ববতীর মন হরণ করিবার জন্য একজন শূদ্র আরও এক ভিক্ষুকীকে এই কাজে লাগাইয়াছে দেখা যায়। Wilson কৃত অনুবাদে, নাট্যগত বিষয়টার নিম্নলিখিত নাম দেওয়া হইয়াছে—a stolen marriage অর্থাৎ গুপ্ত বিবাহ—ইহাতে দশ অঙ্ক নাই। স্বীয় নাটককে দশ অঙ্কে বিভক্ত করিবার মানসে ভবভূতি কতকগুলা অতিরিক্ত ঘটনা একত্র জমা করিয়াছেন, মূল বিষয়টাও প্রচলিত আখ্যানাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কটা প্রায় সমস্তই ঘটনা-বিবৃতি মাত্র। এই অঙ্কে কামন্দকী আপন মৎলব আঁটিতেছেন এবং এই মৎলব তাঁহার সহপাঠীদিগকে বলিতেছেন। মালতী কর্তৃক চিত্রিত এক চিত্রপট লইয়া কলহংস প্রবেশ করে, কলহংসের প্রণয়িনীর ও মালতীর সহচরী মন্দারিকা উহা গ্রহণ করে এবং দৈবক্রমে উহা মাধবের হাতে আসিয়া পড়ে। মাধবও মালতীর একটা ছবি আঁকিয়া তাহার নীচে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া একটা শ্লোক রচনা করিয়া দেয়। মন্দারিকা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া ঐ চিত্রখানি লইয়া গেল। দ্বিতীয় অঙ্কে বৌদ্ধ ভিক্ষুকী মালতীর বিবাহের বন্দোবস্ত করে। তৃতীয় অঙ্কে প্রেমিকগণ শিবের মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে। একটা বাঘ পলায়ন করিয়া মদয়ন্তিকাকে আক্রমণ করে ও গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। মকরন্দ নিজ প্রাণকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নন্দনের ভগিনীকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু হঠাৎ (চতুর্থ অঙ্ক) রাজা তাঁহার নর্ম্মসখার সহিত মালতীর বিবাহ শীঘ্র সুসম্পন্ন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মাধব হতাশ হইয়া, কামন্দকীর কার্য্য-কৌশলের উপর আর বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, ভূত প্রেতদিগের নিকট সাহায্য গ্রহণার্থ, তাহাদিগকে মহামাংস দিবার জন্য মহা শ্মশানে গেলেন। রাত্রে সেখানে উপনীত (পঞ্চম অঙ্ক) হইয়া প্রেতগণকে আহ্বান করিলেন, তাহাদের চীৎকার কোলাহল শুনিতে পাইলেন, তার পর পার্শ্ববর্ত্তী মন্দির হইতে বিলাপ ক্রন্দন শুনিয়া, তাড়াতাড়ি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ; এবং সেখানে ভীষণ করালা দেবীর পুরোহিত অঘোরঘণ্টকে দেখিতে পাইলেন। অঘোরঘণ্ট মন্ত্রতন্ত্র প্রভাবে মালতীকে হরণ করিয়া আনিয়া কপালকুণ্ডলার সাহায্যে তাহাকে বলি দিবার আয়োজন করিয়াছেন। মাধব পুরোহিতকে বধ করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে উদ্ধার করিলেন। পুরোহিতের সহকারিণী, গুরু হত্যার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া শপথ করিল (৬ অঙ্ক)। তরুণীদ্বয় মন্দিরে উপনীত হইল, যুবকদ্বয়কে কামন্দকী পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মকরন্দ মালতীর বিবাহ-পরিচ্ছদ পরিধান করিল ; এবং মালতী মাধবের সহিত পলায়ন করিল। ইত্যবসরে কন্যার সাজে সজ্জিত মকরন্দকে কন্যার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নন্দন (৭ অঙ্ক) জ্বলন্ত-বাসনা-ভরে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। ছদ্মবেশী মালতী রূঢ়ভাবে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। উহাকে প্রশমিত করিবার জন্য নন্দন মদয়ন্তিকাকে পাঠাইয়া দিল। প্রণয়ীদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল ও তাহারা একসঙ্গে পলায়ন করিল।

সৈনিকেরা উহাদের অনুসরণ করিল (৮ অঙ্ক) ; মকরন্দ খুব সাহসের সহিত উহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিল ; মাধব সখার বিপদ দেখিয়া, তাহার সাহায্যার্থে দৌড়িয়া আসিল। মালতী একলা রহিল। কপালকুণ্ডলা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। মাধব মালতী অন্তর্ধানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল (৯ অঙ্ক); মাধব পাগলের মত হইয়া পর্ব্বতে, অরণ্যে, বন্ধুর সহিত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং তাহার প্রণয়িনীকে আনিয়া দিবার জন্য প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে, কামন্দকীর শিষ্যা সৌদামিনী আসিয়া তাহাকে জানাইলেন যে মালতী জীবিতা এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ, তাহার পূর্ব্বেকার স্বহস্ত-রচিত মালাগাছি তাহাকে দিলেন। কামন্দকী, মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা তাহাদের আন্তরিক দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে (১০ অঙ্ক) এমন সময় হঠাৎ মাধব মালতীকে আবার লইয়া আসিল। রাজা তাহাদের বিবাহ দিয়া দিলেন এবং মদয়ন্তিকাকে মকরন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আখ্যান বস্তুতে ভবভূতির যাহা নূতন যোজনা তাহা এই :—মাধবের উন্মাদ (৯ অঙ্ক) এবং ভূতপ্রেতদিগকে আহ্বান করা (৫ অঙ্ক)। নবম অঙ্কের আদর্শ-বস্তু নির্দ্দেশ করা নিষ্প্রয়োজন ; উহাতে ভবভূতি বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কের সহিত পাল্লা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীর ঐ অংশ যেমন একদিকে, লালিত্য ও মনোহারিতায় ভবভূতির রচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তেমনি আবার ভবভূতির ঐ অংশের রচনায় উজ্জ্বল বর্ণ-বিন্যাসের শক্তি ও কারুণ্য-রসের তীব্রত প্রকাশ পায়। পঞ্চম অঙ্কে সম্ভবতঃ আর কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কবির অনুকরণ করা হইয়াছে ; ঐরূপ ঘটনাসংস্থান প্রচলিত আখ্যানাদিতে প্রায়ই দেখা যায়। যথা : —বৃহৎকথায় (১৮ তরঙ্গ) এক বৌদ্ধ ভিক্ষু এক ঘুমন্ত রাজকুমারীকে হরণ করিয়া মহাশ্মশানে লইয়া যায় এবং সেখানে তাহাকে বলি দিতে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণ বিদূষক তাহার বিলাপ-ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই হতভাগা ভিক্ষুকে বধ করে ; আরও পরে, (১২১ তরঙ্গ) এক কাপালিক স্বীয় মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে, রূপসী মদনমঞ্জরীকে বলিদানের জন্য মহাশ্মশানে আনয়ন করে। অন্যত্র (২৫ তরঙ্গ) যাহাতে মন্ত্রতন্ত্রের যোগাযোগ দরকার এরূপ একটা ভীষণ দুঃসাহসিক সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অশোকদত্ত মহাশ্মশানে গিয়া রাক্ষসদিগের নিকট টাটকা মহামাংস বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল ; দাগিনেয়ও ঐরূপ করিয়াছিল (১২১ তরঙ্গ)। ইহারই অনুরূপ গল্প দশকুমারেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—মন্ত্রগুপ্ত রাজকুমারী কনক লেখার প্রাণরক্ষা করে। বলি দিবার জন্য এক ঐন্দ্রজালিক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে আখ্যান বস্তুর রচনায় কবির কৃতিত্ব খুবই কম। তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলিতে, না আছে ব্যক্তি-বিশিষ্টতা, না আছে মৌলিকতা, না আছে দৃষ্টি-আকর্ষক অনন্য-সাধারণতা—ইহার কিছুই নাই। পাত্রদিগের জীবনে, অনুরাগের ভাব (sentiment) ছাড়া আর

কিছুই নাই। মনে হয়, প্রেমিকগুলি, এবং তাহাদের সহায় ও তাহাদের বৈরিগণ, একটা জড়ভাবাপন্ন নিদ্রামগ্ন নগরীতে বিচরণ করিতেছে, বহির্জগতের সহিত তাহাদের যেন কোন সম্বন্ধ নাই। উহারা তাহাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ, মানব-সমাজ হইতে যেন একেবারেই বিচ্ছিন্ন। নাটকের অবান্তর ভূমিকাগুলি, যাহা মৃচ্ছকটিকার দিক্-মণ্ডলকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, সেই পথ-চলা পথিকের ন্যায় ক্ষণিক পাত্রগুলি যাহা দর্শকের অজ্ঞাতসারে নাটকের মধ্যে যাতায়াত করে, এবং ঘটনার গ্রন্থিবন্ধনে ও গ্রন্থিমোচনে অলক্ষিতে সহায়তা করে, এবং নায়ক নায়িকার জীবনকে জনমণ্ডলীর সমগ্র জীবনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, তাহা মালতী মাধবে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমের ঘটনাবিপর্য্যয়ে নায়কগণ যে-বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয় সেই সব অবস্থাতেই ভবভূতি স্বকীয় কবিত্বের শক্তিসম্বল দেখাইবার উপলক্ষ্য অন্বেষণ করেন। এই দৃষ্টিভূমি হইতে দেখিতে গেলে, শ্রীকণ্ঠ উপাধিধারী নাটকগুলি নিশ্চয়ই ওস্তাদি হাতের উৎকৃষ্ট রচনা। তাঁহার ন্যায় আর কেহই অত পূর্ণ মাত্রায় অফুরন্ত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের অধিকারী হইতে পারে নাই। ওরূপ জটিল ছন্দসমূহকে অমন অক্লেশে আর কেহ আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। চিত্তের প্রচণ্ড আবেগ, বিশ্বপ্রকৃতির মহান দৃশ্যসমূহ, তীব্র ও ভীষণ মনোগত সংস্কার—এই সমস্তের চিত্রকর বা ব্যাখ্যাতা ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ভারতীয় সমালোচকেরা ভবভূতি ও কালিদাসের কাব্য রচনার ধরণটা খুব ঠিক্ বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস ভাবের সূচনামাত্র করেন, ভবভূতি ভাবের ব্যাখ্যা করেন। অপ্রচলিত ও ঝঙ্কারকারী শব্দের প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক অভিরুচি আছে, তাহার সহিত গম্ভীর পাণ্ডিত্য সংযোজিত হওয়ায় তিনি অনেক সময় দুর্ব্বোধ শব্দ প্রয়োগ অথবা অপ্রচলিত আর্ষ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। খুব বিরাট গম্ভীর ভাব প্রকাশের চেষ্টায়, তিনি দীর্ঘ সমাসবহুল শব্দ-ঝঙ্কারী বাক্য প্রয়োগের অপব্যবহার করিয়াছেন। শূদ্রকের ন্যায় না আছে তাঁর রসিকতার জ্বলন্ত স্ফূর্ত্তি, কালিদাসের ন্যায় না আছে তাঁর সুকুমার কল্পনা; কিন্তু লেখক-সুলভ, চিত্রকরসুলভ ও কবিসুলভ তাঁহার যে সকল মৌলিক গুণ আছে, তাহাতে করিয়া তিনি নাট্য-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিমানী

সন্ধ্যায় ফুটি জীবনানন্দে বিন্দু বিন্দু ঝরিতে;
ঝলকিয়ে চাই প্রভাত-বেলায়, আলোক-মেলায় মরিতে

অভাগীর স্বর্গ

(১)

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষিয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধূম-ধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দূর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার,—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটী প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর-মা। সে তাহার কুটীর প্রাঙ্গণের গোটা কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার বেগুন আঁচলে বাঁধা,—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান, সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুক্‌রা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর-মা ছোট জাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে, চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো,—আমাকেও আশীর্ব্বাদ করে যাও আমিও যেন এম্‌নি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস দাসী পরিজন,—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ,—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে

লাগিল,—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্জ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর-মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে,—মুখ তাহার চিনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিদুরের রেখা, পদতল দুটি আল্‌তায় রঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান্ দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধ্‌বিনে ?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধ্‌বো'খন রে। হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, ছাখ্ কাঙালী, ছাখ্ ছাখ্ বাবা,—বামুন মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে !

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই ? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেচিস্। ও ত ধুঁয়া ! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপর বাজে আমার ক্ষিদে পায়না বুঝি ? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা ?

কাঙালীর-মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে,—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয় !

হাঁঃ-ধোঁ লেগেছে বই ত না ! তুই কাঁদ্‌তেছিলি !

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল,—শ্মশান সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

(২)

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলাকেই যেন আমরণ ভ্যাঙ্‌চাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর-মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর-মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলিনে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি। কই, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করেনা, কিন্তু, শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই——

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাক্‌রুণ রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখ্‌নু কাঙালী, বামুন-মা রথের ওপরে বসে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখ্‌লে রে!

সবাই দেখ্‌লে?

সব্বাই দেখ্‌লে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা'হলে তুই ও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বল্‌তেছিল, ক্যাঙ্‌লার মা'র মত সতী লক্ষ্মী আর দুলে পাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোক ত নিকে কর্‌তে সাধাসাধি কর্‌লে। কিন্তু, তুই বল্‌লি, না। বল্‌লি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচ্‌বে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের

জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করূলে আমি কোথায় থাকৃতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ, সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল না, তখন উৎপাত, উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটী পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটোত তা'হলে দেবে না মা।

না দিগ্‌গে,—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা'হলে। রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া——

অভাগী রাজপুত্র, কোটাল পুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটাল পুত্র,—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়,—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্ত স্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই বিচ্ছেদ নাই,—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে, সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিলনা, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশান যাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশ জোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালী চরণ, বাবা আমার!

কেন মা ?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মত আমিও অমনি সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বল্‌তে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোট জাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবেনা,—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবেনা। ইস্‌! ছেলের হাতের আগুন,—রথকে যে আস্‌তেই হবে!

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্‌নে মা, বলিস্‌নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্‌ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আন্‌বি, অমনি যেন পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে আমায় বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আল্‌তা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে ক্যাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

(৩)

অভাগীর জীবন নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশী নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেম্‌নি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদা-কাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটাচারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু, আদার সত্ব, তুলসী পাতার রস,—কাঙালীর-মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্‌ ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোব্‌রেজের বড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওযুধে কাজ হবে? আমি এম্‌নি ভাল হব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলিনে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না,—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছলছল্ করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা রাখিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর-মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে,—ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে——

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী বলিল, সে আস্‌বে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বল্‌বি মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধূলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্, বাবা, বলিস্ মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফের্‌বার পথে অম্‌নি নাপ্‌তে বউদি'র কাছ থেকে একটু আল্‌তা চেয়ে আনিস্ ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে, যে সে সেইখান হইতেই কাঁপিতে কাঁপিতে যাত্রা করিল।

(৪)

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে,—পায়ের ধূলো নেবে যে।

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিলনা, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যু-পথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধূলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা,—ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানিনা, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিলনা। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিম্বা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়,—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটীর প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এযে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ান জী! বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিলনা যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত মুখ নাড়িয়া জানাইল এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবেনা।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন ; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারেনা। হায়রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কেরে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল,—আমার মা মরেচে—বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা এই কান্না কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে। কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস করনা বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সকলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার অণুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্‌গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে গিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্‌গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়,—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠোনের গাছ বাবু মশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ!

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকুরি তাঁহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখত হেঁ, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়,—হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে বাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন,—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিনীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল ঠাকুর মশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা' দিগে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়—এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আব্দার। আমারই কত কাঠের দরকার,—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না,—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা', মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্‌চেন, ভট্‌চায মশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন—কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙ্গালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত,—শুধু সেই র আটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শক্তি পূজার ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রামায়ণে দুর্গার কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখা যায় কতকগুলি রাক্ষসীরূপিনী মাতৃকা স্কন্দের অনুচরী ছিলেন। ঐ মাতৃকা কথাটার অন্য রকম অর্থের সুবিধায় ও শিশু স্কন্দকে মাতৃকাগণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মাতৃকা স্কন্দমাতা হইয়া উঠিলেন এবং যখন স্কন্দ শিবপুত্র হইলেন, তখন মাতৃকা অম্বিকা নামের সাদৃশ্যে ও সমার্থে শিবপত্নী হইয়া পড়িলেন। এই মহাভারতের মধ্যে প্রথম দুর্গাকে স্বতন্ত্র প্রধান দেবীরূপে স্তুত ও পূজ্য হইতে দেখি। ইহার কারণ সমগ্র মহাভারত এক সময়ের বা একজনের রচনা নহে। মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তুতি করিয়াছেন (বিরাট পর্ব্ব, ৬ অধ্যায়), অর্জ্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছেন (সৌপ্তিক, ৬ ও ৭ অধ্যায়); ভীষ্মপর্ব্বে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধজয়ের কামনায় দুর্গাকে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সব স্তোত্রে দুর্গার বহু নাম উল্লেখ করা হইয়াছে—দুর্গা, উমা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, চণ্ডী, চণ্ডা, বিজয়া, কালী, করালী ইত্যাদি। তিনি অসুরনাশিনী বিন্ধ্যবাসিনী, মদ্যমাংসপ্রিয় (সীধুমাংসপশুপ্রিয়)। এই বিন্ধ্যবাসিনী নাম হইতে অনুমান হয় পার্ব্বত্য হিমালয় ও বিন্ধ্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে একত্র সম্মিলিত করিয়া হৈমবতী পার্ব্বতী ও বিন্ধ্যবাসিনী পার্ব্বতী একই দেবতার নাম করা হইয়াছিল। বহু দেবতা একই এবং একই দেবতা বহুরূপে প্রকাশ হন এই দার্শনিক মত হইতে অবতার ও বহুমূর্ত্তির সৃষ্টি।

মহাভারতে যে দুর্গার উল্লেখ আছে তিনি চতুর্ভুজা ও কৃষ্ণবর্ণা। কিন্তু তিনি ঠিক কালীও নহেন, কারণ তিনি চতুর্বক্ত্রা। তিনি হিমালয় দুহিতা বা শিবপত্নীও নহেন,—তিনি কুমারী।

মহাভারতের এই দুর্গাস্তোত্র পরবর্ত্তীকালের যোজনা বলিয়াই অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। মহাভারতে শক্তি পূজার উল্লেখ ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্যে শক্তি মূর্ত্তির কোনো প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

কনৌজপতি যশোবর্ম্মার সভাকবি ধোয়ি গৌড়বহ (গৌরবধ) কাব্য রচনা করেন (৭ম শতাব্দী)। সেই কাব্যে হলুদের পাতা মাত্র পরিহিতা অনার্য্য শবরদের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজার উল্লেখ আছে। বহু প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্যের কদম্ব ও চালুক্য বংশের কুল দেবতা ছিলেন সপ্তমমাতৃকা। পঞ্চম শতাব্দীতে মালবদেশে মাতৃকা দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মহাভারতের বিরাট পর্ব্বের দুর্গাস্তবে তাঁকে বলা হইয়াছে "নন্দগোপকুলে জাতা।" এ পর্য্যন্ত তিনি কুমারী, শিবের পত্নী নহেন। সম্বলপুর জিলার অনার্য্য লোকেরা এখনও কুমারীওসা নামক এক দেবীর পূজা করে এবং তাদের প্রবাদ—

আশ্বিনে কুমারী জনম
গোপিনীকুলে পূজন।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের দিকে গোপ আভীর জাতির বাস ছিল। দুর্গা তাদেরই কুলদেবতা ছিলেন বোধ হয়।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে দুর্গা শবর পুলিন্দ বর্ব্বরদিগের দেবতা, তিনি মদ্যমাংসপ্রিয়। শবরৈর্ বর্ব্বরৈশ্ চৈব পুলিন্দৈশ্ চ সুপূজিতা। বৈদিক প্রাকৃতিক-শক্তি-বোধক দেবতারা অনার্য্য দেবদেবীর সঙ্গে মৈত্রী করিয়া ক্রমে ব্যক্তি ও গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন; কারণ সাধারণ লোকেদের ভক্তিপাত্রস্থল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক, সেই পূজনীয় দেবতাদের অনুভবে ধারণা করিবার জন্য তাঁদের পূজকের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতে হইয়াছিল; মানুষের গুণদোষ তাঁহাদিগের উপর আরোপিত হইতে লাগিল; তাঁরা এখন মানুষের ন্যায় সুখে দুঃখে বিচলিত হন; কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশবর্ত্তী। বৈদিক সময়ে শাস্ত্র কথার প্রবক্তা ছিলেন—গায়ত্রী সাবিত্রী; এখন আগম প্রচারের ভার লইলেন হরগৌরী।

এই বৈদিক দেবভাবের সঙ্গে অনার্য্য দেবকল্পনার অনিবার্য্য মিলনের সময় বৈদিক আর্য্য প্রাধান্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ্য চেষ্টার ফল পুরাণ রচনা। পুরাণগুলির মধ্যেও দেবতাদের ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং তাঁদের বংশ পরিচয়ও পাওয়া যায়; পুরাণগুলি এই গোঁজামিল দিয়া সমন্বয় ও রফা করিবার ব্যাকুল চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া পুরাণে পুরাণে পরস্পর-বিরোধিতা এবং একই পুরাণে পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। পুরাণের মধ্যে বায়ু মৎস্য ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু ভাগবত গরুড় খুব সম্ভব যথাক্রমে ৩য়—৪র্থ শতাব্দীতে হইয়াছিল; অন্যান্য পুরাণগুলি ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর রচনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে উমা-পূজার ব্যবস্থা আছে; ব্রজ কুমারীরা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য পুরাণে ত শক্তি প্রাধান্য সুস্পষ্ট। দুর্গা পূজার ব্যবস্থা বহুদেশের বহুসংগ্রহকার লিখিয়া গিয়াছেন—শ্রীদত্ত, হরিনাথ, বিদ্যাধর, রত্নাকর, ভোজদেব, জীমূতবাহন, হলায়ুধ, রায়মুকুট, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি।

পুরাণগুলির মধ্যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারে আমরা এই পরিচয় পাই যে বৈদিক যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ঋষি দক্ষ পার্ব্বতী ও শিবকে প্রথমে দেবতা বা আহ্বানযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। মহাভারত হইতে সকল পুরাণে শিবপার্ব্বতীকে উপেক্ষা করার এই কাহিনী নানা ভাবে বর্ণিত আছে। সেই যজ্ঞের অপমানিতা দক্ষদুহিতা সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু শিবের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইবার জন্য তাঁকে দুষ্কর তপস্যা করিয়া উমা ও অপর্ণা হইতে হইয়াছিল। শিব যখন অবশেষে তাঁকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন, তখনও সকল বিরোধ মিটিল না; শিবকে অর্দ্ধনারীশ্বর হইতে হইল, অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণা কালীকে আর্য্যোচিত গৌরী হইবার জন্য

আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইল (মৎস্য ও কালিকা পুরাণ)। হৈমবতী-পার্ব্বতীকে পিত্রালয় হিমালয় বা স্বামীগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া অনার্য্য দেশের সীমান্ত বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে হইল; এই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের দ্বারা, নতুবা অসুরগণ যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বৈদিক দেবরাজের স্বর্গরাজ্য অপহরণ করিতে চায়। যখন যখন অসুরেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন তখনই হয় দুর্গা, নয় শিব, নয় তাঁদের পুত্র কার্ত্তিকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে, ইন্দ্র সূর্য্য যম প্রভৃতি যে সমস্ত বৈদিক দেবতা পরবর্ত্তী কালেও নামে মাত্র টিঁকিয়া ছিলেন তাঁদের সাধ্যে কুলায় নাই।

শিবদুর্গা যে স্ত্রীপ্রধান গৃহস্থালির আদর্শ হইতে আর্য্য ভিন্ন অপর নানা জাতির দেবকল্পনার সংমিশ্রণে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন তার অনেক নিদর্শন শাস্ত্রে ও ইতিহাসে ও অনুমানে দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃদেবতার প্রাধান্য মধ্যধরণীসাগরের উপকূল হইতে মঙ্গোলিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। রোমানদের এক দেবী ছিলেন অন্নপরেন্না; তিনি অন্নাধিষ্ঠাত্রী; তাঁর পূজা হইত বসন্তকালে ১৫ই মার্চ্চ। ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশেও অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা বহু পরবর্ত্তী কালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সুদূর অতীতে রোমানদিগকে দেবীর যে মহিমা ঐরূপ কল্পনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বাঙ্গালীকেও স্বতন্ত্রভাবে সেই মহিমা আকৃষ্ট করিয়াছিল। ক্রীট দ্বীপে পর্ব্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবী পূজিত হইতেন। রোমানদের ব্যাকাস ও মিনার্ভা দেবীর উপাখ্যান ও পূজাপদ্ধতি এমন অবিকল যে হঠাৎ মনে হয় যে ঐ দুই দেব-দম্পতি এক অভিন্ন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ডবলিউ ওয়ার্ড সাহেব ১৮১৮ সালেরও পূর্ব্বে A view of the History Literature and Mythology of the Hindus, Including a Minute Description of their Manners and Customs—নামক অতি আশ্চর্য্য তথ্যপূর্ণ বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলন করেন; তাতে তিনি শিবদুর্গা ও ব্যাকাস-মিনার্ভাকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে The object of worship is the same throughout India, Tartary, China, Japan, Burma etc. as also among the Assyrians, Chaldeans, the Magians of Persia etc..

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনুমান করেন এই শক্তিপূজার কল্পনাটা আমাদের দেশে শক ও মোঙ্গল প্রভৃতি বহির্ভারতের জাতিদের আগমনের দ্বারাই বদ্ধমূল হয়। পারস্য দেশে ম্যাগিয়ানরা শক্তি উপাসক ছিল; তাদের বিরোধী ছিলেন জরথুস্ত্র। মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের সময় উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া পুরোহিতেরা স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। জরথুস্ত্র-শিষ্যেরা জলপথে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ করেন, তাঁরাই আধুনিক পার্সী; আর শাকদ্বীপী মগ পুরোহিতেরা

জলপথে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও আসামের পথে ভারতে প্রবেশ করেন ; এবং পথ হইতে মোঙ্গল ভাবও খানিকটা সঙ্গে করিয়া আনেন। তাঁরা ভারতের আর্য্যভূমির চৌহদ্দি বেড়িয়া পাঁচটী আস্তানা গাড়েন—জলন্ধর (পাঞ্জাব) ওড়িয়ান (পুরী) কামাখ্যা, পুনা, শ্রীশৈল কেহ বলেন (কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে বেলারী জেলায়) কেহ বলেন, মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশ, পাল্‌নি হিল্‌স্‌ নামে অধুনা পরিচিত ; আবার কেহ বলেন নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত। এক তন্ত্রে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। শিব দুর্গাকে বলিতেছেন,—গচ্ছ ত্বং ভারতবর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন,—Through Kamarupa successive hordes of immigrants from Western China poured into India. From them developed Tantricism of both Buddhism and Hinduism.

এই সব অনুমানের সমর্থন পুরাণ ও তন্ত্র হইতে এবং তাৎকালিক অপর সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। শিবের উৎপত্তির পর তাঁর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল কৈলাসে, ভারতের সেই দিকে যে দিক হইতে আসে শক হূন ও কিরাত ; তার পরে তিনি বিবাহ করিলেন হিমালয়ে, যে দিকে মোঙ্গল জাতির বাস ; এবং তার পরে দুর্গার লীলাক্ষেত্র হইল বিন্ধ্যপর্ব্বতে যে দিকে ভিল, শবর পুলিন্দ জাতিদের প্রাধান্য। বহু পুরাণে দেখা যায় যে শিবপার্ব্বতী কিরাত-বেশে কৈলাসে হিমালয়ে এবং ভিন্ন বেশে বিন্ধ্যপর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া সেই সেই জাতিদের তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্যে বা শিলালিপিতে দুর্গা বা চণ্ডীর প্রাধান্য দেখা যায় না। চণ্ডীকে শবর কিরাতাদি অনার্য্যের দেবতা সুতরাং হীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মালতীমাধব বাসবদত্তা, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিতে, দেখিতে পাই যে চণ্ডী ভূতপ্রেত ও তন্ত্রমন্ত্র তখন অনার্য্য বলিয়া ঘৃণিত ছিল। ভবভূতির সমসাময়িক বাক্‌পতি তাঁর রচিত প্রাকৃত গউরবহো কাব্যে চণ্ডীকে শবরী বলিয়াছেন এবং তাঁর পূজা করিত শবরী ও কোলী স্ত্রীলোকেরা। বরাহপুরাণে চণ্ডীর এক নাম কিরাতিণী। হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণি—পরিশিষ্টে চণ্ডীর এক নাম দিয়াছেন কিরাতী। শরৎকালের চণ্ডীপূজার উৎসবকে শবরোৎসব বলে ; কালিকা পুরাণের ব্যবস্থা যে দেবীর বিসর্জ্জনের সময় শাবরোৎসব 'অবশ্যকর্ত্তব্য'। এই শবরোৎসবে অশ্লীল নৃত্যগীত অনুষ্ঠেয় এবং এখনও বিসর্জ্জনের সময় ঢুলিরা মাতৃবোধে পূজিতা দেবী সম্বন্ধে অকথ্য অশ্লীল নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যায় এবং ভদ্রলোকেরাও তাহা সহ্য করেন। মেরুতন্ত্রে পঞ্চবিধ দেবী সাধনার মধ্যে অন্যতম শাবর সাধনা। বৃহৎ কথায় (৭ম শতাব্দী) বিন্ধ্যবাসিনী পূজার কথা আছে।

দশমহাবিদ্যার অনেক মূর্ত্তি পরে শাক্তসম্প্রদায়ে গৃহীত। অনেক মূর্ত্তির বর্ণনা ও রূপ নিতান্ত অনার্য্য। একদিকে যেমন প্রথমে কুমারী ছিলেন, অপর দিকে ধূমাবতী আসিলেন বিধবা !

মালব দেশের অনার্য্যদিগের মধ্যে বহুমাতৃকার পূজা প্রচলিত ছিল। এই সব মাতৃকা ক্রমে

শিবদুর্গার সহচরী বা দুর্গারই রূপান্তর বলিয়া ভদ্রসমাজে চল হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যোত্তরীয়ে আছে—"এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ।" (শারদীয় দুর্গাপূজার ব্যবহার তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত)

এখনো অনেক জেলার অনেক গ্রামে রীতি আছে যে দুর্গার প্রথমে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাতির বিশেষতঃ হাড়ির বাড়ীতে না হইলে ব্রাহ্মণবাড়ীতে পূজা হইতে পারে না। জয়দ্রথ—যামল বলেন দেবী তৈলকার দ্বারা পূজায় বিশেষ প্রীত হন। (হরপ্রসাদ) দাক্ষিণাত্যের গ্রামদেবতাদের পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নয়, যত সব অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাত।

নিম্নশ্রেণীর দেবস্বরূপ যে উচ্চ কল্পনায় আরোপিত হইয়া উচ্চ পদবী লাভ করে তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কট, বিঠ্ঠল, দেবী পিষ্ঠপুরী নিম্নশ্রেণী হইতে উত্থিত হইয়া এখন সর্ব্বজনপূজিত হইয়াছেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ বলেন—The Tamils were demon-worshippers. The most powerful demoness of the Southern races; Koltavai "the Victorian" has now taken her place in the Hindu pantheon as Uma or Durga, the consort of Siva.

অক্ষয়কুমার দত্ত দেখাইয়াছেন বিঠোবা বিঠ্ঠল রঙ্গনাথ মীনাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবী অনার্য্য হইতে আর্য্য-স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার দেখাইয়াছেন সামলাই নামক গোঁড় দেবতা শেষকালে সামলেশ্বরী কালী হইয়াছেন, গোঁড়দিগের গোঁড় বাবা গোঁড়েশ্বর শিব বলিয়া পূজিত হইতেছেন (বঙ্গদর্শন ২য় বর্ষ চৈত্র সংখ্যা, শিবপূজা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

কিরাত প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি মৃগয়াজীবী তাদের দেবস্বরূপ যেমন শিব-দুর্গার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, আবার আভীর প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি কৃষিজীবী তাদেরও দেবতা ঐ শিব-দুর্গার মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। যে শক্তিতে শস্য উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিতেই জীব সৃষ্টি হয়, এই সমতাবোধ শিব-দুর্গারূপ দেবদম্পতির মধ্যে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। দেবী দুর্গার অপর নাম সেইজন্য শাকম্ভরী—যে দেবী শাক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জকে ভরণ করেন। কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে শাকম্ভরী আদিতে শকদিগের দেবতা ছিলেন। সে যাই হোক্, বৎসরের যে দুই ঋতুতে ফসল উৎপন্ন হয় সেই দুই ঋতুতেই—শরৎ ও বসন্তে দেবী দুর্গার পূজার উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুর্গাপূজায় কলাবৌ নব পত্রিকার পূজা করিতে হয়; ঐ নব পত্রিকা কৃষিসম্পদের প্রতীক বা Symbol (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নব পত্রিকা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, নারায়ণ ১৩২৪)। এইজন্য নব পত্রিকার আর একটা নাম নবদুর্গা। এই নব-পত্রিকার মধ্যে ফল, ফুল, মূল শস্য সমস্তই পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

রম্ভা কচ্বী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোকমানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা ॥

তন্ত্রশাস্ত্রের অপর নাম কৌলশাস্ত্র; একখানি তন্ত্রের নাম কুলচূড়ামণি তন্ত্র। ঐ তন্ত্রের আদেশ, প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমেই কুলবৃক্ষকে নমস্কার করিবে—ওঁ কুলবৃক্ষেভ্যঃ নমঃ; এবং কুলবৃক্ষ দেখিলেই শক্তিপূজক সেই বৃক্ষকে শক্তির আধার জানিয়া নমস্কার করিবে। শাক্তানন্দ তরঙ্গিনীর মতে কুলগাছ বলিতে বুঝায় অনেকগুলি গাছ—অশোক, কেশর, বকুল, বিল্ব, কর্ণিকার, চূত, নমেরু (রুদ্রাক্ষ), পিয়াল, সিন্ধুবার (নিশুন্দ), মদম্ব, মরুবক (ঝিণ্টিকা), চম্পক, শ্লেষ্মাতক (বহেড়া), কঞ্জু, নিম্ব, অশ্বথ। তন্ত্রসার মতে অপর কয়েকটি গাছও 'কুল' সাধারণ নামের অন্তর্গত—বট, উদম্বুর, ধাত্রী (আমলক), চিঞ্চা (তিন্তিরী)। এইসব বৃক্ষে কুলযোগিনীরা সর্ব্বদা বাস করেন। কুলযোগিনী উদ্ভিদ-দেবতা বা বৃক্ষাশ্রয়ী ভূতপেত্নী ছিলেন বোধ হয়, পরে দেবী শাকম্ভরীর অনুচর মধ্যে পরিগণিত হন। কুল মানে বংশও হয়; অনেক জাতির বংশ চিহ্ন (totem) থাকে গাছ; এই বৃক্ষপূজা সেই বংশ চিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদিম রীতির জের হইতেও পারে।

পুরাণগুলি যখন রচিত হইতেছিল উত্তর ভারতে বা দাক্ষিণাত্যে, তখন ভারতের পূর্ব্ব কোণে বঙ্গদেশে (এখন পূর্ব্ববঙ্গ বলিতে যে দেশকে বুঝায় সেখানে) শিব শক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য যে শাস্ত্র রচিত হয় তার নাম তন্ত্রশাস্ত্র। এই দেশে মোঙ্গল দ্রবিড়, কোল, সংমিশ্রণ অধিক ঘটিয়াছিল বলিয়া মাতৃদেবতার প্রাধান্য এই দেশেই অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়; এমন কি বৌদ্ধরা পর্য্যন্ত তাদের তন্ত্রে বহু শক্তির পূজা প্রবর্ত্তন করে এবং ধর্ম্মমূর্ত্তিকে স্ত্রীরূপিনী করিয়া তোলে। অন্ততঃ কতকগুলি তন্ত্র যে বঙ্গদেশের রচিত তার বহু প্রমাণ আছে; তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে তান্ত্রিকদের বিশ্বাস এই—

গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে, গুর্জ্জরে প্রলয়ংগতা ॥

তন্ত্রে বর্ণানুক্রমিক স্তোত্র রচনায় মাত্র একটি 'ব' ব্যবহৃত দেখা যায়; ক অক্ষরকে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাঙলা অক্ষর এবং উচ্চারণ সূত্র করা হইয়াছে যে, হকার যদি যকারের পূর্ব্বে থাকে তবে তাদের যুক্ত উচ্চারণ ঝকার হইবে, এবং য পদের প্রথমে থাকিলে জকারের ন্যায় উচ্চারিত হইবে বলা হইয়াছে (ববদাতন্ত্র, দশম পটল)। এইসব উচ্চারণ বাংলা দেশের বিশেষত্ব।

এইরূপ নানা প্রমাণ দেখিয়া উইলসন সাহেব বলিয়াছেন—Assam or at least North-east Bengal seems to have been the source from which the তান্ত্রিক and শাক্ত corruptions of the Religion of the Vedas and Puranas proceeded.

ইহা বাঙালীর race-cultureএর ফল। যোগশাস্ত্র প্রচারের সঙ্গে তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র রচিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও যোগমত নিশ্চয় প্রচলিত ছিল।

সুতরাং বঙ্গদেশে বহু জাতি মিশ্রণের ফল দেবতাকে একই কালে মাতৃ ও পত্নীরূপে সাধনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাণে এই ভাব অস্পষ্ট হইলেও ছিল—

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণম্ অহম্ ঈশান এব চ কারিতৌ।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

দেবী বিষ্ণুর আমার (ব্রহ্মার) ঈশানের শরীর উৎপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মাদ্যাস্ ত্বৎ সমুদ্ভবাঃ।—কাশীখণ্ড। ব্রহ্মাদি তোমা হইতেই সমুদ্ভূত। তৎপরে তন্ত্রে চক্রসাধনা স্পষ্ট আকার ধরিয়া সেই ভাবকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল এই ভাব যে বেদবিরোধী তাহা তন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে (নিত্যাতন্ত্র, প্রথম পটল)। বৌদ্ধ তন্ত্রগুলি অধিকাংশই মোঙ্গল প্রভাবের রচনা; এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাবে হিন্দু-তন্ত্র অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দু-তন্ত্রের আদর্শ লইয়াই আবার বৌদ্ধ-তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিরা বেদের দেবতার পূজা করিতেন। কিন্তু মানুষ স্থির হইয়া থাকে না। তার চিত্ত নিত্য নব নব সৃষ্টি করে। এইরূপে বেদাতিরিক্ত বহু দেবদেবীর উপাসনা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। দেশীয় লৌকিক বিশ্বাস করিয়া সেইসব দেবতাকেও শাস্ত্রস্তরে তুলিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল পুরাণ, হিন্দু-শাস্ত্র ও বৌদ্ধ-তন্ত্র।

গোড়ায় হিন্দু ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বড় বিবাদ ছিল না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে ছিল ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও শূদ্রের ধর্ম্মচর্চ্চায় অনধিকার এই দুই কারণে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

ইহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও নিজেদের কুলরীতি পরিত্যাগ করে নাই; বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর-তত্ত্বাদির কোনো আলোচনা ছিল না, কেবল শীল ও সদাচার চর্চ্চাতেই চরিত্রের উৎকর্ষ ও তার ফলে নির্ব্বাণ লাভ হয় এই ছিল বুদ্ধদেবের উপদেশ; সুতরাং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কাহাকে বংশগত আচার ও সংস্কার ত্যাগ করিতে হয় নাই বলিয়াই বৌদ্ধদের দলপুষ্টি হইয়াছিল। নবাগত লোকেরা নিজেদের কুলদেবতা ভূতপ্রেত জীবজন্তু প্রভৃতির পূজা লইয়াই বৌদ্ধ হইতে পারিয়াছিল। মৌর্য্য গৌরবের অবসানে বৌদ্ধধর্ম্মের জ্বলন্ত ভাব যখন নিবিয়া আসিল এবং নিরীশ্বরতা ও সংসার-বৈরাগ্য কঠোর হইয়া উঠিল, তখন বুদ্ধদেবই প্রধান উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং নানা জাতির নানা কৌলিক দেবতা বুদ্ধদেবের সহচর দেবতার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। তৎপরে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ কণিষ্কের সময় বৌদ্ধ আচার্য্য অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুন মহাযান অর্থাৎ ধর্ম্মের সহজ পথ ও সাধারণের গম্য পথ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁর পরে পেশওয়ারনিবাসী অসঙ্গ নামক সন্ন্যাসী ষষ্ঠ শতাব্দীতে যোগাচার ভূমিশাস্ত্র প্রভৃতি যোগদর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়া যোগমত প্রচার করেন। নাগার্জ্জুন ও অসঙ্গ যে মহাযান মত প্রবর্ত্তন

করিলেন তাতে এক ঐতিহাসিক বুদ্ধের স্থানে বহু বুদ্ধ কল্পিত হইল ; হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির অনুকরণে জ্ঞান মঙ্গল ও শক্তির আধার বৌদ্ধ ত্রিরত্ন কল্পিত হইল—ব্রহ্মা হইলেন মঞ্জুশ্রী অথবা বাগীশ্বর, বিষ্ণু হইলেন পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর, শিব হইলেন বজ্রপাণি। তিনের অঙ্কে কি এক মোহিনী শক্তি আছে, তার আদর সর্ব্বত্রই—ত্রয়ী বিদ্যা, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিমূর্ত্তি, সবেতেই ত্রিত্ব। এই ত্রিত্ববাদের অপর ফল—বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ। দেবতা যদি আসিলেন তবে তার সঙ্গে সঙ্গে দেবশক্তিরও আমদানী হইল। এই মহাযান মত ভোট সিকিম তিব্বতে গিয়া মঙ্গোল প্রভাবে তাহা বৌদ্ধ-তন্ত্র সৃষ্টি করিল। এই মঙ্গোল-প্রভাবে ধর্ম্ম স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ; অবলোকিতেশ্বর জাপানে স্ত্রীমূর্ত্তিতে পূজা পাইতে লাগিলেন। প্রধান বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রধান দেবী তারা হিন্দুতন্ত্রে প্রবেশ করিলেন এবং যন্ত্র মন্ত্র আঁক ফোঁক তুক তাক ও নানা অসভ্য জাতির ভূতপ্রেতও উভয় তন্ত্রকে ভরিয়া তুলিয়া তান্ত্রিকদিগকে অনাবশ্যক ভয়ে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত মাধ্যমিক পন্থীদিগের বজ্রযান সম্প্রদায় নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারই অন্য শাখা মন্ত্রযান। ধারণী নামক শাস্ত্রগ্রন্থ পুরাতন হইয়া অবোধ্য হইলে এঁরা সেই অবোধ শব্দগুলিকে মন্ত্র করিয়া তাতে শক্তি আরোপ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের পরাভবের পর যখন আবার হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল তখন বৌদ্ধরা যেমন হিন্দু অহিন্দু বহু দেবদেবী আত্মসাৎ করিয়াছিল তেমনি হিন্দুরাও বহু দেবদেবী বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল—বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ হইলেন জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম ; বুদ্ধাস্থি হইল বিষ্ণুপঞ্জর ; বৌদ্ধ যন্ত্র চিহ্নগুলি হইল জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের মুখ চোখ নাক। বুদ্ধপদ হইল বিষ্ণুপদ। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে শাস্ত্রীয় করিবার জন্য যখন পৌরাণিক স্তরে বসাইয়া শিবকে সমাধিস্থ বুদ্ধতুল্য করিয়া তোলা হইল, তখন সাধারণ লোকের মন সুখ দুঃখের সমভাগী আশ্রয়দাতা ও নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবতার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় শক্তিতন্ত্র লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার খুব সহজ সুযোগ পাইয়াছিল। এই ভাবকে সাহায্য করিয়াছিল মুসলমানদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট-শক্তি, এবং সেই শক্তি তারা দেবতার দোহাই দিয়াই লোককে সমঝাইয়া দিতেছিল।

বঙ্গদেশের সংলগ্ন নেপাল সিকিম ভোট হইতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা আসিয়া বঙ্গে তান্ত্রিকতা প্রচার করেন। এই তান্ত্রিকতার স্রোত যে তিব্বত প্রভৃতি মোঙ্গল দেশ হইতে আগত তার একটী উপাখ্যান বহু তন্ত্রে আছে, যথা, রুদ্রযামলতন্ত্র, ব্রহ্মযামলতন্ত্র, মহাপ্রাচীনাচারতন্ত্র, ইত্যাদি। উপাখ্যানটী এই—বশিষ্ঠ পিতা ব্রহ্মার উপদেশে দেবী বুদ্ধেশ্বরীর সাধন করিতে কামাখ্যা পর্ব্বতে যান। তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়াও দেবীর সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ দেবীকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন বশিষ্ঠ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে সাধনা করিতেছেন ; বেদাচারে দেবীর সাধনা হয় না, ঐ সাধনার উপায় মহাচীন

(তিব্বত) দেশে পরিজ্ঞাত আছে। বশিষ্ঠ যদি মহাচীনে গিয়া বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে তাঁর সিদ্ধি হইবে। এই উপদেশ অনুসারে বশিষ্ঠ মহাচীনে গিয়া দেখিলেন বুদ্ধদেব বামাচারে বামামণ্ডলে বসিয়া মদ্য পান করিতেছেন। বশিষ্ঠ বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষিত হইলেন।

ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে কাশ্মীর ও বঙ্গ মঙ্গোলদেশের সহিত ঘনিষ্ট সংযুক্ত বলিয়া এই দুই স্থানে তন্ত্রাচার প্রবল হইয়া বদ্ধমূল হইতেছিল। কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্ক যখন কাশ্মীরের রাজা তখন তিনি শৈব শাক্ত ধর্ম্মের প্রধান পোষক এবং তাঁরই সময়ে নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষ তান্ত্রিকতার প্রধান প্রচারক ছিলেন।

বঙ্গদেশে এককালে শক আধিপত্য ছিল; এবং শকেরা ছিল শৈব-শাক্ত। তৎপরবর্ত্তীকালে বঙ্গে বর্দ্ধন-গুপ্ত-পাল বংশের রাজারা শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরক্ত হন। এইজন্য বঙ্গে তান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পায়। এই সময়ে বৌদ্ধ ও শৈব-শাক্ত ধর্ম্ম পরস্পর সন্নিহিত হইতে হইতে একাকার ধারণ করিতেছিল এবং বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈব-শাক্ত তন্ত্র পরস্পরের উপর প্রস্তাব বিস্তার করিয়াছিল। গুপ্ত রাজাদের সময়ে ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তান্ত্রিকতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং এই সময়েই পীঠস্থানের কল্পনা হইয়া থাকিবে। যতগুলি মহাপীঠ ও উপপীঠ আছে তার অনেকগুলি বঙ্গে অবস্থিত। প্রধান পীঠ কামাখ্যা আসামে, সুগন্ধা বরিশালে, দেবীর নাসিকার পতনস্থান; দেবীর অধর যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম অট্টহাস, দেবীর নাম ফুল্ল-রা অর্থাৎ মঞ্জুভাষিণী, আহমদপুর ষ্টেশন হইতে লাভপুরে যাইতে হয়; বামতল্প পতনের স্থান বগুড়া সেরপুর সন্নিহিত করতোয়া; কাটোয়ার কাছে জুড়নপুরে দেবীর মুণ্ড পতনের পীঠের নাম কালীঘাট; কলিকাতার কালীঘাটও দেবীর দক্ষিণ চরণের চার অঙ্গুলির দাবী রাখেন; আজিমগঞ্জের নিকট কিরীট দেবীর কিরীট পতনে নাম পাইয়াছিল; শ্রীহট্ট দেবীর গ্রীবা পতনের স্থান; নলহাটিতে দেবীর নলা পড়িয়াছিল; চট্টগ্রামে দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ; উজানীতে দেবীর কনুই; কাটোয়ার নিকট কেতুগ্রামে বাম বাহু পতনে পীঠের নাম বহুলা; বোলপুরের কোপাই নদীর তীরে কাঞ্চি পীঠ দেবীর কঙ্কালের স্থান; বাম জঙ্ঘা পাইয়াছিল জয়ন্তী; কিন্তু জয়ন্তী নামের জোরে শ্রীহট্টে ও আসামের নিকটে দুই স্থান সেই সৌভাগ্য করিয়া আসিতেছে; দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পায় ক্ষীরগ্রামে, কাটোয়ার কাছে; মন বা ভ্রূমধ্য লাভ করে বক্রেশ্বর আমদপুরের নিকট; হার পাইয়াছিল সাঁইথিয়ার সন্নিকট নন্দীপুর; বামগুলফ পতনের স্থান মেদিনীপুরের তমলুকের নিকট কিভাস; বাম পদ পড়িয়াছিল জলপাইগুড়ির তিস্তা বা ত্রিস্রোতার বুকে; মালদহের পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ও চণ্ডীপুর দুই জায়গাই পীঠ বলিয়া দাবী করে। এই সব নানা পীঠের অবস্থান ও সংখ্যা হইতে দেখা যায় ক্রমশঃ বহু পীঠ কল্পিত হইয়া আসিয়াছে। পীঠমালার পীঠ বলিয়া অসংখ্য স্থানের নাম আছে। উত্তর রাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল বোধ হয়। তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠ ও

উপপীঠের মধ্যে অনেকগুলি এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। গুপ্তরাজাদের পরে পালবংশের অভ্যুদয়। মাৎস্য ন্যায় অনুসারে প্রজাপুঞ্জ প্রবল হইয়া নিজেরা নির্ব্বাচন করিয়া গোপালদেবকে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে রাজা করে। তখন সাধারণতন্ত্র বঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও দেবতা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও দেবতাদের অভিভূত ও পরাভূত করিয়াছিল। ৭ম শতাব্দীতে শবরগণ বঙ্গ ও উৎকলের কিয়দংশ অধিকার করে। এই সময়ে কাশ্মীর ও বঙ্গ মিত্র রাজ্য ছিল। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারা যায় গৌড়ে সিংহের উৎপাত হইলে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সিংহ বধ করিয়া গৌড় রাজকুমারী কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন। এই সময়ে উভয় তান্ত্রিক রাজ্যের মিত্রতায় ঐ ধর্ম্ম আরো বদ্ধমুল হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। বাঙালী তান্ত্রিক প্রচারকেরা গুজরাটে ও দাক্ষিণাত্যে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার ও তান্ত্রিক দেবমূর্ত্তি কালিকা ও চামুণ্ডা প্রতিষ্ঠা করেন। এলোরা গুহায় (৭৬০ খ্রীঃ অঃ) কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে দেখা যায়। ভবভূতির মালতী-মাধব, সুবন্ধু'র বাসবদত্তা (৬ষ্ঠ শতাব্দী), নাগানন্দ নাটকে দাক্ষিণাত্যে তান্ত্রিকপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমে জলন্ধর ও হিংলাজ, পূর্ব্বে কামরূপ কামাখ্যা এবং দক্ষিণে পুনা হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত রেখা টানিলে যে ভূভাগ সীমাবদ্ধ হয় তার মধ্যে তান্ত্রিক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও আরাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর বিহারের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন, এবং তাঁর প্রভাবে বঙ্গে গৌড়ে মগধে তান্ত্রিক মত বহুল প্রচারিত হয়। এইরূপে যে বঙ্গদেশ এক সময়ে অপবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত, গুপ্তরাজদিগের সময়েই তাহা তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়; স্কন্দপুরাণে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন একটি তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ৬৪৭ সালে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তিব্বতী ও নেপালীরা মিথিলা বঙ্গ আক্রমণ ও জয় করে। তারা নিজের প্রভাব এই দেশে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়া যায়। তৎপরে সেনরাজগণের সময়। কারো কারো মতে গৌড়রাজ জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন (৮ম শতাব্দী)। আদিশূর বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ইহা সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন লুপ্ত হইতে থাকে। মহারাজ বল্লালসেন সিংহগিরি নামক বৌদ্ধ আচার্য্যের উপদেশে বীরাচার তান্ত্রিক হন, পরে হিন্দু তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন (১২শ শতাব্দী)। আবার মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পিতামহ বিজয়সেনের ন্যায় বৈদিক আচারের পক্ষপাতী হইয়া তান্ত্রীকপ্রধান গৌড়বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক আচারের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁর প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধকে দিয়া মৎস্যসূক্ত নামে এক মহাতন্ত্র, রচনা ও প্রচার করেন। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ও বৈদিক-তান্ত্রিক আচার সমন্বয়ের চেষ্টা সফল হয় নাই।

বঙ্গদেশের অধিকাংশই অনেককাল পর্য্যন্ত জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল ও সেই অরণ্যবাসী আরণ্যক-দিগকে কিরাত বলিত।

বঙ্গে আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্য অধিবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল; তাদের প্রভাব সুতরাং অধিক বিস্তৃত হইবারই কথা; তার উপরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে সাধারণ লোকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করাতে তাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও দেবস্বরূপে আরোপিত হইয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সুতরাং শক শবর কিরাত জাতির অধিকৃত দেশে শবরী দেবী দুর্গা বা চণ্ডীর পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়ার একটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সমাপ্ত

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

হারানো খাতা

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,
আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন।
—তীর্থরেণু।

সেদিন নরেশ যখন চলিয়া গেলেন, পরিমলের বোধ হইল স্বামীকে যেন সে সুদূর কালের মতই হারাইয়া ফেলিয়াছে, হয়ত বা চিরকালের জন্যই তাহাদের এই ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, অতঃপর আর কোন দিনই তাহাকে সে আর ফিরিয়া পাইবে না। সে নিজের স্বর্ণসূত্র খচিত গোলাপী আঁচল মুখে চাপিয়া ব্যথায় আকুল আচ্ছন্ন হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার উচ্ছ্বাসে কম্পিত হইয়া বিদীর্ণপ্রায় অন্তরের মধ্য হইতে তাঁহার অভিমানপুষ্ট অভিযোগ উঠিয়া আসিল। কান্নায় অধীর হইয়া সে মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "দুঃখীর চেয়েও দুঃখী আমি, সে তো তুমি জেনে শুনেই আমায় নিয়ে এসেছ। কিন্তু ভালবাসায় যে একসময়ে আমি আজকের রাজরাণীর চেয়েও ঢের বেশী বড় ছিলুম, সে তো তুমি দেখতে পাওনি। তাই ভেবেছ কতকগুলো সোণাদানা চাপিয়ে দিলেই গরীবের মেয়ের বুঝি বুক ভরিয়ে দেওয়া যায়, না? আমার মতন ক'জন বাপের ভালবাসা পায়? আমার কি স্নেহে ভরা মস্ত লোক ভাইই ছিল! আমার মা; আর তিনি। তাঁর কাছেই কি আমি কম পেয়েছিলুম। দাদার বন্ধু কিন্তু দাদার চাইতেও যেন তাঁর যত্ন বেশীই ছিল। তাঁর মার কথা মনে হলে যে এখনও আমি কান্না চাপতে পারিনে। আমায় তুমি গরীব বলে, কালো বলে, এত তুচ্ছ ভাববে যদি, তা'হলে কেন আমায় রাণী করতে নিয়ে এলে? আমি না হয় সেখানে পড়ে মরেই যেতুম। আবার—সে আবার বর্ত্তমান আঘাতের ও নিরুদ্ধবেদনায় ভরা অতীতের স্মৃতির স্মরণে অজস্র কান্নার

ঝাঁটিয়া পড়িল। কিন্তু তার পরই তার মনে হইল, হয়ত এতক্ষণ তার স্বামী তাঁর ভালবাসার জনকে পাশে লইয়া তাহাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছেন। নিজের দুর্ভাগ্যপূর্ণ এবং স্বজনত্যক্ত অতীত আবার যেন নিজের ভয়াবহ মূর্ত্তিখানা লইয়া মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া গেল। প্রচণ্ড অভিমান যেন বন্যাধারায় ভাসিয়া গেল, সে সহসা বিদ্যুৎবেগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় ছুটিয়া আসিল। মোটর প্রভৃতি বাড়ীর কোন গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছে না, খিড়কীর সাম্‌নে একখানা ভাড়াটে গাড়ী। পরিমল ইহা দেখিয়া ঈষৎ আশ্বস্তচিত্তে ফিরিয়া যাইতেছিল, সহসা নজরে পড়িল নীচে সেই ভাড়া গাড়ীর অভিমুখে একটী ক্ষীণাঙ্গী ও সুন্দরী মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ইহাকে দেখিয়া সে সুষমা বলিয়া মনেও করে নাই, কিন্তু যখন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া নিরঞ্জনও গাড়ীতে উঠিল এবং নরেশ নিরঞ্জনের হাতে একটা চিঠির খাম দিয়া বলিলেন "এই চিঠি দেখালেই তারা সব ঠিক করে দেবে, সুষমা! তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারবে জেনেই নিরঞ্জনকে আমি তোমায় দিলুম। দেখছি ওর মত বন্ধু আমার আর জগতে কেউ নেই।" তখন সেই নিরাড়ম্বর বেশধারিনী ও বালিকাকৃতি মেয়েটীকে সুষমা জানিয়া পরিমল বিস্মিতা হইল। তারপর তার মনে হইল, রূপই বা তার এমন অসাধারণটা কি?

লোকের রটনা যে কতটাই অবাস্তব হইতে পারে তাই দেখিয়াও সে অবাক হইল। সে যে এতদিন শুনিয়াছে রাজা তাঁর অর্দ্ধেক রাজঐশ্বর্য্য সুষমার চরণেই ঢালিয়া দিয়াছেন, হীরায় তার গা ভর্ত্তি এবং রূপ নাকি তার সেই হীরার চেয়ে উজ্জ্বল। তার জায়গায় এই সিদাসিদে সুষমাকে বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকিল। স্বামীর দুঃখিত কণ্ঠ ও অভিমান বাক্যও পরিমলের ঈর্ষাবিদ্ধ অন্তরে লজ্জার সূচী বিদ্ধ করিতে ছাড়িল না।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাহার শীতল স্পর্শ এবং চাপা কান্না অনুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কে"?

পরিমল ঝাঁপাইয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া দুইহাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল; "আমার উপর নির্দ্দয় হয়ো না। আমি যে সব হারিয়ে তোমায় পেয়েছি।"

নরেশ স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিলেন; তাঁর বুক ভরিয়া একটা নিশ্বাস উঠিল। বলিলেন, "পরিমল! সুষমার কথা ভুলে যেতে পারবে?"

পরিমল মাথা হেলাইয়া জানাইল পারিবে। লজ্জায় সঙ্কোচে কথার উত্তর সে দিতে পারিল না।

"সে জন্মের মতই আমার সংস্রব ছাড়িয়ে গেছে, অন্ততঃ তোমার কল্পনা থেকেও তাকে তুমি মুক্তি দিও আমরা যেমন ছিলুম তেমনি থাক্‌বো।"

নিরঞ্জন সুষমাকে লইয়া নরেশচন্দ্রের বাগানে যাইবার জন্যই বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ সে

বলিল "ওই বাগানের রাস্তার ধারেই আমি আধমরা হয়ে পড়েছিলুম, রাজাবাহাদুর আমায় তুলে নিয়ে আসেন। বাগানের দরওয়ানগুলো ঠিক যেন যমদূত!"

সুষমার একথা শুনিয়া কি মনে হইল কে জানে, সে বলিয়া উঠিল "দেখুন, বাবা! আমার সেই ছোট্ট বাড়ীটীতে অনেকগুলি দরকারী জিনিষ আছে, আজ আমরা সেই খানেই যাই; কাল তখন সব গোছগাছ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে একেবারেই।"

ভিতরের কথা না জানিয়া নিরঞ্জন সহজেই সম্মত হইল। যেখানে একদিন ভিখারী নিরঞ্জন নরেশের কৃপালাভ করিয়াছিল, সেখানের ভৃত্যবর্গ হয়ত মনিবের অসাক্ষাতে আজও তাহাকে তেমন করিয়া না মানিতেও পারে। নরেশের পত্র থাকিলেও মানুষের প্রবৃত্তিকে কি হুকুমে বন্ধ করা যায়? তাই সে কিছু উপদ্রুত হওয়া সম্ভব জানিয়াও নিজের বাড়ীতেই ফিরিতে চাহিল। নিরঞ্জন সঙ্গে থাকাতে মনে সাহস ছিল। আসিয়াই কিন্তু অপ্রত্যাশিত ফললাভে আনন্দে সে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল,—এযে তার সেই ছোট্ট বেলাকার ইষ্ট গুরু সেই সাধু! আজিকার বড় দুর্দ্দিনে অযাচিতরূপে আসিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অবর্ণনীয় আনন্দের আতিশয্যে শিশুর মত চঞ্চল উৎফুল্ল হইয়া চোখে জল ও মুখে হাসি লইয়া সুষমা বারবার করিয়া বলিতে লাগিল "ঠাকুর গো! আপনি নিশ্চয়ই ভগবান! আমি যে কায়মনোবাক্যে আপনাকেই ডাকছিলুম, তা আপনি জানলেন কেমন করে?"

সাধু কহিলেন "বেটা! আমি যে তোমায় নিজের দরকারেই খুঁজতে এসেছিরে! রাজা-বেটা যদি হুকুম দেয়, তাহলে আমি তোকে আমার অশরণালয়ের সেবাশ্রমের ভারটা দেবার জন্যে সঙ্গে করে অযোধ্যাধামে নিয়ে যাই।—সেখানে দুতিনজন জমিদারের সাহায্যে আর ভিক্ষার ধন দিয়ে আমি এক মস্ত কাজের ছোট্ট বীজ বপন করেছি। জানিস বেটা! বদরীনারায়ণে গিয়েও তোর কথা আমার মনে জাগ্‌ছিল, পথে এক তোর মতন পাঞ্জাবী মেয়ে হাতে পেলুম তার মা বেটী আমার পা জড়িয়ে সাত বছরের মেয়েকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালালো, বল্লে মেয়েটী যাতে ধর্ম্মপথ পায়। বিস্তর ভেবে ভেবে তোদের কথাই আজ পাঁচ ছ বছর ধরে গেয়ে গেয়ে কিছু টাকা জোগাড় করলুম। এর মধ্যে আরও দুতিনটী ছোট ছোট মেয়ে আমার কথা শুনে তাঁদের মায়েরা আমায় দিয়ে গেছে। পথের ধারে সদ্য জন্মানো একটাকে কুড়িয়েছি। দুজন বুড়োমানুষের জিম্মায় রেখে তোকে নিতে এসেছি। কি হবে বেটা! গান বাজনা শিখে? হরিকে ডাকবার জন্যে নিজের স্বভাবদত্ত কণ্ঠ যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট! কাজ কর্; জগতে এসেছিস্, জন্ম সার্থক কর্। যে যেমন জন্ম পেয়েছিস বেটা, তাকেই আবার বড় করে নেওয়া যায়। সবাই কিছু সংসারে আর একজনের বউ হবার জন্যে জন্মায়নি। হাঁড়ি কুঁড়ি সাজিয়ে খেলা নাই বা করতে পেলি? ছেলে হয়ে মা না বল্লেই কি তার মা হওয়া যায় না? যাদের দুঃখের জন্ম, লজ্জার জন্ম, জন্মেই যারা সব হারায়—এমন কি নিজের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত—তাদের মা হবে কি চিরদিনই ওই

সাত সমুদ্র তের নদী পারের বিদেশী মায়েরাই ? তোরা দখল করে নেরে বেটা, দেশের ওই অনাদৃত অংশটাকে তোরা নিজের জোরে দখল কর। করে চরিত্রবলে সকলের দৃষ্টি এই দিকে টেনে আন্। এ একটা কম অভাব নেই দেশে।"

ঠিক নিজেদের অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং তাহা শুধু কল্পনা মাত্র নয়; বাস্তবের মূর্ত্তিতে তাহার দেখা পাইয়া সুষমা যে নিধিই হাতে পাইল তাহা বলিবারই নয়। সে মুখে শুধু পুনঃপুনঃই আনন্দাশ্রুসিক্ত হইতে হইতে বলিতে লাগিল "উঃ যদি আমি আজ না আসতুম! যদি আমি আজ না আসতুম!"

সেই দুঃসহ ক্ষতির কল্পনামাত্রে সুষমার প্রাণ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রোগ মসীঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে, পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।
—কথা।

নিরঞ্জন চলিয়া গেলে পরিমল তার জন্য যে এতখানি শূন্যতা বোধ করিবে তা বোধ করি তার স্বপ্নেও জানা ছিল না। ইদানীং পড়ার দায় না থাকায় সে বেশ প্রসন্নচিত্তেই যখন তখন খুঁজিয়া পাতিয়া তাহার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করিতে আসিত। সেই অবসরে তার ঘরের বিছানার আহারের ও পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধান করাও তার একটা কাজের মধ্যেই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অপ্রিয়দর্শন ভগ্ন দেহমন লোকটীর মধ্যে পরিমল যেন তার পূর্ব্ব স্মৃতির একটুখানি সৌরভ পাইত, তাই তাহার পরে তাহার পূর্ব্ব বিরাগ দিনে দিনেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সুষমা আসিয়া তাহাকে চিলের মতন ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়াতে হয়ত সে তার উপর একটু বেশী করিয়াই চটিত যদি না এর মধ্যে জড়িত থাকিতেন তাহারই স্বামী। নিঃসঙ্গ পরিমলের অবসরকাল ক্ষেপের একটুখানি অবলম্বন নিরঞ্জনকে যে তাহার স্বামীর পরিবর্ত্তে টানিয়া লইয়াই তাহার ঘাড়ের সুষমারূপী প্রেতিনীটা বিদায় হইয়াছে এই কথা মনে করিয়া নিরঞ্জনকে তার এতই শ্রদ্ধা হইল যে সে বলিবার নয়। হাজার বার করিয়াই তার তখন মনে হইল যে, কথায় যে বলে থাকে রাখো, সেই রাখে—তা বাপু এ ঠিকই! ভাগ্যে উনি ওটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তাই না আজ নিজে বেঁচে গেলেন, অন্ততঃ আমি তো বাঁচলুমই। ও না থাকলে আর কার ঘাড়ে যেত, আমার ঘাড়ই সে ভাঙতো নিশ্চয়। যে সময়টায় সে নরেশচন্দ্রের খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধানের জন্য নীচে

নামে এবং কোন কোন দিন একবার করিয়া নিরঞ্জনেরও খোঁজটা খবরটা লয়, তেম্‌নি সময় সেদিন নিরঞ্জনের বিজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার নজরে পড়িয়া গেল, একখানা মলাট ছেঁড়া পুরাতন খাতা। এই খাতার প্রথম পৃষ্ঠার ছত্র কয়েক মাত্র সে এক সময়ে পড়িয়াছিল, যখন সবে মাত্র এর আরম্ভ। এতদিনে না জানি মাষ্টার মশাই-এর ডায়রিখানা কতদূর অগ্রসর হইল, সেই খবরটী জানার অদম্য কৌতূহলে পরিমল সেখানা চুরি করিয়া লইল। নিশ্চয়ই এইবার সে এই ছদ্মবেশীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে। তবে এই যে ডায়রি এ সত্য সত্যই কি ডায়রি—ডায়রি-ছলে লেখা একটা উপন্যাস নয় তো? নরেশের বিশ্বাস নিরঞ্জন একটা বড়লোক; কিন্তু পরিমলের মনে নিরঞ্জন সম্বন্ধে খুবই যে একটা প্রকাণ্ড ধারণা জমিয়া আছে, তা নয়। একটু লেখাপড়া জানে, বসন্তে স্বাস্থ্যহারা হইয়াছে, হয় গাঁজা খায়, না হয় আধ পাগলা। সে আবার ডায়রি কিসের লিখিবে? তবে গাঁজাখোর হইলে যে ঔপন্যাসিক হইতে নাই, তেমন তো কোন বিধান দেখা যায় না! অল্প বিদ্যা এবং মস্ত অবসর লাভ বরং এ বিষয়ে কিছু সুযোগই তো ওর কাছে। অনায়াসেই এখানা একখানা উপন্যাস হইতে পারে। বেশ তো তাদের মাসিক পত্রিকার খোরাক হইবে।——

পরিমল এই খাতাখানার প্রথমার্দ্ধ শেষ করিয়া যখন বাকি অংশ পড়িতে আরম্ভ করিল, তার চোখে তখন নিরঞ্জনের তেমন সুন্দর ছাঁদের পরিষ্কার লেখাও যেন কতকগুলা অস্পষ্ট কালির আঁকের মতই,—যেন কতকগুলা পোকার ছানার মতনই কিলিবিলি করিয়া উঠিতেছিল। তার মাথার মধ্যে যেন একটা গুরু বেদনা, সর্ব্ব শরীরে যেন হাতুড়ি দিয়া পেরেক ঠোকার ব্যথা,—চোখের দৃষ্টি কখনও ঝাপ্‌সা, কখনও জ্বালাময়,—আবার কখনও বা প্রবলবেগে প্রবাহিত অশ্রুর বন্যায় সম্পূর্ণরূপেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। তাহার অতীত জীবনের তিন ভাগেরও বেশী তো দুঃখের মধ্য দিয়া অতীত হইয়াছে, কিন্তু এত বড় যন্ত্রণা-ভোগ যেন তাহার সে সব ভয়ানক দিনেও ঘটে নাই। একি অসম্ভব সম্ভব হইয়া আজ তাহাকে দেখা দিল? একি সত্য? এ কি স্বপ্নময়? একি কোন যাদুকরের খেলা হইতে পারে না?—এও সম্ভব? এও সম্ভব?—

সে খাতায় কি ছিল? এমন কিছুই না! একটি দুর্ভাগ্য জীবনের দুঃখময় কাহিনী। একটি সংসারের খাতা হইতে ছিঁড়িয়া পড়া হারানো পাতা। সে পাতা ক'খানি এই রকম।—

"জীবনটা যেন এলো মেলো হয়ে পড়েছে। এর গ্রন্থি যেখানটায় ছিল, সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, জট পাকিয়ে গেছে কিনা। লোকে আমার কথা জানতে চায়, তাদের কাছে বল্‌বো কি, আমার নিজের কাছেই সবটা যেন খাপ্ ছাড়া গোলমেলে ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মনেই কি ছাই ছিল কিছু? আমি যে কোন দেশের লোক, নামটাই বা কি ছিল, অক্ষর পরিচয় আমার কোন দিন হয়েছিল কিনা, এসবই তো ভুলে বসেছিলেম। মনে পড়্‌লো কবে? বছর দেড়েক বাদে হবে বোধ হয়! আচ্ছা ডাক্তার সাহেবের আশ্রয় আমি ছেড়ে আসি কোন্ সময়টায়? মনে

পড়ে না। কিচ্ছু মনে পড়ে না। হ্যাঁ, ভাব্‌তে ভাব্‌তে এই পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে যে, তাঁর ওখানে থাকতে থাকতেই আমি একটু একটু বই টই পড়তে পারছিলুম। একদিন সাহেবের ছোট ছেলের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইছি, শুনে মেমসাহেব সাহেবকে ডেকে আনেন। তাঁরা আমার ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করে কি একটা যেন বই দিলেন, গড় গড় করে পড়ে গেলুম। ভারি খুসী! ছেলেমেয়েরা তো আমায় ঘিরে হাত ধরাধরি করে শুনতেই লেগে গেলো।

তারপর থেকে আমার ভারি খাতির। সাহেবতো তাঁরা নন, সিন্ধুদেশের লোক। চেহারার আর পোষাকে আমার ওঁদের ইটালিয়ান বোধ হয়েছিল, দুদিন পরে বুঝলুম আমার ভুল। আমার বুদ্ধির দশা ঐরকমই যে হয়ে পড়েচে! কে বল্‌বে যে এই আমিই একদিন অনার নিয়ে বিএ পাশ করেছিলুম সব্বার ওপোর হয়ে। হায়রে—"ধন জন মান, পদ্মপত্রে জলের সমান" এযে দেখ্‌ছি তারও চেয়ে বেশী—বিদ্যে বুদ্ধি এগুলোতো ভিতরের জিনিষ, সেতো আর লুঠ করে নেওয়া যায় না, তাও ফুরোয়। আর দেহের রূপ! সে যে কেমন করেই একেবারে হুবাহুব একখানা পোড়া কাঠের মূর্ত্তি নিতে পারে, সে যেদিন প্রথম দেখি, ঐ সিবিল সার্জ্জন মালখানী সাহেবের বাড়ীতেই তাঁর ছোট মেয়ে সীতার হাতের কৌটায় বসান আয়না দিয়ে, সেদিনের কথা,—এইতো দেখছি বেশ মনেই আছে! সেকি যন্ত্রণাই মনের মধ্যে বোধ করেছিলেম! তারপরই বোধ করি আবার আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় ও সেই সময় পাগলামীর ঝোঁকে কেমন করে বেড়িয়ে পড়ে পালিয়ে আসি। সেতো মনে নেই! তার জন্যে এখনও আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তবে মানুষ হয়ে যে জন্মেছে সে যদি মানুষের মধ্যের সকল দুর্ব্বলতারই উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারে, তাহলেতো আর কথাই থাকেনা, সেতো তখন পুরুষোত্তম পদ পায়। আমি যদি সেই জিনিষ হ্‌তে পারতাম, আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত। পারিনি, তাই এই দুর্দ্দশা। সেদিন যে আমিকে আমি চিনতুম, সে আমিকে আর দেখতে পেলুম না। সে আমার যে মৃত্যু হয়েছিল, সে আমার আত্মীয়েরা যে আমায় শ্মশান ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়ে গেছে, সে আমি যে আর বেঁচে নেই, শ্রাদ্ধাধিকারী নেই বলে শ্রাদ্ধ না হয় হয়নি; কিন্তু তাঁর নাম যে মরার হিসাবের সঙ্গে লেখা হয়ে গিয়েছিল; এ জগতের সঙ্গে যে তার কার কারবার চুকে গ্যাছে, সেই সব কথাই ওই আয়নার মধ্য থেকে এক নিমেষের ভিতরে এই নূতন দেখা আধপোড়া ভীষণ মুখখানা আমায় বলে দিলে, আর চেঁচিয়ে উঠে আমি মূর্চ্ছা গেলুম। আর ওকে দেখিনি —কোন দিনই দেখিনি। দেখলে হয়ত এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারি। কিজানি কেনই আমি ওকে সইতে পারিনে, একেবারে সইতে পারিনে। যেন মনে হয় ঐ আমার সেই পুরানো অতীতকে হারানো অতীতকে আমার কাছ থেকে ডাকাতী করে কেড়ে নিয়েছে। এখন এ মুখ নিয়ে যদিই আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই, আমায় কি তারা তাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত রমেশ বলে আদর করে ডেকে নেয়, না পাগল বলে পুলিস ডাকে, এটা আমার জানতে

ইচ্ছে করলেও এ পর্য্যন্ত পরখ করবার ভরসা আমার হয়নি। লোভ দুএকবার মনে জেগেছিল, কিন্তু কেমন যেন গা ছমছম গা ছমছম করতে লাগলো। আমি যে মরা মানুষ, আগুনজ্বলা চিতা থেকে চুরি করেই না হয় বেঁচে উঠেছি; তা বলে যারা আমায় মরতে দেখেছে তাদের সামনে যাব কেমন করে? ভয়ও হয় লজ্জাও করে। আবার চেহারাখানাও যদি আগের কোন চিহ্ন ধরে থাকতো, তাহলেও নয় একটা যাহোক কথা ছিল। যদি কোনও দিন যাই তো সেই ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে করে। কিন্তু তাতেই কি পর্য্যাপ্ত হবে? তাছাড়া আমি গিয়েই বা করবো কি? আমার যেকিছু সম্পত্তি ছিল, সেকি আর আজও আমার জন্যে পড়ে আছে? তা ভিন্ন সংসারে বন্ধন বলতে তো আমার কোথাও কিছুই বাকি নেই সে সব যে চুকিয়ে নিয়েছি। নাঃ দরকার নেই আর জাল প্রতাপচাঁদের দ্বিতীয় প্রহসনে।

"আচ্ছা মানুষগুলোর আসল অবস্থাটা কি? ভেবে ভেবে হয়তো কোন কূল কিনারাই আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেম না। গাছ থেকে না পড়ে সে মানুষের পেটের থেকে জন্মায়, তা ভিন্ন আর সবই তো তার গাছের ফলের মতই অনিশ্চিত। কোনটা হয়ত ফুলের মধ্যেই লয় পাবে, কোনটা অঙ্কুরেই শুকিয়ে যাবে, কেউ তার চেয়ে বড় হয়ে ঝরে পড়বে, আবার কেউবা টেঁকে থেকে পেকে উঠবে। তা, তাও যে কা'কে কাকে ঠোকরাবে, আর কে'বা পড়বে দেবতার নৈবেদ্যে বা রাজভোগে, তারই নাকি কোন ঠিকানা আছে? মানুষগুলোও যেন তেম্‌নি এক একটা গাছের ফল, কূলহারা তরঙ্গ, পথ-হারানো পথিক। হ্যাঁ মানুষ ঠিক যেন পথ হারানো পথিকই বটে। কোথায় ওদের বাড়ী ঘর, কোথায় ওদের যাত্রা পথের শেষ—তারতো কোন নিকেশই আমি দেখি না। কেবল ঘুরে ঘুরেই পরিশ্রান্ত! একটা গান অনেকদিন আগে শুনেছিলেম, কি কিসে যেন পড়েছিলেম—

'মন! চল নিজ নিকেতন,
সংসার প্রবাসে, প্রবাসীর বেশে, কেন ভ্রম অকারণ?'

কিন্তু 'নিজের নিকেতন' কোথায় তার? জন্ম থেকে জন্মান্তর সেতো সেই অনাদি কাল হতেই এমনি করে 'প্রবাসীর বেশে' 'ভ্রমণ' করবে। একি অকারণ? এর উদ্দেশ্য নাকি শেষকালে সেই 'নিজ নিকেতনে' পৌঁছান! কিন্তু ক'জন আজকে পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারলো আমার যে বড় জানতে ইচ্ছে করে। আমার তো মনে হচ্চে, আমি বুঝি কোনদিনই তা পারবো না। নিজের এ জন্মের বাড়ীখানাকেই মনে হচ্চে যেন সে কতদূরের পথে; যেতে গেলে যেন সে পথ আর কখনো ফুরবেই না; তাঃ নিজের সেই অসীম অনন্ত পথের শেষ ধারে যে সত্যিকারের বাড়ী আছে, সেখানে আমায় পৌঁছে দেবার সাধ্যি কি আমার আছে! তাহলে শুধু এজন্মেই নয় চিরজন্মই পথে পথে 'প্রবাসে প্রবাসে' ঘুরেই মরতে হবে দেখছি। ওগো! ও, পারের বন্ধু! পথ কি আমার কোনদিনই শেষ হবে না?

"আচ্ছা সংসারে কি কেউ সুখী হয়? দু'চারদিনের কথা বলছিনে, অন্ততঃ তার আধখানা জন্ম ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কেউ করতে কি পেরেছে? আমি তো বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। ছোট বেলায় সুখ বড় মন্দ থাকে না, কিন্তু লোভ তাতেও বাধা দেয়। যা চাই তা পাইনে, পাওয়ার ইচ্ছার শেষ রাখেননি যে ভগবান। কাজেই সে সুখের পথও কাঁটার উপর ফুটে থাকে। তারপর বিদ্যারম্ভ হলেই সুখের ঘরে শূন্যি বস্‌লো। ক খ শেষ হতে না হতেই শটকে নামতা, সঙ্গে সঙ্গে এ, বি সি ডি'র ঠ্যালা। তারপর অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল দেখা দিলেই তো মাথার ঠিক্ রাখাই গোল হয়ে পড়ে। তারপর এই মহাসমরে জয়ী হয়ে উঠ্‌তে পারলে, ভগবান করুন আমার মতন অন্ততঃ কারু আজন্মের শ্রম এমন করে যেন ব্যর্থ না হয়; কিন্তু খুবই সুখী হতেও আমি বেশী লোককে দেখিছি তাও তো আমার মনে পড়ে না। শুধু কোটীর মধ্যে দু'একজন যাঁরা পরের জন্য নিজেকে ছেড়ে দেন, তাঁরাই বোধ করি যথার্থ সুখী হতে পারেন—অন্ততঃ হওয়া তো উচিত। রাজা নরেশ কিন্তু সুখী নন; তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। ওঁর সব হাসি মুখের, মনের মধ্যে অশ্রুর নির্ঝর কিন্তু ঢাকা দেওয়া আছে। কেন? সে অবশ্য আমার জানা নেই; কিন্তু যা আমার মনে হলো সেইটুকুই আমি আমার ছেঁড়া খাতায় লিখে রাখলুম।

"আচ্ছা রাণী মা—আমার যিনি ছাত্রী, তাঁকে আমার কি মনে হয়; সুখী না অসুখী? না; ওসব মেয়েরা সুখী বেশী না হলেও প্রায় অসুখী হতে পারে না,—মন ওদের ক্রূর নয়, নিষ্ঠুর নয়, খুব স্বার্থপরও নয়; কিন্তু তবু একটা তফাৎ আছে, সেটা কি, যিনি তৈরি করেছেন তিনিই জানেন। তবে বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়তো হেরে যাবো, তবু একটা কিছু যে প্রভেদ আছে তা' স্বীকার করতেই হবে। তিনি ঠিক রাজা নরেশ নন, এ জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ ডোবেও না ওঠেও না, ভাঙ্গেও না এবং নূতন করে কিছু গড়েও না। স্থিতিস্থাপক ভাবে এরা একরকম কাটিয়ে যায় ভাল। ঝড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার এদের শক্ত ডানা আছে। কিন্তু এঁকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে। সর্ব্বান্তঃকরণেই আমি আশীর্ব্বাদ করি ভগবান ওঁকে রাজরাণী করেই যেন নিশ্চিন্ত থাকেন না, ওঁর সুখ যেন স্থায়ী হয়।

"সুখদার কথা মনে হ'তে আবার অনেক কথাই যেন মনে পড়ে গেল। যে সব পুরানো গাওয়া গানের সুর বাতাসে ছড়িয়ে আছে, তারা যেন সুর বাহারের সুরের ঝঙ্কার উঠ্‌তেই আপনি এসে ধরা দিলে। সুখদার কথা আরও যে আমার বলবার আছে। তাকে কোথা থেকে, আর কেমন করে পেলুম সে কথাতো এখনও বলা হয়নি, আবার হারাতেও যে বেশী সময় লাগেনি, সেটুকুওতো বাকী রাখা চলবে না। সবটুকুই আমার মনের ভিতর একবার ভাল করে গুছিয়ে নিই। তারপর? তারপর এ খাতাখানা আর একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই ভোরের আলো লাগা ঘুমন্ত গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসবো তখন।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভু ! এলেম কোথায় !
বরষ গত হ'ল, জীবন বহে গেল, কখন কি যে হ'ল জানিনে হায় !
আসিনু কোথা হ'তে, যেতেছি কোনপথে, ভাসিবে কালস্রোতে তৃণের প্রায়।
মৃত্যুসিন্ধুপানে চলেছি প্রতিক্ষণ, তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন,
জীবন অবহেলে, আঁধারে দিনু ফেলে, কত কি গেল চলে, কত কি যায়।

"কালীপদর বাড়ী যখন পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যার বড় দেরি নেই। ওযে অত গরীব ছিল তা আমি কোনদিন জানতে পারিনি। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙ্গে বোধ করি কোথায় চলে গেছে, আর একখানা বাতাসে ঢক ঢক শব্দ করচে। বাড়ীখানা এক সময়ে যে গাঁয়ের মধ্যে সব চাইতে বড় লোকেরই বাড়ী ছিল, সে আজও তার বিরাট বপু দেখেই বেশ বোঝা যায়। হলে হবে কি, আজ যে তার এ গাঁয়ে সবার চাইতেই দশা মন্দ, সেও তো আমি একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলেম।

"উঠানে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়ে একটী কিশোরী মেয়ে তার ময়লা কাপড়ের আঁচলটুকু গলায় জড়িয়ে প্রণাম করছিল, আমায় দেখতে পেয়েই সেই আঁচল সে গায়ে টেনে দিলে, মুখের চেহারা থেকেই জানতে পারলুম যে সে আমার কালীপদর বোন সুখদা।

"সুখদার মা যত পারলেন কাঁদলেন, জন্মের মতন দ্বীপান্তরিত ছেলের কথা উল্লেখ করে তার আচরণের নিন্দা করলেন এবং যারা তাকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে তার চেয়েও অধিকতর পাপে পাপী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যেও তিনি খুবই আশীর্ব্বাদ করতে পেরে উঠলেন না। তারপর অনেক বিলম্বে আর সব কথা চুকিয়ে দিয়ে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের কথা তুল্লেন।

"'সংসার তো' আর চলে না বাবা, যা কিছু ছিল পদ'র মোকদ্দমায় ধরে দিলাম, আইবড় মেয়ে ঘাড়ে, কি করি এখন ?'

"আমি আগে হতেই ভাবছিলাম যে কেমন করে ওকথাটা আমি বলবো, অবশ্য পদর বোনকে চোখে দেখে বলবার ভাবনাটা আমার একটুখানি পরেই গেছলো। কারণ কুৎসিত না হলেও সুখদাকে দেখতে এতই সাধারণ যে, সে দেখেই যে আমি ঘুরে পড়িনি, এটা অন্ততঃ তার মা বিশ্বাস করতে পারবেন। এখন আরও একটু সুযোগ পেয়ে নিঃসঙ্কোচেই বলে ফেল্লুম, "তার জন্যে ভাববেন না, কালীপদ যাবার আগে তার ভার আমার হাতে দিয়ে গেছে, আমিও তার কাছ থেকে নিয়েছি।"

"পদ'র মা কেমন একটু সন্দেহের সঙ্গেই আমার মাথা হ'তে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে কথা কইলেন একটু কুণ্ঠিতভাবে। 'তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে ? এতগুলো পাশ করেছ, অত সুন্দর তুমি, পদর মুখে শুনেছিলাম, তোমার বাপ ছিলেন হাকিম। তুমি কি আমার মতন দুঃখীর মেয়েকে—'

"আমি হাসি চেপে রেখে জবাব দিলুম—'পদ আমায় তার ভার দিয়েছে, বিয়ে যার সঙ্গে হয় হবে, সেতো এক্ষুণিই হ'চ্চে না। তবে ভাল পাত্র না পান তো আমাকেই দেবেন, আমারও তাতে কোন আপত্তি নেই।'

"তারপর সুখদা মায়ের হুকুম মতন আমার জন্যে জলখাবার নিয়ে এসে রেখে দিয়েই চলে গেলে, আমি বল্লুম, 'সুখদাকে দেখতে অনেকটাই কালীপদর মতন, তাই আমার আরও আপত্তি নেই।'

"সুখদার মা এবার যে কান্নাটা কাঁদলেন তারমধ্যে আধখানা দুঃখের এবং আধখানা সুখের। সেই ছেলেই তো তাঁকে মহাদেবের মতন জামাই দিয়ে গিয়েছে!

"মাস পাঁচেক পরে পড়াশোনা সাঙ্গ করে ঘরে এসে বসলুম।

"ওইখানকারই সবজজের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বছর পার হয় চলে আসছিল। মেয়ে আমি দেখেছি, চারুমতীকে দেখতে বোধ করি ভালই হবে। যা একটু বেশী মোটা, তা ধনীর দুলালীরা ওরকম হবেন বই কি! গণে পণে, অলঙ্কার বস্ত্রে, এবং আসবাবপত্রে জজবাবু হাজার দুয়েক টাকা মেয়ের প্রতি খরচ করবেন একথাও নাকি ধার্য্য হয়ে গিয়েছিল। আমি বাড়ী এসে বস্‌তেই তিনি লোক দিয়ে পাকা দেখার দিন ঠিক করে বলে পাঠালেন।

"মা খুব খুসী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হরিষে বিষাদ হলো। মাকে সুখদার কথা ভেঙ্গে বলে জানালুম যে এ বিয়ে করা চলে না। তাদের আমি কথা দিয়েছি। মার মনে যে আঘাত লাগলো সে আমি বুঝেছিলেম। মা আমার এক সন্তানের জননী, কুটুম্বিতার সাধ একটা নারীজন্মের নাকি ঈপ্সিত। যাই হোক তবু আমার কথা বজায় রাখবার জন্যে তাঁর ধনী কুটুম্বের সাধ তিনি ছেড়েই দিলেন। জজবাবু নিজে এসে আমায় ডেকে বল্লেন 'জানো তুমি, তোমার মার নামে আমি 'ব্রিচ অফ্ কণ্ট্রাক্টের কেস' করতে পারি।'

"তা' অবশ্য আমি জান্‌তাম না। আর যতই কিছু পড়িনা কেন, আইনতো আর পড়িনি, জান্‌বো কেমন করে? একটু ভেকা হয়ে রইলুম, তিনি তখন আমায় কাবু দেখে অনেক কথাই বল্লেন এবং তক্ষুণি গালি ফিরিয়ে নিয়ে আমায় 'আশীর্ব্বাদ' করে যেতে যে রাজী আছেন, তাও জানিয়ে দিতে দেরী করলেন না, ততক্ষণে আমার জড়তা কাটলো, আমি বল্লেম, 'আমি আর এক-জনকে কথা দিয়েছি; তারা গরীব অনন্যোপায়, তাদের বঞ্চনা করলে ঈশ্বরের দরবারে আমি দোষী বেশী হবো। আপনার ভাবনা কি?'

"কথাটা খোসামদেরই ছাঁচে ঢালা। তাতেই বাবুটীর রাগ বাড়িলেও মাত্রাটা কিছু যে কম থাকলো সে বোধ করি উহারই জন্য। তিনি রুষ্ট পরিহাসে রূঢ় প্রশ্ন করলেন 'তিনি কার মেয়ে শুনি?' আমি বিনীতবচনে জবাব দিলাম 'তার বাপ ছিলেন......সেরেস্তাদার, একমাত্র ভাইএর রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে, বুড় মা ছাড়া কেউ নেই।'

"জজবাবু যেন আঁৎকে উঠেই উঠে দাঁড়ালেন। রাজদ্রোহের নামেই বোধ করি তাঁর হৃৎকম্প

উপস্থিত হয়ে থাকবে। এবার স্পষ্ট পরিহাসেই বল্লেন 'তাহলে কুটুম্ব নির্ব্বাচনটা করেছ ভাল যাহোক সময় থাকতে খবর পেয়ে ভালই হলো, এনার্কিষ্টের দলে মেয়ে দিয়ে কি শেষে ধনে প্রাণে মারা যেতুম।'

"মার অনুমতি নিয়ে কালীপদর মা বোনকে মার আশ্রয়ে এনে দিলাম। ভাবী পুত্রবধূর মুখ দেখে মা যে আমার খুব উল্লসিত হয়ে উঠেননি, সেতো আমি বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের মাতাপুত্রে কোন আলোচনাই আমরা হ'তে দিইনি। মন তার কল্পনার স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চাইবে বইকি! নিজের ছেলের মস্ত নামওলা শ্বশুর, আর সুন্দরী বউ কোন মা কবে চায়নি? অথচ কর্ত্তব্যের খাতিরে কতকিই না করতে হয়। ক'জনের মা ভরাবুকে বউ ঘরে তুলতে পেরেছেন! সয়ে যাওয়া দরকার,—চুপ করে সবই সয়ে যাওয়া, যা পাই তাকেই যথাসাধ্য ভাল মনে করা—এই টুকুই যে দরকার। ঐ না পারলেই যে মানুষ একেবারে গেল।

"সুখদারা রয়ে গেল, আমি চাকরীর জন্য খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছি, আরও দুটো একটা পাশ টাস দেবারও ইচ্ছে আছে, বিয়ের জন্য সুখদার মা ছাড়া আর কারুযে বিশেষ কোন ত্বরা আছে তারতো কোন লক্ষণই দেখিনে। আমার—হ্যাঁ, তা আমার যে একেবারেই ছিলনা, তাও বলতে পারিনে, আবার ছিলই যে তাও বলবার ভরসা আমার নেই। বিয়ে জিনিষটা সম্বন্ধে খুব বেশী তলিয়ে আমি কোন দিনই ভাবিনি। পাঁচটা পাশ করার সঙ্গে ও'ও যেন একটা দায় চোকান। কিন্তু সুখদাকে আমার ভাল লাগছিল। ভালবাসা একে বলতে হয় বলো আমতো কখনও ভাল-বাসিনি, কাজেই ওনিয়ে তর্ক আমি করতে পারবো না, তবে ভালবাসার বর্ণনা যেখানে যত পড়েছি, তাদের সঙ্গে এ ভালবাসার সম্পর্ক বড় অল্পই। সুখদা থাকে মার অন্তঃপুরে, আমি থাকি হয় সদর বাড়ীতে না হয়তো কলকাতায়। বাড়ীর মধ্যে গেলে কখন কখন সুখদাকে দেখতে পাই। একটু গম্ভীর গম্ভীর চালে সে হয়ত মায়েদের দুজনের পূজোর যোগাড় করছে, না হয়তো পান সাজবার সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছে, মধ্যে মধ্যে পড়াতে বসে মা তাকে 'বোকামেয়ে' বলে অনুযোগ করচেন, তা' শুনতে পেয়ে হাসি চেপে আমি বাইরে পালিয়ে এসে হেসে ফেলেছি। মা আমার ওপোর যা খুসী হচ্চেন, 'গাধা পিটে ঘোড়া বানানো' মুখের কথাটীতো নয়।

"বেশীদিন গেল না। বাবার চাকরী, তাঁর অসময়ে মৃত্যুর সুপারিষে, আমি নাকি পেতে পারতুম, কিন্তু ইচ্ছা হলোনা সেটাকে কাজে লাগাতে। তা'ভিন্ন সেই সবজজবাবু নাকি আমার সম্বন্ধে সরকারের কান ভারী করে রেখেছেন এমনি একটা গুজবও শোনা গেল। আমি নিজের টাকা দিয়ে একটা আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধের দোকান খুলে বসলেম। দেশে এক বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন—মকরধ্বজে সুরকির গুঁড়ো মেশাতে না জানায়, তাঁর কিছুমাত্র পশার ছিল না। তাঁকে দিয়ে খাঁটি মকরধ্বজ তৈরিটা শিখে নেবার চেষ্টা করতে লেগে পড়া গেল। তাঁবে

আমার সহায় করে কস্তুরী ভৈরব বা মহা মৃত্যুঞ্জয় রসে কস্তুরীর বদলে আদা বাটা বন্ধ করে, দেশের লোক যাতে খাঁটি জিনিষটা পায় আর বিলিতি ওষুধের মতন নিঃসঙ্কোচে মারাত্মক রোগীকে খাওয়াতে পারে, তারই জন্যে উঠে পড়ে লাগবো মনে করেছিলেম। তা কপালে তো দেশের সেবা করবার পুণ্য সঞ্চিত করা ছিলনা হবে কি করে?

"আমার কবিরাজখানায় সত্যকার মুক্তাভস্ম, স্বর্ণভস্ম,—করাতের গুঁড়ো নয়,—নিখুঁত নেপালী কস্তুরী এবং যত রকম গাছ গাছড়া পাওয়া সম্ভব ছিল, ক্রমে ক্রমে যোগাড় করে তুলছি, এমন সময় এমন মারাত্মক হয়ে আমাদের দেশে বসন্ত মড়ক দেখা দিলে যে তাঁর কাছে আসল নকল সব রকমের কস্তুরী ভৈরব বা মৃত্যুঞ্জয় রস ভয় পেয়ে পালিয়ে রইলো। হরিনাম সহজে তো কেউ নেয় না। একদিনের মধ্যে অমন পঁচিশবারই কানে শোনা তো যেতই, মুখেও বলতে হয়েছে বই কি পাড়া পড়সীর খাতিরে। মা আমার জন্যে ভয় করলেও নিজে নির্ভয়ে পড়সীর সেবায় ছুটে যেতেন; আমায় এঁটে উঠতে না পেরে কপাল চাপড়ে খুন হতেন, বারণ করতেন না, কেঁদে বলতেন 'ও নিজের কাজ করে রাখচে, বারণ আমি করবো কি করে? বিপদতারণ তো আছেন।'

"প্রথমে এ বাড়ীতে বসন্তের ছোঁয়াছ লাগলো সুখদার মাকে। তাঁর সেবা আমরা তিন জনেই করছিলুম, কিন্তু দুজনেই আমরা একদিনের আড়াআড়িতে দুজনকারই মাকে হারিয়ে ফেল্লেম। সুখদা মেয়ে মানুষ, সে লুটোপুটি করে তার হারানো জিনিষের শোক প্রকাশ করলে, কিন্তু বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি বলে আমার অত বড় ক্ষতি আমার শুধু নিঃশব্দ চোখের জল দিয়েই সাঙ্গ করে নিতে হলো। তার উপর যে মুখের চেয়ে জগতে আমার আর কিছুই সুন্দর ও প্রিয় ছিল না, সেই সব চেয়ে আদরের মুখেই আমার নিজের হাতে,—ভাবতে গেলে সমস্ত মন যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে ওঠে। পেরেছিলুমও তো!

"সুখদার জন্যেই ভেবেছিলুম যে বাড়ী ছেড়ে দুজনে কোথাও পালাব নাকি? এমন সময় আমার পালাবার শক্তি হরণ করে আমার সর্ব্বশরীর ব্যেপে বসন্তর গুটি দেখা দিল। সে কি যন্ত্রণা! উঃ সে কি যন্ত্রণা! বোধ করি শর শয্যা পেতে শুলেও তেমন করে সর্ব্বশরীরে তার ফলাগুলো বেঁধে না। হাজার হাজার ছুঁচ দিয়ে যদি সর্ব্বশরীরের মাংসের মধ্যে ফোঁড় তোলা যায় তাতেও কি অত বেশী যন্ত্রণা দিতে পারে? উপকথার রাজার যেমন চোখে শুদ্ধ ছুঁচ বেঁধা ছিল আমার চোখেও যেন তাই হলো। বিশেষ করে ডান চোখটায়। রোগের খেয়ালে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদে কেবলই মরা মাকে আকুল হয়ে ডেকেছি আর সঙ্গে সঙ্গেই কার অশ্রুজলে ভেজা কাতর স্বর কানে গেছে 'মা, মা, মা শেতলা! ভাল করে দাও মা! মা, মা, মা, মা, ভাল করে দাও মা!'

"যতক্ষণ জ্ঞান ছিল সুখদাকেই অনুভব করছিলুম, দেখবার তো চোখ ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাকে মিনতি করে বলেও ছিলুম 'পালিয়ে যাও সুখদা! কেন অনর্থক প্রাণ দেবে, আমি তো গিয়েইছি।' সে কেঁদে উঠে বলেছিল 'এক সঙ্গেই যাই চলো, একলা আমি দাঁড়াবো কোথায়?

"এই প্রথম আর শেষ কথা আমাকে সে বলেছিল। এর পরেই কোন কথাই আমার আর মনে নেই। আমার যখন জ্ঞান হলো তখন আমার সকল স্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই মনে-নেই কতদিনে কত অল্পে অল্পে আমি আমার সেই মরণ থেকে বেঁচে উঠেছিলুম?

"হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারদের কাছে পরে শুনেছি ডাক্তার যে দিন বজরা করে আস্‌তে আস্‌তে জ্বলন্ত চিতা থেকে আমায় মাটিতে আছড়ে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে আমার জীয়ন্ত দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন, তারপর থেকে প্রায় ছয় মাস পরে আমার পায়ের ঘা শুকিয়ে আমার বাঁচবার আশা দেখা দেয়। এতকাল ধরে হাঁসপাতালের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পড়ে আমি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। প্রাণ জিনিসটা তো কঠিন বড় কম নয়। আচ্ছা এই যে আমি মরে গিয়েও বেঁচে উঠলুম, এর পর থেকে কি আমার পুনর্জন্ম হলো না? আমি কি আর সেই আগের আমিই আছি? মরে যে গিয়েছিলুম, তা বুঝতেই পারা যাচ্চে? পোড়াতে যারা এনেছিল, তারা আমার নিকট বন্ধু কেউ যে নয়, তা চিতায় তুলে দিয়ে প্রস্থান করায় প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু কি ভয়ানক আয়ুর জোর আমার! আর অমন নির্জ্জন শ্মশান ঘাটেও কিনা অতবড় বান্ধব জুটে গেল! সেই গলা পচা বসন্তের রোগী তুলে এনে, দুদিনের পথ বয়ে এনে এই যে ছ মাস ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচাল এ কি বড় সহজ কথা! আমার প্রাণটাকে যদি একটুও মায়া করবার দরকার থাক্‌তো, তা'হলে তাঁকে আমার রোজ পূজা করাই উচিত ছিল, কিন্তু তা না থাক্‌লেও তাঁর দয়ার যে শেষ হয় না তা আমায় স্বীকার তো করতেই হইবে। তাঁর পায়ের তলায় পড়েই এই নূতন জন্মটাকে আমার ক্ষয় করা উচিত ছিল বই কি। কিন্তু তখন কি আর মাথার কোন ঠিক আছে? কে আমি, কি করচি, কোথায় যাব—সবই যে ভুল হয়ে গেছলো। ছ মাসের পর প্রাণের আশা! তারও পর পাঁচ ছয় মাস প্রায় পূর্ণ বিকারে কেটে যায়। উঠতে বসতে পেরেছি নাকি ন'মাস দশমাস পরে। বৎসর দেড়েক আপনা ভোলা হয়ে ছিলুম, অর্থাৎ জীবধর্ম্ম ছাড়া মানুষের ধর্ম্ম কিছুই আমার মধ্যে ছিল না। তবে নিরুপদ্রব বলে পাগলা গারদে না পাঠিয়ে আমার ভগবান আমায় নিজের হাঁসপাতালে ঠাঁই দিয়ে রেখেছিলেন। মানুষ্যত্বের ফিরে আসতে আসতে এই মুখের ছবি আমায় পাগল করে এবার পথে বার করে দিলে। তার পরের কথা আরও যেন খেইহারা, খাপছাড়া; আসল কথা এই যে তখন তো আর আমার কথা বলবার জন্য ডাক্তার সাহেবের কম্পাউণ্ডার বা চাকর বাকর কেউ সাক্ষী হয়ে বসেছিল না। কোথায় কোথায় গেলুম, কবে যেন একবার ভাল হয়ে কোনখানে চাকরী করি; শীতকালটা থাকি ভাল, আবার নাকি পাগলামী ঘাড়ে চাপে, তারা তাড়িয়ে দেয়। এমনি কি কি ঘটেছিল, ঠিক ঠিক মনে না থাকলেও একটু একটু স্মরণে আসে। শেষে যেখানে চাকরী করি, তারাই আমায় পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয় বুঝি। তা' সেখান থেকে বেরিয়ে অবধি আর পাগল হইনি, তবে নূতন ক'রে জ্বরে পড়ে এমন দশা হলো

যে আর খেটে খাবার শক্তি ছিল না। তারপর থেকে সকল কথাই বেশ স্পষ্ট মনে আছে। রাজা আমায় আমার আগের জন্মের মতন মান দিচ্চেন, এর কি আমি যোগ্য ?

"আচ্ছা তা'হলে মানুষের সবচেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য কিসে! সব হারানো, না জ্ঞান হারানো ? বোধ করি জ্ঞান হারানোর মতন পাপের ভোগ আর কিছুতেই নয়। সবই তো আমার জ্ঞানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানই যদি না রইলো তা'হলে আমার সবকে যে আমি হারিয়েছি, তাই আমি জানতে পারলুম কই ? দুঃখ জিনিষটা যে সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য তাও তো নয়।" 'দুঃখকেও ভোগ করতে একটা সুখ আছে। আমার যে মা আমার ইহ জন্মের আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তাঁর বিয়োগ দুঃখকে যদি আমার মন নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দেয় তা'হলে আমার পুত্র জন্ম সার্থক হবে কোথা দিয়ে ? না না থাক্, হে ভগবান! আমার এই অসীম দুঃখের পর্ব্বত তুমি ভেঙ্গে দিও না। যদি কেউ দুঃখের মধ্যে বিস্মৃতির কামনা করে, জেনো সে ভুক্তভোগী নয় বলেই করতে পেরেচে। আমার দুঃখ! আমার ব্যথা! আমার মনে তুমি পদ্মের মৃণাল হয়ে ওঠো, গোলাপের কাঁটা হয়ে থাকো, —তোমায় যেন আর ভুলি না। কিন্তু এই দুঃখকে বরণ করে নিতে আমি শিখলুম কোথা থেকে বলো দেখি ? সেও একটি দুঃখী মেয়েরই কাছে। সে আমার মেয়ে হয়েছে। কিন্তু তাকে আমি মোটে চিনিনে। নাইবা চিনলুম ? এ ভবের হাটে কেইবা কা'কে চিনবে ? যার সঙ্গে যখন মেলা যায়। গঙ্গার ধারে গাছ তলায় ভোরের পাখীর মতন সে একটি আনন্দের গান গাইছিল। দুঃখ থেকেও যে আনন্দের রস ছড়িয়ে পড়ে, আর তা আঁজলা ভরে পান করা যায়, তা সেই দিনেই বুঝে নিয়েছি। নাঃ আর যা' হই, পাগল আর হবো না। এইটেই বিধাতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

"একটা জায়গায় বড্ডই খট্‌কা লাগে। সুখদার মুখ যেন এ বাড়ীর রাণীর মুখে কে এনে বসিয়ে দিয়েছে! তার গলার শব্দও তারই চুরি করা!—এ' কেমন করে হলো ? আচ্ছা সুখদা মরে গিয়েছে বলে যে আমার ধারণা হয়েছিল, সেটাই কি ঠিক! কিসে জানলুম! কেউ কি বলেছিল! কিন্তু বলবেই বা কে ? আমার পুরণো জগৎ থেকে কেউ তো আমার এই নূতন জগতে দেখা দিতে আসেনি! তা'হলে সে কি শুধু আমার মনেরই কল্পনা ? তা'হলে কি আমার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্যে আমি এমন করেই অবহেলা করলুম! সুখদার তা'হলে কি হলো ? সে তো কম দিনও নয়। পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে নিঃসহায়া সুখদাকে কে দেখলে ? খবর নেবো, কিন্তু কেমন করে ? আমি যে মরে গেছি। মরা মানুষের চিঠি পেলে জাল বলেই লোকে উড়িয়ে দেবে। নিজে যাব ? বিশ্বাস করবে কেউ ? আবার হয়তো পাগলা গারদে ভর্ত্তি হবো। বাড়ী ঘর টাকা কড়ি ছিল তো সবই,—তা কি তার থাকতে পেরেছে, না আমার জ্ঞাতিরাই দখল করলে ? যদি জানতে পারতুম আমার সুখদা এই রাণী পরিমলের মতনই কোন দয়ালু স্বামীর হাতে পড়ে সুখী আছে, আমি বাঁচতুম যে তা'হলে। আমি যে তার তার নিইছিলুম।

—কাল সংবাদপত্রে দেখলুম, যুদ্ধ জয়ের জন্য রাজনৈতিক অনেক অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হচ্চে! আহা আমার কালীপদ যদি আবার ফিরে আসে!—কিন্তু তাকেই বা সুখদার কথা আমি কি বল্‌বো?"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

তোমার সে আশার হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ!
হৃদয় দিব তারি সনে!

—কথা।

নরেশ নিজের পাঠাগারে বসিয়া একখানা বই খুলিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ভাবিতেছিল সে সুষমার কথা। সাধুজী ও নিরঞ্জনের সঙ্গে সুষমা অযোধ্যা যাইতেছে। সেখানে সাধুজী যে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন তাহাই সুষমার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থল। নরেশ অনেকখানি হাঁপ ছাড়িল। ঐ দুজন লোককে সে একার্য্যের যথার্থ উপযুক্ত শুদ্ধচিত্ত বলিয়াই জানে। মনেমনে ওঁদের কার্য্য সফলতার কামনা করিলেন, মনে মনে সুষমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এজন্মটা তোমার এই রকম করেই কাটিয়ে নাও, এবার যেন নিরাপদ হও, শান্তি পাও।"

উহাদের আরব্ধ কর্ম্মের জন্য সাধুজী তাঁহার নিকট চাঁদা চাহিয়াছেন, তিনি একখানা চেকবই টানিয়া লইয়া দশ হাজার টাকা সই করিলেন, টাকাটা সমিতির ধনভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইবে।

পরিমল ঘরে ঢুকিয়া কথা কহিলে নরেশ চমকিয়া উঠিলেন, অশ্রু পরিপ্লুত এবং কি ভাঙ্গিয়া পড়া সে কণ্ঠস্বর!

"আমায় একবার সঙ্গে করে সুষমার বাড়ী নিয়ে যাবে! তার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসবো,—আর—আর—যাঁকে—যাঁকে না চিনে—না জেনে—"

"পরিমল! কি বল্‌চো তুমি? তুমি সুষমার বাড়ী যাবে তার কাছে ক্ষমা চাইতে?"

পরিমল রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, "শুধু তার কাছেই নয়; তার চেয়েও বেশী অপরাধী আমি যাঁর কাছে; তাঁর পায়ের ধূলো না নিয়ে এলে আমি যে স্থির হ'তে পারছিনে।" পরিমল সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নরেশ চেয়ার হইতে সবেগে উঠিয়া পড়িলেন "পরিমল! পরিমল! কার কথা তুমি বল্‌চো? আমিতো বুঝতে পারছিনা!" ক্রন্দনবিবশা পরিমল একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তুমি কি করে বুঝ্‌তে পারবে? তুমিতো চেনো না। কিন্তু আমি, আমি কি করে তাঁকে অত অযত্ন করেছিলুম! আমি কি

করে তাঁকে চিন্‌তে পেরেও চিন্‌তে পারিনি? গরীব নিরঞ্জন বলেই না অমন তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম, তিনি যে আমার মায়ের আনা রোগ ঘেঁটে নিজে রোগে পড়েছিলেন, তাঁকে যে মরামানুষ মনে করে আমিই দাহ করতে নিয়ে যেতে দিয়েছি, উঃ আমি কি! আমি কি! আমি কি!"

হাবড়া ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম্মে পা দিয়াই নরেশের সঙ্গে সাধুজীর দলের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। সাধু সানন্দে চেঁচাইয়া উঠিলেন "এই যে রাজা আমাদের তুলে দিতে এসেছেন! জয়োস্তু!"

সাধুজীর সঙ্গে স্বাগত শেষ করিয়া নরেশ দুই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল নিরঞ্জনের দিকে। নিরঞ্জন এত লোকের মধ্যে তার মতন লোকের এতটা খাতির অশোভন হয় দেখিয়া নত হইয়া নরেশের পদধূলি লইতে গেলে নরেশ তাহাকে উত্তপ্ত গাঢ় আলিঙ্গনে একেবারে বুকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, কৃত্রিম কোপে হাসিয়া ধমক দিলেন "আবার বদ্‌মাইসি!"

তার পর ইহাঁরা ষ্টেশনের একপ্রান্তে একটু ভিড় ছাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, নরেশ বলিলেন, "নিরঞ্জন! মুক্তেশ্বর রায়ের নায়েব দেওয়ান ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র যে মহাপাতক করেছিলেন, তাঁর সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ সম্পত্তির অর্দ্ধেকটা অর্থাৎ যেটা তিনি মুনিবের কাছ থেকে লাভ করে ছিলেন সেটা আমি বিষয়ের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে এনেছি, নিতেই হবে। তোমার বাবা রত্নেশ্বরবাবু সেই সম্পত্তি হাতে পেয়েও একদিন আমার বাবাকে ছেড়ে দেন; সেই উপলক্ষে তিনি যে চিটিখানি লেখেন, আমি বড় হয়ে সেখানি সযত্নে তুলে রেখেছি। সে চিঠি পেয়েই আমি তোমার খোঁজে গিয়ে জানতে পারি যে তুমি মারা গেছ, এবং আর কোন পথ না পেয়ে যদি কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয় ভেবে তোমারই শেষ চিহ্ন বলে তোমার পরিত্যক্তা "—

নিরঞ্জনের পা টলিয়া সে বসিয়া পড়িতেছিল, নরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া নিকটস্থ বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিলেন। গৈরিকধারিণী সুষমা দূরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্ত্তা সবিস্ময়ে শুনিতেছিল; নিরঞ্জনের সুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হইতে গিয়া সে সাশ্চর্য্যে দেখিল, নিকটস্থ মেয়েদের বিশ্রামাগার হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া একটী তাহারই বয়সী মেয়ে সেই আধপাগলা নিরঞ্জনের পায়ের কাছে পড়িয়া অশ্রুপরিপ্লুতমুখে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"রমেশ দাদা! আমায় কি আপনি চিন্‌তে পারচেন না? আমিতো মরিনি,—আমিই যে পোড়ারমুখী সুখদা।"

সমাপ্ত।

শ্রীঅনুরূপা দেবী

অরূপ

কত জ্যোৎস্না পূর্ণিমার, কত বসন্তের
প্রস্ফুটিত বনশ্রীর স্নিগ্ধ শ্যামলিমা,
কুসুমের বর্ণচ্ছটা, কত অরুণিমা
উষার কপোলে আর ভালে সায়াহ্নের,
নির্ণিমেষে আঁখি মোর করিয়াছে পান।
কত রূপসীর রূপে ভ্রমরের মত
লুটিয়াছে রূপ মধু; এ মুগ্ধ নয়ান
পরাণের মধুচক্রে ভরিয়াছে কত
নয়নের চয়নিকা,—হাসির নির্য্যাস,
অধরের লোধ্রাসব; যৌবন-দোদুল
তরুণীর অঙ্গভরা তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
রূপ সিন্ধু রচিয়াছে অতল অকূল,
এই নয়নের কোণে! রূপের কাজলে
অরূপের শোভা আজি নয়নে উথলে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র একদিন নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া সম্মুখবর্ত্তী বাষ্পীয় পোতের গতির সহিত মহাপুরুষের আবির্ভাবের তুলনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষের আবির্ভাবে সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠে, লোকবিশ্বাস ও রীতিনীতি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একবার এইরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আমাদের শাস্ত্রানুসারে কলিযুগ সর্ব্ব যুগাধম, ইহার তিন পাদ পরিমিত পাপ, এক পাদ মাত্র পুণ্য। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়াছেন,—

নমামি কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
যে যুগে হরিনাম হইল প্রচার॥

যিনি এই হরিনাম প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবানরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার লীলা বর্ণনা করিবার জন্য অনেক ভক্ত পরম উৎসাহে ও অসামান্য নিষ্ঠা ও নিপুণতাসহকারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা কালে ভক্তগণের লেখনীমুখে শত ধারায় ভক্তি উছলিয়া উঠিয়াছে; আপনাদের ইষ্টদেবের সংশ্লিষ্ট সাধু সজ্জনের প্রসঙ্গেও তাঁহারা ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছেন। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের এই নিষ্ঠা ও ভক্তি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে দুর্ল্লভ ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সমাজমধ্যে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন বিশ্বাস আনয়ন করিয়াছিলেন।

যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থকার নূতন প্রবাহে বঙ্গদেশ সিক্ত ও উর্ব্বর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অন্যতম। চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনার প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের সামাজিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; বঙ্গ সমাজ চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে কিরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষয় পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের বর্ণনা লইয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। নবদ্বীপ ইষ্টদেবের জন্মভূমি বলিয়া তাঁহার নিকট অতি পবিত্ররূপে পরিগণিত ছিল; নবদ্বীপের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা সে চিত্র প্রদর্শন করিতেছি,—

"নবদ্বীপের সম্পদ বর্ণনা দুঃসাধ্য। গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে। নবদ্বীপে এক এক জাতীয় লক্ষ লক্ষ লোকের বাস। সরস্বতীর প্রসাদে সকলেই [শাস্ত্রাদিতে] মহাদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। সকলেই মহা অধ্যাপক বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই স্থানের বালকগণও [অন্য স্থানের] ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ পণ্ডিতকুলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। নানা দেশ হইতে লোকে বিদ্যার্থ নবদ্বীপে উপস্থিত হয়, নবদ্বীপে পাঠ শেষ হইলেই তাহাদের বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হয়। এজন্য নবদ্বীপে সংখ্যাতীত শিক্ষার্থীর বাস। নবদ্বীপে লক্ষ কোটী অধ্যাপক বাস করেন। লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতে সকলেই সুখে বাস করিতেছেন।"

বৃন্দাবন দাস একদিকে নবদ্বীপের জনবল, ধনবল ও বিদ্যাবলের ঐরূপ উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়াছেন, অন্য দিকে নবদ্বীপের ধর্ম্মহীনতা ও ভক্তিশূন্যতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নবদ্বীপবাসীরা কেবল বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া বৃথা কাল হরণ করিতেছে। সকল সংসার কৃষ্ণরামভক্তিশূন্য। কলিযুগের প্রারম্ভেই তাহার শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহিয়াই লোকে ধর্ম্ম কর্ম্ম শেষ করিতেছে। কেহ কেহ দম্ভ প্রকাশ করিয়া বিষহরির পূজা করিতেছে। বহু ধন দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মিত হইতেছে। অনেকে পুত্র কন্যার বিবাহে ধন নষ্ট করিতেছে। এইরূপে বৃথায় কাল যাইতেছে। যাহারা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র, তাঁহাদের অবস্থাও এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা শাস্ত্র পড়াইয়াও এই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং শ্রোতার সহিত একত্র যমপাশে ডুবিয়া মরেন। সকলেই যুগধর্ম্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করিতে বিরত রহিয়াছেন। সকলের মুখেই কেবল নিন্দা শুনা যায়, গুণের ব্যাখ্যা দুর্লভ। যাঁহারা বিরক্ত অভিমানী, তপস্বী, তাঁহারাও হরিধ্বনি করিতে বিরত রহিয়াছেন। যাঁহারা গীতা ভাগবতের অধ্যাপনা করেন, তাঁহারাও ভক্তির ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক বোধ করেন। যিনি স্নানের সময় গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষের নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারই অত্যন্ত সুকৃতি বলিতে হইবে। এইমত সকল সংসার বিষ্ণুমায়ায় মোহিত রহিয়াছে। [লোকের মায়া মোহ এতদূর

বর্দ্ধিত হইয়াছে যে,] কেহ কেহ নানা উপহারে বাশুলী দেবীর পূজা এবং মদ্য মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিতেছে।

নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল,
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।"

যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য। নবদ্বীপে শিক্ষার্থী ছাত্রদের স্বভাবও অতি চঞ্চল ছিল। বৃন্দাবন দাস ইহার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"নবদ্বীপে অসংখ্য ছাত্র বাস করে। তাহারা প্রাতঃকালে পাঠ শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। এই সময় এক অধ্যাপকের শিষ্য অন্য অধ্যাপকের শিষ্যের সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করে। [এইরূপে গঙ্গার ঘাট সর্ব্বদা কলহে পূর্ণ থাকে।] কেহ বলে, তোমার গুরুর বুদ্ধি নাই; দেখ, আমি যাহার শিষ্য, তিনি কেমন বিদ্বান। এইরূপে অল্পে অল্পে গালাগালি আরম্ভ হয়। তারপর জল ফেলাফেলি এবং বালু ছিটাছিটি উপস্থিত হয়। তারপর যে যাহাকে পারে, তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে থাকে। কেহ কেহ কর্দ্দম দ্বারা ঢেলাঢেলি করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ কেহ রাজার দোহাই দিয়া বিবাদকারীদিগকে ধরিতে যায়। কেহ কেহ প্রহার করিয়া গঙ্গার অপর তীরে পলায়ন করে। ছাত্রদের তাণ্ডবে গঙ্গার জল মলিন হইয়া যায়।

জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন॥"

কেবল যে নবদ্বীপেই ধর্ম্মহীনতা, ভক্তিশূন্যতা, দাম্ভিকতা, বিষয়াসক্তি এবং কদাচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে। দেশের সকল স্থানেরই ঐরূপ এক দশাই ছিল। তৎকালে পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতেন, তিনি ছাত্রবৃন্দ লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। চৈতন্যদেবের সময়ে এইরূপ একজন পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস এই পণ্ডিতের দাম্ভিকতা এবং অবশেষে চৈতন্যদেবের নিকট তাঁহার পরাজয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা প্রারম্ভটুকু উদ্ধৃত করিতেছি,—

এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি। হস্তি ঘোড়া দোলা অনেক সংহতি।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বলে সরস্বতী ধরি॥ সম্প্রতি আসিয়া হৈল নবদ্বীপ স্থিতি॥
নবদ্বীপ আপনার প্রতিদ্বন্দী চায়।
নহে জয় পত্র মাগে সকল সভায়॥

এই গেল পণ্ডিত মণ্ডলীর দাম্ভিকতার কথা। অন্যান্য বিষয়ে সমাজ কিরূপ দূষিত হইয়াছিল, আমরা তাহা লিখিতেছি,—

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ রাঢ়দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ় দেশ ॥

মহাপ্রভুর আগমনে রাঢ় দেশ ধন্য হইয়াছিল; কিন্তু তিনি দেশবাসীর কৃষ্ণভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছিলেন,—

দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম।
কাহার মুখেতে না শুনিনু হরিনাম ॥
কার মুখে নাহি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ।
প্রভু বলে হেন দেশে আইলাম কেন ॥

তৎকালে দেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বৃন্দাবন দাসের রচনা হইতে আরো কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দেবতা জানেন সব ষষ্ঠী বিষ হরি।
তাহারে সেবেন সবে মহা দম্ভ করি ॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্যমনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন।
কেনবা কৃষ্ণের নৃত্য কেনবা ক্রন্দন ॥
বিষ্ণু মায়া বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহা তমোগুণে ॥

দেশের এই দুর্দ্দিনে অদ্বৈত আচার্য্য এবং শ্রীবাসপ্রমুখ ভক্তগণ নবদ্বীপ নগরে সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেম-কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীবাস এবং তাহার তিন ভ্রাতা রাত্রিকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান করিতেন। ইহাতে প্রতিবাসিগণ ঈর্ষ্যান্বিত এবং ভয়ব্যাকুল হইয়া কীর্ত্তনকারীদিগকে ভর্ৎসনা করিত। তাহাদের ভয়ের কারণ এই ছিল যে, পাষণ্ডদের কীর্ত্তনে গ্রাম উৎসাদিত হইবে। কারণ মহাতীব্র মোসলমান এই স্থানের অধিপতি। তাহারা এ কীর্ত্তন শুনিলে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমাদ ঘটাইবে। প্রতিবাসীদের কেহ বলিত, ইহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেও। কেহ বলিত, এই ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিলে মঙ্গল হইবে। অন্যথা মোসলমান রাজা গ্রামে বল প্রকাশ করিবে। নবদ্বীপবাসীদের এই আশঙ্কা হইতে সময় সময় জনরব উত্থিত হইত।

আজি আমি দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌ আইসে হেথা ॥
শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হইল রাজার আদেশ ॥

মোসলমানের নৌকা যথার্থই আসিয়াছিল, এরূপ কোন উল্লেখ নাই। যে সকল বৈষ্ণব-দ্বেষী, বাশুলী পূজা উপলক্ষে "নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল" করিয়াও নিরাপদ থাকিত,

তাহারা হরিসংকীর্ত্তনে কিজন্য মোসলমান অধিপতির ক্রোধ উপর্জিত হইবে বিবেচনা করিয়াছিল, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব।

ঐ সমস্ত জনরব ভিত্তিহীন ছিল। বৈষ্ণবগণ বিনাবাধায় হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবদের সঙ্গে নবদ্বীপের কাজির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে ধর ধর আজি করো কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
আথে ব্যথে পলাইল নাগরিকগণ।
মহা ত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি কয় আজি দৈবে হইল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লইব জাতি।
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লইয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥

কাজির অত্যাচারে নবদ্বীপে হরিসংকীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল; তখন একদিন সন্ধ্যাকালে চৈতন্যদেব সমস্ত দল বল সহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহে উপনীত হইলেন।

ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডালি ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি হরি বলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বোলে নাচে সব শ্রুতি মূলে দিয়া॥
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ে অগ্নি দেহ চারি ভিতে।

কিন্তু শিষ্যবর্গের অনুরোধে অগ্নি দেওয়া হয় নাই।

দেশাধিকারীর প্রতিনিধি বলিয়া গর্ব্বিত এবং আর্য্য-ধর্ম্মদ্বেষী কাজির সম্মুখে বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন করাতেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি ধরপাকড় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমত প্রথম উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে অনুমিত হয়। চৈতন্যদেব এই উৎপীড়নের যে প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, তাহা গুরুতর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই কার্য্য তাঁহার আচরিত ধর্ম্মের বিরোধী ছিল। আমরা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

তৃণ হতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরু সম সহিষ্ণু বৈষ্ণব করিব।
ভৎসনা তাড়নে কারে কিছু না বলিব॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

চৈতন্যভাগবতের বিবরণের সহিত চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণের অনৈক্য আছে। আমাদের নিকট চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই বিবরণে চৈতন্যদেব নম্ররূপে চিত্রিত হইয়াছেন। আমরা ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি,—

কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজি লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজির ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজি বোলাইলা॥
দূর হইতে আইলা কাজি মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥

অতঃপর মহাপ্রভু কাজির সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিচারের শেষভাগে কাজি বলিয়া উঠিলেন,

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর রহুক তোমাতে ভকতি॥

মোসলমান কাজির চৈতন্যদেবের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তির কারণ বুঝাইবার জন্য স্বপ্ন ও অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে। কাজি স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পাইকেরা হরিসংকীর্ত্তন নিষেধ করিতে যাইয়া অনেক প্রকার অলৌকিক ঘটনা দেখিয়াছিল। তৎকালের মোসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ আর্য্যধর্ম্মের প্রতি এরূপ বিদ্বেষী ছিলেন যে, তাঁহারা ঐ ধর্ম্মাবলম্বীর নিষ্ঠা এবং অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন, লোকে এমত বিশ্বাস করিতে পারিতনা। কাজির সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনকালে প্রকাশ পায় যে, একদিন পাঁচশত নবদ্বীপবাসী কাজির নিকট আসিয়াছিল।

আসি কহে হিন্দুধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু দেখি নাই॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥

মোসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ আর্য্যধর্ম্মের নূতন রূপ ও প্রবলতা দেখিয়া কুপিত হইবেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল। কেবল যে সাধারণ লোকের মধ্যেই এইরূপ ভাব ছিল, তাহা নহে; দেশের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও ঐরূপ ধারণা ছিল। কারণ দেশমধ্যে কোনপ্রকার নূতন তেজ ও অনুরাগ এবং তজ্জনিত জনপ্রবাহ উপস্থিত হইলে তাহা বৈদেশিক রাজার ভীতির সঞ্চার করে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণঅন্তে দেশভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে উপনীত হন। এই স্থানে রূপসনাতনের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হয়। দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণকালে বলিয়াছিলেন,

ইহাঁ হতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই কতিপয় "পাষণ্ডী" নদীয়াবাসী চৈতন্যদেব এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের দমন জন্য কাজির নিকট প্রার্থী হইয়াছিল। এই অদূরদর্শিতা চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে ছিল। তারপর দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবগণের অসমীচীনতা অর্থাৎ কাজির সম্মুখে হরিসংকীর্ত্তন নিবন্ধন তিনি কুপিত হইয়া তাহা বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের কাজির গৃহে গমন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনের ফলে ঐ প্রতিকূলতা দূর হইয়াছিল।

কাজি কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥

এজন্য বোধ হয় যে, মোসলমান শাসনপতিদের আর্য্য-ধর্ম্মের প্রতি যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্ম-দ্বেষ সে মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই এবং তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের নাশ জন্য কোন বিশেষ উৎপীড়ন করেন নাই।

বঙ্গদেশ মোহাচ্ছন্ন; মদ্য ও মাংস তাহার ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ; এইরূপ দুঃসময়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রেমভক্তি প্রচার জন্য নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। বৈষ্ণব সমাজের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, "কারুণ্যহৃদয়" অদ্বৈত আচার্য্য ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন এবং জীবের উদ্ধার জন্য চিন্তা করিয়া ভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তের বাঞ্ছা কল্পতরু নবদ্বীপে নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের পরাভব হয় যখন যেখানে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর কারণ বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গো পাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলি যুগে ধর্ম্ম হয় হরিসংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

এই কহে ভাগবত সর্ব্বতত্ত্বসার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

অবতারবাদ বাঙ্গালী জাতির মজ্জাগত। তাঁহারা দশ অবতারে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। এদেশে আরো কত অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রদীপ্তভাস্করতেজে এখনও লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিকট প্রকট রহিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সমসময়ে বঙ্গদেশে আবার অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন:—

উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি কেহ বলে আপনারে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে এক মহা ব্রহ্মদত্ত আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্য বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে সেই ছার শোচ্যতর॥

বৃন্দাবন দাস অবতার গোপালকে শিয়াল বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন অবতারকে এইরূপ বিদ্রূপ করিতে পারেন নাই; কেবল বিনয়নম্রবচনে প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ কখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচারিত করেন নাই। কেবল তাঁহার ভক্তগণ ঐরূপ বিশ্বাস করিত।

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—

ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া॥

একদিন অদ্বৈত আচার্য্য চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন,

যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়॥
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে॥

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অন্য অবতারের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আরো অবতার হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার ধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া তিনি চৈতন্যদেবের উক্তিরূপে নিম্নলিখিত বাক্যটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এইমত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥

চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবানের অবতাররূপে মহাপ্রভু নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার নিম্নেই নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের স্থান। ইহারা প্রভু নামে সেবিত। নিতাই অধিকতর ভক্তিভাজন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেই আদি যুগে অনেক বৈষ্ণব নিত্যানন্দের নিন্দা করিতেন এবং তাঁহার বিরোধী ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে স্বর্ণ অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করিতেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার নিন্দার কারণ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

বৃন্দাবনদাস রোষগর্ভ ভাষায় নিত্যানন্দের নিন্দুকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন এবং অভিশাপ দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা অতি তীব্র ছিল। তিনি নিত্যানন্দের নিন্দুকদিগকে দুষ্ট, পাপিষ্ঠ এবং পাষণ্ড নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মহিমা প্রচার জন্য চৈতন্যদেবের নিম্নলিখিত বাক্যাবলী গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছেন।

দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইবে যমঘর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক কারণে॥

বৃন্দাবন দাস আর এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

গ্রন্থ পড়ি মুখ মুড়ি করে বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥

বৃন্দাবন দাস আবার লিখিয়াছেন :—

সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।
সবে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তি পদ পায়॥
কোন পাকে নিত্যানন্দে যদি করে হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে সেইজন গেলা॥

এইরূপ বহুস্থানে বৃন্দাবন দাস কখনও চৈতন্যদেবের মুখে, কখনও নিজমুখে নিত্যানন্দের নিন্দুকদের প্রতি রোষাগ্নি বর্ষণ করিয়াছেন।

তৎকালের বহু লোকের নিকট নিত্যানন্দপ্রভু নিন্দিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার প্রতি চৈতন্য-দেবের অগাধ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসের হস্তে নবদ্বীপে প্রেমভক্তি প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

হরি নামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

যে প্রভু করিলা সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার।
করুণা সমুদ্র যাহা বহি নাহি আর॥
যাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারা ব্যক্ত চৈতন্য মহত্ত্ব॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রভু নিত্যানন্দ এবং মহাভক্ত হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ আর হরিদাস গৃহে গৃহে যাইতেছেন, আর বলিতেছেন, তোমরা সকলে হরিনাম কর, ভজ কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ। যাহারা সজ্জন, তাহারা কৃষ্ণনাম শুনিয়া বড় আনন্দ পাইতেছে।

অপরূপ শুনি লোক দুজনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে॥
করিব করিব কেহ বলায় সন্তোষে।
কেহ বলে ক্ষিপ্ত দুইজন মন্ত্র দোষে॥
যে গুলা চৈতন্য নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে মার মার॥
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে।
আমা সব পাগল করিতে আইলে কিসে॥
ভব্য সভ্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥

নিত্যানন্দ ও হরিদাস অসামান্য অনুরাগ ও প্রবল উৎসাহে নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। মহাপাষণ্ড জগাই মাধাইর উদ্ধার হইল। কিন্তু সাধারণতঃ নদীয়াবাসী চৈতন্য-দেব এবং তাঁহার প্রেমভক্তি হইতে দূরে রহিল। বৃন্দাবন দাস ক্ষুব্ধচিত্তে লিখিয়াছেন,—

শ্রীবাসের দাসদাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও তাহা কিছু না জানিল॥
মুরারি গুপ্তের দাসে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একজনে না জানিল॥

চৈতন্যদেব একদিন নিত্যানন্দকে নিভৃতে বলিলেন, আমি জীবের উদ্ধারের জন্য আগমন করিয়াছি। কিন্তু জীবের উদ্ধার হইল না, তাহারা আমাকে ঈর্ষা করেন। তাহাদের মোহপাশ আরও দৃঢ় হইল। আমি শিখা সূত্র সব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। এই ভিক্ষার অর্থ—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

অতঃপর কেশ মুণ্ডন করিয়া চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কেশ মুণ্ডন দেখিয়া ভক্তবৃন্দ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কেহ কহে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাথিয়া কি দিব তা উপরে॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন।
কেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আর বার।
আসন কি দিয়া কিবা করিব সংস্কার॥
হরি হরি বলি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥

ভক্তবৃন্দের এই বিলাপ মহাপ্রভুর সহিত বিচ্ছেদসম্ভাবনাজনিত,—অন্তর্যন্ত্রণার বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। এই যন্ত্রণা গৌরাঙ্গ সুন্দরের সুন্দর কেশরাজির মুণ্ডন অবলম্বন করিয়া বাহির হওয়াতে আমরা এই অনুমান করি যে, তৎকালের ভব্য সমাজে কেশ সংস্কার ও বিন্যাস অতি প্রিয় কার্য্য ছিল।

চব্বিশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর ছয় বৎসর তিনি দেশ পর্য্যটন করেন। গৌড় হইতে নীলাচল, সেতুবন্ধ ও বৃন্দাবন পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করেন। তারপর তিনি আঠার বৎসর শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন। তাঁহার প্রথমবার নীলাচল গমনকালে বাঙ্গালার মোসলমান সুলতান উড়িষ্যাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। একজন ভক্ত চৈতন্যদেবকে এই যুদ্ধের সময় উড়িষ্যায় গমন করিতে নিষেধ করিতেছেন :—

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয়॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥
দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহা দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥

হাণ্টার সাহেব তাঁহার উড়িষ্যা নামক ইতিহাস গ্রন্থে বাঙ্গালার এবং অন্যান্য দেশের মোসলমান কর্ত্তৃক উড়িষ্যার নিষ্ফল আক্রমণের বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের সমসময়ে বাঙ্গালার সুলতান হোসেন শাহ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্যভাগবতের আর একটি বিবরণও প্রচলিত বিশ্বাসবিরোধী। আমাদের দেশের চিরকাল প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বাঙ্গালার মোসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যার দেব

দেবীর মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে এই কার্য্য সুলতান হোসেন শাহে আরোপিত হইয়াছে।

যে হুসেন শাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপি এবে না মানয়ে যত অন্ধ॥

বাঙ্গলা উড়িষ্যার যুদ্ধ এবং দেবদেবীর মূর্ত্তির দুর্দ্দশার যে বিবরণ বৃন্দাবনদাস দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই বৎসর পর চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। তখনও ঐ ঘটনার স্মৃতি দেশমধ্যে উজ্জ্বল ছিল। এরূপও হইতে পারে যে, প্রথমে সুলতান হোসেন শাহের আদেশে এবং দ্বিতীয় বার উড়িষ্যা জয়কালে কালাপাহাড়ের তাণ্ডবে দেব দেবীর মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়াছিল।

শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিতিকালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেম ভক্তি প্রচার জন্য পুনরায় নিয়োজিত করেন।

একদিন শ্রীগৌর সুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বর চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী বহুস্থানে গমনপূর্ব্বক প্রেম ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামে প্রেম ভক্তি প্রচারের যে বিবরণ চৈতন্যভাগবতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি,—

সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিস্তারে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদ পদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেম ধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার।

নবদ্বীপে প্রচারের বিবরণ এইরূপ :—

নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী।
কত মত লোক আছে অন্ত নাহি জানি॥
হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী॥
তথি মধ্যে দুর্জ্জন যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে।
তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণেও রতি মতি অতি হৈলে অমায়ায়॥

আপনে চৈতন্ত কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥

সম্ভবতঃ এই প্রচার কালেই তাঁহার একদল নিন্দুক জুটিয়াছিল। কারণ এই সময় তিনি শালিগ্রামবাসী সূর্য্যদাস সারখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করেন এবং অঙ্গে অলঙ্কার পরেন।

সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর। মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥ সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥

সুকৃতি অলঙ্কার দিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতি নিন্দা রটাইয়াছিলেন। এই নিন্দা রটিয়াছিল মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে—

প্রভু বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥

না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ। আমিত তোমায় অঙ্গে ভক্তি রস বিনে।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্যবাদ॥ অন্য নাহি দেখি কায় বাক্য মনে॥

বস্তুতঃ নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তিবিহ্বলতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহার ভক্তিবিহ্বলতা কখনও কখনও উদ্দামতায় পরিণত হইত। নিত্যানন্দ আবাল্য সন্ন্যাসী; বাল্যকালে তাঁহাকে একজন সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে এই মহাভিক্ষা দানের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্ন্যাসীর প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন সম্ভাবিত পাপ ভয়, অগাধ অপত্যস্নেহ এবং তাহার বিচ্ছেদজনিত অসহ্য ব্যাকুলতা এবং পতির উপর পত্নীর একান্ত নির্ভর যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা উদ্ধৃত করিতেছি,—

ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার। প্রাণ ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার॥ না দিলেও সর্ব্বনাশ হয় হেন বাসী॥
ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন। ভিক্ষুকের পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
সংহতি আমার নাহিক ভাল ব্রাহ্মণ॥ প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
এই যে সকলজ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার। রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥ পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন॥
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে। যদ্যপিও রাম বিনে রাজা নাহি জিয়ে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥ তথাপি দিলেন এই পুরাণেতে কহে॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর। সেইত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥ ধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে॥

দৈবে সেই বস্তু কেনে নহিব সে মতি।
অন্যথা লক্ষণ যার গৃহেতে উৎপত্তি
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥
আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
ন্যাসীরে দিলয়ে পুত্র নোয়াইয়া মাথা॥
নিতানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসীবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভুমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইয়া বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়ো ওঝা হইল পাগল॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যের প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥

নিত্যানন্দ কতদিন সন্ন্যাসীর সহিত যাপন করিয়াছিলেন, তাহা লিখিত নাই। কিন্তু তিনি আর গৃহে ফিরিয়া আইসেন নাই; ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তারপর নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন এবং বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করেন। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হইতে হইল এবে সবার মোচন॥

মহাপ্রভু মূর্খ নীচ দরিদ্রকে "প্রেমসুখে ভাসাইতে" প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ এই প্রতিজ্ঞা সার্থক করেন, বাঙ্গলার নিম্নস্তরে ধর্ম্ম দেন। এজন্য আমাদের দেশে গৌর নিতাই নাম একত্র সংযুক্ত হইয়াছে। নিম্নস্তরে প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছিল; ইহাই বাঙ্গালী জাতিকে মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋণদান। বৃন্দাবন দাস যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "যত ভট্টাচার্য্য একজনে না জাগিল," সে আক্ষেপ চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় আর ঘুচে নাই। মহাপ্রভু বাঙ্গলার উচ্চশ্রেণীতে বহু ভক্ত লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি বলিতে হইবে যে, সে সময়ের ভদ্রসমাজে চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে নাই।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের ৪০ বৎসর পরে রামচন্দ্র কবিরাজ নামক তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনার সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং নরোত্তমদাস ঠাকুর বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার জন্য ব্রতী ছিলেন। তাঁহাদের সাধনায় বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। সে ধর্ম্মের ধারা আর শুষ্ক হয় নাই; তবে নির্ঝরিণীর মত প্রসারতা লাভের সঙ্গে আবিল হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত নিম্নশ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর কিয়দংশকে সিক্ত করিয়া গিয়াছে।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যচরিত বর্ণন কালে তাঁহার জন্ম উপলক্ষে ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন, যজ্ঞসূত্র ধারণ এবং বিবাহের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যেন বর্ত্তমান সময়ের ঐ

সকল ক্রিয়ার বিবরণ পড়িতেছি। অবশ্য স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। আর একটি বিষয়ের পার্থক্য দেখা যায়; চৈতন্যদেবের ঐ সকল ক্রিয়া উপলক্ষে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, প্রতিবাসিবর্গ আসিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। সেরূপ আনন্দ, সেরূপ আমোদ বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল আনন্দ-উচ্ছ্বসিত উৎসবের বিবরণ পাঠ করিলে মনে বড় কৌতুক ও প্রীতি উপস্থিত হয়।

তৎকালের বৈষ্ণবগণ শচী ঠাকুরাণী, লক্ষ্মী দেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে অতিশয় সম্মান ও ভক্তি করিতেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের সাধারণতঃ নারী জাতির প্রতি কিরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করিলে যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা বড় অনুকূল নহে।

একদিন পিতলের বাটি নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে ॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর * চিত্তেতে জন্মিল ॥
বাটী থুই সেই কাক আইল আরবার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার ॥
মহাতীব্র ঠাকুর পণ্ডিত ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত পাত্র হইল অপহার ॥
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি।
নাহিক উপায় কিছু কান্দয়ে মালিনী ॥

চৈতন্য দেবের পরিবারগণ শুদ্ধাচারী ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের আদর্শ এইরূপ—

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বারবার ॥
সনাতন জানিল এই প্রভুর না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

কিন্তু পরিবারদের মধ্যে দুই এক জন বিলাসীও ছিলেন। তাঁহারা বিলাসে মগ্ন হইয়াও ধর্ম্মোৎসাহে মত্ত থাকিতেন। চৈতন্যভাগবতে একজন পরিবারের বিলাসিতার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥
তাই দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে।
পট্টনেত্র বালিস শোভয়ে চারি পাশে ॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত ॥
দিব্য আল বাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খায় গদাধর দেখি দেখি হাসে ॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুইজনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥
চন্দনের উর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি কাগুবিন্দু মিলে।
কি কহিব সে কেশ ভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকী বহি নাহি আর ॥

সে কালের বিলাসিতার আদর্শের সহিত এখনকার বিলাসিতার আদর্শের তুলনা করিয়া দেখিলে এই দরিদ্র দেশের মঙ্গল হইবে।

---

* শ্রীরাম পণ্ডিতের পত্নী।

বৃন্দাবনদাস স্বচক্ষে চৈতন্যদেবকে দেখেন নাই। এজন্য তিনি গ্রন্থ মধ্যে পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ করিয়াছেন। "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন।" তিনি কি অসাধারণ অনুরাগ ও প্রবল উৎসাহে চৈতন্যদেব এবং তাঁহার অন্তরঙ্গগণের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ উপলব্ধ করিতে হইলে ঐ গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক। সমালোচনা দ্বারা তাহা বুঝান কঠিন। বৃন্দাবন দাস শব্দ সম্পদের অধিকারী ছিলেন ; আমরা একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি,—

কালাগ্রির নাট্যশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান ॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নব গুঞ্জন সহিত কুন্তল মনোহর ॥
বিচিত্র ময়ুরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি ॥

হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর ॥
নীল স্তম্ভ জিনি ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণি হার ॥
কি কহিব যে পীত ধটির পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ন ॥

আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন ভিতে ॥

এইরূপ শব্দসম্পদ লইয়া বৃন্দাবনদাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের প্রতি অগাধ ভক্তি এবং তাঁহাদের মাহাত্ম্য জনসমাজে প্রচার জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন তাঁহার যে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস ছিল, তাহা বর্ণিত বিষয় মধ্যে ভাষা দ্বারা যথাযথরূপে প্রকাশ পাইতেছে না বিশ্বাসে, একটি সঙ্কোচ এবং অতৃপ্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি চৈতন্যদেবের অবতারত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এই অবতারত্বের প্রতিষ্ঠা এবং চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ তিনি অলৌকিক ঘটনারাশি দ্বারা গ্রন্থ কলেবর পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের বিদ্বেষীদিগকে পুনঃ পুনঃ তীব্র কটূক্তি করিয়াছেন। অলৌকিকতা এবং কটূক্তিতে গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই অলৌকিকতা এবং কটূক্তির মধ্য দিয়াও চৈতন্যদেবের যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। সে মূর্ত্তি কখনও বাল্য-চাপল্যে উচ্ছৃঙ্খল, কখনও বিদ্যাগর্ব্বে উচ্ছল, কখনও বন্ধু ও পত্নীপ্রেমে কোমল, কখনও পত্নীশোকে রুদ্ধশিখর আগ্নেয়গিরির মত নিশ্চল, কখনও মাতৃ-ভক্তিতে নির্ম্মল, কখনও ত্যাগে উজ্জ্বল, কখনও প্রেম-ভক্তিতে বাহ্যশূন্য বিহ্বল, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ হৃদয় শোণিমায় আরক্তিম, প্রাণময়, সুন্দর ও মনোহর। সে মূর্ত্তির অন্তরাত্মা চৈতন্য দেব সবলে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে সিংহাসন পাতিয়া উপবেশন করেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত

মধ্য আফ্রিকার নরমাংসখাদক জাতি

স্বজাতীয় জীবের মাংস ভক্ষণের প্রথা অনেক হীন জাতীয় জন্তুর মধ্যেও দেখা যায় না। বিড়াল বা কুকুরের মাংস বিড়াল বা কুকুরে ভক্ষণ করে, এরূপ দেখা যায় না। জাহাজের নাবিকগণ খাদ্যাভাব প্রযুক্ত অনাহারক্লিষ্ট হইয়া অন্য উপায়াভাবে পরিশেষে দলস্থ লোকদিগের মধ্য হইতে একজনকে সংহার করিয়া ভক্ষণ করার কথা ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইলেও, ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ নরমাংস ভক্ষণের প্রথা পৃথিবীর কুত্রাপি প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

শ্মশান নৃত্য—মধ্য আফ্রিকা।

ক্যাপ্টেন্ গি বারোস্ (Captain Guy Burrows) পৃথিবীর বহুস্থানে ভ্রমণকালে নরমাংস ভোজীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ (১) মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের বর্ণিত বিষয় মূলতঃ তাহা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলেন, যে সকল মনুষ্য-মাংস-খাদক জাতিদের তিনি দেখিয়াছেন, তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তিই এই কদর্য্য প্রথার কারণ নহে। এই কার্য্যের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অদ্ভুত ভাব

(১) The Land of the Pigmies.

বিজড়িত আছে। আত্মীয়দের মাংস ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ এবং কোন কোন নরভোজীদের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এই মাংস আহার নিষিদ্ধ।

এই অসভ্যদের মনোবৃত্তি বা মনুষ্য জনোচিত আভ্যন্তরীণ সদ্‌গুণাবলীর সম্বন্ধে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে স্বভাবতঃ বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু লেখক, স্বচক্ষে তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া, তাহাদের দয়া ও স্নেহ-প্রবণতার অনেক পরিচয় পাইয়াছেন। নর-খাদক বলিলেই যে একটা ভয়ানক স্বভাবের কাল্পনিক চিত্র মানসপটে উদয় হয়, তাহা তাহাদের অন্য কার্য্যাদিতে পরিলক্ষিত হয় না, বা এই আহার জনিত কোন অস্বাভাবিকতাই তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। হারবার্ট ওয়ার্ডও তাঁহার গ্রন্থে (১) উক্ত ভাবের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও ঐ জাতির মধ্যে স্নেহ মমতা, স্ত্রীপুত্র পালন প্রবৃত্তি, প্রভৃতি গুণরাজির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি নিকটবর্ত্তী কোন কোন অন্য জাতিদের তুলনায় তাহাদের চরিত্রের উপকর্ষের কথাই বলিয়াছেন।

নরমাংস খাদকজাতির মেয়েদের মালা পরিয়া শোভাযাত্রা।

উক্ত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ মধ্য আফ্রিকার খর্ব্বাকৃতি জাতিদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। খাদ্যাভাব হেতু তাহারা অনশনকেও বরণ করিতে প্রস্তুত, তথাপি নরমাংস ভক্ষণের কথা কল্পনাও করিতে পারে না। এদিকে তাহারা এতই অসভ্য যে, পরিষ্কাররূপে গৃহনির্ম্মাণ, ভূমিকর্ষণ বা কোন শিল্পই তাহারা বিদিত নহে। তাহারা শিকার, মৎস্য ধরা বা ফাঁদ পাতিয়া বন্য জীবজন্তু ধরা লইয়াই থাকে। কসাটি নামক অপর একজন লেখক ও তাঁহার বৃত্তান্ত (২) মধ্যে তাহাদের নরমাংসে বীতস্পৃহার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার পার্ক নামক একজন লেখক তাঁহার গ্রন্থমধ্যে (৩) বলিয়াছেন, যে উক্ত বামন জাতিদের মধ্যেও মনুষ্যমাংস ভোজন প্রচলিত আছে, তবে তাহা সাধারণভাবে নহে। ক্যাপ্টেন্ বারো, এ কথার ভিতর কোন সত্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, বহুকাল তিনি ঐ বামন জাতির মধ্যে বাস

(১) Five years among the Congo Cannibals.

(২) Ten years in Equatorial Africa.

(৩) Experience in Equatorial Africa.

করিবার এবং তাহাদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু নরমাংস ভোজনের একটীও দৃষ্টান্ত তাঁহার নয়ন বা শ্রবণ গোচর হয় নাই।

সুবিখ্যাত পরিব্রাজক লিভিংষ্টোন নরমাংস খাদকদের দৈহিক গঠন ও আকার অবয়বাদির সম্বন্ধেও তাহাদিগকে সুন্দরাকৃতি ও সুগঠিত দেহবিশিষ্ট জাতি বলিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া দেখিলে যথাযথভাবে রন্ধন করা হইলে, নরমাংস মানুষের দেহের পক্ষে পুষ্টিকর না হইবার কোন কারণ নাই। লিভিংস্টোন্ সাহেব বলেন, উক্ত সকল বিষয় মধ্যে বিচিত্রতা কিছুমাত্র নাই; আশ্চর্য্য এই, যে স্থান বিবিধ জীবজন্তু ও অন্যান্য ভোজ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ, সেখানেও এ বীভৎস প্রথা প্রচলিত।

নরভুক্‌দের মল্লযুদ্ধ (মধ্য-আফরিকা)।

সভ্যতা বিস্তার ও শাসন প্রভাবে নরমাংসভুক্ জাতিদের মধ্যে ক্রমেই এই রাক্ষসসুলভ কার্য্যের বিলোপ সাধিত হইতেছে। মধ্য আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে এই জাতি বহুলপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয়, ক্রমশঃ তাহারা এই কুৎসিৎ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেছে এবং তাহাদের বর্ব্বরতার জন্য অপরের নিকট লজ্জিত হইতেছে। তাহারা বুঝিয়াছে প্রকৃত মনুষ্য সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে আসন পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের এই হীন অভ্যাস পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

ইহাদের সম্বন্ধে অনেকে লিখিয়া যাইলেও, এই প্রথার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ভৌগলিক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, যে, ইউরোপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং আমেরিকার প্রাচীন অসভ্যদের মধ্যে আরও অধিকপরিমাণে ইহার প্রচলন ছিল; কিন্তু প্রাচীন প্রস্তরযুগের পূর্ব্বে ইহার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষের সময় নরমাংস মানুষের ভক্ষ্যরূপে ব্যবহারের কথার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে এই প্রথা প্রথম কোন বিশেষ প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত হইয়া পরে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কঙ্গোফ্রিষ্টেটের সেনিমাল্যাণ্ড ও অপরাপর স্থানে ধর্ম্মকর্ম্মমূলক নরবলি, নরভোজন বা রাক্ষস বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তথায় যাহা প্রচলিত আছে তাহা স্বেচ্ছাকৃত। যে কোন কারণ হইতেই উহা আরব্ধ হইয়া থাকুক, কোন একটা সংস্কার বা ধর্ম্মসংমিশ্রিত ব্যাপার ইহার মূলে

নরভুক্‌দের শালতি-বিহার।

নাই। তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদের নরমাংসপ্রিয়তার কথা গোপন রাখিবারও কোন চেষ্টা করে না। সেখানে শাক্-সবজি, শস্য ও আহারের উপযোগী জীবজন্তু প্রভূতপরিমাণে পাওয়া সত্ত্বেও এই বীভৎস প্রথা প্রচলিত থাকা, লেখকের মতে উহা তাহাদের চরিত্র-ভ্রষ্টতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। তথাপি তিনি বলেন তাহাদের ইহা স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, নচেৎ ইহার দ্বারা তাহাদের যে কোন উন্নতি পথের বাধা উপস্থিত হইতেছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না।

তথাকার ক্যাঙ্গালা প্রদেশে নরমাংস লোলুপদিগের দ্বারা গোর হইতে মৃতের দেহ অপহরণের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত নরখাদক বলিতে তাহাদেরই বুঝিতে হয়। সেখানে যুদ্ধে হত ব্যক্তিদের বা মৃত শত্রুদের দেহ ভক্ষণ করিয়াই তাহারা নিরস্ত নহে; মানুষকে হত্যা করিয়াও তাহারা উদর পূরণ করিয়া থাকে।

ক্যাঙ্গালায় নরমাংস আহারোপযোগী করিবার জন্য তাহারা যে প্রক্রিয়া করিয়া থাকে তাহা অতীব নিষ্ঠুর এবং তেমনই অদ্ভুত। অপরাধী কয়েদী কিম্বা ক্রীতদাসদিগকেই সাধারণতঃ আহারের জন্য বধ করা হইয়া থাকে, কিন্তু এ কার্য্য একেবারে সংসাধিত হয় না। বধ্য ব্যক্তিকে বধ করিবার তিন দিন পূর্ব্বে তাহার হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহার মস্তকের সহিত একখানি কাষ্ঠখণ্ড বাঁধিয়া তাহাকে কোন জলাশয়ে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা হয়। যদিও মনে হয়, এই ব্যাপারের পশ্চাতে কোন সংস্কার বা কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এই প্রকরণ দ্বারা দেহের মাংস কোমল হইয়া থাকে, এই বিশ্বাস বশতঃ আহারীয়কে উপাদেয় করণ মানসে তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে। তৃতীয় দিবসে তাহাকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া বধ করা হয়।

নরমাংস রন্ধনের জন্যও তাহারা বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। প্রথমতঃ দেহ হইতে মস্তকটী বিচ্ছিন্ন করা হয়। তৎপরে বেশ করিয়া পরিষ্কার করণান্তর ভস্মাচ্ছাদিত জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর সংস্থাপিত করিয়া সমস্ত দেহটী ঝলসাইয়া লওয়া হয়। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত লোমগুলি পুড়িয়া যায়, ততক্ষণ উহা অগ্নির উপর সংরক্ষিত হয়। এইবার গোটা দেহটাকে প্রত্যেক অস্থি সংযোগস্থলে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয় এবং তৎপরে আবশ্যক পরিমাণ মাংস লইয়া, একটী বৃহৎ পাত্রে রন্ধন করা হয়। অবশিষ্টাংশ অগ্নুত্তাপে শুষ্ক করিয়া ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোককে সাধারণতঃ আহারের জন্য বধ করা হয় না, তবে যদ্যপি স্থানান্তরে গমনকালে কোন রমণী ভ্রমণে অপটুতা বশতঃ, দলভ্রষ্ট হয়, তবে তাহার আর নিস্তার নাই। তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বধ করিয়া রন্ধন পূর্ব্বক ভক্ষণ করা হইয়া থাকে। দেশান্তরে গমন কালে দলস্থ খঞ্জ ও পীড়িতদের জন্যও ঐ ব্যবস্থা। ভক্ষণের জন্য নারীদের কখন বধ করা না হইলেও দৈবক্রমে যদি কোন নারী গুলির আঘাতে হত হয়, তাহার দেহও পরিত্যক্ত হয় না।

মৃতের মস্তক আহারের জন্য কখন গৃহীত হয় না, কেবল তাহা হইতে দন্তগুলি তাহাদের গলার হার বা অন্য অলঙ্কাররূপে ব্যবহারের জন্য লওয়া হয়, এবং হত ব্যক্তির মাথার কেশ যদি নিগ্রোসুলভ মোটা না হয় তাহা হইলে তাহারা সেই কেশ সংগ্রহ করিয়া থাকে। অবশেষে নরমুণ্ডগুলি গ্রামের চতুঃপার্শ্বে এক একটী খুঁটীর উপর সংস্থাপিত করিয়া রাখে। অনেক সময় ঢাকের ছাউনির জন্য দেহ হইতে চামড়া পৃথক করিয়া লইয়া থাকে।

অনেকস্থলে একটা সংস্কার আছে যে শত্রুর হৃদ্‌পিণ্ড ভক্ষণ করিলে শত্রুর সাহস এবং বাহুর মাংস ভক্ষণ করিলে তাহার বল বিক্রমের অধিকারী হইতে পারা যায়। মধ্য-আফ্রিকাবাসী নরমাংস ভোজীদের মধ্যে এরূপ কোন সংস্কার নাই।

অতি সংক্ষেপে এই সকল অদ্ভুত জাতিদের কথা বলা হইল। যাঁহারা ইহাদের বিষয় বিষদরূপে জানিতে উৎসুক, তাঁহারা প্রবন্ধ মধ্যে উল্লিখিত পরিব্রাজক ও লেখকদিগের ঐ সকল গ্রন্থপাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীহরিহর শেঠ

এক ফোঁটা গল্প

রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে 'খেয়ালী' লোক—তা জানতাম। কিন্তু তাঁর খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে তা' ভাবিনি।

সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণপত্র পেলাম—শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠিটা পেয়ে আমার কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগ্‌ল। ভাবলাম—শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হলে আমি কি একটা খবর পেতাম না ? আমি হলাম এদিককার ডাক্তার।

যাই হোক্ যখন নিমন্ত্রণ করেছেন তখন যেতেই হবে—গেলামও। গিয়ে দেখি শ্যামবাবু গলায় কাছা নিয়ে স্বয়ং সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া।

আমাকে দেখেই বল্লেন—"আসুন ডাক্তার বাবু—আস্তাজ্ঞে হোক্।" দু'চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার মায়ের হয়েছিল কি ? আমাকে একটা খবর দিলেও ত পার্ত্তেন।"

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"ও, আপনি শোনেননি বুঝি ! আমার মা ত আমার ছেলে বেলাতেই মারা গেছেন। তাঁকে আমার মনেও নেই। ইনি আমার আর এক মা—সত্যিকারের মা ছিলেন"—ভদ্রলোকের গলা কাঁপতে লাগ্‌ল।

আমি বল্লাম—"কি রকম ? কে তিনি ?"

তিনি বল্লেন—"আমার মঙ্গলা গাই। আমার মা কবে ছেলে বেলায় মারা গেছেন মনে নেই। সেই থেকে ওই গাইটাই ত আমাকে এত বড় করে তুলেছে। ওরি দুধে আমার দেহ মন পুষ্ট ! আমার সেই মা এতদিন পরে আমায় ছেড়ে গেলেন ডাক্তার বাবু।" এই বলেই তিনি হু হু করে কেঁদে ফেল্লেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

"বনফুল"

"চন্দ্রগুপ্ত"-এর গান *

[রচনা——————স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্-এ]

(অষ্টম গীত)

ছায়া।

বাগেশ্রী মিশ্র ——————একতালা।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি'।
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি'।
তব শত মনোরথে, তোমার কিরণপথে,
দাঁড়াব না আমি আসি' তোমার করুণা মাগি'।
তুমি শুধু সুখে থাক,——আমি কিছু চাহি নাক,—
শুধু দূরে, অনাদরে, র'ব তব অনুরাগী ॥

[স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

	০	..	..	১			২		
II{	।	মপপা	র্সর্সা |	-ধণা	ধঃ	পাঃ I	মা	রঃ	-জ্ঞাঃ
		সকল্	ব্যথা	০র্	ব্য	থী	আ	মি	০

		০			১		
[রা	জ্ঞা	-া |	া	া	রা | জ্ঞা	মমা	পপা I
হ	ই	০	০	০	তু মি	হও	সব্

* এ গানটি শেষ গান। অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের মত স্বরলিপি করা হইল।

——লেখিকা।

২´ ৩ ০
I র্রা -া -া | -া -া -া | া া র্সা |
মি • • • • • • • আ

১ ২´ ৩
| র্সা র্সনা র্সা I র্সর্রা র্সা -া | ণধা ণা -া |
মি আ• কি অ• ধো • মু• খে •

০ ১ ২´
| া া ধা | ধা ধা ধণা I পা পধণা ধা |
• • তো মা র শি• র রে•• আ

৩ ০ ১
| পা -া -া} {া া র্সা | র্সা র্রা র্রা I
গি • • • • ত ব শ ত

২´ ১ ০
I র্পা র্পা -র্মর্পা | র্মা র্জ্ঞা -া | া া র্জ্ঞা |
ম নো •• র থে • • • তো

১ ২´ ৩
| র্জ্ঞা র্মা র্মা I র্রা র্রা -র্জ্ঞর্রা | র্সনা র্সা -া |
মা র কি র ণ •• প• থে •

০ ১ ২´
| -া -া সা | সা রা রা I পা পা মপা |
• • দাঁ ড়া ব না আ মি আ•

৩ ০ ১
| মঃ -জ্ঞাঃ া | া জ্ঞা মপধণা | ণা -া ণা I
সি • • • তো মা••• র • ক

২´ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা -মা | রা সা -া} II
রু ণা • মা গি •

II{। । মা | পা না না I না না -ধনসা |
তু মি শু ধু সু খে

| না র্সা -া | -া । না | র্সা র্রা র্রা I
থা ক আ মি কি ছু

I র্সর্রা র্সা -ণা | ধা পা -া}|{-া । মা |
চা হি না ক শু

| মা পা পা I ধা ধা -া | -পধা -পধণা ধা |
ধু হু রে অ না হ

| পা -া -া | -া । । I মা মা -া |
য়ে য় ব

| -া । জ্ঞরা | জ্ঞা -া -া | -া । । I
ভ ব

I জ্ঞা রজ্ঞা -মা | -জ্ঞমপা -মপধা -পধণা | -ধণর্সা -ণর্সর্রা -র্সর্রজ্ঞা |
অ হু

| -রজ্ঞমা -জ্ঞমপাঃ পাঃ I র্মজ্ঞা -র্রসা -ণধা | -মপধা -ণা -া}IIII
রা গী

পূজার তত্ত্ব

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

পূজার তত্ত্ব আসিয়াছে। মনি অর্ডারে ৫০৲টি টাকা ও কূপনে লেখা আছে "পূজার তত্ত্বের জন্য।"

রামসদয় বাবু তাহা আসিয়া হৈমবতীকে দিলেন। সেই সঙ্গে একখানি পত্র দিলেন ও একটি পার্শ্বেল দিলেন। হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কিসের টাকা?"

রামসদয় বাবু। নরেশের শ্বশুর পাঠিয়েছেন—পূজার তত্ত্বের টাকা।

হৈমবতী ক্রোধের সহিত টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এই পূজার তত্ত্ব? আমার চাপরাশীরা যে এর চেয়ে ভাল দেয়। আমি এ অপমানের তত্ত্ব নেবো না। টাকা ফেরত দাও—এখনি পাঠিয়ে দাও।"

রামসদয় বাবু। ফেরত আবার কি দেব? আমি তা পারব না, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। —বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

হৈমবতী নরেশচন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দাসীর দ্বারা সেই পার্শ্বেলটি খুলিয়া দেখিলেন, জামাইয়ের জন্য ধুতি চাদর ও এক খানা লাল চওড়া পেড়ে সাড়ী—তাতে 'বেহান ঠাকুরাণী' লেখা। অন্য কাহারো কাপড় নাই। রাগে তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। নরেশ আসিবামাত্র বলিলেন, "নরেশ এই দেখ তোমার শ্বশুরের কীর্ত্তি। আমাদের কি করে অপমান করেছে দেখ। এই ৫০৲টি টাকা পূজার তত্ত্বের জন্যে পাঠিয়েছে। এমন জামাইয়ের এই আদর। আর এই ধুতি চাদর, ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্নার কথা, নূতন জামাই, ভাল ঢাকাই ধুতি চাদর দাও, নয় জরি পেড়ে দাও। তা নয় শুধু পাড়ের দিশি ধুতি চাদর। আর এই ক্যাটকেটে লাল পেড়ে সাড়ী দিয়েছেন আমার জন্য। কৃপণ আর কি! এর চেয়ে আমাদের চাকররা ভাল তত্ত্ব করে। হায় হায় কি কুবুদ্ধিই হল, কি অঘরের মেয়েকেই ঘরে এনেছি। রূপ দেখতে গিয়েই কি ভুল করেছি। এখন বসে বসে রূপ ধুয়ে খাই।"

নরেশ মার মনের মত কথা বলিল "আমার গলায় ছুরী দিয়েছ। একটা জন্তু এনে আমার সর্ব্বনাশ করেছ। না জানে একটা কথা কইতে, না পারে কিছু বুঝতে, কেবল 'মা আর বাবা' যাও ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে আমার আর ওকে দরকার নাই।"

হৈমবতী। পোড়া কপাল অমন বাপ মার। আমার হাত পা কেটে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে। চৌধুরীরা কত সাধাসাধি কল্লে, কত হাতে পায়ে ধরলে। তাদের মেয়েটি কালো, তা কালো হলেই বা ক্ষতি কি হত? কলকাতার মেয়ে বেশ চালাক চটপটে হত, বেশ হত। কত দেওয়া থোয়া কর্ত্ত। কলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী। কত সামগ্রী পাওয়া যেত, জিনিস পত্তরে ঘর থই থই কর্ত্ত, খাট বিছানা টেবিল চেয়ার সব দিত। তা না করে একি করলাম বল দেখি নরেশ?

নরেশ। বেশ ভালই করেছ।

হৈমবতী। নে এখন টাকাকটা শীগ্‌গীর ফিরিয়ে দে। কাপড়গুলাও পার্শ্বেল করে ফিরিয়ে দে। লিখে দে আমরা এসব চাইনে।

নরেশ। বাবা যদি রাগ করেন?

হৈমবতী। তোমার তাতে ভয় কিসের, আমি বলছি লিখে দে। রাগ করে আমি বুঝে নেব।

গৃহিণীর প্রতাপে কর্ত্তা সর্ব্বদা জোড়হস্ত নরেশ তাহা বেশ জানিত, তাড়াতাড়ি মনি অর্ডার করিল ও পার্শ্বেলটি ফেরত দিল।

একদিন দুপুর বেলা মনি অর্ডারটি ও পার্শ্বেলটি নীরদচন্দ্র ফিরিয়া পাইলেন। তিনি তাহা লইয়া ললিতার মায়ের নিকট গিয়া বলিলেন "দেখ পূজার তত্ত্বের যা টাকা পাঠিয়েছিলাম ফিরে এসেছে, পার্শ্বেলটিও এসেছে। উপরে জামাই বাবাজীর হাতের লেখা। তাঁরা কিরকম ভদ্র লোক তা একবার দেখ। কেবল টাকাই বুঝলেন। একবার অন্যের মর্ম্মবেদনা বুঝবার ক্ষমতা হল না। তাঁদের কি মেয়ে নাই?"

জগৎমোহিনী। তখনি ত বলেছিলাম ৫০ টাকা বড় কম হল, আরো কিছু দাও, আমার কথা ত শোন না তাই এমন হল।

নীরদচন্দ্র। মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি চুরি কর্ত্তে বল নাকি? ধারে যে আকণ্ঠ ডুবে গেছি। তোমার হাতের চুড়ি কয়গাছি পর্য্যন্ত যে বেচেছি। আমার মত লোককে সব সময় ধার দেবেই বা কে বল? আমিত আর সেধে কিছু পাঠাব না। তুমি চিটি লিখে জান কেন তাঁরা টাকা ফেরত দিলেন।

ললিতার মা অনেক অনুনয় বিনয় করে পত্র দিলেন, ও কেন টাকা ফেরত দিয়াছেন তাহাও জানিতে চাহিলেন। কিছুদিন পরে তাহার উত্তর আসিল, "৫০৲ টাকার তত্ত্ব আমরা লইতে পারিব না। টাকা দেবার কোনও আবশ্যক নাই। বরের উপযুক্ত কাপড় ইত্যাদি সব কিনে পাঠানই উচিত ছিল। আমাদের ঘরে দাসী চাকরেও এমন অগ্রাহ্য করিয়া টাকা পাঠায় না। এই ৫০৲টি টাকা পাঠাইয়া এমন অপমান করা কেন? বড় ঘরে যখন মেয়ে দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল,

তখন জানা উচিত ছিল সেই ঘরের মতই আদর ব্যবহার করিতে হইবে। যদি সে ভাবে চলিবার ক্ষমতা না থাকে জামাইয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিবার আবশ্যক নাই, এবং ভবিষ্যতে মেয়ের মুখ দেখিবারও আশা নাই। অমন ঘরে পুত্রবধূকে পাঠাইয়া তাহার শিক্ষাবিকৃতি হইতে দেওয়া হইবে না" ইত্যাদি।

নীরদচন্দ্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, দারুণ অপমানে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বেয়ানের নাম স্বাক্ষরিত পত্র বটে, কিন্তু হস্তাক্ষর নরেশচন্দ্রের, তাহা দেখিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলেন, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি যেন লোপ পাইল। তাহা দেখিয়া জগৎমোহিনী বলিলেন "অমন করে রইলে যে—এর উপায় কি হবে?"

নীরদচন্দ্র শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন "উপায় আর কি হবে? মনে কর লতি আর আমাদের নাই"।

জগৎমোহিনী। বালাই ষাট, অমন কথা মুখে এনোনা, লতি আমার বেঁচে থাক, সুখে থাক। তবে তত্ত্বের কি হবে?

নীরদচন্দ্র। লিখে দাও এর বেশী আমরা আর পারিবনা। যখন বিয়ে হয়েছিল, পূজার তত্ত্বের সময় কত দেওয়া হবে তাত কড়ার করা হয় নাই, বা তার লেখা পড়াও হয় নাই। আমার যা ক্ষমতায় হবে তাইত দিব? এতে জোর জবরদস্তি করা কেন? এযে ঘৃণা ও লজ্জার কথা। অত বড় চাকরী করেন তবু এ অর্থের লালসা কেন? ভগবানের এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি! আমরা কি মেয়ে বিক্রি করেছি যে এত ভয়? এখন না হয় এর পর কি এর বিচার হবে না? আমাদের দেশে দিনে দিনে যে কি ঘোর লালসা বেড়ে উঠছে তা বলে কাজ নাই। ক্রমে ক্রমে এটা যেন একটা ব্যবসায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের সমাজ উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, এই কন্যাদায়ের জন্য যদি হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ না হয় ত আমি কি বলেছি। এই অত্যাচার লোক কত সহ্য করিবে? ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া যাইবে। মেয়েদের এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া সবাই ক্রমে সমাজের বন্ধন কাটাইতে ব্যস্ত হইবে। তবুত দেশের মায়েদের চেতনা হয় না। তাঁরা এ সংস্কারকে কত সুখের কর্ত্তে পার্ত্তেন, কিন্তু সেই সংসারে কি আগুনই তাঁরা জ্বালিয়ে তুলেছেন।

উভয়ের দুঃখে কষ্টে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ললিতার মা পুনরায় অনেক অনুনয় বিনয় করে পত্র দিলেন ও তন্মধ্যে স্বামীর অগোচরে আরও ২০টি টাকা দিয়া দিলেন, ও লিখিলেন "এবার যেন অনুগ্রহ করে আর ফিরত না দেন।" এবার পত্র রেজিষ্টারী করিয়া পাঠান হইল। পুনরায় সে পত্র টাকা ও পার্শেল ফেরত আসিল।

(৫)

দিনের পর দিন যায় ললিতার আর কোনও পত্র আসে না। ললিতার মা পত্রের পর পত্র লেখেন সে সকল পত্রের উত্তর নাই। ললিতার ভাই বোনে পত্র দেয়, কোন পত্রেরও জবাব নাই।

ক্রমে সেই সকল পত্রও ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ললিতার মা কন্যার জন্য ভাবিয়া রোগে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

নীরদচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আত্মীয় বন্ধুদের নিকট হইতে সংবাদ লইতেন, ক্রমে তাঁহারাও সংবাদ দিতে পারিলেন না।

নীরদচন্দ্র বৈবাহিককে অগ্রহায়ণ মাসে কন্যাকে আনিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র দিলেন, সে পত্র ফিরিয়া আসিল।

এই প্রকারে বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। কোন উপায়েই আর তাঁহারা সংবাদ পাইলেন না। মেয়ের বিবাহ দিয়া তাঁহারা যেন চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছেন, জীবনের শান্তি নষ্ট হইয়া গেল। কেবল মনে হইত, আহা মেয়েটার যদি বিবাহ না দিতাম, দুমুঠো ভাত খাইয়া বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত। এ কি শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিয়া দিয়া এ কি করিলাম। একমাত্র সেই অন্তর্য্যামী বিধাতা ভিন্ন জগতে এ দুঃখ ঘুচাইবার কেহ রহিল না। আর সেই বালিকা ললিতা—সে পিঞ্জরের বিহঙ্গিনীর মত বড়লোক শ্বশুরের বাটীতে ছটফট করিতে লাগিল। বাপ মার কোন সংবাদ পায় না, একখান হাতের লেখা চিঠি পায় না। চিঠি লিখিবার হুকুম নাই। পাশ করা উচ্চ শিক্ষিত স্বামী, স্ত্রীর সহিত প্রণয়ের কথা বলিতেই ব্যস্ত, তার অন্তরের ব্যথা বুঝিবার শক্তি নাই। নিজে মার দুলাল হইয়া, মার আদর উপভোগ করিতেছে, কিন্তু একবারও বালিকার মর্ম্মব্যথা বুঝিবার শক্তি নাই। ইহাই উচ্চ শিক্ষার ফল। যদি ঘরে ঘরে এমন শিক্ষিত লোকের প্রসারতা বাড়িত, তাহলে সংসার মরুভূমি হইয়া যাইত। ঈশ্বরের এই দয়া যে তাঁর সৃষ্টিতে এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিরল। কোথায় স্নেহে আদরে বালিকা বধূকে বশ করিবে, তা নয় মনুসংহিতা হইতে হিন্দু স্ত্রীর কি কর্ত্তব্য পালনীয় তাহাই শিখাইতে ব্যস্ত। ললিতা সেই সব বড় বড় পুস্তকের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, কোনও অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ভালবাসায় বন্য পশুও বশ মানে, লেকচারে কিছু হয় না। ভালবাসিলেই ভালবাসা পাওয়া যায়, সুশিক্ষিত নরেশচন্দ্র এই সরল পথ ধরিলেই সুখী হইতেন।

এদিকে হৈমবতী পাড়া-প্রতিবাসিনীদের ডাকিয়া গৌরবের সহিত বলেন—"বৌ-মা আমার বড় লক্ষ্মী ; বাপের বাড়ী একদিনও যেতে চায় না। যে বাপ মার ছিরি,—ভুলে নামও করেনা।"

ললিতা ভয়ে চুপচাপ করিয়া থাকিত, কাহারও সম্মুখে চখের জল ফেলিবার হুকুম নাই। গোপনে স্নানের ঘরে গিয়া কক্ষ রুদ্ধ করিয়া, কাঁদিয়া প্রাণের জ্বালা নিভাইত।

প্রতিবাসিনীদের মধ্যে একজন নূতন লোক আসিয়া ছিলেন, তিনি ললিতার মাকে জানিতেন। তিনি গোপনে ললিতার মাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। কোনও সূত্রে নরেশচন্দ্রের জননী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন—"বৌমার সঙ্গে আড়ালে অমন কথাবার্ত্তা তাঁর ভাল লাগেনা।" প্রতিবাসিনী ভদ্রঘরের কন্যা, সে কথায় তিনি তাঁহাদের বাটী আসা ত্যাগ করিলেন।

এমন সময় সহসা নীরদচন্দ্র সংবাদ পাইলেন তাঁহার কন্যা অতিশয় পীড়িতা। ললিতার শ্বশুর বাটীর কেহই এ সংবাদ দেয় নাই। তিনি কন্যার জীবন ভয়ে, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া গেলেন ও ললিতার শ্বশুর মহাশয়ের কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

তিনি ষ্টেসনে জিনিষপত্র রাখিয়া পদব্রজেই গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ফটক প্রবেশ করিতে দেখিয়া রামসদয় বাবু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কারণ, গৃহিণীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার নিজের মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।

নীরদচন্দ্র বাহিরে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, এমন সময় নরেশচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। তিনি শ্বশুরকে দেখিয়া প্রণাম করা ত দূরের কথা, একটু ইংরাজী ফ্যাসানে 'নড্'-ও করিলেন না।

নীরদচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"লতি কেমন আছে ?"

নরেশচন্দ্র। আগের চেয়ে ভাল, তবে বিকারের ঝোঁক আছে।

নীরদচন্দ্র। চল একবার দেখে আসি।

নরেশচন্দ্র। বাবা বলিলেন যে, আপনার সঙ্গে দেখা হবেনা।

নীরদচন্দ্র। দেখা হবেনা!—নিজের মেয়েকে দেখিতে পাবনা ?

নরেশচন্দ্র। বাবা বলিলেন—

নীরদচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কোন প্রকারে সে বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

নরেশচন্দ্র কলিকালের 'ব্রজ সুন্দর'—পিতৃ-আজ্ঞায় ললিতার পিতাকে কন্যার মুখ দর্শন করিতে দিলেন না। তিনি কি কখনো পিতা হইবেন না ? এ যে কি আঘাত তা কি বুঝিতে পারিবেন না ? নিশ্চয়ই পারিবেন। জগতে সকল কাজেরই ফল আছে। যে সময় ললিতার পিতা বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বিকারের ঘোরে ললিতা ডাকিল, "বাবা! বাবা!"

ললিতার শাশুড়ী ঠাকুরাণী সেইখানে বসিয়া ছিলেন বলিলেন "পোড়া কপাল অমন বাবার।"

নীরদচন্দ্র যখন ষ্টেশনে গেলেন, তখন ট্রেণ নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি বিষণ্ণমুখে ষ্টেশনে একটি বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার বাঙ্গালী, ছোট ষ্টেশন, কে কখন আসে যায় সব সংবাদ পান। তিনি নীরদচন্দ্রের সহিত গিয়া বাক্যালাপ জুড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মশায় কোথায় এসেছিলেন ? আবার এখুনি যে যাচ্ছেন ?"

নীরদচন্দ্র। এখানে রামসদয় দত্তর বাটীতে এসেছিলাম, মেয়ে দেখিতে, তা হইল না ফিরিয়া যাইতেছি।

ষ্টেশন মাষ্টার। এখন ত ট্রেণ নাই। খাওয়া দাওয়া ত কিছু হয় নি, আমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অনুগ্রহ করে আমার বাড়ীতে এসে একটু মুখে হাতে জল দিন, আমাদেরও মেয়ে আছে মশায়—

নীরদচন্দ্রের সেই সহানুভূতিপূর্ণ কথায় হৃদয় জুড়াইয়া গেল। তিনি ষ্টেশন মাষ্টারের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, ভাবিলেন এটাও ভগবানের দয়া, এর নিকট হইতে কন্যার সুস্থ

সংবাদ পাইব। তাঁহার বাটীতে গিয়া সামান্য জল পান করিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, রামসদয় বাবুর পুত্রবধূ এখন পীড়িত, তাহার সুস্থ সংবাদ দিয়া যেন তাঁহাকে উপকৃত করেন।

ষ্টেশন মাষ্টার,—নিশ্চয় সংবাদ দিব—বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, ও নীরদচন্দ্রের ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

জগদীশ্বরের দয়া কখন কোথা দিয়ে আসে কেহই জানে না।

নীরদচন্দ্র তার দুই দিন পরে গৃহে ফিরিলেন। জগৎমোহিনী যাতনা ও উৎকণ্ঠার সহিত পথ চাহিয়া ছিলেন। স্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁর বুক শুকাইয়া গেল, আশার প্রদীপ যেন নিভিয়া গেল।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "লতি কেমন আছে?"

নীরদচন্দ্র রুক্ষভাবে বলিলেন "আমাদের আর লতি নাই! আজ থেকে আর তার নাম কোরোনা।"

ললিতার মার চ'খে সব অন্ধকার হইয়া গেল, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

হা'ঘরেদের গান

(Burns অবলম্বনে)

(১)

আইন যাদের রক্ষে তা'রা সাবাস তা'রা ধন্য
　　স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি যে স্বতন্ত্র,
বিচারগৃহ তৈরি কোন কাপুরুষের জন্য
　　দেবের দেউল পুরুত পোষার যন্ত্র।

(২)

খেতাবগুলা উচ্চে রাখ তুচ্ছ কর বৈভব
　　যশ ত ফাঁকা কাজ কি তাতে ভাইরে,
আমোদ কর উড়াও মজা বন্ধুরা আজ কৈ সব
　　ভাইরে নারে নাইরে নারে নাইরে।

(৩)

সাপটী খেলাই, হাত গুনে খাই স্বপন গেঁথে থুইগো
　　আনন্দেতে ভেল্‌কী লাগাই চক্ষে,
রাত্রে মোদের চটের ঘরে চাটাই পেতে শুইগো
　　সঙ্গিনীরে আলিঙ্গি লই বক্ষে।

(৪)

রথটী রাজার জাঁক জমকের, দেশ বিদেশে ভাইরে
　　এমন সুখে এমনি করে যায় কি,
দুগ্ধধবল পুষ্পশয়ন তাইরে নারে নাইরে
　　এমন নিবিড় প্রেমের মিলন পায় কি?

(৫)

স্মৃতির বিরাট গ্রন্থ-সমাজ, টিপ্পনি তার মস্ত,
　　তাহার সাথে মিলন মোদের নাইত,
ব্যাত্য প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে থাকুন তিনি ব্যস্ত,
　　আমরা ভোজের আমোদটুকুই চাইত।

(৬)

নিত্য করি অলক্ষ্মীরে নৃত্য করে স্তব ভাই
　　অমর মোরা ভ্রমণকারী সঙ্ঘ,
আমরা নবীন নিত্য নূতন, ছোকরা ছুঁড়ি সব্বাই
　　জীবন ধরে করেই চলি রঙ্গ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জার্ম্মান ক্রাউন-প্রিন্সের জীবন-স্মৃতি

জার্ম্মান যুবরাজকে প্রায় চারি বৎসর যাবৎ হল্যাণ্ডেই স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন ভোগ করিতে হইতেছে। এই হল্যাণ্ডে বসিয়াই তিনি নিজের জীবন-স্মৃতি লিখিয়াছেন। বইখানির মূল্য ২১ শিলিং। এই বৎসরেরই গত মে মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ৬।৭ মাসে ইহার কয় সংস্করণ হইয়াছে বলিতে পারি না। কারণ আমার নিকট যে বই আছে তাহা সেই প্রথম প্রকাশিত। এমস্টার্ডাম মান্ডাস্ পাবলিশিং কোং কর্ত্তৃক ইহার সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। এত দামের বই সকলে কিনিয়া পড়িবার সুযোগ পাইবেন না। তাছাড়া যাঁহারা বিদেশি ভাষা অবগত নহেন তাঁহাদিগের জন্যও আমি ইহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। প্রায় ৩০০ পৃঃ ব্যাপী বই-এর আগাগোড়া বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে, এবং আমি যাহা বলিব তাহা ঠিক সমালোচনাও নহে। কারণ যথার্থ সমালোচনা করিতে গেলে গত বিশ বৎসরের সমসাময়িক ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় থাকা আবশ্যক, এবং সেই ইতিহাস এখনও সঠিকভাবে লিখিতই হয় নাই। সে ইতিহাসের উপাদান সকল এখন সমসাময়িক সংবাদ পত্রে, দেশ বিদেশের রাজনীতি বিশারদদের লিখিত চিঠি পত্রাদি ও সরকারি কাগজ পত্রাদিতেই আত্মগোপন করিয়া আছে। জার্ম্মান ক্রাউন প্রিন্স বিভিন্ন রাজনীতি বিশারদদের কার্য্যকলাপের যে সকল সমালোচনা করিয়াছেন তাহা ন্যায্য হইয়াছে কিনা বলিতে গেলে অন্য দিকেরও কথা জানিতে হয়। তাই এই বই-এর কোন সমালোচনা না করিয়া, পড়িতে পড়িতে ইহা আমার মনে যতরূপে আঘাত দিয়াছে আমি সেই আঘাতেরই কতকটা পরিচয় দিব।

প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই মনে এই সন্দেহ হয় যে ক্রাউন প্রিন্স সম্ভবতঃ এই বই লিখিয়া জানাইতে চাহিয়াছেন যেন স্বভাবতঃই বাল্যকাল হইতেই তিনি সাম্যবাদী ছিলেন, যেন বর্ত্তমান জার্ম্মান সমাজের কার্য্য কলাপের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং আরও নানারূপে যেন তিনি জার্ম্মান সমাজের নিকট নিজের এমন পরিচয় দিবেন যাহাতে জার্ম্মানদের হৃদয় স্বতঃই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয় ও অবশেষে যেন তিনি জার্ম্মানিতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু সমগ্র বই পড়িয়া বুঝিলাম যদিও জার্ম্মানিতে ফিরিয়া আসিবার তাঁহার অত্যন্ত প্রবল বাসনা আছে। তাই বলিয়া তিনি বর্ত্তমান রিপাবলিক্ জার্ম্মাণির কোনও রূপে খোসামদ করেন নাই; বরং তিনি যে জার্ম্মান রিপাবলিকের মোটেই পক্ষপাতী নন তাহাই স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জার্ম্মানির ধাতে রিপাবলিক্ সহিবে না। তাঁহার মতে ইংলণ্ডের আদর্শানুযায়ী রাজ্য ব্যবস্থাই জার্ম্মানির পক্ষেও সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

ক্রাউন প্রিন্স বড় বেদনার ভার বহন করিতে করিতেই বইখানি লিখিয়াছেন, তাই তাঁর লেখার মধ্য হইতে বেশ একটি আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানির ঘোর দুর্দ্দিনে মর্ম্মাহত হইয়া জার্ম্মানির বিষয় যাহাই বলিয়াছেন তা সবই জার্ম্মানির দোষ ত্রুটিরই কথা; কেন জার্ম্মানি বিগত মহাযুদ্ধে হারিল, কেন বিশ্বের প্রায় সকল রাজশক্তিই জার্ম্মানির বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিল ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া কেবল তিনি জার্ম্মানিরই দোষ ত্রুটি দেখিয়াছেন। এই সম্পর্কে জার্ম্মানির বিভিন্ন রাজপুরুষদিগের কার্য্যকলাপের নিঃসঙ্কোচে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মান মন্ত্রিগণ এমন কি স্বয়ং কাইসারও বাদ পড়েন নাই।

বাল্যের স্মৃতি হইতেই বইটি আরম্ভ হইয়াছে। বাল্যকালের কথার আলোচনা করিতে করিতে বড় শ্রদ্ধা ও বড় প্রীতির সহিতই তাঁহার জননীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমাদের বাল্যের যাহা কিছু গৌরবের ও সৌরভের তা আমরা আমাদের মায়ের কাছ হইতেই পাইয়াছি। কেবল বাল্যের কথাই বা বলি কেন, আমাদের সংসারের যাহা কিছু ভাল তা আমাদের জননীর নিকট হইতেই পাওয়া......আদর্শ রমণী তিনিই, যিনি পরের মঙ্গলের জন্যই জীবন ধারণ করেন; আমাদের জননীও ঠিক সেইরূপই আদর্শ রমণী ছিলেন।" তিনি লিখিয়াছেন জীবনের আনন্দ ও বিপদের দিনে তাঁহারা সকল সময় তাঁহাদের মায়েরই শরণাপন্ন হইতেন ও তাঁহাদের জননীও সকল সময় তাঁহার সকল স্নেহ ভালবাসা দিয়া তাঁহাদের সকলের সহিত সেই আনন্দ ও দুঃখের ভাগ লইতেন। তিনি বলেন তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের জননীর বড় ঘনিষ্ঠ ও বড় মধুর সম্বন্ধ ছিল। মনের কোন চিন্তার ধারাই তিনি তাঁহার জননীর নিকট হইতে কখনও গোপন রাখেন নাই। আর তাঁহাদের পরস্পরের সেই সম্বন্ধ বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তেমনি অবিচ্ছিন্নভাবেই রহিয়াছে।

কিন্তু পিতার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল। কাইসার যে তাঁহাদের ভাল বাসিতেন না তা নহে তবে, তিনি যেন বালকদের সহিত নিজেকে বালকদের মত করিয়া লইতে পারিতেন না। তাই বাল্যকাল হইতেই পিতাপুত্রে তেমন ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ হয় নাই এবং পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা দীক্ষার ফলে পিতা হইতে তাঁহারা যেন আরও দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। জীবনের অতি প্রারম্ভ কালেই রাজকুমারদিগকে বাড়ীর শিক্ষকদিগের হস্তেই সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং ইহারই ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে পিতা তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ইহা এই শিক্ষকদিগের নিকট হইতে শুনিতে হইত; কারণ সাক্ষাৎ ভাবে পিতার সহিত পুত্রদের কোন সম্বন্ধই থাকে নাই। এইরূপে বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদিগকে তৃতীয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তিতায় পিতার সহিত সকল কারবার চালাইতে হইয়াছে, এমন কি পিতা পুত্রে কোনওরূপ ভাবেরও আদান প্রদান সেই তৃতীয় পক্ষের মার্কতেই করিতে হইত। জার্ম্মান রাজবংশের ইহাই রীতি ছিল। এবং এই ব্যবস্থা যেমন সংসারের মধ্যে ঠিক তেমনি সাম্রাজ্য ব্যাপারেও ছিল। ক্রাউন প্রিন্স বলেন এই ব্যবস্থারই কুফল স্বরূপ ভবিষ্যতে যত অনর্থ ঘটিয়াছে। এই বিষয়টি যুবরাজ নানান দৃষ্টান্ত দিয়া অতি বিশদ ও নিপুণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন কাইসারএর পারিষদবর্গ ই কাইসারের নাম লইয়া কাইসার ও জার্ম্মান সাম্রাজ্যের অদৃষ্ট পরিচালনা করিয়াছেন। কয়েকজন রাজপুরুষ ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যের আর কেহ সাক্ষাৎভাবে কাইসারের সহিত সাম্রাজ্য ব্যাপার লইয়া আলাপ করিতে পাইত না, এমন কি অনেক সময় স্বয়ং ক্রাউন প্রিন্স কোনও বিষয় কাইসারের নিকট জ্ঞাপন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত দেখা করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। কতবার ক্রাউন প্রিন্সের নামেই কত কথা কাইসারের কানে লাগান হইয়াছে। কিন্তু সে সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য পিতা পুত্রেও সাক্ষাৎভাবে আলাপ হয় নাই, এমনি জার্ম্মান সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা ছিল। কদাপি যদি ক্রাউন প্রিন্সকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে কাইসার নিজের সম্মুখে ডাকিয়া পাঠাইতেন ত যুবরাজ নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করিতেন, কারণ এই সুযোগে সাক্ষাৎ ভাবে পিতার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইতেন।

রাজবংশের আদবকায়দানুযায়ী ক্রাউন প্রিন্সকে ও জার্ম্মান যুবরাজের মর্য্যাদা সকল সময় রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য কাইসারের পারিষদবর্গ তাঁহাকে সর্ব্বদা পীড়াপীড়ি করিতেন; কিন্তু ক্রাউন প্রিন্সের ধাতে

অত আদব কায়দা সহ্য হইত না; তিনি অত বাঁধাবাঁধি ও আড়ষ্ট ভাব মোটেই পছন্দ করিতেন না; তাই সকল সম্প্রদায়ের যুবকদিগের সহিতই, বিনা আড়ম্বরে তাহাদের মত হইয়াই সমানভাবে খেলাধূলায়, শিকারে, ঘোড়দৌড়ে, এক কথায় সকল প্রকারের আমোদ প্রমোদেই নিঃসঙ্কোচে যোগ দিতেন, তাহাতে তাঁহার এতটুকুও বাধ বাধ
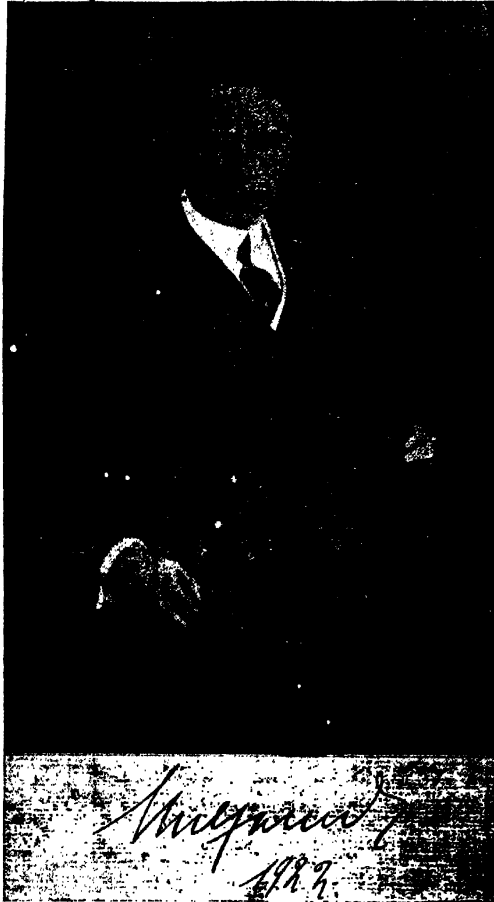
জার্ম্মান ক্রাউন প্রিন্স

ঠেকিত না; বরং ঐরূপে অবাধে মেলামেশা না করিতে পারিলেই তাঁহার কিরূপ যেন অসহ্য মনে হইত। কিন্তু ক্রাউন প্রিন্সের এরূপ ব্যবহার রাজবংশের আর কেহ পছন্দ করিতেন না এবং এই সব কথা তাঁরা কাইসারের কানেও তুলিতেন।

ঘোড় দৌড়ে বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা থাকায় জার্ম্মান যুবরাজদিগের পক্ষে কোনও প্রকার ঘোড় দৌড়ে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রাউন প্রিন্স ঘোড়ায় চড়িতে বড় ভালবাসিতেন ও ঘোড় দৌড়ে যোগ দিতেও কসুর করেন নাই। যেবার তিনি প্রথম ঘোড় দৌড়ে যোগ দেন সেবার তাঁহাকে কাইসারের সম্মুখেই হাজির হইতে হয়। কাইসারের সম্মুখে আসিয়া ক্রাউন প্রিন্সের মনে হইল বুঝি এখনই বা চতুর্দ্দিকে ভীষণ বজ্রপাত হইবে। কাইসার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঘোড়দৌড়ে যোগ দিয়াছিলে ?"

উঃ। "হাঁ পিতা।"

প্রঃ। "জান ইহা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ ?"

উঃ। "হাঁ পিতা।"

প্রঃ। "কেন তবে তুমি এরূপ করিলে ?"

উঃ। "একেত আমার এদিকে প্রাণান্ত ঝোঁক, তা ছাড়া আমার মনে হয় ক্রাউন প্রিন্স যদি তাঁহার সঙ্গী সাথীদের ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে সে বিপদকে গ্রাহ্য করে না তাহা হইলে সে খুব মঙ্গলেরই হয়।"

এক মুহূর্ত্ত কাইসার কি ভাবিলেন এবং যেন সহসাই বলিয়া উঠিলেন "আচ্ছা যাক্, তুমি ঘোড়দৌড়ে জিতলে কি হারলে ?"

উঃ। "দুর্ভাগ্যবশতঃ অমুকের নিকট এতটুকুর জন্ম পরাজিত হইয়াছি।" কাইসার সম্মুখের টেবিলের উপর তীব্রভাবে হাত চাপড়াইয়া অতি বিরক্তির স্বরে বলিলেন "হাঃ, এ বড়ই আক্ষেপের বিষয়।"

ক্রাউন প্রিন্স বলেন কাইসারের লোক নির্ব্বাচনের ক্ষমতা মোটেই ছিল না। যে কার্য্যের জন্ম যে ব্যক্তি ঠিক উপযুক্ত সে ব্যক্তি সে কাজে প্রায়ই থাকে নাই। কাইসারের পারিষদবর্গ নিজেদের মনমর্জ্জি সংবাদ ছাড়া, অন্য কোন সংবাদই কাইসারের কর্ণগোচর হইতে দিত না, এরূপ বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ক্রাউন প্রিন্স কাইসারের কানে তোলেন, এবং কাইসারও যে সময় সময় সে সব কথা না শুনিতেন তা নহে, বরং সময় সময় সেইরূপ কোন কোন কাজও করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই কাইসারের পারিষদবর্গ আবার উল্টা গাইতে আরম্ভ করিতেন ও ফলে হিতে বিপরীত হইত। অর্থাৎ কাইসার সাধারণতঃ স্বয়ং নানাদিক হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে এতটুকুও চেষ্টা করিতেন না, অথবা সকলরূপ লোকজনের সহিত মেলামেশা অথবা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের লোকদিগের নিকট হইতে সাম্রাজ্যের অবস্থা জানিবার কোনই চেষ্টা করিতেন না।

জার্ম্মান সাম্রাজ্যে এইরূপ মধ্যবর্ত্তিতার রীতি থাকার দরুণ কাইসার শেষ অবধি জার্ম্মানির প্রকৃত অবস্থা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, কারণ সকল বিষয়ই তিনি বিভিন্ন রাজপুরুষদিগের সংবাদ সংগ্রহের উপরই নির্ভর করিতেন, এবং তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপর অসম্ভবরূপ আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মনে করিতেন আর সকল অভাব তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারাই সংশোধিত হইয়া যাইবে।

ক্রাউন প্রিন্স এইরূপে বাল্যের পরিচয় দিতে দিতে প্রসঙ্গক্রমে কাইসারের চরিত্রের নানান আলোচনা করেন এবং নিজের লেখা নিজেই পড়িয়া আবার লিখিয়াছেন যে তাঁহার লেখায় যেন পিতার কেবল দোষই দেখান হইয়াছে, তাই এবার তিনি তাঁর গুণেরও কিছু পরিচয় দিবেন, কিন্তু মজার কথা এই যে কাইসারের দুই একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গুণের পরিচয় দিতে দিতে পুনরায় তাঁর দোষের কথাই আনিয়া ফেলিয়াছেন। এই কাইসার বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর প্রাণ বড় সরল ছিল ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি বলিয়াছেন যে কাইসার সকল লোককেই সকল কথা প্রাণ খুলিয়া বলিয়া ফেলিতেন, তাহাতে রাজ্যের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে সেকথা

একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না। অন্তের উপর যেমন তিনি অবাধে বিশ্বাস করিতেন তেমনি তিনি মনে করিতেন অন্তেও সেইরূপ তাঁর বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতেছে। নিজের এই সরলতার দরুণই তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি কখন রাজনৈতিক চালের আশ্রয় লন নাই। ক্রাউন প্রিন্স বলেন যে তাঁর পিতার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে না ছিল তা নয়, তবে তা ক্ষণেকের জন্তই। বাল্যকাল হইতে চাটুকারদিগের নিকট থাকার দরুণ নিজের উজ্জ্বল দিকটাই কেবল তাঁর নজরে ছিল। তাই কালচক্রের ভীষণ নিষ্পেষণে যখন একে একে বিশ্বের সকল জাতি জার্ম্মানির বিরুদ্ধ পক্ষে গিয়া দল পাকাইতে থাকে ও জগৎব্যাপী সমরানলের করালছায়া জার্ম্মানির শিয়রের নিকট প্রতিফলিত হইতে থাকে, তখনও কাইসার এই বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন যে লণ্ডন ও পেট্রোগ্রাডে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা সেই শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি অদৃষ্ট চক্রের গতিও ফিরাইতে পারিবেন। ক্রাউন প্রিন্স বলেন কাইসার চিরকাল জার্ম্মানির মঙ্গল কামনাই করিয়াছেন ও জার্ম্মানির অশেষ মঙ্গল যে শান্তির মধ্য দিয়াই হইবে ইহাই তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল কিন্তু বিধিনির্ব্বন্ধে তিনি যে কাজেই হাত দিয়াছেন সে কাজেই বিপরীত ফল ফলিয়াছে।

এদিকে কিন্তু ক্রাউন প্রিন্স, সপ্তম এডওয়ার্ডএর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন; তিনি বলেন সপ্তমএডওয়ার্ড সারা ইয়ুরোপের সকল সম্রাটদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ওরূপ বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন সম্রাট নাকি ইদানীং আর কেহ হয় নাই। তিনি যেমন ভূয়োদর্শী তেমনি লোকচরিত্রজ্ঞ ছিলেন। বড় শান্তভাবে, সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া সব বিষয় মীমাংসা করিতেন। ক্রাউন প্রিন্সএর বিশ্বাস, যদি সপ্তম এডওয়ার্ড আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতেন ও যেমন ফ্রান্স ও রুষকে ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের সহিত মিলাইয়া আঁতাতের সংগঠন করিয়াছিলেন, তেমন ট্রিপল্ এলায়ন্সের সহিত ট্রিপল্ আঁতাতের মিলন করাইয়া ইয়ুরোপে এক বিরাট যুক্ত সাম্রাজ্যেরও সৃষ্টি তিনি করিতে পারিতেন। কিন্তু একাজ, কেবলমাত্র এক সপ্তম এডওয়ার্ডএর দ্বারাই হইতে পারিত। এইরূপে সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রশংসা বহু পৃষ্ঠাব্যাপী হইয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমগ্র বইটিতে এডমিরাল ভন ট্রিপিজ ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের যেরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে, এমন আর কাহারও হয় নাই। ইঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণে দোষের একটিও উল্লেখ নাই।

কিশোরকালে ক্রাউন প্রিন্সকে কিছুদিন জেনারেল কল্‌কেন্‌হান্‌এর শিক্ষকতায় রাখা হয়। এই সময়ের দুইটি শিক্ষা তিনি জীবনে কখন ভুলিতে পারেন নাই। জেনারেল যুবরাজের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করাইয়া দিয়াছিলেন যে মানুষের মত মানুষ হইলে তাহার মনে ভয় ও বিপদের কোনও ধারণাই থাকিতে পারে না। যুবরাজ ঘোড়ায় চড়িতে বড় ভালবাসিতেন তাই জেনারেল তাঁহাকে খুব ঘোড়ায় চড়িতে দিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল ও ডোবা পরিপূর্ণ স্থানেই ঘোড়ায় চড়িতে হইত। ঐরূপ একসময় জেনারেল ক্রাউন প্রিন্সকে এই উপদেশ দেন "সর্ব্বপ্রথম নিজের প্রাণকে পরপারে নিক্ষেপ করিবে, বাকি সব আপনিই সাধিত হইবে।" জীবনের সকল অবস্থাতেই যুবরাজ এই উপদেশটিকে স্মরণে রাখিতেন।

জার্ম্মান রাজবংশের প্রথানুযায়ী ক্রাউন প্রিন্সকে কোনও একরূপ ব্যবসা শিক্ষা করিতে হয়। সাধারণতঃ রাজকুমারেরা নামমাত্র এবিষয় শিক্ষানবিসি করিতেন, কিন্তু ক্রাউনপ্রিন্স সত্য সত্যই বিশেষ মনোযোগ সহকারেই কামারের কাজ শেখেন। তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনেও স্বীয় হস্তে স্থানীয় কামারের গৃহে যাইয়া মাঝে মাঝে লোহা পিটিতেন ও তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত বহু জিনিষ দেশবিদেশের গণ্যমান্য লোকেরাও বহুমূল্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন।

কিশোরকালে একবার ক্রাউন প্রিন্স মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোনও জুবিলি উপলক্ষে ইংলণ্ডে যান; কিন্তু সেই বিরাট জাঁকজমকের মাঝে দৈত্যাকৃতি দুইটি ভারতবর্ষীয় শরীররক্ষকএর কথা ছাড়া আর কোন কথাই তাঁহার এখন স্মরণ নাই। কিন্তু তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে অতবড় বিরাট উৎসব, যে উৎসবে জগতের সর্ব্বদেশের লোকই উপস্থিত ছিলেন, সেই উৎসব যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিশ্বজোড়া প্রতাপের পরিচয়জ্ঞাপক, সে কথা তখন ক্রাউন প্রিন্স বেশ ভাল করিয়া না বুঝিলেও সেই বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁহার মনে এমনই গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যথার্থ শক্তিকে তিনি কখনও ভুল বোঝেন নাই।

কেমন করিয়া যুবরাজদিগকে ক্রমশঃ রাজকার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয় তাহার একটি সুন্দর চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থের এই অংশ পড়িতে পড়িতে কয়েকবার যদুবাবুর আওরঙ্গজেবের ইতিহাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল যদুবাবু কত আয়াস স্বীকার করিয়া তবে আওরঙ্গজেবের সমস্ত পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। আর আজকাল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদান সকল কত সহজেই সংকলিত, সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতেছে। ইয়ুরোপীয়দিগের এই বিষয়টি বড়ই প্রশংসনীয়। একবার ডাচ্ রিপাব্লিকের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে একটি স্থানে পাইয়াছিলাম যে যুদ্ধকালে বিদ্রোহিদলের কোনও এক জেনারেল একটি চোতা কাগজে কোনও আদেশ ও পরামর্শ নিজেরদলের লোকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই চোতা কাগজও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল, এবং মটলে সাহেব বহুকাল পরে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিতে বসিলে, তিনিও সেই কাগজের টুকরাটি ব্যবহার করিতে পাইয়াছিলেন।

যুবরাজদিগের শিক্ষাবিধির মধ্যে বিদেশ ভ্রমণ একটি প্রধান অঙ্গ। ক্রাউন প্রিন্সও একবার পৃথিবীর নানা স্থানে জার্ম্মান যুবরাজ হিসাবেই ঘুরিয়া বেড়ান এবং সেই উপলক্ষে তুর্কির পুরাতন আমলের শেষ সুলতান আবদুল হামিদ, রুষ সম্রাট জার নিকোলাস, ও পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের সময় লর্ড গ্রের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। ইহাঁদের বহু চিত্তাকর্ষক পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ক্রাউন প্রিন্স লিখিয়াছেন আবদুল হামিদের অতিথিরূপে তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন সে কয়দিন তাঁরা আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। একবার আবদুল হামিদ ক্রাউন প্রিন্সদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ঠিক কোন সময় ও কোথায় যে অভ্যর্থনা করা হইবে তা এক সুলতান স্বয়ং ছাড়া আর কেহ জানিতেন না, কারণ সুলতানের ভয় ছিল যে কোন সময় তাঁহার প্রতি আক্রমণ হইতে পারে; ইনি বড়ই স্বেচ্ছাচারী সম্রাট ছিলেন কি না। ভোজনকালেও ক্রাউন প্রিন্স হামিদের পোষাক পরিচ্ছদ একটু স্বাভাবিকরূপে ঢিলা দেখিয়া একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিতে পারেন যে তাঁর পরিচ্ছদের তলায় এক বর্ম্মের আবরণ ছিল।

জারের প্রাণভীতি আরও তীব্র ছিল। একবার ক্রাউন প্রিন্স তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে তাঁহাকে দেড়শত প্রহরী অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই প্রহরীদিগকে দাবার বলের মত করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। জারের সহিত একবার মোটরে করিয়া ভ্রমণকালে রাজপথে সৈনিকপুরুষ ও পুলিশ ভিন্ন আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কারণ নগরবাসিদের সেই সময় রাজপথে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ হয়। ইহা ১৯০৩ সালের কথা।

রাজপুরুষদিগের বিদেশ ভ্রমণের মূলে প্রায়ই এই উদ্দেশ্য থাকে যে, তাঁহারা বিদেশের রাজপুরুষদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন কেমন করিয়া কোন রাষ্ট্রকে তাঁহাদের দলে টানিতে পারেন। জার্ম্মান যুবরাজও সে চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জএর রাজ্যাভিষেক কালে ক্রাউন প্রিন্স ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং সে সময় তাঁহার সহিত লর্ড গ্রের দেখা হয়। নানান কথা হইতে হইতে ক্রাউন প্রিন্স অনবধানতা বশতঃ তাঁহার প্রাণের একটী কথা বলিয়া ফেলেন। ক্রাউন প্রিন্স বলেন যে যদি জগতের দুই প্রধান শক্তিশালী জাতি—এক জার্ম্মানি, যাহারা স্থলে অপরাজেয়, ও দ্বিতীয় ইংলণ্ড, যাহারা জলে অপরাজেয়,—মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয় ত জগতের শান্তি বোধ হয় কদাপি নষ্ট হয় না. এবং তাহা হইলে এই দুই জাতিই নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে সারা জগৎ ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিতে পারে। লর্ড গ্রে সমস্ত কথা শুনিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কেবল এইটুকুই বলিয়াছিলেন "হাঁ, সব সত্যি, কিন্তু ইংলণ্ড আর কাহাকেও কিছুমাত্র ভাগ দিতেও ইচ্ছুক নহে, এমন কি জার্ম্মানিকেও না।"

রুমানিয়াতে গিয়া ক্রাউন প্রিন্স বুঝিতে পারেন যে তাহারা জার্ম্মানির প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন ত নয়ই, বরং তাঁহার সন্দেহ হয় যে বিপদকালে হয়ত তাহারা বিরুদ্ধ পক্ষই অবলম্বন করিবে আর, অষ্ট্রিয়ার বিষয়ও ক্রাউন প্রিন্স এই লিখিয়াছেন যে, রাজনৈতিক হিসাবে জার্ম্মানি যেন ক্রমেই অষ্ট্রিয়ার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ হয়ত কোনদিন অষ্ট্রিয়ারই স্বার্থের জন্য জার্ম্মানিকেও যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে। এ সকল কথা জার্ম্মানিতে ফিরিয়া তিনি কাইজারকে ও জার্ম্মানির প্রধান মন্ত্রীকে জানান, কিন্তু বেথম্যান হলওয়েগ তাঁর কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই।

তাঁহার স্বদেশে বিসমার্কের সহিতও জীবনে দুইবার দেখা হয়। বিসমার্ককে যুবরাজ কোনও অতীত যুগের এক মহান পুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার একটি বড় মজার কথা আর একজনের মুখ দিয়া এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কথাটি এই "আমি ত ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে বিশেষ ইচ্ছুক, কিন্তু ইংলণ্ড যেকিছুতেই এই বন্ধুত্ব স্বীকার করিতে চায় না।"

এই গ্রন্থে কাইজার ও বেথম্যান হলওয়েগের বিরুদ্ধে যেরূপ দোষারোপ করা হইয়াছে এরূপ আর কাহারও বিরুদ্ধে করা হয় নাই। ক্রাউন প্রিন্স বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে জার্ম্মানিতে রাজনীতিবিদ্ একজনও কেহ ছিলেন না। তিনি বলেন যে যদিও বার্লিনের ইংরাজ প্রতিনিধি কাইজারকে স্পষ্টই বলেন যে ইংলণ্ডের এলাইস্‌দের বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড নিশ্চয়ই তাহার মিত্রপক্ষই অবলম্বন করিবে তথাপি কাইসার অথবা হলওয়েগ শেষ অবধি এই বিশ্বাসেই নির্ভর করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ড কখনই জার্ম্মানির বিরুদ্ধে সহসা যোগ দিবে না। একের পর আর এক রাজশক্তি ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহার প্রতিকারের কোন উপায় কাইসার অথবা হলওয়েগ কেহই কিছু করেন নাই। যাহার এতটুকুও দেখিবার ক্ষমতা ছিল সেই দেখিয়াছে যে ক্রমশঃ জগতের সকল জাতিই জার্ম্মানির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু এ কেবল কাইসার ও হলওয়েগের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে নাই। এই কথার সমর্থনে ক্রাউন প্রিন্স বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

এই বিদ্বেষের কারণ বিষয়ে ক্রাউন প্রিন্স বলেন যে যেমন ব্যক্তির বিষয়ে তেমনই জাতির বিষয়ে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে যাহারা অত্যন্ত হৈ চৈ করিয়া জগতে উন্নতির পথে অন্যের মনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে তাহাদিগকে জগৎবাসীর হিংসা, বিরোধ ও শত্রুতা ভোগ করিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি সপ্তম এডওয়ার্ডএর বিষয়ও এইরূপ লিখিয়াছেন যে তিনি জার্ম্মানির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন কালেই ছিলেন না, তবে জার্ম্মানির কথা উঠিতে কোনও সময় তিনি

ক্রাউন প্রিন্সকে বলেন যে জার্ম্মানি যেরূপে ব্যবসা বাণিজ্যে, ও উপনিবেশ স্থাপনে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে তাঁহার এই বিশেষ ভয় যে একদিন জার্ম্মানির সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ না বাধিয়া যায়; কারণ ইংলণ্ড জার্ম্মানির এইরূপ অবাধ সংপ্রসারণ কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না; তা না হইলে যে ইংলণ্ডের সমূহ ক্ষতি ও বিপদের সম্ভাবনা। ক্রাউন্স প্রিন্স বলেন ব্যবসা বাণিজ্যে ও উপনিবেশ সংস্থাপনে জার্ম্মানি এরূপ অসম্ভবরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল, যে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় জগতের আর কেহ পারিয়া উঠিতেছিল না, এবং ইহাই যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের মূল কারণ, তাহা গ্রন্থকার নানারূপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রাউন প্রিন্স জার্ম্মানির প্রশংসার মধ্যে কেবল সামরিক নেতাদিগেরই প্রশংসা করিয়াছেন; ও তাঁহাদের মধ্যেও হিণ্ডেনবার্গ ও লুডেনড্রুফ-এর প্রশংসাই প্রাণ খুলিয়া করিয়াছেন, আর হলওয়েগের উপর যেন তাঁর জাতক্রোধ হইয়াছে। তিনি বলেন যত অনর্থ কেবল হলওয়েগের নিশ্চেষ্টতা ও নিরুদ্যম-এর দরুণই হইয়াছে।

জার্ম্মান যুদ্ধের যে সকল অংশে জার্ম্মানির ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয় সে সকল অংশ এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মনে থাকে না, সময় কিরূপে কাটিল। যুদ্ধের এই সকল বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। মার্ণের যুদ্ধের বিবরণে বুঝিতে পারা যায় কেমন করিয়া একটি ব্যক্তির ভুল ভ্রান্তিতেও কত বড় ওলট পালট হইতে পারে। যুদ্ধের একটি ইতিহাস ইনি পৃথকভাবে লিখিবেন।

পরিশেষে কিরূপে জার্ম্মানিতে অন্তর্বিপ্লব হইল এবং কাইসার ও ক্রাউনপ্রিন্স অগত্যা কিরূপে জার্ম্মানি ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় লন, এসব এমন বিস্তারিত ও নিপুণভাবে লিখিত হইয়াছে যে, জগতের ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলস্বরূপ চার্লস্ প্রথমকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়; ফরাশিবিপ্লবের পরিণামে চতুর্দ্দশলুইকেও শেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়; রুষ সম্রাট জার নিকোলাসও প্রজাদের হাতেই প্রাণ সমর্পণ করেন। জার্ম্মানিতেও এক অভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া গেল; কিন্তু রাজশক্তির সহিত বলিতে গেলে এতটুকুও সংঘর্ষ হইল না; এবং জার্ম্মাণ প্রজাবর্গও রাজবংশের কাহারও রক্তের জন্য এতটুকুও লালায়িত হয় নাই। ইচ্ছা করিলেই কাইসার বা ক্রাউন প্রিন্সকে বিদ্রোহীরা ধরিয়া বন্দী করিতে পারিত, কিন্তু এ চেষ্টাও তাহারা করে নাই। এবং কাইসার অথবা ক্রাউনপ্রিন্স ইচ্ছা করিলেও বিদ্রোহীদের সহিত একটা শক্তি পরীক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে দিকেও ইঁহারা চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই জার্ম্মানি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কারণ সামরিক শক্তিই ছিল কাইসারের প্রধান অবলম্বন এবং এই সামরিক বিভাগেরই প্রধান সেনাপতি, স্বয়ং হিণ্ডেনবার্গও কাইসারের পক্ষে যখন আসিলেন না, বরং তিনিও কাইসারকে রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইতেই খোলাখুলি ভাবে যখন উপদেশ দিলেন, এমন কি যখন কাইসার সম্রাটের পদ ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াও নিজ সেনার সহিত থাকিয়া শেষ যুদ্ধের পর জার্ম্মানিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেও, এই হিণ্ডেনবর্গও কাইসারকে পাকে চক্রে জার্ম্মাণি হইতে হল্যাণ্ড পাঠাইয়া দিলেন, তখন আর হল্যাণ্ড না গিয়া কাইসার কি করেন?

হল্যাণ্ডে পলায়নকালে ক্রাউনপ্রিন্স পথে শুনিলেন যে হিণ্ডেনবার্গও স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছেন। হিণ্ডেন বার্গ অবশ্য কোন সময়ই কাইসার-বিরোধী ছিলেন না, তবে যখন তিনি দেখিলেন যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গেলে অনর্থক একটা রক্তপাতের সৃষ্টি হইবে তখন কাইসারের পক্ষের লোক হইয়াও তিনি বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন, কারণ তাঁর স্বদেশ প্রীতির নিকট আর কিছুই বলবত্তর ছিল না।

ক্রাউন প্রিন্সের পলায়নের ইতিহাস উপন্যাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক। একে ত ইহা তাঁহার নিজের হাতের

লেখা, তার উপর স্বীয় মর্ম্মব্যথাকে ভাবায়ও রঞ্জিত করিবার তাঁহার বেশ ক্ষমতা আছে, তার প্রমাণ তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে পাওয়া যায়; পড়িবার সময় স্বতঃই মনে হয় যেন ইহা উপন্যাসের মত অথচ জানা আছে ইহা সত্যই উপন্যাস নহে, তাই ইহাঁর লেখা এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২৪)

আমার ওয়াশিংটন দেখিবার কোনওই সম্ভাবনা ছিল না। ন্যাসনাল্ টেম্পারেন্স্ সোসাইটি ওয়াশিংটনে কোনও বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন নাই। ওয়াশিংটনের কোনও য়্যুনিটেরিয়ান মণ্ডলীও আমার কথা শুনিয়াছিলেন কি না জানি না। তাঁদের নিকট হইতেও কোনও নিমন্ত্রণ পাই নাই। এদিকে আমার দেশে ফিরিবার দিনও ঘনাইয়া আসিতেছিল। ওয়াশিংটন যাইবার আশা ছাড়িয়া দিয়া নিউইয়র্ক হোটেলে যে অন্ধ সাহিত্যসেবিনীর সঙ্গে আমার আলাপ-আত্মীয়তা হইয়াছিল, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হইল না, একথা লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার নিউইয়র্ক ছাড়িবার পূর্ব্বেই তিনি ওয়াশিংটনে চলিয়া গিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। আমি এসময় বষ্টনে ছিলাম। বষ্টনের মাদকতা-নিবারণীসমিতি সকলে মিলিয়া সেখানকার ট্রেমণ্ট্ টেম্পলে একটা বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। আমাকেই এই সভার প্রধান বক্তারূপে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমেরিকাতে এত বড় মাদকতানিবারণী সভায় আর কোথাও বক্তৃতা করি নাই। এই বক্তৃতার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই উপলক্ষে যখন বষ্টনে ছিলাম তখন আমার ওয়াশিংটন যাওয়া হইল না, আমার অন্ধ বন্ধুটিকে একথা লিখিয়া পাঠাই। আমেরিকা যাইয়া আমি ওয়াশিংটন না দেখিয়া দেশে ফিরিব, ইহাতে ইঁহার এবং ইঁহার সঙ্গিনী মিস্ এলস্কিন্, ই, ফক্সের স্বদেশাভিমানে আঘাত লাগিল। মার্কিণের যুক্ত রাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন, মার্কিণের রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রস্থল, মার্কিণীয়দিগের রাষ্ট্রীয় গৌরবের এবং রাষ্ট্রনীতির লীলাভূমি ওয়াশিংটন। নিউইয়র্ক নিউইয়র্ক নামক প্রাদেশিক রাষ্ট্রের—State of New York'এর—প্রধান নগর, প্রাদেশিক রাষ্ট্র শক্তির কেন্দ্রস্থল। নিউইয়র্করাষ্ট্রের অধিবাসীরাই কেবল নিউইয়র্ক সহরের গৌরব করিয়া থাকে। বষ্টন মাছেচুসেট্‌সরাষ্ট্রের বা State of Massachussets'এর রাজধানী। মাছেচুসেট্‌সের অধিবাসীরাই বষ্টনের গৌরবে গরীয়ান হয়। সেইরূপ শিকাগোর নামে মিসোরী রাষ্ট্রের লোকেরাই

মাতিয়া উঠে। এসকল সহর প্রাদেশিক স্বদেশাভিমানের বা provincial patriotism'এর আশ্রয় এবং অবলম্বন হইয়া আছে। মার্কিণে এই প্রাদেশিক স্বদেশাভিমানের বা provincial patriotism খুবই প্রবল। ইহার ফলে বড় বড় প্রদেশ বা State-গুলির মধ্যে বেশ একটা রেষারেষিও জাগিয়া আছে। বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যেই এই রেষারেষিটা সকলের চাইতে বেশী ফুটিয়া আছে। শিকাগো প্রাণপণে নিউইয়র্ককে ছাড়াইয়া যাইতে চাহে। সেণ্ট লুই নিউইয়র্ক এবং শিকাগো অপেক্ষা বড় হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং বড় বড় সহরগুলির মধ্যে একটা প্রখর প্রতিযোগিতা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রাদেশিক স্বদেশাভিমানে মার্কিণীয়দিগের রাষ্ট্রীয় একত্বানুভূতির কোনই ব্যাঘাত জন্মায় নাই। আমাদের কথায় কহে "মহিষের শিং বাঁকা, যুঝবার বেলা একা।" মার্কিণের স্বাদেশিকতাতে একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ওয়াশিংটন মার্কিণের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় একতার বিগ্রহ হইয়া আছে। ওয়াশিংটন সমগ্র আমেরিকার রাষ্ট্রধানী বা capital বলিয়া আমেরিকাবাসীমাত্রেরই গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। আমি নিউইয়র্ক দেখিলাম, শিকাগো দেখিলাম, বষ্টন দেখিলাম, সেণ্ট লুই দেখিলাম, আরও ছোট ছোট কত রাষ্ট্র-কেন্দ্র, বাণিজ্য-কেন্দ্র, শিক্ষা ও সাধনা-কেন্দ্র দেখিলাম, কিন্তু ওয়াশিংটন না দেখিয়াই দেশে ফিরিয়া গেলাম, একথাটা আমার এই অন্ধ বন্ধু এবং তাঁহার সঙ্গিনীর অসহ্য বোধ হইল। কিছুতেই ইঁহারা আমাকে একবার ওয়াশিংটন না লইয়া গিয়া ছাড়িবেন না, এই সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। জুন মাসের প্রথমে আমার দেশে ফিরিবার কথা। বোধ হয় এপ্রেলের শেষভাগে আমি ট্রেমণ্ট্ টেম্পলে মাদকতা-নিবারণী সভায় বক্তৃতা দিতে যাই। সেই সময়েই আমি আমার ওয়াশিংটন যাওয়া হইল না, তাঁহাদের সঙ্গেও আর দেখা হইল না, একথা আমার বন্ধুদিগকে ওয়াশিংটনে লিখিয়া পাঠাই। পত্রোত্তরে তাঁহারা লিখিলেন যে আমাকে ওয়াশিংটন যাইতেই হইবে। আমি লিখিলাম, একটা কাজের অছিলা ব্যতীত আমি যাই কেমন করিয়া? আর খরচপত্রেরই বা ব্যবস্থা করিব কিরূপে? এই চিঠি লিখিয়া আমি ভাবিলাম, ইহার উপরে আর কোনও অনুরোধ উপরোধ আসিবে না। কিন্তু দিন তিনচার পরে হঠাৎ এক তার পাইলাম "আগামী সপ্তাহে কোন্‌দিন ফুরসৎ আছে ওয়াশিংটনে আসিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবেন, অনতিবিলম্বে তারযোগে জানাইবেন। বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। খরচ দেওয়া যাইবে।" কিসের বক্তৃতা, কে ব্যবস্থা করিল, কিছুই বুঝিলাম না। যাহাহউক, একটা কোনও ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা ভাবিয়া উত্তর দিলাম,—"পরবর্ত্তী বৃহস্পতিবার রাত্রে ওয়াশিংটন পৌঁছিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুইদিন সেখানে থাকিতে পারিব। শুক্রবার রাত্রে কেণ্টকি প্রদেশের রাজধানী লুই ভিলে যাইতে হইবে।" ফেরত তার আসিল, "ওয়াশিংটনের ফিল্ হারমনিক্ সোসাইটির সংস্রবে বৃহস্পতি-বারেই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছে।" আমি মঙ্গলবার বষ্টন হইতে ওয়াশিংটন যাত্রা করিলাম।

তখন এপ্রেলের শেষভাগ। কিন্তু নিউইয়র্ক বা বষ্টনে তখনও শীতের জের মেটে নাই। বসন্তের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক, সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেও আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নিউইয়র্কের সীমা ছাড়াইতে না ছাড়াইতেই চারিদিকে মার্কিণের বাসন্তী বনস্থলীর নবোন্মেষিত রূপযৌবনের পসরা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বসন্ত কাহাকে বলে এদেশে আমরা তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। আমাদের দেশে শীতের পরই গ্রীষ্ম হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়ে। শীত এবং গ্রীষ্মের সন্ধিকালটাকেই আমরা বসন্ত বলিয়া ভাবিয়া লই। শীতপ্রধান দেশে না গেলে বসন্তের সত্য স্বরূপটি চাক্ষুষ করা যায় না। আমরা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে বসন্তের যে ছবি পড়িয়া থাকি, তাহার প্রত্যক্ষ হয় কেবল শীত-প্রধান দেশেই। ভারতের সমতল ভূমিতে এরূপ দেখা যায় না। বিলাতে এবং আমেরিকায় যাইবার পূর্ব্বে আমার ভাগ্যেও বসন্তের সত্য স্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। শীতকালে সে সকল দেশে উদ্ভিদ্ জগৎ যেন মরিয়া থাকে। মৃত মানুষের যেমন কবর হয়, সেইরূপ শীতকালে শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদ প্রকৃতি যেন সমাধিস্থ হইয়া রহে। আমাদের প্রাচীনশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রকারের বহিরিন্দ্রিয়-চেষ্টার নিবৃত্তিকে সমাধির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শীতপ্রধান দেশের বনস্থলী শীতকালে সকল প্রকারের বাহিরের প্রাণপণ চেষ্টা রুদ্ধ করিয়া এইরূপ সমাধিস্থ হইয়া যেন রহে। তাহাদের ভিতরে যে কোনও প্রকারের প্রাণতা আছে, বাহির হইতে ইহার কোনওই প্রমাণ পাওয়া যায় না।—এ মরা গাছগুলি যে আবার বাঁচিয়া উঠিবে, ইহা সহসা কল্পনা করাও কঠিন হয়। গাছগুলি দেখিলে মনে হয় যেন শুক্‌নো কাঠ হইয়া রহিয়াছে, ভাঙিয়া জ্বালাইলেই হয়। কিন্তু ভাঙিতে গেলেই এ ভ্রান্তিটা দূর হয়। বসন্তের নিঃশ্বাসে শীতপ্রধান দেশের বৃক্ষলতাদির এই সমাধি ভাঙিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে মনে হয় যেন মরা গাছগুলি রাতারাতি জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে। "শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল" গানে ও কবিতাতেই এদেশে একথাটা শুনি। সত্য সত্যই যে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, শীতপ্রধান দেশে, নিদারুণ শীতের অবসানে নব-বসন্তসমাগমে এই কথাটা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। বসন্তের প্রথম সাড়াতে বৃক্ষলতাতে একপ্রকারের মিথ্যা পল্লব গজাইয়া উঠে। এগুলি প্রকৃত পল্লব নহে। এ সকলে জীবনের প্রফুল্লতা এবং রংয়ের বাহার দেখিতে পাওয়া যায় না। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে পরে মানুষের গায়ের মরা চামড়াগুলি যেমন উষ্ক শুষ্ক হইয়া উঠে, শীতের অবসানে শীতপ্রধান দেশে বৃক্ষলতাদিরাও যেন সেইরূপ একটা খোলস বদলাইতে আরম্ভ করে। শুক্‌নো ডালে পাতার মতন একটা কি গজাইয়া উঠে। এগুলি সত্য জীবন্ত পত্রপল্লব নহে। ইহা বনস্থলীর দীর্ঘ শীতের জড়তা দূর করিবার গা ভাঙার মতন। এই মিথ্যা পাতাগুলি অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ঝরিয়া পড়ে। আর তখনই সত্য বসন্তের আবির্ভাব আরম্ভ হয়। আর এই বসন্ত সমাগমে সে দেশে প্রথমে গাছে পাতায় কুড়ি গজায় না। একেবারেই ফুল ফুটিয়া উঠে। এমন ফুলের বাহার আর কোথাও দেখি নাই। নববসন্তের প্রথম চুম্বন সংস্পর্শে বনস্থলী বরণকিরণগন্ধে সমস্ত প্রকৃতিকে মাতাইয়া

তোলে। এখানে একটু ধ্যান করিলেই প্রকৃতিরাণীর অসাধারণ ছলাকলা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রথমে এইরূপ ফুল ফুটাইয়া বনস্থলী আপনার ভবিষ্যত ফলসম্ভারের আয়োজন করিয়া থাকে। এই অদ্ভুত ফুলসাজ তাহার বাসর সজ্জা। পুষ্পরাশির রূপে ও গন্ধে আকুল করিয়া বৃক্ষলতাদি পতঙ্গকুলকে ঝাঁকে ঝাঁকে আপনার কোলে ডাকিয়া আনে। অচল বলিয়া নিজেরা যে অভিসারে বাহির হইতে পারে না, পতঙ্গকুলের আশ্রয়ে ও সাহায্যে বৃক্ষলতাদি সেই অভিসারে আপনার প্রাণকে বাহির করিয়া দেয়। এসকল কীটপতঙ্গেরা ফুলের বর্ণে ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের উপরে আসিয়া বসে, এবং ডানায় মাখিয়া ও পায়ে জড়াইয়া পুষ্প-কেশরগুলিকে চারিদিকে ছড়াইয়া এই অদ্ভুত নিগূঢ় যৌনলীলাতে অপূর্ব্ব কুশলতাসহকারে দূতীগিরি করিয়া থাকে। এইরূপেই বনস্থলী বসন্ত-সমাগমে আপনার ভবিষ্যত ফলসম্ভারের আয়োজন করিয়া লয়। এই জন্যই বসন্ত-সমাগমে শীতপ্রধান দেশের বৃক্ষলতাদি সকলের আগে বরণকিরণগন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তখনও পাতা গজাইবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। পাতার প্রয়োজন ফলকে ঢাকিয়া রাখিয়া বাঁচাইবার জন্য। ফলের সম্ভাবনা যখন জাগিতে আরম্ভ করে, ঝরন্ত ফুলের পাঁপড়ির মাঝখান হইতে যখন ফলের কচিমুখ বাড়িয়া উঠে, তখনই এই অসহায় শিশুগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এইজন্যই শীতপ্রধান দেশের বনস্থলীতে নব-বসন্তসমাগমে সকলের আগে ফুল ফুটে; তারপর ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষলতাদি নিবিড় পত্র পল্লবের আচ্ছাদনে নিজেদের ঢাকিতে আরম্ভ করে। এই নববসন্তের বাহার দেখিতে দেখিতে আমি বষ্টন হইতে ওয়াশিংটনের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে প্রায় দুইদিন ও একরাত্রি গাড়ীতে কাটাইয়া পরদিন সন্ধ্যাকালে ওয়াশিংটনে গিয়া পৌঁছিলাম।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়িলাম। আমাকে কেহ প্রত্যুদ্‌গমন করিতে আসেন নাই। কোথায় থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও জানিতাম না। আমার অন্ধ বন্ধুটির ঠিকানা জানা ছিল। অগত্যা একটা গাড়ী করিয়া সেই বাড়ীতেই গেলাম। তখন রাত্রি নয়টা। যাইয়া দেখিলাম আমার বন্ধুরা বাড়ী নাই। মহামুস্কিলে পড়িলাম। তাঁহারা কত রাত্রে ফিরিবেন তাহারও ঠিকানা নাই। কি করি, ষ্টেশনেতেই হোটেল আছে, অগত্যা সেখানে গিয়াই রাত্রি কাটাইব ঠিক করিয়া আবার ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে খানিক দূর গিয়াই গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বন্ধুদিগকে দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহাদের সঙ্গে আবার তাঁদের হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা হয় নাই। ওয়াশিংটনের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার নাম কর্ণেল ব্লাউণ্ট। তিনি সে সময়ে সহরে ছিলেন না। তাঁহার গৃহিণী মিসেস্ ব্লাউণ্টই আমার আতিথ্যের ভার লইয়াছিলেন। মিসেস্ ব্লাউণ্টের গাড়ীও আমাকে

লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিল; কিন্তু আমাকে খুঁজিয়া পায় নাই। যাহা হউক সে রাত্রি আমার নিউইয়র্কের বন্ধুদিগের আশ্রয়ে আসিয়াই কাটাইলাম।

কি করিয়া আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল, জিজ্ঞাসা করিলে মিস্ ফক্স এক অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিলেন। তিনি কহিলেন:—

"যখন শুনিলাম যে তুমি দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, আমাদের সঙ্গে আর দেখা হইবে না, বিশেষতঃ আমেরিকায় আসিয়া আমাদের রাজধানী দেখিয়া যাইবেনা, তখন প্রাণে বড়ই বাজিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যেরূপ প্রকারেই হউক তোমাকে ওয়াশিংটন আসিতেই হইবে। তখনও কিরূপে যে ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিব, তাহা জানিতাম না, কল্পনাও করিতে পারি নাই। তবে ভাবিলাম; ওয়াশিংটনে কত সভা সমিতি আছে, তাদের কোনও একটাকে ধরিয়া তোমার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা কি করিতে পারিব না? এসকল সভা সমিতির নাম মাঝে মাঝে কাগজে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ইহাদের আর কোনও খোঁজ খবর ত জানি না, এদের ঠিকানাই বা পাই কোথায়? কর্ত্তাদের নাগালই বা পাইব কেমনে? পরের দিন প্রাতঃকালে স্থানীয় সংবাদপত্র খুলিয়া কোথাও কোন বড় সভা সমিতির বৈঠক হইতেছে কিনা, খুঁজিতে লাগিলাম। দেখিলাম সেই দিনই ফিল্ হারমনিক্ সোসাইটির একটা অধিবেশন বসিবে। সাধারণ সভার অধিবেশন নহে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন। যথাসময়ে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করিতে চাই বলিয়া আমার নাম পাঠাইয়া দিলাম। সম্পাদক তখনই সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। আমি কহিলাম, ভারতবর্ষের একজন প্রসিদ্ধ বক্তা কয়মাস হইতে মার্কিণে আসিয়া নানা স্থানে বক্তৃতা দিতেছেন, আপনারা সংবাদপত্রে তাঁহার নাম অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন। নিউইয়র্ক, বষ্টন, শিকাগো, মিড্ভিল, লুই ভিল্, সেণ্ট লুই প্রভৃতি মার্কিণ সভ্যতার প্রায় সকল কেন্দ্র হইতেই তিনি নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন, এক ওয়াশিংটনেই এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় নাই, এ বড়ই লজ্জার কথা। আমি ওয়াশিংটনের অধিবাসী নহি, অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছি, কিন্তু ওয়াশিংটন সকল আমেরিকা বাসীর অতিশয় আদরের এবং গৌরবের বস্তু; এত বড় একজন বিদেশী আমার দেশে আসিয়া ওয়াশিংটন না দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিতে আমার অত্যন্ত লজ্জা হয়। এইজন্য—আমি ত আর ওয়াশিংটনের কাহাকেও চিনি না,—আজ সংবাদপত্রে আপনাদের সমিতির বৈঠক বসিবে দেখিয়া আপনাদের কাছেই এই লজ্জা নিবারণের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, আমাদের অর্থাগার প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছে, আগে জানিলে না হয় একটা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। আমি কহিলাম, তাঁহার দক্ষিণার ভাবনা আপনাদিগকে ভাবিতে হইবে না, সে ভার আমি লইলাম। আপনাদের হল আছে, এই হলে আপনারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করুন; আলো এবং বিজ্ঞাপনের খরচ ভিন্ন আপনাদিগকে আর কোনও

খরচের ভারই বহিতে হইবে না। সম্পাদক অল্পক্ষণের জন্য সমিতির সভ্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, আমাদের সভাপতি উপস্থিত নাই, তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিব কিরূপে? আমি কহিলাম, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, সেটুকু লিখিয়া দিন, আর সভাপতি মহাশয়ের বাড়ীর ঠিকানাটাও বলিয়া দিন, আমি তাঁহার নিকট যাইতেছি। তাঁহাকে রাজী করাইতে পারিলেই ত হইল? সম্পাদক মহাশয় কাজেই সমিতির অভিপ্রায় জানাইয়া সভাপতির নামে একখানা চিঠি আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁহার বাড়ীর ঠিকানাও টুকিয়া লইলাম। সভাপতির অনুমতি পাইলে, তাঁহাকে সেকথা ত জানাইয়া আসিতে হইবে! এই চিঠি লইয়া আমি সোজাসুজি সভাপতির সন্ধানে গেলাম। সভাপতির সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার মত লইয়া সেই রাত্রেই সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতে চিঠিখানা দিয়া আসিলাম।

ঘর ও পাওয়া গেল, আলোবাতিরও ব্যবস্থা হইল, বিজ্ঞাপনও ত বাহির হইবে, কিন্তু কেবল তাতেই ত আসর জমিবেনা! তার ব্যবস্থা কি করিব? তখন এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। তুমি ওয়াশিংটনে বক্তৃতা দিবে, সভাঘর যদি ভরিয়া না যায়, আর সহরের মাথাওয়ালা লোক যদি বক্তৃতায় উপস্থিত না হন, তাহা হইলে তোমারও অপমান, আমাদেরও লজ্জার কথা। কাজেই পরদিন প্রাতঃকালে সহরের বড় বড় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের নিকট ছুটিলাম। তাঁদের কহিলাম:—আগামী বৃহস্পতিবারে ফিলহারমনিক্ সোসাইটীর ঘরে একটা জাঁকাল রকমের সভা হইবে। ভারতবর্ষের একজন অতি প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক, ইংলণ্ডে সবাই যাঁহার নাম জানে, তিনি ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং সাধনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। ফিল্ হারমনিক্ সোসাইটী এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এত বড় খবরটা তোমাদের কাগজে খুঁজিয়া পাতিয়া পাইলাম না, এ কেমন কথা? তখন তাঁহারা বলিলেন, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এই সাংবাদটা আজই আমরা ছাপাইয়া দিব। আমি কহিলাম, কেবল এই সংবাদটা দিয়াই কি তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে? তোমাদের পাঠকেরা এই বক্তা কে ইহা কি জানিতে চাহিবেনা? সম্পাদকেরা কহিলেন, আমরা মাঝে মাঝে তাঁর নাম দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সবিশেষ ত তাঁর কথা কিছুই জানি না। তুমি কি আমাদিগকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারিবে? তখন আমি তাঁহাদিগকে তোমার সবিশেষ পরিচয় দিলাম। বক্তৃতার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সম্বন্ধেও এক একটা প্রবন্ধ বড় বড় শিরোনামার নীচে মুদ্রিত হইল। এ কাজটা শেষ হইলে ভাবিলাম, যাই হউক সভাগৃহ আর শূন্য পড়িয়া থাকিবে না। তখন ভাবনা হইল সহরের মাতব্বর লোকদিগকে জড়ো করি কিরূপে? প্রথমেই বুড়া ডাক্তার হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। ডাক্তার হ্যারিসের নাম তুমি শুনিয়াছ, ইনি আমাদের প্রধান দার্শনিক, International Journal of Speculative Philosophyর সম্পাদক, আর মার্কিণের যুক্তরাজ্যের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা—State Commissioner of Education."

আমি কহিলাম, "হ্যারিসের নাম আমার খুবই জানা আছে। তাঁর গ্রন্থাদিও কিছু কিছু দেখিয়াছি, আর তাঁর বার্ষিক রিপোর্টও (Report of the State Commissioner of Education U. S. A.) দু'একখানা আমার চোখে পড়িয়াছে।"

মিস্ ফক্স্ কহিলেন, "এই ডাক্তার হ্যারিস মার্কিণের মনীষীদিগের অগ্রণী। তাঁহাকে যাইয় কিরূপে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছি, সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এবং সভাপতির আসন গ্রহ করিতেও অনুরোধ করিলাম। তিনি সভাতে উপস্থিত থাকিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু সভাপা হইতে রাজী হইলেন না। যা হোক তাঁর উপস্থিতির জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ দিয়া আমি বিদা লইবার উপক্রম করিলাম। ডাক্তার হ্যারিস তখন কহিলেন, ফিল্ হারমনিক্ সোসাইটীই বি নিজে সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিবে? আমি কহিলাম, বক্তা বিনা দক্ষিণাতেই বক্তৃতা দিবেন তিনি কোথাও কোনও ফিসের দাবী করেন না; তবে আমাদেরও অন্ততঃ তাঁর রেল ভাড় ও হাত খরচার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। 'ডাক্তার হ্যারিস ইহা শুনিয়া একখানা দশ ডলারের নোট আমার হাতে দিলেন। এই আমার প্রথম পুঁজি হইল। ইহার পরে আরও দু'পাঁচজন মাতব্বর লোকের সঙ্গে দেখা করিলাম। ডাক্তার হ্যারিশ এই বক্তৃতায় ব্যবস্থার কথা শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন, নিজে উপস্থিত থাকিবেন, এবং খরচের জন্য ১০ ডলার দিয়াছেন, এ সকল কথ কহিলাম। "ডাক্তার হ্যারিস যে অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক তাহাতে ওয়াশিংটনের কেন আমেরিকার সর্ব্বত্রই বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ঝাঁকিয়া পড়িবেন, আমি জামি জানিতাম, সুতরাং হ্যারিসের সহানুভূতি পাইয়া বক্তৃতার আসরটা যে ভাল করিয়াই জমিবে, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহই রহিল না।

তারপর ভাবিলাম, তুমি ওয়াশিংটনে আসিবে আর আমাদের এই ছোট্ট বাসা বাড়ীতে থাকিবে, এত হয় না। সোসাইটীর অতিথি না হইলে তোমারও যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে না, আমাদেরও মান থাকিবেনা। সুতরাং তখন এই ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। য়্যুনিটেরিয়ানদিগের নিকট তুমি সুপরিচিত। ওয়াশিংটনের য়্যুনিটেরিয়ান সমাজের সকলের চাইতে বড়লোক কর্ণেল ব্লাউন্ট, ইহা জানিতাম, সুতরাং মিসেস্ ব্লাউন্টের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহাকে গিয়া তোমার বক্তৃতার কথা বলিলাম, আর ওয়াশিংটনে তোমার থাকা তখনও আর কোনও ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া আমাদের গরীব পেন্‌সিয়নে হয়ত তোমায় থাকিতে হইবে, একথাও কহিলাম। মিসেস্ ব্লাউন্ট কহিলেন, আগে সংবাদ পাইলে তিনি অতিশয় আহ্লাদসহকারে তোমার আতিথ্যের ভার লইতেন, কিন্তু এ সপ্তাহে একজন য়্যুনিটেরিয়ান ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের গির্জ্জায় আচার্য্যের কাজ করিতে আসিতেছেন, মিসেস্ ব্লাউন্ট তাঁহার আতিথ্যের ভার লইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কবে আসিবেন? মিসেস্ ব্লাউন্ট কহিলেন, শনিবার। আমি কহিলাম, তুমি বুধবার রাত্রে আসিবে, শনিবার রাত্রের গাড়ীতে তোমাকে

লুই ভিল্ যাইতে হইবে, রবিবারে লুইভিল্ য়্যুনিটেরিয়ান গির্জ্জায় তোমার আচার্য্যের কাজ করিবার কথা। মিসেস্ ব্লাউণ্ট কহিলেন, তাহা হইলে ত কোনও গোলই নাই। শনিবার পর্য্যন্ত তিনি স্বচ্ছন্দে ও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তোমার আতিথ্য সৎকার করিবেন।

তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থা ত হইল। তুমি ওয়াশিংটন সমাজের একজন অগ্রণীর অতিথি হইয়া আসিবে, তাহারও ব্যবস্থা হইল। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ত চাই। White Houseএর খাতায় তোমার নাম থাকা আবশ্যক। পরদিন প্রাতঃকালে White Houseএ যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিনলের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলাম। কহিলাম, ভারতবর্ষের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ওয়াশিংটনে আসিতেছেন; বৃহস্পতিবারে ফিল্ হারমনিক সোসাইটীর হলে বক্তৃতা দিবেন, ডাক্তার হ্যারিস প্রভৃতি সহরের গণ্যমান্য বিদ্বজ্জনেরা এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ইঁহার সাক্ষাৎ হয় কিরূপে? তিনি বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—তিনদিন মাত্র ওয়াশিংটনে থাকিবেন, এই সময়ের মধ্যে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে একটা Interview এর ব্যবস্থা করা ত চাই। সেক্রেটারী সাহেব কহিলেন, অসম্ভব। এই তিনদিনের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের মুহূর্ত্তমাত্র অবসর নাই। আমি কহিলাম, আচ্ছা, মিঃ পাল মিসেস ব্লাউণ্টের অতিথি। মিসেস্ ব্লাউণ্টকে যাইয়া বলি যে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তাঁহার দেখার সম্ভাবনা নাই। এই বলিয়াই আমি চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলাম। সেক্রেটারী কহিলেন, একটু বোস, আমি প্রেসিডেণ্টের Engagementএর তালিকাটা একটু দেখিয়া আসি। আমি বুঝিলাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। অল্পক্ষণ পরে সেক্রেটারী সাহেব খাতা হাতে আসিয়া কহিলেন যে শুক্রবার সকালে সাড়ে নয়টার সময় প্রেসিডেণ্ট সাহেবের একটু ফুরসৎ আছে, সে সময় তোমার সঙ্গে দেখা হইতে পারে। আমি কহিলাম, আচ্ছা মিসেস্ ব্লাউণ্টকে সেই সময় মিঃ পালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে কহিব। সেক্রেটারী সাহেব উত্তর করিলেন, মিসেস্ ব্লাউণ্টের আসা নিষ্প্রয়োজন, তুমিই সঙ্গে লইয়া আসিও।

কিন্তু ওয়াশিংটনের সমাজ যথাযোগ্যভাবে তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবে না কি? এই ভাবিয়া আবার মিসেস্ ব্লাউণ্টের সঙ্গে দেখা করিলাম। বলিলাম, মিঃ পাল আপনার অতিথি হইবেন। সামাজিক কর্ত্তব্য তাঁহার সম্বন্ধে আপনিই ঘাড় পাতিয়া লইয়াছেন; তাহার ব্যবস্থা কি করিবেন? তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটা সান্ধ্য-সম্মিলনের ত ব্যবস্থা করা চাই। তিনি কহিলেন, আমিও ইহা ভাবিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে চলিয়া যাওয়াতে আমি অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। নিমন্ত্রিতদিগের লিষ্টি করা, নিমন্ত্রণপত্র লেখা ও তাহার বিলি করিবার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে এখন একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার কন্যার বিবাহের খাটুনীতে আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি কহিলাম, আপনার কন্যা যাহা করিতেন, আপনার আদেশে আমি তাহা করিতে রাজী আছি। আপনার বাড়ীতে যাঁরা সচরাচর নিমন্ত্রিত

হন, তাঁদের নামের লিষ্টি ও ঠিকানা ত আপনার কাছে আছে? সে খাতাখানা পাইলে নিমন্ত্রণের চিঠিপত্রের ব্যবস্থা আমিই করিতে পারি। তখন মিসেস্ ব্লাউন্ট সেই খাতাটা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন। শুক্রবার রাত্রি ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে তোমার সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইল। আমাকেই মিসেস্ ব্লাউন্টের নামে সমস্ত নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করিতে হইয়াছে। ওয়াশিংটনে তোমার প্রথম engagement বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে ফিল্‌হারমনিক্ বক্তৃতা, শুক্রবার প্রাতে ৯॥০টার সময় রাষ্ট্রপতি ম্যাক্ কিন্‌লের সঙ্গে সাক্ষাৎ। শুক্রবার রাত্রি ৯॥০ টার সময় মিসেস্ ব্লাউন্টের বাড়ীতে সান্ধ্য সম্মিলন।"

এই দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। একটি সামান্য স্ত্রীলোকের চেষ্টায় এসকল আয়োজন কেবল মার্কিণেই সম্ভব। আর সম্ভব মার্কিণ স্বাধীনতা এবং মানবতার লীলাভূমি বলিয়া। এখানে মানুষের মানুষ বলিয়া একটা দাম আছে। আমার ওয়াশিংটন যাওয়া উপলক্ষে মার্কিণ সমাজের এবং মার্কিণীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাইলাম, কেতাব পড়া ত দূরে থাক, মার্কিণের নানাস্থানে তিন মাসকাল অনবরত ভ্রমণ করিয়া ও নানা শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে নানারূপ সংস্রবে আসিয়াও সে পরিচয় পাই নাই।

(২৫)

যথাসময়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে সভাগৃহে যাইয়া দেখিলাম, ঘরটা খুব বড় নয় বটে, কিন্তু স্ত্রী পুরুষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম ওয়াশিংটন সমাজের মনীষীদলের প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। কাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করা হয়, মনে নাই। কেবল এইমাত্র যেন মনে পড়ে যে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য ছিলেন। ওয়াশিংটনে যাইয়া অবধি এই বক্তৃতার কথা যখনি মনে হইয়াছে, তখনই ডাক্তার হ্যারিসের সম্পাদিত Journal of Speculative Philosophyর কথাও মনে পড়িয়াছে। আর ডাক্তার হ্যারিস আগাগোড়া ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তা এবং প্রাচীন মনীষাকে গ্রীক এবং খৃষ্টীয় দার্শনিক চিন্তা এবং মনীষার তুলনায় সর্ব্বদা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; এই কথাটাও মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। মার্কিণের চিন্তানায়কেরা ডাঃ হ্যারিসের কথা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, একথাও আমার জানা ছিল। ওয়াশিংটনের মনীষী-সমাজ ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান নহেন; সভায় যাইবার পূর্ব্ব হইতেই আমার মনের ভিতর এই কথাটা আলোড়িত হইতেছিল। সুতরাং যদি ভগবান কৃপা করেন, তাহা হইলে ডাঃ হ্যারিসের ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় মতবাদের একটা ভাল জবাব দিবার ইচ্ছা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ওয়াশিংটনের বক্তৃতায় আমি এই প্রয়াসই পাইয়াছিলাম।

য়ুরোপের অধিকাংশ দার্শনিকেরা শঙ্কর-বেদান্ত-দর্শনকেই ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠতম বিবৃতি বলিয়া বিবেচনা করেন। কেহ বা শঙ্কর-বেদান্ত মত স্বল্পবিস্তর গ্রহণও করিয়া

থাকেন। কেহ বা ইহাকে বর্জ্জন করিয়া চলেন। কিন্তু সকলেই বেদান্ত বলিতে শঙ্কর-বেদান্ত মাত্রই বুঝেন, এবং শঙ্কর-সিদ্ধান্তকেই ভারতীয় দর্শনের চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন। ডাঃ হ্যারিস শঙ্কর-বেদান্তের মায়াবাদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াই আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মায়াবাদ বিশ্ব-সমস্যার কোনও মীমাংসাই করিতে পারে না, কেবল সৃষ্টি-সমস্যাকে একটা কথা দিয়া ধামা চাপা দিতে চাহে। মোটামুটি ইহাই ডাঃ হ্যারিসের সমালোচনার মূল সূত্র ছিল। আমার বক্তৃতাতে আমি এই সমালোচনার ভুল ভ্রান্তি দেখাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলাম।

আমি প্রথমে উঠিয়াই সামান্য ভূমিকার পরে কহিলাম, ভারতের দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা পশ্চিমের লোককে বুঝান সহজ নহে। য়ুরোপ দর্শন বলিতে Speculation বুঝে। য়ুরোপের দর্শন মনগড়া বস্তু; 'যেহেতু অতএবের' উপরে প্রতিষ্ঠিত; অনুমান ও উপমানের উপরেই য়ুরোপের দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। Logicএর উপরে Philosophy গড়িয়া উঠিয়াছে। এই Logic দুইভাগে বিভক্ত—deductive এবং inductive। য়ুরোপের দর্শন সচরাচর এই Logicএর সাহায্যেই বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। অল্পকাল হইল Logicএর আর একটা ধারার কথাও য়ুরোপ কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ধারার নাম Transcendental Logic। Deductive এবং inductive Logicএর প্রতিষ্ঠা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপরে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের আর একটা পথ আছে। সেই পথটার খোঁজ পাইয়াই য়ুরোপের চিন্তা Transcendental Logicএর কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনেরা বহু সহস্রাব্দ পূর্ব্বে সেই পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এপথকে অপরোক্ষ অনুভূতি বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পথ কহিয়াছেন। জ্ঞাতা যে আত্মা, সে যখন কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে আপনার জ্ঞেয় বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখন তাহার সেই বিষয়ের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়। এই অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারাই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, অনুমান এবং উপমানের দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, সেই সকল ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। ইহাই দর্শনের বিষয়। ইংরাজীতে যাহাকে philosophy কহে, আমরা তাহাকেই দর্শন কহিয়া থাকি। দর্শন অর্থই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভব। আমাদের পরিভাষায় দর্শন আর জ্ঞান একই কথা। আর জ্ঞান বলিতে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভবে যাইয়া যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই কেবল বুঝিয়া থাকি। এইজন্য আমাদের দর্শন speculation নহে, কিন্তু direct cognition। ভারতীয় দর্শন যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে গেলে, সকলের গোড়াতে এই কথাটাই বুঝিতে হয়। এই দর্শন speculationএর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধনার দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে বিশুদ্ধ করিয়া আত্মা যখন নিজের স্বরূপে অবস্থিতি করে, সেই যোগের অবস্থাতে যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ হয়, তাহারই

উপরে ভারতের মূল দর্শন প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ইহার নাম, দর্শন—দেখা, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ অনুভবেতে ধরা। এই দর্শনের একটা সাধনা আছে, culture আছে। ইহার একটা সাধন,—যমনিয়মাদি দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি discipline। আমাদের দর্শন এবং ধর্ম্ম ভিন্ন নহে। দর্শনের সাধনাঙ্গ ধর্ম্ম বা religion; আর ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গ দর্শন বা philosophy। philosophy বা দর্শনকে জীবনে পরিণত করিবার পথ, ধর্ম্মসাধন; ধর্ম্মের সত্যকে ও তত্ত্বকে অপরোক্ষ অনুভবেতে ধরিবার পথ দর্শন। ভারতবর্ষের প্রাচীনেরা তাঁহাদের দর্শনকে যে স্থানে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, য়ুরোপের দার্শনিকেরা এখনও ভাল করিয়া সে স্থানের সন্ধান পান নাই। এইজন্যই য়ুরোপ ভারতীয় দর্শনের পরিভাষা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বেদান্ত সর্ব্ব প্রধান। বেদান্তের প্রশ্ন, ব্রহ্ম কাহাকে বলে? ব্রহ্ম বস্তু কি? বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া মানুষ যখন ইহার মীমাংসার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। এই বলিয়া আমি তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবারুণীসম্বাদের অবতারণা করিয়া ধাপে ধাপে কিরূপে জড়-বিজ্ঞান হইতে জীব-বিজ্ঞানে, জীব-বিজ্ঞান হইতে মনোবিজ্ঞানে, মনোবিজ্ঞান হইতে দর্শনে এবং রসতত্ত্বের ভিতর দিয়া পরমতত্ত্ব যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাতে উপনীত হইতে হয়, যথাসাধ্য ইহা বিবৃত করিলাম। এই ভৃগুবারুণীসম্বাদের ব্রহ্মতত্ত্বেই ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা; ইহাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। এই বেদান্ত-দর্শন দুই ধারাতে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এক ধারা শঙ্কর-বেদান্তের ধারা; আর এক ধারা বৈষ্ণব-বেদান্তের ধারা। য়ুরোপীয়েরা শঙ্কর-বেদান্তের কথাই কিছু কিছু জানেন। বৈষ্ণব-বেদান্তের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় নাই বলিলেই হয়। এইজন্য অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিতে ভারতবর্ষের দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; অলীক কল্পনা বা Vain Speculation বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করেন।

মায়া বলিতে তাঁরা একটা ম্যাজিক, একটা যাদু বুঝেন। যাহা বস্তু নহে, তাহাকে বস্তুর মতন দেখাইয়া ভ্রান্তি সৃষ্টি করাই ম্যাজিকের বা যাদুর কার্য্য। ইহাই মায়া। এই সৃষ্টিটা সত্য নহে, কিন্তু একটা অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞাত যাদুশক্তি প্রভাবে আমাদের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই যাদুশক্তির নামই মায়া। এই 'মায়া বা 'illusion-বাদের উপরেই ভারতের বেদান্তদর্শন বিশ্বসমস্যার মীমাংসাকে দাঁড় করাইয়াছেন, অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে মায়াকে ম্যাজিক বলা যায় বটে। আমাদের শাস্ত্রেও মায়াকে অঘটনঘটনপটীয়সী কহিয়াছেন। যাহা ঘটিতে পারে না, তাহা ঘটানোই মায়ার কার্য্য। কিন্তু যাহা ঘটিতে পারে না তাহার অর্থ কি? ব্রহ্ম এই বিশ্বের কারণ, বিশ্ব তাঁহারই কার্য্য। কারণের বিকারেতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ব্রহ্মকে বিশ্ব-কার্য্যের কারণ বলিলে তাঁহাতে বিকার আরোপ করিতে হয়। এত বড় মুস্কিলের কথা। অবিকারী যে ব্রহ্ম তাঁহা হইতে এই বিকাররূপ

বিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব হয় কি রূপে ? বিশ্ব যে আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। বিশ্ব যে পরিবর্ত্তন বা বিকারশীল, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। আর ব্রহ্ম যে আছেন অর্থাৎ এই বিশ্বরূপ কার্য্যের অনাদি-আদি কারণ যে আছে, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। অনাদ্যনন্ত ব্রহ্ম যে নিত্য সত্য সনাতন, তাঁহার মধ্যে যে কোনও প্রকারের পরিবর্ত্তন নাই, হইতেই পারে না, হইলে যে তাঁহার নিত্যত্ব ও সনাতনত্ব নষ্ট হইয়া যায়, এ সকল কথাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। এই যে নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্ম, যিনি জগতের অনাদি-আদি কারণ, তাঁহা হইতে এই চঞ্চল ক্রমাভিব্যক্ত জগৎপ্রপঞ্চ বা বিশ্বপ্রবাহের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব, এই প্রশ্নের মীমাংসার সন্ধানে যাইয়াই ভারতীয় বেদান্ত দর্শন এই মায়াবাদের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মায়া অর্থ মিথ্যা নহে। মায়া অর্থ ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জগতের আদি কারণ হইয়াও নিজে অবিকৃত থাকিয়া বিশ্বকার্য্য প্রবাহিত করিতেছেন, তাহারই নাম মায়া। ইংরাজীতে মায়াকে illusion বলিলে তাহার সদর্থ হয় না। মায়ার প্রকৃত ইংরাজী অনুবাদ magicও নহে, illusionও নহে, কিন্তু জগৎ রচয়িতার Creative Will. খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে শব্দব্রহ্মবাদের বা Logos-বাদের আশ্রয়ে এই বিশ্বসমস্যার মীমাংসার যে চেষ্টা হইয়াছে, ভারতের বেদান্তদর্শন মায়াবাদের আশ্রয়ে সেই সমস্যারই মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। "আদিতে বাক্য ছিলেন—In the beginning was the Word; এই বাক্য বা Word ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এই বাক্য বা Wordএর দ্বারাই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এই বাক্য বা Wordকে এখানে আনার আয়োজন এই যে ঈশ্বরকে যদি স্রষ্টা বলা হয়, তাহা হইলে এই সৃষ্টি কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তারূপ ঈশ্বরের মধ্যে সর্ব্বদাই নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা মানিতে হয়। বিশ্বস্রষ্টার নিত্যত্ব এবং সনাতনত্ব রক্ষা করিবার জন্য গ্রীক দর্শন এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মশাস্ত্র এই শব্দব্রহ্মবাদের বা Logos-বাদের আশ্রয় লইয়াছেন; আমাদের বেদান্তদর্শন সেইরূপ এই সমস্যার মীমাংসার সন্ধানে যাইয়া মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই কথাটা বুঝিলে, এই মায়াবাদকে একটা অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না।

তার পর ভারতের বেদান্তদর্শনের দুই ধারা, এক শঙ্কর-বেদান্ত, আর এক বৈষ্ণব বেদান্ত। শঙ্কর বেদান্তে ব্রহ্মস্বরূপেতে কোনও প্রকারের ভেদ স্বীকার করেন না; বৈষ্ণব বেদান্তে ব্রহ্মস্বরূপেতে ভেদ আছে, ইহা মানিয়া থাকেন। কিন্তু এই ভেদের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের অখণ্ড একত্ব নষ্ট হয় না। এই ভেদ ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর সঙ্গে নহে, কিন্তু তাঁহার নিজের মধ্যে। ব্রহ্ম জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। জ্ঞান বলিলেই একজন জ্ঞাতা এবং তাঁর জ্ঞেয় বিষয় বুঝায়। আনন্দ বলিতে ভোক্তা এবং ভোগ্যের সম্বন্ধ বুঝায়। আমাদের জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় এবং ভোগের বিষয় বা ভোগ্য আমাদের বাহিরে আছে। কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞেয় এবং ভোগ্য তাঁহার নিজের স্বরূপের ভিতরেই রহিয়াছে। তিনি আপনি আপনার জ্ঞেয়; আপনি আপনার ভোগ্য।

ব্রহ্ম নিজের স্বরূপের মধ্যে নিয়তই একটা ভেদের সৃষ্টি করিয়া আপনি আপনার জ্ঞেয় এবং আপনি আপনার ভোগ্য হইয়া আপনার জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিতেছেন। ব্রহ্মের একত্ব undifferentiated unity নহে, কিন্তু Self-differentiated unity। ব্রহ্মের ভিতরে একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদ রহিয়াছে। বৈষ্ণব-বেদান্ত ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ inconceivable unity in difference and inconceivable difference in unity প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধেতে ব্রহ্মের জ্ঞাতা এবং ভোক্তারূপে ব্রহ্মকে পুরুষ কহিয়াছেন। আর ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞেয় এবং ভোগ্যকে প্রকৃতি কহিয়াছেন। জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য জ্ঞাতার অনুরূপ জ্ঞেয়ের প্রয়োজন হয়। ভোক্তার পূর্ণতার জন্য তাঁহার অনুরূপ ভোগ্যের প্রবোজন হয়। জ্ঞেয় এবং ভোগ্য জ্ঞাতা এবং ভোক্তা অপেক্ষা ছোট হইলে জ্ঞান এবং ভোগ পরিপূর্ণ হইতে পারে না। এইজন্য পুরুষ এবং প্রকৃতি গুণে এবং শক্তিতে একে অন্যের সমান। এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোনও তারতম্য নাই। আর যে আত্ম-বিভাগের দ্বারা অখণ্ড চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আপনি আপনার জ্ঞেয় এবং ভোগ্য হইয়া থাকেন, তাহাকে আমাদের পরিভাষায় লীলা কহে। এই লীলা অবিরাম চলিতেছে। জ্ঞানের আরম্ভ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদের প্রকাশ হইতে। কিন্তু এই ভেদ নিঃশেষে বিলোপ পাইয়া জ্ঞেয়কে জ্ঞাতার নিজের স্বরূপের সঙ্গে না মিশাইয়া দিলে জ্ঞান পূর্ণ হয় না। জ্ঞানক্রিয়ার সূচনায় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুই; জ্ঞানের পূর্ণতায় জ্ঞাতাই জ্ঞেয় হইয়া যায়, দুইয়ের মধ্যে আর ভেদ থাকে না। কিন্তু জ্ঞানের এই পূর্ণতাতেই আবার জ্ঞান লোপ পায়; তখন প্রলয়ের অবস্থা। কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপের জ্ঞান লোপ পাইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানের পরিপূর্ণতাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ নষ্ট হইবামাত্রই আবার জ্ঞানের প্রয়োজনে নূতন ভেদের সৃষ্টি হয়। এইরূপে ভেদের পরে অভেদ, অভেদের পরে ভেদ, এই লীলাচক্র অবিরাম ঘুরিতেছে। ইহাই ভগবানের জ্ঞানলীলা। ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আনন্দ জন্মে না। আবার এই আনন্দের চরম অবস্থাতে ভোক্তা ভোগ্যকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া যান। জ্ঞানের আরম্ভে যেমন ভেদ, পরিণতিতে অভেদ, আনন্দেতে তাহাই হয়। দুই না হইলে আনন্দ হয় না। আবার আনন্দের পরিপূর্ণ অবস্থায় দুই মিলিয়া এক হইয়া যায়। এইরূপ ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপের মধ্যেও ভেদের পরে অভেদ, অভেদের পরে আবার ভেদ, এই ভেদাভেদ চক্র অবিরাম ঘুরিতেছে। ইহাই ব্রহ্মের আনন্দলীলা বা রসলীলা। এই লীলাই বৈষ্ণববেদান্তের মূল সূত্র। এই ভেদাভেদবাদ খৃষ্টীয়ান সাধনাতেও ধরা পড়িয়াছে। খৃষ্টীয়ান সাধনায় যাহাকে Eternal Generation of Christ কহে, বৈষ্ণব সাধনায় তাহাকেই ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলা কহে। আমরা যাহাকে পুরুষ কহিয়াছি, খৃষ্টীয়ানেরা তাহাকেই পিতা কহিয়াছেন। আমরা যাহাকে প্রকৃতি কহিয়াছি, খৃষ্টীয়ানেরা তাহাকেই Son কহিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাধনার পরমতত্ত্ব

যে শ্রীকৃষ্ণ তিনিই পুরুষ; এই শ্রীকৃষ্ণই খৃষ্টীয়ান সাধনার God। আমাদের বৈষ্ণব-সাধনার প্রকৃতি বা শ্রীরাধা খৃষ্টীয়ান সাধনার Christ। এই ভাবে দেখিলে হিন্দুদিগের বৈষ্ণব-বেদান্তের সঙ্গে খৃষ্টীয়ানদিগের তত্ত্বসিদ্ধান্তের একটা অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কর বেদান্তে যাহাকে মায়া কহিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাই তাহাকে প্রকৃতি কহেন। শঙ্কর-বেদান্ত মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি কহিয়া থাকেন, কিন্তু শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মানেন না। বৈষ্ণব-বেদান্তে প্রকৃতিকে পুরুষের শক্তি কহিয়া থাকেন বটে; কিন্তু এই প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্নও নহেন, আবার পুরুষের সঙ্গে একান্ত অভিন্নও নহেন, এই কথা কহিয়া প্রকৃতির একটা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। এই ভেদাভেদের ভিতর দিয়াই অদ্বয় জ্ঞানবস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহার পুরুষবিধত্বের বা personality'র প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। শঙ্কর বেদান্তের ব্রহ্ম impersonal বা super-personal। বৈষ্ণব-বেদান্তের ব্রহ্ম personal। শঙ্কর-বেদান্তই একমাত্র হিন্দু দর্শন নহে। হিন্দুর দার্শনিক চিন্তার আর একটা ধারা আছে, একথাটা না জানাতেই য়ুরোপীয়েরা মনে করেন হিন্দুর দর্শন কেবল গাঁজাখুরী মাত্র। আর ভৃগুবারুণীসম্বাদ পড়িলে দেখিতে পাই, আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন যেমন জড়-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতেছে, ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই চেষ্টাই করিয়াছিল। য়ুরোপে যেমন একটা মধ্যযুগ বা তমোযুগ, Dark Ages বা Middle Ages গিয়াছে, য়ুরোপের অভিব্যক্তির ইতিহাসে যেমন একটা Mediaeval Stage দেখা যায়, ভারতবর্ষেও সেইরূপ একটা তমোযুগ বা মধ্যযুগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মধ্যযুগে যেমন য়ুরোপে সেইরূপ ভারতবর্ষে মানুষের চিন্তা এবং সাধনা বস্তুসংস্পর্শ হারাইয়া নিতান্ত অন্তর্মুখী বা subjective এবং কাল্পনিক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই মধ্যযুগের ভারতীয় চিন্তাকে ভারতবর্ষের মনীষার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না। সে প্রমাণ পাই প্রাচীন উপনিষদাদিতে। সে প্রমাণ পাই সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনাতে। আর সে প্রমাণ পাই বেদান্তসূত্রে বা পূর্ব্ব-মীমাংসায়। আর পাই এই বৈষ্ণব-বেদান্তে।

মোটের উপরে এই কথাগুলিই আমি ওয়াশিংটনের এই বক্তৃতায় যথাসাধ্য ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বক্তৃতার পরে বৃদ্ধ ডাক্তার হ্যারিস আমার কাছে আসিয়া কখন তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা করিবার সুবিধা হইবে জিজ্ঞাসা করেন। পর দিবস মধ্যাহ্নে তাঁহার কর্ম্মস্থলে যাইয়া দেখা করিব, এই বন্দোবস্ত হয়। এই "দেখার" কথা জীবনে ভুলিব না। তাঁহার ঘরে ঢুকিবামাত্র দুহাতে আমার হাত ধরিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত কি বিনয় প্রকাশ করিলেন, তাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। "ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তাতে এ সকল কথা আছে, আমি জানিতাম না। এইজন্য প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তা-শক্তির প্রতি আমি কি অবিচার করিয়াছি!

এ অজ্ঞতা ও অপরাধের জন্য আমি তোমাদের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমরা পশ্চিমে তোমাদের দর্শনের মায়ার কথাই বিশেষ শুনিয়াছি। শঙ্কর-বেদান্তের কথাই যা একটু আধটু জানি। এরই পাশে পাশে যে আর একটা বিশাল ও গভীর চিন্তাধারা বহিয়া গিয়াছে তার কোনও খোঁজ পাই নাই। এইজন্য আমি এই ক'বছর ধরিয়া ভারতবর্ষের দর্শনের অযথা সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিও।" একবার দু'বার নয়, এক একটা কথা কহিয়াই ডাঃ হ্যারিস বারম্বার এই বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বিনয় দেখিয়া আমি একদিকে লজ্জায় ও আর দিকে গৌরবে ভারী হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এই বৈষ্ণব-বেদান্তের কোনও ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে কি না জানিতে চাহিলেন। তখনও শ্রীভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের গোবিন্দ-ভাষ্যের কথা আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মুখে শুনিয়াছিলাম। আমাদের সাধারণ ইংরাজীনবীশেরা তাহার কোনওই খোঁজ জানিতেন কি না সন্দেহ। সুতরাং বৈষ্ণব-বেদান্ত সম্বন্ধে কোনও ইংরাজী গ্রন্থের নাম করিতে পারিলাম না। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ থিবোর শঙ্কর-ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের ভূমিকায় সংক্ষেপে তিনি শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও রামানুজ-সিদ্ধান্তের একটা তুলনায় সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ডাঃ হ্যারিসকে একথা কহিলাম। অমনি তিনি তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া Sacred Books of the East গুলি আনাইয়া টেবিলের উপর স্তূপাকৃত করিলেন, এবং আমাকে থিবোর ভূমিকার সেই অংশটা দেখাইয়া দিতে কহিলেন। আমি বই খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি তাহা টুকিয়া লইলেন। তারপর ভৃগুবারুণীসম্বাদ কোথায় আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ম্যাক্স মুলারের উপনিষদের অনুবাদ খুলিয়া ইহা বাহির করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত ইহাও টুকিয়া লইলেন। তারপর আরও অনেক কথা হইল। সকল কথা মনে নাই। তবে দু'তিন মিনিট পরে পরেই যে তিনি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার প্রতি অমর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মার্জ্জনা চাহিতেছিলেন, একথা ভুলিব না।

আগেকার বন্দোবস্ত মত রাষ্ট্রপতি ম্যাক্ কিন্‌লের সঙ্গেও দেখা হইয়াছিল। মিনিট দশ পনের বোধ হয় কথাবার্ত্তা হয়; কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য সে কথাতে কিছু ছিল না।

(২৬).

ওয়াশিংটন হইতে পশ্চিম আমেরিকা ঘুরিয়া আবার বষ্টনে গেলাম। এই বৎসর বষ্টনে আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের পঞ্চসপ্ততি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে খুব সমারোহ হয়। দেশবিদেশ হইতে বহু পণ্ডিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। আমাদের এ দেশ হইতে ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিমন্ত্রণে আমিও সেখানে যাই। বষ্টনে সব চাইতে বড় হোটেল বেক্লে

ভিউ হোটেল। য়্যুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের বাড়ীর নিকটেই হোটেল ছিল। এই উৎসব উপলক্ষে বড় বড় সভাদির অধিবেশন ট্রেমণ্ট টেম্পলে হইয়াছিল। এই ট্রেমণ্ট টেম্পলও বেলে ভিউ হোটেলের অতি নিকটে ছিল। এই হোটেলেই য়্যুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা দুই তিন শত অভ্যাগত একসঙ্গে এই হোটেলেই ছিলাম। য়্যুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনই আমাদের সমুদায় খরচ বহন করিয়াছিলেন। ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকের জন্য য়্যুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনকে প্রতিদিন সাত আট ডলার অর্থাৎ আমাদের কুড়িপঁচিশ টাকা এই হোটেলকে দিতে হইয়াছিল। সাত আট দিন ধরিয়া এই অতিথি-সৎকার চলিয়াছিল। ইহা হইতেই কতটা সমারোহ সহকারে য়্যুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশন এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, জর্ম্মানি, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, দিনেমার, নরওয়ে এবং বোধ হয় রাশিয়া হইতে খ্যাতনামা একেশ্বরবাদীরা এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জাপানে আমেরিকার য়্যুনিটেরিয়ানদের একটা বড় প্রচারক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানের য়্যুনিটেরিয়ান মণ্ডলীর দু'একজন প্রতিনিধি বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সকল অভ্যাগতদিগকে বক্তৃতা দিবার বা উপাসনাকালে আচার্য্যের কর্ম্ম করিবার অবসর দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং এই উৎসব উপলক্ষে আমাকে কোনও বক্তৃতা দিতে হয় নাই। মজুমদার মহাশয়কে একটিমাত্র বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার এই বক্তৃতাতে আমিও ভারতবর্ষের লোক বলিয়া আমাকে মঙ্গলাচরণটি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই বষ্টনের আরও কতকগুলি সভাসমিতির বার্ষিক উৎসব হয়। তার এক সভায় আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল।

এই সভার নাম Massachusset's Moral Education Society. একদিন প্রাতঃকালে এই সভার বার্ষিক উৎসবের আয়োজন হয়। ঐ সময়ে আমার কি আর একটা কাজ ছিল। এইজন্য সভায় উপস্থিত হইতে আমার কিছু বিলম্ব হইবে বলিয়াছিলাম। আরও অনেক বক্তা ছিলেন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই রাজী হন। আমি যাইয়া দেখিলাম সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। একটি ভদ্র-মহিলা সভানেত্রীর আসন অধিকার করিয়া আছেন। আমি যখন সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হইলে এক বৃদ্ধ খৃষ্টীয়ান পাদরী বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তিনি উঠিয়াই পকেট হইতে ছোট্ট একখানা বাইবেল বাহির করিয়া কহিলেন যে "অতি শৈশবে আমার জননী আমার হাতে এই পুস্তকখানি দিয়াছিলেন। আমি যাহা ধর্ম্ম ও নীতি বলিয়া জানি তাহা এই পুস্তকেই আছে। এছাড়া কোনও প্রকারের ধর্ম্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা সম্ভব নহে। দুনিয়ার সকল লোকে একথা মানে না। ভারতবর্ষের লোকেরা গরুর ল্যাজ চুম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তারা পবিত্রতালাভের জন্য গোবর খাইয়া থাকে। গরুর মাংস খাওয়া অপেক্ষা

গোবর খাওয়াটা তারা ভাল বলিয়া মনে করে।" আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অমনি চেঁচাইয়া উঠিলাম—Hear Hear! তারপর তিনি কহিলেন, "বৃক্ষের পরিচয় ফলেতে, ধর্ম্মের পরিচয় সমাজে। খৃষ্টধর্ম্মের পরিচয় খৃষ্টীয়ান সমাজ। মুসলমান ধর্ম্মের পরিচয় ইস্‌লাম জগত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিচয় ভারতবর্ষ। খৃষ্টধর্ম্মের বাহিরে নীতিশিক্ষার কোনওপ্রকারের ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" ইঁহার বক্তৃতা এত অনুদার হইয়াছিল যে লোকে বিরক্ত হইয়া দলে দলে উঠিয়া গেল। হলটা ফাঁকা হইতে লাগিল।

ইঁহার পরেই আমার পালা। বুঝিলাম আমিই শেষ বক্তা। আমি উঠিয়াই একেবারে মঞ্চপ্রান্তে যাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। দাড়াইয়া কহিলাম—সে বক্তৃতাটা এখনও আমার মনে আছে।

"Madam President, Ladies and Gentlemen! I stand before you as a heathen. Heathen means one who is not a Christian; and I am not ashamed to say that I am not a Christian. Whatever little hesitancy I may have had to make such a confession before a Christian audience, two years ago, when I left my native shores, after two years of the closest study of your so called Christian civilisation in fog and rain and sleet and snow, by gaslight and electric light and whatever little sun-light God grants to your country—in London, Birmingham, Manchester, Glasgow, Edinburgh, New York, Chicago and Boston—in Picadilly and Leicester Square, in Princes street, in the Bowry and Tremmont street—I am prouder than ever that I am not a Christian. But I did not come to tell you of all these things. But God proposes and (পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলাম) somebody else disposes."

তারপরেই কহিলাম যে একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধর্ম্ম ও নীতি স্বতন্ত্র; আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধর্ম্ম ও নীতি অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু একটা ধর্ম্ম আছে, যাহা কেবল নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে নীতির বিরোধী। যে ধর্ম্ম কহে মানুষের জন্ম পাপে, সে ধর্ম্ম নীতির মূল ছেদন করিয়া দেয়।

Born of the Devil I must own my father and claim my heritage as the son of the Devil. Born in sin, if this be a fact, then I must run the course of my life in sin. Not to do so would really be sinful to me, for the highest law to me is the law of my being.

কিন্তু এ মরা বকরী আবার জবাই করিয়া লাভ কি? মানুষের জন্ম পাপে ও পরিণাম অনন্ত নরক—এ সকল মতবাদ সভ্যসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সকল এখন কেবল প্রাচীন পুস্তকাগারে ধূলিসমাচ্ছন্ন পুস্তকের ভিতরেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সভ্যলোকে এ সকল নীতি বিগর্হিত মতবাদে আর বিশ্বাস করে না। যাক্ সে সকল কথা। নীতিশিক্ষা দেওয়া তোমার সভার উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমাদের নীতিশিক্ষার কথা আমি যখনই দেখি ও ভাবি, তখনই বিভ্রান্ত

হইয়া যাই। আমি ঠাওর করিয়া উঠিতে পারি না, তোমরা দেবতা না নীরেট বোকা—Are you gods or fools ? তোমাদের ঈশ্বর কহিয়াছিলেন, আলোক হউক, আর অমনি আলো ফুটিয়া উঠিয়াছিল—বাইবেল একথা কহে। তোমাদের পাদ্রীরা কহেন সাধু হও, আর অমনি তোমরা সাধু হইয়া উঠ ; সংযমী হও, আর অমনি তোমাদের সংযম ফুটিয়া উঠে। এ যদি সত্য হয়, তবে তোমরা মানুষ নও, দেবতা। আর এ যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে তোমরা নীরেট বোকা ; কত ধানে কত চাল কিছুই বুঝ না।

You take the credit of being a practical people. My People have never been practical—practical iu robbing other people's lands and robbing other people's gold. But they were very practical in matters pertaining to the inner life. The moral education which they imparted was therefore never merely instructive but always constructive. They knew that our character depended very largely if not absolutely upon our nerves ; and they said, take care of your nerves and your character and morals will take care of themselves. The physiological reference of ethics or moral education have commenced to be realised even by your physiologists and psychologists. But, it has been recognised ages and ages ago by my people. They therefore tried to build up man's morals and character on his nerves, and tried to regulate man's food and his ordinary habits of life with a view to help him to attain moral perfection. But all the moral education that you seem to know so far consists in oral instructions. You have perfected the methods of this oral instructions to a degree unknown to us. I have seen the beautiful charts used by your Sunday schools to quicken the love of lower animals in the young people. But when the Sunday School is dismissed, and the young boys and girls walk to their homes along streets where so often and at such short intervals huge carcasses of animals hanging from the ceiling at butcher's windows and when sitting down to their Sunday dinner, they see a big limb of some of these animals steaming on the table, the master of the house sharpening the carving knife almost like an expert butcher, while the whole family is eagerly looking on the operation—I have often wondered what effect the lesson on love of animals taught in the Sunday schools is left in minds of scholars. My people are mostly vegetarians. And even those who take meat have it cut up into such small pieces before they are cooked and made ready for food that it requires an effort of the imagination to call to mind the living animal from the sight of the cooked food. Then again, what pains do not you take to instruct your children to be kind to the poor. But if a poor and wretched hungry brother knocks at your door, when you are at dinner, you go out and make him to the nearest policeman and return to your half-finished meal on strawberry cream and short cake in the full satisfaction of having done a human duty by a famished brother. But my little girl, three years old, would pester the life out of her mother if a poor man came at her door and was not given a dole of rice or pulse, or potato or sweets. But what's the good my telling you all these things. You are Civilised and we are Barbarians. এই বলিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম।

পাদ্রী সাহেব যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন অনেক লোক উঠিয়া গিয়াছিলেন। পরে বুঝিলাম যে তাঁহারা একেবারে সভার বাড়ী ছাড়িয়া যান নাই, কেবল হলের বাহিরে যাইয়া পায়চারী বা গল্পগুজব বা ধূমপান করিতেছিলেন। কারণ, আমি যেই বক্তৃতা করিতে উঠিলাম, আর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী হাততালি দিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলেন, অমনি আবার ঘরটা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তারপর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে আমি তাহাদের সভ্যতা ও সাধনার উপরে এমন তীব্র আক্রমণ করিলাম, অথচ কেউ রাগ করিল না, কেউ বিরক্ত হইল না, কেউ সভাস্থল ছাড়িয়া গেল না ; বরঞ্চ মুহুর্মুহু করতাল ধ্বনি করিয়া আমার কথায় সায় দিতে লাগিল। এরূপ মানসিক উদারতা আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। আমিই শেষ বক্তা ছিলাম। আমার বক্তৃতা শেষ হইবার পরেই সভা ভঙ্গ হইল। তখন শ্রোতৃমণ্ডলী আমাকে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই ভদ্র মহিলা। কেহ কহিলেন, মিঃ পাল, আমরা কি এতই মন্দ? আমি কহিলাম, আমি কি তা বলেছি? তবে কথায় বলে, জানেনই ত, ঢিল ছুড়িলে পাটকেল খাইতে হয়। কেহ বা বলিলেন, মিঃ পাল, আমি বড় খুসী হইয়াছি। যেমন বেয়াদবী করিতে গিয়াছিল, তেমনি জবাব মিলিয়াছে। সভাভঙ্গের পরে হোটেলে আসিয়া খাইতে গেলাম। আহার শেষ করিয়া যেই বাহিরে আসিয়াছি, দেখিলাম আমার গোটা বক্তৃতাটা সংবাদপত্রে ছাপা হইয়া বিক্রী হইতেছে। ইহার পরে যে কদিন বষ্টনে ছিলাম, প্রতিদিন আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে চিঠি পাইতে লাগিলাম। কেহ বা আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আর কচিৎ কেহ বা খৃষ্টীয়ান নীতি ও সভ্যতার পক্ষ সমর্থন করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে নানাস্থান হইতে বক্তৃতা দিবার জন্যও নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি তখন আমার জাহাজের টিকিট কিনিয়া বসিয়াছি। বাড়ী পানেও মন ছুটিয়াছে। কাজেই এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হইল না। ইহার চার পাঁচদিন পরেই নিউইয়র্ক হইতে আমি আবার জাহাজে চাপিয়া লিভারপুল যাত্রা করি।

সমাপ্ত

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

বঙ্গ-মাতা

বঙ্গ-মাতার অঙ্ক আমার সকল বেদন হরে,
অঞ্চলে তার মলয় হাওয়া শ্রান্তি হরণ করে
বঙ্গ-মাতার বক্ষ আমার সকল ক্ষুধা হরে,
তপ্ত শিরে শীতল করা নয়ন-বারি ঝরে।

কণ্ঠে মাতার বংশী বীণার পাগল-করা ডাক্,
ওষ্ঠে হাসি ভালবাসি হৃদয় মধু-চাক্।
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে মায়ের মুখে চাই,
চেয়ে চেয়ে আত্ম-হারা বিশ্ব ভুলে যাই।

এই মায়েরি গর্ভে যেন জন্মি কোটী বার,
এই মায়েরি চরণ-তলে মরণ করি সার।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

বিদ্রোহিনী

(১)

"কই গো, মা ঠাকরুণ, মাছ নেবে গা ?"

সুরেশের মাতা পুত্রের শয়নগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কই দেখি দুলে বৌ ? এমন টাটকা মাছ, এত সকালে কোথায় পেলি মা ?"

"ক'দিন মাছ চুরি হচ্ছিল বলে, তোমার ব্যাটা, কাল রাত্রিতে আড়ায় পাহারা দিতে গিছল। ভোরবেলা এই মাছ নিয়ে এ'য়েছে। 'আমি বলি এমাছ আর কে নেবে, দাদাবাবু বাড়ি এয়েছেন, বৌঠাকরুণ এয়েছেন, বামুনমা'র কাছে নিয়ে যাই।"

"বেশ করেছিস্, মা ! ঐ বড় মাগুরটা আর——"

সুরেশ চাএর বাটি হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রায় তিন পোয়া ওজনের মাগুর মাছটি দেখিয়া বলিয়া উঠিল "বাঃ, বেশ মাছ ত দুলে বৌ——"

তাহার পশ্চাতে তাহার স্ত্রী সুচিন্তা আসিয়া দাঁড়াইল। সে সহরের মেয়ে। এমন মাছ কেনা বেচা দেখা তাহার ভাগ্যে বোধ হয় কখনু ঘটিয়া উঠে নাই। সে কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল।

দুলে বৌ সুরেশের দিকে চাহিয়া সলজ্জ হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আমার ভাগ্যি যে আজ তুমি বাড়ি এয়েছ, আর এমন মাছ——"

সুরেশ বলিল "আমিও তোমার জন্যে একটা জিনিস এনিছি—আমারও ভাগ্যি।"

দুলে বৌ বলিল "দেখ্‌লেন মা, শুনলে বৌ ঠাকরুণ, দেবতার কথা"—পরে সুরেশের দিকে চাহিয়া বলিল "অপরাধ হবে যে, ঠাকুরপো !"

মা বলিলেন "কি জিনিস এনেছিস্ বাবা ?"

"তুমি ভুলে গেছ মা ? তুমিই ত লিখেছিলে—নিয়ে এস ত চিন্তা, সেই কাগজে মোড়া আঙ্গট্ দুটো।"

অকস্মাৎ সুরেশের মাতার ও দুলে বৌএর মুখ একসঙ্গেই একটু বিমর্ষ হইয়া গেল। দুলে বৌ মাটির দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "এখন আর সে দুটো আমার দরকার হবে না, বৌ ঠাকরুণ। মাঠাকরুণের কাছে রেখে দিও।"

"আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা, আবার শিগ্‌গির তোমার কাজে লাগবে। এখন আমিই রেখে দিব।"

সুরেশ এবং সুচিন্তা দুই জনেই আশ্চর্য্য হইয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল। এমন

সময় একটি তের চৌদ্দ বছরের বালিকা সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মাছ দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল "মোটে একটা নিয়েছে কেন মা? আরও নাও না।" তাহার পর সুরেশের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল "মামাই ত এটা খেয়ে ফেলবে, আর মামী মা?"

সুরেশ হাসিয়া বলিল "আমি বুঝি এত খাই?"

"মুণি ত ঠিক বলেছে, তুমি ঐ বড়টা খাবে, আর এইটা—বৌদিদি," এই কথা বলিয়া দুলে বৌ আর একটা মাগুর মাছ পেতে হইতে তুলিয়া মাটিতে রাখিল।

সুচিন্তা একটু সলজ্জ হাসি হাসিল। সুরেশের জননীর কিন্তু যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন "তুমি এত সকালে উঠ্‌লে কেন মণি। একটু শুয়ে থাক্‌তে বলেছিলুম—সমস্ত দিন,—মণিকা মৃদু হাসিয়া বলিল "তুমি যেন কি। একাদশী, তা হয়েছে কি? সমস্ত দিন ঘরের ভিতর বসে থাকা যায়? একটু ঘুরলে ফির্‌লে কাজ কর্‌লে যেন ননীর পুতুল গলে যাব।"

প্রাতঃকালের আলোকোজ্জ্বল মুখগুলির ভাব অকস্মাৎ মেঘাবৃতের মত হইয়া গেল।

মণিকা সুরেশের মাতৃপিতৃহীনা ভাগিনেয়ী। দিদিমা সেই মাতৃহীনা বালিকাকে সূতিকাগৃহ হইতেই বুকে তুলিয়া লইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তাই সে তাঁহাকেই মা বলিয়া ভাবিত। গত বৎসর তাহার বিবাহ এবং বৈধব্য দুইই হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ মণিকার মুখ ধুইবার কথা মনে হইল, এবং সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

"আজ মাছ নয় মা। দুলে বৌ ও মাছ তুলে নিয়ে যাও।" বলিয়া সুরেশ শয়নগৃহে ঢুকিল।

কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ থাকিবার পর সুচিন্তা বলিল "কি হ'ল মা?"

দুলে বৌ বলিল "বুঝ্‌লে না, বৌদিদি। আজ একাদশী, মণিত মুখে জল দেবে না। আমাদের ঘর হলে——!"

সুচিন্তা সে কথায় বাধা দিয়া বলিল "সে কি মা! এই দুধের মেয়ে একাদশী করে।

"কি কর্‌ব মা, অনেক বলিছি শুনে না। বলে, যে বলে তারও পাপ, যে করে তারও পাপ; ঐ কচি মেয়ে, কিন্তু কথায় আমি ওর মুখের কাছে দাঁড়াতে পারি না।"

"তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি আজ ওকে ভাত খাওয়াব।"

"আমার কি অসাধ। পার ত দেখ না।"

দুলে বৌ বলিল "তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, দুপুর বেলা ঘরে পড়ে আই চাই করে, তুমি ভাত খাওয়াবে।"

(২)

"তুমি কিছু বল্‌বে না ?"

"কোন ফল হবে না, চিন্তা।"

"এই পাপেই দেশটা উৎসন্ন যাচ্ছে। এমন হৃদয়হীন সমাজে থাকার চেয়ে নরকের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরা ভাল।"

সুচিন্তা মণিকাকে আজ ভাতে বসাইবার জন্য তাহার মাসিক পত্রিকা পাঠলব্ধ অনেক তর্কোক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল; তাহার রমণী হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি, আন্তরিক প্রীতি স্নেহের সহিত মিশাইয়া, মণিকার উপর স্থাপন করিয়াছিল; তাহার নিজের ব্যক্তিগত মনোভাব, নারীর অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয়, মামুলি বক্তৃতার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া মণিকা ও সমাগত দুলে বৌ দুই জনকেই স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ফলে কিছু হয় নাই। সেই ছোট অশিক্ষিতা পল্লী-বালিকার পারিপার্শ্বিকের এবং পুরুষপরম্পরাগত সংস্কারের দৃঢ়তায় বি, এ, ফেল সুচিন্তার সমস্ত যুক্তি তর্ক, অভিমান অনুনয়, ভাসিয়া গেল। তাই সে আজ রাগিয়া গিয়াছিল।

সুরেশ বলিল "সমাজের অপরাধ ? তুমি ত অনেক চেষ্টা করলে, মাও আগে চেষ্টা করেছিলেন—"

"নিন্দার ভয়ে, শ্বশুর বাড়ীতে শুন্‌লে কি বল্‌বে, সেই ভয়ে—"

"ওটা মিছে কথা, কেতাবি কথা। মণ্টি যদি একাদশী না করে, কোন ভদ্রলোক নিন্দে করবে না। এখন সে কাল নাই। আর সাধারণ লোকের কথা শুন্‌লে ত, দুলে বৌ বলছিল, আমার বোন ঐ বয়সে দুবার বিধবা হয়েছিল। এখন আবার নিকে করে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না করছে।

"এ পোড়া দেশে কায়েত বামুনের চেয়ে বাগ্দি দুলে ঢের ভাল।"

সুরেশ পরিহাস করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বোধ হয় সুচিন্তা আরও রাগিয়া যাইবে বলিয়া সে লোভ সম্বরণ করিয়া বলিল "শশীমুচির বোনকে ডেকে দিব, তাকে একবার নিকে করবার পরামর্শ দিয়ে মজাটা দেখ না।"

"কেন কি হয়েছিল ?"

"হরে মুচির পিঠে বোধ হয় এখনও ঝাঁটাকাঠির দাগ আছে।"

(৩)

সুচিন্তা মধ্যাহ্নে বড় ঘরের দ্বারে বসিয়া চুল শুকাইতেছিল। মণিকা তাহার পাশে বসিয়া মাথার চুলের গোছাগুলি চিরিয়া চিরিয়া রৌদ্রে ধরিতেছিল। পাড়ার দুই একটি ঝিউড়ি এবং বধূ ক্রমে সেখানে আসিয়া জমিতে লাগিল, কলিকাতা হইতে আগত এই নূতন ধরণের মেয়েটিকে

কেন্দ্র করিয়া এখন প্রায় প্রত্যহ এমন সময়ে ঘোষালদের বাড়ি একটি মেয়ে মজলিস জমিয়া উঠে। সুচিন্তার পিতা চিরকাল বিদেশে কর্ম্মোপলক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। মেয়েটিকে কিন্তু তিনি কলিকাতার কোন বালিকাবিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ রাখিয়া সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুরেশ তাঁহার বন্ধুপুত্র। একমাত্র কন্যাকে শিক্ষিত, সুস্থ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুরেশের হতে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সুরেশের মাতা শিক্ষিতা বধূকে লইয়া অসুখী হন্ নাই। আর সুচিন্তাও প্রায় বিদেশে সুরেশের কর্ম্মস্থানে থাকে। এই কয়েকদিনের জন্য পল্লীগ্রামে আসিয়া নূতন অভিজ্ঞতার আনন্দে এবং পল্লীবালাগুলির সরল সৌহার্দ্দে সে সুখীই হইয়াছে। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে এই মজলিসে অনেক নূতন গল্পগুজব হয়, মাসিক পত্রের অনেক প্রবন্ধপাঠ হয়, এবং সুচিন্তার অনেক নব্য মত, "নারীর অধিকার" প্রভৃতি, প্রচারিত হয়।

কায়েতদের বড় বৌ বলিতেছিল "কি বল বৌ! পুরুষ মানুষ আর মেয়ে মানুষ সমান।"

"কেন নয়? ওদের দুটো হাত, দুটো পা, ওদেরও ক্ষুধা তৃষ্ণা—"

আর একজন বলিল "তাত বটে। তবে সুরেশ দাদাকে ঘরে বসিয়ে রেখে তুমি ওঁর হয়ে শ্রীরামপুরের থানায় গিয়ে চাকরি করগে না।" সুরেশ শ্রীরামপুরে পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

"তাও ত মেয়েরা কচ্ছে—রেলে টিকিট্ বেচছে, স্কুলে মাস্টারি করছে—"

"মরণ তাদের, আমরা এই ঘরে বসে কেমন রাজত্ব,—যখন যা দরকার হুকুম কচ্ছি আর এসে পৌঁছুচ্ছে—"

"হুকুম করবার আগেই বল, দিদি" বলিয়া একটি ফুটফুটে পনের ষোল বছরের মেয়ে অকারণ হাসিয়া উঠিল।

সুচিন্তা বলিল "তবুত ওদের উপর নির্ভর করতে হয়, ওদের মতে চল্‌তে হয়, পাণ থেকে একটু চূণ খস্‌লে—"

"কে তোমাকে এ সব কথা বল্‌লে বৌদিদি, ও সব কেতাবি কথা রেখে দাও—।" অপেক্ষাকৃত বয়স্কা একটি মহিলা বাধা দিয়ে বলিলেন "আর ঝগড়া করতে হবে না। সব রকমই আছে।"

আর একজন বলিল "কল্‌কাতার বৌ, তুমি যদি একবার সইএর বাড়িতে যাও দেখ্‌তে পাবে কে কার উপর নির্ভর করে। তাই ওর অত তেজ। সবাইকার ত আর অমনটি যোটে না সই।"

"তোমারও কম নয়, ভাই।"

সুচিন্তার বক্তৃতা কিন্তু চলিতে লাগিল। সে বলিতেছিল, তোমরা বুঝতে পারছ না ভাই। সব দেশেই স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, স্ত্রী সব রকমেই পুরুষের সমান, কেবল এই হতভাগা দেশেই—"

এই সময়ে সেই ফুটফুটে মেয়েটি তাদের সইয়ের কানে মুখ রাখিয়া কি বলিল। তাহার সইএর মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল 'যা, ফাজলিমি করিস নি।" সে বালিকাটি হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল "হাঁ সই, তোমার পায়ে পড়ি, কলকাতার বৌকে কথাটা একবার জিজ্ঞাসা কর না।"

এই সময় দুলে বৌ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল "কি হয়েছে দুলে বৌ? খোঁড়াচ্ছিস কেন? কোমরে চুনে হলুদ যে।"

"আর কি বৌ-ঠাকরুণ, যা হয়। দু এক কথা হতে না হতে তোমার দেওর পোড়ারমুখো দুয়ার থেকে ঠেলে ফেলে দিলে, কোমরে গোড়ালি মারলে—"

সুচিন্তা বলিয়া উঠিল "মারে!"

"একদিন কি? বারমাস। দুলে বৌএর চোক দিয়া জল পড়িতেছিল।

কায়েতদের বড় বৌ বলিল "ছোঁড়া বড় বদরাগী এখনও দু মাস হয়নি, এমন ঠেঙ্গাঠেঙ্গি করলে যে পেটের ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেল। আবার আরম্ভ করেছে। আজ সন্ধে বেলা ওকে ডাকিয়ে শাসন করে দিতে বলছি।"

"আমি কিন্তু আর ওর ঘর করব না, বড়দিদি।"

"তবে কি করবি?"

"যে দিকে দুচোক যায়, চলে যাব।"

ছোট মেয়েটি বলিল "তা দেখা যাবে। যখন উদ্ধব দাদার সেবার অসুখ হয়েছিল, তখন তবে কালীর দুয়ারে অত মাথা কুটে মরতিস কেন?"

"তোর এক কথা বাবু! ছোট লোক ভদ্দর লোক সব ঘরেই ঘর করতে ঝগড়া কলহ হয়ে থাকে। তা বলে কি আপনার মানুষ পর হয়ে যায়। টান থাকে না?"

সুচিন্তা বলিল "দুলে বৌ ঠিক বলেছে। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে অমন পশুর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই—।"

তুমি এখন বক্তৃতা কর বৌ। বেলা যাচ্ছে আমি এখন উঠি; বলিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কায়স্থ বধূ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপর মেয়েগুলিও উঠিল।

(৪)

শিবপুরে পাটের কলের কাছে মাদ্রার বস্তিতে হাজার দুই মাটির কুঠারির মধ্যে হাজার দশেক লোক ও কয় হাজার ছাগল এক সঙ্গেই যে কিরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা তাহারাই জানে। প্রত্যেক কুঠারিগুলি বোধ হয় ৬ হাত লম্বা আর ৪ হাত চওড়া। তাহার মধ্যে যে ৫।৬টি লোক তাদের লট বহর, বকরি মুরগি সমেত কি করিয়া বারমাস বাস করে এবং বাঁচিয়া থাকে তাহার সদুত্তর চিকিৎসা শাস্ত্র ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণের দেয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু

সাধারণ পাঠকের বুদ্ধির অগম্য। তবে এস্থলে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী পুরুষের স্বনির্ভরতা, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং হিন্দু মুসলমান সমন্বয় যে দ্রুতবেগেই অগ্রসর হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

সেই বস্তির একটি কুঠারিতে আমাদের বনগ্রামের দুলে বৌ বসিয়া তাহার মামার বাড়ীর করিমের চাচীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল। দুলে বৌ উদ্ধব দুলের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার বাটি হইতে মামার বাড়ি চলিয়া যায়। সেখানকার করিমের চাচী বহুকাল হইতে শিবপুরের কলে নলির কাজ করিয়া কয়েক বৎসর তাঁতের কাজে পদোন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভব দুলেনীর দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠাতে সে তাহাকে পাটের কলে কাজ করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া শিবপুরে লইয়া আসিয়াছে। মোটে কাল তাহারা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে পল্লীগ্রামের মুক্ত বায়ু, ফাঁকা মাঠ, নিকান পোচান খটখটে শুক্নো ঘরখানি হইতে আসিয়া এই স্যাঁতস্যাঁতে মাটিখসা ছিটে বেড়ার দেয়ালের উপর খোলার চালের নীচু, শুয়ারের খোঁয়াড়ের মত ঘরে থাকিতে তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এই ঘরটাতে কাল রাত্রিতে সবশুদ্ধ পাঁচজন লোককে শুইতে হইয়াছিল। করিমের চাচী আর দুইটী স্ত্রীলোক এবং করিমের পনর ষোল বছরের ছেলে এবং তাহাদেরই সঙ্গে নবাগতা দুলে বৌ ঘরটার মধ্যে কোন রকমে রাত্রিটা যে কি করিয়া কাটাইয়াছে তাহা সে এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। নূতন যায়গায় আসিবার জন্যও বটে, তাহার মনটা খারাপ ছিল বলিয়াও বটে, এবং আর একটা দুর্ভাবনার জন্যও বটে, কাল সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম হয় নাই। সামনের দরজাটা খোলা ছিল এবং দুয়ারের উপর একটা খাটিয়ায় শুইয়া করিম বক্স দিব্য নাক ডাকাইয়া সুনিদ্রা উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু দুলে বৌএর কেবলই মনে হইতেছিল যদি রাত্রিতে তাহার বাহিরে যাইবার দরকার হয়, অত বড় মরদটার সুমুখ দিয়া কি করিয়া যাইবে।

করিমের চাচী বলিতেছিল "নে ভবী আর গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকিস্ নে। ঐ কোণের চুলোটায় আগুন দিয়ে রাস্তার কল থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয়, আর মাথাটা ধুয়ে আয়। তুই ত আর আর আমাদের ছোঁয়া খাবি না যে এক চুলোয় হবে।"

করিমের বেটা বলিল, "এত কি তাড়াতাড়ি? আজ ত কল বন্ধ।"

"ওকে যে কলে ভর্ত্তি করতে হবে। সর্দ্দারের কাছে এ বেলাই নিয়ে যাব, আর বিকেলে বাবুর কাছে—"

"সর্দ্দারের কাছে দুটি টাকা বুঝলে ত—আর বাবুর কাছে—"

"যা যা, তোকে আর ডেঁপোমি করতে হবে না। সে সব আমি জানি।"

(৫)

"মা, বুঝি এখনও দুধ খেতে পায় নি; কেঁদে কেঁদে মরছে।"

"তাইত। বেলাও ত কম হয়নি। উদ্ধরে যে কখন আসবে, তা সেই জানে।

"সে হয়ত, ঘরে দোর দিয়ে পড়ে আছে। না ডাক্‌লে কি আর আস্‌বে ?"

"তুই একবার যা না মণি।"

এমন সময় উদ্ধব দুলে গাই দুইতে আসিল। সুরেশের মা বলিলেন "তোর কি হয়েছে রে উদ্ধব ? কাল বেলা তিন পহর করলি, আজও আবার তাই, কইলে বাছুরটো ডেকেডেকে—" হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি উদ্ধবের মুখের উপর পড়াতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন "অসুখ করেছে বাবা ?"

উদ্ধব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'না'।

"তবে ? বৌ রাগ করে মামার বাড়ী চলে গেছে, তাই ? মণি বল্‌ছিল, উদ্ধব দাদা দুদিন রান্না চড়ায় নি ! ঘরে দোর দিয়ে পড়ে থাকে।"

উদ্ধবের চোখে জল আসিতেছিল। সে কোন উত্তর না দিয়া দুধ দুইবার বকনোটা লইয়া গোয়াল ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মণি গিয়া বাছুর ধরিল। সে যখন জিজ্ঞাসা করিতেছিল "বৌ কবে আস্‌বে" তখন উদ্ধবের বুকের ব্যথাটা চোখের জল হইয়া গড়াইতেছিল, এবং তাহার দুইটি হাতই জোড়া থাকাতে সে তাহা পুঁচিয়া লুকাইবার অবসর না পাইয়া বিব্রত হইতেছিল। যখন সে দুধের পাত্রটি বড় ঘরের দ্বারে রাখিয়া মণিকে বলিতেছিল "দিদি হাতে একটু জল দাও" তখন সুরেশের মা তাহার জন্য কিছু গুড় ও মুড়ি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আজ আর তোর হাত পুড়িয়ে কাজ নেই, এইখানে দুটি প্রসাদ পেয়ে যাস্‌।"

সেই দিন যখন বৈকালিক মজলিসে মেয়েদের সমাগম হইতেছিল, তখন উদ্ধব কলাপাতাটা বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া এক ঘটি জল হাতে লইয়া আহারস্থান পরিষ্কার করিবার জন্য একটু গোবরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কায়েতদের বড় বৌ এবং সেই ফুটফুটে মেয়েটিকে আসিতে দেখিয়া সে বলিল "সরো দিদি, একটু গোবর এনে দাও না, সকড়িটে নিয়ে নিই।" সরোজিনী গোবর গাদার দিকে গেলে কায়স্থ বধূ বলিলেন "উদ্ধব ঠাকুরপো, বউএর খবর—" এই সময়ে সুরেশের মা রান্নাঘর হইতে একটু গোবর হাতে করিয়া সেখানে পৌঁছিলেন। সরোজিনীও এক তাল গোবর হাতে মাখিয়া দাঁড়াইল। কায়েত বৌ বলিলেন "যা হাত ধুয়ে আয়, আর গোবরে কাজ নেই যে গোবর এনেছিস্‌।"

সরোজিনী "কি মন্দ গোবর এনেছি কায়েত বউ দিদি ?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে হাত ধুইতে গেল।

কায়স্থ বধূ বলিলেন "বামুন মা, উদ্ধব ঠাকুর পোর বউএর খবর কিছু জান ?"

"বৌ রাগ করে মামার বাড়ি গেছে আর কি খবর মা ?"

"তাই, উদ্ধব ঠাকুরপো ? না আরও কিছু ?"

উদ্ধব কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কোন জবাব তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তাহার ভাব দেখিয়া বামুন মা বলিলেন "কি হয়েছে উদ্ধব ? ঠিক করে বল্‌ দেখি বাবা ?"

উদ্ধব আর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল "সে আর নেই মা ?"

"নেই কিরে ? মারা গেছে ?"

"না। মামার বাড়ী নেই।"

কায়স্থ বধূ বলিলেন "তবে আমি কানা ঘুষায় যা শুনিছি তাই সত্যি ? সে—"

উদ্ধব তাড়াতাড়ি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "না না, তা কেন বড় গিন্নি। সে আর আমার অন্ন খাবে না বলে পাটের কলে চাকরি নিয়েছে।"

এই সময় সরোজিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কায়স্থ বধূ বলিলেন "তুই বউয়ের ঘরে যা, আমি কথাটা সেরে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি কথা গা ?"

"সে তোর শুনিবার নয়।" সুতরাং প্রবল কৌতূহল সত্বেও সরোজিনীর আর সে কথা শুনা হইল না। সে চলিয়া গেলে বামুন মা বলিলেন "কবে গেছে উদ্ধব। তাকে যে ফেরাতে হবে বাবা।"

"পরশু রাত্রিতে চলে গেছে মা। আমি ত কখনও এ গাঁয়ের বাইরে যাইনি কি করে খোঁজ করব ? যদি দাদাঠাকুরও এখানে থাকতেন—"

কায়েস্থ বধূ বলিলেন "বামুন মা, সুরেশ ঠাকুরপোকে তুমি একখানা চিঠি দাও খোঁজ নিতে—"

"তা বউকে বলছি। তুমিও ত তার কাছেই যাচ্ছ—"

সুচিন্তা শুনিয়া বলিল "বেশ করেছে। সমস্ত বাঙ্গালী মেয়ের যেদিন এই রকম সম্মান জ্ঞান জন্মাবে, সেইদিন মেয়েদের—।"

আর সকলে সেই বক্তৃতা চুপ করিয়া শুনিতেছিল কেবল সরোজিনী হাসিয়া উঠিল। বয়োজ্যেষ্ঠ কায়স্থ বধূ এই সকল কথায় বড় বাদ প্রতিবাদ করিতেন না, আজ কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন "কি ভাল করেছে শুনি বউ ? একটা সংসার ভেঙ্গে গেল। ছুলে ছোঁড়াটার চেহারা কি হয়েছে একবার দেখেছ কি ?"

সুচিন্তা বলিল "কেন হয় দিদি ? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। লাথি মেরে যখন তার—"

"তুমি থাম। উদ্ধবে যে সাধু পুরুষ তা আমি বলছি না। ও সব জাত চিরকালই ঐ রকম। কিন্তু এই যে চলে যাওয়া—তার ফল ঐ ছুঁড়িটার পক্ষে কি জান ?

"কেন সে খাটবে, খাবে। বিদেশে ত চাকরী অনেক আছে। আর আমাদের দেশেও কলে, চা বাগানে—"

"হাঁ গো হাঁ। আমার আর জানতে বাকী নেই। ভাসুর দিন কতক চা বাগানে কেরাণীগিরি করেছিলেন। আর আমার বাপের বাড়ী শিবপুরে। সেখানে অনেক কল।"

সুচিন্তা হাসিয়া বলিল—"দিদি তুমি মিছে রাগ করছ। এখানে শুধু একটা পেটের

দায়ে অত "দূর ছাই"। মারধোর খেয়ে থাকার চেয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা কি ভাল নয়।"

সরোজিনী বলিল "উদ্ধব দাদা কখন তাকে দূর ছাই করত না, বৌ। কত ভালবাসিত তা এ পাড়ার সকলেই জানে।"

সুচিন্তা একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল "প্রেমের পরিচয় বুঝি চড় লাথিতে—।"

কায়স্থ বধূ বলিলেন "ঠাট্টা করো না বউ। সরো ঠিক বলেছে। কিন্তু ওকথা যাক। সেখানে তার পরিণাম কি জান?"

"কি"?

"তার জাত, জন্ম, ধর্ম্ম, কিছুই থাকবে না। তার শরীরও নষ্ট হয়ে যাবে।"

"কেন। সে যদি ভাল হয়—"

"তোমার সঙ্গে ওতর্ক আমি করব না। তোমার কেতাবি বিদ্যে কি বলে জানি না কিন্তু এটা ঠিক যে সঙ্গদোষে, লোভে পড়ে ভাল লোকেও মন্দ হয়ে যায়।"

সরোজিনীর সই বলিল "আমার বাপের বাড়ীর কাছে পালেদের এক বিধবা ঝিউড়ি ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে শ্রীরামপুরে কলে কাজ করতে গেছিল। তিন বছর বস্তিতে কাটায়ে সে যখন ফিরে এল তার দিকে যাওয়া যায় না। ঠোঁটের একদিকের খানিকটা খসে গেছে, সর্ব্বাঙ্গে—এই সময় বামুন মা আসাতে সকলের কথা বন্ধ হয়ে গেল। কায়স্থ বধূ বলিলেন, "বউকে দিয়ে চিঠি লিখেয়ে দাও মা।"

(৬)

সন্ধ্যারতির শঙ্খগুলি এইমাত্র থামিয়াছে। গ্রাম্য গৃহস্থের তুলসীতলার সন্ধ্যাপ্রদীপ এখনও নিবিয়া যায় নাই। বামুন মা সদর দরজাটি বন্ধ করিবার জন্য যাইতেছিলেন। দুলেবৌ হঠাৎ আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল। তিনি প্রথমে একটু চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার পর তাহাকে চিনিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "ফিরে এসেছিস মা. বেশ করেছিস। পাগলীর মত এমন ঘর সংসার ছেড়ে—"

"আর আমার ঘর সংসার মা! তিন দিন, শুনলুম, ভিটের সন্ধে পড়েনি। তোমার বেটা উদাসী হয়ে গেছে, এখন আমার মরণ হলে বাঁচি—"

"ও কথা বলতে নেই বাছা। উদ্ধবকে তোরই খোঁজে পাঠিয়েছি"।

"সে আর এ অপমানের পর কি ও মুখো হবে মা? তাকে কি আর আমি জানি না!"

"না না। সে ফিরে আসবে। চিঠি নিয়ে আমার সুরেশের কাছে গেছে তোর খোঁজ করবার জন্যে।"

"আমি এ কালামুখ কাল কি করে গাঁয়ে বার করব ?"

"কেন কি হয়েছে বল্ দেখি দুলে বৌ ? তুই রাগ করে মামার বাড়ি গেছলি বইত নয়। বাড়াবাড়ি করিস্‌নি বাবু।"

সুচিন্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কার সঙ্গে কথা কইছ, মা ?"

বামুন মা দুলে বৌএর হাতটা ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন "দেখ না বৌমা চিন্‌তে পার কিনা।" তাহার পর দুলে বৌএর দিকে ফিরিয়া স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে আবার সন্ধেবেলা কিন্তু তুই নাইয়ে ছাড়লি" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

লজ্জিত দুলে বৌ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সুচিন্তা বলিল "তুমি যে ফিরে এলে ? কলে কাজ হ'ল না বুঝি ?

দুলে বৌ বলিল "ছি ছি, কলের কাজের মুখে আগুন। আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল বলেই—"

"কেন বল দেখি ? কি হ'ল সেখানে ?"

"তুমি শুন্‌লে কানে আঙ্গুল দেবে।"

"কি শুনিই না"

"বল্‌তে লজ্জা করে বৌদি। একটা খোঁয়াড়ের মত ঘরে রাত্তিরটা যে কি করে কাটিয়েছিলুম, ভাবিয়া মনে পড়ছে না। সকালবেলায় এক মুঠো আধসিদ্ধ চাল্ নাকে মুখে গুঁজে করিমের মা'র সঙ্গে সর্দ্দারের কাছে গেলুম। তার হাতে দুটো টাকা দিতে হ'ল। তা'র পরে সর্দ্দারের সঙ্গে দুজনে বড় বাবুর কাছে গেলুম। সর্দ্দার বাবুর সঙ্গে কি ফিস্ ফিস্ করে কথা কহিতে লাগিল। তখন করিমের মা আর আমি উঠানের একপাশে ব'সে। একটু পরে সর্দ্দার ফিরে এসে বল্‌লে বাবুকে ভর্ত্তি কর্‌বার জন্যে ৫৲ টাকা দিতে হবে। আর ফি হপ্তায় এক টাকা। করিমের মা বল্‌লে ওর হাতে আর মোটে তিনটি টাকা আছে। তাই দিতে পারবে, তবে হপ্তা হপ্তা একটাকাই দেবে। এ হপ্তাটা না হয় আমিই ও খরচটা চালিয়ে দেব। সর্দ্দার বল্‌লে বোধ হয় হবে না, তুমি একবার না হয় বলে দেখ।"

করিমের চাচী আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। বাবু আর একজন বাবুর সঙ্গে কি কথা কইছিল। আমাদের দিকে চাইতেই করিমের চাচী বল্‌লে "বাবু এর মোটে তিনটি টাকা—" তার কথা শেষ না হতে হতেই বাবু আমার দিকে চেয়ে,—মা গো সে কি চাউনি, গাঁয়ে হ'লে মেয়ে নাথিতে তার চোয়াল ভেঙ্গে দিতুম—বল্‌লে করিমের মা এর কোন টাকা লাগ্‌বে না। সন্ধেবেলা নিয়ে আসিস্। সব শুনে ভর্ত্তি করে নেব।" আর যে বাবুটি বসেছিল সে হেসে বল্‌লে "কিন্তু তোমার ছোট সাহেব।" কলের বাবু বল্‌লে—"আরে সে পরে।"—পথে আস্‌তে আস্‌তে করিমের চাচী আমাকে যা বল্‌লে, তা আগেই কতকটা আমি বুঝে নিয়েছিলুম। সেদিন দুপুরবেলা কলের ছুটি ছিল। করিমের বেটাকে একটা টাকা কবলে হাবড়ার রেলে তুলে দিতে বল্‌লুম। তার পর একবারে এখানে এসে বেঁচেছি।"

(৭)

পরদিন বৈকালিক মহিলা মজলিসে সুচিন্তা বিদ্রোহিনী শীর্ষক একটি গল্প লিখিয়া সমবেত মহিলাদিগকে শুনাইয়া দিলেন। তাহাতে তিনি অন্তঃপুরই নারীত্বের বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত আশ্রম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং কায়স্থ বধূ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "দেখ ভাই, আমাদেরও বন-গাঁ-এর জল হাওয়ার গুণ আছে। এই কদিনেই কল্‌কাতার বৌএর মত ফিরে গেছে।"

সরোজিনী গল্প শুনিতে শুনিতে কেবলই হাসিতেছিল এবং তজ্জন্য তিরস্কার লাভ করিতেছিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল "জল হাওয়ার গুণ না দুলে বৌএর গুণ, কায়েত বৌদি?"

দুলে বৌ বলিল "আমার গুণের মুখে আগুন!"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

নন্দদুলাল ও রাধাবল্লভজী

আজ বাঙ্গালাদেশ ভক্তি ও পূজার শ্মশান; শত শত মন্দিরের ভগ্নস্তূপ এই শ্মশানে ভক্তির হাড়-পঞ্জরের ন্যায় পড়িয়া আছে। খড়দহের অনতিদূরে সাঁইবোনায় "নন্দদুলাল" এককালে জাগ্রত দেবতা ছিলেন। সেই সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টার রব এখন মন্দীভূত, আরতির ধূপ-দীপ এখন পরিম্লান। "নন্দদুলাল" এবং "শ্যামসুন্দর" একখানি পাথর কাটিয়া গড়া হইয়াছিল, এই প্রবাদ। সেই পাথরখানি হইতে যে তৃতীয় মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাঁহার নাম "রাধা-বল্লভজী—" ইঁহার মন্দির বল্লভপুরে অবস্থিত।

এখন আমরা সাঁইবোনার নন্দদুলাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ও "নন্দদুলাল"-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রুদ্ররাম বন্দোপাধ্যায় সমসাময়িক, সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

রুদ্ররামের পিতা যদুনন্দন শাক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রুদ্ররাম তাঁহার মাতুল শ্রীরামপুরের অন্তর্গত চাতরা নিবাসী কাশীপতি চৌধুরীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশীপতির গৃহে একটি নারায়ণ বিগ্রহ ছিল,—একদা তিনি কার্য্যগতিকে অন্যত্র গিয়াছিলেন; সেই সময় মাতুলানীর অনুরোধে রুদ্ররাম উক্ত নারায়ণ বিগ্রহের পূজা সম্পন্ন করেন। কাশীপতি বাড়ী আসিয়া যখন শুনিলেন রুদ্ররাম নারায়ণ পূজা করিতেছে, তখন তিনি চটিয়া গেলেন। রুদ্ররাম শাক্ত, সুতরাং নারায়ণ পূজার অধিকার নাই—এই হেতু দেখাইয়া তিনি স্বীয় স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন এবং বালক রুদ্ররামকে প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন।

রুদ্ররাম মাতুলের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়া পাইয়া একবস্ত্রে সেই গৃহ ত্যাগ করিলেন। রুদ্ররাম মনে মনে সংকল্প করেন, কোনরূপ কৃষ্ণ বিগ্রহ না লইয়া ফিরিবেন না। রুদ্ররাম খড়দহে আসিয়া বীরভদ্রের সঙ্গে মিলিত হন।

আমরা পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে লিখিয়াছি, বীরভদ্র গৌড়ের সম্রাটের নিকট একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর প্রাপ্ত হন এবং তাহা হইতে "শ্যামসুন্দর" বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু সাঁইবোনায় প্রবাদ যে রুদ্ররাম নবাবের নিকট হইতে উক্ত পাথর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের সাধকদের সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক প্রবাদের সৃষ্টি হয়, রুদ্ররাম সম্বন্ধেও জনশ্রুতি চুপ করিয়া রহে নাই। একটা প্রবাদ অনুসারে, তাঁহার দুশ্চর তপস্যায় প্রীত হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নবাবের নিকট হইতে প্রস্তর আনিয়া বিগ্রহ নির্ম্মাণের উপদেশ দিয়াছিলেন। আর একটি প্রবাদ এই যে নবাবদত্ত পাথরখানি গঙ্গার জলে রুদ্ররাম ভাসাইয়া দিয়া তিনি নিজে নদীর তীর দিয়া পদব্রজে বাড়ী ফিরিয়া দেখেন যে শিলাখণ্ড তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই "সাঁই-বোনার" ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। নবাব নাকি প্রোথিত শিলাখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ রুদ্ররামকে প্রচুর পরিমাণে ভূমি দেবোত্তর স্বরূপ দিয়াছিলেন, সেই দেবোত্তর এখন অরণ্যে পরিণত হইয়া তজ্জাত অতি ক্ষুদ্র আয়ে 'নন্দদুলালে'র ব্যয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। সেই গ্রামবাসীরা বলিয়া থাকেন, রুদ্ররামের প্রদত্ত পাথরের অংশ হইতে বীরভদ্র "শ্যাম সুন্দর" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনটি বিগ্রহের নির্ম্মাণের পর পাথরের যে অবশিষ্ঠ অংশ পড়িয়াছিল—তাহার প্রতি-চিত্র আমরা পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে দিয়াছি। এইস্থানে আমরা 'নন্দলাল' বিগ্রহের প্রতি-চিত্র দিতেছি, ময়ূরপুচ্ছালঙ্কৃত নন্দদুলালের আরতির ক্ষীণ ঘণ্টারব এখনও "সাঁইবোনায়" বাজিয়া উঠে, কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর হাস্য আবিষ্কার করিতে এখন আর শত শত ভক্তের চক্ষু প্রতীক্ষা করিয়া

'নন্দদুলাল বিগ্রহ'

থাকে না; তেমন যত্নে পবিত্র হইয়া গঙ্গাজলে স্নাত মালীরা আর তাঁর কণ্ঠের বনফুলমালা রচনা করে না; তেমন আনন্দে তাঁহার শীতল ভোগের প্রসাদাংশ পাইবার জন্য বালবৃদ্ধ যুবকেরা আর মন্দিরে আনাগোনা করে না; বঙ্গের শ্যামা পল্লীর প্রাণে এই বিগ্রহদের জন্য যে কত স্নেহ ও ভক্তি সঞ্চিত ছিল, কত চোখের জলে, কত অনশনব্রতে কত আমন্দ ও কত ধর্ম্ম দেওয়ার বিলুপ্ত স্মৃতি যে এই বিগ্রহদের মন্দির-আঙ্গিনার সহিত জড়িত রহিয়াছে, কত পদ্ম-দল-নিভ আঁখি পত্র হইতে অশ্রুমুক্তা যে এই সকল মূর্ত্তির দর্শনানন্দে ঝরিয়া পড়িত, সে সকল কথা মনে হইলে স্বতঃই কষ্ট হয়। এই শুরুনগরীর শত শত মিলের ধূমায় আচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া ও ইঞ্জিনের

রুদ্ররামের হস্তলিখিত ভাগবত

বিঘোর উৎকট শব্দ প্রহারে জর্জ্জরিত কর্ণ-পটহের ব্যথা লইয়া কেমন করিয়া আমরা সে আনন্দের স্মৃতি জানাইব, যে আনন্দ মন্দির-সংলগ্ন উদ্যানের জাতি যুঁথি পুষ্প কোরকের ঘ্রাণেও শুভ শঙ্খ ও মন্দিরার স্নিগ্ধ রবে, আপনা আপনি হৃদয়ে উথলিয়া উঠিত। আমাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি ছিন্ন পুষ্প-কলির মত শুকাইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতেছে; এই জন্যই প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলিয়াছি, বঙ্গপল্লীগুলি এখন ভক্তির শ্মশানক্ষেত্র।

রুদ্ররামের পাণ্ডিত্যও যথেষ্ট ছিল, এখনও লোকমুখে তিনি "রুদ্ররাম পণ্ডিত" নামেই আখ্যাত হইয়া থাকেন, তাঁহার স্বহস্তলিখিত ভাগবতখানি এখন 'নন্দদুলালে'র মন্দিরে রক্ষিত আছে। তাঁহার হস্তাক্ষরের কিঞ্চিৎ প্রতিলিপি আমরা উপরে দিলাম।

"নন্দদুলাল" এখন আর তাহার পূর্ব্বতন মন্দিরে নাই, সে মন্দির ছিল "লাবণ্যময়ী" নদীর ধারে। লাবণ্যময়ী নদী এখন মজিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বমন্দিরের জায়গাটী নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে দেখুন।
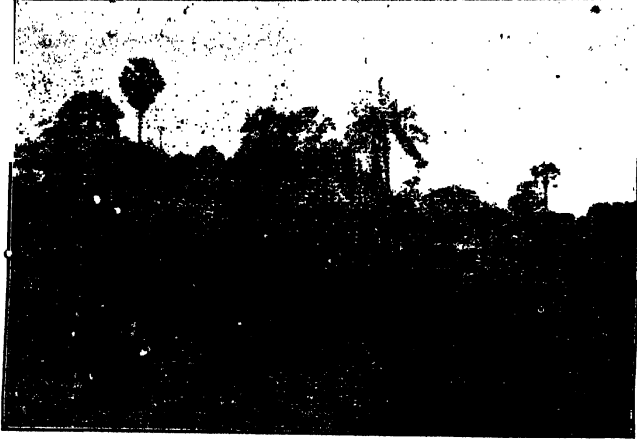
(পূর্ব্বমন্দিরের জায়গা)

দোল মন্দির

"নন্দদুলালের" দোলমন্দির এখনও আছে, বৃক্ষাচ্ছাদিত প্রাচীন মন্দিরের দৃশ্য স্নিগ্ধ ভাবোদ্দীপক; এখন দুঃস্থ নারায়ণের বাড়ীখানির প্রাচীরের ইটগুলি খসিয়া পড়িতেছে, কাহার প্রাণ আর আরাধ্যের আবাসস্থানের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে? কে এই ভগ্ন প্রাচীন ও জরাজীর্ণ মন্দিরকে মেরামত করিবে? দোলমন্দিরের চিত্র পার্শ্বে দেওয়া গেল।

এইবার 'নন্দদুলালের' বাটীখানি দেখুন; এমারতের দুর্দ্দশা দেখুন; পাকাবাড়ীর ছাদ বাঁশের ঠেকায় দাঁড়াইয়া আছে। আমরা কলিকাতার কোন পুতিগন্ধময় গলির এক কোণে দেড় কাঠা জমি কিনিবার লালসায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছি। দেশের ঠাকুর বর্ষাকালে ভগ্ন ছাদের জল-ঠেলিয়া মাথা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অথচ আমরা হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। আরাধ্যের দুর্গতি করিয়া আরাধক কবে সুখী বা বড় হইয়াছেন ?

নন্দদুলালের বাটী ২

এইবার সেই পাথরটার অংশ দ্বারা গঠিত তৃতীয় মূর্ত্তি রাধা বল্লভের মন্দিরটি দেখুন। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহা বল্লভপুরে অবস্থিত। কথিত আছে এই মূর্ত্তি গড়িবার জন্য যতটুকু পাথর পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে কতকটা বাঁচিয়াছিল। সেই পাথরের অংশটা এখনও আছে এবং উহা "অনঙ্গ দেব" নামে এখনও পূজা পাইয়া থাকে।

সত্য সাধন

(১)

প্রবল প্রতাপ "নাদির শাহা" সে
ভারত ভাসায়ে রক্তে,
নাস্তিক মত করেন প্রচার
বসি দিল্লীর তখ্‌তে।
"আমিই 'মালেক' 'দীন দুনিয়ার'
যদি কেহ কহে খোদা আছে তার
গরদান নেবে" হুকুম এমনি,
দিল যত অনুরক্তে
দীন দুনিয়ার মালেক জনাব
বসি দিল্লীর তক্তে!

(২)

নিদারুণ সেই আদেশ শুনিয়া
সাধু জন কয় কাঁদিরে!
জুমা মস্‌জিদ ভেসে যাবে আজ
নিরপরাধের রুধিরে!
গোপনে সাধুরা শঙ্কিত মনে
নীতি আলোচনা করে নির্জ্জনে।
"শির ডারি দিব দিবনাক সার
বুঝাব ধর্ম্ম বধিরে
শাসনের ভয়ে খোদার বান্দা
খোদা ক'বে নাক নাদীরে।"

(৩)

বেগম মহালে বাদশা দুহিতা
কালো কেশরাশি এলায়ে,
চিকণ গাঁথনে গাঁথিছেন কভু
দিতেছেন খুলে' ফেলায়ে!
সহসা কনক দর্পণ খানি
ভূমে পড়ে গেল কেমনে না জানি,
বাঁদী ছিল পাশে "আল্লা" বলিয়া
কম তনুখানি হেলায়ে
বাদশাজাদীর হাতে তুলে দিল
বাঁধা কেশরাশি এলায়ে;—

(৪)

কহেন কুমারী "কি বলিলি বাঁদী,
স্মরিলি কি মোর পিতারে?"
কিঙ্করী কহে সস্মিতাননে
আলোড়িত কেশ বিথারে
"মিছে বলিব না শাসনের বশে
শোভান্ আল্লা অদ্বিতীয় সে
চির স্মরণীয় সেই একজন"—
রোষে বাঁকাইয়া সিথারে,
কুমারী কহিল "কি বলিলি বাঁদী
ডাকিস্‌নি মোর পিতারে?"

(৫)

"মন নহে বাঁদী বাদ্‌শাহজাদী
এ বাঁদী ডরেনা মরণে,
জ্বলিব এ তনু সত্য কহি যে
সত্য-পিতার স্মরণে।"
ঘাতকে ডাকিয়া ডাকিনীর প্রায়
কুমারী অমনি বধিল তাহায়
সাধু জনে কহে যে চিনেছে তাঁয়
আজিকে মৃত্যু বরণে,
সে গেল চলিয়া দীন দুনিয়ার
সেই মালিকের চরণে।"

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

ছিটে-ফোঁটা

বর নেই বাসর

গোপীনাথ সিদ্ধান্ত বারিধি ওরফে দল-গোবিন্দপুরের সার্ব্বজনিক গুঁপে ঠাকুর্দ্দা তাঁর গৃধিনী প্যাটার্ণ নাসিকাটি সই করে নিয়ে বললেন, "বাপু হে, তা হ'লে শোন, একটা গল্প বলি।" স্বনামধন্য রসিক চূড়ামণি দ্বিজেন্দ্রলাল বলে গেছেন—

"আমরা কালো তোমরা কালো,— হাড়ি মুচী ডোমরা কালো।"

এমনকি গদাধরের পিসী অবধি অমানিশার মসীনিন্দিত কালো তনুখানির কতই না গর্ব্ব করে থাকেন, কিন্তু আমাদের দলগোবিন্দপুরের গুঁপে ঠাকুর্দ্দার বিরাট কুষ্মাণ্ডবৎ বপুখানির কালো রঙের সংসারে তুলনা নাই। সে চিকোন পালিস করা নিটোল নিখুঁৎ ঘনঘোর অঙ্গ দেখে কাল বৈশাখীর মেঘ বলে ভ্রম হয়। ঠাকুর্দ্দা আমার এদিকে আবার স্থূল হ'তে হ'তে বর্ত্তুলে এসে দাঁড়িয়েছেন; সে উত্তরদক্ষিণে ঈষৎ চাপা বিশ্বগোলকের উপরে মাথাটি তাঁর একটি ক্ষুদ্র বিস্ফোটকের শোভা ধরেছে। নাকটি তাঁর সে বিস্ফোটকের অগ্রভাগে একটি প্রকাণ্ড প্রশ্নসূচক চিহ্ন—a note of interrogation। এই যে রূপবর্ণনা দিলাম এ হচ্ছে ঠাকুর্দ্দারই স্বমুখের স্বরূপকথন। নিজের লোকললাম জগজ্জনমোহন রূপের বর্ণনা করতে করতে ঠাকুর্দ্দা কতবারই না বলেছেন, "হে আমার নাতি নাতিনীর দল, আমি হচ্ছি অধুনাতন ভারতের জীবন্ত প্রতীচ। তোমাদের ঘন নিবিড় অজ্ঞান আমায় কালো করেছে; তোমাদের পশু অঙ্গের স্ফীতি আমায় গরুর পেটের মত বর্ত্তুল করেছে; তোমাদের মাথাগুলি নয় মুরগীর, নয় সুপুরীর আর নয় গুগলীর; দেখ আমারও তাই। তোমাদের নাকটি পরের আঁস্তাকুড়ের দুর্গন্ধের সুধাসুরভিতে বেঁচে আছে; আমারও এই বঁড়শীর মত কুটিল বক্র enquiring নাসিকা তাই পরের ছিদ্রের দিকে সদাসর্ব্বদা বাড়িয়েই আছি। আমি বাপু তোমাদেরই উপমা; আমাহেন এই জীবন্ত ভারতদর্পণে বঙ্গ বেহার মাদ্রাজ বোম্বাইয়ের up-to-date মুখাকৃতি তোমরা দেখে ন্যাও।"

এই রকম ভণিতার পর আজ গুপে ঠাকুর্দ্দা মাথা দুলিয়ে সমুখের আকাশকে দু' চার বার নাকের খড়্গে চিরে আরম্ভ করলেন, "বাপু হে, একটি গল্প বলি শোনো। এই পাশের বারোয়ারীতলারই কথা। নাটুদত্তের বাড়ী সানাই বাজছে, বর আসে আসে। বাড়ীতে এখনই তিল ধারণের স্থান নেই; তিন রকম মানুষ এয়েচে, আহুত রবাহুত আর অনাহুত। কাউকেই ফেরাবার যো নেই, কারণ কন্যাদায় তো কেবল বিপন্ন গৃহকর্ত্তার; কন্যাযাত্রীরা বেঁকলে আর রক্ষা আছে? কি অঘটন ঘটিয়ে শুভকার্য্যটার ঘাটে ভরাডুবী করবে, তা কে বলতে পারে।

হটাৎ দূরে সোরগোল শোনা গেল ; ব্যাঙের ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো আওয়াজ বাতাসে ভেসে এসে সবাইকে চঞ্চল ভ্যাবাচাকা করে তুললো। তাই তো, এ যে উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম চার দিক্ থেকে আওয়াজ আসছে! গাঁয়ে আর কারু বাড়ীতে বিয়ে আছে নাকি, কই তা' তো শোনা যায় নি! সব চেয়ে চঞ্চল হলেন রবাহুত আর অনাহুতের দল, কারণ দুনিয়ার সব মহোৎসবে মঙ্গলকার্য্যে তাঁরাই ছাঁদা বাঁধেন, আর সে দিকে অসুবিধে বুঝলে শুভকার্য্য ভণ্ডুল করে ছাড়েন। পরের কাজে এঁরা সব উৎসর্গিতপ্রাণ, পরমুণ্ডেই ঘুরে বেড়ান এবং চরে খান,—সেটা তাদেরই কল্যাণে।

বাপ্ রে, সে কি আওয়াজ! ব্যাঙের শব্দে কান পাতবার যো নেই। মানুষ গাড়ী মটর বাইকও আসছে অগুন্তি, সঙ্গে বর কি না। সবাই এসে পৌঁচালেন ; শাঁক, উলুধ্বনি, "আসুন বসুন" রবে আসর গরম হয়ে উঠলো। কিন্তু তখনও কারু বিস্ময় কাটেনি, কারণ পূব দিক থেকে আবার একদল আসছে। আবার ড্রাম ক্ল্যারিয়নেট, গাড়ী ঘোড়া, লোক লস্কর, আলো রোসনাই, আশাসোটা, এবং শেষে চতুর্দ্দোলা থেকে টোপরপরা একটি নবকার্ত্তিকের অবতরণ।

কারু মুখে কথা নেই, সবারই চোখে ভয়, শুধু গোঁফের ডগায় অপ্রতিভ হাসি ও আড়ষ্ট দন্ত পংক্তির বিকাশ। এতেই কি রক্ষে আছে? আবার আলো আতসবাজী, সোরগোল, সানাই ভেঁপু, ঘোড়ার টগবগ, মোটরের ভ্যাঁ ভোঁ এবং বরযাত্রীর দল পরিবেষ্টিত হয়ে আর একটি টোপর পরা নবকার্ত্তিকের আগমন। এবম্প্রকারে দিগ্বিদিক হতে উপর্য্যুপরি চার বার চারটি বরের শোভাযাত্রা এসে, বিপন্ন এবং উত্তেজনা উদ্বেগে প্রায় মুক্তকচ্ছ নাটু দত্তের আঙিনায় হাজির। এতক্ষণে সুভাশুদ্ধ সবাই উঠে দাড়িয়েছেন, সবারই মেজাজ বিলক্ষণ বিগড়েছে, সবাই হাত নেড়ে পা ছুঁড়ে, টিকি থাকে তো তাই দুলিয়ে, তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছেন। কে বা কার কথা শোনে? সভার চারদিকে টোপরপরা চারটি নবকার্ত্তিক বেশ সপ্রতিভহাস্যে গোঁফে তা' দিচ্ছেন আর পরস্পরের দিকে বাঁকা ট্যারচা চাহনী চাইছেন।

কে একজন সেই গুলজার নরকের কোলাহল ছাপিয়ে ষাঁড়ের আওয়াজে হাঁকলেন, "বর দেখতে গেছিল কারা, চিনে নিক না, তা হ'লেই তো গোল চোকে, বাকি গুলোকে গলা ধাক্কা দিয়ে মিউনিসিপালিটির নালা নদ্দর্মায় রেখে আসা যায়।" অনেক হাঁক ডাক করে অবশেষে জানা গেল কে যে বর তা' কেউই চেনেন না, এ বলে এ, ও বলে সে। সবাই বেশ একটু কড়া রকমের নেশা করে ছেলে দেখায় গেছিলেন, তাঁদের পুরো হুঁস থাকলে তো তাঁরা বর চিনবেন?

অগত্যা কার যে আজ বিবাহ, কে যে এ আসরের বর,—এই মঙ্গল উৎসবের আসল মানুষটি, তা' আর কিছুতেই ঠিক হ'লো না, উত্তরোত্তর শুধু কোলাহল বেড়েই চললো। অথচ বর বিনা আসর কি হয়, বিবাহ কি সাজে, শুভকার্য্য কি সফল হয়, উৎসব কি জমে? বর নেই সে তো এক দুর্দ্দৈব বটেই, কিন্তু এরকম বরবাহুল্য যে গোদের উপর বিষ ফোঁড়া! যে আসে সেই বলে আমি বর। তখন চারটি বরযাত্রীদলের যত রবাহুত ও অনাহুতরা আওয়াজ তুললো,

আচ্ছা বর যেন নেই, তোমাদের কনে আছে কি? দোর দরজা ভাঙ, বাড়ীর মধ্যে ঢোক, দেখ কনে আছে কিনা। কনেকে আন, মঙ্গলপিঁড়িতে বসিয়ে কপালে কনে চন্দন দিয়ে রাঙা চেলী পরিয়ে স্বয়ংম্বা লক্ষ্মীকে নিয়ে এস, মা যার গলায় আজ মালা দেবেন সেই বর, যাকে সাতটিবার প্রদক্ষিণ করে যাবেন সেই এ আসরের রাজা, এ সুরসভার সুরপতি, এ মঙ্গল উৎসবের আসল মনের মানুষ।

বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখা গেল কনে নেই, যে নড়িধরা কোঁকড় আকৃতি বুড়ীকে কনে সাজানো হয়েছিল সে বেগতিক দেখে পালিয়েছে, শূন্য পিঁড়ি পড়ে আছে, সেখানে শুধু মেয়েদের হাসি টিটকারী ঠেলাঠেলি গা টেপাটেপি, ক্ষুরের মত বাঁকা চাহনী আর ফিস ফিস সুরে রঙ্গরস। দরজা ভেঙে মালা ছিঁড়ে আলপনা মাড়িয়ে পুরুষের দল বীরদর্পে সেখানে ঢুকেছিল বটে কিন্তু শেষে আর পালাতে পথ পায় না। ঘনঘন বিঘূর্ণিত বাউটি চুড়ি শাঁখা ইয়ারিং নোলক নথের তাড়নায় সবাই তটস্থ, সবাই পিছিয়ে পড়লে বাঁচে।

খুব খানিকটা হাতাহাতি গালাগালি ছাতা-পেটাপেটি হয়ে আসর ভেঙে গেল। সবাই পেলেন চাঁদার বদলে উত্তম মধ্যম গুঁতো। শেষে অবিশ্যি আসল কথাটা শোনা গেল যে, নাটুদত্ত হাতাহাটের বিয়েপাগলা রসিক মিত্তিরের সঙ্গে একটু রঙ্গরসিকতা করতে গিয়ে নিজেই ঠকেছেন। নিজের বুড়ী আশী বছুরী ধাই মাকে কনে সাজিয়ে মিত্তিরপোকে অপ্রতিভ করবেন খবর পেয়ে মিত্তির নাকি তাঁর ইয়ারদের মারফত চতুর্ধা হয়ে প্রকাশ হয়েছিলেন। আসল কথা হচ্ছে, এ আসরের না ছিল বর না ছিল কনে।

বাপু হে! ভাষ্য অনাবশ্যক। তোমরা ইয়ং ইণ্ডিয়ার দল অস্থার্থ করে নিও, তোমাদের পলিটিক্যাল বিয়ে বাসরে কাজে লাগবে, তোমাদের একটু ধাতস্থ করবে। কনেটি হবে কুঁজো নড়িধরা কুণ্ডলী পাকানো বুড়ি নয়, নূতন যুগের লক্ষ্মী ঠাকরুণটি; আর বর হবে যারই মাথায় টোপর আছে সেই-ই নয়, একজন কেউ। তবেই তো তোমাদের বরযাত্রী যাওয়াও হবে আর চাঁদাও জুটবে। সমস্তটাই যদি একটা পেল্লায় রঙ্গরস হয়, সেরেফ ফাঁকা আওয়াজ হয়, চতুরালির ভুয়ো ফানুস হয়, আপমৎলবীর হাট বাজার হয়, তা' হ'লে সে ক্ষেত্রে সবাই সমান ঠকে। মেকীর ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই-ই ঠকে, কেবল দু'জনার ঠকার রকমটি আলাদা; একটী সদ্য ফলদায়ী আর একটি বিলম্বে ফলপ্রসূ, একটি দাবাগ্নি আর একটি ফিন্‌কির আগুন। মেকী রাজার রাজত্ব হ'লেও তা' দু'দিনের,—বিজয়লক্ষ্মীর একটা নির্ম্মম পরিহাসমাত্র। সত্যকার বিবাহে শুভকার্য্যটিই প্রধান, মন্ত্রউপচার বাদ্য রোশ্‌নাই আহার বিহার সেই শুভ যজ্ঞেরই অঙ্গভূষণ; এগুলি করলে সত্যটি প্রকট ও ভূষিত অলঙ্কৃত হয়ে দেখা দেয়, তা' বলে এসব না করলেও যে চলে না তা নয়, দেবতা ও অগ্নি সাক্ষী করে শুধু মন্ত্রেও বিবাহ হয়।

এই তোমাদের রাজনীতির বিবাহ বাসরে তোমরা খুঁজে দেখ উৎসবলক্ষ্মীর যুগপ্রতিমাটি— সে দেবী কোথায়,—আনন্দোৎসবের সে আনন্দবিগ্রহ জাগ্রত কিনা,—কোন্ মানুষকেই বা সে

শক্তিঘনা জীবনরাণী আপন রাজপাটের জন্য চেয়েছেন,—কার ললাটে তাঁর শ্রীহস্তের টিকা আপ দীপ্ত,—কার পদস্পর্শে ধরণী কাঁপে, গ্রহ নক্ষত্র টলে, শক্তির ছন্দ জাগে, মা আমার আপনি ব ধরেন।—সেই তাঁর মানুষ, তারই আজ বিবাহ, সেই শুভবজ্ঞের আমন্ত্রণে তোমরা নিমন্ত্রিত।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘো

মাঘে

গয়ায় কংগ্রেস—কংগ্রেস পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই অকপট হিতৈষণায় কা করিতেছেন। যদিবা ইঁহাদের অবলম্বিত গোটা পদ্ধতিটাই ভ্রান্ত হয়, তবুও ইঁহাদের ত্রুটীে বা পরাজয়ে টিট্‌কারী দেওয়া চলে না। মনে বিষের জ্বালা না থাকিলে সমালোচনায় হাসি-তামা চলিতে পারে, কারণ হাস্যরস, সাহিত্যের ব্যঞ্জনে লবণ; কিন্তু যে পরিহাসে কেহ কেহ বলিতেছেন যে এবারে গয়া ক্ষেত্রে মৃত কংগ্রেসের পিণ্ড পড়িয়াছে, সেটা নিষ্ঠুর পরিহাস। উহাতে ঘৃণার উপেক্ষা আছে, বিষের জ্বালা আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমালোচনাতেও যেখানে এই বিষের জ্বালা ও গোলদীঘির নামে জলাতঙ্ক লক্ষ্য করিয়াছি, সেখানেই ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমাদে সকলের কাজের সকল জয়-পরাজয়ের সঙ্গেই যে সামাজিক মঙ্গলের সম্পর্ক আছে, সমাজ-তত্ত্বে সেই মোটা কথাটা ভুলিয়াই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘৃণা করি ও উপেক্ষা করি, এবং মত-ভেদ সহিতে পারি না।

কংগ্রেসের অনুষ্ঠের পদ্ধতিগুলি উপযোগী মনে না করায়, এবারকার সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, এই সম্বন্ধে একটি নূতন দল গড়িতেছেন যে, তাঁহার মতের প্রভাব বাড়াইয়া অপর সকলকে সেই মতের অনুবর্ত্তী করাইবেন। অপরকে বিষ-চক্ষে না দেখিলে, লোকে এই পন্থাই অবলম্বন করে। ভারতবর্ষ শাসনের জন্য যে সকল বিধি ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে সম্পর্কেও দাস মহাশয় এই পন্থা অনুসরণ করেন না কেন, তাহা স্বভাবতই এরূপ স্থলে মনে পড়ে। দাস মহাশয় সমালোচনা-সহিষ্ণু, দক্ষ আইন-ব্যবসায়ী; কাজেই মন কষা-কষির ভয় না রাখিয়া তাঁহার কাজের ও উক্তির সমালোচনা করিতে পারি।

দাস মহাশয়ের অভিভাষণে রাষ্ট্রীয় বিধি অমান্যের পক্ষে যে সকল কথা আছে, তাহার সুসঙ্গতি ধরিতে পারি নাই। যাহা অন্যায় ও অহিতকর, তাহা যে পরিহার্য্য, ইহা বুঝাইবার জন্য কোন দেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্তে প্রয়োজন নাই। একথা কিন্তু সকল সময় বলা বা ভাবা চলে না যে, আমি যাহা অন্যায় মনে করি, অপর পক্ষে অন্যায় জানিয়াই তাহার অনুষ্ঠান করেন। আমার বিবেচনায় গবর্ণমেন্টের যাহা কিছু অন্যায় কাজ, তাহাই যে গবর্ণমেন্ট শয়তানি বুদ্ধিতে

করিতেছেন, একথা বলিতে গেলে আপনাকে বাদ দিয়া বিশ্বের সকলকে শয়তানের দলে ফেলিতে হয়। আরও কথা আছে।

ইংরেজেরা কেন আসিয়া দেশ দখল করিল, আর কেনই বা উঠিয়া যাইতেছে না, সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক; তর্ক করিয়া কিছু বুঝাইলেও তাহারা দেশ ছাড়িবে না, নিশ্চিত। দেশ শাসন করিতে হইলে নিশ্চয়ই আইন-কানুন রচিয়া তাহা প্রতিপালনের কড়া ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক লোকেই সে আইনকে প্রতিপাল্য মনে করিতে না পারে; আমাদের বিবেচনায় যে ব্যক্তি চোর, সে দণ্ডবিধির নিয়মটাকে ন্যায্য মনে করে না,—কেন যে ধনীরা তাহাকে টাকার ভাগ দিবে না, তাহা সে বোঝে না। নদীয়া জেলার প্রসিদ্ধ বিশে ডাকাত এই মর্ম্মের সংস্কৃত বচনের দোহাই দিয়া ধনী অধ্যাপকের টাকা লুটিয়াছিল যে, কৃপণের ধন দস্যুর অধিকারে যায়। দস্যু যদি আলেক্জাণ্ডার হইতে পারে, তবে সে আইন অগ্রাহ্য করিয়া নিজে আইনের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারে,—নহিলে নয়। পররাজ্যে হউক, "স্বরাজ্যে" হউক, বাঁধা আইন চলিবেই, আর সে আইনে ভুল, ত্রুটিও থাকিবেই। সে স্থলে যদি আইন সংশোধনের চেষ্টা ছাড়িতে হয়, তবে বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ ঘটাইতে হয়। আকাশ-পাতাল মতভেদে যদি দাস মহাশয় কংগ্রেসের মত ও পদ্ধতি বদলাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, তবে যে গবর্ণমেণ্টকে বিদ্রোহ বাধাইয়া তাড়াইয়া দিতে চাহেন না, তাহার বিধি ব্যবস্থাদির সংশোধনের কথা না বলিয়া, উহার অপ্রতিপালনের কথা তুলিলেন কেন? আমার প্রশ্ন, সহযোগেরও নয়, অসহযোগেরও নয়,—যাহা ন্যায্য তাহাই ভাবের প্ররোচনা-হীন সুযুক্তিতে বুঝিতে চাই।

উচ্চশিক্ষা বিষয়ে লর্ড লিটনের উক্তি—আমাদের গবর্ণর বাহাদুর স্কটিস্ কলেজের জন্মতিথির সভায় উচ্চশিক্ষার্থী যুবকদের ইউরোপ যাত্রার প্রয়োজনের কথা বলিবার পর বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, যাহাতে এদেশেই উচ্চশিক্ষা সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হয়, তাহার সুব্যবস্থা হওয়া উচিত। কথাটি চমৎকার; কিন্তু এখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার যতটুকু ব্যবস্থা আছে, তাহাই যে গবর্ণর বাহাদুরের শিক্ষা সচিবের ব্যবস্থায় রক্ষা করা দায় হইয়াছে। অতি অল্প টাকা ব্যয়কেই যদি অপব্যয় বলা যায়, তবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা কোথা হইতে আসিবে? ইউরোপের শিক্ষার ব্যবস্থায়, আর্টস্ বিভাগের শিক্ষার জন্য যে রকমের ব্যয় হয়; তাহার শতাংশ ব্যয় করিবার প্রস্তাব তুলিলেও দেশের বিজ্ঞ সমালোচকেরা মূর্চ্ছা যাইবেন; বিজ্ঞান বিভাগের কথার ত উল্লেখেরই প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যেই ব্যয় সঙ্কোচের প্রসঙ্গে রব উঠিয়াছে যে, শিক্ষা বিভাগের ব্যয় আরও কমাইতে হইবে। জাতীয় মনুষ্যত্ব বিধানের জন্য যাহা

প্রয়োজনীয়, তাহারই উপর যত চোট পড়িতেছে। সমর বিভাগের ব্যয় কমাইবার কথা কোন সরকারী মন্তব্যে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সার মণ্টেগু ওয়েব দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন যে, যখন ভারত সীমান্তে যথার্থই যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল, ও যুদ্ধ ঘটিবার ভীষণ আশঙ্কা ছিল; তখন ত্রিশ কোটি টাকায় সকল ব্যয় কুলাইত, আর এখন সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক অবস্থায় ও প্রায় নিরুপদ্রব রাজত্বের সময়ে সেই ব্যয় বাড়িয়াছে প্রায় ৭০ কোটী টাকাতে। তিনি দেখাইয়াছেন যে এক দিকে যেমন জিনিস পত্রের মূল্য চড়িয়াছে, অন্যদিকে আবার তেমনি সৈন্যের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন সস্তা গণ্ডার দিন নয় বলিয়া তিনি বেশী করিয়া টাকা ধরিয়াও দেখাইয়াছেন যে ৪৫ কোটী টাকাতেই কুলাইয়া যাইতে পারে,—আর না হয় সে জন্য ৫০ কোটী পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা চলে। গবর্ণমেণ্ট এই ন্যায্য কথাটুকু মানিলেই, এই দরিদ্র দেশের বিশ কোটী টাকা দেশের যথার্থ উন্নতিতে ব্যয়িত হইতে পারে।

টানাটানির দিনে যে কেন ঢাকায় একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় বসিল, তাহা জানিনা। ১৯১২ অব্দে বঙ্গ-বিভাগ তুলিয়া দিবার সময়ে গবর্ণমেণ্ট নাকি প্রতিশ্রুত ছিলেন যে মুসলমানদের হিতের জন্য ও তাঁহাদের মহজবি শিক্ষা বাড়াইবার জন্য ঢাকায় নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয় বসিবে। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতেও সে শিক্ষার কোন আয়োজন দেখি না; বরং এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাহা আছে, ঢাকায় তাহা নাই। মুসলমানেরা যে ঢাকায় পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই না; পূর্ব্বাঞ্চলের মুসলমানেরা সংখ্যায় অধিক, অথচ ঢাকায় মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা খুব অল্প। এবার কেবল ১৭ জন এম্, এ, ও এম্ এস্ সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার মধ্যে এম্, এ পরীক্ষায় কেবল একজন মুসলমান ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—আর তাহাও মুসলমানি বিদ্যায় নয়,—ইংরেজী সাহিত্যে। সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কলিকাতা পোষ্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগের ছাত্র সংখ্যার অনেক কম, কিন্তু ব্যয় অনেক অধিক। একদিকে যদি এইভাবে টাকা কড়ির ব্যয় হয়, আর অন্য দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যয় না চলে, তবে আর কেমন করিয়া আশা করিব যে, গবর্ণর বাহাদুরের উক্তির অনুরূপে উচ্চশিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা হইতে পারিবে?

* * *

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শত্রু—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে লোকের কাছে নিন্দিত করিবার জন্য যাঁহারা সমালোচনা করেন, তাঁহাদের কোন ব্যক্তি নিন্দার কথায় সমর্থনে একবার শ্রীযুক্ত সেড্‌লার সাহেবের নাম করিয়াছিলেন; সেড্‌লার মহাশয় সে বিষয়ে সমালোচককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি মুদ্রিত না করিয়া, শ্রীযুক্ত সেড্‌লারকে ত্রুটী স্বীকার করিয়া পত্র লেখেন; কাজেই লোকে কিছু জানিতে পারে নাই। তাহার পর সমালোচকের পক্ষের প্ররোচনায় যখন টাইমস্ পত্রে গালি মন্দ বাহির হইল, তখন শ্রীযুক্ত সেড্‌লার উহার প্রতিবাদ করেন, এবং

বিশ্ব-বিদ্যালয়টি যে, সার আশুতোষের প্রশংসনীয় যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা লেখেন। এ সংবাদ প্রচার করিবার দিকে সমালোচকের পক্ষের কোন উদ্যোগ হইবে কি? ইহাতেই সমালোচনার মূল্য ধরা পড়ে।

* * *

শিক্ষাপ্রসারে বিস্ সাহেবের মন্তব্য—বিস্ সাহেবের রিপোর্ট পড়িয়া বোঝা যায়, তিনি অকৃত্রিম উৎসাহী এবং লোক সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য উদ্যোগী। কিন্তু দেশের নিম্নস্তরের লোকে কি শিক্ষা চায়, ও কি করিলে, লেখাপড়ার দিকে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া পদে পদে অনেক ভুল করিয়াছেন। ইউরোপীয় চশমায় ভারতকে দেখিলে যাহা ঘটিতে পারে, তাহাই ঘটিয়াছে। এদেশের লোককে সুসভ্য করিবার অতি সরল ও অকপট বুদ্ধিতে যদি কোন ইউরোপের লোক বিলাতি পোষাকের ব্যবস্থা করেন, আর দেশের লোক তাহা না লইতে চায়, তবে কি বলা চলে, যে এদেশের লোকেরা উন্নত হইতে চায় না? বিস্ সাহেবের শিক্ষা পদ্ধতি লোকেরা যে আদর করিয়া লয় নাই, তাহাতে বিস্ সাহেব বুঝিয়াছেন, যে শিক্ষায় ইহাদের আস্থা নাই।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যায় সকল পাড়া গাঁয়ের 'ছেলে' মেয়েরা বিনা ব্যয়ে পাঠশালায় জুটিয়া লিখিতে পড়িতে শিখিত; এখন সরকারী ব্যবস্থায় যে সকল গ্রাম্য পাঠশালা হইয়াছে, তাহাতে অনুরোধ উপরোধ করিয়াও ছেলেমেয়ে আনা যায় না। পাদ্রীদের বিচারে তখন ছেলে মেয়েরা কুসংস্কারের বই পড়িত; কুসংস্কার রাখিয়া সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিত, কিন্তু সু-সংস্কারের যুগে তাহা বাদ পড়িয়াছে। সুসংস্কারকে যদি মনোহর ও চিত্তাকর্ষক করিতে না পারা যায়, তবে ছেলেমেয়েরা পড়িতে আসিবে কেন? আর পড়িতে আসিলেও যাহা মনোহর নয় বলিয়া কেবল মুখস্থ করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা যে মানসিক বিকাশের সহায় নয়, তাহাও নিশ্চিত। পাঠশালার বই যে কলে তৈরী না হইলে অগ্রাহ্য হয়, সে কলের ভিতরে চিত্তাকর্ষক সাহিত্য রচিত হইতে পারে না।

বিস্ সাহেবের বুদ্ধির ভুলের একটা দৃষ্টান্ত দিলেই, তাঁহার ভ্রান্তির মূল ধরিতে পারা যাইবে। এটা যে বর্ব্বর দেশ নয়, আর এদেশের সাহিত্যের ও লিপির যে অতি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া বিস্ সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 'বাঙ্গলা বর্ণমালার' কঠোরতা দূর করিয়া রোমান অক্ষর অর্থাৎ ইংরেজী অক্ষর চালাইবেন। একবার এই বিষয়ে এইরূপ প্রস্তাব উঠিয়াছিল, আর তাহাতে হয় রোমান অক্ষর না হয় নাগরী অক্ষর চালাইবার কথা হয়। এই উপহাসযোগ্য বিষয়ে তর্ক তুলিব না, তবে সে প্রসঙ্গে একবার যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

সর্ব্বরোগের শান্তি যেমন বিজ্ঞাপনের ঔষধে,
লব্ধ যথা কাব্য-কলা,—ছড়াশুদ্ধ নৈষধে,
সহায় যথা সকল বৃক্ষ, দুর্ভিক্ষ-উৎখাতে,
সর্ব্বরাষ্ট্র নীতির সিদ্ধি ঘটায় যেমন গুর্খাতে,
বাড়বে তেমনি বাঙ্গলা,—যদি হরফগুলি পাকড়ায়ে,
সাজাও তাকে রোমান সাজে কিংবা পেটাও নাগরাইয়ে।

* * *

ইউরোপের অশান্তি—লোজান্ শহরের বৈঠক এখনও বসিতেছে, কিন্তু তুর্কীদের দাবীদাওয়ার শেষ ফয়সালা হয় নাই। ধর্ম্মের সূতায় রাষ্ট্রনীতিকে না জড়াইয়া তুর্কী নূতন উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছে; সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাধা পড়ে নাই। রণতরী লইয়া দর্দনলিষের পথে কি ভাবে যাতায়াত হইবে, এবং মুসলমানের রাজ্যে অ-মুসলমানদের কি ব্যবস্থা হইবে, এসকল বিষয়ের নিস্পত্তিতেও বেশি গোল ঘটিবেনা। গোল ঘটিয়াছে, মেসোপোটিমিয়া লইয়া; মোশাল, আরবের নয় আর সেখানকার লোকেরা না কি তুর্কীর অধীনতাই চায় আশা করি সন্ধির প্রস্তাবে এই মোশাল, মুষল হইয়া উঠিবে না।

জর্ম্মানিকে দুঃস্থ করিবার জন্য ফরাসীরা জিদ্ ধরিয়াছে, আর ইতালি ফরাসীর সহায় হইয়াছে। ইংরেজেরা বলেন যে, জর্ম্মানিকে গলা টিপিয়া ও পায়ে দলিয়া টাকা আদায় করিবার প্রবৃত্তি অতি অন্যায় প্রবৃত্তি; কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ জানেন যে, বহুকাল হইতেই জার্ম্মানির রাইনধৌত প্রদেশটির উপরে ফরাসীদের লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে; তাহারা এখন সুযোগ পাইয়া, সন্ধির সর্ত্ত উড়াইয়া দিয়া জোর করিয়া কাফ্রী সৈন্য বসাইয়া রুর জেলাটি দখল করিয়া টাকা আদায় করিতে চায়। শুনিতে পাইতেছি ঐ প্রদেশের জর্ম্মানেরা মরিলেও ফরাসীর কব্জায় থাকিয়া টাকা উশুল দিবার ব্যবস্থায় কোন কাজ করিবেনা। এত নির্য্যাতন অপমানের স্মৃতি জর্ম্মানিতে যে লুপ্ত হইবেনা, জিদের উষ্ণতায় ফরাসীরা তাহা ভাবিতেছেনা। পরের ঋণে জড়াইয়া অষ্ট্রীয়া এখন পরাধীনের অপেক্ষাও নীচতর অবস্থায় জীবন বহিতেছে; আর, দুর্দ্দিনে পড়িয়া জর্ম্মানি সকল অপমান সহিতেছে। শান্তি স্থাপনের নামে অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে।

* * *

হাঁসপাতাল সংস্কার—মিনিষ্টার সার সুরেন্দ্রনাথ সরকারি টাকার টানাটানি দেখিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, দাতব্য ঔষধালয়গুলিকে হাতব্য ঔষধালয় করা হউক; অর্থাৎ রোগিদের জন্য হাঁসপাতালে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে, তাহার ততখানি রাখা হইবে না, আর প্রতিদিন যাহারা হাঁসপাতালের দরজায় আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়, তাহাদিগকে কিছু কিছু পয়সা দিতে হইবে। এইরূপে যাহাদের কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে, তাহারা হাঁসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসা

করাইতে চায় না,—কেবল দায়ে ঠেকিয়াই জনকতক লোক হাসপাতালে বাস করিতে যায়। তাহার পরে আবার যাহারা পয়সা দিয়া অনায়াসে ঔষধ কিনিতে পারে, তাহারা কাঙ্গালী বিদায়ের আসরে যাইবার মত কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া, ডাক্তারের চকিত দৃষ্টিতে রোগ নির্ণয় করাইয়া ঔষধ প্রার্থনা করে না। ব্যয় সঙ্কোচের সম্বন্ধে প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল অসহায় রুগ্নদের পক্ষের অতি ক্ষুদ্র ব্যবস্থার দিকে; যাঁহাদের কোন অভাব নাই, সেই ধনীদের মোটা ভৃতি বা বৃত্তির দিকে নজর পড়িল না। হয়ত বা ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হইয়াছে যে, যাঁহারা মরিতেই বসিয়াছে, তাহারা মরুক। প্রস্তাবটির স্বপক্ষে এই উক্তিটি তুলিতে পারি—

দরিদ্রান্ "মার" কৌন্তেয়! "খুব" প্রষচ্ছেশ্বরে ধনম্।

* * *

১৭২ জনের ফাঁসী—চৌরীচৌরায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে মহাত্মা গান্ধী বারদৌলিতে অসহযোগনীতি অবলম্বন স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বোধ হয় সকলেরই মনে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। উত্তেজিত জনসঙ্ঘ সেই সময় ২৩ জন পুলিসের লোককে মারিয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়াছিল। সে হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহ নৃশংস, ঘৃণ্য ও বর্ব্বরোচিত—কিন্তু তাহার বিচারফলও তদুপযুক্ত লোমহর্ষণ, ভীষণ ও হৃদয়বিদারক। এই সম্পর্কে ২২৮ জন ধৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬ জন বিচারকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে, ১ জন চিররুগ্ন হইয়া পড়িলে মুক্তি পায়, ২ জন দু' বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, ৪৭ জন মুক্তি পায় এবং অবশিষ্ট ১৭২ জনকে লক্ষ্ণৌএর সেসন জজ মিঃ হোম (Holme) শান্তমস্তিকে ফাঁসির আদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতি একজন মৃত পুলিশের জন্য ফাঁসি হইবে ৭½ জনের। এইরূপ বিচার কখনও কোনদেশে হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহা ভারতের বিশেষত্বের অন্যতম। শুনা যাইতেছে, এই বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হইবে; সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কোন আলোচনা করা হইল না।

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক রীস্ ডেভিড্স্—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে সুপণ্ডিত রীস্‌ডেবিড্স্ সম্প্রতি ৮০ বৎসর বয়সে জীবনলীলা শেষ করিলেন। ১৮৬৬ অব্দে ২৩ বৎসর বয়সে যখন সিংহলে সিবিল সার্বিসের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখনই ইঁহার দৃষ্টি সে দেশের প্রাচীন সাহিত্যের উপরে পড়ে। তাঁহারই উদ্যোগে ও যত্নে Pali Text Society স্থাপিত হয়, ও সেই প্রতিষ্ঠান হইতে পালি নামে পরিচিত প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য বহু পরিমাণে মুদ্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্য সংগ্রহে, তিনি পণ্ডিতদের অগ্রণী ছিলেন, এবং তাঁহার পত্নীও বৌদ্ধ-দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিত রীস্ ডেবিড্সের নিকটে ভারতবর্ষ ঋণী আর এই মন্তব্য লেখক নিজে বিশেষভাবে ঋণী।

অম্বিকাচরণ মজুমদার—ফরিদপুরের এই স্বদেশহিতৈষী মহাত্মার নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। পুরাতন কংগ্রেসের ইনি একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন, আর ইঁহার বাগ্মিতায় সকলেই মুগ্ধ হইতেন। প্রায় ৬০ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যু পর্য্যন্ত, তিনি নিজের ওকালতী ব্যবসায়ের বিপুল ক্ষতি করিয়া আপনার আদর্শ অনুসারে দেশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

কুচ্‌বিহারাধিপতি—ভিলের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বেই কুচ্‌বিহারের মহারাজ ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার ৬।৭ বৎসর বয়সের যে শিশু পুত্রটি এখন গদি পাইলেন, বিশেষভাবে তিনি তাঁহার মাতার রক্ষণাধীনেই থাকিবেন; তাঁহার এই মাতা মহারাজ গাইকোয়াড়ের দুহিতা।

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী—শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশের এই কৃতী পুরুষ, ব্যবস্থাপক সভার নূতন ব্যবস্থায় প্রথমে বে-সরকারী সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যায় ও দেশের সাহিত্যে ইঁহার অনুরাগ ছিল। ইঁহার একটি পুত্র হয়ত এখন শিক্ষার্থীরূপে ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—২৪শে পৌষ রাত্রে ৮২ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের জীবন শেষ হইল। জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের উজ্জ্বল রত্নদের মধ্যে ইনি একজন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, আর বোম্বাই প্রদেশ ইঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল; সেই প্রদেশের অনেক বিবরণ তাঁহার বোম্বাই-চিত্র গ্রন্থে আছে। আপনাকে প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি ইঁহার বড় অল্পই ছিল,—তাই ইঁহার বিদ্যাবত্তা, সাহিত্যিক ক্ষমতা ও চরিত্রের মধুরতার কথা কেবল শিক্ষিতেরাই বিশেষভাবে জানেন। বঙ্গ সমাজ-সম্মিলনে তাঁহার পদ্য-আবৃত্তির কথা মনে পড়িতেছে। এদেশে, গীতার অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার পদ্য-অনুবাদখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বপ্ন-প্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ এখনও "দেব-নিকেতন" আলো করিতেছেন, আর ইঁহার কনিষ্ঠদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদের "মনের তিমির" হরিতেছেন, ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বে তাঁহার প্রতিভার আলোক ছড়াইতেছেন। ইঁহার ভগিনীদের মধ্যে, সাহিত্যে সুপরিচিতা স্বর্ণকুমারী দেবী একা জীবিতা।

শুদ্ধি-পত্র

গত পৌষ সংখ্যার 'বঙ্গবাণী'র ৫৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৬০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং মাঘ সংখ্যার ৭৩০ পৃষ্ঠা হইতে ৭৩৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত স্বরলিপির তালাঙ্ক-সারিকাতে যেখানে যেখানে '২' অঙ্কের শিরোদেশে রেফ-চিহ্ন ছাপা হয় নাই, সে সকল স্থানে রেফ বসিবে, যথা......২´,

এবং ৫৫৯ পৃষ্ঠায়......| (র্র র্র র্রা ননা ননা) } |......ইহার
অ নু ধ "বলে কেন'

পরিবর্ত্তে...... | (র্গ র্মা ননা ননা) } |......হইবে।
অ নু ধ "বলে কেন'

এই দুইটী ছাপার ভুল। 'বঙ্গবাণী'র সঙ্গীতপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ ভুলকয়টী সংশোধন করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা

Printed & published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.